বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল

(১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রীঃ)

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের লেখা
ভূমিকা সংবলিত

শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় এম.এ.
অধ্যাপক, বিশ্বভারতী

ভারতী বুক স্টল
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯

দ্বিতীয় সংস্করণ,
১৯৬৬

মূল্য—পনেরো টাকা মাত্র

প্রচ্ছদ:
সুখেন গাঙ্গুলি

প্রকাশক:
হৃষীকেশ বার্রিক
ভারতী বুক স্টল,
৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর:
শ্রীগৌরহরি মাইতি
বাণী-মু
৯এ, মনমোহন বোস ষ্ট্রীট
কলকাতা-৬

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধাভাজন

ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার

মহোদয়ের করকমলে

ইতিহাসের লক্ষ্মী ওঠেন
এই জীবনের সিন্ধু-তীরে,—
বিস্মরণের সরণীতেই
তাঁর নিলয়ে চলেন ফিরে।
মিলিয়ে গেল রথখানা তাঁর
মহাকালের ঘোড়ায় টানা ;
চাকার আঁকা দাগ দেখে আজ
মিলবে কি তাঁর ঠিক্ ঠিকানা ?

ভূমিকা

এ বইখানি বাংলায় স্বাধীন মুসলমান রাজ্যের প্রতিষ্ঠা থেকে আরম্ভ করে মুঘল যুগের অব্যবহিত পূর্বে শের শাহের অধিকার পর্যন্ত বাংলা দেশের একখানি সম্পূর্ণ ইতিহাস। অবশ্য এতে গণেশ ও হোসেন শাহ এবং আর কয়েকজন সুলতানের প্রসঙ্গ যেমন বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে, অন্য রাজাদের বর্ণনা তার তুলনায় কিছু সংক্ষিপ্ত। কিন্তু সংক্ষিপ্ত হলেও অন্যান্য রাজগণের সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্যই আলোচনা করা হয়েছে এবং প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে তাঁদের রাজত্বের ঘটনাগুলির বিচার করা হয়েছে। মোটের উপর ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ইতিহাস দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হবার পর বাংলা ভাষায় বাংলা দেশের মুসলমান যুগের প্রথম ভাগের এরূপ ধারাবাহিক ইতিহাস আর কেহ লেখেন নাই। ইংরেজীতেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত বাংলার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড ব্যতীত এই যুগের আর কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নাই।

গ্রন্থকার বাংলা দেশের মধ্যযুগের সাহিত্য ও ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর পূর্ব-প্রকাশিত গ্রন্থের ন্যায় এই গ্রন্থেও গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। বস্তুতঃ এই যুগের সম্বন্ধে জ্ঞান ও গবেষণায় তিনি যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ এ সম্বন্ধে আজ আর কোন সন্দেহ নাই। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি যে সকল নূতন তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন এবং জটিল ঐতিহাসিক সমস্যাগুলি যেরূপ নিপুণভাবে ও যুক্তির সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন তাতে মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসে তাঁকে একজন বিশেষজ্ঞ বলে অভিনন্দিত করতে কারও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা হবে না বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

রাজা গণেশের সম্বন্ধে এমন সম্পূর্ণ ও যুক্তিমূলক বিবরণ আর কোন গ্রন্থে নাই। অবশ্য গণেশের সম্বন্ধে সকল সমস্যারই চূড়ান্ত মীমাংসা করবার মত প্রমাণ আমাদের হাতে নাই—সুতরাং কতকগুলি ঘটনা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকবেই। কিন্তু এ যাবৎ যেখানে যা কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে—তার একটিও গ্রন্থকারের দৃষ্টি এড়ায় নি বলেই মনে হয়। আর তার থেকে তিনি যে সকল সিদ্ধান্ত করেছেন তাও খুব যুক্তিসঙ্গত। গণেশ ও ইব্রাহিম শর্কীর বিরোধ সম্বন্ধে তিনি সম্প্রতি-আবিষ্কৃত কতকগুলি নূতন তথ্যের সাহায্যে যে সুচিন্তিত মন্তব্য করেছেন তা খুবই প্রামাণিক বলে গ্রহণ করা যায়। এ সম্বন্ধে

এতদিন যে কতগুলি অস্পষ্ট ও পরস্পরবিরুদ্ধ ধারণা ছিল তা দূর করে তিনি একটি মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ দিয়ে বাংলার ইতিহাসের এই অন্ধকার যুগের উপর নূতন আলোক পাত করেছেন। নূর কুৎব্ আলম ও আশ্‌রফ সিম্‌নানী ইব্রাহিম শর্কীকে বাংলার কাফের রাজার বিরুদ্ধে যে ভাষায় উত্তেজিত করেছিলেন (দ্বিতীয় সং, পৃঃ ১১:-১৩) তাতে বোঝা যাবে সে যুগে হিন্দু ও মুসলমানের প্রকৃত সম্বন্ধ কি ছিল। যাঁরা মনগড়া হিন্দু-মুসলমানের কাল্পনিক ভ্রাতৃভাবে বিশ্বাস না করে এ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানতে চান—তাঁরা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ১১০ থেকে ১২৬ পৃষ্ঠা পড়লে অনেক খাঁটি তথ্য পাবেন। আর গণেশ এই প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করে যে অন্ততঃ কিছুকাল গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেছিলেন তাতে প্রমাণিত হয় যে রাজা গণেশ একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী পুরুষ ছিলেন। বাঙ্গালী ও বাংলার ইতিহাস তাঁর স্মৃতির যথোচিত সমাদর করেনি। বাঙ্গালীর এই অপবাদ কতকটা দূর করে গ্রন্থকার আমাদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

হোসেন শাহ সম্বন্ধে যে রকম পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এই গ্রন্থে আছে পূর্বে তা কখনও পড়িনি। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের একটি প্রশংসনীয় উদ্যমের কথা উল্লেখ করা উচিত। অনেক প্রচলিত ও বদ্ধমূল ধারণার মূলে যে কোন সত্য নেই তিনি তার কতকগুলি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। হোসেন শাহ সম্বন্ধে কতকগুলি ধারণা এদেশে প্রচলিত আছে। তিনি নাকি বাংলা সাহিত্যের বড় একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁর ধর্মমত নাকি ছিল খুবই উদার (দ্বিতীয় সং, ৩৯৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এই সব কারণে 'হোসেন শাহী আমল' নামে বাংলার ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়েরই সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বাংলার মুসলমান যুগের এই আদর্শ রাজার সম্বন্ধে ৺দীনেশচন্দ্র সেন থেকে আরম্ভ করে বর্তমান কালের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসলেখকেরা যে কাল্পনিক কাহিনী ইতিহাস বলে চালিয়ে এসেছেন আলোচ্য গ্রন্থে তা একেবারে ভূমিসাৎ হয়েছে। এটি গ্রন্থকারের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক অবদান বলে আমি মনে করি। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে (দ্বিতীয় সং, ২২০ পৃঃ) এবং মৃগাবতীর শ্লোকে (দ্বিতীয় সং, ৩৯৬ পৃঃ) যে হোসেন শাহের উল্লেখ আছে—তিনি যে বাংলার সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ এটা সকলেই বিনা বিচারে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু গ্রন্থকার যে সমস্ত যুক্তি দেখিয়েছেন তাতে বিজয় গুপ্তের বর্ণিত হোসেন শাহ যে জলালুদ্দীন ফতে শাহ—তা'ই অধিকতর সঙ্গত মনে

হয়। অধ্যাপক সৈয়দ হাসান আসকারির মত উদ্ধৃত করে গ্রন্থকার দেখিয়েছেন যে মৃগাবতীর হোসেন শাহও খুব সম্ভবত ভিন্ন ব্যক্তি। হোসেন শাহ বিদ্যা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কিনা এবং তাঁর ধর্মসম্বন্ধীয় নীতি কতটা উদার ছিল—এই দুইটি প্রশ্ন সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা দ্বারা গ্রন্থকার যে প্রচলিত মতের ভ্রান্তি দেখিয়েছেন (দ্বিতীয় সং, ৩৯৩-৪১১ পৃঃ) তা এই গ্রন্থের একটি বিশেষ মূল্যবান অংশ। হোসেন শাহের সম্বন্ধে আর একটি প্রচলিত ধারণা এই যে তিনিই প্রথম সত্যপীরের সির্নি প্রবর্তন করেন। এ সম্বন্ধে যে কোন প্রমাণ নাই এবং সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে গ্রন্থকার সে সম্বন্ধে অনেক যুক্তি দেখিয়েছেন।

হোসেন শাহের প্রসঙ্গে গ্রন্থকার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন। 'রাজমালা' নামক ত্রিপুরার ইতিহাস বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। দুর্গামণি উজীরের সম্পাদিত (ও সংশোধিত) পুঁথিই এখন আমাদের একমাত্র সম্বল। এবং এর থেকে মূল পুঁথি রচনার তারিখ ও ইহার ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করে যাঁরা এই গ্রন্থ সম্বন্ধে থিসিস্ লেখেন তাঁরাও জানেন না যে এর পুরাতন পুঁথি এখনও পাওয়া যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত একখানি পুঁথির গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন। দুর্গামণি উজীর কর্তৃক রাজমালা সংশোধনের আগেই এই পুঁথি লিপিকৃত হয়েছিল। এই পুঁথি থেকে ত্রিপুরার রাজা ধন্যমাণিক্যের বঙ্গদেশ আক্রমণ ও হোসেন শাহের ত্রিপুরা-অভিযান সম্বন্ধে যে অংশ গ্রন্থকার উদ্ধৃত করেছেন তার সঙ্গে মুদ্রিত রাজমালার পাঠের অনেক অনৈক্য দেখা যায়। এ সম্বন্ধে গ্রন্থকার সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। বাংলা দেশ ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে এই পুরানো রাজমালার পুঁথি অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান দিয়েছে। গ্রন্থকার এটি উদ্ধৃত করে বাংলা ঐতিহাসিক সাহিত্যের সমৃদ্ধি খুব বাড়িয়েছেন।

এ পর্যন্ত যা লেখা হয়েছে তা থেকেই আলোচ্য গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা যাবে। বাংলা সাহিত্যে এই গ্রন্থখানির স্থান যে খুব উঁচুতে এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি এই উদীয়মান প্রতিভাশালী লেখককে সম্বর্ধনা করে ও অভিনন্দন জানিয়ে এই ভূমিকার উপসংহার করছি।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

গ্রন্থকারের নিবেদন

(প্রথম সংস্করণ)

বর্তমান বইটি পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আজ যেমন আমার আনন্দ হচ্ছে, তেমনি আবার আশঙ্কাও হচ্ছে। কারণ মধ্যযুগের বাংলাদেশের ইতিহাস রচনার মত জটিল এবং শ্রমসাধ্য কাজ খুব কমই আছে। আলোচ্য যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে কোন সমসাময়িক ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় না। কিছু কিছু সূত্র বিক্ষিপ্তভাবে এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে আছে, সেগুলি অবলম্বন করে অনেক কষ্টে ঐ ইতিহাসকে পুনর্গঠন করে নিতে হয়। কিন্তু এই জাতীয় সূত্রের পরিমাণও এত অপ্রচুর যে পুনর্গঠন সন্তোষজনক হয় না। তাছাড়া এই দুরূহ কাজে হাত দেওয়া তাঁরই সাজে—যিনি সুপণ্ডিত, বহুভাষাবিৎ এবং মুসলিম সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। সেদিক দিয়ে আমার অযোগ্যতা সম্বন্ধে আমি যতটা সচেতন, এমন বোধ হয় আর কেউই নন। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের মধ্যযুগের ইতিহাসের একটি পর্ব সম্বন্ধে বই লিখলাম—একে দুঃসাহস ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। তাই আজ আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কাও হচ্ছে যে আমার দুঃসাহস হয়তো তিরস্কৃত হবে।

এই দুঃসাহস কেন আমার হল, সে সম্বন্ধে আমি এখানে কৈফিয়ৎ দিতে চাই। তা দিতে হলে এই ইতিহাস-গ্রন্থ রচনার ইতিহাসটি সংক্ষেপে বলা দরকার। কয়েক বছর আগে অন্য কোন একটি বিষয় সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে আমার 'রাজা গণেশ' সম্বন্ধে কিছু জানার প্রয়োজন হয়। সে সম্বন্ধে বিভিন্ন ঐতিহাসিকের লেখা সমস্ত আলোচনা পড়েও ঠিক তৃপ্তি পেলাম না, মনে হল ঐ বিষয় সম্বন্ধে বলবার কথা আরও অনেক বাকী থেকে গিয়েছে এবং যেটুকু এঁরা বলেছেন, তারও কিছু সংশোধন দরকার। তখন আমি নিজেই ঐ বিষয় সংক্রান্ত মূল সূত্রগুলি পড়তে এবং এ নিয়ে ভাবতে সুরু করলাম। আমার অধ্যয়ন ও চিন্তার ফল হল 'রাজা গণেশ ও তাঁর বংশ' নামে একটি প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধের পরে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের বাংলার ইতিহাসের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আরও কয়েকটি প্রবন্ধ লিখলাম। সেই প্রবন্ধগুলি একত্র করে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে আমি একখানি বই প্রকাশ করলাম—তার নাম 'রাজা গণেশের আমল'। বইটি প্রকাশের সময় ধরে নিয়েছিলাম যে এ বই বিশেষজ্ঞদের কাছে শুধু ধিক্কার ও উপহাসই লাভ

করবে এবং সেই সঙ্গেই আমার ইতিহাস-রচনা-প্রচেষ্টাতে পড়বে পূর্ণচ্ছেদ। কিন্তু তার বদলে বইটি তাঁদের অনুমোদন ও আশীর্বাদ লাভ করল। বিভিন্ন পত্রিকায় ঐ বইয়ের যে সমস্ত সমালোচনা প্রকাশিত হল, তাতে লেখকের উৎসাহ বিশেষভাবে বর্ধিত হল।

এই সমস্ত সমালোচনার মধ্যে দু'টির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার মনে করছি। মধ্যযুগের বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৩৬৩ বঙ্গাব্দের (৫৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা) পৌষ মাসের 'প্রবাসী'র 'পুস্তক-পরিচয়'- এ (পৃঃ ৩৮২) লেখেন,

"ইতিহাস ও জীবনীর ক্ষেত্রে বিজ্ঞানবিরোধী কল্পনাবিলাস যেভাবে খরতর গতিতে বাংলা সাহিত্যকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে তাহাতে বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক গবেষণা বাংলাদেশে লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিতেছে। উদীয়মান গ্রন্থকার বাংলা ভাষায় এই গবেষণাগ্রন্থ লিখিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। যাঁহারা 'বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস' জাতীয় গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া রাজা গণেশকে রূপকথার নায়ক সাজাইয়া তৃপ্তিবোধ করেন—বহু শিক্ষিত বাঙ্গালী অদ্যাপি করিতেছেন—তাঁহারা আলোচ্য গ্রন্থটি একবার পড়িয়া দেখুন। বর্ত্তমানে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হওয়াতে রাজা গণেশের রাজত্বের উপর প্রচুর আলোকপাত হইয়াছে এবং গ্রন্থকার যাবতীয় উপকরণ বিচারপূর্ব্বক খণ্ডন-মণ্ডন করিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কোন কোন ঘটনার বৈচিত্র্য এতই চিত্তাকর্ষক যে, রূপকথাকেও পরাস্ত করিতে পারে।"

তাঁর এই সমালোচনা আমার জীবনের এক অমূল্য সম্পদ।

'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' রচয়িতা ডঃ সুকুমার সেন ১৩৬৩-৬৪ বঙ্গাব্দের মাঘ-চৈত্র মাসের (২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা) 'যাত্রী' পত্রিকায় (পৃঃ ৬৬-৬৮) 'রাজা গণেশের আমল'-এর যে সমালোচনা করেন, তাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য। ডঃ সেন তাঁর সমালোচনার উপক্রমে লেখেন,

"নানাদিক থেকে সাক্ষ্যপ্রমাণ আহরণে লেখক যে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়েছেন তা এখনকার দিনের গবেষণা গ্রন্থে (অবশ্য বাংলায় লেখা) মিলবে না।"

ডঃ সুকুমার সেন তাঁর সমালোচনা শেষ করেন এই বলে,

"সুখময় বাবু আমাদের ভূতপূর্ব ছাত্র। এঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা রাখি। অনেকদিন কোন বাংলা বই পড়ে এমন তৃপ্তি পাইনি।"

এঁদের এই উক্তিগুলি আমাকে বিশেষ অনুপ্রেরণা যোগায়। তার ফলে এবারে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রবেশের চেষ্টা করেছি—বাংলার দ্বিশতবর্ষব্যাপী স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রীঃ) সম্বন্ধে যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ আকারে আলোচনা করে এই বইটি লিখেছি। এ বই লেখার যোগ্যতা যে আমার নেই, তা আগেই বলেছি। কিন্তু কয়েক বৎসরের অধ্যয়ন ও চিন্তার ফলে যে তথ্যগুলি পেয়েছি, সেগুলিকে প্রকাশ করাই আমি নানা কারণে যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচনা করেছি। আমার অপটু হাতের এই সামান্য প্রচেষ্টার মূল্য নিঃসন্দেহে অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু তার মধ্যে যদি অল্প কিছু প্রয়োজনীয় বস্তুও থাকে, তবে তা পরবর্তী গবেষকদের কাজে লাগবে। সুতরাং তাকে অপ্রকাশিত রেখে কোন লাভ নেই। এই পর্বের ইতিহাস রচনার যোগ্য ব্যক্তি যিনি আসবেন—সেই পরম দক্ষ ও পরম পণ্ডিত ঐতিহাসিকের পথের কয়েকটি কাঁটা হয়ত এই বইটির মধ্য দিয়ে অপসারিত করতে পেরেছি এবং তা যদি পেরে থাকি, তাকেই যথেষ্ট বলে আমি মনে করব।

এই বই লেখার সময় আমি এপর্যন্ত আবিষ্কৃত সব সূত্র থেকেই তথ্য আহরণ করার প্রয়াস পেয়েছি। অনেকের মনে এই ধারণা আছে যে আলোচ্য যুগের বাংলার ইতিহাসের উপকরণ যে সমস্ত সূত্রে পাওয়া যায়, তাদের অধিকাংশই ফার্সী ভাষায় লেখা। কিন্তু এই ধারণা যথার্থ নয়। এই যুগের ইতিহাসের ফার্সী সূত্র খুব বেশী নেই; যে ক'খানি আছে, তাদের প্রায় সবগুলিই ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে এবং তাদের নিয়ে এপর্যন্ত আলোচনাও হয়েছে বিস্তর। সুতরাং ফার্সী সূত্রগুলিতে প্রদত্ত তথ্য যে কেউই আহরণ করতে পারেন এবং তাদের মধ্য থেকে নতুন কিছু পাবার আশা নেই। পক্ষান্তরে এই যুগের সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় রচিত বহু গ্রন্থে ইতিহাসের অনেক উপকরণ ছড়িয়ে আছে, সেগুলি খুবই মূল্যবান্; দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, চৈতন্যচরিত-গ্রন্থগুলির মধ্যে জলালুদ্দীন ফতে শাহ্ ও আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্ব-কালের নানা ব্যাপার সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওয়া যায়। মধ্যযুগের বাংলার কোন প্রামাণিক ধারাবাহিক ইতিহাস যখন পাওয়া যায় না, তখন সেই ইতিহাসকে পুনর্গঠন করে তুলতে হবে এবং সেই পুনর্গঠনে অনেকখানি উপাদান যোগাবে এই সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থগুলি। অথচ আজ পর্যন্ত এগুলি বিশেষ কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। বর্তমান বইটির মধ্যে সুপরিচিত ও ইতিপূর্বে-আলোচিত সূত্রগুলি ব্যবহৃত হয়েছে, সেইসঙ্গে এযাবৎ-অবহেলিত

এই সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থগুলির সাক্ষ্যও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তার ফলে হয়তো আমার পক্ষে কোন কোন বিষয় সম্বন্ধে কিছু কিছু নতুন সংবাদ দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

এই বইতে বিভিন্ন মুদ্রিত গ্রন্থের নাম যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা দরকার। এইসব গ্রন্থের যতটুকু পরিচয় উল্লেখ করলে যথেষ্ট হবে তার বেশী করিনি। যে সমস্ত বইয়ের নাম এবং পৃষ্ঠাসংখ্যা মাত্র উল্লিখিত হয়েছে, সংস্করণের উল্লেখ নেই, সে সব বইয়ের প্রথম সংস্করণ ব্যবহৃত হয়েছে বুঝতে হবে। 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থের অধ্যায়সংখ্যা উল্লেখের সময় বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত সংস্করণকে এবং চৈতন্যচরিতামৃতের পরিচ্ছেদসংখ্যা উল্লেখের সময় বঙ্গবাসী প্রেস প্রকাশিত সংস্করণকে অনুসরণ করেছি, কিন্তু ঐ দুই সংস্করণের পাঠকে সর্বত্র অনুসরণ করিনি, তার বদলে বিভিন্ন মুদ্রিত সংস্করণ ও কয়েকটি পুঁথি মিলিয়ে দেখার পরে যে পাঠ আমার কাছে সঙ্গত বলে মনে হয়েছে, তারই উপর নির্ভর করেছি ও তা'ই উদ্ধৃত করেছি। এই বইয়ে আলোচ্য পর্বের বিভিন্ন শিলালিপি থেকে বহু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে; এই ব্যাপারে আমি প্রধানত তিনটি বই থেকে সাহায্য পেয়েছি, (১) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ' (২) ডঃ আহমদ হাসান দানীর Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal, (৩) মৌলভী শামসুদ্দীন আহমদের Inscriptions of Bengal (Vol. IV)। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ'-এ তাঁর সময় পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রাক্-মোগল যুগের বাংলার মুসলিম সুলতানদের শিলালিপিগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ সমেত প্রায় পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করেন। পরবর্তীকালে যাঁরা বাংলার সুলতানদের শিলালিপিগুলির তালিকা বা বিবরণ প্রস্তুত করেছেন, তাঁরা রাখালদাসের তালিকা থেকে বিশেষভাবে সাহায্য পেয়েছেন; কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, তাঁরা যথোপযুক্তভাবে রাখালদাসের কাছে ঋণ স্বীকার করেন নি।

এই বইতে বাংলার ইতিহাসের যে পর্বটি আলোচিত হয়েছে, তাকে আগে অনেকে "পাঠান সুলতানদের আমল" নামে অভিহিত করতেন। কিন্তু ঐ নাম সম্পূর্ণ অসার্থক, কারণ শের শাহের আগে কোন পাঠান সুলতানই বাংলাদেশ শাসন করেন নি। আলোচ্য পর্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে এই পর্বে

বাংলাদেশ একটানা দু'শো বছর ধরে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ভোগ করেছে। এই সুদীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশের সম্পদ বাংলার ভিতরেই ছিল—বাইরে যায় নি। তা ছাড়া এই পর্বের অধিকাংশ সময় বাঙালীরাই বাংলাদেশ শাসন করেছেন বলা যায়। রাজা গণেশ ও তাঁর বংশধরেরা বাঙালী ছিলেন। নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ ও তাঁর বংশধরদেরও তা'ই বলা যেতে পারে। আলাউদ্দীন হোসেন শাহও বাঙালী ছিলেন বলে এই বইতে দেখবার চেষ্টা করেছি। বাংলার স্বাধীন সুলতানদের আমল আর একদিক দিয়ে স্মরণীয়। এই পর্বে বাংলা সাহিত্যের লক্ষ্যণীয় বিকাশ ঘটে। কয়েকজন দিক্‌পাল কবি এই পর্বেই আবির্ভূত হয়ে বাংলা সাহিত্যকে সুগঠিত ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন করে তোলেন; তাঁদের মধ্যে অনেকেই বাংলার রাজা ও রাজকর্মচারীদের কাছে পৃষ্ঠপোষণ লাভ করেছিলেন। কাজেই, বাংলার ইতিহাসের আলোচ্য পর্বটি সবদিক দিয়েই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই পর্বে যে সব সুলতান বাংলাদেশ শাসন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই অসাধারণ ছিলেন। তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি। এই বইটিতে কোন কোন রাজার সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে, কারণ তাঁদের সম্বন্ধে অন্য রাজাদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশী তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু তার দ্বারা এই কথা বোঝায় না যে অন্য রাজাদের তুলনায় তাঁরা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সব দিক দিয়ে বিচার করলে বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে রুকনুদ্দীন বারবক শাহকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলতে হয়। এই বইতে তাঁর সম্বন্ধে যে আলোচনা আছে, তা অন্য কোন কোন রাজা সম্বন্ধীয় দীর্ঘতর আলোচনার তুলনায় স্বল্পায়তন হওয়ার দরুন হয়তো তেমনভাবে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে না। সেইজন্যে এখানেই এ সম্বন্ধে সকলকে অবহিত করে রাখলাম।

আধুনিক যুগের কোন কোন লেখক রাজনৈতিক ইতিহাসকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে করেন না; তাঁদের মতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসই দেশের আসল ইতিহাস। কিন্তু এই ধারণা একেবারেই যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ প্রথমত, সর্বদেশের ও সর্বকালের ইতিহাসে দেখা যায়, জাতীয় জীবনের অন্যান্য দিকের তুলনায় রাজনৈতিক দিকই সবিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। আজকের দিনের সংবাদপত্রগুলিতেও প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় শিরোনামায় রাজনৈতিক সংবাদগুলিই পরিবেশিত হয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সন্দেশ তাতে গৌণতর স্থান লাভ করে। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক ইতিহাসকে বাদ দিয়ে কোন

দেশের অন্যান্য দিকের ইতিহাসও লেখা যায় না। দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনা করতে হলেও প্রথমে রাজনৈতিক ইতিহাস ভালভাবে অধ্যয়ন করা দরকার। কারণ রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রভাবেই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বেশীর ভাগ বৈচিত্র্য ও পরিবর্তনই সংঘটিত হয় রাজনৈতিক ইতিহাসের পট-পরিবর্তনের ফলে। এই সমস্ত কারণে আমাদের দেশের অতীতকালের রাজনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্ব কোনক্রমেই ছোট করে দেখা চলে না, বরং তার সম্বন্ধে এখন আগেকার চেয়ে আরও ব্যাপকভাবে গবেষণা হওয়া দরকার।

বর্তমান বইয়ে মুসলমানী নামগুলি এবং অন্যান্য আরবী-ফারসী শব্দগুলি বাংলা অক্ষরে যেভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তার সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা দরকার। এই নাম ও শব্দগুলি যেভাবে উচ্চারিত হয়, যতদূর সম্ভব সেইভাবেই লেখবার চেষ্টা করেছি। এগুলি রোমান অক্ষরে যেভাবে লেখা হয়, তার সঙ্গে উচ্চারণের অনেক সময় একটা পার্থক্য দেখা যায়। এই নাম ও শব্দগুলি বাংলা অক্ষরে কীভাবে লিখব, সে বিষয়ে আমি আরবী ও ফার্সী ভাষার অদ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন মৈত্র মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি এগুলি যেভাবে লেখা উচিত, সে সম্বন্ধে আমায় যে পরামর্শ দিয়েছেন, তা'ই গ্রহণ করেছি।

এই বইটির রচনা ও প্রকাশের ব্যাপারে অনেকেই আমায় বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। স্বনামধন্য ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহোদয় এই বইটির ভূমিকা লিখে দিয়ে একে অসামান্য গৌরব দান করেছেন। তাঁর কাছে আমার ঋণের অন্ত নেই। শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন মৈত্রের কাছে যখনই কোন সাহায্য চেয়েছি, তিনি তখনই তাঁর নিজের কাজ ফেলে রেখে আমায় সাহায্য করেছেন। পাটনা কলেজের অধ্যাপক সৈয়দ হাসান আসকারির কাছেও আমি কয়েকটি বিষয়ে সাহায্য পেয়েছি। বিশ্বভারতী হিন্দীভবনের অধ্যাপক ডঃ শিবনাথ কুংবনের 'মৃগাবতী' থেকে উদ্ধৃত রাজ-প্রশস্তিটির পাঠ নির্ণয় ও তার বাংলা অনুবাদ করেছেন। এই পাঠ ও অনুবাদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁরই। বিশ্বভারতী চীনভবনের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র সেন ও সহকারী গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত য়ান-যুন-হুয়া এবং বিশ্বভারতীর ওড়িয়া বিভাগের অধ্যাপক ডঃ দেবীপ্রসন্ন পট্টনায়ক ও ডঃ নরেন্দ্রনাথ

মিশ্রও আমাকে কোন কোন বিষয়ে সাহায্য করেছেন। আর একজনের কাছে আমি ঋণী। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক জনাব আহমদ শরীফ।

এই বই যদি বাঙালী পাঠকদের মনে, বিশেষভাবে তরুণদের মনে মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুমাত্র অনুরাগ জাগাতে সক্ষম হয়, তাহলে আমি আমার সমস্ত পরিশ্রম সফল বলে মনে করব। আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি এমনই যে আমরা বাংলাদেশের ইতিহাস, বিশেষত মধ্যযুগের ইতিহাস সম্বন্ধে ছাত্রজীবনে প্রায় কিছুই জানবার সুযোগ পাই না। কোন ইংরেজ, সে উচ্চশিক্ষিতই হোক্ আর স্বল্পশিক্ষিতই হোক্ আর তার পেশা যা'ই হোক্ না কেন—ইংলণ্ডের ইতিহাসটি মোটামুটিভাবে জানতে বাধ্য। ইংলণ্ডের অ্যালফ্রেড দি গ্রেট অথবা উইলিয়ম দি কংকারারের মত প্রসিদ্ধ রাজাদের সম্বন্ধে কিছু খবর রাখে না এমন ইংরেজ তো কেউ নেইই, অখ্যাততর রাজাদেরও অন্তত নামটুকু সে জাতের প্রত্যেকেই জানে। কিন্তু বাংলাদেশের খুব শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও অধিকাংশই এদেশের শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ বা গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ বা রুকনুদ্দীন বারবক শাহ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নৃপতিদের নাম জানেন না এবং জানেন না বলে ঘোষণা করতে তাঁরা কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন না! এর চেয়ে লজ্জার বিষয় আর কিছুই হতে পারে না। রাজা গণেশ বা হোসেন শাহের নাম অনেকে শুনেছেন, কিন্তু ঐ শোনামাত্রই সার, তাঁদের সম্বন্ধে আর কিছুই তাঁদের জানা নেই। অনেকে আবার বহুলপ্রচারিত কিন্তু সম্পূর্ণ অপ্রামাণিক কোন কোন বই পড়ে বাংলার ইতিহাসের আলোচ্য পর্ব সম্বন্ধে এক ভ্রান্ত ধারণা গঠন করে বসে আছেন; এই জাতীয় বইগুলির মধ্যে অন্যতম দুর্গাচরণ সান্ন্যালের লেখা 'বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস', বইখানা নামে 'ইতিহাস' হলেও আসলে বটতলার বস্তাপচা উপন্যাসের সমগোত্রীয়, আগাগোড়াই নিকৃষ্ট ধরনের কাল্পনিক উপাখ্যানে ভর্তি। শিক্ষিত বাঙালী জনসাধারণের কাছে আমি এই আশাই করব যে তাঁরা নিজের দেশের অতীতকে জানতে আগ্রহবোধ করবেন, মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসের প্রতি অনুরাগী হবেন এবং নকল ছেড়ে আসলের স্বাদ গ্রহণ করবেন।

শান্তিনিকেতন,
৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২

শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থকারের নিবেদন

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

চার বছর আগে—১৯৬২ সালে এই বইয়ের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। আজ প্রায় বছর দুই তা' নিঃশেষিত হয়েছে। ছাপার ব্যাপারে দেরী হওয়ার জন্য এই সংস্করণ প্রকাশিত হতে বেশ দেরীই হয়ে গেল।

প্রথম সংস্করণের সঙ্গে এই সংস্করণের কয়েকটি পার্থক্য সকলেই লক্ষ করবেন। প্রথম সংস্করণ দু'টি খণ্ডে বিভক্ত ছিল—এই সংস্করণ তা' নেই। তারপর, প্রথম সংস্করণে বাংলার স্বাধীন সুলতানদের আমলের রাজনৈতিক ইতিহাসই কেবল ছিল; কিন্তু বর্তমান সংস্করণের দশম, একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়ে ঐ আমলের বাংলার ইতিহাসের অন্য কোন কোন দিক্ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। দশম অধ্যায়ে 'স্বাধীন সুলতানদের আমলে বাংলার শাসন-ব্যবস্থা ও সামরিক ব্যবস্থা' সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়টি রচনার সময় Journal of the Asiatic Society of Pakistan, Vol. IIIতে প্রকাশিত ডক্টর আবদুল করিমের Aspects of Muslim Adminstration in Bengal down to A. D. 1538 প্রবন্ধটি থেকে খুব বেশী পরিমাণে সাহায্য পেয়েছি। সুলতানী আমলের বাংলার শাসন-ব্যবস্থা ও সামরিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে সব তথ্য বিভিন্ন শিলালিপিতে পাওয়া যায়, সেগুলি ডক্টর করিম তাঁর প্রবন্ধে পরিপাটিভাবে সংগ্রহ করেছিলেন; এই অধ্যায়ে সেই তথ্যগুলি উল্লেখ করার সময় আমি সংশ্লিষ্ট শিলালিপিগুলির নিদর্শনী না দিয়ে ডক্টর করিমের প্রবন্ধের নিদর্শনী দিয়েছি। শিলালিপি ছাড়া আর যে সমস্ত সূত্র থেকে তিনি তথ্য আহরণ করেছেন, সেগুলি ব্যবহার করার সময়ও আমি ঐ পন্থাই অনুসরণ করেছি। এ ছাড়া আরও অনেক সূত্র থেকে আমার বইয়ের দশম অধ্যায়ের তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, যেগুলি পূর্ববর্তী গবেষকরা ব্যবহার করেন নি। এই সব সূত্রের যথাযথ নিদর্শনী দিয়েছি। একাদশ অধ্যায়ে বিভিন্ন বৈদেশিক বিবরণ, সাহিত্যগ্রন্থ ও শাস্ত্র-গ্রন্থের সাক্ষ্য অবলম্বনে 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে এ' যুগের বাংলাদেশ'-এর একটি প্রামাণিক ছবি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। বিভিন্ন সূত্রে এ' যুগের বাংলা দেশ সম্বন্ধে যতটা সংবাদ পাওয়া যায়, তার সবটাই অবিকৃতভাবে সংগ্রহ

করার চেষ্টা করেছি। বিষয়ানুক্রমে এ' যুগের বাংলার সামাজিক ইতিহাস লেখার চেষ্টা আমি করি নি, কারণ তা লেখার মত পর্যাপ্ত উপকরণ পাওয়া যায় না। শ্রদ্ধেয় ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহোদয় তাঁর সম্পাদিত সম্প্রতি-প্রকাশিত 'বাংলাদেশের ইতিহাস: দ্বিতীয় খণ্ড'তে ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক ইতিহাস বিষয়ানুক্রমে রচনা করেছেন, সকলকে সেটি পড়তে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি।

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহোদয় এই বইয়ের ভূমিকায় এবং তাঁর অন্য বহু গ্রন্থে ও প্রবন্ধে এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, বাংলার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কোনদিন কোনরকম ঐক্য ছিল না এবং মুসলমান রাজারা সব সময়েই হিন্দুদের উপর অত্যাচার করতেন ও হিন্দু ধর্মের অবমাননা করতেন। এ সম্বন্ধে আমার নিজস্ব মত কী, তা অনেকে জানতে চেয়েছেন। আমার মত এই যে, হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু জাতির প্রতি মনোভাবের দিক দিয়ে সে যুগের মুসলমানদের তিনটি স্তরে ভাগ করা চলে। প্রথম স্তরের অন্তর্গত ছিলেন গোঁড়া মোল্লা, আলিম ও দরবেশেরা—এঁরা হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু জাতির প্রতি সত্যিই বিদ্বেষভাব পোষণ করতেন এবং সেই বিদ্বেষ রাজাদের মনেও সংক্রামিত করার চেষ্টা করতেন। দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্গত ছিলেন মুসলমান রাজারা, এঁদের মধ্যে অনেকেই অন্তরে অন্তরে হিন্দুদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন না (কেউ কেউ অবশ্য উদারমতাবলম্বী ছিলেন)। গোঁড়া মোল্লা, আলিম ও দরবেশরা যখন এঁদের কাছে হিন্দুবিদ্বেষ প্রচার করতেন, তখন এঁরা মুখে তাতে সমর্থন জানাতেন, কিন্তু কার্যত কেউই বড় একটা হিন্দুবিরোধী নীতি অনুসরণ করতেন না, কারণ তা করলে অযথা হিন্দুদের অসন্তোষ উদ্রেক করে রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা বিপন্ন করার ঝুঁকি নেওয়া হবে। অবশ্য কোন হিন্দু রাজ্যে অভিযানে যাবার সময় এঁরা কয়েকটি মন্দির ও দেবমূর্তি প্রভৃতি ভাঙতেন এবং দেশে ফিরে সে কথা প্রচার করতেন, মুখ্যত মোল্লা, দরবেশ প্রভৃতির কাছে বাহবা পাবার জন্য; অবশ্য এই মন্দির-ভাঙার সংবাদ প্রচারের সময়েও অতিরঞ্জনের আশ্রয় নেওয়া হত (বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ৪৫৬-৫৭ দ্রষ্টব্য)। সে যুগের মুসলমানদের তৃতীয় স্তরের অন্তর্গত ছিলেন মুসলিম জনসাধারণ, এঁরা হিন্দুদের প্রতি খুব একটা বিদ্বেষের ভাব পোষণ করতেন না, বরং তাদের সঙ্গে গ্রামসম্পর্ক স্থাপন করতেন ও তাদের কোন কোন পবিত্র গ্রন্থের (রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি) রস আস্বাদন করতে

দ্বিধা করতেন না। সুতরাং সব মুসলমানদেরই সঙ্গে যে হিন্দুদের অনৈক্য ছিল এবং মুসলিম রাজারা যে সাধারণত হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার করতেন, এ কথা বলা যায় না বলেই মনে হয়।

'বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর'-এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হবার পরে আরও এমন দু'খানা বই প্রকাশিত হয়েছে, যাদের মধ্যে স্বাধীন সুলতানদের আমল সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আছে। একখানি বইয়ের নাম 'বঙ্গদেশের ইতিহাস', এর লেখিকা ডক্টর সুশীলা মণ্ডল; দ্বিতীয় বইখানির নাম 'বাঙলার ইতিহাস', এর লেখক শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন। এই দু'খানি বইয়ের সুলতানী আমল সংক্রান্ত অংশ প্রধানত আচার্য যদুনাথ সরকার সম্পাদিত ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত History of Bengal (Vol. II) অবলম্বনে লেখা। এই বই দু'খানির মধ্যে "নতুন গবেষণা" যেটুকু আছে, তা একেবারেই গ্রহণ-যোগ্য নয়। কারণ ডক্টর সুশীলা মণ্ডলের "নতুন গবেষণা"র প্রধান আকরগ্রন্থ দুর্গাচরণ সান্যালের 'বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস', যা মোটেই ইতিহাসগ্রন্থ নয়, কতকগুলি গালগল্পের সমষ্টি; আর শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেনের "নতুন গবেষণা"র সূত্রগ্রন্থ ঈশান নাগরের 'অদ্বৈতপ্রকাশ' ও লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের 'বাল্যলীলাসূত্র' প্রভৃতি অপ্রামাণিক গ্রন্থ। ঐ দু'খানি বইতে অনেক চমকপ্রদ ভুলও আছে, যেমন ডঃ সুশীলা মণ্ডলের গ্রন্থে হোসেন শাহের তথাকথিত উজীর 'পুরন্দর খান'-এর (বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ৩৮৩-৮৪ দ্রষ্টব্য) প্রকৃত নাম 'গোপীনাথ বসু' না বলে 'পুরন্দর বসু' বলা হয়েছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর কবি কৃষ্ণকমল গোস্বামীকে ষোড়শ শতাব্দীর কবি বলা হয়েছে এবং বর্তমান গ্রন্থকারের নাম 'সুখময় বন্দ্যোপাধ্যায়' লেখা হয়েছে। শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেনের গ্রন্থে ভুলের সংখ্যা ডক্টর সুশীলা মণ্ডলের বইয়ের তুলনায়ও অনেক বেশী। আমার এই বইয়ের বর্তমান সংস্করণ রচনার সময় এই দু'খানি বই আমার বিশেষ কাজে লাগে নি।

এই সংস্করণের ছাপা শেষ হবার পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর মমতাজুর রহমান তরফদারের লেখা Husain Shahi Bengal : a Socio-Political Study নামে বইখানি আমার হাতে পৌঁছেছে। এই বইখানি খুব সুলিখিত, এর সব জায়গাতেই লেখকের পাণ্ডিত্য ও সংগ্রহশক্তির উজ্জ্বল নিদর্শন মেলে। লেখক পূর্বসূরীদের গবেষণাকে যথোচিত মূল্য দেবারও চেষ্টা করেছেন। অবশ্য কতকগুলি বিষয় (যেমন জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে'

বর্ণিত গৌড়েশ্বরের "নদীয়া উচ্ছন্ন" করার কাল এবং গৌরাই মল্লিকের ত্রিপুরা অভিযানের ফলাফল) সম্বন্ধে সমস্ত তথ্যের যথোচিত ব্যবহার করতে না পারায় তাঁর সিদ্ধান্ত নির্ভুল হতে পারে নি; অনেক ব্যাপারে আমরা তাঁর সঙ্গে একমতও নই; কিন্তু তাঁর এই গ্রন্থের উৎকর্ষ সম্বন্ধে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নেই।

এই বইয়ের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হবার পরে কোন কোন সমালোচক এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে এর মধ্যে আকরগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি একটু বেশী পরিমাণে দেওয়া হয়েছে, তার ফলে বর্ণনার ধারাবাহিকতা স্থানে স্থানে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এই অভিমতের যৌক্তিকতা আমি স্বীকার করি। তা সত্ত্বেও বর্তমান সংস্করণে আমি উদ্ধৃতির পরিমাণ কমাই নি, তার কারণ তিনটি। প্রথমত, বাংলা দেশের (বিশেষত তার মুসলমান আমলের) ইতিহাস সংক্রান্ত গবেষণা এখনও শৈশবাবস্থা অতিক্রম করে নি, সুতরাং এ বিষয়ের গবেষণায় যাঁরাই প্রবৃত্ত হবেন, তাঁদের কোন কিছু মত প্রতিষ্ঠা করার সময় তথ্য-প্রমাণগুলি একটু বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করতে হবে, তাতে বর্ণনার ধারাবাহিকতা একটু ক্ষুণ্ণ হলেও তাকে স্বীকার করে নিতে হবে। দ্বিতীয়ত, আমার এ বই যাঁরা পড়বেন, তাঁরা সাধারণ পাঠক বা প্রথম শিক্ষার্থী হবেন না, বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে কতকটা বিশেষ জ্ঞান তাঁদের থাকবে, এটাই আমি আশা করি; উদ্ধৃতির প্রাচুর্য তাঁদের পক্ষে বর্ণনার ধারা অনুসরণে অসুবিধার কারণ হবে না বলেই আমি মনে করি। তৃতীয়ত, এ বইতে তথ্য-প্রমাণগুলি আমি যেভাবে বিশ্লেষণ করেছি ও বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত করেছি, তা সকলে গ্রহণ না করতে পারেন; কিন্তু যাঁরা গ্রহণ করবেন না, মূল সূত্রগুলির পূর্ণাঙ্গ উদ্ধৃতিগুলি তাঁদেরও কাজে লাগবে। অর্থাৎ আমার বই গবেষণা-গ্রন্থ হিসাবে মূল্যবান হোক বা না হোক্, প্রয়োজনীয় আকর-সূত্রাবলীর সংকলন হিসাবে তার একটা মূল্য থাকবে। খুঁটিনাটি আলোচনা ও বিস্তৃত উদ্ধৃতি বর্জন করে বাংলার স্বাধীন সুলতানদের আমলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমি ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 'বাংলাদেশের ইতিহাস: দ্বিতীয় খণ্ড' বইয়ে (পৃঃ ৩১-১০৮) লিখেছি, সাধারণ পাঠকদের তা' পড়তে অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিভিন্ন পত্রিকায় এই বইয়ের অনেক সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। এই সব সমালোচনা আমাকে বর্তমান সংস্করণে বইটির উন্নতি সাধন করতে ও প্রথম সংস্করণের ভুলগুলি সংশোধন করতে সাহায্য করেছে। কোন

কোন সমালোচক অবশ্য ভুল ধরতে গিয়ে নিজেই ভুল করেছেন। যেমন; আমি যেখানে লিখেছি—কোন ইতিহাসগ্রন্থে আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের (১ম) "নাম পাওয়া যায় নি," তার সমালোচনা করে একজন সমালোচক লিখেছেন—কেন? আচার্য যদুনাথ সরকারের লেখা ইতিহাসগ্রন্থে (History of Bengal, Vol. II) তো আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের নাম আছে। ঐ সরলবুদ্ধি সমালোচক বুঝতে পারেন নি যে আলোচ্য জায়গায় "ইতিহাসগ্রন্থ" বলতে আমি ইতিহাসের মূলগ্রন্থ (Source-book of history) কে বুঝিয়েছিলাম, আধুনিক ঐতিহাসিকদের লেখা গবেষণা-গ্রন্থকে বোঝাই নি। আবার কোন কোন সমালোচক রজনীকান্ত চক্রবর্তী, নিখিলনাথ রায় প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের অভিমতকে যথোচিত মূল্য না দেওয়ার জন্য আমার উপরে দোষারোপ করেছেন; কিন্তু রজনীকান্ত ও নিখিলনাথের বাংলার ইতিহাস সংক্রান্ত গবেষণা এখন কালবারিত হয়ে পড়েছে, তা' ছাড়া তাঁরা অপ্রামাণিক কুলজীগ্রন্থ (অনেক ক্ষেত্রে জাল কুলজীগ্রন্থ) কে তাঁদের গবেষণার অন্যতম সূত্ররূপে ব্যবহার করেছিলেন। এই কারণে তাঁদের অভিমত নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন এখনকার দিনে আছে বলে আমি মনে করি না।

এই সংস্করণে প্রথম সংস্করণের "গ্রন্থকারের নিবেদন"টি সংক্ষিপ্ত আকারে ছাপা হল। উৎসর্গ-পত্রের পর পৃষ্ঠায় দেওয়া "ইতিহাসের লক্ষ্মী ওঠেন" কবিতাটি কার লেখা, তা অনেকে জানতে চেয়েছেন। ওটি আমারই লেখা।

বর্তমান সংস্করণে ভুলবশত বইয়ের ভিতরে 'পঞ্চম অধ্যায়,' 'ষষ্ঠ অধ্যায়,' 'সপ্তম অধ্যায়,' ও 'অষ্টম অধ্যায়'-এর জায়গায় যথাক্রমে 'দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,' 'তৃতীয় অধ্যায়', 'চতুর্থ অধ্যায়' ও 'পঞ্চম অধ্যায়' ছাপা হয়েছে (এগুলি আসলে ঐ সব অধ্যায়ের প্রথম সংস্করণের ক্রমিকসংখ্যা)। পাঠকেরা সূচীপত্র দেখে এই ভুলগুলি সংশোধন করলে অনুগৃহীত হব।

শান্তিনিকেতন,
৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬

সুখময় মুখোপাধ্যায়

বাংলার স্বাধীন সুলতানদের কালানুক্রমিক তালিকা

(ক) মুবারক শাহী বংশের সুলতানগণ ও আলী শাহ

	নাম	শাসনকাল
(১)	ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ [১]	৭৩৯-৭৫০ হিঃ/১৩৩৮-১৩৪৯ খ্রীঃ
(২)	ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহ [১] (মুবারক শাহের পুত্র)	৭৫০-৭৫৩ হিঃ/১৩৪৯-১৩৫২ খ্রীঃ
(৩)	আলাউদ্দীন আলী শাহ [২]	৭৪২-৭৪৩ হিঃ/১৩৪১-১৩৪২ খ্রীঃ

১ সোনারগাঁওয়ের সুলতান।

২ লখনৌতির সুলতান।

(খ) ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতানগণ

	নাম	শাসনকাল
(১)	শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ	৭৪৩-৭৫৯ হিঃ/১৩৪২-১৩৫৮ খ্রীঃ
(২)	সিকন্দর শাহ (ইলিয়াস শাহের পুত্র)	৭৫৯-(আঃ) ৭৯৩ হিঃ/১৩৫৮-(আঃ) ১৩৯১ খ্রীঃ
(৩)	গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ (সিকন্দর শাহের পুত্র)	(আঃ) ৭৯৩-৮১৩ হিঃ/(আঃ) ১৩৯১-১৪১০ খ্রীঃ
(৪)	সৈফুদ্দীন হমজা শাহ (আজম শাহের পুত্র)	৮১৩ ৮১৫ হিঃ/১৪১০-১৪১২ খ্রীঃ

(গ) বায়াজিদ শাহী বংশের সুলতানগণ

	নাম	শাসনকাল
(১)	শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ	৮১৫-৮১৭ হিঃ/১৪১২-১৪১৪ খ্রীঃ
(২)	আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ (১ম) (বায়াজিদ শাহের পুত্র)	৮১৭ হিঃ/১৪১৪ খ্রীঃ

(ঘ) রাজা গণেশ ও তাঁর বংশের সুলতানগণ

নাম	শাসনকাল
(১) রাজা গণেশ বা দনুজমর্দনদেব	৮১৮ হিঃ/১৪১৫ খ্রীঃ
	৮২০-৮২১ হিঃ/১৪১৭-১৪১৮ খ্রীঃ
(২) জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ	৮১৮-৮১৯ হিঃ/১৪১৫-১৪১৬ খ্রীঃ
(রাজা গণেশের পুত্র)	৮২১-৮৩৬ হিঃ/১৪১৮-১৪৩৩ খ্রীঃ
(৩) মহেন্দ্রদেব	৮২১ হিঃ/১৪১৮ খ্রীঃ
(রাজা গণেশের পুত্র)	
(৪) শামসুদ্দীন আহমদ শাহ	৮৩৬-(আঃ) ৮৩৯ হিঃ/১৪৩৩-(আঃ) ১৪৩৬ খ্রীঃ
(জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের পুত্র)	

(ঙ) মাহ্‌মুদ শাহী বংশের সুলতানগণ

নাম	শাসনকাল
(১) নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ(১ম)	(আঃ) ৮৩৯-৮৬৪হিঃ/
	(আঃ) ১৪৩৬-১৪৫৯ খ্রীঃ
(২) রুকনুদ্দীন বারবক শাহ	৮৬০-৮৮০ হিঃ/১৪৫৫-১৪৭৬ খ্রীঃ[৩]
(মাহমুদ শাহের পুত্র)	
(৩) শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহ	৮৭৯-৮৮৫ হিঃ/১৪৭৪-১৪৮০ খ্রীঃ
(বারবক শাহের পুত্র)	
(৪) সিকন্দর শাহ	৮৮৫-৮৮৬ হিঃ/১৪৮০-১৪৮১ খ্রীঃ
(য়ুসুফ শাহের পুত্র ?)	
(৫) জলালুদ্দীন ফতেহ্‌ শাহ	৮৮৬-৮৯২ হিঃ/১৪৮১-১৪৮৭ খ্রীঃ
(মাহ্‌মুদ শাহের পুত্র)	

৩ রুকনুদ্দীন বারবক শাহ ৮৬০-৬৪ হিজরায় তাঁর পিতা নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের সঙ্গে এবং ৮৭৯-৮০ হিজরায় তাঁর পুত্র শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহের সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করেন।

(চ) সুলতান শাহজাদা ও হাবশী সুলতানগণ

	নাম	শাসনকাল
(১)	বারবক বা সুলতান শাহজাদা	৮৯২ হিঃ/১৪৮৭ খ্রীঃ
(২)	সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ (হাবশী)	৮৯২-৮৯৫ হিঃ/১৪৮৭-১৪৯০ খ্রীঃ
(৩)	নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ (২য়) (হাবশী—ফিরোজ শাহের পুত্র)	৮৯৫-৮৯৬ হিঃ/১৪৯০-১৪৯১ খ্রীঃ
( )	শামসুদ্দীন মুজাফফর শাহ (হাবশী)	৮৯৬-৮৯৮ হিঃ/১৪৯১-১৪৯৩ খ্রীঃ

(ছ) হোসেন শাহী বংশের সুলতানগণ

	নাম	শাসনকাল
(১)	আলাউদ্দীন হোসেন শাহ	৮৯৮-৯২৫ হিঃ/১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ
(২)	নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ (হোসেন শাহের পুত্র)	৯২৫ ৯৩৮ হিঃ/১৫১৯ ১৫৩২ খ্রীঃ[৪]
(৩)	আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ (২য়) (নসরৎ শাহের পুত্র)	৯৩৮-৯৩৯ হিঃ/১৫৩২-১৫৩৩ খ্রীঃ
(৪)	গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ (হোসেন শাহের পুত্র)	৯৩৯-৯৪৫ হিঃ/১৫৩৩-১৫৩৮ খ্রীঃ[৫]

৪ নসরৎ শাহ ৯২৫ হিজরার আগে কয়েক বৎসর হোসেন শাহের সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করেছিলেন।

৫ মাহ্‌মুদ শাহ নসরৎ শাহের রাজত্বের শেষ দিকে স্বনামে মুদ্রা প্রকাশ করেছিলেন।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	ছত্র	আছে	হবে
১৮২	৭	১৪৫৮	১৪৫৯
৩৮০	১৩	(১৫) বিদ্যাবাচস্পতি	(১৮) বিদ্যাবাচস্পতি
৩৮১	১	(১৬-১৭) জগাই-মাধাই	(১৯-২০) জগাই-মাধাই
৪৬৪	১৪	(১) ইব্‌ন্ বতুতার বিবরণ	ইব্‌ন্ বতুতার বিবরণ
৪৭০	৪	(১) ওয়াংতা-ইউয়ানের বিবরণ	ওয়াংতা-ইউয়ানের বিবরণ

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

স্বাধীনতার প্রথম পর্যায় (১-১৯)

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইলিয়াস শাহী বংশ (২০-৯৫)

তৃতীয় অধ্যায়

রাজা গণেশের ক্ষমতা-অধিকার—ক্রীড়নক রাজবংশ (৯৬-৯৮)

চতুর্থ অধ্যায়

রাজা গণেশ (৯৯-১৪৯)

পঞ্চম অধ্যায়

রাজা গণেশের বংশ (১৫০-১৬৯)

ষষ্ঠ অধ্যায়

মাহ্মূদ শাহী বংশ (১৭০-২৪১)

সপ্তম অধ্যায়

হাবশী রাজত্ব (২৪২-২৬৭)

অষ্টম অধ্যায়

আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্ (২৬৮-৪১২)

নবম অধ্যায়

হোসেন শাহী বংশের শেষ পর্ব (৪১৫-৫৮)

দশম অধ্যায়

স্বাধীন সুলতানদের আমলে বাংলার শাসন-ব্যবস্থা ও সামরিক ব্যবস্থা (৪৫৯-৪৬৩)

একাদশ অধ্যায়

সমসাময়িক দৃষ্টিতে এ' যুগের বাংলাদেশ (৪৬৪-৫১৪)

দ্বাদশ অধ্যায়

স্বাধীন সুলতানদের আমলের স্মৃতিচিহ্ন (৫১৫-৫২১)

১ সংযোজন—পৃঃ ১৸৵৹ দ্রষ্টব্য

সংযোজন

হোসেন শাহের পুত্রগণ

(৪১২ পৃষ্ঠা ৩০ ছত্রের পরে সংযোজনীয়)

'তবকাৎ-ই-আকবরী', 'মাসির-ই-রহিমী', 'রিয়াজ-উস্-সলাতীন' প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থের মতে হোসেন শাহের ১৮ জন পুত্র ছিল। প্রামাণিক সূত্র থেকে হোসেন শাহের তিনজন পুত্রের কথা জানা যায়—নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ, গিয়াসুদ্দীন মাহ্মুদ শাহ ও দানিয়েল। নসরৎ শাহ হোসেন শাহের মৃত্যুর পরে ও মাহ্মুদ শাহ আরও পরে সুলতান হয়েছিলেন। কয়েকটি প্রামাণিক ইতিহাসগ্রন্থ থেকে জানা যায় যে,—১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সিকন্দর লোদীর সৈন্যবাহিনীকে বাধা দেবার জন্য হোসেন শাহ্ যে সৈন্যবাহিনী পাঠান, তাঁর পুত্র দানিয়েল তার নেতা ছিলেন। একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, দানিয়েল ৯০৩ হিজরা বা ১৪৯৭-৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মুঙ্গেরের শাহ নফাহ্‌র দরগায় একটি সমাধি-কক্ষ নির্মাণ করিয়ে ছলেন। হোসেন শাহের আর একজন পুত্র আসাম-অভিযানের সময়ে নিহত হয়েছিলেন, এ কথা বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া যায়। কোন কোন কিংবদন্তী অনুসারে এই পুত্রের নাম "দুলাল গাজী"। দানিয়েল ও "দুলাল গাজী" অভিন্ন হতে পারেন। তবে এ সম্বন্ধে জোর করে কিছু বলা যায় না।

ভাস্কো-দা-গামার বিবরণ

(৪৯২ পৃষ্ঠা ১৬ ছত্রের পরে সংযোজনীয়)

ভাস্কো-দা-গামা ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগালে ফিরে বাংলাদেশ সম্বন্ধে একটি অতিসংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছিলেন ; বিবরণটি আমরা নীচে উদ্ধৃত করলাম,

"বেন্‌গুআলা (বাংলা)-র রাজা মুরিশ (মুসলমান)। এখানে খ্রীষ্টান (!) ও মুর (মুসলমান) উভয় সম্প্রদায়ের লোকরাই বাস করে। এ' দেশের সৈন্য-বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা প্রায় চব্বিশ হাজার ; তার মধ্যে দশ হাজার অশ্বারোহী এবং অবশিষ্ট পদাতিক। রণহস্তীর সংখ্যা চারশো। এ' দেশ থেকে প্রচুর গম (!) এবং খুব দামী তুলার জিনিস রপ্তানী হতে পারে। এখানে যে কাপড় বাইশ শিলিং ছ' পেনি দামে বিক্রী হয়, তা' কালিকটে বিক্রী করে নব্বই শিলিং পাওয়া যায়। এখানে রূপার পরিমাণ অত্যধিক।" (J. J. A. Compos, History of the Portuguese in Bengal. p 25)

বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর :
স্বাধীন সুলতানদের আমল
(১৩৩৮—১৫৩৮ খ্রীঃ)

প্রথম অধ্যায়

স্বাধীনতার প্রথম পর্যায়

অবতরণিকা

বাংলাদেশে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠার সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলা দেশ পর্যায়ক্রমে একবার দিল্লীর অধীন হয়েছে, আবার স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের স্বাধীনতা ঘোষণা থেকে সুরু করে ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের উচ্ছেদ পর্যন্ত পুরোপুরি দু'শো বছর বাংলাদেশ যে রকম অবিচ্ছিন্নভাবে স্বাধীনতা ভোগ করেছিল, তত দীর্ঘদিন ধরে আর কোন সময় তার স্বাধীনতা স্থায়ী হয় নি। এই দু'শো বছর বাংলা দেশের ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায়। এই সময়ে বাংলার সুলতানরা নিজেদের যোগ্যতা, শক্তি ও ঐশ্বর্যের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নৃপতিদের অন্যতম হয়ে উঠেছিলেন। শুধু তা'ই নয়, তাঁরা দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থার পরিচালনায় এবং রাজার নানা রকম কর্তব্য পালনেও অপরিসীম দক্ষতা দেখিয়ে গিয়েছেন। তার ফলে তাঁরা বাংলার জনসাধারণের, এমন কি বিধর্মী হিন্দুদেরও আস্থা ও ভালোবাসা অর্জন করেছিলেন। বাংলার ইতিহাসের এই স্মরণীয় পর্বটির সম্বন্ধেই আমরা অতঃপর আলোচনা করব।

ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ

১৩২২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার স্বাধীন সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের মৃত্যু হবার পর তাঁর পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে বিরোধ বাধে। এঁদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত জয়ী হন গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ্। কিন্তু তাঁর দু'জন ভ্রাতা দিল্লীর তৎকালীন সুলতান গিয়াসুদ্দীন তোগলকের সাহায্য প্রার্থনা করেন। গিয়াসুদ্দীন তোগলক সসৈন্যে বাংলায় এসে গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহকে পরাজিত ও বন্দী করেন এবং বাংলাদেশকে সম্পূর্ণভাবে নিজের অধীনে আনেন (১৩২৪ খ্রীঃ)। ৭৩৯ হিজরা বা ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশ তোগলক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকে। ঐ সময়ে বাংলাদেশ তিনটি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত ছিল—লখ্‌নৌতি (লক্ষ্মণাবতী), সোনারগাঁও এবং সাতগাঁও।

১৩৩৮ খ্রীঃর অব্যবহিত পূর্বে এই তিনটি অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন যথাক্রমে কদর খান, বহ্‌রাম খান ও মালিক অজুদ্দীন য়াহিআ। কয়েক-বছর সাফল্যের সঙ্গে সোনারগাঁও অঞ্চল শাসন করবার পর বহ্‌রাম খান পরলোকগমন করেন। এই বহ্‌রাম খানের তরবারি-বাহক ছিলেন ফখরুদ্দীন। তিনি ৭৩৯ হিজরায় দিল্লীর স্থলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সোনারগাঁও অঞ্চলে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন এবং ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ নাম নিয়ে নিজেকে স্বাধীন স্থলতান বলে ঘোষণা করলেন। এই সময়ে দিল্লীর স্থলতান মুহম্মদ তোগলকের খামখেয়ালীপনা ও অত্যাচারের ফলে তাঁর সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ছিল, কাজেই ফখরুদ্দীন তাঁর উচ্চাশা নিবৃত্তির স্থযোগ পেয়ে গেলেন।

কীভাবে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ দিল্লীর স্থলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীন হলেন, তার সংক্ষিপ্ত অথচ নির্ভরযোগ্য বিবরণ সমসাময়িক ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারনির 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী'তে পাওয়া যায়। জিয়াউদ্দীন বারনি দোয়াব ও বারনে মুহম্মদ তোগলকের অত্যাচার বর্ণনা করার পরে লিখেছেন,

"এই সময়ের দ্বিতীয় ঘটনা হচ্ছে বাংলাদেশে বহ্‌রাম খানের মৃত্যুর পরে ফখ্‌রার গোলযোগ। ফখ্‌রা এবং তার বাঙালী সৈন্যেরা বিদ্রোহী হয়; কদর খান (তাদের হাতে) নিহত হয় এবং তার স্ত্রী, পুত্র, হাতী ও অস্ত্রশস্ত্র খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। লখ্‌নৌতির ধন-সম্পদ লুণ্ঠিত হয়। লখ্‌নৌতি, সাতগাঁও ও সোনারগাঁও (মুহম্মদ তোগলকের) হস্তচ্যুত হয়, এগুলি ফখ্‌রা ও অন্যান্য বিদ্রোহীদের হাতে গিয়ে পড়ে *; অতঃপর আর (এদের) পুনরুদ্ধার করা যায় নি।"

ফখরুদ্দীনের বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা অর্জন সম্বন্ধে য়াহিআ বিন্‌ সিরহিন্দির 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'তে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত সংবাদ পাওয়া যায়। এতে লেখা আছে,

"বহ্‌রাম খান সোনারগাঁওয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন এবং তাঁর তরবারি-বাহক মালিক ফখরুদ্দীন ৭৩৯ হিজরায় (১৩৩৮ খ্রীঃ) বিদ্রোহী

* এর দ্বারা বোঝায় না যে, লখ্‌নৌতি, সোনারগাঁও, সাতগাঁও—সমস্ত জায়গাই ফখরুদ্দীনের হাতে গিয়ে পড়ল; বাংলাদেশের বিভিন্ন বিদ্রোহী বিভিন্ন জায়গা দখল করল—এই কথাই বারনি বলতে চেয়েছেন।

হয়ে সুলতান ফখরুদ্দীন নাম নিয়ে রাজচিহ্ন ধারণ করল। লখ্‌নৌতির শাসনকর্তা মালিক পিণ্ডার খিলজি কদর খান, মুস্তৌফি-ই-মমালিক মালিক হিসামুদ্দীন আবু রেজা, সাতগাঁওয়ের জায়গীরদার আজম-ই-মুল্ক্‌ অজুদ্দীন য়াহিআ এবং করহ্‌-এর আমীর নসরৎ খানের পুত্র ফিরোজ খান বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে সোনারগাঁওয়ে গেলেন। সেও (ফখরুদ্দীন) তাঁর লোকদের নিয়ে তাঁদের সম্মুখীন হল। তারপর যে যুদ্ধ হল, তাতে ফখরুদ্দীন পর্যুদস্ত হয়ে পলায়ন করল। পলাতকের হাতী এবং ঘোড়াগুলি বিজয়ী পক্ষের দখলে এল। কদর খান ঐ জায়গায় রইলেন, অন্যান্য আমীররা তাঁদের নিজের নিজের জায়গীরে ফিরে গেলেন।

"বর্ষাকাল উপস্থিত হলে কদর খানের বাহিনীর বেশীর ভাগ ঘোড়া মারা গেল। তিনি দু'তিন মাস ধরে বিপুল পরিমাণ রৌপ্যমুদ্রা সংগ্রহ করে তাঁর নিজের গৃহে স্তূপাকারে ভাণ্ডারজাত করেছিলেন। তিনি বলতেন যে সম্রাটের সামনেও তিনি এইভাবে রৌপ্যমুদ্রা সঞ্চয় করতেন, কারণ তিনি যত বেশী সঞ্চয় করবেন, সুলতানের তাতে তত বেশী কাজ হবে। মালিক হিসামুদ্দীন তাঁকে এই মর্মে উপদেশ দিলেন, 'দূর দেশে প্রভূত ধন সংগ্রহ করা ক্ষতিকর, কারণ তার উপর লোকদের লোভ হবে এবং তারা সন্দেহ করবে কেন এই অর্থ সম্রাটকে পাঠানো হচ্ছে না। যা কিছু অর্থ ও সম্পদ সংগ্রহ করা হয়েছে, সমস্ত রাজকোষে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। এর চেয়ে ভাল আর কিছুই হতে পারে না।' কদর খান তাঁর কথায় কর্ণপাত করলেন না; তিনি সৈন্যদের তাদের প্রাপ্য (লুঠের অংশ) দিলেন না, রাজকোষেও ঐ সম্পদ পাঠালেন না। তাঁর সৈন্যেরা ঐ ধনের জন্য লালায়িত হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে ফখরুদ্দীন এসে পৌঁছোলো এবং পৌঁছোবামাত্র কদর খানের সৈন্যেরা তার সঙ্গে যোগ দিয়ে কদর খানকে হত্যা করল।

"ফখরুদ্দীন সোনারগাঁওকে তার রাজধানী করল এবং তার গোলাম মুখলিশকে লখ্‌নৌতিতে রেখে দিল। কদর খানের অধীনস্থ আরিজ-ই-লস্কর (সৈন্যবাহিনীর বেতনদাতা) আলী মুবারক মুখলিশকে বধ করে লখ্‌নৌতি অধিকার করলেন। কিন্তু তিনি সার্বভৌম রাজা হবার কোন লক্ষণ না দেখিয়ে সম্রাটের (মুহম্মদ তোগলক) কাছে এই মর্মে এক আবেদন পাঠালেন যে তিনি লখ্‌নৌতি অধিকার করেছেন; যদি সম্রাট তাঁর কোন ভৃত্যকে সেখানে পাঠান এবং (লখ্‌নৌতির) সিংহাসনে বসান (অর্থাৎ শাসনকর্তার

পদে নিযুক্ত করেন), সে (ফখরুদ্দীন) সম্রাটকে শ্রদ্ধা দেখাবে। সুলতান আদেশ জারী করলেন যে নগরীর (অর্থাৎ দিল্লীর) শাসনকর্তা য়ুসুফকে 'খান' পদবী দিয়ে (লখ্‌নৌতিতে) পাঠান হল। ইতিমধ্যে (অর্থাৎ লখ্‌নৌতিতে পৌছোবার আগেই) মালিক য়ুসুফের মৃত্যু হল, কিন্তু সুলতান এদিকে মন দিলেন না এবং কাউকেই তিনি লখ্‌নৌতিতে পাঠালেন না। আলী মুবারক তখন ফখ্‌রুদ্দীনের সঙ্গে তাঁর শত্রুতার জন্য বাধ্য হয়ে রাজচিহ্ন ধারণ করলেন এবং সুলতান আলাউদ্দীন নামে নিজেকে অভিহিত করলেন।"

সমসাময়িক গ্রন্থ 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী'তে ফখরুদ্দীনের বিদ্রোহ ও সাফল্যলাভ সম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে, কিঞ্চিৎ পরবর্তী গ্রন্থ 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'তে তার সম্পূর্ণ সমর্থন মিলছে, উপরন্তু তাতে এই ঘটনার বিস্তৃততর বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে। এই বিবরণ খুব পরিষ্কার এবং সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। পরবর্তী কালে লেখা ইতিহাসগ্রন্থগুলিতে মোটামুটি ভাবে 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'র বিবরণেরই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

'রিয়াজ- উস্‌-সলাতীনে'র মতে ফখরুদ্দীন কদর খানের সিলাহ্‌দার বা বর্মরক্ষক ছিলেন, কিন্তু 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'তে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে যে, ফখ্‌রুদ্দীন বহ্‌রাম খানের তরবারি-বাহক ছিলেন, বদাওনীর 'মন্ত্‌খব্‌-উৎ-তওয়ারিখে' এই উক্তির সমর্থন আছে; সোনারগাঁওয়ে বহ্‌রাম খানের মৃত্যুর পর সেই জায়গাতেই ফখরুদ্দীন বিদ্রোহ করেন। অতএব 'রিয়াজ'-এর উক্তি সম্পূর্ণ ভুল। কদর খান আসলে ফখরুদ্দীনের প্রভু ছিলেন না, শত্রু ছিলেন; ফখরুদ্দীনকে পরাজিত করেও কদর খান নিজের অতিরিক্ত অর্থলোভের জন্য শেষরক্ষা করতে পারেননি। তারই জন্য ফখরুদ্দীন কদর খানকে বধ করে সংগ্রামে জয়ী হতে পেরেছিলেন।

ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ ৭৫০ হিজরা (১৩৪৯-৫০ খ্রীঃ) পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন, কারণ ৭৪০ হিঃ থেকে ৭৫০ হিঃ পর্যন্ত সোনারগাঁও টাকশালে উৎকীর্ণ তাঁর মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে। ৭৫০ হিজরাতেই তাঁর রাজত্ব শেষ হয়, কারণ ৭৫০ হিঃর পরে আর তাঁর মুদ্রা মিলছে না, তার জায়গায় ৭৫০ হিঃ থেকে ৭৫৩ হিঃ পর্যন্ত সোনারগাঁও টাকশালে তৈরী ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহের মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে।

'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'তে লেখা আছে, "ফখ্‌রুদ্দীন সোনারগাঁওকে তার রাজধানী করল এবং তার গোলাম মুখলিশকে লখ্‌নৌতিতে রেখে দিল।"

এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, ফখরুদ্দীন লখ্নৌতি জয় করেছিলেন এবং মুখলিশকে তার শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করেছিলেন; কিন্তু নিজের রাজধানী স্থাপন করেছিলেন সোনারগাঁওয়ে, সম্ভবত লখ্নৌতি তাঁর পক্ষে যথেষ্ট নিরাপদ জায়গা নয় বলে। এরপর আলী মুবারক মুখলিশকে বধ করে লখ্নৌতি পুনরধিকার করে নেন। ফখরুদ্দীন কোনদিন লখ্নৌতি জয় করেন নি বলে যে ধারণা আছে, তা 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'র বিবরণ থেকে ভুল প্রমাণিত হচ্ছে। আলাউদ্দীন আলী শাহের অধীনে লখ্নৌতি অঞ্চল ছাড়া আর কোন অঞ্চল কোনদিন ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ চট্টগ্রাম জয় করে সেখানে প্রথম মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন বলে প্রসিদ্ধি আছে। এই বিষয়ের প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় ঔরংজেবের অন্যতম কর্মচারী শিহাবুদ্দীন তালিশের লেখায়। শিহাবুদ্দীন তালিশ লিখেছেন, "সুদূর অতীতে ফখরুদ্দীন নামে বাংলার একজন সুলতান চট্টগ্রাম সম্পূর্ণভাবে জয় করেন এবং শ্রীপুরের ঘাটির সামনে নদীর বিপরীত পারে অবস্থিত চাঁদপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত একটি বাঁধ তৈরী করেন। চট্টগ্রামে যে সমস্ত মসজিদ ও সমাধি রয়েছে, সেগুলি ফখরুদ্দীনের আমলে নির্মিত হয়েছিল। ধ্বংসাবশেষ থেকে তা প্রমাণ হয় (The ruins prove it)।" (Studies in Mughal India, by Jadunath Sarkar, p. 122 দ্রষ্টব্য)।

শিহাবুদ্দীন তালিশের উক্তি থেকে অবশ্য ফখরুদ্দীনের চট্টগ্রাম বিজয় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না, কারণ শিহাবুদ্দীন তালিশ ফখরুদ্দীনের মৃত্যুর প্রায় সওয়া তিনশো বছর বাদে তাঁর বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তবে শিহাবুদ্দীন তালিশের বিবরণের শেষ দুটি বাক্য থেকে মনে হয় যে তিনি চট্টগ্রামের অনেক ধ্বংসাবশেষের শিলালিপিতে ফখরুদ্দীনের নাম দেখেছিলেন। শিহাবুদ্দীন তালিশ কিছুদিন চট্টগ্রামে বাস করেছিলেন এবং চট্টগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস জানবার সুযোগ পেয়েছিলেন, কাজেই ফখরুদ্দীনের চট্টগ্রাম বিজয় সম্বন্ধে তাঁর উক্তি সত্য বলেই মনে হয়।

ইব্‌ন্ বতুতা ফখরুদ্দীনের রাজত্বকালে বাংলাদেশে এসেছিলেন (৭৪৭ হিঃ)। তাঁর ভ্রমণ-বিবরণী থেকে আমরা ফখরুদ্দীন সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানতে পারি। ফকীরদের উপর ফখরুদ্দীনের অসামান্য প্রীতি, আলাউদ্দীন

আলী শাহের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ এবং ফখরুদ্দীনের রাজত্বকালে বাংলাদেশের অবস্থা সম্বন্ধে ইব্‌ন্ বতুতা অনেক সংবাদ দিয়েছেন। আমরা এখানে ইব্‌ন্ বতুতার লেখা থেকে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করছি।

"বাংলার সুলতান—ইনি সুলতান ফখরুদ্দীন, ডাকনাম ফখ্‌রা। ইনি গুণী রাজা এবং বিদেশীদের, বিশেষত ফকীর ও সুফীদের ভালবাসেন।...আলী শাহ লখ্‌নৌতিতে ছিলেন।...ফখরুদ্দীন...'সোদকাওয়াঙে' এবং বাংলার অবশিষ্ট অংশে বিদ্রোহ করেন। সেখানে তিনি নিজের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আলী শাহের যুদ্ধ বাধে। শীতকালে এবং বর্ষাকালে জলকাদার মধ্যে ফখরুদ্দীন জলপথে লখ্‌নৌতি আক্রমণ করতেন, কারণ জলে তিনি শক্তিশালী ছিলেন। কিন্তু শুষ্ক ঋতু (গ্রীষ্মকাল) এলে আলী শাহ স্থলপথে বাংলা আক্রমণ করতেন, কারণ স্থলে তাঁর শক্তি বেশী ছিল।

"সুলতান ফখরুদ্দীনের ফকীরদের প্রতি শ্রদ্ধা এত প্রগাঢ় ছিল যে তিনি তাদের (ফকীরদের) মধ্য থেকে শায়দা নামে একজনকে 'সোদকাওয়াঙে' তাঁর নায়েব (প্রতিনিধি) নিযুক্ত করেছিলেন। অতঃপর ফখরুদ্দীন তাঁর একজন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য সৈন্যবাহিনী নিয়ে যাত্রা করেন। কিন্তু শায়দা নিজে স্বাধীন হবার অভিপ্রায়ে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সে সুলতান ফখরুদ্দীনের পুত্রকে হত্যা করে। এইটি ছাড়া সুলতানের আর কোন পুত্র ছিল না। এই খবর শুনে সুলতান রাজধানীতে ফিরে আসেন। শায়দা এবং তার দলের লোকেরা পালিয়ে 'সুনারকাওয়াঙ' (সোনারগাঁও) শহরে আশ্রয় নিল। ঐ স্থান খুব দুর্ভেদ্য। সুলতান ঐ জায়গা দখল করার জন্য এক সৈন্যবাহিনী পাঠালেন। সেখানকার অধিবাসীরা নিজেদের প্রাণের ভয়ে শায়দাকে বন্দী করে সুলতানের বাহিনীর কাছে পাঠিয়ে দিল। এই খবর সুলতানের কাছে গেলে তিনি বিদ্রোহীর মাথা (তাঁর কাছে) পাঠাতে আদেশ দিলেন। ফলে তার (শায়দার) মাথা কেটে ফেলা হল ও (সুলতানের কাছে) পাঠানো হল এবং তার জন্য এক বিরাট সংখ্যক ফকীর নিহত হল। আমি যখন 'সোদকাওয়াঙে' প্রবেশ করি, আমি তার সুলতানকে দেখিনি বা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিনি, কারণ তিনি ভারতবর্ষের সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন এবং আমি যদি সাক্ষাৎ করি, তার ফলাফল কী হবে, সে সম্বন্ধে আমার ভয় হয়েছিল।"

ইব্‌ন্ বতুতা এখানে একটি নতুন সংবাদ দিয়েছেন। সেটি এই যে, তাঁর

বাংলাদেশে ভ্রমণের সময়ে 'সোদকাওয়াঙ' ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের রাজধানী ছিল। ফখরুদ্দীন পর্যায়ক্রমে সোনারগাঁও ও 'সোদকাওয়াঙে' তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করতেন বলে মনে হয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই 'সোদকাওয়াঙ' আসলে কোন্ শহর? ধ্বনির দিক দিয়ে মাত্র দুটি শহরের নামের সঙ্গে 'সোদকাওয়াঙ'-এর মিল দেখা যায়—সাতগাঁও ও চাটগাঁও। আমি ইতিপূর্বে এই বইয়ের প্রথম সংস্করণে (পৃঃ ৩৭৯-৩৮৩) এ সম্বন্ধে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করেছিলাম যে 'সোদকাওয়াঙ' ও 'সাতগাঁও' অভিন্ন। কিন্তু এখন সে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছি। কারণ সাতগাঁও যে ফখরুদ্দীনের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তার স্বতন্ত্র কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বারনির 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী'র যে সংক্ষিপ্ত অনুবাদ এলিয়ট করেছেন (Tarikh-i-Firoz Shahi, Translated by Elliot, edited by Dowson, 1953, p. 167 দ্রঃ), তা পড়লে মনে ধারণা জন্মায় যে, ফখরুদ্দীন সাতগাঁও অধিকার করেছিলেন, কিন্তু বারনির মূল গ্রন্থ পড়লে ঐ ধারণা অপনোদিত হয়। 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী' থেকে জানা যায়, ফখরুদ্দীন যখন সোনারগাঁওয়ে বিদ্রোহ করেছিলেন, তখন সাতগাঁওয়ের শাসনকর্তা ছিলেন মালিক অজুদ্দীন য়াহিআ; তিনি কদর খানের সহযোগী হয়ে ফখরুদ্দীনকে দমন করতে এসেছিলেন; প্রথম সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে ফখরুদ্দীন পলায়ন করলে অজুদ্দীন সাতগাঁওয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। ইব্‌ন্ বত্তুতা কর্তৃক উল্লিখিত 'সোদকাওয়াঙ' যে 'সাতগাঁও' নয়, তার একটি বড় প্রমাণ এই যে, যে বছরে ইব্‌ন্ বত্তুতা বাংলাদেশে এসেছিলেন সেই বছরেই অর্থাৎ ৭৪৭ হিজরায় সাতগাঁওয়ের টাকশাল থেকে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের মুদ্রা উৎকীর্ণ হয়েছিল (J. N. S. I., Vol. V, 1943, p. 66 দ্রষ্টব্য) সুতরাং যতদূর মনে হয়, মালিক অজুদ্দীন য়াহিআ অথবা তাঁর কোন স্থলাভিষিক্তের কাছ থেকে ইলিয়াস শাহ সরাসরি সাতগাঁও জয় করেছিলেন, সাতগাঁও কোনদিন ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের রাজ্যভুক্ত হয় নি। পক্ষান্তরে, ফখরুদ্দীন চাটগাঁও অধিকার করেছিলেন বলে শিহাবুদ্দীন তালিশ লিখেছেন এবং শিহাবুদ্দীনের উক্তি যে সত্য, তা আমরা ইতিপূর্বে দেখাবার চেষ্টা করেছি। অতএব 'সোদকাওয়াঙ' চাটগাঁওয়ের সঙ্গে অভিন্ন বলেই সিদ্ধান্ত করা যায়।

ইব্‌ন্ বত্তুতার বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ঐ সময় বাংলাদেশ ধনে-ধান্যে ভরা ছিল এবং তার জিনিসপত্র এত সস্তা ছিল, তেমনটি পৃথিবীর আর কোথাও

ছিল না। ইব্‌ন্ বত্তুতার বিবরণের মধ্যে সেযুগের বিভিন্ন জিনিষের দাম উল্লিখিত আছে।

ফখরুদ্দীনের রাজ্যের অন্তর্গত হবঙ্ক (বর্তমান শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত) শহরে ইব্‌ন্ বত্তুতা হিন্দুদের যে অবস্থা দেখেছিলেন, তার তিনি এই বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন, "হবঙ্কের অধিবাসীরা বিধর্মী, তারা 'জিম্মা'র (রক্ষণব্যবস্থা) অধীন। যে শস্য তারা উৎপাদন করে, তার অর্ধেক নিয়ে নেওয়া হয়। তাছাড়াও তাদের কোন কোন কর দিতে হয়।" এর থেকে বোঝা যায়, ফখ্‌রুদ্দীনের কাছ থেকে হিন্দুরা উদার ব্যবহার পায় নি।

ইব্‌ন্ বত্তুতা নীল নদী অর্থাৎ মেঘনা দিয়ে হবঙ্ক থেকে সোনারগাঁওয়ে এসেছিলেন। তিনি লিখেছেন, "সুলতান ফখরুদ্দীন আদেশ দিয়েছেন যে এই নদীতে ফকীরদের কাছ থেকে কোন ভাড়া আদায় করা হবে না এবং যার কিছু নেই, তাকে খাদ্য দেওয়া হবে। যে ফকীর এই শহরে (সোনারগাঁওয়ে) আসে, তাকে আধ দীনার (প্রায় আট আনার মত) দেওয়া হয়।"

ইব্‌ন্ বত্তুতা লিখেছেন যে, 'সোদকাওয়াঙ' বা চাটগাঁওয়ের কাছে নদীতে "অসংখ্য জাহাজ আছে, এগুলি দিয়ে এরা লখ্‌নৌতির লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করে।" এর থেকে বোঝা যায়, লখ্‌নৌতির তৎকালীন সুলতান ইলিয়াস শাহের সঙ্গেও ফখরুদ্দীনের যুদ্ধ হত।

কিন্তু ইব্‌ন্ বত্তুতা তাঁর বিবরণে ফখরুদ্দীনের সম্বন্ধে একটি ভুল খবর দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন যে বাংলাদেশ থেকে সুলতান নাসিরুদ্দীনের (বলবনের পুত্র বুগরা খান) বংশের আধিপত্য লুপ্ত হলে ফখরুদ্দীন মুহম্মদ তোগলকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং নিজে স্বাধীন রাজা হন, কারণ তিনি নাসিরুদ্দীনের বংশের মিত্র ছিলেন। কিন্তু বাংলায় নাসিরুদ্দীনের বংশের আধিপত্য ১৩০১ খ্রীষ্টাব্দে বা তার কিছুকাল আগে নাসিরুদ্দীনের পুত্র রুকনুদ্দীন কায়কাউসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়েছিল। ফখরুদ্দীনের বিদ্রোহ তার বহু পরে সংঘটিত হয়েছিল। ইব্‌ন্ বত্তুতা শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ (১৩০১-১৩২২ খ্রীঃ) ও তাঁর পুত্রদের নাসিরুদ্দীনের বংশের লোক বলে মনে করেছেন, কিন্তু তাঁরা নাসিরুদ্দীনের বংশধর নন (এ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য History of Bengal, D. U., Vol. II, p. 77, pp. 93-94 এবং I. H. Q., Vol. XVIII, No. 1, 1942, p. 65 ff. দ্রষ্টব্য)। শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের বংশের উচ্ছেদ ফখরুদ্দীনের বিদ্রোহের ১০।১১ বছর আগে ঘটেছিল (History

of Bengal, D. U., Vol. II. p. 89 দ্রষ্টব্য), সুতরাং তা'ও ফখরুদ্দীনের বিদ্রোহের কারণ হতে পারে বলে মনে হয় না। 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'র মতে গিয়াসুদ্দীন তোগলকের পালিতপুত্র—দিল্লী থেকে প্রেরিত বহ্‌রাম খানের তরবারি-বাহক ছিলেন ফখরুদ্দীন। শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের বংশের সঙ্গে ফখরুদ্দীনের কোন ঘনিষ্ঠতা ছিল বলে অন্য কোন সূত্র থেকে জানা যায় না। তবে এরকম ঘনিষ্ঠতা থাকা অসম্ভব নয়। ফখরুদ্দীন শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের বংশের উচ্ছেদকে তাঁর বিদ্রোহের অজুহাত হিসাবে উপস্থাপিত করেছিলেন, এরকম হতে পারে।

কীভাবে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের মৃত্যু হল, তা সঠিকভাবে বলা যায় না। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন বিবরণে বিভিন্ন ধরনের কথা লেখা আছে এবং আশ্চর্যের বিষয়, কারও কথা সত্য নয়। নীচে আমরা এ সম্বন্ধে আলোচনা করছি।

শাম্‌স্‌-ই-সিরাজ আফিফ রচিত 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী'তে লেখা আছে যে ফিরোজ শাহ তোগলক ও শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের যুদ্ধের পর ফিরোজ শাহ দিল্লীতে ফিরে গেলে (৭৫৫ হিঃ=১৩৫৪ খ্রীঃ) ইলিয়াস শাহ সোনারগাঁও আক্রমণ করে ফখরুদ্দীনকে নিহত করেন এবং তাঁর রাজ্য অধিকার করে নেন। কিন্তু মুদ্রার সাক্ষ্য থেকে দেখা যায়, ৭৫০ হিজরায় ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের মৃত্যু হয় এবং ঐ বছরেই ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন ও ৭৫৩ হিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। অতএব ৭৫৫ হিজরায় ফখরুদ্দীনের নিহত হওয়া এবং ইলিয়াস শাহের ফখরুদ্দীনের কাছ থেকে রাজ্য কেড়ে নেওয়া—দুইই অসম্ভব।

য়াহিআ বিন্‌ সিরহিন্দি তাঁর 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'তে লিখেছেন যে ইলিয়াস শাহ ৭৪১ হিজরায় সোনারগাঁও আক্রমণ ও অধিকার করেন এবং ফখরুদ্দীনকে প্রথমে গলায় শৃঙ্খল বেঁধে বন্দী করেন ও পরে বধ করেন। কিন্তু ফখরুদ্দীন ৭৫০ হিঃ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন এবং ৭৫৩ হিঃ অবধি তাঁর পুত্র রাজত্ব করেন। অতএব ৭৪১ হিজরায় তাঁর পরাজয় ও রাজ্যচ্যুতি অসম্ভব।

বদাঔনী তাঁর 'মন্তখব-উৎ-তওয়ারিখে' লিখেছেন যে ফখরুদ্দীন বিদ্রোহ ঘোষণা করলে সুলতান মুহম্মদ তোগলক তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং ৭৪১ হিজরায় সোনারগাঁওয়ে এসে সোনারগাঁও অধিকার করেন ও ফখরুদ্দীনকে দিল্লীতে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেন। কিন্তু মুহম্মদ তোগলকের সমসাময়িক ঐতি-

হাসিকেরা তাঁর এই তথাকথিত ৭৪১ হিজরার বঙ্গাভিযান সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও উল্লেখ করেননি, তাঁদের লেখা বিবরণ থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে মুহম্মদ তোগলক ৭৪১ হিজরায় বাংলাদেশ থেকে দূরে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে গিয়েছিলেন। আলোচ্য যুগের প্রধান সমসাময়িক ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারনি স্পষ্টই লিখেছেন যে ফখরুদ্দীন বিদ্রোহ করে মুহম্মদ তোগলকের সাম্রাজ্যের যে সমস্ত অংশ অধিকার করেছিলেন, মুহম্মদ সেগুলি কোন দিন পুনরধিকার করতে পারেন নি। যাহোক, ৭৪১ হিজরায় যখন মুহম্মদ তোগলক বাংলাদেশে আসেননি এবং ফখরুদ্দীন যখন ৭৫০ হিঃ পর্যন্ত বেঁচেছিলেন, তখন বদাওনীর উক্তি ভুল বলে প্রমাণিত হচ্ছে।

বখশী নিজামুদ্দীন তাঁর 'তবকাৎ-ই-আকবরী'তে এবং গোলাম হোসেন তাঁর 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' লিখেছেন যে লখ্‌নৌতির সুলতান আলাউদ্দীন আলী শাহ এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে সুলতান ফখরুদ্দীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন; যুদ্ধের পরে আলী শাহ ফখরুদ্দীনকে বন্দী করেন এবং তাঁকে বধ করে তিনি কদর খানের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। 'তবকাৎ' ও 'রিয়াজ'-এর মতে ৭৪১ হিজরায় এই ঘটনা ঘটেছিল। আবার ৭৪১ হিজরা! 'আইন-ই-আকবরী'তেও লেখা আছে যে আলী শাহ ফখরুদ্দীনকে আক্রমণ করে বন্দী ও বধ করেছিলেন, কিন্তু তাতে কোন সালের উল্লেখ করা হয়নি। মুদ্রা ও শিলালিপির সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে, ৭৪৩ হিজরায় আলাউদ্দীন আলী শাহের মৃত্যু ঘটে ও শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন; ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ যখন ৭৫০ হিঃ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন, তখন আলাউদ্দীন আলী শাহের হাতে তাঁর মৃত্যু ঘটতে পারে না।

অতএব এ সম্বন্ধে প্রত্যেকটি বিবরণের উক্তিই ভ্রান্ত। আসলে যতদূর মনে হয়, ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল।

ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের প্রসঙ্গ শেষ করবার আগে তাঁর সম্বন্ধে আর একটি কথা উল্লেখ করা দরকার। তাঁর মুদ্রাগুলির গঠন ও আকৃতি চমৎকার এবং এ পর্যন্ত বাংলার সুলতানদের যত মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে তাদের মধ্যে এগুলি সবচেয়ে সুন্দর। এ সম্বন্ধে ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী লিখেছেন, "The coins of Fakhruddin are veritable gems of the art of coin-striking and speak volumes in favour of the skill of the Sonargaon artists. Their shape is regular, the lettering on

them delightfully neat and well-shaped, and they carry about them a refreshing air of refinement. It is a joy to behold them and a delight to read them. It may be safely asserted that coin-making never again attained such excellence in Bengal." রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও লিখেছেন, "সুলতান ফখর্-উদ্দীন্ মবারক্ শাহের মুদ্রা অবিমিশ্ররজতে নির্ম্মিত এবং ইহার গঠন অতি সুন্দর।"

বিখ্যাত দরবেশ শেখ জলালুদ্দীন তব্রিজী ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি কামরূপের পার্বত্য অঞ্চলে বাস করতেন। ইব্‌ন্ বত্তুতা ৭৪৭ হিজরা বা ১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। পরের বছর ১৫০ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহ

ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহের নাম কোন ইতিহাসগ্রন্থে পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র মুদ্রার সাক্ষ্য থেকে তাঁর অস্তিত্ব জানা গিয়েছে।

ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহের সমস্ত মুদ্রা ফখরুদ্দীন মুবারক শাহেরই মত সোনারগাঁওয়ের টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ। তাঁর মুদ্রায় 'অস্-সুলতান বিন্ অস্-সুলতান' লেখা আছে। এর থেকে বোঝা যায় যে ইখতিয়ারুদ্দীনের পিতা সুলতান ছিলেন। কিন্তু কোন মুদ্রাতেই তাঁর পিতার নাম লেখা নেই। না থাকলেও, ফখরুদ্দীন মুবারক শাহই যে ইখতিয়ারুদ্দীনের পিতা, তা তিনটি প্রমাণ থেকে বলা চলে। প্রথমত, ফখরুদ্দীনের মুদ্রা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ইখতিয়ারুদ্দীনের মুদ্রা সুরু হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ফখরুদ্দীন ও ইখতিয়ারুদ্দীনের মুদ্রার গঠন অবিকল এক এবং দু'জনের মুদ্রারই উল্টো-পিঠে "খলীফৎ-এর ডান হাত" কথাটি লেখা আছে একইভাবে। তৃতীয়ত, ঐ সময়ে বা তার অব্যবহিত আগে সোনারগাঁওয়ে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ ছাড়া এমন কোন সুলতানের সন্ধান পাওয়া যায় না, ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহ যাঁর পুত্র হতে পারেন। এই তিনটি প্রমাণ থেকেই টমাস ইখতিয়ারুদ্দীন ফখরুদ্দীনের পুত্র ছিলেন বলে সিদ্ধান্ত করেছেন এবং পরবর্তী সমস্ত ঐতিহাসিক তাঁর সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছেন।

ইখতিয়ারুদ্দীন যে ফখরুদ্দীনের পুত্র, সে সম্বন্ধে আমাদের কোন সংশয়

নেই। তবে ইব্‌ন্ বত্তুতার একটি উক্তি এ সম্বন্ধে খানিকটা সংশয়ের সৃষ্টি করে। ইব্‌ন্ বত্তুতা লিখেছেন যে ফখরুদ্দীন শায়দা নামক একজন ফকীরকে সাতগাঁওয়ের শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করে কোন একজন শত্রুর বিরুদ্ধে যখন যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন, তখন দুষ্ট শায়দা ফখরুদ্দীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ফখরুদ্দীনের পুত্রকে হত্যা করে। এইটি ছাড়া সুলতানের আর কোন পুত্র ছিল না। ফখরুদ্দীনের একমাত্র পুত্র যখন শায়দার হাতে নিহত হয়েছিলেন বলে জানা যাচ্ছে, তখন ইখতিয়ারুদ্দীন ফখরুদ্দীনের পুত্র হন কেমন করে? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর এই যে, ইব্‌ন্ বত্তুতার বাংলাদেশে ভ্রমণের পরে ফখরুদ্দীনের আর একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনিই ইখতিয়ারুদ্দীন। এই মত যদি সত্য হয়, তাহলে বলতে হবে ৭৫০ হিজরায় সিংহাসনে আরোহণের সময় ইখতিয়ারুদ্দীন নিতান্ত শিশু ছিলেন, কারণ ৭৪৭ হিজরা বা ১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইব্‌ন্ বত্তুতা বাংলাদেশে ভ্রমণ করেন। ৭৫৩ হিজরায় যখন ইখতিয়ারুদ্দীনের রাজত্বের অবসান হয়, তখনও তিনি শিশুই ছিলেন।* আমাদের মত সত্য হলে কেন ইখতিয়ারুদ্দীন কোন ইতিহাসগ্রন্থে উল্লিখিত হন নি, তা বোঝা যাবে।

৭৫৩ হিজরা থেকে ৭৫৮ হিজরা অবধি সোনারগাঁও টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের মুদ্রা অব্যাহতভাবে পাওয়া যাচ্ছে। এর থেকে বোঝা যায় যে, ৭৫৩ হিজরায় ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহ শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ কর্তৃক রাজচ্যুত ও সম্ভবত নিহত হন।

শামস্‌-ই-সিরাজ আফিফ তাঁর 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী'তে লিখেছেন যে, ইলিয়াস শাহ কর্তৃক ফখরুদ্দীন নিহত ও তাঁর রাজ্য অধিকৃত হবার পরে ফখরুদ্দীনের জামাতা জাফর খান দিল্লীতে ফিরোজ শাহের কাছে গিয়ে নালিশ করেন। আফিফের এই উক্তির মধ্যে যে ভুল আছে, সেকথা আগেই বলেছি। আমরা সিকন্দর শাহের প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব এবং এই ভুলের কারণ কী, তাও নিরূপণের চেষ্টা করব। আসলে জাফর খান ইলিয়াস শাহ কর্তৃক ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহের রাজ্য

* ডঃ আবদুল করিমের মতে এরকম সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন প্রয়োজন নেই (সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৯, পৃঃ ২২৭ দ্রঃ)। কিন্তু ইব্‌ন্ বত্তুতার উক্তির সঙ্গে ইখতিয়ারুদ্দীন সম্বন্ধে সমস্ত ইতিহাসগ্রন্থের নীরবতাকে একত্র পর্যালোচনা করলে এই সিদ্ধান্তে আসাই সঙ্গত বলে আমাদের মনে হয়।

অধিকারের পরেই ফিরোজ শাহের কাছে গিয়ে নালিশ করেছিলেন সন্দেহ নেই। যতদূর মনে হয়, শিশু ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহের অভিভাবকরূপে তাঁর ভগ্নীপতি জাফর খান রাজ্য শাসন করতেন। এই শিশুর কথা সমসাময়িক ও পরবর্তী ঐতিহাসিকেরা উল্লেখ করেননি বা করবার প্রয়োজন বোধ করেননি। শাম্স্-ই-সিরাজ আফিফের মতে ইলিয়াস শাহের সোনারগাঁও অধিকারের সময় জাফর খান শুল্ক আদায় এবং শুল্ক সংগ্রাহকদের হিসাবপত্র পরীক্ষার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এই কথা সত্য বলে মনে হয়। জাফর খানের অভিযোগের ফলেই ফিরোজ শাহ দ্বিতীয়বার বাংলাদেশ আক্রমণ করেন।

আলাউদ্দীন আলী শাহ

আলাউদ্দীন আলী শাহের পূর্ব নাম আলী মুবারক। তিনি লখ্নৌতির শাসনকর্তা কদর খানের অধীনে সৈন্যবাহিনীর বেতনদাতা ছিলেন। কদর খান সোনারগাঁওয়ে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের বিদ্রোহ দমন করতে যান এবং প্রথমে ফখরুদ্দীনকে পরাজিত করেও তারপর নিজের অর্থলোভের দরুণ সৈন্যবাহিনীর বিরাগভাজন হন, ফলে তারা ফখরুদ্দীনের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাঁকে নিহত করে। ফখরুদ্দীন তারপর লখ্নৌতি অধিকার করে সেখানে নিজের ভৃত্য মুখলিশকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। আলী মুবারক কিন্তু বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে মুখলিশকে বধ করে লখ্নৌতি অধিকার করেন। তিনি নিজেকে স্বাধীন সুলতান হিসাবে ঘোষণা করার বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় না দেখিয়ে দিল্লীশ্বর মুহম্মদ তোগলকের কাছে লখ্নৌতির একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করার আবেদন জানিয়ে চিঠি পাঠান। মুহম্মদ তোগলক কর্তৃক নিযুক্ত শাসনকর্তা য়ুসুফ দিল্লীতে এসে পৌছোবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয় এবং উন্মাদ মুহম্মদ তোগলক তাঁর জায়গায় আর কাউকে নিযুক্ত করেন নি। তখন আলী মুবারক বাধ্য হয়ে সিংহাসনে বসলেন এবং আলাউদ্দীন আলী শাহ নাম নিলেন। কারণ তাঁর শত্রু ফখরুদ্দীন অনবরত লখ্নৌতি জয়ের চেষ্টা করছেন, লখ্নৌতিতে কোন শাসনকর্তা নেই, অতএব আলী মুবারককেই সে আক্রমণ ঠেকাতে হবে। কিন্তু লোকে রাজা ভিন্ন কারও নির্দেশ সহজে মানবে না, তাই বাধ্য হয়ে তিনি রাজা হলেন। আলী মুবারক যে সত্যিকারের বীর, নিঃস্বার্থপরায়ণ এবং কর্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন, তা 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'তে বর্ণিত তাঁর এই ইতিহাস থেকে বোঝা যায়।

ইব্‌ন্ বত্তুতার বিবরণ থেকে জানা যায়, আলী শাহ কীরকমভাবে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের সঙ্গে যুদ্ধ করতেন। বর্ষাকাল এবং শীতকালে ফখরুদ্দীন লখ্‌নৌতি আক্রমণ করতেন, কারণ ফখরুদ্দীন জলে শক্তিশালী ছিলেন; কিন্তু আলী শাহ স্থলে বেশী শক্তিশালী ছিলেন বলে গ্রীষ্মকালে তিনিই ফখরুদ্দীনের রাজ্য আক্রমণ করতেন।

আলাউদ্দীন আলী শাহের সমস্ত মুদ্রাই ফিরোজাবাদ বা পাণ্ডুয়ার টাকশাল থেকে তৈরী। এর থেকে বোঝা যায়, উত্তরবঙ্গের অঞ্চলবিশেষ তাঁর অধিকারে ছিল। সমসাময়িক ইতিহাসগ্রন্থগুলিতে বলা হয়েছে, লখ্‌নৌতি অঞ্চল (অর্থাৎ পূর্বতন মুসলমান সুলতানদের রাজ্যের মধ্যে উত্তরবঙ্গের যে সমস্ত অঞ্চল ছিল) তাঁর অধিকারে ছিল। বাংলার আর কোন অঞ্চল যে তিনি কোন দিন অধিকার করেছিলেন, তার কোন প্রমাণ নেই। সোনারগাঁও অঞ্চল অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ যে তাঁর শত্রু ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের অধীনে ছিল, তার প্রমাণ আছে। এসম্বন্ধে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

আলাউদ্দীন আলী শাহ কতদিন রাজত্ব করেছিলেন, সে প্রশ্ন আগে বেশ জটিল ছিল। কারণ টমাস এবং তাঁর অনুবর্তী গবেষকেরা বলেছিলেন, আলী শাহের ৭৪২, ৭৪৩, ৭৪৪, ৭৪৫ ও ৭৪৬ হিজরার মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। আলী শাহের পরবর্তী সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহেরও ৭৪০, ৭৪৩, ৭৪৪, ৭৪৫ ও ৭৪৬ হিজরার মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে বলে এঁরা বলেছিলেন। দুই সুলতানের মুদ্রাই ফিরোজাবাদের টাকশালে তৈরী। টমাস এবং তাঁর অনুবর্তী গবেষকদের মত সত্য হলে বলতে হত, আলী শাহ ও ইলিয়াস শাহ ৭৪০ বা ৭৪২ হিজরা থেকে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করেছেন, এবং কখনও একজন, কখনও অপরজন ফিরোজাবাদ দখল করে তার টাকশাল থেকে মুদ্রা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এইভাবে যে সে টাকশাল থেকে মুদ্রা প্রকাশ করলেই লোকে সে মুদ্রাকে গ্রহণ করে না। আসলে টমাস প্রভৃতি গবেষকেরা আলী শাহ ও ইলিয়াস শাহের অনেক মুদ্রার তারিখ ভুল পড়াতেই এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে আলাউদ্দীন আলী শাহের এ পর্যন্ত যে সমস্ত মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে, সমস্তই ৭৪২ ও ৭৪৩ হিজরায় তৈরী; ইলিয়াস শাহের ৭৪০ হিজরার কোন মুদ্রা নেই, ঐ তারিখ ভুল পড়া হয়েছিল (Bhattashali, Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal, pp. 14-17, 19-24)। ইলিয়াস শাহের রাজত্বের প্রাচীনতম তারিখ ৭৪৩ হিজরার ২রা শাবান। ঐ

তারিখে উৎকীর্ণ তাঁর একটি শিলালিপি পাওয়া যায়। ৭৪৩ থেকে ৭৫৮ হিজরা পর্যন্ত ইলিয়াস শাহের মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে। অতএব ৭৪৩ হিজরার শাবান মাসের আগেই যে আলাউদ্দীন আলী শাহের রাজত্ব শেষ হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর রাজত্ব কবে আরম্ভ হয়েছিল, তা'ও অনুমান করা কঠিন নয়। ৭৪২ হিজরায় সর্বপ্রথম আলাউদ্দীন আলী শাহের মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে। ঐ বছরেই তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। কারণ ৭৩৯ হিজরায় ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তারপর কদর খান কর্তৃক বিদ্রোহ দমন, কদর খানের হত্যা, ফখরুদ্দীন কর্তৃক লখ্‌নৌতি অধিকার, সেখানে মুখলিশকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করা, আলী শাহ কর্তৃক মুখলিশকে বধ ও লখ্‌নৌতি পুনরধিকার, মুহম্মদ তোগলকের কাছে শাসনকর্তা নিয়োগ করতে চিঠি লেখা, মুহম্মদ তোগলক কর্তৃক শাসনকর্তা নিয়োগ, সেই শাসনকর্তার মৃত্যু, অতঃপর মুহম্মদ তোগলকের কিছুকাল নতুন শাসনকর্তা নিয়োগে অবহেলা এবং তার ফলে আলী শাহের সিংহাসনে আরোহণ—এই ঘটনাগুলি যথাক্রমে ঘটে। এত ঘটনা ঘটতে ৩।৪ বছরের কম সময় লাগবার কথা নয়। অতএব আলী শাহ ৭৪২ হিজরায় সিংহাসনে আরোহণ করেন বলে ধরা যায়। পরবর্তী কালের ইতিহাসগ্রন্থগুলিতে লেখা আছে যে আলী শাহ এক বছর কয়েক মাস ('রিয়াজ'-এর মতে এক বছর পাঁচ মাস) রাজত্ব করেন। এই কথাই সত্য বলে মনে হয়। সুতরাং আলাউদ্দীন আলী শাহ ৭৪২ হিজরার গোড়ার দিকে সিংহাসনে আরোহণ করেন বলে অনুমান করা যায়।

শামস্-ই-সিরাজ আফিফ তাঁর 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী'তে লিখেছেন যে, শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের কাছ থেকে পাণ্ডুয়া জয় করার পরে (১৩৫৪ খ্রীঃ) ফিরোজ শাহ তোগলক ঐ শহরের নাম ফিরোজাবাদ রাখেন। কিন্তু আলাউদ্দীন আলী শাহের মুদ্রাগুলি ফিরোজাবাদের টাকশালে উৎকীর্ণ হয়েছিল বলে মুদ্রাগুলিতে লেখা আছে। অতএব শামস্-ই-সিরাজ আফিফের উক্তি ভুল বলে প্রমাণিত হচ্ছে। যতদূর মনে হয়, আলী শাহই প্রথম পাণ্ডুয়া বা ফিরোজাবাদে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। এর প্রায় একশো বছর পর পর্যন্ত এই শহর বাংলার রাজধানী ছিল।

শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের সঙ্গে আলাউদ্দীন আলী শাহের কী সম্পর্ক ছিল, তা সঠিকভাবে জানা যায় না। 'আইন-ই-আকবরী'র মতে ইলিয়াস বাংলার অন্যতম আমীর ছিলেন, 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে'র মতে ইলিয়াস

ছিলেন আলী শাহের ধাত্রীমাতার পুত্র এবং বুকাননের বিবরণীর মতে তিনি ছিলেন আলী শাহের ভৃত্য। প্রায় সমস্ত বিবরণীরই মতে ইলিয়াস ষড়যন্ত্র করে আলী শাহকে বধ করে নিজে রাজা হন। এই সব বিবরণের মধ্যে 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'ই সব চেয়ে প্রাচীন। এতে লেখা আছে, "মালিক ইলিয়াস হাজীর বহু সমর্থক ছিল। তিনি লখ্‌নৌতির আমীর ও মালিকদের এবং জনসাধারণের সঙ্গে যোগ দিয়ে আলাউদ্দীনকে বধ করেন এবং সুলতান শামসুদ্দীন নাম নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন।" এই কথা সত্য বলেই গ্রহণ করা যায়।

'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' আলাউদ্দীন আলী শাহের উত্থান ও পতন সম্বন্ধে যে কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা আমরা নীচে উদ্ধৃত করলাম,—

"কথিত আছে মালিক আলী মুবারক প্রথমে মালিক ফিরোজ রজবের একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিলেন। মালিক ফিরোজ সুলতান গিয়াসুদ্দীন তোগলক শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং সুলতান মুহম্মদ শাহের জ্ঞাতি ভ্রাতা ছিলেন। সুলতান মুহম্মদ শাহ যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করলেন, তখন রাজত্বের প্রথম বছরেই তিনি মালিক ফিরোজকে তাঁর সচিব (সেক্রেটারী) নিযুক্ত করলেন। এই সময়ে আলী মুবারকের ধর্ম-ভাই হাজী ইলিয়াস কোন অপকর্ম করেন এবং তার জন্য তিনি দিল্লী থেকে পলায়ন করেন। মালিক ফিরোজ আলী মুবারককে তাঁর কথা বললে তিনি তাঁর (ইলিয়াসের) খোঁজ করলেন। যখন তাঁর কোন পাত্তা পাওয়া গেল না, তখন আলী মুবারক মালিক ফিরোজকে তাঁর পলায়নের কথা জানালেন। মালিক ফিরোজ তখন তাঁর উপর চটে গিয়ে তাঁকেও তাড়িয়ে দিলেন। আলী মুবারক বাংলাদেশের দিকে রওনা হলেন। পথে তিনি স্বপ্নে হজরৎ শাহ মখদুম জলালুদ্দীন তব্রিজীর (ভগবান তাঁর সমাধি পবিত্র করুন) দেখা পেলেন এবং তাঁকে বিনয় ও আনুগত্য দেখিয়ে পরিতুষ্ট করলেন ; সেই দরবেশ তাঁকে বললেন, 'আমরা তোমাকে বাংলার সুবা দান করছি, কিন্তু তুমি আমাদের জন্য একটি দরগা তৈরী করে দেবে।' আলী মুবারক তাতে সম্মত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় দরগা তৈরী করতে হবে। দরবেশ বললেন "পাণ্ডুয়া শহরে এক জায়গায় তুমি তিনটি ইঁট দেখতে পাবে। একটির উপরে আর একটি করে ইঁটগুলি রয়েছে এবং এই ইঁটগুলির নীচে আছে একটি তাজা একশো পাপড়ীওয়ালা গোলাপ ফুল। ঐ জায়গায় দরগা নির্মাণ করতে হবে।" যখন তিনি (আলী মুবারক) বাংলায়

পৌছোলেন, তিনি কদর খানের কাছে চাকরী নিয়ে সেখানেই থেকে গেলেন এবং ক্রমে ক্রমে তিনি কদর খানের বাহিনীর প্রধান সেনাপতির পদে উন্নীত হলেন।...আলী মুবারক আলাউদ্দীন নাম নিয়ে সুলতান হয়ে...অসীম ক্ষিপ্রতার সঙ্গে, লখ্‌নৌতিতে একদল সৈন্য রেখে বাংলার অন্যান্য অঞ্চল জয়ে মন দিলেন। বাংলাদেশে নিজের নামে খুৎবা এবং মুদ্রা প্রবর্তন করার পর তিনি বিলাস এবং সাফল্যের নেশায় এমনই মত্ত হয়ে গেলেন যে দরবেশের আদেশের কথা ভুলে গেলেন। তার ফলে এক রাত্রে আবার ঐ দরবেশ তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, 'আলাউদ্দীন! তুমি বাংলার রাজ্য পেয়েছ, কিন্তু আমার আদেশ ভুলে গেছ।' আলাউদ্দীন পর দিনই ইটগুলির খোঁজ করে দেখলেন দরবেশ যে নিশানা দিয়েছিলেন, সেই ভাবেই সেগুলি আছে। তিনি সেখানে একটি দরগা তৈরী করলেন, এখনও তার চিহ্ন বর্তমান আছে। এই সময়ে হাজী ইলিয়াসও পাণ্ডুয়ায় এলেন। সুলতান আলাউদ্দীন কিছু সময় তাঁকে বন্দী করে রেখে দিলেন, কিন্তু তাঁর ধাত্রী—ইলিয়াসের জননীর অনুরোধে তাঁকে ছেড়ে দিলেন এবং তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ পদ দিয়ে—তাঁর সামনে আসতে আজ্ঞা দিলেন। হাজী ইলিয়াস অল্প সময়ের মধ্যেই সৈন্যবাহিনীকে নিজের দলে টানলেন। একদিন তিনি খোজাদের সাহায্যে আলাউদ্দীনকে হত্যা করলেন এবং নিজে সুলতান শামসুদ্দীন ভাঙ্গরা নাম নিয়ে লখ্‌নৌতি এবং বাংলার রাজ্য অধিকার করলেন। আলাউদ্দীনের রাজ্য এক বছর পাঁচ মাস স্থায়ী হয়েছিল।"

বুকাননের বিবরণীতে আলী শাহ্ সম্বন্ধে যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তার সঙ্গে 'রিয়াজ'-এর বিবরণের মিল আছে, কিন্তু অমিলও যথেষ্ট। বুকাননের বিবরণীতে যা লেখা আছে, তা আমরা নীচে উদ্ধৃত করলাম এবং এই বিবরণীর বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য [ ] বন্ধনীর মধ্যে দিলাম।

"Firuz Shah, king of Delhi [ফিরোজ শাহ্ তখনও দিল্লীর সুলতান হননি], was a desolute prince, fond of hunting in company with his women, one of whom was corrupted by Shamsudin, then a servant of Alawudin, a principal officer under the king. ['রিয়াজ'-এর মতে শামসুদ্দীন ইলিয়াস আলাউদ্দীন আলী শাহের ধর্মভ্রাতা আর এই বিবরণীর মতে ভৃত্য; 'রিয়াজ'-এ শুধু লেখা আছে ইলিয়াস

দিল্লীতে কোন এক অপকর্ম করেছিলেন, আর এখানে বলা হয়েছে ইলিয়াস ফিরোজ শাহের জনৈক স্ত্রীলোক (উপপত্নী)কে নষ্ট করেছিলেন।] The culprit having secreted himself, the king was enraged with his master, and sent him to AzmutKhan, governor of Bengal, [নতুন নাম ; স্টেপলটন এঁকে মুহম্মদ তোগলকের অধীনস্থ সাতগাঁওয়ের শাসনকর্তা আজম-উল-মূল্‌ক্‌-এর সঙ্গে অভিন্ন ধরতে চান (Memoirs of Gaur and Pandua, p. 21. f. n.] I suppose with a view of having him killed. On the road he met with a holy man, Shyekh Jalaludin, of Tabriz, ['রিয়াজ'-এর মতে আলী শাহ্‌ স্বপ্নে জলালুদ্দীন তব্রিজীর দেখা পেয়েছিলেন, আর এই বিবরণীর মতে তাঁর সাক্ষাৎ দর্শন পেয়েছিলেন ; এ ব্যাপার সম্ভাব্য, কারণ জলালুদ্দীন তব্রিজী ঐ সময় জীবিত ছিলেন, ইব্‌ন্‌ বতুতা ১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে দেখেছিলেন।] who prophesied to him that he would be king, and requested that he would then bestow an endowment on him. I suppose the holy man also discovered to the noble the design of his being sent to Bengal ; as the manuscript [যার থেকে এই বিবরণী সঙ্কলিত হয়েছে] states that he immediately killed Azmut Khan, and seized on the government. [অন্য কোন বিবরণীতে এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় না।] He only, however, assumed the title of Muktagh, or governor ; but retained his authority for 20 years. [ভুল কথা।] He probably neglected the saint, who, according to the manuscript, seems to have assisted the fugitive servant, Shamsudin, to seize on the government. After having murdered Alawudin, under the disguise of a religious mendicant, by the advice of the saint Jalal, of Tabriz, [ধর্মনিষ্ঠ সর্বজনপূজ্য দরবেশ জলালুদ্দীন তব্রিজী বৃদ্ধ বয়সে ইলিয়াসের সঙ্গে আলী শাহের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছিলেন বলে বিশ্বাস করা যায় না] usually called Mukhdum Shah, Shamsudin fixed the seat of his government at Peruya, [পেঁড়ো অর্থাৎ পাণ্ডুয়া] and assumed the title of king." [পাণ্ডুয়া বা ফিরোজাবাদ সম্ভবত

আলাউদ্দীন আলী শাহেরও রাজধানী ছিল, কারণ সেখানকার টাকশাল থেকে তাঁর মুদ্রা প্রকাশিত হবেছিল।]

পাণ্ডুয়াতে জলালুদ্দীন তব্রিজীর নামাঙ্কিত একটি দরগা এখনও বর্তমান; এই দরগাটি 'শাহ জলালের দরগা' বা 'বড়ী দরগা' নামে পরিচিত। এই দরগার মধ্যে অনেকগুলি কোঠা আছে, এগুলি আলাউদ্দীন আলী শাহের রাজত্বকালের অনেক পরে নির্মিত। আলাউদ্দীন আলী শাহ যে দরগাটি নির্মাণ করিয়েছিলেন, তার কিছুই বোধ হয় এখন আর বর্তমান নেই। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে গোলাম হোসেন 'রিয়াজ-উস্-সলাতীন' বইয়ে লিখেছিলেন যে ঐ সময়ে আলাউদ্দীন আলী শাহ কর্তৃক নির্মিত দরগার "চিহ্ন" মাত্র অবশিষ্ট ছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইলিয়াস শাহী বংশ

শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ

আলাউদ্দীন আলী শাহকে হত্যা করে হাজী ইলিয়াস শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ নাম নিয়ে রাজা হলেন। 'রিয়াজ-উস্-সলাতীন' ও বুকাননের বিবরণী—উভয় সূত্রেই লেখা আছে যে ইলিয়াস দুশ্চরিত্র লোক ছিলেন এবং ষড়যন্ত্র করে তাঁর প্রভু আলী শাহকে বধ করেছিলেন। এই সব কথা কতদূর সত্য, তা বলা যায় না। তবে রাজা হবার আগে ইলিয়াস যা'ই করে থাকুন না কেন, রাজা হবার পরে তিনি অসীম যোগ্যতার পরিচয় দেন। আলী শাহকে বধ করে তিনি শুধু উত্তর বঙ্গের রাজা হলেন না, অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আরও বৃহত্তর গৌরবের অধিকারী হলেন। নানা রাজ্য তিনি জয় করলেন, সমগ্র বাংলাদেশকে এবং বাংলার বহির্ভূত অনেক অঞ্চলকেও নিজের অধিকারে আনলেন, দিল্লীর সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখলেন এবং এমন এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করলেন, যা দীর্ঘকাল ধরে গৌরব ও কৃতিত্বের সঙ্গে বাংলাদেশ শাসন করতে সক্ষম হয়েছিল।

অথচ এই কীর্তিমান নৃপতির পূর্ব-ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। 'রিয়াজ-উস্-সলাতীন', বুকাননের বিবরণী প্রভৃতি অর্বাচীন সূত্রে এ সম্বন্ধে যা বলা আছে, সেটুকু আলাউদ্দীন আলী শাহের প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছি। ইলিয়াস যে বাংলার বাইরে থেকে এসেছিলেন, এ সম্বন্ধে সব বিবরণীই একমত। কিন্তু তাঁর আদি নিবাস কোথায় ছিল, তার উল্লেখ প্রায় কোন সূত্রেই মেলে না। আরবের দু'জন ঐতিহাসিক ইব্‌ন্-ই-হজর এবং অল-সখাওয়ী গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের কথা লেখবার সময় গিয়াসুদ্দীনের পিতামহ ইলিয়াস শাহকে অল-সিজিস্তানী বলেছেন (Islamic Culture, 1958, p. 199) এঁরা চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক এবং প্রামাণিক গ্রন্থকার হিসাবে পরিচিত। এঁদের উক্তি থেকে মনে হয়, হাজী ইলিয়াসের আদি নিবাস ছিল পূর্ব ইরানের সিজিস্তানে। ইলিয়াস শাহ যে মক্কায় তীর্থ করে এসেছিলেন, তা তাঁর 'হাজী' উপাধি থেকে বোঝা যায়। 'তারিখ-ই মুবারক শাহী'তে ইলিয়াসকে "মালিক ইলিয়াস" বলা হয়েছে; এর থেকে বোঝা যায়

যে, আলাউদ্দীন আলী শাহের রাজত্বকালে ইলিয়াস লখ্‌নৌতি রাজ্যের একজন অভিজাত রাজপুরুষ ছিলেন।

যাহোক্, প্রথম জীবনে যিনি একজন নগণ্য ব্যক্তি ছিলেন, তিনিই পরবর্তীকালে এক বিরাট রাজ্যের অধীশ্বর হয়েছিলেন এবং জয়ের পর জয়ের মুকুট পরে, প্রবল শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে নিজের গৌরবের পতাকা উড়িয়েছিলেন। এইরকম অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ক্ষণজন্মা ব্যক্তির আবির্ভাব শুধু এদেশে নয়, ভিন্ন দেশেও খুব কমই হতে দেখা গিয়েছে। এঁর ইতিহাস যেটুকু জানা যায়, তা আমরা এখন বর্ণনা করব।

৭৪৪ হিজরা থেকে ফিরোজাবাদ বা পাণ্ডুয়ার টাকশালে তৈরী শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে। কারও কারও মতে তাঁর কতকগুলি পাণ্ডুয়ায় তৈরী মুদ্রার তারিখ ৭৪৩ হিজরা, কিন্তু এ সম্বন্ধে সকলে একমত নন। যাহোক, ৭৪৩ হিজরায় যে ইলিয়াস পাণ্ডুয়া তথা উত্তর বঙ্গ অধিকার করেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ কলকাতার বেনিয়াপুকুর এলাকার একটি আধুনিক মসজিদে একটি শিলালিপি সংলগ্ন আছে, সেটি শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের রাজত্বকালে ৭৪৩ হিজরার ২রা শাবান তারিখে অর্থাৎ ১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে উৎকীর্ণ হয়েছিল বলে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে (Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal, Dr. A. H. Dani, p. 10)। শিলালিপিটি কলকাতায় আবিষ্কৃত হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন যে ইলিয়াস শাহ প্রথমে দক্ষিণ বঙ্গ বা সাতগাঁও অঞ্চল অধিকার করেছিলেন। কিন্তু যে মসজিদে শিলালিপিটি পাওয়া গেছে, সেটি আধুনিক। এই মসজিদটি তৈরী হবার আগে শিলালিপিটি যে দক্ষিণ বঙ্গে ছিল, সে সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নেই। শিলালিপিটিতে প্রসিদ্ধ দরবেশ আলা অল-হকের জন্য একটি মসজিদ নির্মাণের কথা লেখা আছে। আলা অল-হক যে পাণ্ডুয়ায় বাস করতেন, সে সম্বন্ধে সব সূত্রই একমত। (পরে ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকন্দর শাহের রাজত্বকালে তিনি পাণ্ডুয়া থেকে সোনারগাঁওয়ে যেতে বাধ্য হন।) সুতরাং ইলিয়াস শাহের এই শিলালিপিটি যে মূলে পাণ্ডুয়ায় ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ অল্প।

অবশ্য এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, ইলিয়াস শাহ ৭৪৭ হিঃ বা ১৩৪৬ খ্রীঃর মধ্যেই সাতগাঁও অঞ্চল জয় করেছিলেন, কারণ ৭৪৭ হিজরায় সাতগাঁওয়ের টাকশাল থেকে তাঁর মুদ্রা প্রকাশিত হয়েছিল।

সিংহাসনে আরোহণ করে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ রাজ্যজয়ের দিকে মন দিলেন। ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নেপাল আক্রমণ করেন এবং সেখানকার বহু নগর ভস্মীভূত করেন, বহু মন্দির ভেঙে ফেলেন ও বিখ্যাত পশুপতিনাথের মূর্তিকে তিন খণ্ড করেন। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে সংকলিত একটি নেপাল রাজবংশাবলীতে লেখা আছে,

"সম্বৎ ৪৬৯ পৌর্ণমাস্যাং শ্রীশ্রীরাজাজয়রাজদেবেন শ্রীপশুপতিভট্টারকস্য কোষ প্রঢোকিতম্। তেন তত্র পূর্বসুরত্রাণ সমসদীনেনাগত্য শ্রীপশুপতিস্ত্রিখণ্ডীকৃতঃ, নেপাল সমস্ত ভস্মীভবানা হাহাকরোস্তি লোকাশ্চ।" (ইতিহাস, ৮ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ১৫৩)

এখানে বলা হয়েছে যে ৪৬৯ নেওয়ারী সংবৎ বা ১৩৪৯ খ্রীষ্টাব্দে নেপালের রাজা জয়রাজ (মল্ল) পশুপতিনাথের কোষ থেকে অর্থ গ্রহণ করেন এবং তার পরে পূর্বদেশের (অর্থাৎ বাংলার) সুরত্রাণ (সুলতান) সমসদীন (শামসুদ্দীন= শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ) নেপালে এসে পশুপতিনাথকে তিন খণ্ড করেন এবং সমস্ত পুড়িয়ে দেন। ১৩৪৯ খ্রীঃর কত পরে বাংলার সুলতান নেপাল আক্রমণ করেছিলেন, তা এখানে লেখা হয় নি। কিন্তু কাঠমণ্ডুর নিকটস্থ স্বয়ম্ভুনাথ মন্দিরের এক শিলালিপিতে এই আক্রমণের সঠিক বৎসরটি পাওয়া যায়। এই শিলালিপির প্রাসঙ্গিক অংশ নীচে উদ্ধৃত হল।

সপ্তত্যভ্যধিকে শ্রীমন্নেপালাব্দ চতুঃশতে।
মার্গশীর্ষে সিতে পক্ষে দশম্যাং গুরুবাসরে॥
সুরত্রাণ সমসদীনো বঙ্গাল বহুলৈ র্বলৈঃ।
সহাগত্য চ নেপালে ভগ্নো দগ্ধশ্চ সর্বশঃ॥

(ইতিহাস, ঐ সংখ্যা, পৃঃ ১৫২)

এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে ৪৭০ নেওয়ারী সংবৎ বা ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে শামসুদ্দীন নেপাল আক্রমণ করে ছারখার করেছিলেন।

প্রাচীন ললিতপুরী বা পাটনের লিপিতে ইলিয়াস শাহের নেপাল আক্রমণের কথা এইভাবে উল্লিখিত হয়েছে,

শ্রুতান সমসদীন যবনাধিরাজঃ
নেপাল সর্বনগরং ভস্মীকরোতি।

(ইতিহাস, ঐ সংখ্যা, পৃঃ ১৫১)

'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা'য় লেখা আছে যে ইলিয়াস শাহ জাজনগর অর্থাৎ উড়িষ্যা

আক্রমণ করেছিলেন। তিনি চিল্কা হ্রদের সীমা পর্যন্ত অভিযান চালিয়েছিলেন এবং ৪৪টি হাতী সমেত বহু সম্পত্তি লুঠ করেছিলেন। 'তবকাৎ-ই-আকবরী'-তেও লেখা আছে যে ইলিয়াস এক সৈন্যবাহিনী গঠন করে জাজনগরে অভিযান করেছিলেন এবং সেখান থেকে অনেক হাতী লাভ করে নিজের রাজধানীতে ফিরে এসেছিলেন।

উত্তরে ও দক্ষিণে নেপাল ও উড়িষ্যা অভিযানে ইলিয়াস শাহ লুঠপাট করে বহু সম্পদ হস্তগত করেন বটে, কিন্তু এর দ্বারা তাঁর রাজ্যের আয়তন কতখানি প্রসারিত হয়েছিল তা জানা যায় না। অথচ পশ্চিম ও পূর্বে তাঁর রাজ্যের সীমা যে অনেক দূর প্রসারিত হয়েছিল, তা সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। সমসাময়িক ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারনি লিখেছেন যে ইলিয়াস শাহ ত্রিহুত আক্রমণ করে তা অধিকার করে নিয়েছিলেন এবং ঐ দেশ লুঠ করে, তার বহু নগর ছারখার করে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের উপরেই তিনি সমানভাবে অত্যাচার চালিয়েছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর ঐতিহাসিক মুল্লা তকিয়া তাঁর বয়াজে লিখেছেন যে হাজী ইলিয়াস উত্তর বিহারের হাজীপুর পর্যন্ত জয় করেছিলেন। হাজী ইলিয়াসের নাম অনুযায়ী হাজীপুর নামক স্থানের নামকরণ হয়েছিল বলে প্রবাদ আছে।

'সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী' নামে আর একটি সমসাময়িক ইতিহাসগ্রন্থে লেখা আছে যে ইলিয়াস শাহ চম্পারণ, গোরক্ষপুর ও কাশী জয় করে এক বিরাট ভূখণ্ড তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং বহ্‌রাইচের সিপাহ্‌সালার শেখ মস্‌উদ গাজীর সমাধিতে দু'বার গিয়ে নিজের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। এই বইয়ের মতে ইলিয়াস বহ্‌রাইচ থেকে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করে বলে-ছিলেন, "এত প্রচুর শক্তি ও সম্পদ, স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনী নিয়ে আমি যদি দিল্লী গিয়ে শেখ-উল-ইসলাম নিজামুদ্দীনের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করতাম তাহলে কেমন সুন্দর হত? আমাকে এবং আমার বাহিনীকে বাধা দিতে কে সাহস করত?"

পূর্বদিকেও ইলিয়াস শাহ নতুন নতুন রাজ্য জয় করেছিলেন। মুদ্রার সাক্ষ্য থেকে দেখা যায়, ৭৫৩ হিজরা বা ১৩৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইলিয়াস শাহ ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের পুত্র ইখ্‌তিয়ারুদ্দীন গাজী শাহের কাছ থেকে সোনারগাঁও তথা পূর্ববঙ্গ জয় করে নেন। এর ফলে ইলিয়াস শাহ সমগ্র বাংলাদেশেরই অধীশ্বর হলেন।

এছাড়া ইলিয়াস শাহ কামরূপেরও অন্তত কতকাংশ জয় করেছিলেন। কারণ তাঁর পুত্র সিকন্দর শাহের রাজত্বের একেবারে গোড়ার দিকে—৭৫৯ হিজরায় উৎকীর্ণ একটি মুদ্রায় টাকশালের নাম লেখা আছে, "চৌলীস্তান ওরফে কামরূপ।" ("চৌলীস্তান" মানে চাউলের দেশ। ডঃ আবদুল করিমের মতে স্থানটির প্রকৃত নাম 'আওয়ালিস্তান'—Corpus of the Muslim Coins of Bengal, p. 50 দ্রষ্টব্য।) এর দ্বারা বোঝা যায় যে সিকন্দর শাহের রাজত্বের সুরু থেকেই কামরূপ বা তার কতকাংশ তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইলিয়াস শাহ ৭৫৯ হিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। সুতরাং "কামরূপ" অঞ্চল জয় তাঁরই রাজত্বকালের ঘটনা, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু ইলিয়াস শাহের এই সমস্ত বিজয়ের গৌরবও ম্লান হয়ে যায়, যখন দিল্লীর পরাক্রান্ত সুলতান ফিরোজ শাহ তোগলকের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষের কথা স্মরণ করি।

যদিও ফিরোজ শাহের অনুগত লোকদের লেখা ইতিহাস-গ্রন্থে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে ইলিয়াস এই যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের উক্তি বিশ্লেষণ করলে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না যে প্রকৃত সত্য অন্যরূপ। এ সম্বন্ধে বিচার করার আগে এই সংঘর্ষের বিবরণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করব।

তিনখানি সমসাময়িক গ্রন্থে এই সংঘর্ষের কথা পাওয়া যায়। এই তিনটি গ্রন্থের মধ্যে একটি জিয়াউদ্দীন বারনি রচিত 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী'। দ্বিতীয়টি শামস্-ই-সিরাজ আফিফ রচিত 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী'। তৃতীয়টি অজ্ঞাতনামা কোন ব্যক্তি কর্তৃক স্বয়ং ফিরোজ শাহের নির্দেশে রচিত 'সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী'। তিনটিই ফিরোজ শাহের অনুগত লোকের লেখা। সুতরাং যেক্ষেত্রে জয়পরাজয়ের প্রশ্ন জড়িত, সেক্ষেত্রে তাঁদের উক্তি একদেশদর্শিতা-দোষে দুষ্ট হয়ে পড়েছে।

এই তিনটি বইয়ের মধ্যে জিয়াউদ্দীন বারনির বইই সব চেয়ে আগে—ফিরোজ শাহ ও ইলিয়াস শাহের সংঘর্ষের মাত্র পাঁচ বছর পরে—১৩৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। তাই বারনির বইয়ে এ সম্বন্ধে যা লেখা আছে, তা খুব মূল্যবান। নীচে তার সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হল।

সুলতান ফিরোজ শাহের রাজত্বের প্রথম বছরেই (১৩৫১-৫২ খ্রীঃ) তাঁর কানে এই খবর পৌছোলো যে লখ্‌নৌতির শাসনকর্তা ঐ দেশ জোর করে

অধিকার করে অসংখ্য পাইক ও ধনুককে (ধনুকধারী সৈন্যদের) একত্র সমবেত করেছে এবং ত্রিহুত আক্রমণ করে, সেখানকার মুসলমান ও জিম্মিদের (হিন্দুদের) উপর অত্যাচার করে সেই দেশ লুঠ করছে ও শহরগুলি ছারখার করছে। সেই সঙ্গে ত্রিহুত ও ফিরোজ শাহের রাজ্যের সীমান্তে সে উৎপীড়ন চালাচ্ছে। এই কথা শুনে ফিরোজ শাহ ৭৫৪ হিজরার ১০ই শওয়াল (৮ই নভেম্বর, ১৩৫৩ খ্রীঃ) তারিখে লখ্‌নৌতি ও পাণ্ডুয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন এবং অবিরাম যাত্রা করে অযোধ্যা প্রদেশে পৌছোলেন। বহু রাজার সাহায্যপুষ্ট বিশাল বাহিনী নিয়ে ফিরোজ শাহ সরযূ নদী পার হলেন। ভাঙখোর ইলিয়াস শাহ ফিরোজ শাহের আগমনের কথা শুনে সীমান্ত ছেড়ে ত্রিহুতে পালিয়ে গেলেন। তারপর ফিরোজ শাহের বাহিনী খরোসা ও গোরক্ষপুরে পৌছোলে ইলিয়াস ত্রিহুত থেকে পাণ্ডুয়ায় পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। গোরক্ষপুর ও খরোসার রাজারা ফিরোজ শাহের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে তাঁকে কর ও উপঢৌকন দিলেন এবং তাঁর বাহিনীতে নিজেদের বাহিনী নিয়ে যোগ দিলেন। ফিরোজ শাহও তাঁদের সর্বতোভাবে অভয় দান করলেন। এদিকে ফিরোজ শাহের বাহিনী আসছে শুনে ইলিয়াস পাণ্ডুয়া থেকে চলে গিয়ে একডালা নামক একটি নিকটবর্তী জায়গার দুর্গে আশ্রয় নিলেন এবং আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। ফিরোজ শাহের বাহিনী গোরক্ষপুর থেকে জাকাৎ এবং জাকাৎ থেকে ত্রিহুতে গিয়ে পৌছোলো। ত্রিহুতের রাজা ও জমিদাররা ফিরোজ শাহের সভায় এসে বশ্যতা স্বীকার করে উপঢৌকন দিলেন। ফিরোজ শাহ ত্রিহুতে সুশাসনের বন্দোবস্ত করলেন এবং তাঁর বাহিনী ত্রিহুতে কোনরকম অত্যাচার করল না। ইলিয়াস পাণ্ডুয়ার সমস্ত লোকজন নিয়ে একডালায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, ঐ স্থানের এক দিকে জল, অপর দিকে জঙ্গল। ইলিয়াস তাঁর পরামর্শদাতা ও সমর্থকদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তাঁরা সকলেই একবাক্যে বললেন যে বর্ষাকাল খুব সন্নিকট, আশপাশের জমিগুলি খুব নীচু, বর্ষায় তারা জলে ভরে যাবে এবং বড় বড় মশা জন্মাবে, ফলে ফিরোজ শাহের বাহিনীর পক্ষে সেখানে থাকা সম্ভব হবে না, তাদের ঘোড়াগুলি মশার কামড় সহ্য করতে পারবে না। এই সমস্ত কারণের জন্য বর্ষা নামলে ফিরোজ শাহের বাহিনী পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হবে। এদিকে ফিরোজ শাহের বাহিনী পাণ্ডুয়ায় পৌছোলে ফিরোজ শাহ এই মর্মে এক ফরমান জারী করলেন যে তাঁর দলের

কেউ যেন পাণ্ডুয়ার লোকদের কোন ক্ষতি না করে এবং ইলিয়াস শাহের প্রসাদ ও উদ্যান নষ্ট বা ভস্মীভূত না করে। তাঁর যে সমস্ত অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য পাণ্ডুয়ায় পৌছেছিল, তারা পাণ্ডুয়ার সাধারণ লোকদের কিছু বলল না, কিন্তু ইলিয়াস শাহের প্রাসাদে যে সমস্ত বিদ্রোহী ছিল, তাদের অনেককে বধ করল। তাঁর প্রাসাদের ঘোড়াগুলিও তারা দখল করল। তারপর ফিরোজ শাহের বাহিনী একডালার দিকে রওনা হল। একডালার সামনে যে জলের বেষ্টনী ছিল, তারই ধারে ফিরোজ শাহের বাহিনী একটি "কংখর"-এ* তাঁবু গাড়ল। ফিরোজ শাহ এক ফরমান জারী করে আদেশ দিলেন যে তাঁর বাহিনীর লোকেরা যেন নদী পার হবার ব্যবস্থা করতে ও বাঁধ, সেতু প্রভৃতি তৈরী করতে সুরু করে এবং নদী পার হবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হলে সবাই যেন একসঙ্গে নদী পার হয়ে একডালা দুর্গ দখল ও ধূলিসাৎ করে। ফিরোজ শাহের লোকেরা যতশীঘ্র সম্ভব নদী পার হয়ে একডালা দুর্গ ধ্বংস করবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠল। কিন্তু সুলতানের মনে হল দুর্গ ধ্বংস করলে দোষী লোকদের সঙ্গে নির্দোষ লোকদেরও প্রাণ যাবে, সুন্নী মুসলমানদের জেনানা অমুসলমান পাইক ও ধনুক সৈন্য এবং অন্যান্য উচ্ছৃঙ্খল লোকদের হাতে পড়বে; বহু উচ্চ, সম্ভ্রান্ত ও জ্ঞানী লোক এবং সুফীরা, ছাত্রেরা, দরবেশরা, সন্ন্যাসীরা, বিদেশীরা ও পথিকেরা প্রাণ হারাবে। অথচ দুষ্ট ইলিয়াস শাহের জল ও জঙ্গলে ঘেরা দুর্গ ধ্বংস করতে গেলে হাতী ব্যবহার করতে হবে এবং তা করলেই এ সমস্ত ঘটবে। সেই কারণে সুলতান প্রার্থনা করতে লাগলেন যে ইলিয়াস যেন সসৈন্যে দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর বাহিনীকে আক্রমণ করে, তাহলেই তিনি তাকে শাস্তি দিতে পারবেন। তাঁর প্রার্থনা একদিন পূর্ণ হল। একদিন সকালে ফিরোজ শাহ এই মর্মে এক ফরমান জারী করলেন যে অত্যধিক লোকের অবস্থানের জন্য বর্তমান ঘাঁটি তাঁর সৈন্যদের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠেছে, সুতরাং ঘাঁটি পরিবর্তন করতে হবে। তাই শুনে তাঁর বাহিনীর লোকেরা আনন্দিত হয়ে সোরগোল করে ঐ কংখর ছেড়ে নতুন ঘাঁটির জন্য নির্দিষ্ট স্থানের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

এদিকে ইলিয়াস শাহ এবং তাঁর দলের লোকেরা ভাবলেন যে ফিরোজ শাহের সৈন্যদল পশ্চাদপসরণ করছে। ইলিয়াস এ সম্বন্ধে কোন খোঁজখবর

* "কংখর"-এর অর্থ ছাউনি ফেলবার উপযোগী বিশেষভাবে প্রস্তুত স্থান (The place dressed with concrete for camping"—Bhattashali)।

না নিয়ে ভাঙের নেশা এবং অত্যধিক আত্মবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে একডালা থেকে তাঁর হাতীসওয়ার, ঘোড়সওয়ার ও পদাতিক সৈন্য নিয়ে বেরিয়ে এলেন এবং ফিরোজ শাহের পরিত্যক্ত ঘাঁটির সামনে তাঁর হাতীগুলোকে সাজালেন। তার ফলে তাঁর বাহিনী ফিরোজ শাহের বাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়াল।

যুদ্ধ সুরু হয়ে গেল। ইলিয়াসের সৈন্যেরা প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করল। ফিরোজ শাহ তাঁর বাহিনীর কয়েকটি দলের প্রতি ফরমান জারী করে শত্রু-বাহিনীকে আক্রমণ করতে বললেন। তাঁর সৈন্যেরা আল্লা-হো-আকবর ধ্বনি করে কোষ থেকে অসি নিষ্কাশিত করল এবং প্রথম আক্রমণেই ইলিয়াস শাহের বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দিল। শত্রু-বাহিনী দিশাহারা হয়ে পড়ল। রক্তের স্রোত বয়ে গেল। ফিরোজ শাহের সৈন্যেরা ইলিয়াস শাহের রাজছত্র, রাজদণ্ড, তূর্য ও পতাকা এবং ১৪টি হাতী দখল করল। ইলিয়াস চক্ষের নিমেষে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অন্তর্হিত হলেন। ফিরোজ শাহের সৈন্যেরা তাদের তরবারি দিয়ে তাঁর অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যদের মাথা কেটে ফেলতে লাগল। ফলে অনতিবিলম্বে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতদেহের স্তূপ জমে উঠল। বাংলার বিখ্যাত পাইক সৈন্যেরা বহুবছর ধরে নিজেদের বাংলাদেশের পিতা বলে অভিহিত করত, লোকে তাদেব বীর বলত, ভাঙখোর ইলিয়াসের কাছে তারা তাদের সাহসের জন্য বখশিস পেয়ে আসছিল এবং বাংলার জলের দ্বারা স্ফীতকায় (হিন্দু) "রাজা"-দের সঙ্গে তারা সেই জংলী উন্মাদটার (ইলিয়াসের) পাশে দাঁড়িয়ে বেপরোয়াভাবে হাত-পা ছুঁড়ছিল। যুদ্ধ সুরু হলে তারাই বিজয়ী সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হয়ে মুখে দুটি আঙুল পুরে দিল, ঠিকমত দাঁড়াতে ভুলে গেল, হাত থেকে তরবারি ও তীরধনুক ফেলে দিল, মাটিতে কপাল ঘসতে লাগল এবং প্রতিপক্ষের তরবারিতে কাটা পড়তে লাগল।

বিকালের মধ্যে শত্রুর মৃতদেহের স্তূপে সমস্ত জায়গাটা ভরে গেল। ফিরোজ শাহের সৈন্যেরা বিজয়ী হল এবং প্রচুর লুঠের সম্পত্তি তাদের হস্তগত হল। তাদের কারও মাথার একটি চুলও এই যুদ্ধে নষ্ট হল না।

সান্ধ্য উপাসনার পরে বিজয়ী ফিরোজ শাহ তাঁর সভায় বসে এই ফরমান জারী করলেন যে ইলিয়াস শাহের পক্ষের যেসব লোক বন্দী হয়েছে এবং তাঁর রাজছত্র প্রভৃতি যেসব জিনিস তাঁর বাহিনী হস্তগত করেছে—তাদের যেন তাঁর কাছে নিয়ে আসা হয়। ৪৪টি অতিকায় পর্বতের মত হাতী—যেগুলি

ইলিয়াস শাহের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি জয় করেছিলেন—সেগুলি তাঁর সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। ফিরোজ শাহের মাহুত ও হস্তীরক্ষকরা বলল এত বড় হাতী এর আগে কখনও দিল্লীতে যায়নি।

এই হাতীগুলিকে দেখে ফিরোজ শাহ আমীর ও রাজাদের বললেন, "এইসব হাতীর জোরেই ইলিয়াস দিল্লীর বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করার কথা কল্পনা করেছিল। এমন হাতীগুলি হারাবার ফলে তার গর্ব আর মাথা তুলবে না এবং সে আমার কাছে বশ্যতা স্বীকার করবে ও দিল্লীতে প্রতি বছর উপঢৌকন সমেত তার ভৃত্যদের পাঠাবে। ন্যায়সঙ্গত রাজা ভিন্ন আর কারও হাতীশালে বড় হাতী থাকা উচিত নয়। অবিবেচক লোকদের বড় হাতী থাকলে তাদের মাথায় অহঙ্কার জন্মায়। নির্ভীক প্রকৃতির দুর্বৃত্তের হাতে বড় হাতী পড়লে মহা বিপদের সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে পরিণামে তারই পতন ও ধ্বংস হয়।"

এইসব ঘটনার পরে ফিরোজ শাহ এক ফরমান জারী করে সমস্ত লুঠের মাল তাঁর সেনাপতির কাছে জমা দিতে বললেন। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙার পর সুলতান ভগবানের কাছে তাঁর বিজয়ের জন্য ধন্যবাদ জানালেন। তার পরদিন তাঁর বাহিনীর সমস্ত লোকেরা—উচ্চ, নীচ, অশ্বারোহী, পদাতিক, মুসলমান, হিন্দু, বাজারের লোক এবং ভৃত্য, সকলে রাজসভার সামনে সমবেত হয়ে বলল তারা একডালা দুর্গ লুঠ করবে এবং হাতী দিয়ে তা ধূলিসাৎ করে ইলিয়াস শাহের অনুগত লোকদের তাড়িয়ে দেবে। কিন্তু সুলতান তা করার অনুমতি দিলেন না। তিনি বললেন, "যারা বিদ্রোহ করেছিল তারা নিহত হয়েছে। যে সমস্ত হাতী ইলিয়াসের দম্ভ ও বিশ্বাসঘাতকতার কারণ ছিল, সেগুলি অধিকৃত হয়েছে। ভগবান আমাদের সাহায্য করে বিজয়ী করেছেন। এখন বর্ষাকাল আসন্ন হয়ে উঠেছে। আমাদের লক্ষ্য হবে মুসলমানদের মধ্যে এবং বর্তমান ইসলামের বাহিনীর লোকদের মধ্যে যারা এখন নিরাপদে আছে, তারা যাতে নিরাপদে গৃহে ফিরতে পারে, তার জন্য চেষ্টা করা। এইরকম বিজয় লাভের পরে আর অতিরিক্ত কিছু চাওয়া উচিত নয়।"

সুলতানের নির্দেশে তাঁর বাহিনীর লোকেরা দিল্লীর দিকে ফিরতে সুরু করল। ৭৫৫ হিজরার ১২ই শাবান (১লা সেপ্টেম্বর, ১৩৫৪ খ্রীঃ) তারিখে তারা দিল্লী পৌঁছোলো। ইলিয়াস শাহের যে সমস্ত সম্পত্তি ফিরোজ শাহের সৈন্যেরা লুঠ করেছিল এবং তাঁর দলের যে সমস্ত লোককে তারা বন্দী করেছিল, তাদের দিল্লীর পথে পথে দেখিয়ে বেড়ানো হল। দিল্লীর লোকেরা ফিরোজ

শাহের বিজয় উপলক্ষে মহা আনন্দে উৎসব, পানভোজন ও নৃত্যগীত করতে লাগল। সুলতান দরিদ্রদের এই বিজয় উপলক্ষে বহু অর্থ দান করলেন। তিনি দিল্লীর আলিমদের অনেক উপহার দিলেন, শেখদের আশ্রমে দান করলেন এবং সন্ন্যাসীদের আস্তানায় শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলেন। দরবেশদের সমাধিতে গিয়েও তিনি দানধ্যান করলেন। এই বিজয়ের ফলে লখ্‌নৌতির শাসনকর্তা ইলিয়াস নম্র হয়ে বশ্যতা স্বীকার করলেন। তিনি ফিরোজ শাহের দরবারে দু'বার উপঢৌকন পাঠালেন এবং একজন আমীর যেভাবে বশ্যতা স্বীকার করে আবেদন জানায়, তেমন ভাবেই আবেদন জানিয়ে চিঠি লিখলেন।

শাম্‌স্‌-ই-সিরাজ আফিফ এবং 'সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী'র বিবরণ বারনির বিবরণের সঙ্গে মূলত অভিন্ন। তবে কোন কোন বিষয়ে তাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। নীচে আমরা এই বিষয়গুলির উল্লেখ করলাম।

শাম্‌স্‌-ই-সিরাজ আফিফ লিখেছেন যে ফিরোজ শাহ কুশী নদীর তীরে পৌঁছে দেখেছিলেন অপর তীরে গঙ্গা ও কুশীর সঙ্গমস্থলের খুব কাছে ইলিয়াস শাহের সৈন্যেরা রয়েছে। তার ফলে ফিরোজ শাহের বাহিনী কুশীর উজানে ১০০ ক্রোশ উঠে গিয়ে চম্পারণের নীচে অনেক কষ্ট করে খরস্রোতা কুশী নদী পার হয়। ফিরোজ শাহ চম্পারণ ও রচাপ হয়ে বাংলাদেশে পৌঁছোন। অতঃপর ইলিয়াস শাহ একডালা দুর্গে আশ্রয় নেন। ফিরোজ শাহ ঐ দুর্গ অবরোধ করেন এবং তার চারদিকে পরিখা খনন করান। প্রত্যেক দিন ইলিয়াস শাহের সৈন্যেরা একডালা থেকে বেরিয়ে এসে পাঁয়তাড়া ভাঁজত, কিন্তু প্রতিপক্ষের শরবর্ষণে জর্জরিত হয়ে একডালা দ্বীপে ফিরে গিয়ে সেখানে আশ্রয় নিত। ফিরোজ শাহের সৈন্যবাহিনী বাংলাদেশ ছেয়ে ফেলেছিল। বাংলার অনেক রাও, রাণা এবং জমিদার ফিরোজ শাহের দলে যোগ দিলেন। বাংলার জনসাধারণের মধ্যেও অনেকে তাঁর দলে যোগ দিল।

এইভাবে কিছুদিন কাটবার পর সূর্য কর্কটরাশিতে প্রবেশ করার উপক্রম করল এবং আর্দ্র আবহাওয়া দেখা দিল। তখন ফিরোজ শাহ তাঁর অমাত্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে দিল্লীর দিকে কয়েক ক্রোশ এগিয়ে গেলেন এবং একডালা দুর্গে কয়েকজন কালান্দার বা ফকীরকে পাঠালেন। এইসব কালান্দার একডালা দুর্গে গিয়ে বন্দী হল এবং তাদের ইলিয়াস শাহের কাছে নিয়ে যাওয়া হলে তারা ইলিয়াস শাহকে জানাল যে ফিরোজ শাহ সমস্ত সৈন্যসামন্ত ও

মালপত্র নিয়ে দিল্লীর দিকে রওনা হয়েছেন।* এই খবর শুনে ইলিয়াস ১০,০০০ ঘোড়া, ৫০টি হাতী এবং ২,০০,০০০ পদাতিক সমেত এক বিরাট বাহিনী নিয়ে ফিরোজ শাহকে আক্রমণ করলেন। তখন ফিরোজ শাহ একডালা থেকে সাত ক্রোশ দূরে নদীতীরে তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি ইলিয়াস শাহের আসার খবর পেয়ে তাঁর অশ্বারোহী বাহিনীকে তিনভাগ করে সাজালেন। ডান দিকের বাহিনীতে ৩০,০০০ সৈন্য রইল মীর-শিকার মালিক দিলান-এর অধীনে, বাঁ দিকের বাহিনীতে মালিক হিসাম নওয়ার অধীনে ৩০,০০০ যোদ্ধা রইল এবং মাঝের বাহিনীতে তাতার খানের অধীনে ৩০,০০০ সৈন্য থাকল। হাতীগুলিকেও তিন ভাগ করে সাজানো হল। ফিরোজ শাহ সমস্ত বাহিনীতে ঘুরে তাঁর লোকদের উৎসাহিত করতে লাগলেন। ইলিয়াস ফিরোজ শাহের সৈন্যসজ্জা দেখে বুঝতে পারলেন যে কালান্দাররা তাঁকে ঠকিয়েছে। তিনি ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। যুদ্ধ সুরু হয়ে গেল। প্রথমে তীর ধনুকের যুদ্ধ, তারপর বর্ষা ও তরবারির যুদ্ধ হল এবং তারপর দু'দলের সৈন্যেরা পরস্পরের এত কাছাকাছি এল যে হাতাহাতি যুদ্ধ চলতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে প্রচণ্ড যুদ্ধের পরে ইলিয়াস শাহ পরাজিত হয়ে পালাতে লাগলেন। তাতার খান তাঁকে বিদ্রূপ করতে লাগলেন। ইলিয়াস শাহের সমস্ত বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, তাঁর ৪৮টি হাতী ফিরোজ শাহের লোকেরা দখল করল এবং ৩টি হাতী প্রাণ হারাল।* ইলিয়াস মাত্র ৭ জন অশ্বারোহী নিয়ে পালিয়ে একডালা দুর্গে প্রবেশ করে অনেক কষ্টে দুর্গের দ্বার বন্ধ করে দিলেন। ফিরোজ শাহের সৈন্যরা শহর (একডালা শহর) অধিকার করল। ফিরোজ শাহ সেখানে এসে পৌছোলে (ইলিয়াস শাহের অন্তঃপুরের) সম্ভ্রান্ত মহিলারা দুর্গের ছাদে চড়লেন এবং ফিরোজ শাহকে দেখে মাথার কাপড় খুলে গভীর শোক প্রকাশ করতে লাগলেন। ফিরোজ শাহ তা'ই দেখে দুঃখিত হয়ে ভাবলেন যে অনেক মুসলমানকে হত্যা করে তিনি এই শহর ও এই দেশ অধিকার করেছেন এবং দুর্গ দখল করতে হলে আরও বহু মুসলমানকে হত্যা

* জিয়াউদ্দীন বারনির উক্তির সঙ্গে আফিফের এই উক্তির প্রভেদ লক্ষণীয়। বারনির মতে ইলিয়াস আপনার থেকেই ভেবেছিলেন যে ফিরোজ শাহ পশ্চাদপসরণ করছেন।

* একথা সত্য হতে পারে না, কারণ শাম্‌স্‌-ই-সিরাজ আফিফ নিজেই লিখেছেন যে ইলিয়াস ৫০টি হাতী নিয়ে যুদ্ধে এসেছিলেন। ৫০টি হাতীর মধ্যে ৩টি হাতী যদি যুদ্ধে মারা পড়ে, তাহলে ৪৮টি হাতী বিজিত হতে পারে না।

করতে ও সম্ভ্রান্ত মহিলাদের অমর্যাদার মধ্যে নিক্ষেপ করতে হবে। তা করলে তিনি চরম বিচারের দিনে কী কৈফিয়ৎ দেবেন এবং মোগলদের সঙ্গে তাঁর কী পার্থক্য থাকবে? তাতার খান বারবার সুলতানকে অনুরোধ করতে লাগলেন বিজিত অঞ্চলগুলি স্থায়িভাবে অধিকারে রাখার জন্য। কিন্তু ফিরোজ শাহ বললেন যে এর আগে দিল্লীর বহু রাজা বাংলাদেশকে নিজেদের অধীনে এনেছেন, কিন্তু তাঁদের কেউই সেখানে বেশীদিন থাকা উচিত মনে করেন নি, কারণ বাংলাদেশ জলাভূমিতে পূর্ণ এবং এখানকার সম্ভ্রান্ত লোকরা দ্বীপে বাস করেন; অতএব পূর্ববর্তী রাজারা যা করেছেন, তার তুলনায় স্বতন্ত্র কিছু করা তাঁর পক্ষে উচিত হবে না। এই বলে ফিরোজ শাহ তাঁর বাহিনীকে ফিরে যেতে আদেশ দিলেন। যাবার আগে সুলতান নিহত বাঙালীদের মাথাগুলি এক জায়গায় জড়ো করতে আদেশ দিলেন এবং এক একটি মাথা সংগ্রহের জন্য একটি করে রূপোর টঙ্কা পুরস্কার ঘোষণা করলেন। ১,৮০,০০০-এরও বেশী মাথা পাওয়া গেল, কারণ পুরো একদিন ধরে সাতক্রোশ ব্যাপী জায়গা জুড়ে যুদ্ধ হয়েছিল। সুলতানের বাহিনী দিল্লীর দিকে রওনা হল। মাঝপথে পাণ্ডুয়ায় ফিরোজ শাহের নামে খুৎবা পড়া হল। ফিরোজ শাহ একডালা ও পাণ্ডুয়ার নাম পরিবর্তন করে যথাক্রমে আজাদপুর ও ফিরোজাবাদ রাখলেন। তারপর তিনি দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করলেন। লখ্‌নৌতি থেকে পাওয়া হাতীগুলিকে সামনে রেখে তাঁর বাহিনী দিল্লীতে প্রবেশ করল।

'সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী'তে মোটামুটিভাবে শাম্‌স্‌-ই-সিরাজ আফিফেরই অনুরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে, তবে এই বইয়ের মধ্যে খুঁটিনাটি বিষয়ের বর্ণনা অপেক্ষাকৃত কম। এই বইয়ের মতে ইলিয়াস শাহ একডালা দুর্গে ঢোকবার আগে একবার তাঁর বাহিনীর সঙ্গে ফিরোজ শাহের বাহিনীর যুদ্ধ হয়েছিল এবং তাতে ইলিয়াসের বাহিনী পরাস্ত হয়েছিল; তারপর তিনি বহু হাতী এবং আট লাখ পদাতিক সৈন্য সংগ্রহ করে নতুন এক বাহিনী গঠন করেন এবং দ্বিতীয়বার ফিরোজ শাহের বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেন; এবারও তিনি পরাজিত হন; তাঁর পক্ষের প্রায় ৬০,০০০ লোক এই যুদ্ধে প্রাণ হারায়* এবং অনেকে বন্দী হয়; বিজয়ী পক্ষ ইলিয়াস শাহের অনেকগুলি হাতী

* শাম্‌স্‌-ই-সিরাজ আফিফের মতে ইলিয়াস শাহের পক্ষের এক লক্ষ আশী হাজারেরও বেশী লোক নিহত হয়েছিল। আসলে নিহতের সংখ্যাকে 'সিরাৎ'—এই যথেষ্ট অতিরঞ্জিত করে বলা হয়েছে।; আফিফ অতিরঞ্জিত করেছেন আরও অনেক বেশী পরিমাণে।

দখল করে। 'সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী'র মতে যুদ্ধ জয়ের পর ফিরোজ শাহের বাহিনী একডালা দুর্গ জয়ের উদ্যোগ করছিল। কিন্তু এই সময় বিপন্ন মুসলমানরা চীৎকার করে তাদের দুঃখের কথা জানাতে থাকে। মুসলিম স্ত্রীলোকেরা ফিরোজ শাহের কাছে করুণভাবে নিরস্ত হবার জন্য আবেদন জানায়; তারা বলে যে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ তাদের আটক করে রাখায় তারা বিপন্ন হয়ে পড়েছে; একে তারা ঐ দুর্বৃত্তের অত্যাচারে পীড়িত, তার উপর ফিরোজ শাহ কর্তৃক দুর্গ অবরোধের ফলে তারা ভয়ে দিশাহারা হয়ে পড়েছে; কারণ ফিরোজ শাহের সৈন্যেরা দুর্গ জয় করলে তারা দুর্গ লুঠ করবে এবং মেয়েদের ক্রীতদাসী বানাবে; তারা (মেয়েরা) শামসুদ্দীনের সমর্থক নয়, বরং সম্রাট ফিরোজ শাহেরই আজ্ঞাবহ; সম্রাট যদি তাদের রক্ষা না করেন, তাহলে অপমানের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে তারা বিষ খেয়ে মরবে। এদের অনুনয় ও আবেদনের ফলে ফিরোজ শাহ দুর্গ জয়ের চেষ্টা থেকে নিরস্ত হন। বাংলার (বন্দী) সৈন্যেরা কান্নাকাটি করার পর ফিরোজ শাহ তাদের মুক্তি দেন এবং একডালার নাম আজাদপুর রাখেন।* জয় এবং প্রভূত ধনসম্পদ লাভ করে ফিরোজ শাহ দিল্লী ফিরে যান। ইলিয়াসও শিক্ষা পাওয়ার পরে অত্যাচার বন্ধ করেন এবং সম্রাটের কাছে অতীত আচরণের জন্য ক্ষমা চেয়ে প্রতি বছর দিল্লীতে উপঢৌকন প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দেন।

জিয়াউদ্দীন বারনি, শাম্স্-ই-সিরাজ আফিফ এবং 'সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী'র লেখক, এই তিনজন ঐতিহাসিকই দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে ফিরোজ শাহের সঙ্গে যুদ্ধে ইলিয়াস শাহ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিলেন। এঁরা এমনভাবে যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন, যার থেকে মনে হয় ফিরোজ শাহের প্রচণ্ড শক্তির কাছে ইলিয়াস শাহ মেষশাবকের মত অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। বারনি আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে লিখেছেন যে প্রথম আক্রমণেই ফিরোজ শাহের বাহিনী ইলিয়াস শাহের সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়, তারপর যথেচ্ছভাবে তাদের মাথা কাটতে থাকে এবং এই যুদ্ধে ফিরোজ শাহের পক্ষের কারও মাথার একটি চুলও নষ্ট হয় নি। কিন্তু আফিফ এতখানি নির্লজ্জ অত্যুক্তি করতে পারেন নি, তিনি লিখেছেন যে, প্রচণ্ড যুদ্ধের পর ইলিয়াস শাহ পরাজয় বরণ করেন। এঁদের

* এ কথা সম্ভবত সত্য। শাম্স্-ই-সিরাজ আফিফও এ কথা বলেছেন। আফিফের মতে ফিরোজ শাহ অধিকন্তু পাণ্ডুয়ার নামও বদলে 'ফিরোজাবাদ' রেখেছিলেন। এই কথা সত্য নয়।

কিঞ্চিৎ পরবর্তী ঐতিহাসিক য়াহিআ বিন্ সিরহিন্দি তাঁর 'তারিখ-ই-মোবারক শাহী'তে এই যুদ্ধের বিবরণ দেবার সময় একে "মহাযুদ্ধ" (great battle) বলেছেন।

একডালার যুদ্ধে ইলিয়াস শাহ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিলেন বলে বিশ্বাস করা যায় না। ফিরোজ শাহের অনুগত তিনজন ঐতিহাসিক এই যুদ্ধের যে বিবরণ দিয়েছেন, তা বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে ফিরোজ শাহই এই যুদ্ধে সুবিধা করতে না পেরে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হন। এ সম্বন্ধে টমাস ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যা বলেছেন, তা অখণ্ডনীয়। টমাস লিখেছেন, "the invasion only resulted in the confession of weakness, conveniently attributed to the periodical flooding of the country." রাখালদাস লিখেছেন, "সুলতান্ ফিরোজ শাহের সমসাময়িক ঐতিহাসিক শমস্-ই-সিরাজ্ আফিফ্ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, গৌড়ীয় অবরোধবাসিনীগণের রোদনধ্বনিতে বিচলিত হইয়া বাদ্শাহ্ দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। আফিফের এই উক্তি ফিরোজ শাহের গৌড়াভিযানের বিফলতা গোপন করিবার জন্য লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। বাদ্শাহ যখন গৌড়াভিযানে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন কি জানিতেন না যে, গৌড়-যুদ্ধে বহু মুসলমান নিহত হইবে এবং তাহাদিগের পুত্র কলত্রের আর্ত্তনাদ সতত তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিবে? সম্মুখযুদ্ধে পরাজিত হইলেও ইলিয়াস্ শাহের সেনা তখনও যুদ্ধ পরিত্যাগ করে নাই, গৌড়-দেশ অধিকৃত হইলেও রাজধানীর প্রধান দুর্গ তখনও অনধিকৃত ছিল, এই অবস্থায় যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করা যদি বিজয় হয়, তাহা হইলে মুসলমান ঐতিহাসিকগণের উক্তি সত্য। বর্ষাকালে গৌড়দেশে অবস্থান অসম্ভব দেখিয়া এবং সুরক্ষিত দুর্ভেদ্য একডালা দুর্গ অধিকার অসম্ভব জানিয়া, গৌড়াভিযানে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া দিল্লীর বাদ্শাহ্ ফিরোজ শাহ্ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। জিয়া-উদ্দীন বার্ণী বঙ্গদেশীয় রাজা ও পদাতিক সেনার কাপুরুষতার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ......শম্স্-ই-সিরাজ্ আফিফ্ সুলতান্ শমস্-উদ্দীন্ ফিরোজ্ (ইলিয়াস) শাহের কাপুরুষতার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,......কিন্তু এই কাপুরুষ সুলতান্, তাঁহার অধীন কাপুরুষ বাঙ্গালী রাজগণ এবং তাঁহাদিগের অধীন কাপুরুষ পদাতিক সেনার জন্য ভারতেশ্বর ফিরোজ্ শাহকে একডালার অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল।

জিয়া-উদ্দীন বার্ণী স্পষ্ট স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, গৌড়াভিযানে ফিরোজ শাহের দুর্ব্বলতাই প্রকাশ পাইয়াছিল এবং সৌভাগ্যক্রমে বর্ষাকাল আসিয়া পড়ায়, পরাজয়ের পরিবর্ত্তে উহাই প্রত্যাবর্ত্তনের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।”

জিয়াউদ্দীন বারনি লিখেছেন যে সুলতান ফিরোজ শাহ ইলিয়াস শাহের ৪৪টি হাতী দখল করে বলেছিলেন যে এর ফলেই ইলিয়াস শাহ বশীভূত হবে; কারণ এইসব বড় বড় হাতীর জোরেই ইলিয়াস শাহের গর্ব এত বেড়েছিল। অদ্ভুত কথা! যেন ইলিয়াস শাহের এই ৪৪টি ভিন্ন আর কোন হাতী ছিল না এবং নতুন হাতী সংগ্রহ করা এতই দুরূহ ব্যাপার! ফিরোজ শাহ নিজের দুর্বলতা গোপন করবার জন্যই এই কথা বলেছিলেন সন্দেহ নেই।

তারপর, বার্নি, আফিফ ও ‘সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী’-রচয়িতা তিন-জনেই লিখেছেন যে পাছে নিরীহ লোকেরা নিহত বা উৎপীড়িত হয় এবং সম্ভ্রান্ত মহিলাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়, সেই কারণে ফিরোজ শাহ একডালা দুর্গ জয় করেননি। কিন্তু তা'ই যদি হয়, তাহলে ফিরোজ শাহ ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকন্দর শাহের রাজত্বকালে আবার বাংলাদেশ আক্রমণ ও একডালা দুর্গ অবরোধ করেছিলেন কেন? তখনও তো নিরীহ ব্যক্তিদের প্রাণনাশ ও সম্ভ্রান্ত মহিলাদের মর্যাদা হানির একইরকম সম্ভাবনা ছিল। এইসব বাজে কথা লিখে ফিরোজ শাহের চাটুকার ঐতিহাসিকেরা ফিরোজ শাহের ব্যর্থতাই উদ্‌ঘাটিত করেছেন।

আসল কথা, ফিরোজ শাহের সঙ্গে সংঘর্ষে ইলিয়াস শাহ পরাজিত হন নি, পলায়নও করেন নি; তিনি উচ্চাঙ্গের রণকৌশল অনুসারেই কাজ করেছিলেন। ফিরোজ শাহকে সৈন্যবাহিনী সমেত নিজের রাজ্যে অনেক দূর প্রবেশ করতে দিয়ে তিনি একডালা দুর্গে আশ্রয় নিয়ে কালক্ষেপণ করছিলেন। তিনি জানতেন যে বর্ষার আগে ফিরোজ শাহ একডালা দুর্গ জয় করতে পারবেন না। তারপর বর্ষা উপস্থিত হলে ফিরোজ শাহের বাহিনী অসহায় হয়ে পড়বে, তখন তিনি অতি সহজেই তাদের পরাজিত করতে পারবেন। সম্ভবত ফিরোজ শাহের সৈন্যসংখ্যা ইলিয়াস শাহের তুলনায় বেশী ছিল, তাই ইলিয়াস এই কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। তারপর ফিরোজ শাহের সৈন্যেরা চলে যাচ্ছে ভেবে তিনি তাদের আক্রমণ করেছিলেন, যার বর্ণনা আফিফ দিয়েছেন। পূর্বোক্ত ঐতিহাসিকেরা এই যুদ্ধে ইলিয়াস পরাজিত হয়েছিলেন বলে দেখাবার

চেষ্টা করলেও পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ থেকে বোঝা যায় যে কোন পক্ষই এই যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে জয়ী হতে পারে নি। ফিরোজ শাহ কয়েকজন বন্দী, কিছু লুঠের মাল ও কয়েকটি হাতী ভিন্ন আর কিছুই এই যুদ্ধ থেকে লাভ করতে পারেন নি। তাঁর পক্ষেও নিশ্চয় কিছু ক্ষতি হয়েছিল, যার কথা পূর্বোক্ত লেখকরা চেপে গিয়েছেন। ইলিয়াস এই যুদ্ধের পরে আবার একডালা দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কাজেই তাঁর অবস্থা আগে যা ছিল, এখনও তা'ই থেকে গেল। কিন্তু ফিরোজ শাহ এই যুদ্ধেই ইলিয়াস শাহের বলবীর্যের পরিচয় পেয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে ইলিয়াসকে পর্যুদস্ত করা বা একডালা দুর্গ জয় করা দুইই তাঁর পক্ষে অসম্ভব, উপরন্তু বর্ষাকাল এলে তাঁর বাহিনীর শোচনীয় বিপর্যয় ঘটবে। তাই তিনি হাতী জয়ের দ্বারাই যুদ্ধ জয় হয়েছে এই জাতীয় কথা বলে কোন রকমে নিজের মান বাঁচিয়ে বাংলাদেশ থেকে সসৈন্যে প্রস্থান করলেন। পরে প্রচারের মধ্য দিয়ে তিনি নিজের গ্লানি গোপন করেছিলেন। (প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ফিরোজ শাহ প্রায় সমস্ত অভিযানেই এই ভাবে অসাফল্য বরণ করেছিলেন।)

এই হচ্ছে ফিরোজ শাহ ও ইলিয়াস শাহের সংঘর্ষের পরিণামের প্রকৃত চিত্র। এই যুদ্ধের ফলে বাংলাদেশে ও তার পূর্বদিকে ইলিয়াস শাহের অধিকার কিছু মাত্র খর্ব হয় নি, কিন্তু বাংলার পশ্চিমে যে সব রাজ্য ইলিয়াস জয় করেছিলেন, সেগুলি ফিরোজ শাহের অধিকারভুক্ত হয়েছিল। যাহোক্, এই সংঘর্ষের কিছুদিন পরে ফিরোজ শাহকে ইলিয়াস শাহ উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন, এর থেকে বোঝা যায় ইতিমধ্যে ফিরোজ শাহের সঙ্গে তাঁর সন্ধি স্থাপিত হয়েছিল। অবশ্য বারনি, আফিফ এবং 'সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী'র লেখকের মতে ইলিয়াসের এই উপঢৌকন প্রেরণ বশ্যতা স্বীকারের চিহ্ন, কিন্তু ফিরোজ শাহের প্রভাব থেকে মুক্ত য়াহিআ বিন্ সিরহিন্দি তাঁর 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'তে স্পষ্টই লিখেছেন যে ইলিয়াস শাহ সমকক্ষ রাজা হিসাবে ফিরোজ শাহকে উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন; এই বইয়ের মতে একবার ইলিয়াস শাহের উপঢৌকন পেয়ে ফিরোজ শাহ ইলিয়াসের দূতকে বলেছিলেন, "তুমি যা এনেছ, আমার দীন ভৃত্যেরা তার চেয়ে ভাল জিনিষ তৈরী করে। এখন থেকে তোমাদের বাছা বাছা হাতী আনা উচিত। একজন রাজার আর একজন সমকক্ষ রাজাকে (Brother king) এই ধরণের উপহারই দেওয়া উচিত।" পরবর্তীকালে রচিত 'তবকাৎ-ই-আকবরী' গ্রন্থের মতে ৭৫৫ হিঃর ২৭শে রবী

অল-আখির তারিখে ইলিয়াস শাহের সঙ্গে ফিরোজ শাহের সন্ধি হয় এবং এরপর ফিরোজ শাহ বাংলাদেশ থেকে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা সুরু করেন। এই কথা সঠিক হওয়া অসম্ভব নয়। সম্ভবত ফিরোজ শাহের গৌরবহানি হতে পারে, এই আশঙ্কায় সমসাময়িক ঐতিহাসিকেরা এই সন্ধি সম্বন্ধে কিছু লেখেন নি। তবে এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না।

শামস্-ই-সিরাজ আফিফ 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী'তে লিখেছেন যে বাংলাদেশ থেকে ফিরোজ শাহের প্রত্যাবর্তনের পরে একটা ঘটনা ঘটে। সেটি এই, "When Shamsu-d din entered Ikdala, he seized the Governor, who had shut the gates, and had him executed." (শামস্-ই-সিরাজ আফিফের লেখার ইলিয়ট কৃত ইংরেজী অনুবাদ)। এই বাক্যটির অর্থ অনেকে ধরতে পারেন নি। আমাদের মনে হয়, এখানে "Ikdala" বলতে একডালা দুর্গকে নয়, একডালা শহরকে বোঝাচ্ছে। ফিরোজ শাহ একডালা দুর্গ অধিকার করতে না পারলেও একডালা শহর যে অধিকার করেছিলেন, তা আফিফ লিখেছেন। এই শহরেরই নাম ফিরোজ শাহ পরিবর্তিত করে আজাদপুর রাখেন, এ কথা আফিফ ও 'সিরাৎ' থেকে জানা যায়। আমাদের মনে হয়, উপরে উদ্ধৃত বাক্যে আফিফ এই বলতে চেয়েছেন যে ফিরোজ শাহ চলে যাবার পরে ইলিয়াস একডালা দুর্গ থেকে বেরিয়ে এক-ডালা শহরে প্রবেশ করে সেখানে ফিরোজ শাহ যে শাসনকর্তা নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন এবং যিনি একডালা দুর্গের দ্বার অবরোধ করেছিলেন, তাঁকে বন্দী ও বধ করেন। সম্ভবত এর পরে ইলিয়াস বাংলাদেশে ফিরোজ শাহের অধিকৃত সমস্ত অঞ্চলগুলি জয় করে নেন।

য়াহিআ বিন্ সিরহিন্দি 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'তে একডালার যুদ্ধ সম্বন্ধে কয়েকটি নতুন সংবাদ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন যে ৭৫০ হিজরার ২৮শে (পাঠান্তর ২৭শে) রবী অল-আউয়ল (২১শে এপ্রিল, ১৩৫৪ খ্রীঃ) তারিখে এই যুদ্ধ হয় এবং এই যুদ্ধে ইলিয়াস শাহের বাঙালী পাইক-বাহিনীর অধিনায়ক ("পাইক-ই-মুকদ্দম") ছিলেন সহদেও (সহদেব), তিনি যুদ্ধে নিহত হন। বলা বাহুল্য য়াহিআ বিন্ সিরহিন্দির এই উক্তি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য, কারণ তিনি যে সময় 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী' লেখেন, তখনও নিশ্চয়ই একডালার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বা এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীদের মধ্যে অনেকে জীবিত ছিলেন।

এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। ইলিয়াস শাহের সেনাপতি ছিলেন হিন্দু সহদেব। এছাড়া জিয়াউদ্দীন বারনি স্পষ্টই লিখেছেন যে হিন্দু রাজারা তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। তারপর, ইলিয়াস শাহের শক্তির প্রধান উৎস ছিল পাইকেরা। সে যুগের পাইকেরা সাধারণত হিন্দু হত, ফিরোজ শাহের পক্ষীয় পাইকদেরও অনেকে যে হিন্দু ছিল, সে কথা বারনি বলে গেছেন। সুতরাং যে ইলিয়াস শাহ নেপালে গিয়ে হিন্দুর দেবমন্দির ও প্রতিমা ধ্বংস করেছিলেন, তিনি এখন হিন্দুদেরই সাহায্যে তাঁর স্বাধীনতা রক্ষা করলেন। বাংলার স্বাধীন সুলতানদের হিন্দুর সহায়তা গ্রহণের প্রথম ঐতিহাসিক নিদর্শন এইখানেই পাওয়া গেল। পরবর্তী কালে বাংলার সুলতানদের হিন্দুরা যে আরও বেশী সাহায্য করেছিল, তা আমরা পরে দেখতে পাব। হিন্দুরা মুসলমান সুলতানদের জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হয় নি। একডালার যুদ্ধে যেমন সহদেব প্রাণবিসর্জন দিয়েছিলেন, ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে নসরৎ শাহের সঙ্গে বাবরের যুদ্ধে তেমনি বসন্ত রাও নামে আর একজন হিন্দু বীর নসরৎ শাহের হয়ে যুদ্ধ করে প্রাণ দেন।

'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' ফিরোজ শাহ ও ইলিয়াস শাহের সংঘর্ষ সম্বন্ধে কয়েকটি নতুন কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই বইয়ে লেখা আছে যে, ইলিয়াস শাহ তাঁর পুত্রকে পাণ্ডুয়ার দুর্গে এক সৈন্যবাহিনী সমেত রেখে একডালায় গিয়েছিলেন; ফিরোজ শাহ পাণ্ডুয়ায় এসে ইলিয়াসের পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁকে বন্দী করে একডালা অভিমুখে যাত্রা করেন; ফিরোজ শাহ বাইশ দিন ধরে একডালা দুর্গ অবরোধ করার পরে ইলিয়াস দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেন; দুই পক্ষে বহু লোক নিহত হবার পরে ইলিয়াস পরাজিত হন এবং আবার একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে 'রিয়াজ'-রচয়িতা লিখেছেন, "কথিত আছে দরবেশ শেখ রাজা বিয়াবানি এই সময় মারা যান। এঁর উপরে সুলতান শামসুদ্দীনের গভীর বিশ্বাস ছিল। সুলতান শামসুদ্দীন ফকীরের ছদ্মবেশে দুর্গ থেকে বেরিয়ে শেখের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হলে তিনি একা ঘোড়ায় চড়ে ফিরোজ শাহের সঙ্গে দেখা করে দুর্গে ফিরে যান; কিন্তু ফিরোজ শাহ তাঁকে চিনতে পারেন নি। সুলতান (ফিরোজ শাহ) যখন এই ব্যাপার জানতে পারলেন, তখন তিনি (ইলিয়াসকে ধরতে না পারার জন্য) দুঃখ প্রকাশ করে-ছিলেন।" 'রিয়াজ'-এর মতে বর্ষা এসে গেলে ফিরোজ শাহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে

সন্ধির প্রস্তাব করেছিলেন এবং ইলিয়াস শাহও একটানা অবরোধের ফলে ক্লান্ত হয়ে আংশিক বশ্যতা স্বীকার করে সন্ধি করেছিলেন। তখন ফিরোজ শাহ ইলিয়াসের পুত্র ও অন্যান্য বন্দীদের মুক্তি দিয়ে দিল্লী ফিরে যান। এই সব উক্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বখ্‌শী নিজামুদ্দীনের 'তবকাৎ-ই-আকবরী'তে ফিরোজ শাহ ও ইলিয়াস শাহের সংঘর্ষের বিভিন্ন ঘটনার সময় নির্দেশ করা হয়েছে। এই বইয়ের মতে (১) ৭৫৪ হিঃর ১০ই শওয়াল তারিখে ফিরোজ শাহ দিল্লী থেকে রওনা হন, (২) ৭৫৫ হিঃর ৭ই রবী অল-আউয়ল তারিখে ফিরোজ শাহ এক-ডালায় পৌছোন, (৩) ৭৫৫ হিঃর ২৯শে রবী অল-আউয়ল তারিখে তিনি একডালা থেকে দিল্লী ফিরে যাবার ভান করেন, (৪) ৭৫৫ হিঃর ৫ই রবী অল-আখির তারিখে ইলিয়াস শাহ ফিরোজ শাহকে আক্রমণ করেন, (৫) ৭৫৫ হিঃর ৭ই রবী অল-আখির তারিখে ফিরোজ শাহ গৌড়ের বন্দীদের মুক্তি দান করেন, (৬) ৭৫৫ হিঃর ২৭শে রবী অল-আখির তারিখে ইলিয়াস শাহ ও ফিরোজ শাহের সন্ধি হয় এবং ফিরোজ দিল্লী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন সুরু করেন, (৭) ৭৫৫ হিঃর ১২ই শাবান তারিখে ফিরোজ শাহ দিল্লী পৌছোন। এর মধ্যে (১) ও (৭) নং ঘটনার তারিখ সঠিক, কারণ বারনির 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী'তে এই দুই তারিখ উল্লিখিত হয়েছে। (৩) ও (৪) নং ঘটনার তারিখ ভুল, কারণ 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'তে লেখা আছে যে ৭৫৫ হিঃর ২৭শে বা ২৮শে রবী অল-আউয়ল তারিখে (৪) নং ঘটনা ঘটেছিল। অন্যান্য তারিখগুলি নিজামুদ্দীন কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন, তা জানা যায় না, কাজেই তাদের যাথার্থ্য সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না। (৬) নং "ঘটনা" আদৌ ঘটেছিল কিনা বলা যায় না, কারণ সমসাময়িক বইগুলিতে এই বিষয়ের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না; তবে ফিরোজ শাহের সঙ্গে ইলিয়াস শাহের সন্ধি যে সম্পূর্ণ সম্ভাব্য ব্যাপার, তা আগেই আলোচনা করে দেখিয়েছি। বুকাননের বিবরণীতে ইলিয়াস শাহ ও ফিরোজ শাহের সংঘর্ষের কারণ সম্বন্ধে লেখা হয়েছে যে ইলিয়াস "made war on Ibrahim, governor of Behar, on the part of Firuz···The royal party, however, repulsed the usurper. The emperor then invaded Bengal." এই কথার সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। বিহারে প্রাপ্ত মালিক বায়ুর কবরের শিলালিপি এবং রাজগীরের বিপুল পাহাড়ের একটি মন্দিরের

(সংস্কৃতে লেখা) শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, মালিক ইব্রাহিম বায়ু (সংস্কৃতে লেখা শিলালিপিতে মালিক বয়া নামে উল্লিখিত) ফিরোজ শাহের অধীনে বিহারের (মগধের) শাসনকর্তা ছিলেন ; প্রথমোক্ত শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, তিনি ৭৫৩ হিঃর ১৩ই জিল্কদ (২০শে জানুয়ারী, ১৩৫৩ খ্রীঃ) তারিখে পরলোক গমন করেন (J.A.S.P., Vol. VIII, No. 1, p. 48 দ্রঃ)। সুতরাং যতদূর মনে হয়, ইলিয়াস বিহার জয়ের জন্য মালিক ইব্রাহিম বায়ুকে আক্রমণ করেন এবং তাঁকে বিব্রত করেন ; তার ফলেই ফিরোজ শাহ বাংলাদেশ আক্রমণের সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হন ; মালিক বায়ুর মৃত্যুর তারিখ ফিরোজ শাহের বাংলাদেশ আক্রমণের তারিখের কয়েক মাস পূর্ববর্তী, সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে যে ইলিয়াস শাহের সঙ্গে যুদ্ধেই মালিক বায়ু নিহত হন।

সমসাময়িক ইতিহাস-গ্রন্থগুলিতে একডালা-র অবস্থান স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা হয়নি। তাই এই বিষয় নিয়ে আধুনিক কালের পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছে। জিয়াউদ্দীন বারনি, শাম্‌স্‌-ই-সিরাজ আফিফ, ফিরিশতা, গোলাম হোসেন প্রভৃতির উক্তি বিশ্লেষণ করে এঁরা একডালার প্রকৃত অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। কারও কারও মতে একডালা বর্তমান মালদহ জেলায় অবস্থিত। অন্যদের মধ্যে কেউ ঢাকা জেলায়, কেউ দিনাজপুর জেলায় একডালার অবস্থিতি নির্ণয় করেন। কিন্তু শেষোক্ত পণ্ডিতরা দেখেননি যে ফিরোজ শাহ ও ইলিয়াস শাহের সমসাময়িক এবং সম্ভবত একডালা যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তি* কর্তৃক যুদ্ধের অল্প পরে রচিত 'সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী'তে লেখা আছে, "...Ikdala which was situated on the banks of the Ganges and was surrounded by one of the branches of said river." (কে. কে. বসুর অনুবাদ, J. B. O.

* এরকম ধারণার কারণ, 'সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী'তে লেখা আছে যে ইলিয়াস শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার সময় ফিরোজ শাহ মাঝে এক জায়গায় নেকড়ে, চিতা, বাঘ, ভালুক, সিংহ প্রভৃতি বন্য জন্তু শিকারের নেশায় মেতে ওঠেন, সিংহ শিকারের সময় গ্রন্থকারের কলম চলছিল। (At the time when the pen (of the author) was being set in motion, furious lions fell before the fierce arrows of the (imperial) army.—কে. কে. বসুর অনুবাদ] এর থেকে মনে হয়, সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী'র লেখক এই অভিযানে ফিরোজ শাহের সহযাত্রী ছিলেন।

R. S. Vol. XXVII, pt. I, p. 87 দ্রষ্টব্য।) দিনাজপুর বা ঢাকা জেলায় গঙ্গা নদী নেই। আমরা এই বইয়ের অষ্টম অধ্যায়ে 'হোসেন শাহের রাজধানী' শীর্ষক আলোচনার মধ্যে এই বিষয়টি সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি এবং দেখাবার চেষ্টা করেছি যে এই একডালা বর্তমান মালদহ জেলার অন্তর্গত প্রাচীন গৌড় নগরীর পাশেই অবস্থিত ছিল।

একডালা দুর্গে আশ্রয় নিয়ে ইলিয়াস শাহ ফিরোজ শাহ তোগলকের আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন। তাঁর পুত্র সিকন্দর শাহের রাজত্বকালে যখন ফিরোজ শাহ দ্বিতীয়বার বাংলাদেশ আক্রমণ করেন, তখনও সিকন্দর এই একডালা দুর্গে আশ্রয় নিয়েই তাঁকে ঠেকিয়ে রাখেন ও সন্ধি করতে বাধ্য করেন। অথচ এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ একডালা দুর্গের বিস্তৃত প্রামাণিক বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না। সমসাময়িক ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারনি লিখেছেন যে একডালা দুর্গের এক পাশে নদী এবং আর একপাশে জঙ্গল ছিল। 'সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী'র মতে একডালা দুর্গ গঙ্গার তীরে অবস্থিত এবং গঙ্গার একটি শাখানদী দ্বারা বেষ্টিত ছিল। তার ফলেই দুর্গটি এত দুর্ভেদ্য হয়ে উঠেছিল সন্দেহ নেই। বারনির বিবরণ থেকেই জানা যায় যে, একডালা দুর্গের আয়তন অসাধারণ রকমের বৃহৎ ছিল, যার ফলে ইলিয়াস শাহ পাণ্ডুয়া শহরের সমস্ত লোকজন নিয়ে তার মধ্যে ঢুকে বসেছিলেন। শাম্‌স্‌-ই-সিরাজ আফিফ লিখেছেন যে একডালা দুর্গ একটি দ্বীপের ("জজৈর") উপর অবস্থিত ছিল। দ্বীপ বলতে আফিফ নদী দ্বারা বেষ্টিত ভূখণ্ড বুঝিয়েছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু আফিফ লিখেছেন যে, একডালা দুর্গটি কাদামাটি দিয়ে তৈরী ছিল; তিনি "বিশ্বস্ত লোকদের" কাছে এই কথা শুনেছিলেন বলে জানিয়েছেন। এই বিষয়টি আমাদের মনে বিস্ময় ও সন্দেহের সৃষ্টি করে। যদিও তখন পর্যন্ত এ দেশের যুদ্ধে কামান ব্যবহৃত হয়নি, তাহলেও কাদামাটি দিয়ে তৈরী দুর্গ এতদিন ধরে কী করে পরাক্রান্ত শত্রুবাহিনীর আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখতে পারল, তা আমরা বুঝতে পারি না। সম্ভবত আফিফ ভুল খবর পেয়েছিলেন।

ইলিয়াস শাহের বিরুদ্ধে অভিযান করবার পূর্বাহ্নে ফিরোজ শাহ তোগলক একটি "নিশান" বা ঘোষণাপত্র জারী করেছিলেন। সেটি পাওয়া গিয়েছে। ফিরোজ শাহের অন্যতম বিশিষ্ট কর্মচারী মালিক অয়ন্‌-উল-মুল্‌ক্‌ মাহরুর চিঠিপত্রের সংকলন গ্রন্থ 'ইন্‌শা-ই-মাহ্‌রু'র মধ্যে এই "নিশান"টি

সংরক্ষিত হয়ে আছে (J. A. S. B. 1923, pp. 279-280 দ্রষ্টব্য)। আমরা নীচে "নিশান"টির পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ দিলাম।

"যেহেতু আমাদের কানে (এই সংবাদ) এসেছে যে—ইলিয়াস হাজী লখ্‌নৌতি এবং ত্রিহুত অঞ্চলের লোকদের উপর যথেচ্ছাচারিতা ও উৎপীড়ন চালাচ্ছে, অহেতুক রক্তপাত করছে এমন কি স্ত্রীলোকদেরও রক্তপাত করছে, যদিও প্রত্যেক ধর্ম ও মতবাদেরই সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি এই যে, কোন স্ত্রীলোককে হত্যা করা চলবে না, যদি সে স্ত্রীলোক কাফের হয়, তবুও না; এবং (ইলিয়াস হাজী) ইসলামের আইনে অনুমোদিত নয়, এমন সব কর আদায় করে লোকদের কষ্ট দিচ্ছে; জীবন ও সম্পত্তির কোন নিরাপত্তা নেই, সম্মান ও সতীত্বেরও নিরাপত্তা নেই; এবং যেহেতু এই অঞ্চল আমাদের প্রভুরা (পূর্ববর্তী রাজারা) জয় করেছিলেন, এবং উত্তরাধিকারসূত্রে ও ইমামের দান হিসাবে আজ তা আমাদের হাতে এসেছে, আমাদের রাজকীয় ও সাহসী সত্তার উপরে ঐ রাজ্যের অধিবাসীদের নিরাপত্তা বিধান (করার দায়িত্ব) বর্তেছে; এবং যেহেতু ইলিয়াস হাজী পরলোকগত সম্রাটের (মুহম্মদ-বিন-তোগলক) জীবিতাবস্থায় সম্রাটের প্রতি বশ্য ও অনুগত ছিল, এবং আমাদের পবিত্র অভিষেকের সময়ে সে অধীন ব্যক্তির মত বশ্যতা স্বীকার ও রাজভক্তি প্রদর্শন করেছিল, আমাদের কাছে সে দরখাস্ত পাঠিয়েছিল এবং আমাদের সেবা করবার জন্য (তার) ভৃত্যদের পাঠিয়েছিল; তাই ভগবানের সৃষ্ট প্রাণীদের উপরে সে যে অত্যাচার ও যথেচ্ছাচারিতা চালাচ্ছে, তার অতি ক্ষুদ্র অংশ যদি ইতিপূর্বে আমাদের গোচরে আসত, তাহলে আমরা তাকে সাবধান করে দিতাম, যার ফলে সে তা থেকে নিবৃত্ত হতে পারত; এবং যেহেতু সে সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে ও প্রকাশ্যে আমাদের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে, তাই আমরা এক অপরাজেয় সৈন্যবাহিনী নিয়ে এই দেশ উন্মুক্ত করবার জন্য এবং এখানকার অধিবাসীদের সুখের (সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করার) জন্য এর সন্নিহিত হয়েছি এই আশা নিয়ে যে এর দ্বারা সবাইকে উৎপীড়ন থেকে মুক্ত করব, বিচার ও দয়ার প্রলেপ দিয়ে তার অত্যাচারের ক্ষত আরোগ্য করব; এবং তার অত্যাচার ও নৃশংসতার উত্তপ্ত দূষিত ঝটিকায় বিশুষ্ক তাদের অস্তিত্বের বৃক্ষ আমাদের উদারতার নির্মল জলনিষেকে বর্ধিত ও ফলবন্ত হয়ে উঠবে। সুতরাং আমাদের দয়ার আধিক্যহেতু আমরা আদেশ দিয়েছি যে লখ্‌নৌতি অঞ্চলের সমস্ত লোকেরা—সাদাৎ, উলেমা, মশায়খ, ও এই জাতীয় অন্যান্য লোকেরা এবং খান, মালিক, উমারা, সদর্, আকাবের ও মারিফ এবং তাঁদের অনুচরবর্গ,

যারা তাদের আন্তরিকতার প্রমাণ দিতে পারে অথবা যাদের ইসলামের প্রতি অনুরাগ এইদিকে চালিত করে, তারা অপেক্ষা বা বিলম্ব না করে আমাদের বিশ্বরক্ষাকারী উপস্থিতির কাছে আসবে। তারা তাদের জায়গীর, গ্রাম, জমি, বৃত্তি, পারিশ্রমিক ও বেতন থেকে যা পেত, তার চাইতে তাদের আমরা বেশী দেব ; এবং কসই (কোশী) নদী থেকে লখ্‌নৌতির বেলায়ং নদীর সুদূর সীমা পর্যন্ত অঞ্চলে যে শ্রেণীর লোকেরা জমীন্‌দার (জমিদার) ও মুকদ্দম নামে অভিহিত, তারাও আমাদের বিশ্ব-রক্ষাকারী উপস্থিতির সমীপে আসতে পারে। আমরা বর্তমান বছরের ফসল (যা করস্বরূপ দিতে হয়) এবং শুল্ক পরিপূর্ণভাবে মাপ করে দেব ; এবং আগামী বছর থেকে পরলোকগত সুলতান শামসুদ্দীনের (শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ) রাজত্বকালে বলবৎ আইন অনুসারে রাজস্ব ও শুল্ক আদায়ের জন্য আমরা নির্দেশ দিয়েছি ; কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তার চেয়ে বেশী দাবী করা হবে না এবং অতিরিক্ত ও অবৈধ যে সমস্ত কর ও শুল্ক দেশের ঐ অঞ্চলের লোকেদের উপর অতিরিক্ত ভারী বোঝা হয়ে উঠতে পারে, সেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে মকুব ও উচ্ছেদ করা হবে ; এবং যে সমস্ত সন্ন্যাসী, সাঁই ও গব্‌র্‌ (?) ইত্যাদি দলবদ্ধভাবে আমাদের বিশ্বরক্ষাকারী উপস্থিতির কাছে আসবে, তারা তাদের জায়গীর, গ্রাম, জমি, পারিশ্রমিক ও বেতন থেকে যা পেত, আমরা তাদের সম্পূর্ণভাবে তা'ই মঞ্জুর করব ; এবং যারা দুদলে ভাগ হয়ে আসবে, আমরা তাদের একটি বেকনা (?) মঞ্জুর করব ; এবং যে কেউ একা আসবে, সে যা পেত, তা'ই আমরা মঞ্জুর করব। তাছাড়া আমরা তাদের আদি বাসভূমি থেকে উচ্ছেদ করব না অথবা তাদের ক্লেশের কারণ ঘটাব না ; আমরা এই আদেশ দিয়েছি যে এই অঞ্চলের প্রত্যেকেই তাদের গৃহে অন্তরের আশা অনুযায়ী বাস করতে পারে এবং চিরকাল দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি ও পরিতৃপ্তি উপভোগ করতে পারে—যদি ঈশ্বর ইচ্ছা করেন।"

জিয়াউদ্দীন বারনি তাঁর 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী'তে ইলিয়াস শাহের যে সব অত্যাচারের কথা লিখেছেন, "নিশান"টিতেও সেই ধরণের কথাই লেখা আছে। "নিশান"টি পড়লেই বোঝা যায় যে ফিরোজ শাহ ইলিয়াস শাহের প্রজাদের নানারকম লোভ দেখিয়ে নিজের দলে টানবার চেষ্টা করেছিলেন ; আসল কথা, ফিরোজ শাহ বুঝতে পেরেছিলেন যে ইলিয়াস শাহের বিরুদ্ধে জয়লাভ দুঃসাধ্য ; তাই ইলিয়াস শাহের দল ভাঙাবার জন্যে তিনি সম্ভাব্য সব রকম উপায় অবলম্বন করেছিলেন।

"নিশান"টিতে দাবী করা হয়েছে যে ফিরোজ শাহের অভিষেকের সময়ে ইলিয়াস তাঁর কাছে বশ্যতা স্বীকার ও রাজভক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। আসলে সম্ভবত ইলিয়াস ঐ সময়ে সৌজন্যসূচক উপহার ও চিঠি পাঠিয়েছিলেন; তাকেই "নিশান"-এ এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। "নিশান"-এর মতে ইলিয়াস মুহম্মদ তোগলকের রাজত্বকালে তাঁর প্রতি অনুগত ছিলেন, কিন্তু মুহম্মদ তোগলকের রাজত্বকালের শেষ নয় বছর (৭৪৩-৭৫২ হিঃ) ইলিয়াস বাংলাদেশে পরিপূর্ণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছিলেন এবং নিজের নামে মুদ্রা প্রকাশ করেছিলেন।

এই "নিশান"-এ এবং বারনির বইয়ে ইলিয়াস শাহের অত্যাচারের কথা ফলাও করে লেখা হয়েছে। নিরপেক্ষ কোন সূত্র থেকে এই সব কথার সমর্থন না পাওয়া পর্যন্ত এদের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করা যায় না। তবে একটি ব্যাপার এ সম্বন্ধে খানিকটা সন্দেহের সৃষ্টি করে। বিহারের বিখ্যাত দরবেশ শরফুদ্দীন য়াহিআ মনেরি এই সময়ে জীবিত ছিলেন। শেখ হুসামুদ্দীন মাণিকপুরীর 'রফীক অল-আরেফীন' (রচনাকাল পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ)-এর এক জায়গায় লেখা আছে, "সুলতান ফিরোজ শেখ শরফুদ্দীন মনেরির সঙ্গে দেখা করার জন্য বিহার (শরীফ)-এ আসেন। ···সুলতান নিজের মনে ভাবলেন শেখের সঙ্গেই তিনি প্রার্থনা করবেন। শেখ ইমামের ভূমিকা গ্রহণ করলেন। তিনি প্রথমবার হাঁটু গেড়ে "এজাজা নসরুল্লাহ্" শ্লোক আবৃত্তি করলেন এবং দ্বিতীয়বার তিনি "তব্বৎ ইয়াদা" শ্লোক পড়লেন। প্রার্থনা শেষ হলে সুলতান বললেন যে এর থেকে তিনি শুভ সঙ্কেত পাচ্ছেন। শেখ উত্তর দিলেন তিনি তাঁর (ফিরোজ শাহের) জয়ের জন্য 'এজাজা' এবং তাঁর শত্রুর পরাজয়ের জন্য 'তব্বৎ ইয়াদা' আবৃত্তি করেছেন।" ফিরোজ শাহ তোগলক একবার ইলিয়াস শাহের বিরুদ্ধে অভিযান করবার সময় এবং দ্বিতীয়বার ইলিয়াসের পুত্র সিকন্দর শাহের বিরুদ্ধে অভিযান করার সময় বিহারে এসেছিলেন। শরফুদ্দীন য়াহিআ মনেরি ফিরোজ শাহের যে শত্রুর পরাজয় কামনা করেছিলেন, তিনি সিকন্দর শাহ হতে পারেন না, কারণ সিকন্দর শাহের সঙ্গে শরফুদ্দীনের গভীর প্রীতির সম্বন্ধ ছিল (সিকন্দর শাহ ও গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ সংক্রান্ত আলোচনা দ্রষ্টব্য)। অতএব ইলিয়াস শাহের সঙ্গে সংঘর্ষের পূর্বাহ্ণেই ফিরোজ শাহ শরফুদ্দীনের কাছে এসেছিলেন এবং শরফুদ্দীন ইলিয়াস শাহেরই পরাজয় কামনা করেছিলেন, তাতে কোন

সন্দেহ নেই। এর থেকে মনে হয়, শরফুদ্দীন য়াহিআ মনেরি ইলিয়াস শাহের উপরে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। সুতরাং ইলিয়াস শাহ তাঁর প্রজাদের উপরে কিছু অত্যাচার করেছিলেন এবং তারই ফলে এই সর্বজন-শ্রদ্ধেয় দরবেশের তিনি অসন্তোষ উদ্রেক করেছিলেন বলে কেউ কেউ অনুমান করতে পারেন। আমাদের মনে হয়, ফিরোজ শাহের "নিশান" এবং বারনির বইয়ে ইলিয়াসের যে সমস্ত অত্যাচারের কথা লেখা আছে, তার অধিকাংশই সত্য নয়, কিন্তু "নিশান"-এ ইলিয়াসের প্রজাদের উপরে নতুন নতুন কর বসানো সম্বন্ধে যা লেখা আছে তা সত্য, কারণ "নিশান"-এ ফিরোজ শাহ সমস্ত কর এক বছরের জন্য মকুব করার এবং পরে স্থায়িভাবে হ্রাস করার আশ্বাস দিয়েছেন। ইলিয়াস শাহ সম্ভবত অর্থলোভ বা প্রয়োজননির্বাহের জন্য এই রকম বহু নতুন কর বসিয়েছিলেন এবং এরই জন্য তিনি শরফুদ্দীন য়াহিআ মনেরি প্রমুখ অনেক লোকের অপ্রীতিভাজন হয়েছিলেন বলে মনে হয়।*

'রিয়াজ' এবং বুকাননের বিবরণীতে লেখা আছে যে ফিরোজ শাহ ও ইলিয়াস শাহ যথাক্রমে দিল্লীর সম্রাট ও বাংলার শাসনকর্তা হবার আগেই ইলিয়াস দিল্লীতে সাংঘাতিক অপকর্ম করে ফিরোজ শাহের অসন্তোষ উদ্রেক করেছিলেন ও বাংলায় পালিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু আলোচ্য নিশানটিতে এই ব্যাপারের বিন্দুমাত্রও উল্লেখ দেখা যায় না। এতে ইলিয়াসের যে সমস্ত "অপরাধ"-এর কথা বলা হয়েছে, সমস্তই সাম্প্রতিক কালের ব্যাপার। 'রিয়াজ' ও বুকাননের বিবরণীর উক্তি সত্য হলে ফিরোজ শাহ তার উল্লেখ করে তাঁর অভিযোগের তালিকা বর্ধিত করার সুযোগ ছেড়ে দিতেন বলে বোধ হয় না। সুতরাং এই দুই বিবরণীর আলোচ্য উক্তি মিথ্যা বলে মনে হয়।

শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছুই জানা যায় না। যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যাপারে তিনি উচ্চাঙ্গের প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু দেশ শাসনের ব্যাপারে তাঁর দক্ষতা কী রকম ছিল, তা জানবার বর্তমানে কোন উপায় নেই।

---

* ডঃ আবদুল করিম এই বইয়ের প্রথম সংস্করণের সমালোচনা করার সময় আমাদের এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করতে পারেন নি। তিনি মন্তব্য করেছেন, "ইলিয়াস শাহ যদি এত অত্যাচার করেন, তিনি বাঙালীদের সমর্থন পেলেন কি করে?" (সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা সংখ্যা, পৃঃ ২২৭) কিন্তু ইলিয়াস শাহ যে অত্যাচার করেছিলেন, তা আমরা বলি নি, আমরা বলেছি বোধ হয় তিনি বহু নতুন কর বসিয়েছিলেন।

ইলিয়াস শাহ্ যে লৌহকঠিন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, তা ফিরোজ শাহের বিরুদ্ধে দৃঢ়তাপূর্ণ প্রতিরোধ ও পরিণামে জয়যুক্ত হওয়া থেকেই বোঝা যায়। কিন্তু তাঁর চরিত্রের অন্যান্য দিক সম্বন্ধে কিছুই আমরা জানি না। ইলিয়াস শাহ মুসলিম সন্ত ও দরবেশদের খুব সম্মান করতেন। তাঁর সময়ে বাংলাদেশে তিনজন বিশিষ্ট মুসলিম সন্ত বর্তমান ছিলেন—অখী সিরাজুদ্দীন, তাঁর শিষ্য আলা অল-হক এবং রাজা বিয়াবানি। শেষোক্ত দুজনের সঙ্গে ইলিয়াস শাহের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাঁর রাজত্বকালে ও সম্ভবত তাঁরই আদেশে আলা অল-হকের জন্য ৭৪৩ হিঃর ২রা শাবান বা ১৩৪২ খ্রীঃর ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল (Dani, Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal, p. 10 দ্রষ্টব্য)। 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে'র মতে ফিরোজ শাহ্ যখন একডালা দুর্গ অবরোধ করেছিলেন, সেই সময়ে শেখ রাজা বিয়াবানির মৃত্যু হয় এবং ইলিয়াস শাহ অসীম বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ফকীরের ছদ্মবেশে একডালা দুর্গ থেকে বেরিয়ে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

'তবকাৎ-ই-আকবরী' ও 'রিয়াজ-উস-সলাতীনে' লেখা আছে যে, জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করা ও সৈন্যবাহিনীর হৃদয় জয় করার জন্য ইলিয়াস শাহ আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। 'রিয়াজ'-এর মতে ইলিয়াস দিল্লীর শাম্সী স্নানাগারের অনুরূপ একটি স্নানাগার নির্মাণ করেছিলেন।

জিয়াউদ্দীন বারনি এবং অন্যান্য সমসাময়িক ও পরবর্তী ঐতিহাসিকেরা লিখেছেন যে ইলিয়াস শাহ্ ভাঙ বা সিদ্ধির নেশা করতেন। একথা সত্য বলেই মনে হয়। পরবর্তীকালে লেখা বহু গ্রন্থে ইলিয়াস শাহের নামের সঙ্গে 'ভাঙ্গরা' নামে একটি উপাধি বা উপনাম যুক্ত দেখা যায়। 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে'র মতে ইলিয়াস শাহ অত্যধিক পরিমাণে ভাঙ খেতেন বলে 'সুলতান শামসুদ্দীন ভাঙ্গরা' নামে পরিচিত ছিলেন। ডঃ আহমদ হাসান দানী একথা বিশ্বাস করেন না, কারণ 'তারিখ-ই-ফিরিশতা'য় লেখা আছে যে ইলিয়াস শাহ সিংহাসনে আরোহণ করে নিজেই 'সুলতান শামসুদ্দীন ভাঙ্করা' উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্তু ফিরিশতার কথা যে সত্য, তার কোন প্রমাণ নেই। ডঃ দানী মনে করেন 'সুলতান শামসুদ্দীন বাঙ্গালাহ্' বিকৃত হয়ে 'সুলতান ভাঙ্গরা (বা ভাঙ্করা)'য় পরিণত হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য, শাম্স্-ই-সিরাজ আফিফ ইলিয়াস শাহকে 'শাহ্-ই-বাঙ্গালাহ্' উপাধিতে অভিহিত

করেছেন। 'সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী'র মতে ইলিয়াস শুধু ভাঙখোর ছিলেন না, কুষ্ঠরোগীও ছিলেন এবং কুষ্ঠরোগ থেকে মুক্ত হবার জন্য তিনি বহ্‌রাইচের সিপাহ্‌সালার শেখ মসুদ গাজীর সমাধির ধূলি সর্বাঙ্গে লেপন করেন। কিন্তু 'সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী' ইলিয়াস শাহের শত্রুপক্ষের লোকের লেখা, কাজেই তার উক্তি কতখানি সত্য আর কতখানি বিদ্বেষপ্রণোদিত, তা বলা কঠিন। ফিরোজ শাহের অনুগত লোকদের লেখা বইগুলিতে ইলিয়াস শাহের চরিত্রে নানাভাবে কালিমা লেপন করা হয়েছে, বলা বাহুল্য তার অধিকাংশই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের ৭৫৮ হিজরা অবধি তারিখের মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। ৭৫৯ হিজরা থেকে তাঁর পুত্র সিকন্দর শাহের মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে। সমসাময়িক গ্রন্থ 'সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী' এবং কিঞ্চিৎ পরবর্তী গ্রন্থ 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'তে লেখা আছে যে ইলিয়াস শাহ ৭৫৯ হিজরায় পরলোক গমন করেন। এ' কথার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

'তবকাৎ-ই-আকবরী' ও 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে'র মতে ইলিয়াস শাহ তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে মালিক তাজুদ্দীন এবং আরও কয়েকজন অমাত্যের হাত দিয়ে দিল্লীতে ফিরোজ শাহের কাছে বহু উপহার পাঠিয়েছিলেন। ফিরোজ শাহ এই দূতদের আগের দূতদের চেয়েও বেশী যত্ন করে কিছুদিন পরে তাঁর হাতীশালার অধ্যক্ষ ("শাহনাফীল") মালিক সৈফুদ্দীন মারফৎ ইলিয়াস শাহকে আরবী ও তুর্কী ঘোড়া এবং আরও নানারকমের উপহার পাঠিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে বাংলাদেশে ইলিয়াস শাহের মৃত্যু হয়। মালিক তাজুদ্দীন ও মালিক সৈফুদ্দীন বিহারে পৌঁছে এই খবর পান। সৈফুদ্দীন দিল্লীতে ইলিয়াসের মৃত্যু-সংবাদ পাঠালেন এবং ফিরোজ শাহের আদেশ অনুসারে ঘোড়া ও উপহারগুলি বিহারে অবস্থিত ফিরোজ শাহের সৈন্যদের বেতনের বদলে বণ্টন করে দিলেন। মালিক তাজুদ্দীন বাংলাদেশে ফিরে গেলেন।

শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের মুদ্রাগুলি ফিরোজাবাদ (পাণ্ডুয়া), সাতগাঁও, সোনারগাঁও এবং শহর-ই-নৌ নামে একটি অজ্ঞাত স্থানের টাকশাল থেকে উৎকর্ণ হয়েছিল। "শহর-ই-নৌ" সম্ভবত নিকলো দা কন্তির ভ্রমণ-বিবরণে উল্লিখিত গঙ্গাতীরে অবস্থিত "শেরনোব" শহরের সঙ্গে অভিন্ন। ইলিয়াস শাহের এ পর্যন্ত একটি মাত্র শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, সেটি কলকাতার বেনিয়াপুকুরের একটি আধুনিক মসজিদে বসানো আছে, মূলে এটি অন্যত্র ছিল।

সিকন্দর শাহ

সিকন্দর শাহ্ ইলিয়াস শাহের সুযোগ্য পুত্র ও উত্তরাধিকারী। পিতার মৃত্যুর পরে তিনি নির্বিঘ্নে ও সর্বসম্মতিক্রমে সিংহাসনে আরোহণ করেন। 'তবকাৎ-ই-আকবরী'র মতে সিকন্দর শাহ্ ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পরে তৃতীয় দিনে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং দয়া ও ন্যায়বিচারের বাণী ঘোষণা করে রাজকর্তব্য গ্রহণ করেন। তাঁর রাজত্বকালেও দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ শাহ বাংলাদেশ জয় করতে আসেন, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে সন্ধি করে ফিরে যান। সুদীর্ঘ তেত্রিশ বছর তিনি রাজত্ব করেছিলেন। বাংলাদেশের আর কোন মুসলমান নৃপতি বা শাসনকর্তা সিকন্দর শাহের মত এত দীর্ঘকাল এ দেশ শাসন করেন নি। পিতার মত তিনিও অসামান্য প্রতিভা ও দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই অনন্যসাধারণ নৃপতির সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্যই জানা যায় না।

শাম্‌স্-ই-সিরাজ আফিফের লেখা 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী' এবং অজ্ঞাত-নামা ব্যক্তির লেখা 'সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী'তে ফিরোজ শাহ তোগলক এবং সিকন্দর শাহের সংঘর্ষের বিস্তৃত বিবরণপাওয়া যায়। শাম্‌স্-ই-সিরাজ আফিফের বিবরণে খুঁটিনাটি তথ্য বেশী পাওয়া যায়। কিন্তু তার মধ্যে কিছু কিছু ভুল আছে। আফিফ লিখেছেন যে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের জামাতা জাফর খানের অনুরোধে ফিরোজ শাহ্ বাংলাদেশে দ্বিতীয়বার অভিযান করেন; ফিরোজ শাহ্ বাংলাদেশে তাঁর প্রথম অভিযানের পর দিল্লীতে ফিরে গেলে ইলিয়াস শাহ ফখরুদ্দীনের উপর প্রতিশোধ নেবার মৎলব করে নৌকোয় চড়ে কয়েকদিনের মধ্যে সোনারগাঁওয়ে পৌছোন এবং বিপদের ভয় থেকে নিশ্চিন্ত ফখরুদ্দীনকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করে অবিলম্বে বধ করেন ও তাঁর রাজ্য অধিকার করেন, ফখরুদ্দীনের সমস্ত বন্ধু ও অনুচররা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে; জাফর খান এই সময় শুল্ক আদায় এবং শুল্ক সংগ্রাহকদের হিসাবপত্র পরীক্ষার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি সমস্ত খবর শুনে সোনারগাঁও থেকে পলায়ন করেন এবং নানা পথ ঘুরে অনেক কষ্টে জলপথে থাট্টায় ও সেখান থেকে দিল্লীতে পৌছে ফিরোজ শাহকে সমস্ত কথা নিবেদন করেন; ফিরোজ শাহ তাঁকে প্রচুর অর্থ, সম্মান ও উচ্চ রাজপদ দান করেন এবং পরিশেষে, যাতে জাফর খান শ্বশুরের রাজ্যের অধীশ্বর হতে পারেন, তার জন্য স্বয়ং ইলিয়াস শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। কিন্তু ফিরোজ শাহের প্রথম বাংলা-অভিযান

হিজরাতে শেষ হয়; আর ফখরুদ্দীন ৭৫০ হিজরায় পরলোক গমন করেছিলেন, কারণ তাঁর ৭৫০ হিঃ পর্যন্তই মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে; ৭৫০ হিঃ থেকে ৭৫৩ হিঃ পর্যন্ত তাঁর পুত্র ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহের মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে। ৭৫৩ হিঃ থেকে ৭৫৮ হিঃ পর্যন্ত একটানা সোনারগাঁও টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ ইলিয়াস শাহের মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে! অতএব ইলিয়াস শাহ ৭২৫ হিজরায় ফখরুদ্দীনকে বন্দী ও নিহত করে তাঁর রাজ্য অধিকার করতে পারেন না। তিনি আসলে উচ্ছেদ (ও সম্ভবত বধ) করেছিলেন ফখরুদ্দীনের পুত্র ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহকে এবং এই ঘটনা ঘটেছিল ৭৫৩ হিজরায়—ফিরোজ শাহের প্রথম গৌড়-অভিযানের আগেই। সুতরাং শামস্-ই-সিরাজ আফিফ এক্ষেত্রে ভুল করেছেন, তাঁর পক্ষে এই জাতীয় ভুল করা খুবই স্বাভাবিক, কারণ ফিরোজ শাহের বঙ্গাভিযান সম্বন্ধে তাঁর কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল না; ঐ সময়ে তিনি হয় জন্মান নি না হয় নিতান্ত বালক ছিলেন। [শামস্-ই-সিরাজ-আফিফ 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী'তে লিখেছেন যে ফিরোজ শাহ ৭০৯ হিঃ বা ১৩০৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর নিজের পিতামহ শামস্-ই-শহাব-আফিফ ও ফিরোজ শাহ একই দিনে জন্মান (Tarikh-i-Firoz Shahi, Eng. Translation, 1953, pp. 3, 5 দ্রষ্টব্য)। অতএব ৭৫৯ হিজরা বা ১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ফিরোজ শাহের দ্বিতীয় বঙ্গাভিযানের সময় ফিরোজ শাহ ও শামস্-ই-শহাব আফিফ দুজনেরই বয়স ৪৯ বছর ছিল। সুতরাং শামস্-ই-শহাব আফিফের পৌত্র শামস্-ই-সিরাজ আফিফ ঐ সময়ে জন্মান নি বা জন্মালেও নিতান্ত বালক ছিলেন।] শামস্-ই-সিরাজ আফিফের পিতা ফিরোজ শাহের বঙ্গাভিযানের সময় ফিরোজ শাহের "খওয়াস" (attendant) ছিলেন, তাঁর কাছে শুনে আফিফ এই ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন। অবশ্য জাফর খান যে ফিরোজ শাহের কাছে গিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন এবং ফিরোজ শাহ যে জাফর খানের দাবী পূরণ করার অজুহাত দেখিয়ে বাংলাদেশে দ্বিতীয়বার অভিযান করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আসলে ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহকে উচ্ছেদ করে ইলিয়াস শাহ সোনারগাঁও অধিকার করার বেশ কিছুদিন পরে জাফর খান দিল্লীতে যান।

শামস্-ই-সিরাজ আফিফ ফিরোজ শাহের দ্বিতীয় বঙ্গাভিযানের যে বিবরণ দিয়েছেন, নীচে তার সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হল।

যখন বাংলার সুলতান শামসুদ্দীন শুনলেন যে ফিরোজ শাহ তাঁর বিরুদ্ধে

অভিযানের প্রস্তুতি করছেন, তখন তিনি ভয় পেলেন এবং একডালায় থাকা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হবে না বুঝে সোনারগাঁওয়ে চলে যাওয়া উচিত মনে করলেন, কারণ ঐ জায়গা বাংলার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং সেখানে তিনি শত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপদ হতে পারবেন। তিনি সেখানেই গেলেন, কিন্তু সেখানকার লোকেরা তাঁর অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবার জন্য ফিরোজ শাহকে আবেদন জানিয়ে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। ফিরোজ শাহও তখন সসৈন্যে বাংলার দিকে রওনা হলেন।

ফিরোজ শাহের প্রথম অভিযানের মত দ্বিতীয় অভিযানেও বিরাট ও শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গেল। তাঁর বাহিনীতে ৭০,০০০ ঘোড়সওয়ার, ৪৭০টি রণহস্তী এবং বহু নৌকো ছিল; যে সব তাঁবু গেল, তাঁর মধ্যে দুটি বাইরের তাঁবু, দুটি অভ্যর্থনা করবার তাঁবু, দুটি ঘুমোবার তাঁবু এবং দুটি রান্না-বান্না প্রভৃতি সাংসারিক কাজ করবার তাঁবু ছিল। তাঁর বাহিনীতে ১৮০টি নানা ধরণের পতাকা, ৮৪টি গাধার পিঠে বোঝাই তূর্য ও দামামা এবং বহু উট, গাধা ও ঘোড়া ছিল।

কনৌজ, অযোধ্যা ও জৌনপুর হয়ে ফিরোজ শাহ বাংলাদেশে এসে পৌছোলেন। ইতিমধ্যে সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ মারা গিয়েছিলেন এবং তাঁর পুত্র সিকন্দর শাহ রাজা হয়েছিলেন। তিনি দুর্ভেদ্য ও জলবেষ্টিত একডালা দুর্গে আশ্রয় নিলেন। ফিরোজ শাহের বাহিনী ঐ দুর্গ বেষ্টন করে রইল এবং কাঠের বাড়ী তৈরী করে বাস করতে লাগল। দু'পক্ষই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল এবং চারদিকে আরাদা (শূল ক্ষেপণের যন্ত্র) ও মঞ্জানিক (শর ক্ষেপণের যন্ত্র) স্থাপন করল। উভয় দলে তীর ও বল্লম ছোঁড়াছুঁড়ি চলতে লাগল। সিকন্দর শাহের পক্ষের লোকেরা ভয়ে দুর্গের ভিতর থেকে বেরোতে পারত না। কিন্তু হঠাৎ একদিন সিকন্দরিয়া দুর্গের (সিকন্দরের দুর্গ অর্থাৎ একডালা) একটি প্রধান প্রাকার অত্যধিক লোকের ভার সইতে না পেরে ধ্বসে পড়ল। তার ফলে উভয় পক্ষেরই মধ্যে তুমুল চীৎকার উঠল এবং তারা যুদ্ধের জন্য তৈরী হল। হিসামুলমূল্ক্ সুলতান ফিরোজ শাহকে এই সুযোগে দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করে নিতে বললেন। কিন্তু ফিরোজ শাহ বললেন যে এখন অতর্কিত আক্রমণ করে দুর্গ অধিকার করলে নিষ্ঠুর ও অভদ্র লোকদের হাতে সম্ভ্রান্ত মহিলাদের অমর্যাদা ঘটবে। তাই ভগবানের উপর বিশ্বাস রেখে অপেক্ষা করাই ভাল।" তাঁর লোকেরা

দুর্গ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু ধৈর্যের সঙ্গে তারা সুলতানের আদেশ মেনে নিল।

এদিকে "কালোদের রাজা" সিকন্দর শাহের উৎসাহী বাঙালী মিস্ত্রীরা সারারাত্রি খেটে বিধ্বস্ত প্রাকার মেরামত করে ফেলল। একডালা দুর্গ কাদামাটি দিয়ে তৈরী ছিল বলে এত কম সময়ের মধ্যেই প্রাকারটি মেরামত করে ফেলা সম্ভব হল। তারপর দু'পক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলতে লাগল, যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। অবশেষে দুর্গে খাদ্য ফুরিয়ে গেল। বাঙালীরা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল। কিন্তু দু'পক্ষই যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই দুই সুলতান সন্ধি কামনা করলেন। সিকন্দর শাহ তাঁর মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তাঁরা ফিরোজ শাহের কাছে সন্ধির প্রস্তাব করে দূত পাঠাতে চাইলেন। সিকন্দর শাহ নিরুত্তর রইলেন, কিন্তু তাঁর মন্ত্রীরা মৌনতাকেই সম্মতির লক্ষণ জ্ঞান করে ফিরোজ শাহের কাছে একজন চতুর ও বিশ্বস্ত দূত পাঠিয়ে বললেন যে যুধ্যমান দুই পক্ষই যখন মুসলমান, তখন তাঁদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হওয়াই উচিত। ফিরোজ শাহ বললেন যে সন্ধি করতে তাঁর আপত্তি নেই, তবে জাফর খানকে সোনারগাঁওয়ের রাজা করতে হবে এই তাঁর একমাত্র সর্ত। ফিরোজ শাহের সিদ্ধান্ত শুনে তাঁর মন্ত্রীরা সিকন্দর শাহের কাছে হৈবৎ খান নামে একজন দূত পাঠালেন। হৈবৎ খানের বাড়ী ছিল বাংলায় এবং তাঁর দুই পুত্র সিকন্দর শাহের অধীনে চাকরী করতেন। হৈবৎ খানের কাছে প্রস্তাব শুনে সিকন্দর শাহ প্রথমে এসম্বন্ধে কিছু না জানার ভান করলেন। কিন্তু সুকৌশলী ও মিষ্টভাষী হৈবৎ খান তাঁকে ভাল করে সমস্ত বুঝিয়ে বলে ফিরোজ শাহের প্রদত্ত সর্ত অনুযায়ী সন্ধি করতে রাজী করালেন। সিকন্দর তখন বললেন জাফর খানকে সোনারগাঁওয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে ফিরোজ শাহের নিজের আসার কী দরকার ছিল, তিনি দিল্লী থেকে সিকন্দরকে আদেশ পাঠালেই তো সিকন্দর জাফর খানকে সোনারগাঁও ছেড়ে দিতেন!

হৈবৎ খান ফিরোজ শাহের কাছে ফিরে গিয়ে তাঁকে সমস্ত কথা জানালেন। সব কথা শুনে ফিরোজ শাহ খুশী হয়ে বললেন যে তিনি সিকন্দর শাহের সঙ্গে সন্ধি করবেন এবং তাঁকে তিনি নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রের মত জ্ঞান করবেন। তারপর হৈবৎ খানের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি সিকন্দর শাহকে উপহার পাঠালেন। ফিরোজ শাহ মালিক কাবুল বা তোরাবান্দ খানের হাত দিয়ে ৮০,০০০ টকা দামের একটি মুকুট এবং ৫০০ আরবী ও তুর্কী ঘোড়া একডালা

দুর্গে পাঠালেন। সেই সঙ্গে এই ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে তাঁর এবং সিকন্দরের মধ্যে আর যুদ্ধ হবে না। ইস্কান্দরের (অর্থাৎ সিকন্দরের) দুর্গের পরিখা ২০ গজ চওড়া ছিল, তা সত্ত্বেও মালিক কাবুল ঘোড়া চড়ে তা লাফ দিয়ে পার হয়ে গেলেন এবং দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করলেন। সিকন্দর শাহের সভায় গিয়ে মালিক কাবুল সাতবার সিকন্দরের সিংহাসন প্রদক্ষিণ করলেন এবং তাঁর মাথায় মুকুট ও বুকে সম্মান-উত্তরীয় পরিয়ে দিলেন। সুলতান সিকন্দর সন্তুষ্ট হয়ে চল্লিশটি হাতী এবং আরও নানা মূল্যবান উপহার পাঠালেন এবং এই কামনা প্রকাশ করলেন যে এখন থেকে প্রতি বছর দুই সুলতানের মধ্যে সৌভ্রাত্র ও বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ উপহার-বিনিময় চলতে থাকবে। যতদিন ফিরোজ শাহ ও সিকন্দর শাহ বেঁচে ছিলেন, ততদিন দু'জনের মধ্যে উপহার-বিনিময় চলেছিল।

সিকন্দর শাহের প্রেরিত উপহার পেয়ে ফিরোজ শাহ খুব খুশী হলেন। অতঃপর তিনি জাফর খানকে ডাকিয়ে পাঠিয়ে তাঁকে সোনারগাঁওয়ে গিয়ে সেখানকার রাজপদ গ্রহণ করার নির্দেশ দিলেন। এও বললেন যে জাফর খানের নিরাপত্তার জন্য তিনি তাঁর সমগ্র সৈন্যবাহিনী নিয়ে যেখানে আছেন, সেখানেই কিছু সময় অবস্থান করবেন, ইতিমধ্যে জাফর খান সোনারগাঁওয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবেন। জাফর খান তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তাঁরা সকলেই বললেন জাফর খানের পক্ষে সোনারগাঁওয়ে থাকতে পারা একেবারেই অসম্ভব, কারণ তাঁর আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবেরা কেউই বেঁচে নেই, সকলেই বিনষ্ট হয়েছে। জাফর খান তখন ফিরোজ শাহের কাছে ফিরে গিয়ে জানালেন যে দিল্লীতেই তিনি ও তাঁর পরিবার নিরাপদে থাকতে পারবেন, তাই সোনারগাঁওয়ের রাজা হবার বাসনা আর তাঁর নেই, তার বদলে তিনি তাঁর বর্তমান অবস্থাতেই পরিতুষ্ট থেকে শান্তিতে জীবন কাটাতে চান। একথা শুনে ফিরোজ শাহ সন্তুষ্ট হলেন এবং সৈন্যবাহিনী নিয়ে বাংলাদেশ থেকে প্রথমে জৌনপুর ও পরে জাজনগর বা উড়িষ্যার দিকে গেলেন। তাঁর এই দ্বিতীয় বঙ্গাভিযান শেষ হতে দু' বছর সাত মাস সময় লেগেছিল।

আফিফের বিবরণ মোটামুটিভাবে বিশ্বাসযোগ্য, তবে এই বিবরণের একডালা দুর্গের গম্বুজ ধ্বসে পড়া ও মহিলাদের সম্ভ্রম হানির ভয়ে ফিরোজ শাহের তা আক্রমণ করতে অস্বীকৃত হওয়া এবং সিকন্দর শাহের জাফর খানকে সোনার-গাঁও ছেড়ে দিতে রাজী হওয়া প্রভৃতি প্রসঙ্গগুলি অমূলক বলে মনে হয়।

'সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী'র বিবরণ আফিফের বিবরণের তুলনায় সংক্ষিপ্ত,

কিন্তু এর মূল্য অন্য দিক দিয়ে বেশী, কারণ এই বইয়ের লেখক সম্ভবত ফিরোজ শাহ ও সিকন্দর শাহের যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন আর স্বয়ং ফিরোজ শাহের নির্দেশে এই বই লেখা হয়। 'সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী'তে লেখা আছে যে শামসুদ্দীনের মৃত্যুর পর সুলতান সিকন্দর পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। যৌবনের ঔদ্ধত্যে তিনি তাঁর শুভার্থীদের উপদেশ অগ্রাহ্য করে এবং আগেকার ইতিহাস ভুলে গিয়ে সম্রাট ফিরোজ শাহের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। এই সময়ে পিণ্ডার খিলজী নামে ফিরোজ শাহের একজন কর্মচারী দিল্লীতে বিশ্বস্তভাবে সুলতানের কাজ করে কাদির খান উপাধি এবং অধিকন্তু "বঙ্গ ও বাঙ্গালা" দেশের কর্তৃত্ব (!) লাভ করেন। ইলিয়াস শাহের এক পুত্র আলী শাহ এই পিণ্ডারের কর্মচারী ছিলেন এবং পিণ্ডার তাঁকে ভাইপো বলে ডাকতেন। (এর দ্বারা 'সিরাৎ'-রচয়িতা বোঝাতে চাইছেন যে ফিরোজশাহের কাছে সিকন্দর শাহ নিতান্ত তুচ্ছ ব্যক্তি। ইলিয়াস শাহের সিকন্দর শাহ ছাড়া অন্য কোন পুত্রের নাম একমাত্র এখানেই পাওয়া যায়।) এসব কথা ভুলে গিয়ে সিকন্দর যখন ফিরোজ শাহের কর্তৃত্ব অস্বীকার করলেন, তখন ফিরোজ শাহ তাঁকে শিক্ষা দিতে সঙ্কল্প করলেন। ফিরোজ শাহ তাঁর সভাসদদের জানালেন যে সিকন্দর রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকার অধিকার হারিয়েছেন এবং ৭৫৯ হিজরায় (১৩৫৭-৫৮ খ্রীঃ) তিনি তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। ফিরোজ শাহ তাঁর বাহিনী নিয়ে বাংলায় পৌছোলেন এবং একডালা দুর্গ অবরোধ করলেন। তার ফলে সিকন্দর পরিশেষে বিবর্ণ হয়ে বৈরীভাব ত্যাগ করে দয়া ভিক্ষা করলেন। ফিরোজ শাহও তাঁকে ক্ষমা করে বললেন, "বুদ্ধিমান লোক কোন অবিজ্ঞোচিত কাজ করলে তার শাস্তি দেবার সময় উদার ব্যবহার করা প্রয়োজন।" সিকন্দরের যে সমস্ত লোক বন্দী হয়েছিল, তাদের ফিরোজ শাহ মুক্তি দিলেন। সিকন্দরও ফিরোজ শাহকে বড় বড় হাতী ও অনেক সুন্দর উপহার পাঠালেন। সেই সঙ্গে তিনি জানালেন যে যারা মিছামিছি তাঁর উপর দোষ দিয়ে তাঁর নামে কোন কিছু প্রচার করেছে, তাদের উপযুক্ত অনুসন্ধানের পর তিনি শাস্তি দিতে চান এবং দেশকে দুর্বৃত্তদের হাত থেকে মুক্ত করার ভার তিনিই নিচ্ছেন।

সুতরাং ফিরোজ শাহের প্রথম অভিযানের মত দ্বিতীয় অভিযানও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। সিকন্দর তাঁর পিতারই মত যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে ফিরোজ শাহের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করলেন, উপরন্তু স্বাধীন ও সার্বভৌম নৃপতি হিসাবে

ফিরোজ শাহের কাছে স্বীকৃতি আদায় করে নিলেন। শামস্-ই-সিরাজ আফিফ ও 'সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী'র লেখক বলেছেন যে সিকন্দরই প্রথমে ফিরোজ শাহের কাছে সন্ধির প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু এ-সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ আছে। অন্তত 'সিরাৎ'-এ সিকন্দর শাহের যে দীনভাবে ক্ষমা ভিক্ষার বর্ণনা আছে, তা যে সত্য নয় তা বলাই বাহুল্য। সিকন্দর শাহ যদি সত্যিই এভাবে নত হতেন, তাহলে ফিরোজ শাহ বাংলাদেশে তাঁর সার্বভৌম অধিকার স্বীকার করতেন না, তাঁকে নিজের সামন্ত করে রাখতেন।

ফিরোজ শাহের এই দ্বিতীয় বঙ্গাভিযান যে ৭৫৯ হিজরায় সুরু হয়েছিল এবং দু'বছর সাত মাস চলেছিল, তা যথাক্রমে 'সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী' এবং শামস্-ই সিরাজ আফিফের বই থেকে জানা যায়। সুতরাং ৭৬১ হিজরার শেষ দিক অথবা ৭৬২ হিজরার প্রথম দিকে এই অভিযান শেষ হয়েছিল। 'তবকাৎ-ই-আকবরী' প্রভৃতি পরবর্তীকালে রচিত ইতিহাস-গ্রন্থগুলিতে লেখা আছে যে ৭৬২ হিজরার রজব মাসে ফিরোজ শাহ দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন। একথা সত্য বলেই মনে হয়।

পরবর্তীকালে লেখা ইতিহাসগ্রন্থগুলিতে ফিরোজ শাহের এই দ্বিতীয় বঙ্গাভিযান সম্বন্ধে কয়েকটি নতুন কথা পাওয়া যায়। 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'তে লেখা আছে যে ৭৫৯ হিজরার শেষ দিকে বাংলাদেশ থেকে দূতেরা ফিরোজ শাহের দরবারে উপঢৌকন নিয়ে এসেছিল এবং তারপর ফিরোজ শাহ বাংলাদেশে অভিযান করেন। একথা সত্য হলে বলতে হবে, ফিরোজ শাহের অভিযানের প্রস্তুতি তার আগেই সম্পূর্ণ হয়েছিল, কিন্তু ফিরোজ শাহ বাংলার রাজদূতদের কিছুই বুঝতে দেননি এবং তারা চলে যাবার পরে তিনি বাংলার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'র এই সময় নির্দেশে ভুল আছে বলে মনে হয়। 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে'র মতে সিকন্দর শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেই ফিরোজ শাহকে বিভিন্ন ধরণের ৫০টি দুষ্প্রাপ্য হাতী উপহার পাঠিয়েছিলেন। ফিরিশ্‌তা ও 'রিয়াজ'-এর মতে ফিরোজ শাহ যখন সিকন্দর শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন বর্ষার জন্য গোমতী নদীর তীরে জাফরাবাদে তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল; সেই সময় ফিরোজ শাহ সিকন্দর শাহের কাছে দূত পাঠান; সিকন্দর শাহ বুঝতে পারেন নি ফিরোজ শাহের আসার উদ্দেশ্য কী। এ সম্বন্ধে তাঁর মনে দুশ্চিন্তা ছিল, তাই তিনি পাঁচটি হাতী ও অন্যান্য উপহার সমেত ফিরোজ শাহের কাছে দূত পাঠান, কিন্তু

তাতে কোন ফল হয়নি। 'তবকাৎ-ই-আকবরী' ও 'মন্তখব-উৎ-তওয়ারিখ' এর মতে জাফরাবাদ থেকে ফিরোজ শাহ সিকন্দর শাহের কাছে সৈয়দ রসুলদার নামে একজন দূত পাঠিয়েছিলেন।

সিকন্দর শাহের রাজত্বকালের আর কোন ঘটনার কথা জানা যায় না। তাঁর একটি অক্ষয় কীর্তি বিখ্যাত আদিনা মসজিদ নির্মাণ করা। স্থাপত্য-সৌন্দর্যের দিক দিয়ে এই মসজিদটি অতুলনীয়। ভারতবর্ষে নির্মিত সমস্ত মসজিদের মধ্যে এইটি আয়তনের দিক থেকে দ্বিতীয়। এর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বহু হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি ও হিন্দু মন্দিরের উপকরণ দেখতে পাওয়া যায়। এই কারণে, সুলতানের আদেশে বিভিন্ন হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে আদিনা মসজিদের উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। এই অনুমান সত্য হলে বলতে হবে ধর্মের ব্যাপারে সিকন্দর শাহের মনোভাব খুব উদার ছিল না। কিন্তু ঐ অনুমান থেকে নিম্নোক্ত একটি সমস্যার সন্তোষ-জনক সমাধান হয় না।

মুসলমান আমলে হিন্দু মন্দিরের উপকরণে যে সমস্ত মসজিদ তৈরী হত, তাতে সাধারণত দেব-দেবীর মূর্তিগুলিকে নিশ্চিহ্ন বা বিকৃত করা হত অথবা উলটে রাখা হত; কিন্তু আদিনা মসজিদের মধ্যে যেসব দেবদেবীর মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়, তাদের অধিকাংশই অবিকৃত এবং সেগুলি সোজা ভাবেই বসানো আছে, তাদের অনেকগুলি—মসজিদের বাইরের দেওয়ালে ও ভিতরে বেশ ভাল জায়গায় প্রতিষ্ঠিত আছে। দ্বিতীয়ত, এই মসজিদের কয়েকটি দরজার উপরের প্যানেলে খুব সুন্দরভাবে হিন্দু দেবতার মূর্তি খোদাই করা আছে; ঐ প্যানেল-গুলি বাইরের থেকে আনা হয়েছে বলে মনে করা শক্ত, কারণ এগুলি দরজার মাপের সঙ্গে অবিকল মিলে যায়, বাইরের থেকে আনা মূর্তি-সংবলিত প্যানেলকে দরজার মাপের সঙ্গে কৃত্রিমভাবে মেলানো হলে তার মধ্যে এমন সুষমতা ও পরিপূর্ণতা রক্ষা করা সম্ভব হত বলে মনে হয় না।

সুতরাং সিকন্দর শাহ হিন্দু-মন্দির ধ্বংস করিয়ে তার থেকে আদিনা মসজিদের উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে না। উপরে যে দুটি সমস্যার উল্লেখ করা হয়েছে, তার সমাধান সম্বন্ধে পাণ্ডুয়া অঞ্চলে প্রচলিত একটি পুরানো প্রবাদ থেকে খানিকটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়; প্রবাদটি এই যে, রাজা গণেশ ক্ষমতা লাভের পরে আদিনা মসজিদকে তাঁর কাছারী-বাড়ীতে পরিণত করেছিলেন। এ সম্বন্ধে এইচ. এস. স্টেপলটন লিখেছিলেন, "It

may also be added with reference to the supposed connection of Rājā Kāns with the Eklākhī building that local tradition states that when the Rājā obtained supreme power over Bengal after the death of the short-lived successors of Ghiyāsuddīn, out of contempt for Muhammadanism he used the adjacent Adīna mosque as his Kācherī (Magistrate's Court or Zamindārī Office)." (Memoirs of Gaur and Pandua, p. 126, f. n.)

এই প্রবাদ সত্য হওয়া অসম্ভব নয়। এই প্রবাদ যদি সত্য হয়, তাহলে এমন হতে পারে যে, আদিনা মসজিদ যখন প্রথম নির্মিত হয়, তখন তাতে কোন হিন্দু দেব দেবীর মূর্তি ছিল না; রাজা গণেশ যখন ক্ষমতা লাভ করে আদিনা মসজিদকে কাছারীতে পরিণত করেছিলেন, সেই সময়ে তাঁরই আদেশে হয়ত এই মসজিদের মধ্যে দেবদেবীর মূর্তিগুলি খোদাই করা হয়েছিল। কিন্তু গণেশের মৃত্যুর পর আদিনা মসজিদ আবার মসজিদে পরিণত হয়। সমসাময়িক আরবী গ্রন্থকার 'ইব্‌ন্‌-ই-হজর (১৩৭২-১৪৪৯ খ্রীঃ) তাঁর 'ইন্‌বা-উল্‌-গুম্‌র্‌' বইয়ে লিখেছেন যে রাজা গণেশের পুত্র জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ রাজা হবার পরে তাঁর পিতা (অর্থাৎ গণেশ) মসজিদ ও অন্যান্য জিনিষ যা কিছু ধ্বংস করেছিলেন, সেগুলির সংস্কারসাধন করেন। সম্ভবত এইভাবে আদিনা মসজিদকেও আবার মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়, কিন্তু দেবদেবীর মূর্তিগুলিকে আর অপসারণ করা হয়নি, এগুলি অপসারণ করলে আদিনা মসজিদের সৌন্দর্যহানি ঘটবে ভেবেই হয়তো জলালুদ্দীন ও তাঁর পরবর্তী মুসলমান সুলতানেরা এগুলিকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। এই যদি প্রকৃত ব্যাপার হয় তাহলে পূর্বোক্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান হয়।

আদিনা মসজিদের পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ দিক বর্তমানে প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত। কেবল পশ্চিম দিকের অনেকখানি অংশ এখনও অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। এত বিরাট ও এত সুন্দর মসজিদটি চারশো বছরও সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় থাকতে পারে নি, কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে 'রিয়াজ'-রচয়িতা গোলাম হোসেন এর "কিছু চিহ্ন" মাত্র দেখেছিলেন।

আদিনা মসজিদের পশ্চিম দিকের বাইরের দেওয়ালে একটি শিলালিপি আছে, তাতে সিকন্দর শাহের রাজত্বকালে এই মসজিদ নির্মিত হওয়ার কথা

লেখা আছে। শিলালিপিটির তারিখ ৭৭০ হিজরার ৬ই রজব অর্থাৎ ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৩৬৯ খ্রীষ্টাব্দ। কথিত আছে শিলালিপিটির ভাষা স্বয়ং সিকন্দর শাহের লেখনীনিঃসৃত। 'রিয়াজ'-রচয়িতা সিকন্দর শাহের রাজত্বকাল সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে লিখেছেন যে সিকন্দর শাহ আদিনা মসজিদ সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। কিন্তু উপরে উল্লিখিত শিলালিপির সাক্ষ্য থেকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, সিকন্দর শাহের জীবদ্দশাতেই এই মসজিদ সম্পূর্ণ হয়েছিল, কারণ ঐ শিলালিপির তারিখের পরেও সিকন্দর-শাহ আরও একুশ বছর জীবিত ছিলেন। আদিনা মসজিদের পশ্চিম দিকে আগে একটি সমাধি ছিল। লোকে বলে এইটিই সিকন্দর শাহের সমাধি।

সিকন্দর শাহের ৭৫৯ হিঃ থেকে ৭৯২ হিঃ পর্যন্ত বছরগুলিতে উৎকীর্ণ মুদ্রা পাওয়া যায়। ৭৯৩ হিঃ থেকে তাঁর পুত্র গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে। অতএব ৭৯২ বা ৭৯৩ হিজরায় যে সিকন্দর শাহের মৃত্যু ঘটেছিল, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

সিকন্দর শাহের মুদ্রাগুলি ফিরোজাবাদ (পাণ্ডুয়া), সোনারগাঁও, সাতগাঁও, মুয়াজ্জমাবাদ, শহর-ই-নৌ এবং কামরূপের টাকশালে উৎকীর্ণ হয়েছিল। আজ অবধি এইসব জায়গায় তাঁর শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে :—

দেবীকোট (দিনাজপুর), পাণ্ডুয়া (মালদহ) এবং মোল্লা সিমলা (হুগলী)।

এর থেকে তাঁর রাজ্যের সীমা সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। মোল্লা সিমলার শিলালিপিতে সুলতানের নাম নেই, তবে মুখলিশ খান নামে একজন রাজ-কর্মচারীর নাম পাওয়া যায়।

সিকন্দর শাহের প্রসঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, আজ অবধি কোন মুদ্রা, শিলালিপি বা আর কোন সূত্রে তাঁর পূর্ণ রাজকীয় নাম পাওয়া যায় নি।

সিকন্দর শাহ তাঁর পিতা ইলিয়াস শাহেরই মত মুসলিম সাধুসন্তদের ভক্ত ছিলেন। দেবীকোটের বিখ্যাত সন্ত মখদুম মৌলানা আতা ওয়াহিদুদ্দীন বা মোল্লা আতার সমাধিতে তিনি ৭৬৫ হিজরায় একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। তাঁর সমসাময়িক বিখ্যাত দরবেশ আলা অল-হকের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে রচিত মুসলিম সন্তদের জীবনীগ্রন্থ 'অখবার অল-অখিয়ার'-এর সাক্ষ্য বিশ্বাস করলে বলতে হয়, শেষের দিকে আলা অল-হকের সঙ্গে সিকন্দর শাহের বিরোধ ঘটে। এই

বইতে লেখা আছে যে আলা অল-হক বাংলার রাজধানী পাণ্ডুয়ায় ছাত্র, ভিক্ষুক ও পথিকদের খাওয়াবার জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করতেন। সুলতানের পক্ষেও এত অর্থ ব্যয় করা সম্ভব নয় বলে সুলতানের মনে আলা অল-হকের প্রতি ঈর্ষ্যা জাগ্রত হল এবং তিনি তাঁকে রাজধানী পাণ্ডুয়া ছেড়ে সোনারগাঁওয়ে চলে যেতে বললেন। সোনারগাঁওয়ে গিয়ে আলা অল-হক আগের তুলনায় দ্বিগুণ অর্থ ব্যয় করতে লাগলেন। কিন্তু কেউ-ই জানত না কোথা থেকে তিনি এই অর্থ পেতেন। বুকাননের বিবরণীতে 'অখবার অল-অখিয়ার'-এর এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায়। এতে লেখা আছে, "The most celebrated person in the reign of Sekundur, was a holy man named Mukhdum Alalhuk, whose son, Azem Khan, was commander of the troops. The saint having taken disgust at some part of the king's conduct, retired to Sonargang, near Dhaka...The good man was, however, soon after induced to return."

এই বিবরণীতে আর একটি নতুন কথা পাওয়া গেল যে আলা অল-হকের পুত্র আজম খান সিকন্দরের সেনাপতি ছিলেন। 'অখবার অল-আখিয়ার'-এর মতে আজম খান সুলতানের উজীর ছিলেন।

এছাড়া বিহারের বিখ্যাত দরবেশ শেখ-উল-ইসলাম শরফুল হক ওয়াদ্দীন ওরফে শরফুদ্দীন য়াহিআ মনেরির সঙ্গে সিকন্দর শাহের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তাঁদের মধ্যে পত্রবিনিময় চলত। বিহারের দরবেশ মুজঃফর শাম্স্ বলখি সিকন্দর শাহের পুত্র গিয়াসুদ্দীন আজম শাহকে যে চিঠিগুলি লিখেছিলেন, তার একটিতে লেখা আছে, "যদিও ফিরোজ শাহ (তোগলক) এবং তাঁর পক্ষের লোকেরা বারবার শেখকে (শরফুদ্দীন য়াহিআ মনেরি) কিছু লিখতে অনুরোধ করেন যা তাঁরা স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে রাখতে পারেন, তিনি তাঁদের পৃথকভাবে কিছু লেখেন নি বা পাঠান নি। পক্ষান্তরে তিনি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে অন্তরের ইচ্ছায় শহীদ সুলতানকে (সিকন্দর শাহ) প্রায়ই চিঠি লিখতেন।" (Proceedings of the 19th session of Indian History Congress, 1956, p. 214)

নূর কুৎব্ আলমের শিষ্য শেখ হুসামুদ্দীন মাণিকপুরীর বাণী ও উপদেশ সংগ্রহ করে তাঁর শিষ্য ফরীদ বিন সালার 'রফীক অল-আরেফিন' নামে একটি

বই প্রকাশ করেন। এই বইয়ের মধ্যে দেখা যায়, শেখ হুসামুদ্দীন মাণিকপুরী রাজা হিসাবে ও মানুষ হিসাবে সিকন্দর শাহের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

সিকন্দর শাহের মৃত্যু সম্বন্ধে 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' একটি অতি করুণ কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। সেটি এই :—

সিকন্দর শাহের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে সতেরটি পুত্র এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে একটিমাত্র পুত্র জন্মগ্রহণ করে। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রের নাম গিয়াসুদ্দীন, তিনি আদবকায়দা জানতেন ও অন্যান্য গুণে ভূষিত ছিলেন এবং তাঁর ভাইদের তুলনায় তিনি সবদিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। শাসনকার্য পরিচালনায়ও তিনি দক্ষ ছিলেন। তার ফলে তাঁর বিমাতা ঈর্ষ্যাপরায়ণা হয়ে উঠলেন এবং তাঁর অনিষ্ট করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। একদিন তিনি সুলতান সিকন্দর শাহের কাছে গিয়ে বললেন যে গিয়াসুদ্দীন পিতা ও ভ্রাতাদের বধ করে সিংহাসন অধিকারের মৎলব করছেন। অতএব তাকে বন্দী করা অথবা তার চোখ অন্ধ করে দেওয়া উচিত। সিকন্দর একথা শুনে বিরক্ত হলেন। তখন রাণী বললেন যে সুলতানের মঙ্গলের কথা ভেবেই তিনি একথা তাঁকে জানানো প্রয়োজন বোধ করেছেন। তাই শুনে সিকন্দর নিজের মনে বললেন, "গিয়াসুদ্দীন কর্তব্যপরায়ণ পুত্র এবং শাসনদক্ষতার অধিকারী। সে যদি আমার জীবন নিতে চায়, নিক্। পুত্র কর্তব্যপরায়ণ হলেই সুখের বিষয়। সে যদি কর্তব্যপরায়ণ না হয়, তাহলে ধ্বংস হোক্।" এর পরে তিনি গিয়াসুদ্দীনকে সম্পূর্ণভাবে রাজ্য পরিচালনার ভার দিলেন। কিন্তু গিয়াসুদ্দীন বিমাতার চাতুরী ও কৌশল সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সন্দিগ্ধ ছিলেন। একদিন শিকারের অছিলা করে তিনি সোনারগাঁওয়ে পালিয়ে গেলেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি এক বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করে পিতার কাছে সিংহাসন দাবী করলেন এবং তারপরে রাজ্য অধিকারের জন্য সৈন্যবাহিনী নিয়ে তিনি সোনারগাঁও থেকে রওনা হলেন এবং সোনারগড়িতে ঘাঁটি গাড়লেন। সিকন্দর শাহও এক শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলেন। পিতা-পুত্রের মধ্যে এখন আর বিন্দুমাত্রও ভালোবাসা ছিল না। গোয়ালপাড়ার প্রান্তরে দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হল। গিয়াসুদ্দীন তাঁর দলের লোকদের আদেশ দিয়েছিলেন সিকন্দরকে বধ না করে জীবিত অবস্থায় বন্দী করবার জন্য। কিন্তু তাদের মধ্যে একজন সিকন্দরকে না চিনে বধ করে ফেলল। যখন অন্য একজন লোক তাকে জানাল যে সে সিকন্দরকেই বধ করেছে, তখন সে ঐ লোকটির সঙ্গে

গিয়াসুদ্দীনের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কাউকে বধ না করলে যদি নিজে নিহত হতে হয়, তাহলে কি আমরা তাকে বধ করতে পারি?" গিয়াসুদ্দীন বললেন, "নিশ্চয়ই পার।" তারপর তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "যতদুর মনে হয় তোমরা সুলতানকেই বধ করেছ।" ঐ লোকটি বলল, "হ্যাঁ। না জেনে আমি সুলতানের বুকে বর্শা বিদ্ধ করেছি। এখনও তাঁর জীবনের কিছু অবশিষ্ট আছে।" গিয়াসুদ্দীন তখন তাড়াতাড়ি ঘোড়ায় চড়ে যেখানে তাঁর পিতা পড়েছিলেন, সেখানে গিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পিতার মাথা কোলে তুলে নিলেন। তাঁর গাল দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তিনি বললেন, "পিতা! চোখ খুলুন। আপনার অন্তিম অভিলাষ ব্যক্ত করুন। আমি তা পূর্ণ করব।" সিকন্দর চোখ খুলে বললেন, "আমার জীবনের কাজ শেষ হয়েছে। এ রাজ্য এখন তোমার। রাজা হিসাবে তুমি সমৃদ্ধি লাভ কর।" এই বলে তিনি প্রাণত্যাগ করলেন। গিয়াসুদ্দীন কয়েকজন অমাত্যকে পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্বাহের জন্য রেখে নিজে ঘোড়ায় চড়ে পাণ্ডুয়ায় গিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করলেন।

এই কাহিনীর খুঁটিনাটিগুলি সব সত্য কিনা তা বলা যায় না, তবে এর মূল ভিত্তি যে সত্য, তা আমরা গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের প্রসঙ্গের মধ্যে আলোচনা করে দেখাবার চেষ্টা করব।

বুকাননের বিবরণে 'রিয়াজে' প্রদত্ত এই কাহিনীর সমর্থন পাওয়া যায়। এতে আলা অল-হকের সোনারগাঁও-গমনের বর্ণনার (আগে উদ্ধৃত) ঠিক পরেই লেখা আছে, "...but the king's son, Ghyashudin, having also taken disgust, retired to the same place (Sonargang), and afterwards made war against his father, who, after a reign of 32 years, fell in battle at a place called Satra, near Goyalpara."

পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধে সিকন্দর শাহ যে নিহত হয়েছিলেন, 'রিয়াজ' ও বুকানন-বিবরণীর এই উক্তির সমর্থন একটি সমসাময়িক সূত্র থেকেও পাওয়া যাচ্ছে। বিহারের দরবেশ মুজঃফর শাম্‌স বল্‌খি গিয়াসুদ্দীন আজম শাহকে লেখা এক চিঠিতে সিকন্দর শাহকে "শহীদ সুলতান" (the Martyred Sultan) বলে উল্লেখ করেছেন।

কোন্ স্থানে পিতা-পুত্রের যুদ্ধ হয়েছিল, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন সূত্রের মধ্যে

মোটামুটি মতৈক্য আছে। তবে ঐ গোয়ালপাড়ার অবস্থান সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

সিকন্দর শাহের রাজত্বকালেই দিল্লীর সঙ্গে বাংলার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তার ফলে পরবর্তী সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ থেকে সুরু করে আলাউদ্দীন হোসেন শাহ পর্যন্ত সুলতানদের সম্বন্ধে দিল্লীর সমসাময়িক ঐতিহাসিকেরা প্রায় কিছুই লিপিবদ্ধ করেন নি।

গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ

ইলিয়াস শাহী বংশের একটি বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, এই বংশের প্রথম তিনজন রাজাই অত্যন্ত যোগ্য ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন। ইলিয়াস শাহ ও সিকন্দর শাহ প্রধানত যুদ্ধবিগ্রহ ও স্বাধীনতা রক্ষার মধ্যে নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ইলিয়াসের পৌত্র ও সিকন্দরের পুত্র গিয়াসুদ্দীন আজম শাহও পিতা ও পিতামহের মতই বাংলার শ্রেষ্ঠ সুলতানদের অন্যতম বলে গণ্য হবেন। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব যুদ্ধবিগ্রহের ক্ষেত্রে নয়, অন্য ক্ষেত্রে। বাংলার সমস্ত স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে তাঁর মত আকর্ষণীয় চরিত্র বোধহয় আর কারও নেই। লোকরঞ্জক ব্যক্তিত্বের দিক দিয়ে তাঁর তুলনা হয় না। তাঁর চরিত্রে নানারকম বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ হয়েছিল। এই সুলতানের যে সমস্ত কার্যকলাপের বিবরণ পাওয়া যায়, প্রায় প্রত্যেকটির মধ্যেই একটি উন্নত বৈচিত্র্যপ্রিয় রুচিমান্ বিদগ্ধ মনের পরিচয় মেলে। এঁর জীবনের কোন কোন ঘটনা এতই বিচিত্র যে সেগুলি থেকে এঁকে রূপকথার রাজপুত্রের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে হয়। এখন আমরা এই অনন্যসাধারণ নরপতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনায় অগ্রসর হব।

'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের রাজ্যাধিকার সম্বন্ধে যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তা যদি সত্য হয়, তাহলে বলতে হবে গিয়াসুদ্দীন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ও পিতাকে যুদ্ধে নিহত করে রাজা হয়েছিলেন। এই ব্যাপার আপাতদৃষ্টিতে ঘোরতর কৃতঘ্নতা ও মনুষ্যত্বহীনতার পরিচায়ক বলে মনে হয়, কারণ সিকন্দর শাহ গিয়াসুদ্দীনকে অত্যন্ত ভালবাসতেন, প্রথমা স্ত্রীর প্ররোচনা সত্ত্বেও তাঁর উপর বিরাগ পোষণ করেননি এবং গিয়াসুদ্দীনের উপরেই রাজ্য পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করেছিলেন। কিন্তু 'রিয়াজ'-এই লেখা আছে যে প্রথমা স্ত্রীর কথাতে সিকন্দর শাহের মন একটু টলেছিল;

এর পরেও যে তিনি গিয়াসুদ্দীনের উপরে রাজ্যের পরিচালনা-ভার অর্পণ করেছিলেন, তা বোধ হয় গিয়াসুদ্দীনকে পরীক্ষা করবার জন্যই ; এ ছাড়া গিয়াসুদ্দীনের বিমাতার চক্রান্তও সব সময় সক্রিয় ছিল। সম্ভবত এই সমস্ত কারণে গিয়াসুদ্দীন আত্মরক্ষার অনুরোধে সোনারগাঁওয়ে চলে গিয়েছিলেন। পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কারণ, তিনি সোনারগাঁওতে বেশীদিন পড়ে থাকলে পাণ্ডুয়ায় তাঁর বিমাতা ও বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা শক্তিশালী হয়ে উঠত, এবং তার ফলে তাঁর পক্ষে পিতার স্বাভাবিক মৃত্যুর পরে বাংলার রাজা হওয়া দুঃসাধ্য তো হতই, হয়তো সোনারগাঁও-ও হারাতে হত। পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেও গিয়াসুদ্দীন তাঁর অনুচরদের সিকন্দর শাহকে বধ করতে নিষেধ করেছিলেন। সুতরাং তাঁর মধ্যে কোন সময়েই মনুষ্যত্বের অভাব সূচিত হয় নি। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করলে গিয়াসুদ্দীনের আচরণ সম্পূর্ণ না হলেও আংশিকভাবে ক্ষমা করা যায়।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে 'রিয়াজে'র ঐ বিবরণ কতদূর সত্য? ঐ বিবরণের সমস্ত খুঁটিনাটিগুলি সত্য কিনা তা বলা যায় না। তবে মূল বিষয়টি সত্য। মূল বিষয়টির সমর্থন বুকাননের বিবরণ থেকে পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া গিয়াসুদ্দীন যে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাঁর জীবদ্দশায় বাংলাদেশের একাংশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছিলেন, তার কয়েকটি প্রমাণ আছে। সেগুলি এই,

(১) পূর্ববঙ্গের মুয়াজ্জমাবাদ এবং পশ্চিমবঙ্গের সাতগাঁওয়ের টাকশালে উৎকীর্ণ গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের এমন কতকগুলি মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে, যেগুলি সিকন্দর শাহের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ হয়েছিল।

(২) পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন টাকশালে উৎকীর্ণ সিকন্দর শাহের যে সমস্ত মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে, তাদের কোনটিই ৭৭৭ হিজরার পরবর্তী নয়।

এই দু'টি বিষয় থেকে মনে হয়, ৭৭৭ হিজরার পরবর্তী ও ৭৯৩ হিজরার পূর্ববর্তী কোন এক সময়ে গিয়াসুদ্দীন তাঁর পিতা সিকন্দর শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন এবং সোনারগাঁও ও সাতগাঁও সমেত বাংলার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের স্বাধীন রাজা হয়ে বসেছিলেন। কিন্তু এই দুটি বিষয় এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত প্রমাণ বলে গণ্য হতে পারে না। এ সম্বন্ধে অন্য যে প্রমাণ আছে, এখন তার উল্লেখ করছি।

'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' ইরানের বিখ্যাত কবি, হাফিজের সঙ্গে

গিয়াসুদ্দীনের যোগাযোগের একটি কাহিনী পাওয়া যায়। কাহিনীটি সংক্ষেপে এই। একবার সুলতান গিয়াসুদ্দীনের খুব কঠিন অসুখ হয়েছিল, বাঁচবার কোন আশা ছিল না। তিনি সে সময়ে সরুব্, গুল ও লালা নামে তাঁর হারেমের তিনটি মেয়েকে তাঁর মৃত্যুর পর শবদেহকে স্নান করাবার জন্য নির্বাচিত করেন। কিন্তু গিয়াসুদ্দীন সেবার সেরে উঠ্লেন, উঠে মেয়ে তিনটিকে তিনি আগের চেয়েও বেশী অনুগ্রহ করতে লাগলেন। কিন্তু অন্য মেয়েরা তাদের উপর ঈর্ষ্যান্বিত হয়ে শবদেহ স্নান করানোর ব্যাপার নিয়ে তাদের টিট্কারী মারত। একদিন সুলতানের মেজাজ যখন প্রফুল্ল ছিল, তখন ঐ তিনটি মেয়ে সুযোগ বুঝে সুলতানের কাছে অন্য মেয়েদের টিট্কারী মারার কথা জানাল। সুলতান সঙ্গে সঙ্গে এক ছত্র ফার্সী কবিতা রচনা করলেন। চরণটির ইংরেজী অনুবাদ এই,

"Cup-bearer, this is the story of sarv (the cypress), Gul (the Rose) and Lalah (The Tulip)."

কিন্তু সুলতান কবিতাটির দ্বিতীয় চরণ আর রচনা করতে পারলেন না, তাঁর সভার কোন কবিও পারলেন না। তখন সুলতান এই চরণটি লিখে একজন দূত মারফৎ ইরানের শিরাজ শহরে কবি হাফিজের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। হাফিজ সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় চরণটি রচনা করলেন; তার ইংরেজী অনুবাদ, "The story relates to the three corpse-washers"* হাফিজ এই সঙ্গে একটি গজলও লিখে পাঠালেন এবং গিয়াসুদ্দীন তার প্রতিদানে কবিকে অনেক উপহার পাঠালেন। 'রিয়াজ-উস্ সলাতীনে' এই গজলটি থেকে দুটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। শ্লোক দুটির ইংরেজী অনুবাদ এই,

The parrots of Hindustān shall all be sugar-shedding
From this Persian sugar-candy that goes forth to Bengal.
Hāfiz, from the yearning for the company of Sulṭān
Ghiāṣ-ud-dīn,
Rest not ; for thy (this) lyric is the outcome of lamentation.

* "...the word used for 'morning draughts' being the same as that used for 'corpse-washers'". (Cambridge History of India, Vol III, Ch. XI, p. 265)

শেষ শ্লোকটি থেকে মনে হয়, গিয়াসুদ্দীন হাফিজকে বাংলাদেশে আসবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন এবং আসতে না পারার জন্য হাফিজ দুঃখিত হয়েছিলেন।

'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' বর্ণিত অন্যান্য কাহিনীর মত এই কাহিনীরও সব খুঁটিনাটিগুলি সত্য কিনা, তা বলা যায় না, তবে মূল বিষয়টি—অর্থাৎ হাফিজের গজল লিখে গিয়াসুদ্দীনকে প্রেরণের কথা যে সত্য, তার প্রমাণ আছে। এই বিষয়ের উল্লেখ 'রিয়াজ উস্-সলাতীনে'র দু'শো বছর আগে রচিত 'আইন-ই-আকবরী'তেও পাওয়া যায়। 'আইন-ই-আকবরী'র দ্বিতীয় খণ্ডের ইংরেজী অনুবাদ থেকে প্রাসঙ্গিক অংশটুকু নীচে উদ্ধৃত করছি,

"On Sikandar's death his son was elected to succeed him and was proclaimed under the title of Ghiyāsu'ddin. Khāwajah Hafiz of Shirāz sent him an ode in which occurs the following verse :

And now shall India's parroquets on sugar revel all,
In this sweet Persian lyric that is borne to far Bengal."

(Ain-i-Akbari, Vol. II, Jarrett's translation,
2nd Edition, p. 161)

সুতরাং ষোড়শ শতাব্দী থেকেই আমরা বিভিন্ন সূত্রে আলোচ্য কাহিনীটির উল্লেখ পাচ্ছি। কিন্তু হাফিজের নিজের লেখাই এসম্বন্ধে সবচেয়ে বড় প্রমাণ। হাফিজের মৃত্যুর সামান্য পরে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু মুহম্মদ গুল-অন্দাম 'দিওয়ান-ই-হাফিজ' নামে যে হাফিজ-রচিত গানের সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তার মধ্যে বাংলার সুলতান গিয়াসুদ্দীনকে প্রেরিত গজলটি সম্পূর্ণ আকারে পাওয়া যায়। তার মধ্যে 'আইন-ই-আকবরী' এবং 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' উদ্ধৃত শ্লোকগুলিও রয়েছে। এইচ ডব্লিউ ক্লার্ক এই গজলটির যে ইংরেজী অনুবাদ করেছেন, তা নীচে উদ্ধৃত করলাম,

"Saki ! the tale of the cypress and the rose and the
tulip—goeth.
And with the three washers (cups of wine),
this dispute—goeth.

Drink wine ; for the new bride of the sward hath found beauty's limit (is perfect in beauty).
Of the trade of the broker, the work of this tale—goeth.
Sugar-shattering (verse of Hāfiz devouring), have become all the parrots (poets) of Hindustān,
On account of this Farsī candy (sweet Persian ode) that to Bangal—goeth.
In the path of verse, behold the travelling of place and of time !
This child (ode) of one night, the path of (travel of) one year (to Bengal)—goeth.
That eye of sorcery (of the beloved) 'Ābid fascinating behold.
How, in its rear, the Kārvān of sorcery—goeth.
Sweat expressed, the beloved proudly moveth ; and on the face of the white rose,
The sweat (drops) of night dew from shame of his (the beloved's) face—goeth.
From the path, go not to the world's blandishments. For this old woman
Sitteth a cheat ; and a bawd, She—goeth.
Be not like Sāmirī, who beheld gold ; and, from assishness,
Let go Mūsā ; and, in pursuit of the (golden) calf,— goeth.
From the king's garden, the spring-wind bloweth :
And within the tulip's bowl, wine from dew—goeth.
Of love for the assembly of the Sulṭān Ghiyāṣu-d-Dīn, Ḥāfiẓ !
Be not silent. For, from lamenting, the work—goeth."

(Dīvān-i-Ḥāfiẓ, translated by H. W. Clarke, 1891, Vol. I, pp. 310-311)

এপর্যন্ত আবিষ্কৃত 'দিওয়ান-ই-হাফিজে'র অসংখ্য পুথিতে এই গজলটি পাওয়া গিয়েছে। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে মীর্জা মুহম্মদ কজবীনী এবং ডঃ কাসিম গনী 'দিওয়ান-ই-হাফিজে'র যে শ্রেষ্ঠ ও প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করেন, তার মধ্যে তাঁরা বিপুল পরিশ্রম করে নানারকম প্রমাণের কষ্টিপাথরে যাচাই করে হাফিজের নামে প্রচলিত গানগুলির মধ্যে কোন্‌গুলি তাঁর স্বরচিত, তা নির্ণয় করেছেন ; আলোচ্য গজলটিকে তাঁরা হাফিজের নিজের রচনা বলেই স্বীকার করেছেন (Fifty poems of Hafiz, edited by Arthur J. Arberry, Cambridge, 1953, pp. 10-11, 104-105, 160-161 দ্রষ্টব্য)। এই গজলটি হাফিজের শ্রেষ্ঠ রচনাবলীর অন্যতম এবং Fifty poems of Hafiz প্রভৃতি সংকলনগ্রন্থে এটি স্থান পেয়েছে। হাফিজের নিজের লেখা এই গজলটিতে বলা হয়েছে যে পদটি বাংলাদেশে যাচ্ছে এক বছরের পথ অতিক্রম করে (সে সময়ে ইরান থেকে বাংলাদেশে আসতে এক বছরই সময় লাগত) ; সুলতান গিয়াসুদ্দীনের নামও হাফিজ এই গজলে প্রীতির সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং হাফিজ কর্তৃক বাংলার সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহকে গজল লিখে পাঠানো একটা ঐতিহাসিক ঘটনা।*

এই ঘটনা থেকে যেমন গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের কাব্যামোদিতার পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি আবার পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বাংলাদেশের একাংশে তাঁর স্বাধীনভাবে রাজত্ব করার কথাও প্রমাণিত হয়। কারণ,

* কোন কোন আধুনিক গবেষকের মতে হাফিজের এই গজলে উল্লিখিত সুলতান গিয়াসুদ্দীন আসলে বাহ্‌মনী রাজ্যের সুলতান দ্বিতীয় মুহম্মদ শাহ। কিন্তু বাহ্‌মনীর সুলতান মুহম্মদ (ফিরিশ্‌তায় "মাহ্‌মুদ" নামে উল্লিখিত) শাহের সঙ্গে হাফিজের যোগাযোগের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি কাহিনী 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা'য় লিপিবদ্ধ হয়েছে, তার মধ্যে আলোচ্য ব্যাপারের কোন উল্লেখ নেই ; আর ঐ সুলতানের নাম 'গিয়াসুদ্দীন' ছিল না। গিয়াসুদ্দীন শাহ নামেও বাহ্‌মনী রাজ্যে একজন সুলতান ছিলেন, কিন্তু তিনি হাফিজের মৃত্যুর আট বছর পরে—৭৯৯ হিজরায় মাত্র মাস দেড়েকের জন্য সিংহাসনে আরোহণ করেন (J.B.O.R.S., 1941, pp. 455-469 দ্রষ্টব্য)। আবার কোন কোন গবেষকের মতে হাফিজের গজলে উল্লিখিত গিয়াসুদ্দীন হীরাটের রাজপুত্র গিয়াসুদ্দীন পীর আলী, কিন্তু হাফিজ স্পষ্ট লিখেছেন তাঁর এই গজল এক বছরের পথ অতিক্রম করছে· স্বল্পদূরবর্তী হীরাটে গজলটি প্রেরিত হলে তিনি একথা লিখতেন না। এই দু'দল গবেষকের মধ্যে কেউই লক্ষ করেননি যে —হাফিজ গজলটিতে বলেছেন যে এটি বাংলা দেশে যাচ্ছে এবং 'আইন-ই-আকবরী'র মত প্রাচীন গ্রন্থে লেখা আছে যে হাফিজ বাংলার সুলতান গিয়াসুদ্দীনকে এই গান পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং এই সমস্ত গবেষকের স্বকপোলকল্পিত মত একেবারেই মূল্যহীন।

সিকন্দর শাহের ৭৯২ হিজরা অবধি তারিখের মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু হাফিজ যে ৭৯১ হিজরা বা ১৩৮৯ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন, তা তাঁর সমাধি-ফলকের লিপি এবং তাঁর বন্ধু মুহম্মদ গুল-অন্দামের লেখা 'দিওয়ান-ই-হাফিজে'র ভূমিকা থেকে প্রামাণিকভাবে জানা যায়। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, সিকন্দর শাহের জীবদ্দশাতেই গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ বাংলাদেশের একাংশে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করছিলেন এবং এই সময় তিনি নিজেকে বাংলার সুলতান বলে ঘোষণা করেছিলেন। এই সময়েই কবি হাফিজের সঙ্গে তাঁর সংযোগ স্থাপিত হয় এবং হাফিজ তাঁকে গজল লিখে পাঠান। কোন্ বছরে এই ঘটনা ঘটেছিল, তা সঠিকভাবে বলা যায় না; কোন কোন গবেষকের মতে গিয়াসুদ্দীন ৭৯০ হিজরা বা ১৩৮৮ খ্রীষ্টাব্দে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন; এই মত ঠিক হলে বলতে হবে, স্বাধীন রাজা হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করার অব্যবহিত পরেই গিয়াসুদ্দীন হাফিজকে চিঠি লেখেন এবং গিয়াসুদ্দীনকে গজল পাঠানোর অব্যবহিত পরেই হাফিজের মৃত্যু হয়। অবশ্য গিয়াসুদ্দীন ৭৯০ হিজরার আগেই স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন বলে মনে হয়।

সিকন্দর শাহকে যুদ্ধে পরাজিত করে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ সমগ্র বাংলার সিংহাসন অধিকার করেছিলেন, 'রিয়াজ'-এর ও বুকাননের বিবরণীর এই উক্তির পিছনে অন্য প্রমাণ না থাকলেও এই ব্যাপার খুবই সম্ভাব্য।

৭৯২ অথবা ৭৯৩ হিজরায় সিকন্দরের মৃত্যু ঘটে এবং গিয়াসুদ্দীন সারা বাংলার অধীশ্বর হন। 'রিয়াজ'-এ লেখা আছে যে সিংহাসনে আরোহণ করার পর "প্রথমে তিনি তাঁর বৈমাত্রেয় ভায়েদের চোখ অন্ধ করে তাদের মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন এবং নিজেকে ভায়েদের চক্রান্ত থেকে মুক্ত করলেন।" কিন্তু বুকাননের বিবরণীর মতে গিয়াসুদ্দীন ভাইদের অন্ধ করেননি, বধ করেছিলেন; এতে লেখা আছে, "Ghyashudin, on succeeding to the government, put seventeen brothers to death."

'রিয়াজ'-এর মতে রাজা হয়ে বসবার পরে গিয়াসুদ্দীন ন্যায়বিচার করতে থাকেন। এই বইয়ের মতে গিয়াসুদ্দীন সুশাসক ছিলেন এবং ঐস্লামিক আইনের বিধিনিষেধ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। তাঁর ন্যায়পরায়ণতা সম্বন্ধে 'রিয়াজ'-এ একটি কাহিনী উল্লিখিত হয়েছে। কাহিনীটি সর্বজনপরিচিত।

কিন্তু অনেকে এটিকে খানিকটা বিকৃত রূপ দিয়ে তাঁদের বইয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন। আমরা 'রিয়াজ-উস্-সলাতীন' থেকে কাহিনীটি হুবহু অনুবাদ করে দিলাম,

"একদিন তীর ছোঁড়বার সময় সুলতানের তীর আকস্মিকভাবে এক বিধবার পুত্রকে আঘাত করে। বিধবা কাজী সিরাজুদ্দীনের কাছে এর প্রতিকার প্রার্থনা করে। কাজী চিন্তিত হলেন। কারণ তিনি যদি রাজার প্রতি পক্ষপাত দেখান, তাহলে ভগবানের বিচারশালায় তিনি অপরাধী বলে গণ্য হবেন। আর যদি তা না দেখান, তা' হ'লে রাজাকে বিচারালয়ে আহ্বান করা কঠিন কাজ হবে। অনেক বিচার-বিবেচনার পরে রাজার কাছে সমন জারী করার জন্য তিনি একজন পেয়াদা পাঠালেন এবং নিজে আদালতে বিচারকের মসনদে বসলেন, মসনদের তলায় একটি বেত রেখে দিয়ে। প্রাসাদে পৌছে কাজীর পেয়াদা দেখল রাজার কাছে যাওয়া অসম্ভব, সে তখন চীৎকার করে আজান দিতে সুরু করল। রাজা অসময়ে এই আজানধ্বনি শুনে মুঅজ্জিনকে (যে আজান দেয়) তাঁর কাছে নিয়ে আসতে আদেশ দিলেন। যখন রাজার ভৃত্যেরা ঐ পেয়াদাকে রাজার কাছে নিয়ে গেল, রাজা তাকে অসময়ে আজান দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলল, 'কাজী সিরাজুদ্দীন আমাকে পাঠিয়েছেন, রাজাকে বিচারালয়ে নিয়ে যাবার জন্য। রাজার কাছে আসতে পারা কঠিন বলে আমি (এখানে) প্রবেশ লাভের জন্য এই উপায় অবলম্বন করেছি। এখন উঠুন এবং বিচারালয়ে চলুন। আপনি যে বিধবার ছেলেকে তীর মেরে আহত করেছেন, সে-ই অভিযোগ করেছে।' সুলতান তক্ষণি উঠলেন এবং বগলের নীচে একটি ছোট তলোয়ার লুকিয়ে প্রাসাদ থেকে বেরোলেন। যখন সুলতান কাজীর সামনে উপস্থিত হলেন, কাজী তাঁকে কিছুমাত্র খাতির না করে বললেন, 'এই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের হৃদয়কে শান্ত করুন।' রাজার পক্ষে যা সম্ভব ছিল সেই উপায়ে (অর্থাৎ প্রচুর অর্থ দিয়ে) বৃদ্ধাকে শান্ত করে রাজা বললেন, 'কাজী! এখন বৃদ্ধা সন্তুষ্ট হয়েছে।' কাজী বৃদ্ধার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি ক্ষতিপূরণ পেয়েছ এবং সন্তুষ্ট হয়েছ?' স্ত্রীলোকটি বলল, 'হ্যাঁ! আমি সন্তুষ্ট হয়েছি।' তখন কাজী মহানন্দে উঠে দাঁড়ালেন এবং রাজাকে শ্রদ্ধা দেখিয়ে মসনদে বসালেন। রাজা বগল থেকে তলোয়ার বার করে বললেন, 'কাজী! আমি পবিত্র আইনের বিধান পালনে বাধ্য বলে তোমার বিচারালয়ে এসেছি। আজ যদি আমি তোমাকে আইনের নির্দেশের

প্রতি নিষ্ঠা থেকে একচুল বিচ্যুত হতে দেখতাম, তাহলে এই তলোয়ার দিয়ে তোমার মাথা কেটে ফেলতাম। ভগবানকে ধন্যবাদ, সমস্তই ঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে।' কাজীও মসনদের তলা থেকে তাঁর বেতখানা বার করে বললেন, 'হুজুর! যদি আপনাকে আজ আমি পবিত্র আইনের বিধান সামান্যমাত্রও লঙ্ঘন করতে দেখতাম—তাহলে, ভগবানের দোহাই, এই বেত দিয়ে আমি আপনার পিঠ ক্ষতবিক্ষত করে দিতাম।' (অর্থাৎ, আসামী যদি আদালতের নির্দেশ লঙ্ঘন করে, তাহলে তার প্রাপ্য শাস্তি বেত্রদণ্ড; সুলতান আদালতের নির্দেশ না মানলে কাজী তাঁকেও সেই শাস্তি দিতেন; অবশ্য, সুলতানকে বেত্রাঘাত করলে কাজীকে সুলতান হয়তো বধ করতেন; কিন্তু কাজীর কাছে নিজের জীবনের চেয়েও আইনের মর্যাদা বড়।) এই বলে কাজী বললেন, 'একটি বিপদ এসেছিল, কিন্তু ভালয় ভালয় শেষ হয়েছে।' রাজা খুশী হয়ে কাজীকে অনেক উপহার ও পারিতোষিক দিয়ে ফিরে এলেন।"

এই চমৎকার গল্পটি 'রিয়াজ-উস্-সলাতীন' ভিন্ন অন্য কোন সূত্রে এপর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তাই এটি কতদূর সত্য, তা বলার কোন উপায় নেই। তবে গল্পটি অত্যন্ত মধুর। এটি যদি সত্য হয়, তাহলে এরকম ঘটনা আমাদের দেশে অতীতকালে ঘটেছিল বলে আমরা গর্বিত হতে পারি। কাজী সিরাজুদ্দীনের মত বিচারক যে কোন দেশেরই গৌরব। সুলতান গিয়াসুদ্দীনেরও ন্যায়নিষ্ঠা এই গল্পটিতে অতুলনীয় রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। বিহারের দরবেশ মুজাফফর শাম্স বলখি গিয়াসুদ্দীন আজম শাহকে যে সমস্ত চিঠি লিখেছিলেন, তাদের অনেকগুলি থেকে জানা যায় যে গিয়াসুদ্দীন সত্যই ন্যায়নিষ্ঠ ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন। আলোচ্য গল্পটিতে গিয়াসুদ্দীনের চরিত্র যেভাবে ফুটেছে, সেইটিই তাঁর আসল রূপ বলে মনে করতে ইচ্ছা যায়।

পিতামহ ইলিয়াস শাহ ও পিতা সিকন্দর শাহের মত গিয়াসুদ্দীন আজম শাহও মুসলিম সন্তদের অত্যন্ত ভক্তি করতেন। পূর্বোক্ত আলা অল হকের পুত্র নূর কুৎব্ আলম গিয়াসুদ্দীনের সমসাময়িক ছিলেন। 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' লেখা আছে, "রাজার (গিয়াসুদ্দীন) প্রথম থেকেই সন্ত নূর কুৎব্ উল-আলমের উপর বিরাট আস্থা ছিল; তিনি তাঁর সমসাময়িক এবং সহপাঠী ছিলেন; দুজনেই শেখ হামিদুদ্দীন কুন্জ্নশীন নগোরীর কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন।" বুকাননের বিবরণীতে লেখা আছে, "The most holy man at his court was Mukdum Shah Nur Kotub Alum, son of

Alalhuk." এই কথা সত্য হলে বলতে হবে, গিয়াসুদ্দীনের সভায় অনেক দরবেশ উপস্থিত থাকতেন এবং নূর কুৎব্ আলম ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধানতম।

নূর কুৎব্ আলমের শিষ্য শেখ হুসামুদ্দীন মানিকপুরীর বাণী ও উপদেশের সংগ্রহ-গ্রন্থ 'রফীক অল-আরেফীন' থেকে জানা যায় যে নূর কুৎব্ আলম ও গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, গিয়াসুদ্দীন প্রায়ই নূর কুৎব্ আলমের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ ও উপদেশ চাইতেন। 'রফীক অল-আরেফীন'-এ লেখা আছে, একদিন সুলতান গিয়াসুদ্দীন কুৎব্ আলমকে প্রশ্ন করেন যে—'হাদিস্'-এ বলা হয়েছে, আচারনিষ্ঠাপালনকারী এবং আচার-নিষ্ঠাবর্জনকারী দুই ধরনের লোকই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অভিশপ্ত বলে গণ্য হতে পারে ; এই উক্তির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে যে স্ববিরোধ দেখা যায়, তা নিরসনের উপায় কী ? এর উত্তরে নূর কুৎব্ আলম বলেন যে প্রথমটি রাজা ও অমাত্যদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য, অর্থাৎ তারা নিজেদের কর্তব্য-কর্মে অবহেলা করে আচারনিষ্ঠা নিয়ে পড়ে থাকলে ঈশ্বরের অভিশাপ লাভ করবে, আর দ্বিতীয়টি দরবেশদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য অর্থাৎ তারা আচারনিষ্ঠা বর্জন করলে ঈশ্বরের কাছে অভিশপ্ত হবে ; ঈশ্বরসৃষ্ট প্রাণীদের প্রতি ভাল ব্যবহার এবং ন্যায়বিচার করা রাজা ও অমাত্যদের প্রাথমিক কর্তব্য, অন্য কোন কাজে নিয়োজিত থাকার জন্যে যদি সেই কর্তব্যে বাধা পড়ে, তবে তা বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। 'রফীক অল-আরেফীন'-এর আর এক জায়গায় শিষ্যদের প্রতি শেখ হুসামুদ্দীন মানিকপুরীর এই উক্তিটি দেখতে পাওয়া যায়, "একদিন বাংলার সুলতান গিয়াসুদ্দীন হজরৎ কুৎব্ আলমের কাছে এক বারকোষ-ভর্তি খাবার পাঠান ; কুৎব্ আলম তা নিজের হাতে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেন। ঐহিক জগতের রাজার প্রতি ধর্মজগতের রাজার এই ব্যবহার আমার কাছে অদ্ভুত লাগল ; পরের দিন হজরৎ কুৎব্ আলম আমাকে 'মসাবিহ্' আনতে বললেন, আমার তখন হঠাৎ মনে হল আমি তাঁর অসন্তোষ উদ্রেক করেছি। হজরৎ কুৎব্ আলম ঐ বইয়ের পাতা খুলে রসুলের 'যে তার নেতাকে শ্রদ্ধা করে, সে তাঁকেই শ্রদ্ধা করে…' এই উক্তিটি পড়লেন ; তারপর তিনি বললেন, 'আমরা রাজা এবং রাজপুরুষদেরও শ্রদ্ধা করি, যাতে আমাদের সন্তানেরা আমাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করে তাঁদের প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শন করে'।" (এই বইয়ে 'রফীক অল-আরেফীন'-এর যে সমস্ত উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে, সেগুলির জন্য

Current Studies, No. 1, May 1953, pp. 4-11-তে প্রকাশিত অধ্যাপক সৈয়দ হাসান আস্‌কারির প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

আগেই আমরা বলেছি, দরবেশদের প্রাচীন জীবনীগ্রন্থ 'অখবার অল-আখিয়ার'-এ লেখা আছে যে নূর কুৎব্ আলমের ভ্রাতা আজম খান সুলতানের উজীর ছিলেন। আজম খান নাকি নূর কুৎব্ আলমকে রাজদরবারে একটি উচ্চ পদ দিতে চান, কিন্তু নূর কুৎব্ তা প্রত্যাখ্যান করেন।

আর একজন দরবেশকে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ্ বিশেষ ভক্তি করতেন। তাঁর নাম মুজাফফর শাম্‌স্ বল্‌খি। এঁর নিবাস ছিল বিহারে। ইনি শুধু দরবেশ ছিলেন না, একজন মস্ত বড় পণ্ডিতও ছিলেন। গিয়াসুদ্দীন আজম শাহকে ইনি অনেকগুলি চিঠি লিখেছিলেন। তার মধ্যে বারোটি চিঠি অধ্যাপক সৈয়দ হাসান আস্‌কারি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন এবং Correspondence of the two 14th century Sufi Saints of Bihar with the contemporary sovereigns of Delhi and Bengal প্রবন্ধে তাদের পরিচয় দিয়েছেন (Proceedings of the Nineteenth session of Indian History Congress, 1956, pp. 206-224 দ্রষ্টব্য। অতঃপর বিভিন্ন চিঠির উল্লেখের সময় আমরা এই Proceedings-এর পৃষ্ঠাসংখ্যা উল্লেখ করব।) এই চিঠিগুলির প্রত্যেকটিতেই মুজাফফর শাম্‌স্ বল্‌খি গিয়াসুদ্দীনকে ভগবানের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে, ইস্‌লামের বিধিনিষেধ নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করতে, কোরাণের শিক্ষা গ্রহণ করতে, প্রত্যহ নিয়মিতভাবে প্রার্থনা ও অন্যান্যভাবে ভগবদ্‌ভক্তি প্রকাশ করতে, রাজার কর্তব্য পালন করতে এবং ন্যায়বিচার করতে উপদেশ দিয়েছেন, সেই সঙ্গে ঐ সব কাজের পন্থা ও পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। একটি চিঠিতে (p. 214) তিনি লিখেছেন, "বন্ধু! ধর্মের বিধানগুলিকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাক। ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ কর এবং তাঁরই কাছে আশ্রয় গ্রহণ কর। যে সমস্ত প্রার্থনা করা দরকার এবং এই চিঠিতে আমি যে সব প্রার্থনার কথা লিখেছি, তা করতে হবে।" আর একটি চিঠিতে (p. 222) তিনি লিখেছেন, "রাজার এই গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থনা উত্তরোত্তর অধিকভাবে করা উচিত, 'ভগবান! আমার হৃদয় এবং জিহ্বাকে ঠিক রাখবার শক্তি দাও এবং আমাকে দিয়ে মুসলমানদের কাজ ঠিকভাবে করাও ও বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত কর।' এই চিঠিতে বল্‌খি গিয়াসুদ্দীনকে ৪০ দিন ধরে যাবতীয় পাপ থেকে

বিরত থাকতে* এবং ঈশ্বরের দয়া ভিক্ষা করতে উপদেশ দিয়েছেন। এছাড়া এই দরবেশ একাধিক চিঠিতে গিয়াসুদ্দীনকে হজরৎ মুহম্মদের এই বাণী স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে এক মুহূর্তের ন্যায়বিচার ৬০ বছরের প্রার্থনা ও ভক্তি-প্রকাশের চেয়েও উৎকৃষ্ট। তিনি তাঁর বিভিন্ন চিঠিতে গিয়াসুদ্দীনকে এই রকম বহু উপদেশ দিয়েছেন। সবচেয়ে বেশী উপদেশ দিয়েছেন তাঁর শেষ চিঠিতে। এটি অত্যন্ত দীর্ঘ এবং পুঁথির ১৫ পৃষ্ঠা জুড়ে লেখা হয়েছে। বল্‌খি চিরদিনের মত দেশ ছেড়ে মক্কায় চলে যাবার আগে এই চিঠিটি লেখেন বলে এর মধ্যে তিনি গিয়াসুদ্দীনকে এত উপদেশ দিয়েছেন।

এই চিঠিগুলি থেকে গিয়াসুদ্দীন ও তাঁর পিতা সিকন্দর শাহ সম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান তথ্য পাই। চিঠিগুলি গিয়াসুদ্দীনের চরিত্র সম্বন্ধে যে আলোকপাত করেছে, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি চিঠিতে (p. 213) মুজাফফর শামস্ বল্‌খি গিয়াসুদ্দীনকে "আমার সমৃদ্ধিশালী পুত্র" বলে সম্বোধন করেছেন এবং ফিরোজ শাহ তোগলকের মৃত্যুর পর দিল্লীতে যে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তার বর্ণনা দিয়েছেন। এই চিঠিতেই বল্‌খি লিখেছেন যে শেখ-উল ইস্‌লাম শরফুল্ হক্ ওয়াদ্দীন (বিহারের আর একজন বিখ্যাত দরবেশ, ইনি শরফুদ্দীন য়াহিআ মনেরি নামেই বেশী পরিচিত ছিলেন) বাংলাদেশকে খুব ভালবাসতেন এবং যৌবনে তিনি বাংলাদেশে বাস করেছিলেন ; তিনি "শহীদ সুলতানে"র (অর্থাৎ সিকন্দর শাহ) উপর অত্যন্ত প্রসন্ন ও সন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাঁকে তিনি প্রায়ই স্বেচ্ছায় ও সানন্দে চিঠি লিখতেন। এই চিঠিতেই মুজাফফর শাম্‌স্ বল্‌খি গিয়াসুদ্দীনকে লিখেছেন, "তুমি রাজা এবং যুবক। অতীতে কিছুকাল তুমি সুখ এবং আমোদ-প্রমোদে নিমগ্ন ছিলে, কিন্তু এখন তুমি পবিত্র ও ধর্মনিষ্ঠ জীবন কামনা করছ।" গিয়াসুদ্দীন একবার কোন একটি যুদ্ধে লিপ্ত হন। মুজাফফর শাম্‌স্ বল্‌খি এই সময় গিয়াসুদ্দীনকে লেখেন (p. 216), "তোমার শত্রুরা পরাজিত, বিপর্যস্ত এবং অমর্যাদা-লিপ্ত হোক্।" আর একটি চিঠিতে (p. 217) তিনি লেখেন, "আমি তুচ্ছ লোক। রাজার সেবা করার মত কিছুই আমার নেই, দু'টি সুসজ্জিত ঘোড়া পর্যন্ত নেই, থাকলে আমি রাজার জন্য যুদ্ধ করতে পারতাম।"

কয়েকটি চিঠি থেকে জানা যায় যে মুজাফফর শাম্‌স্ বল্‌খি যখন শেষবার মক্কায় যান, তখন চট্টগ্রাম বন্দর থেকে যাত্রা করেন। কিন্তু তার আগে তাঁকে

* সারা জীবন ধরে নয় কেন ?

দীর্ঘ দু'বছর গিয়াসুদ্দীনের রাজ্যে কাটাতে হয়। বল্‌খি এই সময় অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর চুল পেকে গিয়েছিল, দাঁত শিথিল হয়ে গিয়েছিল। এর কয়েক বছর বাদে—৮০৩ হিজরায় তিনি এডেনে পরলোক গমন করেন। তাঁর সন্তানও ছিল না, অর্থ বা শক্তিও ছিল না। মক্কায় গিয়ে দেহত্যাগ করা ও সেখানে কবরস্থ হওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। গিয়াসুদ্দীন তাঁকে যে সমস্ত মূল্যবান উপহার শ্রদ্ধার্ঘ্যস্বরূপ দিয়েছিলেন, তার অধিকাংশই তিনি অন্য লোকদের দান করেন এবং অবশিষ্ট অংশ পথ-খরচার জন্য রেখে দেন। গাঙ্গুরা নামক জায়গায় বল্‌খি গিয়াসুদ্দীনের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। এর পর চট্টগ্রামে থাকার সময় বল্‌খি শহরের বাইরে একটি আলাদা এবং বাতাসভরা বেওয়ারিশ বাড়ীতে বাস করেছিলেন। চট্টগ্রামে তিনি মাসাধিককাল ছিলেন। চট্টগ্রাম থেকে বল্‌খি সুলতান গিয়াসুদ্দীনকে একটি চিঠি (p. 218) লিখে চট্টগ্রামের কারকুনদের কাছে এক ফরমান পাঠাতে অনুরোধ জানান, যাতে তারা প্রথম জাহাজেই মক্কাযাত্রী দরবেশদের স্থান করে দেয়। এর থেকে বোঝা যায়, চট্টগ্রাম ঐ সময় গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সম্ভবত গিয়াসুদ্দীন বল্‌খিকে একাধিক ফরমান পাঠিয়েছিলেন। একটি ফরমানের সঙ্গে তিনি বল্‌খির কাছে একটি পোশাক পাঠিয়েছিলেন, বল্‌খি সেটি পরিধান করে সুলতানের জন্য ঈশ্বরের কাছে দু'বার হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা জানান। আর একটি ফরমানের সঙ্গে গিয়াসুদ্দীন একটি গজল পাঠিয়েছিলেন, তাতে বল্‌খির বিচ্ছেদে গিয়াসুদ্দীনের মনোবেদনা উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষায় অভিব্যক্ত হয়েছিল। বল্‌খি এটি পড়ে বিহ্বল হন এবং সুলতানকে লেখেন, "আমার হাতে কার্যের কর্তৃত্ব থাকলে আমি রাজার (গিয়াসুদ্দীনের) এলাকা ছেড়ে চলে যেতাম না। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছার কাছে মানুষের ইচ্ছা হার মানে। গজলের প্রত্যেকটি শব্দ এক একটি শর।" (p. 221) কাব্যামোদী সুলতান গিয়াসুদ্দীন যে নিজেও কবি ছিলেন ও গজল লিখতেন, সে কথা 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে' পাওয়া যায়, এখন এই সমসাময়িক চিঠি থেকে তার সাক্ষাৎ প্রমাণ পাওয়া গেল। এই চিঠিতেই মুজাফফর শাম্‌স্ বল্‌খি গিয়াসুদ্দীন আজম শাহকে লিখেছেন, "আমার মতে পৃথিবীর সমস্ত রাজাদের মধ্যে তুমিই ভগবানের এই সমস্ত আশীর্বাদ (ভগবদ্ভক্তি, কবিত্বশক্তি প্রভৃতি) লাভ করেছ, কারণ তুমি অনেক ভালবাসা পেয়েছ এবং জনপ্রিয় হয়েছ। কোন কোন

লোক (রাজা) তাদের রাজ্যের জন্য গর্ববোধ করে। বিধর্মীরা যেমন রাজ্য পায় তারা ঠিক্ তেমনিভাবেই রাজ্য পেয়েছে। কিন্তু তোমার যেরকম বিদ্যা, মহত্ত্ব, উদারতা, নির্ভীক হৃদয় এবং সিংহের মত সাহস প্রভৃতি গুণ আছে, তাদের তা নেই।" গিয়াসুদ্দীন সম্বন্ধে মুজাফফর শামস্ বল্‌খির এই প্রশংসোক্তি খুব মূল্যবান। কারণ বল্‌খি চাটুকার ছিলেন না। তিনি অর্থ বা সম্মান কোন কিছুই চাইতেন না। সুলতান অযাচিতভাবে তাঁকে অর্থ বা উপহার দিলে তিনি তক্ষণি তা গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। যে সমস্ত আলিম রাজাদের সভায় যেতেন, তিনি তাঁদের নিন্দা করতেন তাঁরা তাঁদের বিদ্যার অমর্যাদা করেছেন বলে। সুতরাং বল্‌খি গিয়াসুদ্দীনের চরিত্র সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা সম্পূর্ণ সত্য, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর কথা যে সত্য, তা গিয়াসুদ্দীনের অন্যান্য কার্যকলাপ থেকেও প্রমাণিত হয়।

একবার গিয়াসুদ্দীন বল্‌খিকে একটি ফরমান পাঠান এবং সেই সঙ্গে অনুরোধ জানান, তিনি যেন তাঁর রাজ্যে আরও কিছুকাল থাকেন। এতে বল্‌খি ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হয়ে লেখেন, "বন্ধু ! যখন আমি যাত্রা সুরু করেছি, কী করে তার পরিবর্তন করতে পারি?……(আর) অবস্থান করা যুক্তিযুক্ত নয় এবং তা আমার অবস্থার সঙ্গে খাপ খায় না ……দেরী করা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। আমি রসুলকে স্বপ্নে দেখেছি, তিনি তিনবার আমায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।……অতএব আমি আমার অনুবর্তী এবং আশ্রিত লোকদের নিয়ে চলে যাচ্ছি। তুমি যদি ফকিরদের যাত্রার দেরী করিয়ে তাদের মন না ভেঙে দিয়ে তাদের হৃদয় বুঝে তার তৃপ্তিবিধান করতে পারতে, তাহলেই ভাল হত। (pp. 218-219)

আর একটি ফরমান পেয়ে খুশী হয়ে বল্‌খি গিয়াসুদ্দীনকে লেখেন, "রাজকীয় ফরমানটি নানারকম জ্ঞানের মণিমুক্তায় পরিপূর্ণ। তার সঙ্গে এই চতুষ্ক শ্লোকটি (quatrain) আছে, 'যদি তুমি আধ্যাত্মিক কামনার মদে মাতাল হয়ে থাক, যদি তুমি স্বর্গীয় প্রেমে চিরমত্ত হয়ে থাক, এই ভিখারীর পাত্রে তার একটি ফোঁটা ফেলে দাও।'……যদিও আমি প্রকৃতিস্থ ছিলাম, এই শ্লোকটি আমার মনে মহা উল্লাস জাগিয়ে তুলল।" (p. 221) এই চিঠিটি থেকে গিয়াসুদ্দীনের পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব সম্বন্ধে আর একটি প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। বল্‌খি এই চিঠিতে লিখেছেন যে গিয়াসুদ্দীন তাঁকে যে আলখাল্লা ও পাগড়ী পাঠিয়েছেন, তা তিনি পরিধান করেছেন এবং তার বিনিময়ে তিনি তাঁকে একটি আয়না উপহার

দিচ্ছেন ; যে শেখের তিনি সেবা করেছিলেন, তিনি এই আয়নায় মুখ দেখতেন বলে বল্‌খি এই আয়নাটিকে তাঁর পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে যত্নে রক্ষা করেছিলেন ; এটি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। কেউ বল্‌খিকে কিছু দান করলে তিনি তাঁর সাধ্যমত প্রতিদান দেবার চেষ্টা করতেন। সর্বশেষ চিঠিতে বল্‌খি গিয়াসুদ্দীনকে লেখেন যে তিনি চিরদিনের মত চলে যাচ্ছেন বলে এই চিঠিতে তাঁকে ধর্ম সম্বন্ধে এত উপদেশ দিয়েছেন। আসন্ন যাত্রা সম্বন্ধে মানসিক উদ্বেগ থাকার দরুণ তিনি তাঁর বক্তব্যকে গুছিয়ে লিখতে পারেন নি, গিয়াসুদ্দীন তাঁর "মার্জিত রুচি"র দ্বারা এগুলিকে নিশ্চয়ই সাজিয়ে নিতে সমর্থ হবেন। (p. 222)

কিন্তু ঈশ্বরগতপ্রাণ, সর্বত্যাগী, পণ্ডিতাগ্রগণ্য মুজাফফর শাম্‌স্‌ বল্‌খি বিধর্মীদের উপর একেবারেই সদয় ছিলেন না। বিভিন্ন চিঠিতে তিনি বিধর্মীদের তীব্র ভাষায় ধিক্কার দিয়েছেন এবং গিয়াসুদ্দীনের মনে বিধর্মীদের প্রতি বিরাগ বর্ধিত করবার চেষ্টা করেছেন। একটি চিঠিতে (pp. 215-216) তিনি গিয়াসুদ্দীনকে লিখেছেন যে বিধর্মীদের উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করা ও মুসলমানদের উপর কর্তৃত্ব করতে দেওয়া উচিত নয়। পরে আমরা এ' সম্বন্ধে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করছি।

যাহোক্‌, মুজাফফর শাম্‌স্‌ বল্‌খির এই সমস্ত চিঠি পড়ে মনে হয়, 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে' গিয়াসুদ্দীনের ন্যায়পরায়ণতা ও কাজীর আদালতে আসামী হিসাবে দাঁড়ানো সম্বন্ধে যে কাহিনীটি লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা সত্য হওয়া খুবই সম্ভব। কারণ ঐ কাহিনীটিতে দেখি গিয়াসুদ্দীন কাজীকে বলছেন যে পবিত্র আইনের (শরিয়ৎ) বিধান পালনে বাধ্য হওয়ার জন্যই তিনি তাঁর আদালতে এসেছেন। বল্‌খির চিঠিগুলিতেও দেখি বল্‌খি বারবার গিয়াসুদ্দীনকে শরিয়তের বিধান পালন করতে ও ন্যায়পরায়ণ হতে নির্দেশ দিচ্ছেন। গিয়াসুদ্দীন যে ধর্মপ্রাণ ছিলেন এবং বল্‌খিকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন, তা বল্‌খির চিঠি পড়েই বোঝা যায়। সেইজন্য তিনি সত্যই শরিয়তের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন বলে মনে হয়। কাজেই তাঁর পক্ষে শরিয়তের বিধান অনুসারে কাজীর বিচারালয়ে আসামী হিসাবে উপস্থিত হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

মুজাফফর শাম্‌স্‌ বল্‌খির পূর্বোদ্ধৃত একটি চিঠি থেকে জানা যায় যে, গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ প্রথম জীবনে সুখ এবং আমোদপ্রমোদে লিপ্ত ছিলেন, কিন্তু পরে

ধর্মগতপ্রাণ হয়ে ওঠেন। মুজাফফর শাম্‌স্‌ বল্‌খি, নূর কুৎব্‌ আলম প্রভৃতি দরবেশদের প্রভাবে তাঁর ধর্মনিষ্ঠা দিন দিন বাড়তে থাকে এবং এই ধর্মনিষ্ঠারই ফলে গিয়াসুদ্দীন বহু অর্থ ব্যয় করে মক্কা ও মদিনায় দু'টি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। দু'জন সমসাময়িক আরবদেশীয় ঐতিহাসিকের লেখা বইয়ে—ইব্‌ন্‌-ই-হজরের (১৩৭২-১৪৪৯ খ্রীঃ) 'ইন্‌বাউ'ল-গুম্‌র্‌'-এ ও তকী অল-ফাসির (১৩৭৩-১৪২৯ খ্রীঃ) 'ইকদু'থ-থামিন'-এ এ' সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়; এই দু'টি বইয়ে প্রদত্ত বিবরণ থেকে জানা যায় যে,—গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ হানাফী ছিলেন; বিদ্যা ও সম্পদে তিনি ছিলেন ধন্য, তত্ত্ববিদ ও ধার্মিক লোকেরা তাঁকে ভালবাসতেন; তিনি সাহসী, উদার ও দানশীল ছিলেন এবং পণ্ডিত ও ধার্মিক ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষণ করতেন। তিনি মক্কার উম্মে-হানী ফটকে একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করান; এই মাদ্রাসা এবং এর সম্পত্তির (endowment) জন্য তিনি বারো হাজার মিশরী স্বর্ণ-মিথ্‌কল খরচ করেন এবং এতে মুসলিম আইনের চারটি পদ্ধতি বা মধহব (হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হানবালী) শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করেন। ৮১৩ হিজরার রমজান মাসে এই মাদ্রাসার নির্মাণ সুরু হয় এবং ৮১৪ হিজরার মাঝের দিকে শেষ হয়। অবশ্য মাদ্রাসার কাজ ৮১৪ হিজরার গোড়ার দিকেই সুরু হয়েছিল। তকী অল-ফাসি (উপরে উল্লিখিত দু'জন আরবী ঐতিহাসিকের অন্যতম) এই মাদ্রাসার অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন; তিনি 'মালেকী' মধহব পড়াতেন। মাদ্রাসায় ষাটজন ছাত্র ছিল—শাফেয়ী ও হানাফী মধহবের কুড়িজন করে এবং মালেকী ও হানবালী মধহবের দশজন করে ছাত্র। মাদ্রাসার নিকটবর্তী অঞ্চলের দু'খণ্ড জমি এবং চারটি জলাধার ক্রয় করে মাদ্রাসাকে দান করা হয়েছিল। এই সম্পত্তির আয়ের এক-পঞ্চমাংশ থেকে শিক্ষকদের বেতন দেওয়া হত, তিন-পঞ্চমাংশ দ্বারা ছাত্রদের ব্যয় নির্বাহ হত, বাকী এক-পঞ্চমাংশের দুই-তৃতীয়াংশ মাদ্রাসা ভবনের দশজন অধিবাসীর (ভৃত্যাদি) ব্যয় নির্বাহ হত ও এক-তৃতীয়াংশ বাড়ীর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের—বাতি, তেল, জল প্রভৃতি—ব্যয়-নির্বাহ হত। মাদ্রাসা-ভবনের সামনে অবস্থিত একটি বাড়ীও ৫০০ স্বর্ণ-মিথকল দামে কিনে মাদ্রাসাকে দান করা হয়। মক্কার এই মাদ্রাসার জন্য এত খরচ করেও গিয়াসুদ্দীন তৃপ্ত হন নি, তিনি মদিনার 'বাবু'ল ইসলাম'-এর কাছে 'হিসামুল-'অতিক' নামক স্থানে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এছাড়া তিনি কয়েকবার মক্কা ও মদিনার অধিবাসীদের

মূল্যবান উপহার পাঠিয়েছিলেন। (Islamic Culture, 1958, pp. 199-200 দ্রঃ)।

গোলাম আলী আজাদ বিলগ্রামী নামে একজন পরবর্তী লেখক তাঁর 'খজানাহ্-ই-আমিরাহ্' বইয়ে এই বিষয়টি সম্বন্ধে কিছু অতিরিক্ত সংবাদ দিয়েছেন। বিলগ্রামী কাজী কুৎবুদ্দীন হানাফীর লেখা 'তারিখ-ই-মক্কা' নামক বই থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন এবং তিনি নিজে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা, সরাই, খাল প্রভৃতি দেখেছেন বলে জানিয়েছেন। বিলগ্রামী লিখেছেন, "বাংলার শাসক সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ তাঁর ব্যক্তিগত ভৃত্য য়াকুৎ অনানী মারফৎ মক্কা ও মদিনায় এক বিরাট পরিমাণ অর্থ পাঠান ঐ দুই পবিত্র স্থানের অধিবাসীদের মধ্যে বণ্টন করবার জন্য এবং পবিত্র মক্কা শহরে তাঁর নামে একটি মাদ্রাসা ও একটি সরাই স্থাপন করবার জন্য। তিনি (য়াকুৎ অনানী) ওয়াকৃফ্ তৈরী করার জন্য জমি কিন্‌লেন এবং শিক্ষা প্রভৃতি জনহিতকর কাজের জন্য অর্থব্যয় করলেন। মক্কার শরীফ মৌলানা হাসান-বিন-অজ্‌লানের কাছে তিনি একটি চিঠি লিখলেন এবং তাঁকে মূল্যবান সব উপহার পাঠালেন। শরীফ তা গ্রহণ করে সুলতানের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করার আদেশ জারী করলেন। শরীফ তাঁর পারিবারিক প্রথা অনুসারে (প্রেরিত অর্থের) এক তৃতীয়াংশ গ্রহণ করলেন এবং অবশিষ্টাংশ পবিত্র শহর দু'টির বিদ্বান ও অভাবগ্রস্ত লোকদের মধ্যে বণ্টন করা হল। এত অর্থ প্রেরিত হয়েছিল যে দুই পবিত্র স্থানের প্রত্যেক লোকই তার অংশ পেল। য়াকুৎ 'বাব-ই-উম্মেহানী' নামক স্থানের কাছে মাদ্রাসা ও সরাই নির্মাণের জন্য দু'টি বাড়ী কিনলেন। বাড়ী দু'টি ভেঙ্গে ফেলে (তাদের জায়গায়) মাদ্রাসা ও সরাই নির্মাণ করা হল। দুই আসীল চার রহ্‌বা জমি কেনা হল মাদ্রাসার সম্পত্তি হিসাবে। তিনি (য়াকুৎ) চারটি মধ্‌হবের চার জন শিক্ষককে নিযুক্ত করলেন এবং ষাট জন ছাত্র সংগৃহীত হল। এর খরচ (মাদ্রাসার) সম্পত্তির আয় থেকে নির্বাহ হবার ব্যবস্থা করা হল। তিনি মাদ্রাসার সামনে পাঁচশো স্বর্ণ-মিথ্‌কল দিয়ে আর একটি বাড়ী কিনলেন এবং এটিকে সরাইয়ের সম্পত্তি করে দিলেন। যে জমির উপর মাদ্রাসা ও সরাই তৈরী হয়েছিল, তার জন্য এবং দুই আসীল চার রহ্‌বা জমির জন্য মৌলানা হাসান বারো হাজার স্বর্ণ-মিথ্‌কল নিলেন। এ ছাড়াও তিনি এক বিরাট পরিমাণ অর্থ নিলেন, কত তা কেউ বলতে পারে না। সুলতান

গিয়াসুদ্দীন আরাফাহ্ নামক স্থানে একটি খাল খনন করবার জন্য পূর্বোক্ত য়াকুৎ মারফৎ অর্থ পাঠান। মৌলানা হাসান তা নিয়ে বলেন, 'এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আমরাই করব।' ঐ অর্থের পরিমাণ ত্রিশ হাজার স্বর্ণ-মিথকল।"* (Social History of the Muslims in Bengal by Abdul Karim, pp. 49-50 দ্রঃ)। মৌলানা হাসান এই অর্থ অন্য কাজে খরচ করেছিলেন বলে সূত্রান্তরে উল্লিখিত হয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর আরবী ঐতিহাসিক অল-সখাওয়ী লিখেছেন যে য়াকুৎ অনানী জাতিতে হাবশী ছিলেন এবং ৮১৫ হিজরায় তিনি পরলোক গমন করেন।

ইব্‌ন্-ই-হজরের 'ইন্‌বাউ'ল্-গুম্‌র্' থেকে জানা যায় যে, খান-ই-জহান নামে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের একজন উজীর ছিলেন; এঁর প্রকৃত নাম য়াহ্‌য়া, পিতার নাম আরব শাহ; ৮১৪ হিজরায় খুব করুণভাবে এঁর মৃত্যু হয়। 'নজহতু'ল-খওয়াতির' নামে একটি অর্বাচীন গ্রন্থের (এই গ্রন্থেও কুৎবুদ্দীনের 'তারিখ-ই-মক্কা'র সাক্ষ্য উদ্ধৃত করা হয়েছে) মতে খান-ই-জহানই গিয়াসুদ্দীনকে মক্কায় মাদ্রাসা খোলার অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন এবং মদিনার শাসনকর্তা ও অধিবাসীদের ইনি অনেক টাকাকড়ি ও জিনিসপত্র উপহার পাঠিয়েছিলেন; এঁর ভৃত্য হাজী ইকবাল এই সব উপহার নিয়ে য়াকুতের সঙ্গে গিয়েছিল কিন্তু জেড্ডার কাছে একটি নৌকা ডুবে যাওয়ায় অনেক উপহারসামগ্রী নষ্ট হয়ে যায় (Islamic Culture, 1958, pp. 199-207 দ্রঃ।)

বিদেশে দূত প্রেরণ গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের একটি অভিনব ও প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য। পারস্যের সিরাজে কবি হাফিজের কাছে এবং আরবের তীর্থস্থান মক্কা ও মদিনায় তিনি দূত পাঠিয়েছিলেন, তা আমরা দেখে এসেছি। অবশ্য সিরাজে তিনি দূত পাঠিয়েছিলেন তাঁর কাব্যামোদী মনের তাগিদে এবং মক্কা-মদিনায় দূত পাঠিয়েছিলেন ধর্ম-নিষ্ঠার তাগিদে। কিন্তু নিছক্ বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য তিনি দূত ও উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন, এরকম দৃষ্টান্তও আমরা অন্তত দু'টি পাই। প্রথমবার তিনি তা পাঠিয়েছিলেন ভারতবর্ষেরই আর একটি রাজ্যের শাসককে। এই সময়ে খওয়াজা-ই-জহান উপাধিধারী খোজা মালিক সারওয়ার স্বাধীন ও পরাক্রান্ত জৌনপুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ৭৯৬ হিজরার রজব মাসে (মে, ১৩৯৪ খ্রীঃ) তিনি দিল্লী

* এই বিবরণ থেকে মৌলানা হাসানকে খুব সুবিধাজনক লোক বলে মনে হয় না

থেকে জৌনপুরে যান এবং কনৌজ, করহ্, অযোধ্যা, সন্দীলহ্, দালমু, বহ্রাইচ, বিহার ও ত্রিহুত প্রভৃতি অঞ্চল জয় করে তার একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসেন। প্রামাণিক গ্রন্থ 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'তে (Eng. Translation,- p. 165) লেখা আছে, "জাজনগরের রায় এবং লখ্নৌতির অধিপতি, যাঁরা প্রতি বছর দিল্লীতে হাতী পাঠাতেন, তাঁরা এখন খওয়াজা-ই-জহানকে হাতী উপহার দিলেন।" বলা বাহুল্য, এই সময় লখ্নৌতি অর্থাৎ বাংলার অধিপতি ছিলেন গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ, জৌনপুর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ৪।৫ বছর আগেই তিনি রাজা হন এবং খওয়াজা-ই-জহানের মৃত্যুর ১০।১১ বছর পরে তাঁর মৃত্যু হয়। অতএব তিনিই খওয়াজা-ই-জহানকে হাতী পাঠিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, এই হাতী প্রেরণ বশ্যতা স্বীকারের নিদর্শন নয়, সমকক্ষ রাজা হিসাবে উপহার দান। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, সমসাময়িক মুসলিম ঐতিহাসিক রচিত কোন গ্রন্থে গিয়াসুদ্দীনের এই একটিমাত্র কাজের উল্লেখ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় যে বিদেশী রাজার কাছে গিয়াসুদ্দীন দূত ও উপহার পাঠিয়েছিলেন, তিনি সুদূর চীনদেশের সম্রাট 'মিং' বংশীয় য়ুং-লো। চীনদেশের বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থ থেকে গিয়াসুদ্দীনের এই দূত প্রেরণের কথা জানা যায়।

'শি-য়াং-ছাও-কুং-তিয়েন-লু' নামে বইটিতে লেখা আছে,

"সম্রাট য়ুং-লোর রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে (১৪০৮ খ্রীঃ) (বাংলার) রাজা ঙ্গায়-য়া স্জ্-তিং (গি-য়া-সু-দ্দীন) চীনদেশে ভেট সমেত এক দূত পাঠান।"

'শু য়ু-চৌ-ৎজ্-লু' নামে বইটিতে লেখা আছে,

"য়ুং-লো'র রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে (১৪০৫ খ্রীঃ) বাংলার রাজা ঙ্গায়-য়া-স্জ্-তিং চীনের রাজসভায় দূত পাঠান। (চীন) সম্রাটও বাংলার রাজা ও রানাকে নানারকম রেশমী কাপড় উপহার পাঠাতে আদেশ দেন। য়ুং-লো'র রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে (১৪০৮ খ্রীঃ) ঐ দেশের (বাংলার) রাজা আবার দূত পাঠালেন। এই দূত ভেটসমেত তাই-ৎ-সাং বন্দরে এসে পৌছোলেন। (চীনের) সম্রাট তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য পররাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রীকে সেখানে পাঠালেন।

'মিং' রাজবংশের সরকারী ইতিহাসগ্রন্থ 'মিং-শ্রু'-এ এ'সম্বন্ধে লেখা আছে, "য়ুং-লো'র রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে (১৪০৮ খ্রীঃ) বাংলার রাজা উপহার সমেত চীনে একজন দূত পাঠান। চীনও প্রতিদানস্বরূপ অনেক উপহার পাঠায়। য়ুং-লোর রাজত্বের সপ্তম বর্ষে (১৪০৯ খ্রীঃ) তাঁদের (বাংলার)

দূত ২৩০ জন রাজকর্মচারী সঙ্গে নিয়ে চীনে এসেছিলেন। (চীন) সম্রাট সেই সময় বিদেশের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। কাজেই তিনি বাংলাদেশে অনেক উপহার পাঠালেন। এর পর থেকে তারা (বাংলার রাজদূতেরা) প্রতি বছরই (চীনে) আসত।"

এই সব চীনা গ্রন্থের সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ চীন-সম্রাটের কাছে প্রথমবার ১৪০৫ খ্রীষ্টাব্দে, দ্বিতীয়বার ১৪০৮ খ্রীষ্টাব্দে ও তৃতীয়বার ১৪০৯ খ্রীষ্টাব্দে দূত ও উপহার পাঠিয়েছিলেন। তারপর থেকে প্রতি বছরই বাংলার দূতেরা চীনে যেত। চীন-সম্রাটও গিয়াসুদ্দীনকে নানারকম উপহার পাঠিয়েছিলেন। ১৪১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের মৃত্যু হয়। বাংলার দূতেরা ১৪১২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু সংবাদ নিয়ে চীনে পৌঁছেছিল, এ' কথা 'মিং-শ্‌র্' থেকে জানা যায়। (এসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য বর্তমান বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

এখানে একটি কথা বলবার আছে। ফিলিপ্‌স্ তাঁর এক প্রবন্ধে (Journal of the Royal Asiatic Society, 1895, pp. 529-533 দ্রষ্টব্য) লিখেছিলেন যে চীন সম্রাট য়ুং-লোই প্রথম বাংলাদেশে দূত পাঠিয়েছিলেন। ফিলিপ্‌সের মতে য়ুং-লো তাঁর যে পূর্ববর্তী সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করে রাজা হয়েছিলেন, সেই হুই-তি সাগরপারের কোন দেশে লুকিয়ে আছেন ভেবে য়ুং-লো বিভিন্ন দেশে দূত পাঠাতে সুরু করেন এবং এইভাবে বাংলাদেশেও দূত পাঠান। কিন্তু 'শু-য়ূ-চৌ-ৎজ্‌-লু'তে পরিষ্কার লেখা আছে যে বাংলার রাজা গিয়াসুদ্দীনই প্রথম ১৪০৫ খ্রীষ্টাব্দে চীনে দূত পাঠিয়েছিলেন তার পরে চীন-সম্রাট বাংলায় দূত পাঠান। পঞ্চদশ শতাব্দীর একেবারে প্রথমে চীনে দূত প্রেরণ গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের দূরদর্শিতা ও প্রগতিশীল মনের পরিচায়ক।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের যে সমস্ত কার্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা করলাম, তাদের মধ্যে তাঁর কৃতিত্বই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু চাঁদের যেমন শুক্ল ও কৃষ্ণ দুটি পক্ষই থাকে, তেমনি গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের কৃতিত্বের নিদর্শনের পাশে তাঁর ব্যর্থতার নিদর্শনও দাঁড়িয়ে আছে। এখন এই দিক সম্বন্ধেই আমরা আলোচনা করব।

গিয়াসুদ্দীনের ব্যর্থতা সবচেয়ে প্রকট হয়েছে যুদ্ধবিগ্রহের ব্যাপারে। যদিও তিনি নিজের পিতার সঙ্গে যুদ্ধে সাফল্য লাভ করে বাংলার সিংহাসনে বসেছিলেন, তাহলেও এরই মধ্য দিয়ে তাঁর সর্বনাশের পথ প্রশস্ত হয়েছিল।

কারণ, পিতার সঙ্গে অন্তত কয়েক বছরব্যাপী বিরোধের পর তিনি তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেন। বিরোধের সময়টুকুতে দেশের সংহতি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আর পিতা-পুত্রের যুদ্ধের ফলে উভয় পক্ষের যে ক্ষতি হয়েছিল, তাতে দেশের মোট সামরিক শক্তি অনেকখানি হ্রাস পেয়েছিল সন্দেহ নেই।

সমগ্র বাংলার অধীশ্বর হবার পরেও গিয়াসুদ্দীন কয়েকবার বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং তারও ফল ভাল হয় নি। বুকাননের বিবরণীর মতে গিয়াসুদ্দীন শহাব খান নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ করেন, কিন্তু সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। এই জাতীয় দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ও ক্রমাগত অসাফল্যের ফলে যে কোন রাজারই শক্তিহ্রাস পেতে বাধ্য। বুকানন-বিবরণীর মতে দরবেশ নূর কুৎব্ আলম গিয়াসুদ্দীন ও শহাব খানের মধ্যে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেন। সন্ধির প্রস্তাব অনেকদূর এগিয়েছিল, এমন সময় গিয়াসুদ্দীন শহাব খানকে হঠাৎ আক্রমণ করে বন্দী করেন। ("···Shah Nur Kotub Alam···attempted to make a peace with a Shaheb Khan, with whom Ghyashudin had been carrying on an unsuccessful war. While the treaty was going forward, Ghyashudin seized on his adversary.") এ কথা সত্য হলে বলতে হবে, গিয়াসুদ্দীন বিশ্বাসঘাতকতা করে শহাব খানকে পরাজিত করেছিলেন; দীর্ঘকালব্যাপী ব্যর্থ সংগ্রামের পরে এইভাবে বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা জয়লাভ করে গিয়াসুদ্দীন কোন রকমে তাঁর মান হয়তো বাঁচিয়েছিলেন কিন্তু মোটের উপর তাঁর যে ক্ষতি হয়েছিল, এই জয়ে তা পূরণ হবার কথা নয়।

বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে, গিয়াসুদ্দীন কামতা ও কামরূপ রাজ্যে অভিযান করেছিলেন। কুচবিহারে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং গৌহাটিতে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে যে মাটির নীচে পোঁতা মুদ্রাসমষ্টি আবিষ্কৃত হয়েছিল তাদের সর্বাধুনিক মুদ্রা যথাক্রমে ৭৯৯ ও ৮০২ হিজরার এবং এগুলি গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের নামাঙ্কিত। এব থেকে মনে হয়, কামতা ও কামরূপ রাজ্যের কিয়দংশে অন্তত সাময়িকভাবে গিয়াসুদ্দীনের অধিকার স্থাপিত হয়েছিল। গৌহাটির যাদুঘরে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের একটি শিলালিপি সংরক্ষিত আছে। মূলে এটি কোথায় ছিল, তা জানা যায় না। এটি যদি ঐ অঞ্চলেরই হয়, তাহলে কামরূপে গিয়াসুদ্দীনের অধিকার সম্বন্ধে আর একটি প্রমাণ পাওয়া যায়। কামরূপে যে ইলিয়াস শাহ ও সিকন্দর শাহের অধিকার ছিল, তা কামরূপের

টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ সিকন্দর শাহের ৭৫৯ হিজরার মুদ্রা থেকে বোঝা যায়। সিকন্দর শাহ ও গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের বিরোধের সময় সম্ভবত কামরূপ আবার সুযোগ বুঝে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল, কারণ পরবর্তীকালে সেখানকার টাকশালে বাংলার সুলতানের আর কোন মুদ্রা উৎকীর্ণ হতে দেখি না। 'যোগিনীতন্ত্র' নামে একটি গ্রন্থে কামরূপে ১৩১৬ (?) (তারিখটি স্পষ্ট ভাবে পড়া যায় নি) শকাব্দে (=১৩৯৪-৯৫ খ্রীঃ) মুসলমানদের আক্রমণের এবং দ্বাদশবর্ষব্যাপী আধিপত্যের অস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় (Gait's Report on the progress of Historical Research in Assam, pp. 52-53 দ্রষ্টব্য)। কেউ কেউ মনে করেন এর দ্বারা কামরূপে বাংলার সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের আক্রমণ ও আধিপত্যের কথাই বোঝাচ্ছে, কারণ কামরূপের আশেপাশে সে সময় আর কোন মুসলিম রাজ্য ছিল না। যোগিনীতন্ত্রের কথা বিশ্বাস করলে বলতে হয় যে মুসলমানেরা (যবন) কোচদের (কুবাচ) সঙ্গে মিলিতভাবে কামরূপ শাসন করে, কিন্তু ১২ বছর যুক্ত শাসনের পর কোচদের সঙ্গে অসোমদের (সৌমর) সন্ধি স্থাপিত হয় এবং কামরূপে শান্তি ফিরে আসে। অবশ্য এই জাতীয় অর্বাচীন সূত্রের অস্পষ্ট উক্তি এবং তারিখের সন্দেহজনক পাঠের উপর নির্ভর করে কোন সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা চলে না। অসমীয়া বুরঞ্জীর সাক্ষ্য বিশ্বাস করলে বলতে হয় যে গিয়াসুদ্দীনের কামতা-রাজ্য জয়ের অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। কয়েকটি বুরঞ্জীতে লেখা আছে যে, অহোম-রাজ সুদঙ্ফা (১৩৯৭-১৪০৭ খ্রীঃ) কামতা-রাজের উপরে অপ্রসন্ন হয়ে তার রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন, কারণ তার স্ত্রীর গুপ্তপ্রণয়ী তাই-সুলাইকে কামতা-রাজ আশ্রয় দিয়েছিলেন। এইভাবে কামতা-রাজ্য একদিক থেকে অহোম-রাজ কর্তৃক আক্রান্ত হলে বাংলার সুলতান সুযোগ বুঝে কামতা-রাজ্য আক্রমণ করেন। কামতা-রাজ তখন বিপদ দেখে অহোমরাজের সঙ্গে তাঁর কন্যা ভাজনীর বিবাহ দিয়ে তাঁর সঙ্গে সন্ধি করলেন এবং অহোম-রাজ ও কামতা-রাজ তখন এক সঙ্গে বাংলার সুলতানের বিরুদ্ধে তাঁদের সৈন্যবাহিনী সমবেত করে রুখে দাঁড়ালেন। তার ফলে বাংলার সুলতানের সৈন্যবাহিনীকে করতোয়া নদীর এপার পর্যন্ত গিয়েই ক্ষান্ত হতে হল (The Delhi Sultanate, Bharatiya Vidya Bhavan, pp. 391-392 দ্রষ্টব্য)। বলা বাহুল্য এই সময়ে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহই বাংলার সুলতান ছিলেন।

এই সমস্ত বিবরণ পড়লে মনে হয়, গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের সামরিক

অভিযানগুলির একটা বড় অংশই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল এবং অনেক শক্তি ক্ষয়ের পর কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি মাত্র আংশিক সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

সমসাময়িক কবি বিদ্যাপতির বিভিন্ন গ্রন্থ পড়লে মনে হয়, তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজা শিবসিংহ গিয়াসুদ্দীন আজম শাহকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। কারণ 'পুরুষপরীক্ষা'তে বিদ্যাপতি শিবসিংহ সম্বন্ধে বলেছেন, "যো গৌড়েশ্বর-গজ্জনেশ্বর রণক্ষৌণিষু লব্ধা যশো" এবং 'শৈবসর্বস্বসারে' শিবসিংহ সম্বন্ধে বলেছেন, "শৌর্যাবর্জিত গৌড়গজ্জনমহীপালোপনম্রীকৃতা"। 'পুরুষপরীক্ষা' শিবসিংহের রাজত্বকালে লেখা। ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে শিবসিংহের রাজত্ব শেষ হয় (বর্তমান গ্রন্থ, চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। 'পুরুষপরীক্ষা' তার আগেই লেখা। শিবসিংহের সঙ্গে "গৌড়েশ্বর" বা "গৌড়মহীপালে"র যুদ্ধ তারও আগেকার ঘটনা। এদিকে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ ১৪১০-১১ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। সুতরাং শিবসিংহ কর্তৃক পরাজিত গৌড়েশ্বর গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ হবারই খুব বেশী সম্ভাবনা। কীভাবে, কখন ও কোথায় শিবসিংহের সঙ্গে গৌড়েশ্বরের যুদ্ধ হয়েছিল, সে সম্বন্ধে কিছুই জানা যাচ্ছে না। নিজের পৃষ্ঠপোষক সম্বন্ধে বিদ্যাপতির এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য না অতিরঞ্জিত, তা'ও বোঝা যাচ্ছে-না; তবে সত্য হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি শিবসিংহের কাছে যদি গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ পরাজিত হয়ে থাকেন, তাহলে বলতে হবে ঐ সময়ে তাঁর সামরিক শক্তি একেবারে দৈন্য-দশায় এসে পৌঁছেছিল। এর আগেকার দীর্ঘবিলম্বিত এবং অনেকাংশে ব্যর্থ সমর-প্রচেষ্টাগুলিই বোধহয় এর প্রধান কারণ। শিবসিংহের সঙ্গে রাজা গণেশের বন্ধুত্ব ছিল; গণেশের অভ্যুত্থানে সাহায্য করার জন্যই সম্ভবত শিবসিংহ গৌড়েশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন।

গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ হিন্দুদের সম্বন্ধে যে নীতি অনুসরণ করেছিলেন, তার সম্বন্ধে এখন কিছু আলোচনা করা দরকার। আমাদের মনে হয়, তাঁর রাজত্বের শেষের দিকে তিনি এই বিষয়ে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারে তিনি শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এখন আমরা সেই কথাতেই আসছি।

ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতানেরা যুদ্ধবিগ্রহ ও শাসনকার্যের ব্যাপারে কেবলমাত্র মুসলমানদের উপরেই নির্ভর করতেন না, হিন্দুদেরও সাহায্য নিতেন। দিল্লীর পরাক্রান্ত সম্রাট ফিরোজ শাহ তোগলকের আক্রমণকে প্রতিহত

করে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ যে নিজের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলেন, এর পিছনে হিন্দুদের সাহায্য একটা বড় উপাদান জুগিয়েছিল। একডালার রণক্ষেত্রে ফিরোজ শাহের বিরুদ্ধে ইলিয়াস শাহের শক্তির প্রধান স্তম্ভ ছিল হিন্দু পাইক-বাহিনী এবং তাদের নেতা সহদেব। অনুমান করতে পারি ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকন্দর শাহের রাজত্বকালেও হিন্দুদের প্রাধান্য হ্রাস পায় নি। সিকন্দরের পুত্র গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের রাজত্বকালের অন্তত প্রথমার্ধ পর্যন্ত যে হিন্দুরা বহু উচ্চ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিল, তা আমরা জানতে পারি গিয়াসুদ্দীনকে লেখা মুজাফফর শামস্ বল্‌খির একটি চিঠি (Proceedings, Ind. Hist. Cong., 1956, pp. 215-216 দ্রষ্টব্য) থেকে। চিঠিটি ৮০০ হিজরার শেষ দিকে লেখা, কারণ এর মধ্যেই এক জায়গায় আছে, "আটশো সাল (হিজরা) সমাপ্ত হল।" এই চিঠিতেই বল্‌খি গিয়াসুদ্দীনকে লিখছেন,

"মহান্ ঈশ্বর বলেছেন, 'বিশ্বাসিগণ! তোমাদের শ্রেণীর বাইরের কারো সঙ্গে অন্তরঙ্গতা স্থাপন কোরো না।' টীকা এবং শব্দকোষগুলিতে এই বিষয়টির মর্মার্থস্বরূপ এই কথা বলা হয়েছে যে মুসলমানরা কাফের এবং অপরিচিত লোকদের বিশ্বস্ত কর্মচারী বা মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করবে না। যদি তারা (মুসলমানরা) বলে যে তাদের (অমুসলমানদের) বন্ধু বা প্রিয়জন তারা বানাচ্ছে না, সুবিধার জন্য এ'রকম করছে,—তার উত্তর এই যে, ভগবান বলেছেন এতে সুবিধা হয় না, এই ব্যাপার গোলযোগ ও বিদ্রোহের কারণ হয়। তিনি (ভগবান) বলেছেন, 'তারা তোমাকে দূষিত করতে ব্যর্থ হবে না' এবং 'তারা তোমার জন্য গোলযোগ সৃষ্টি করতে ইতস্তত করবে না বা বিরত হবে না।' অতএব ভগবানের আদেশ শোনা এবং আমাদের দুর্বল বিচারকে বিসর্জন দেওয়াই আমাদের অবশ্যকর্তব্য। ভগবান বলেছেন, 'তারা কেবলমাত্র তোমার ধ্বংস কামনা করতে পারে' অর্থাৎ যখনই তুমি তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা স্থাপন করবে, তারা তোমাকে মন্দ কাজে জড়িত করাই পছন্দ করবে। কাফেরদের কিছু কাজ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তাদের 'ওয়ালি' (প্রধান তত্ত্বাবধায়ক বা শাসনকর্তা) নিযুক্ত করা উচিত নয়, কারণ তা করলে তারা মুসলমানদের উপর কর্তৃত্ব লাভ করবে এবং তাদের উপর মুরুব্বীয়ানা ফলাবে। ভগবান বলেছেন, 'মুসলমানরা যেন কাফেরদের বন্ধু বা সহায়ক হিসাবে গ্রহণ করে ভগবানকে উপেক্ষা না করে।' যদি কেউ তা করে, তাহলে ভগবানের সাহায্য তারা পাবে

না—এক সতর্কবাণী ছাড়া, যাতে আমরা তোমাদের তাদের (কাফেরদের) হাত থেকে রক্ষা করতে পারি। যারা মুসলমানদের উপরে কাফেরদের কর্তৃত্ব দান করেছে, তাদের বিরুদ্ধে কোরান, হাদিস্ এবং ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলিতে অনেক তীব্র সতর্কবাণী লেখা আছে। 'ভগবান অপ্রত্যাশিত জায়গা থেকে সাহায্য দান করেন এবং তিনিই মুক্তি দেন। খাদ্য, জয় এবং সমৃদ্ধি দান করতে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।' পরাজিত কাফেররা নতমস্তকে তাদের নিজেদের যে ভূমি রয়েছে সেখানে নিজেদের শক্তি ও কর্তৃত্ব ফলায় এবং সেই অঞ্চল শাসন করে। কিন্তু তারা ইসলামের দেশগুলিতে মুসলমানদের উপরে উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হয়েছে এবং তাদের উপরে হুকুম চালাচ্ছে। এইরকম ব্যাপার ঘটা উচিত নয়।"

এই চিঠিটি পড়লে বোঝা যায় যে মুজাফফর শাম্‌স্ বল্‌খি বিধর্মীদের উপর একেবারেই প্রসন্ন ছিলেন না। যাহোক্, এই চিঠিখানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর থেকে দু'টি বিষয় খুব পরিষ্কারভাবে জানা যাচ্ছে।

(১) অন্তত ৮০০ হিজরা পর্যন্ত গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের রাজ্যে বহু হিন্দু উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং অনেক মুসলমান ঐসব হিন্দুর অধীনে কাজ করতেন।

(২) বিধর্মী-বিদ্বেষী মুজাফফর শাম্‌স্ বল্‌খি অমুসলমানদের উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করা পছন্দ করেন নি এবং গিয়াসুদ্দীনকে এই নীতি পরিত্যাগ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন।

বলা বাহুল্য, ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কাছে দরবেশ বল্‌খির এই উপদেশ যতই মধুর লাগুক না কেন ব্যাবহারিক দিক থেকে তা কোনমতেই সমর্থন করা চলে না। কারণ মুসলমান সুলতানরা যে হিন্দু-প্রেমের বশবর্তী হয়ে হিন্দুদের উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করতেন, তা নয়; সমস্ত পদের জন্য যোগ্য মুসলমান পাওয়া যেত না বলেই তাঁরা হিন্দুদের অনেক পদে নিয়োগ করতে বাধ্য হতেন। এইসব পদ থেকে হিন্দুদের অপসারণ করার অর্থ দেশের শক্তি ও শাসন-ব্যবস্থাকে পঙ্গু করা। উপরন্তু হিন্দুদের এইসব পদ থেকে বরখাস্ত করলে তাদের মনে অসন্তোষের সৃষ্টি হত। তাদের রাখলে যে গোলযোগ ও বিদ্রোহের সম্ভাবনা আছে বলে বল্‌খি বলছেন (ভগবানের আদেশের দোহাই দিয়ে), তাদের সরালে তার চেয়ে বেশী গোলযোগ ও বিদ্রোহের সম্ভাবনা দেখা দিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও বল্‌খি ঈশ্বর, কোরান, হাদিস্, ঐতিহাসিক

গ্রন্থ প্রভৃতির দোহাই দিয়ে এবং ভগবানই খাদ্য, জয় ও সমৃদ্ধি দান করবেন ইত্যাদি কথা বলে গিয়াসুদ্দীনকে বোঝবার চেষ্টা করেছেন যে বিধর্মীদের উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করা উচিত নয় এবং তার প্রয়োজনও নেই।

অধ্যাপক সৈয়দ হাসান আস্‌কারি বল্‌খির মতকে সমর্থন করে লিখেছেন, "In view of what happened shortly after to the Ilyasshahi dynasty at the hands of the Hindu Minister, Raja Kans or Ganesh, the warning given by the saint of Bihar to Ghayāsuddin Azam Shah appears to be rather prophetic." (Proceedings, Ind. Hist. Cong., 1956, p. 216)।

কিন্তু, বাংলার সুলতান হিন্দুদের উচ্চপদে নিয়োগ করেছিলেন বলে হিন্দুদের বাড় বেড়েছিল এবং তারই ফলে একজন হিন্দু অত্যধিক প্রতাপশালী হয়ে উঠে ইলিয়াস শাহী বংশকে উচ্ছেদ করে বাংলার সিংহাসন অধিকার করেছিলেন, এই ধারণা সত্য নয়। মুজাফফর শাম্‌স্ বল্‌খির একান্ত ভক্ত ধর্মপ্রাণ সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ বল্‌খির উপদেশের ফলে হিন্দুদের সম্বন্ধে যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তার কথা পর্যালোচনা করলেই রাজা গণেশের অভ্যুত্থানের প্রকৃত কারণ বোঝা যাবে। ৮০০ হিজরায় বল্‌খি গিয়াসুদ্দীনকে এই উপদেশ দেন। গিয়াসুদ্দীন যে বল্‌খির উপদেশ সত্যিই শুনেছিলেন, তার প্রমাণ আছে। ৮০৮ হিঃর পরে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ ও তাঁর পুত্র সৈফুদ্দীন হম্‌জা শাহের রাজত্বকালে চীন-সম্রাটের কাছ থেকে কয়েকবার বাংলার রাজসভায় দূতের দল এসেছিলেন; তাঁরা বাংলার সুলতানের অমাত্যদের মধ্যে একজনও অমুসলমান দেখতে পান নি। চীনা দূতদলের দোভাষী মা-হোয়ান 'য়িং-য়া- শ্যং-লান' গ্রন্থে বাংলাদেশ সম্বন্ধে লিখেছেন, "(বাংলার) রাজার প্রাসাদ এবং ছোট বড় সমস্ত আমীরের (noble) প্রাসাদ শহরের (রাজধানীর) মধ্যেই। তাঁরা সবাই মুসলমান।"

ফিরিশ্‌তার মতে রাজা গণেশ ইলিয়াস শাহী বংশীয় সুলতানদের অন্যতম আমীর ('অজ উমরাএ') ছিলেন। অথচ মা-হোয়ান বলছেন যে, বাংলার রাজার ছোট বড় সমস্ত আমীরই মুসলমান। এর থেকে আমাদের মনে হয়, গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে অতিমাত্রায় ধর্মান্ধ হয়ে ওঠেন এবং বল্‌খি প্রভৃতি দরবেশের উপদেশ শুনে আমীরের পদ ও অন্যান্য উচ্চ রাজপদ থেকে হিন্দুদের বিতাড়িত করেন। অন্যতম হিন্দু আমীর রাজা

গণেশও সম্ভবত এই সময়ে পদচ্যুত হন। এই ধর্মান্ধতার পরিচয় গিয়াসুদ্দীনের অন্যান্য কাজের মধ্যেও মেলে ; তাঁর আমলে মা-হোয়ান প্রমুখ চীনা রাজ-প্রতিনিধিবর্গকে কেবলমাত্র বাংলার মুসলমানদের জীবনযাত্রাই দেখানো হয়েছিল, তাই মা-হোয়ান তাঁর বিবরণীতে লিখেছেন, "এদেশের বিবাহ এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া মুসলিম ধর্মের বিধান অনুসারে সম্পন্ন হয়।......এদেশের পাঁজীতে বারোটি মাস আছে, কিন্তু তাতে মলমাস গণনার কোন ব্যবস্থা নেই।" এদেশে হিন্দুদের মধ্যে যে বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার স্বতন্ত্র পদ্ধতি প্রচলিত আছে এবং তাঁদের পাঁজীতে যে মলমাস গণনার রীতি প্রচলিত আছে, একথা মা-হোয়ান লেখেন নি, তার কারণ একমাত্র এ'ই হতে পারে যে এইসব বিষয় জানবার কোন সুযোগই তাঁরা পান নি বাংলার তৎকালীন রাজশক্তির হিন্দুবিরোধী নীতির দরুণ। আমাদের মনে হয়,—গিয়াসুদ্দীনের এই ধর্মান্ধতা ও অদূরদর্শী নীতির ফলেই রাজা গণেশ, যাঁর অপরিমিত সামরিক শক্তি ছিল (বর্তমান গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) এবং যিনি ইলিয়াস শাহী বংশীয় সুলতানদের মিত্র ও সেবক ছিলেন, তিনি এখন তাঁদেরই বিপক্ষে গেলেন এবং গিয়াসুদ্দীনকে চক্রান্ত করে হত্যা করিয়ে (পরে আলোচনা দ্রষ্টব্য) তাঁর বংশকে উচ্ছেদ করে নিজে ক্ষমতা অধিকার করলেন। রাজা গণেশের অভ্যুত্থান কেবলমাত্র তাঁর ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষের দরুণ ঘটে নি। হিন্দুদের সম্বন্ধে গিয়াসুদ্দীন যে ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করেছিলেন, সেই নীতিই এজন্য দায়ী। তবে যতদূর মনে হয়, গিয়াসুদ্দীন তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকে এই ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করেন নি, শেষের দিকে করেছিলেন ; এবং তারই ফলে এই মহান্ নৃপতির রাজত্ব ও জীবন এক করুণ পরিসমাপ্তির মধ্যে পর্যবসিত হয়েছিল।

গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের ইতিহাস সম্বন্ধে যা জানা যায়, সে সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করলাম। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর ত্রুটিবিচ্যুতি ও ব্যর্থতা সত্ত্বেও তিনি যে বাংলার শ্রেষ্ঠ সুলতানদের মধ্যে অন্যতম, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই এবং চিত্তাকর্ষক ও সুমধুর চরিত্রের দিক দিয়ে তিনি সকলের অগ্রগণ্য।

গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের মুদ্রাগুলি উত্তরবঙ্গের ফিরোজাবাদ, পূর্ববঙ্গের মুয়াজ্জমাবাদ এবং পশ্চিমবঙ্গের সাতগাঁও-এর টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ হয়েছিল। এর থেকে বোঝা যায় দক্ষিণবঙ্গ বাদে মোটামুটিভাবে বাংলার

আর সমস্ত অঞ্চলেই তাঁর অধিকার ছিল। এ ছাড়া জন্নতাবাদ নামে আর একটি জায়গার টাকশাল থেকে তাঁর মুদ্রা বেরিয়েছিল, এই জায়গার অবস্থান এপর্যন্ত নির্ণয় করা যায় নি। এই জন্নতাবাদ গৌড়ের সঙ্গে অভিন্ন নয়, কারণ গৌড়ের 'জন্নতাবাদ' নাম ষোড়শ শতাব্দীতে হুমায়ুন রাখেন। এই সমস্ত স্থান ছাড়া কামরূপ ও কামতা রাজ্যের কিয়দংশ অন্তত সাময়িকভাবে তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল বলে আগে দেখাবার চেষ্টা করেছি।

এখন গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ সংক্রান্ত আর একটি বিষয়ের আলোচনা করে তাঁর প্রসঙ্গ শেষ করব।

পারস্যের অমর কবি হাফিজের সঙ্গে গিয়াসুদ্দীনের যোগাযোগ সম্বন্ধে আগে সবিস্তারে আলোচনা করেছি। ভারতবর্ষের কোন সমসাময়িক কবির সঙ্গে তাঁর মত কাব্যামোদী স্থলতানের কোন সম্পর্ক ছিল কিনা, সে প্রশ্ন স্বভাবতই উঠতে পারে। এখন আমরা এই প্রশ্নেরই বিচার করব।

মিথিলার বিখ্যাত কবি বিদ্যাপতির জীবৎকাল আনুমানিক ১৩৭০-১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দ। বাংলাদেশে যে সময় গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ রাজা ছিলেন, সেই সময়ে মিথিলায় বসে বিদ্যাপতি তাঁর অনেক শ্রেষ্ঠ পদ রচনা করেছিলেন। অনেকে মনে করেন বিদ্যাপতির সঙ্গে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের যোগাযোগ ছিল এবং বিদ্যাপতি তাঁর একটি পদে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের নাম করেছেন। এরকম ধারণার কারণ বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত একটি পদের (বিদ্যাপতি, খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত, ২ নং পদ) ভনিতা এই,

বেকতও চোরি গুপুত কর কতিখন বিদ্যাপতি কবি ভান।
মহলম জুগপতি (যুগপতি) চিরে জীবে জীবথু গ্যাসদীন স্থরতান॥

কিন্তু এই "বিদ্যাপতি কবি" কে এবং "গ্যাসদীন স্থরতান" কে, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। একদল পণ্ডিত বলেন "বিদ্যাপতি কবি" মৈথিল বিদ্যাপতি এবং "গ্যাসদীন স্থরতান" গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ।

আবার কোন কোন পণ্ডিত বলেন এই "গ্যাসদীন স্থরতান" দিল্লীর স্থলতান গিয়াসুদ্দীন তোগলক (রাজত্বকাল ১৩২০-১৩২৫ খ্রীঃ) এবং "বিদ্যাপতি কবি" চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকের কোন অজ্ঞাতপরিচয় 'বিদ্যাপতি' নামধারী কবি ; অথবা এটি ঐ সময়কার অন্য কোন কবির লেখা, গায়েন বা লিপিকরের ভ্রমক্রমে ভনিতায় 'বিদ্যাপতি'র নাম বসে গেছে।

আর একদল পণ্ডিত বলেন এই বিদ্যাপতি সুপরিচিত মৈথিল কবি বিদ্যাপতিই বটেন, কিন্তু "গ্যাসদীন সুরতান" দিল্লীর সুলতান দ্বিতীয় গিয়াসুদ্দীন তোগলক, যিনি ১৩৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৩৮৯ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

এ সম্বন্ধে চতুর্থ মত হচ্ছে এই যে এই "গ্যাসদীন সুরতান" বাংলার সুলতান গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ (১৫৩৩-১৫৩৮ খ্রীঃ) এবং "বিদ্যাপতি কবি" ষোড়শ শতকের বিখ্যাত পদকর্তা কবিশেখর, যিনি 'বিদ্যাপতি' ভনিতাতেও পদ রচনা করতেন।

এই রকম অবস্থায় বিষয়টি সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা খুবই দুরূহ। তবে মোটামুটিভাবে বলা যায়, উপরে উল্লিখিত চারটি মতের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মতের ভিত্তি খুব দৃঢ় নয়। কারণ চতুর্দশ শতকের প্রথম দিক্‌কার কোন "বিদ্যাপতি কবি"র কথা এ পর্যন্ত জানা যায় নি অথবা পদটির ভণিতা পালটেছে বলেও বিনা প্রমাণে সিদ্ধান্ত করা যায় না। সেই রকম দ্বিতীয় গিয়াসুদ্দীন তোগলক খুব অল্প সময়ের জন্য দিল্লী সমেত ছোট একটি অঞ্চলের রাজা হয়েছিলেন, বিদ্যাপতির দেশ মিথিলা বা তার প্রতিবেশী কোন অঞ্চলে এই রাজার কোন অধিকার ছিল না। সুতরাং বিদ্যাপতি এই নগণ্য সুলতানের নাম তাঁর পদের ভনিতায় উল্লেখ করবেন এবং তাঁকে "যুগপতি" বলবেন বলে বিনা প্রমাণে বিশ্বাস করা যায় না। সুতরাং প্রথম ও চতুর্থ মতের মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণীয়, সে সম্বন্ধেই বিতর্ককে সীমাবদ্ধ করা চলে। এই "গ্যাসদীন সুরতান" যে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ, সে কথা বলার স্বপক্ষে যুক্তি এই:—

(১) আলোচ্য পদটি মিথিলা-নিবাসী লোচন কর্তৃক সংকলিত 'রাগতরঙ্গিণী'তে পাওয়া যায়। 'রাগতরঙ্গিণী'র উপক্রমে লোচন মিথিলার বিখ্যাত কবি বিদ্যাপতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন। দ্বিতীয় কোন বিদ্যাপতির কথা তিনি ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ করেন নি। অতএব লোচন বিদ্যাপতি-নামাঙ্কিত যে সমস্ত পদ সংগ্রহ করেছেন, সেগুলি সবই মৈথিল বিদ্যাপতির রচনা বলে মনে করা যেতে পারে। এই পদটি মৈথিল বিদ্যাপতির লেখা হলে "গ্যাসদীন সুরতান" তাঁর সমসাময়িক সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ বলেই প্রতিপন্ন হন।

(২) গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ কাব্যরসিক ছিলেন। তিনি নিজেও কবিতা লিখতেন এবং মহাকবি হাফিজের কাছে এক ছত্র কবিতা পাঠিয়ে

তাঁকে দিয়ে কবিতাটি পূরণ করিয়েছিলেন। গিয়াসুদ্দীন মাহ্মুদ শাহের কাব্যরসিকতা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব পদটিতে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের কথাই বলা হয়েছে বলে মনে হয়।

(৩) গিয়াসুদ্দীন মাহ্মুদ শাহ অপদার্থ, বিলাসী ও দুশ্চরিত্র প্রকৃতির লোক ছিলেন। এই কারণে একমাত্র চাটুকার ভিন্ন আর কেউ তাঁকে "যুগপতি" বলতে পারেন না। কিন্তু গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ সম্বন্ধে "যুগপতি" বিশেষণ খুব সার্থকভাবেই প্রযুক্ত হতে পারে।

কিন্তু "গ্যাসদীন সুরতান" যে গিয়াসুদ্দীন মাহ্মুদ শাহ, তা বলার দিকেও কয়েকটি যুক্তি আছে। এই বইয়ের নবম অধ্যায়ে গিয়াসুদ্দীন মাহ্মুদ শাহ সংক্রান্ত আলোচনার মধ্যে আমরা ঐ যুক্তিগুলির উল্লেখ করেছি। আজম শাহ ও মাহ্মুদ শাহ, উভয়েরই স্বপক্ষে যুক্তি আছে, আবার কারও পক্ষের যুক্তিই চূড়ান্ত নয়। এই অবস্থায় আলোচ্য বিষয়টি সম্বন্ধে শেষ কথা বলা বর্তমানে সম্ভব নয়। অবশ্য "গ্যাসদীন সুরতান"কে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের সঙ্গেই অভিন্ন ধরতে ইচ্ছা যায়। পারস্যের অমর কবি হাফিজ তাঁর গজলের ভনিতায় যে সুলতানের নাম পরম সমাদরে উল্লেখ করেছেন, মিথিলার অমর কবি বিদ্যাপতিও তাঁর পদের ভণিতায় সেই সুলতানের নামই প্রশস্তি-সহকারে উল্লেখ করেছেন বলে ভাবতে ভালো লাগে। কিন্তু ঐতিহাসিকের কাছে তাঁর ব্যক্তিগত রুচি বড় কথা নয়, তথ্য ও যুক্তিই প্রধান। সেই জন্যে "গ্যাসদীন সুরতান"-কে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের সঙ্গে অভিন্ন বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করতে পারলাম না।

ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক মনে করেন, 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যের রচয়িতা বাঙালী মুসলমান কবি শাহ মোহাম্মদ সগীর গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের পৃষ্ঠ-পোষণ লাভ করেছিলেন। তিনি "চট্টগ্রামের পুঁথির সহিত মিলাইয়া ত্রিপুরার খণ্ডিত পুঁথির পত্র হইতে কবির যে আত্মবিবরণী" "প্রস্তুত" করেছিলেন, তা ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের 'মাহে-নও' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এর পরে 'মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য' (১৯৫৭) গ্রন্থে তিনি ঐ আত্মবিবরণীর অবিকল (অসংশোধিত) পাঠ ও আলোকচিত্র প্রকাশ করেছেন। আত্মবিবরণীর নিম্নোদ্ধৃত ছত্রগুলি থেকেই ডঃ হক তাঁর পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন,

রাজা রাজ্যেশ্বর মধ্যে ধার্মিক পণ্ডিত।
দেব অবতার নৃপ জগৎ বিদিত॥

(৫) শাহ মোহাম্মদ সগীরকে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের সমসাময়িক বলে মনে করলে বলতে হবে, সগীর বিদ্যাপতির সমসাময়িক এবং কৃত্তিবাসের চেয়ে প্রাচীনতর কবি। কিন্তু সগীরের কাব্যের যে সমস্ত অংশ ডঃ হক এবং অন্যান্য গবেষকরা এ পর্যন্ত উদ্ধৃত করেছেন, তাদের ভাষা বিচার করলে সগীরকে এত প্রাচীন কবি বলে মনে হয় না। অবশ্য সগীর যে ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্তী নন, তা'ও তাঁর ভাষা থেকেই বলা যায়।

(৬) জনাব সুলতান আহমদ ভুঁইয়া সগীরের প্রাচীনত্ব স্বীকার করেন না। তিনি একাধিক প্রবন্ধে এসম্বন্ধে ডঃ এনামুল হকের মতকে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। একটি প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় রক্ষিত 'ইউসুফ-জোলেখা'র একটি পুঁথিতে কাব্যের কাহিনীর মধ্যে তার অন্যতম চরিত্র রাজা তৈমূসের গুণ-বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখা রয়েছে,

মনুষ্যের মৈদ্ধে জেন ধর্ম্ম অবতার।
মোহা মোহা নরপতি পৃথিদ্বির সার॥

* * *

রাজা রাজেশ্বর মোহা ধাম্মিক পণ্ডিত।
দেব অবতার নৃপ জগত বিদিত॥

* * *

করুণা হৃদএ রাজা পুণ্য ততপর।
সর্বগুণে অসীম অতুল মেনোহর॥
পুর্ন্নিমার চন্দ্র জিনি বদন সোন্দর।
মধুর মধুর বানি কহে মৃদুশ্বর।
রমনি বল্লব নৃপ রসে নিউপমা।
কনে বা কহিতে পারে সে গুন মহিমা॥

এই ছত্রগুলিই আবার ডঃ এনামুল হক কর্তৃক প্রকাশিত সগীরের পূর্বোক্ত রাজবন্দনার মধ্যে প্রায় অবিকলভাবে পাওয়া যায়—দু'একটি শব্দ মাত্র পরিবর্তিত হয়েছে। এইভাবে জনাব ভুঁইয়া রাজবন্দনার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে (তাঁরই ভাষায়) "ঘোরতর সন্দেহের অবকাশ" সৃষ্টি করেছেন।

এরপর জনাব সুলতান আহমদ ভুঁইয়া 'নও বাহার' পত্রিকার চতুর্থ বর্ষ পঞ্চম সংখ্যায় (পৃঃ ২২৫-২২৮) প্রকাশিত এক প্রবন্ধে লেখেন, "শাহ মোহাম্মদ

সগীরের কাব্যে আমরা যে সমস্ত ভনিতা পাই তাহাতে দেখা যায় যে, কবি ইহা ফারসী কোনও কিতাব দেখিয়া রচনা করিয়াছেন। ...পারস্য সাহিত্যের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, মহাকবি ফেরদৌসী এবং মোল্লা আবদুর রহমান জামী (১৪১৪-৯২ খৃঃ) 'যসুফ জোলেখা' নামীয় কাব্য যথাক্রমে একাদশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচনা করিয়াছেন। ......ফেরদৌসী, জামী ও সগীরের কাব্য আলোচনা করিয়া আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, সগীরের কাব্যখানি জামীর কাব্যের অনুকরণে রচিত; ফেরদৌসীর কাব্যের কোন প্রভাব তাঁহার কাব্যে নাই। সুতরাং জামীর 'য়ুসুফ জোলেখা' কাব্য রচনার (রচনাকাল—৮৮৮হিঃ=১৪৮৩ খৃঃ দ্রষ্টব্য—Literary History of Persia—E. G. Brown, Vol. III, page 516) অন্ততঃ পক্ষে একশত বৎসর পরে আমাদের বঙ্গাল দেশের কবি শাহ মোহাম্মদ সগীর তাঁহার 'য়ুসুফ জোলেখা' কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন, ইহা সহজেই অনুমেয়। কাজেই খুব নেক নজরে দেখিলেও শাহ মোহাম্মদ সগীরকে কিছুতেই ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদের পূর্বে ফেলা যায় না।"

এতক্ষণ যে আলোচনা করা হল, তার ফলে আশা করি সকলেই বুঝতে পারবেন যে সগীরকে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের সমসাময়িক বলার প্রচণ্ড অসুবিধা আছে। কোন কবিকে এতখানি প্রাচীন বলে নিঃসংশয়ে ঘোষণা করতে গেলে আরও জোরালো প্রমাণের প্রয়োজন।[*]

মুদ্রার সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে, গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ ৮১৩ হিজরা বা ১৪১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন, কারণ ঐ বছরেই তার মুদ্রা শেষ হয়েছে এবং তার পুত্র সৈফুদ্দীন হমজা শাহের মুদ্রা শুরু হয়েছে। সমসাময়িক আরবী ঐতিহাসিক ইবন্-ই-হজর লিখছেন যে গিয়াসুদ্দীন ৮১৪ হিজরায়

[*] উদীয়মান-গবেষক শেখ এ. টি. এম রুহুল আমিনের মতে সগীরের আত্মবিবরণীতে উল্লিখিত "গোছ" কবির পৃষ্ঠপোষকেরই নাম, তবে ইনি গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ নন, বাংলার আফগান সুলতান গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ (১৫৫৬-১৫৬০ খ্রীঃ)। এই সুলতানের পিতা শামসুদ্দীন মুহম্মদ গাজী—আদিল শাহ সূরের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন, তার রাজ্যও (বাংলাদেশ) শত্রুর হস্তগত হয়; গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ নিজের চেষ্টায় হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করে এবং পিতৃশত্রু আদিল শাহকে পরাজিত ও নিহত করে পিতার কীর্তিকে ম্লান করে দিয়েছিলেন, এইজন্য "ঠাই ঠাই ইচ্ছে রাজা আপনা বিজয়।...লইলেন্ত রাজ্যপাট বঙ্গাল গৌড়িআ" চরণগুলি তাঁর সম্বন্ধে সার্থকভাবে প্রযোজ্য (মাসিক মোহাম্মদী, শ্রাবণ, ১৩৭১, পৃঃ ৬৫৪-৬৫৭ দ্রঃ)। "গোছ" যদি সুলতানের নাম হয়, তা হলে জনাব আমিনের মতই যুক্তিযুক্ত বলতে হবে।

(১৪১১-১২ খ্রীঃ) পরলোকগমন করেছিলেন; এর কারণ সম্ভবত এই যে, ইব্ন্-ই-হজর ঐ বছরেই গিয়াসুদ্দীনের মৃত্যু সংবাদ পেয়েছিলেন। 'মিং-শ্‌র্' থেকে জানা যায় যে, চীন সম্রাট ১৪১২ খ্রীষ্টাব্দে গিয়াসুদ্দীনের মৃত্যু-সংবাদ পেয়েছিলেন। 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' লেখা আছে, "রাজা কান্স্, যিনি ঐ অঞ্চলের একজন জমিদার ছিলেন, তাঁর কৌশলের দ্বারা সুলতান (গিয়াসুদ্দীন)-কে বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করা হয়।" অন্য কোন সূত্রে এই উক্তির সমর্থন না পাওয়া গেলেও এ ব্যাপার সম্পূর্ণ সম্ভাব্য। আমরা আগেই দেখাবার চেষ্টা করেছি যে গিয়াসুদ্দীন তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে ধর্মান্ধ হয়ে উঠে হিন্দু-বিরোধী নীতি অনুসরণ করেছিলেন এবং তার ফলে গণেশ তাঁর পক্ষ থেকে বিপক্ষে চলে গিয়েছিলেন। সম্ভবত এই ব্যাপারেরই পরিণতিস্বরূপ গণেশের ষড়যন্ত্রে গিয়াসুদ্দীন নিহত হন।

সৈফুদ্দীন হম্‌জা শাহ

গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের মৃত্যুর পর তাঁব পুত্র সৈফুদ্দীন হম্‌জা শাহ রাজা হলেন। মুদ্রার সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে, ইনি ৮১৩ হিজরায় (১৪১০-১১ খ্রীঃ) সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৮১৫ হিজরায় (১৪১২-১৩ খ্রীঃ) এঁর রাজত্ব শেষ হয়। 'তবকাৎ-ই-আকবরী', 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা এবং 'রিয়াজ উস্-সলাতীনে' লেখা আছে যে এঁর উপাধি ছিল 'সুলতান-উস্ সলাতীন' (রাজাধিরাজ)। 'রিয়াজ'-এর মতে অমাত্য ও সেনাপতিরা সৈফুদ্দীনকে এই উপাধি দেন। সৈফুদ্দীনের এই উপাধি সত্যিই ছিল, কারণ বিভিন্ন মুদ্রায় এই উপাধি উল্লিখিত আছে।

'তারিখ-ই-ফিরিশতা'য় সৈফুদ্দীন হম্‌জা শাহ সম্বন্ধে লেখা আছে, "তিনি ছিলেন সাহসী, ধৈর্যশীল এবং উদার নরপতি। তাঁর বুদ্ধি ও ব্যাবহারিক অভিজ্ঞতা থাকার জন্য তাঁর কর্মচারীরা সাবধানে শাসনকার্য পরিচালনা করত। দেশের (হিন্দু) রাজারা তাঁর বশ্যতার জোয়াল থেকে মাথা বার করত না এবং রাজস্ব দিতে দেরী করত না। 'তবকাৎ-ই-আকবরী'তে সৈফুদ্দীন সম্বন্ধে লেখা আছে, "তিনি দয়ালু, ধৈর্যশীল এবং সাহসী রাজা ছিলেন।"

এই সব প্রশংসোক্তি কতদূর সত্য, তা বলা যায় না। আচার্য যদুনাথ সরকার মনে করেন যে ফিরিশ্‌তার কথাগুলি গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের

সম্বন্ধে প্রযোজ্য, ফিরিশ্‌তা ভুলক্রমে এগুলি সৈফুদ্দীন হম্‌জা শাহের উপরে আরোপ করেছেন (History of Bengal, D.U., Vol. II, pp. 115-116)। এই অনুমান খুবই যুক্তিসঙ্গত।

সৈফুদ্দীন হম্‌জা শাহের রাজত্বকালে অন্তত একবার চীন-সম্রাটের দূতেরা এসেছিল—গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশের জন্য। এ সম্বন্ধে চীনের মিং রাজবংশের ইতিহাসগ্রন্থ 'মিং-শ্‌র্'-এ লেখা আছে,* "য়ুং-লো'র রাজত্বের দশম বর্ষে (১৪১২ খ্রীঃ) বাংলার রাজদূতেরা চীনে পৌছোবার পূর্বাহ্লে সম্রাট তাঁদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করবার জন্য কয়েকজন মন্ত্রীকে চেন-চিয়াং-এ পাঠালেন। ব্যবস্থা যখন সম্পূর্ণ, এমন সময় বাংলার দূতেরা তাদের রাজার (গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ) মৃত্যু-সংবাদ নিয়ে পৌছালো। (মৃত রাজার) শোকানুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্যে (চীন থেকে) রাজপুরুষদের পাঠানো হল। তাঁর উত্তরাধিকারী পুত্র সাই-উ-তিং (সৈফুদ্দীন) কে রাজারূপে নিযুক্ত করা হল।"†

ইব্‌ন্‌-ই-হজরের 'ইন্‌বাউ'ল্‌-গুম্‌র্' থেকে জানা যায় যে, সৈফুদ্দীন হম্‌জা শাহের ক্রীতদাস শিহাব তাঁকে পরাভূত ও নিহত করে সিংহাসন অধিকার করে। মুদ্রার সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে, এই শিহাবই শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ নিয়ে সৈফুদ্দীনের পরে সুলতান হন।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণের পতনের পর যেমন নগণ্য শল্য সেনাপতি হয়েছিলেন, তেমনি ইলিয়াস শাহী বংশের শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ, সিকন্দর শাহ এবং গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ—এই তিনজন দিক্‌পাল সুলতানের পরে দুর্বল সৈফুদ্দীন হম্‌জা শাহ রাজা হন ; শল্যের সেনাপতিত্বের মত সৈফুদ্দীনের রাজত্বও অল্পকাল স্থায়ী হয়েছিল।

সৈফুদ্দীন হম্‌জা শাহের যে সমস্ত মুদ্রা এপর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি সাতগাঁও, মুয়াজ্জমাবাদ এবং ফিরোজাবাদ বা পাণ্ডুয়ার টাকশালে উৎকীর্ণ হয়েছিল। তাঁর কোন শিলালিপি এপর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

---

* ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচীর ইংরেজী অনুবাদ (Visva-Bharati Annals, Vol. I, p. 133 দ্রঃ) সংশ্লিষ্ট অংশটির ক্ষেত্রে ঠিক মূলানুগ নয়। অধ্যাপক নারায়ণচন্দ্র সেন মূল চীনা গ্রন্থ থেকে এই অংশটির বঙ্গানুবাদ করে দিয়েছেন এবং আমরা তারই উপর নির্ভর করেছি।

† চীন-সম্রাটেরা পৃথিবীর অন্যান্য রাজাদের নিজেদের সামন্ত বলে মনে করতেন।

তৃতীয় অধ্যায়

রাজা গণেশের ক্ষমতা-অধিকার—ক্রীড়নক রাজবংশ

শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ

সৈফুদ্দীন হম্‌জা শাহের মৃত্যুর পর বাংলাদেশের শাসনক্ষমতা কার্যত রাজা গণেশের হাতে এল। কিন্তু নামে রাজা হলেন অন্য ব্যক্তি। তাঁর নাম শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ।

'তবকাৎ-ই-আকবরী', 'আইন-ই-আকবরী', তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা', 'রিয়াজ উস্‌-সলাতীন' প্রভৃতি গ্রন্থের মতে সৈফুদ্দীন হম্‌জা শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শামসুদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু মুদ্রার সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে, সৈফুদ্দীনের পরবর্তী রাজার নাম শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ। শিহাবুদ্দীন তাঁর মুদ্রায় নিজেকে সৈফুদ্দীনের পুত্র বলেন নি। বাংলাদেশে যখনই কোন সুলতানের পুত্র সুলতান হয়েছেন, তিনি মুদ্রায় নিজেকে সুলতানের পুত্র বলেছেন। শিহাবুদ্দীন সুলতানের পুত্র হলে সে কথা তাঁর মুদ্রায় অনুল্লিখিত থাকত না। অতএব শিহাবুদ্দীন যে সৈফুদ্দীনের পুত্র ছিলেন না, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'রিয়াজ'-এ শিহাবুদ্দীনের প্রকৃত নাম এবং সৈফুদ্দীনের পুত্র না হওয়ার ব্যাপারটা একটা মতান্তর হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে; 'রিয়াজ'-এ লেখা আছে, "কেউ কেউ লিখেছেন যে এই শামসুদ্দীন সুলতান-উস্‌-সলাতীনের ঔরসপুত্র ছিলেন না, পালিতপুত্র ছিলেন এবং তাঁর নাম ছিল শিহাবুদ্দীন।" একমাত্র বুকানন-বিবরণীতেই 'শামসুদ্দীন' নামের উল্লেখ নেই, তাতে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে, "…Syafudin, who governed three years, and was succeeded by his slave Sahabudin, who also governed three years."

বুকানন-বিবরণীতে আর একটি নতুন খবর দেওয়া হয়েছে যে শিহাবুদ্দীন ছিলেন সৈফুদ্দীনের ক্রীতদাস। এতদিন পর্যন্ত অন্য কোন সূত্রে এই কথার সমর্থন পাওয়া যায় নি। কিন্তু একটি সম্প্রতি-আবিষ্কৃত প্রামাণিক সূত্র—সমসাময়িক আরবী ঐতিহাসিক ইব্‌ন্‌-ই- হজর রচিত গ্রন্থ 'ইনবাউ'ল গুমর্‌'-

পরিষ্কারভাবে লেখা আছে যে শিহাব অর্থাৎ শিহাবুদ্দীন সৈফুদ্দীনের ক্রীতদাস ছিলেন। ইব্‌ন্‌-ই-হজরের বিবরণ থেকে আরও জানা যায় যে শিহাব সৈফুদ্দীনকে পরাজিত ও নিহত করে রাজা হয়েছিলেন এবং তাঁকে পরাস্ত ও নিহত করেছিলেন "ফন্দু কাস" অর্থাৎ হিন্দু গণেশ। ইব্‌ন্‌-ই-হজরের এই বিবরণ সম্পূর্ণ প্রামাণ্য।*

অতএব শিহাবুদ্দীন সৈফুদ্দীনের ক্রীতদাস ছিলেন বলেই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। কিন্তু ক্রীতদাস প্রভুকে পরাস্ত ও নিহত করে রাজা হলেন। যতদূর মনে হয়, অমিতশক্তিধর গণেশের সাহায্যের ফলেই শিহাবুদ্দীন এই অসাধ্য সাধন করতে পেরেছিলেন। ফিরিশ্‌তার মতে গণেশ শিহাবুদ্দীনকে শিখণ্ডী খাড়া করে রেখে নিজে রাজ্যের কর্তৃত্ব হস্তগত করেছিলেন। তিনি লিখেছেন,

"তাঁর (শিহাবুদ্দীনের) তরুণ বয়সের জন্য বুদ্ধি অত্যন্ত কম ছিল। কান্‌স্‌ নামে একজন বিধর্মী, যিনি এই বংশের (ইলিয়াস শাহী বংশের) অন্যতম অমাত্য ছিলেন, তিনি এঁর রাজত্বকালে বিরাট ক্ষমতা ও প্রাধান্য অর্জন করেন এবং রাজ্য ও রাজস্ব—সব কিছুরই উপর পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করেন।"

এই বর্ণনা মূলত সত্য বলেই মনে হয়। 'আইন-ই-আকবরী' ও 'রিয়াজ-উস-সলাতীনে' এই বর্ণনার সমর্থন আছে।

শিহাবুদ্দীন চীনসম্রাটকে (স্পষ্টত সৈফুদ্দীনের আমলে দূত ও উপহার প্রেরণের জন্য) ধন্যবাদ জানিয়ে এক লিপি পাঠান এবং সেই সঙ্গে নানারকম উপহার পাঠান। তার মধ্যে ছিল জিরাফ, বাংলার বিখ্যাত ঘোড়া এবং বাংলার বিভিন্ন উৎপন্ন দ্রব্য। তাঁর পাঠানো জিরাফ চীনদেশে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। 'শি-য়াং-ছাও-কুং-তিয়েন-লু', 'শু য়ু-চৌ-ৎজ্‌-লু', 'মিং-শ্‌র্‌' প্রভৃতি চীনা ইতিহাসগ্রন্থে এর বিবরণ পাওয়া যায় (এই বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ ৮১৫ হিজরায় (১৪১২-১৪১৩ খ্রীঃ) সিংহাসনে বসেন এবং ৮১৭ হিজরায় (১৪১৪-১৪১৫ খ্রীঃ) তাঁর রাজত্ব শেষ হয়। তাঁর মুদ্রাগুলি ফিরোজাবাদ বা পাণ্ডুয়া, সাতগাঁও ও মুয়াজ্জমাবাদের টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ হয়েছিল। এপর্যন্ত তাঁর কোন শিলালিপি মেলে নি।

* ইব্‌ন্‌-ই-হজরের কিঞ্চিৎ পরবর্তী আরবী ঐতিহাসিক অল-সখাওয়ী লিখেছেন যে শিহাব গণেশ কর্তৃক আক্রান্ত ও নিহত হয় নি, গণেশই ("ফন্দু কাস") শিহাব কর্তৃক আক্রান্ত ও নিহত হন এবং গণেশের পুত্র মুসলমান হয়ে শিহাবকে আক্রমণ করে তার রাজ্য কেড়ে নেন। বলা বাহুল্য অল-সখাওয়ীর উক্তি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

শিহাবুদ্দীনের মৃত্যু সম্বন্ধে 'রিয়াজ'-এ তিনটি মত উল্লিখিত হয়েছে, (১) স্বাভাবিক রোগভোগের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়; (২) রাজা গণেশের কৌশলে তিনি নিহত হন; (৩) রাজা গণেশ তাঁকে আক্রমণ করে বধ করেন। ইব্‌ন্-ই-হজরের 'ইন্‌বাউ'ল-গুম্‌র্' থেকে জানা যায় যে, এদের মধ্যে তৃতীয় মতটিই সত্য, অর্থাৎ শিহাবুদ্দীন গণেশ কর্তৃক আক্রান্ত, পরাজিত ও নিহত হয়েছিলেন। সম্ভবত শিহাবুদ্দীন গণেশের বিরুদ্ধে যাবার চেষ্টা করাতেই গণেশ তাঁকে আক্রমণ ও বধ করেছিলেন।

আচার্য যদুনাথ সরকারের মতে সৈফুদ্দীন ও শিহাবুদ্দীনের রাজত্বকালে আমীরদের ক্ষমতা খুব বৃদ্ধি পেয়েছিল, কারণ উভয় সুলতানকেই আমীরেরা সিংহাসনে বসিয়েছিলেন বলে 'তবকাৎ-ই-আকবরী', 'তারিখ-ই ফিরিশ্‌তা', 'রিয়াজ-উস-সলাতীন' প্রভৃতি গ্রন্থে লেখা আছে। কিন্তু এই মত সমর্থন করা যায় না, কারণ পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলিতে সিকন্দর শাহ, রুকনুদ্দীন বারবক শাহ প্রভৃতি পরাক্রান্ত সুলতানদের সম্বন্ধেও লেখা হয়েছে যে আমীরেরা তাঁদের সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। সম্ভবত বাংলাব প্রত্যেক সুলতানই সিংহাসনে আরোহণের সময়ে আমীরদেব আনুষ্ঠানিক অনুমোদন গ্রহণ করতেন। সৈফুদ্দীন ও শিহাবুদ্দীনের রাজত্বকালে গণেশ ছাড়া আর কোন আমীরের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে মনে হয় না।

আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ

মুদ্রার সাক্ষ্য থেকে দেখা যায়, শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ রাজা হন। তাঁর কেবলমাত্র ৮১৭ হিজরার (১৪১৪-১৫ খ্রীঃ) মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। এই মুদ্রাগুলি সাতগাঁও ও মুয়াজ্জমাবাদের টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ হয়েছিল।

আজ অবধি কোন ইতিহাস-গ্রন্থে বা মুদ্রা ভিন্ন অন্য কোন সূত্রে এই আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের নাম পাওয়া যায় নি। যতদূর মনে হয়, ইনি ছিলেন "তরুণ" শিহাবুদ্দীনের বালক পুত্র; শিহাবুদ্দীনকে বধ করার পরে গণেশ এঁকে রাজা হিসাবে খাড়া করে আগের মত রাজ্যশাসন করতে থাকেন এবং কয়েকমাস বাদে যখন বোঝেন আর কাউকে শিখণ্ডী হিসাবে খাড়া করে না রাখলেও চলবে, তখন তিনি আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহকে অপসারিত করে নিজেই সিংহাসনে আরোহণ করেন; সম্ভবত আলাউদ্দীন গণেশের হাতে প্রাণও হারান।

চতুর্থ অধ্যায়

রাজা গণেশ

অবতরণিকা

বাংলাদেশের মধ্যযুগের ইতিহাসে যাঁদের নাম ভাস্বর অক্ষরে লেখা রয়েছে, রাজা গণেশ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। একক কৃতিত্বের দিক দিয়ে গণেশের সঙ্গে খুব কম লোকেরই তুলনা চলতে পারে। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা ছিল মুসলমানদের অধিকারে। এর মধ্যে কোন কোন সময় অঞ্চলবিশেষে হিন্দুদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছে বটে, কিন্তু সমগ্র বাংলার সিংহাসন অধিকার এই একটিমাত্র হিন্দুর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে গণেশ বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গের মত আবির্ভূত হয়ে অসাধ্যসাধন করেছিলেন, প্রবল বিরুদ্ধশক্তির বাধাকে জয় করে বাংলায় হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গণেশের কীর্তির অসামান্যতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে দ্বিমত নেই।

অবশ্য এই হিন্দু অভ্যুদয় বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। গণেশের বংশধররা পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে ধর্মান্তর গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁরা বাংলার সিংহাসন বেশীদিন নিজেদের অধিকারে রাখতে পারেননি। কিন্তু স্বল্পস্থায়ী হলেও গণেশ ও তাঁর বংশের রাজত্ব বাংলার ইতিহাসের এক অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অধ্যায়। কারণ, প্রথমত এই বংশ হিন্দুর বংশ, দ্বিতীয়ত এই বংশের রাজারা বাংলা দেশেরই সন্তান। এর আগে যে সমস্ত মুসলমান সুলতান এদেশে রাজত্ব করেছিলেন, তাঁদের পিতৃভূমি ছিল বাংলার বাইরে। তাঁরা নিজেরাও বাংলাকে নিজেদের স্বদেশ বলে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেন নি। তাই বাঙালী জনসাধারণও তাঁদের আপন বলে ভাবতে পারে নি। কিন্তু বাঙালী রাজা গণেশ যেদিন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হলেন, সেদিন থেকে বাংলার রাজশক্তির সঙ্গে বাংলার জনসাধারণের অন্তরের যোগ স্থাপিত হল। এই কারণে রাজা গণেশের আবির্ভাব বাংলার ইতিহাসের একটি যুগ-লক্ষণাক্রান্ত ঘটনা এবং এই ঘটনা থেকেই বাংলার ইতিহাসের একটি নতুন অধ্যায় সুরু হল।

বর্তমান অধ্যায়ে আমরা রাজা গণেশ সম্বন্ধে যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য বিবরণী রচনার চেষ্টা করব। অবশ্য এই অসামান্য রাজার সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য

সূত্র থেকে খুব কম তথ্য পাওয়া যায়। সেটুকু একত্র সংগ্রহ করে সতর্ক-ভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে আমাদের সত্য নির্ধারণের চেষ্টা করতে হবে।

রাজার নাম

প্রথমে রাজার নাম সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা দরকার। আমরা যাঁকে 'রাজা গণেশ' বলছি, সত্যিই তাঁর নাম 'গণেশ' কিনা, সে সম্বন্ধে সকলে এখনও নিঃসংশয় হতে পারেন নি। বাংলা দেশে রাজা গণেশ এবং তাঁর ছেলে যদুর সম্বন্ধে নানারকম মনোহর কিংবদন্তী ও শ্লোক প্রচলিত আছে। যদু যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জলালুদ্দীন নাম নিয়েছিলেন, এ সম্বন্ধে সব কিংবদন্তীই একমত, কিন্তু এই রাজা ও তাঁর ছেলে যদু-জলালুদ্দীন সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য বিবৃতি কেবলমাত্র মুসলমান ঐতিহাসিকদের লেখা ফার্সী বইয়েই মেলে। তাদের মধ্যে রাজার নাম 'কান্‌স্', 'কান্সি', 'কনেস্', 'কানসি'—এইভাবেই পাওয়া যায়। এঁর সমসাময়িক দরবেশ নূর কুৎব্ আলম ও আশরফ সিম্‌নানীর লেখা চিঠিতে এর নাম লেখা আছে 'কান্‌স্ রায়'। একমাত্র ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিপোর্টার ফ্রান্সিস বুকাননের লেখা বা সংগ্রহ করা একটি বিবরণীতে* (যা আনুমানিক ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে পাণ্ডুয়ার একটি পুরোনো ফার্সী পুঁথি অবলম্বনে রচিত হয়েছিল বলে প্রকাশ) রাজার নাম 'গণেশ' রূপে মেলে। এই অবস্থার জন্যে কেউ কেউ বলেন রাজার মূল নাম 'কংস', 'গণেশ' নয়।

দুখানি বাংলা বই এবং একখানি সংস্কৃত বইয়ে "রাজা গণেশ"-এর নাম পাওয়া যায়। বাংলা বই দুটির নাম 'অদ্বৈতপ্রকাশ' (রচনাকাল ১৫৬৮ খ্রীঃ বলে কথিত) ও প্রেমবিলাস (রচনাকাল ১৬০০ খ্রীঃ বলে কথিত) এবং সংস্কৃত বইটির নাম 'বাল্যলীলাসূত্র' (রচনাকাল ১৪৮৭ খ্রীঃ বলে কথিত)। তিনখানি বইতেই বলা হয়েছে "রাজা গণেশ" অদ্বৈতের পূর্বপুরুষ নরসিংহ নাড়িয়ালকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করেছিলেন। প্রেমবিলাসের চতুর্বিংশ বিলাসে আছে,

> প্রভাকরের পুত্র নরসিংহ নাড়িয়াল।
> গণেশ রাজার মন্ত্রী লোকে ঘোষে সর্বকাল॥

* Martin's Eastern India, Vol. II, p. 616—621. এটি আসলে মেজর উইলিয়ম ফ্রাঙ্কলিনের লেখা বলে বেভারিজ মনে করেন (J. A. S. B., 1894, Pt. I, pp. 91—93 দ্রঃ)।

... ...

দৈবে শ্রীহট্ট হৈতে শ্রীগণেশ রাজা।
নরসিংহ নাড়িয়ালে করিলেক পূজা॥

'অদ্বৈতপ্রকাশে' আছে,

সেই নরসিংহের যশ ঘোষে ত্রিভুবন।
সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অতি বিচক্ষণ॥
যাঁহার মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়ের বাদশাহ্ মারি গৌড়ে হৈল রাজা॥

'বাল্যলীলাসূত্রে' আছে,

শ্রীমান নৃসিংহস্য মহাত্মনো বৈ যশঃপ্রসূনে স্ফুটিতে মনোজ্ঞে।
তৎসৌরভব্যূহবিমোহিতাত্মা রাজা গণেশো বহুশাস্ত্রদর্শী॥

গ্রহপক্ষাক্ষিশশধৃতমিতে শাকে সুবুদ্ধিমান্।
গণেশো যবনং জিত্বা গৌড়ৈকচ্ছত্রধৃগভূৎ॥

বিশেষজ্ঞদের গবেষণার ফলে প্রমাণিত হয়েছে এই তিনখানি বই যতটা প্রাচীনত্ব দাবী করছে, ততটা প্রাচীন নয়। সুতরাং এদের মধ্যে বর্ণিত ঘটনার ঐতিহাসিকতা সন্দেহজনক। কিন্তু রাজার নাম সম্বন্ধে এদের সাক্ষ্যকে সরাসরি অগ্রাহ্য করা চলে না।

এই রাজার প্রকৃত নাম যে 'গণেশ', একথা মনে করার স্বপক্ষে আরও অনেক যুক্তি আছে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক বেভারিজ এই যুক্তিগুলি দেখিয়েছিলেন—গ্ (গাফ্) এবং ক্ (কাফ্) অক্ষরের পার্থক্য ফার্সী পুঁথিতে সাধারণতঃ রক্ষিত হয় না এবং 'গাফ্'-এর জায়গায় 'কাফ্'ই প্রায় সর্বত্র লেখা হয়।...১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের Journal Asiatique-এর ২০৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত কান্দাহার শিলালিপিতে দেখতে পাওয়া যায়, 'ঘোড়াঘাট', 'গৌড়' এবং 'বাঙ্গালা' নামগুলি লেখা হয়েছে যথাক্রমে 'কোড়াকাট', 'কৌড়' এবং 'বাঙ্কালা' রূপে। এই কারণে 'কান্স' ও 'কনেস' মূলে 'গণেশ' ছিল বলে মনে হয়।... তাছাড়া সব পুঁথিতেই 'কান্স' নাম পাওয়া যায় বললে ভুল হবে। অন্তত একখানি পুঁথিতে নিশ্চয়ই 'গণেশ' নাম ছিল, যেখানি বুকানন ব্যবহার করেছিলেন।... শুধু তাই নয়, 'গণেশ' রাজার স্মৃতি এখনও জনপ্রবাদের মধ্যে বেঁচে আছে। এঁর প্রকৃত নাম যদি 'কংস' হয়, তাহলে বলতে হবে, এতবড়

একজন হিন্দু রাজার আসল নাম তাঁর স্বধর্মের লোকেরা ভুলে গেছে, কেবল মুসলমানরাই মনে করে রেখেছে। এ ব্যাপার অসম্ভব বলেই মনে হয়। (J. A. S. B, 1892, Pt. I, No. 2, pp. 118-119)

'গণেশ' নামের আদ্যক্ষর 'গ্' যে ফার্সী পুথিতে 'ক্' হয়ে পড়ত, তার আরও প্রমাণ আমরা পেয়েছি। লোদী বংশের সুলতান সিকন্দর লোদীর সময়ে 'গণেশ নামে একজন হিন্দু রাজা ছিলেন, তাঁর আসল নামটি কেবলমাত্র 'মখ্জান-ই-আফ্গানী'র পুঁথিতে বিশুদ্ধভাবে পাওয়া যায়। 'তবকাৎ-ই-আকবরী'র পুঁথিতে এঁর নাম হয়ে পড়েছে 'কনিস্'। সুতরাং বাংলার এই বিখ্যাত রাজার নামও মূলে 'গণেশ' ছিল বলে মনে হয়। কিন্তু সমসাময়িক আরবী ঐতিহাসিক ইব্ন্-ই-হজর ও তাঁর অনুবর্তী কোন কোন গ্রন্থকার গণেশের নাম লিখেছেন "ফন্দু কাস"। "ফন্দু" "হিন্দুর" বিকৃত রূপ ; "কাস" সম্ভবত "গণেশ"-এর বিকৃত রূপ। কিন্তু "কাস" "কাশী"রও অপভ্রংশ হতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মুন্সী শ্যামপ্রসাদ মেজর উইলিয়ম ফ্রাঙ্কলিনের জন্য ফার্সী ভাষায় গৌড়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা করেছিলেন ; এই ইতিহাসে তিনি লিখেছেন যে জলালুদ্দীনের পিতার নাম ছিল "কাশী রায়" (J. A. S. B., 1902, Pt. I, p. 44 দ্রঃ)। "কাশী"-ও সংস্কৃত ভাষায় অজ্ঞ লিপিকরের হাতে পড়ে ফার্সী পুঁথিতে "কান্স্"-এ পরিণত হতে পারে। এই রাজার নাম 'গণেশ' ছিল বলেই আমাদের ধারণা। এই বইয়েব সর্বত্র এই নামেই আমর এঁর উল্লেখ করেছি। কিন্তু ইব্ন্-ই-হজর প্রভৃতি সমসাময়িক লেখকদের এবং হিন্দু ঐতিহাসিক মুন্শী শ্যামপ্রসাদের বিপরীত সাক্ষ্যের জন্য এ সম্বন্ধে একটু সন্দেহ থেকে গেল।

ঐতিহাসিক সূত্র

যে সমস্ত সূত্রের মধ্যে গণেশ ও তাঁর বংশের ইতিহাস পাওয়া যায়, তার মধ্যে আইন-ই-আকবরী, তবকাৎ-ই-আকবরী, মাসির-ই-রহিমী, তারিখ-ই-ফিরিশ্তা, রিয়াজ-উস্-সলাতীন এবং বুকাননের বিবরণী উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই সূত্রগুলির মধ্যে একটিও গণেশের সমসাময়িক নয়। আইন-ই-আকবরী' ও 'তবকাৎ-ই-আকবরী' আকবরের রাজত্বকালে এবং 'মাসির-ই-রহিমী' ও 'তারিখ-ই-ফিরিশ্তা' জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে রচিত হয়। 'রিয়াজ-উস্ সলাতীন' ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে লেখা। এর লেখক গোলাম হোসেন তাঁর ব্যবহৃ

সূত্রগুলির নাম দু'এক জায়গা ভিন্ন কোথাও উল্লেখ করেন নি, কিন্তু তিনি যে 'আইন-ই-আকবরী', 'তবকাৎ-ই-আকবরী', 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা' এবং আরও কতকগুলি অধুনালুপ্ত বই থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন, তা বোঝা যায়। গোলাম হোসেনের ঐতিহাসিকোচিত দৃষ্টি ছিল। তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে শিলালিপি থেকেও তথ্য আহরণ করেছেন; কিন্তু তিনি অনেক ক্ষেত্রে যে কিংবদন্তীর উপরও নির্ভর করেছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বুকাননের বিবরণী একটি অজ্ঞাতনামা ফার্সী বই অবলম্বনে রচিত হয়েছিল। 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে'র সঙ্গে এই বিবরণীর উক্তির অনেক ক্ষেত্রে মিল আছে কিন্তু পার্থক্যের পরিমাণও উপেক্ষণীয় নয়।

সমসাময়িক নয় বলে এই সমস্ত সূত্রের উক্তি নির্বিচারে গ্রহণযোগ্য নয়, বিশেষত এদের লেখকরা যে সমস্ত সূত্র থেকে তথ্য আহরণ করেছেন, সেগুলির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে যখন আমরা কিছুই জানি না। বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার ফলে এইসব সূত্রের উক্তি অনেক ক্ষেত্রে ভুল প্রমাণিত হয়েছে, বিশেষ করে বিভিন্ন রাজার রাজত্বকাল সম্বন্ধে এদের ভুল অত্যন্ত বেশী। এদের মধ্যে দেওয়া প্রায় কোন ঘটনার সালই শুদ্ধ নয়, এমন কি কোন কোন রাজার নাম সম্বন্ধেও এদের মধ্যে গোলমাল আছে।* এইসব কারণে এদের যে সমস্ত কথা সমসাময়িক সূত্রের উক্তি দ্বারা সমর্থিত, কেবলমাত্র সেইটুকুই নিশ্চিন্ত মনে গ্রহণ করা যায়। অবশ্য যে সব বিষয়ে একাধিক সূত্রের বিবৃতির মধ্যে মিল আছে এবং যে সব

* এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার জন্য আচার্য যদুনাথ সরকার সম্পাদিত **History of Bengal, Vol. II, pp. 115-116** দ্রষ্টব্য।

† জনাব আহমদ হাসান দানী 'দেববংশের ইতিবৃত্তি' নামে আর একটি সূত্রের বিবরণ দিয়েছেন ও ব্যবহার করেছেন (J.A.S., 1952, pp. 151-52)। এই তথাকথিত 'দেববংশের ইতিবৃত্তি' যে আসলে 'বটুভট্টের দেববংশ' নামে একখানি জাল কুলগ্রন্থ অবলম্বনে রচিত, তা ৺নগেন্দ্রনাথ বসু রচিত 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' রাজন্যকাণ্ডের ৩৬৭ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত 'বটুভট্টের দেববংশে'র সংক্ষিপ্তসারের সঙ্গে মিলিয়ে নিলেই বোঝা যাবে। 'বটুভট্টের দেববংশ' যে জাল বই, তা ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার দেখিয়েছেন (ভারতবর্ষ, কার্ত্তিক, ১৩৪৬, পৃঃ ৬৬০ দ্রষ্টব্য)। "দেববংশের ইতিবৃত্তি" নামটিও ডঃ দানীর স্বকপোলকল্পিত। ডঃ দানী যে বইয়ে এই সূত্রটির উল্লেখ পেয়েছেন, তা' হল সতীশচন্দ্র মিত্রের লেখা 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' (প্রথম খণ্ড)। ঐ বইয়ে (পৃঃ ২৭৯-২৮০) আলোচ্য সূত্রটিকে "দেববংশের ইতিবৃত্তি" বলা হয় নি, "কায়স্থ দেব-বংশের ইতিবৃত্তসম্বলিত একখানি হস্তলিখিত প্রাচীন কুলগ্রন্থ" বলে অভিহিত করা হয়েছে।

উক্তি পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খায় সেগুলিও মোটামুটিভাবে বিশ্বাসযোগ্য। যাহোক্ গণেশ ও তাঁর বংশের ইতিহাস রচনার আরও কতকগুলি সূত্র আমাদের হস্তগত হয়েছে, তাদের মধ্যে কয়েকটি সমসাময়িক। অবশ্য এই সব সূত্রের মধ্যে কোন ধারাবাহিক ইতিহাস মেলে না, বিচ্ছিন্ন কতকগুলি তথ্য পাওয়া যায় মাত্র। আলোচনার মধ্যে এগুলির উল্লেখ ও ব্যবহার করা হবে।

গণেশের পূর্ব-ইতিহাস ও দেশ

এবার গণেশ সম্বন্ধে আলোচনা স্বরু করা যেতে পারে। কিন্তু প্রথমে আমাদের জানা দরকার, বাংলার শাসনক্ষমতা হস্তগত করার আগে তিনি কী ছিলেন। এ সম্বন্ধে 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' খুব স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়। এতে বলা হয়েছে, গণেশ ছিলেন 'ভাতুড়িয়া'র জমিদার। রেনেলের মানচিত্রে (১৭৭৮) উত্তরবঙ্গের একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল 'ভাতুড়িয়া' নামে চিহ্নিত হয়েছে। এই অঞ্চলটির পশ্চিম দিকে মহানন্দা ও পুনর্ভবা নদী, দক্ষিণে পদ্মা নদী, পূর্ব দিকে করতোয়া নদী এবং উত্তরে দিনাজপুর ও ঘোড়াঘাট। প্রাচীন দলিলপত্রেও 'ভাতুড়িয়া'র নাম পাওয়া যায়। জাফর খাঁর বন্দোবস্তে (১৭২২) 'ভাতুড়িয়া'কে চাক্‌লা ঘোড়াঘাটের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[১] ভাতুড়িয়া নামটি অত্যন্ত প্রাচীন এবং মীরজুমলার জায়গীরগুলির মধ্যে ভাতুড়িয়া অন্যতম।[২] 'আইন-ই-আকবরী'তে সরকার বাজুহার অন্তর্গত বাহুড়িয়া বা বাহ্‌সুড়িয়া নামে একটি মহলের উল্লেখ পাওয়া যায়। বেভারিজ মনে করেন, 'ভাতুড়িয়া' নামই লিপিকর-প্রমাদে বাহুড়িয়া বা বাহ্‌সুড়িয়া হয়েছে।[৩] যাহোক্ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ভাতুড়িয়া অঞ্চল বর্তমানে রাজশাহী জেলার অন্তর্গত এবং অঞ্চলটির নাম অত্যন্ত প্রাচীন। সুতরাং গণেশ যে এই অঞ্চলের জমিদার ছিলেন, 'রিয়াজে'র এই কথা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়।[৪] অন্য কোন বিবরণীতে

১. J. A. S. B., 1892, Pt, I, No. 2., p. 120

২. Do.

৩. Do.

৪. বর্তমান পশ্চিম দিনাজপুর জেলার অন্যতম মহকুমা শহর রায়গঞ্জের কাছে 'রাজা গণেশ' নামে একটি গ্রাম আছে। গ্রামটির এই নাম কে কোন্ সময়ে দিয়েছে, এবং রাজা গণেশের সঙ্গে এ গ্রামের কোন সম্পর্ক ছিল কিনা তা জানি না।

'রিয়াজ'-এর উক্তির বিরোধী কোন কথা নেই। অবশ্য বুকানন লিখেছেন, "Gones, a Hindu, and Hakim, of Dynwaj (perhaps a petty Hindu chief of Dinajpur), seized the government." বুকাননের উক্তিতে বন্ধনীর মধ্যস্থিত অংশটুকু থেকে অনেকে মনে করেন, তাঁর ব্যবহৃত পুঁথির মতে গণেশ দিনাজপুর অঞ্চলের রাজা ছিলেন। কিন্তু বন্ধনীর মধ্যেকার অংশটুকু বুকাননের স্বরচিত। তাঁর ব্যবহৃত পুঁথিতে 'গণেশ' সম্বন্ধে 'দিনাজপুরের জমিদার' এই উক্তি ছিল না। ছিল এমন একটি শব্দ, বুকানন যার অনুবাদ করেছেন, "Hakim of Dynwaj"; এই শব্দটির বুকানন মানে করেছেন "Perhaps a petty Hindu chief of Dinajpur." কিন্তু এই ব্যাখ্যা যে তাঁর নিজের কাছে সন্তোষজনক মনে হয় নি তার প্রমাণ হচ্ছে, দিনাজপুর অঞ্চলের বিবরণ দেবার সময় তিনি লিখেছেন, "Whether or not, it is the same with Dynwaj, the governor (Hakim) of which, Gones, usurped the government of Gaur, I cannot say." (Martin's Easten India, Vol. II, p. 624) তাছাড়া পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দীতে 'দিনাজ' নামে কোন জায়গা ছিল না। বর্তমানে 'দিনাজপুর' নামে যে অঞ্চল পরিচিত তা বিজয়নগর নামে একটি ছোট পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিল।* যাই হোক, বুকাননের মনগড়া ব্যাখ্যার উপর গুরুত্ব আরোপ করে 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে'র সুস্পষ্ট উক্তিকে অবিশ্বাস করার কোন হেতু নেই। অতএব গণেশ বর্তমান রাজশাহী জেলার অন্তর্গত ভাতুড়িয়া অঞ্চলের জমিদার ছিলেন বলেই মনে হয়। বুকাননের বিবরণীতে উল্লিখিত "Hakim, of Dynwaj"-এর আসল মানে কি, সে সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সম্প্রতি রাজা গণেশের পুত্র জলালুদ্দীন মুহম্মদশাহের নামাঙ্কিত ও তাঁরই রাজত্বকালে উৎকীর্ণ একটি শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে (Dani, Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal, p. 14 দ্রঃ)। ডঃ দানীর মতে এতে নির্মাতার নাম এইভাবে উল্লিখিত হয়েছে,

"মালিক সদর্ অল্-মিলাৎ ওয়াদ্দীন সুলতানী আমীর-এ-দীহ্ (?) ভাতোরিয়া (?) খাস্।"

---

* অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য সর্বপ্রথম এদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন (প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৬০, পৃঃ ৯০—৯৩ দ্রষ্টব্য)।

অবশ্য "দীহ্" ও "ভাতোরিয়া" এই শব্দ দুটির পাঠ স্বয়ং ডঃ দানীর মতেই সম্পূর্ণ সন্দেহাতীত নয়। কিন্তু এই পাঠ ঠিক হলে রাজা গণেশের সঙ্গে ভাতুড়িয়ার সম্পর্কের আর একটি প্রমাণ পাওয়া যায়।*

যাহোক্, গণেশ যে উত্তরবঙ্গের অঞ্চলবিশেষের জমিদার ছিলেন, তাতো জানা গেল। তিনি যে জমিদার ছিলেন তা তাঁর প্রতিপক্ষ মুসলিম দরবেশ নূর কুৎব্ আলমের একটি সম্প্রতি-আবিষ্কৃত চিঠি থেকেও জানা যায়। নূর কুৎব্ লিখেছেন—

"Oh soul of the father, how strange is the affair and astonishing the time that···thousands of Doctors of religion and learned men and asceties and devotees had fallen under the command of an infidel, a zeminder of 400 years (standing)."

বাংলা ভাষায় এর মর্মানুবাদ এই,

"ঈশ্বরের কী অদ্ভুত লীলা। হাজার হাজার ধার্মিক এবং শিক্ষিত লোক আজ ৪০০ বছরের জমিদার এক বিধর্মীর অধীনস্থ হয়েছে।"

কিন্তু "৪০০ বছরের জমিদার" কথার অর্থ কী? কষ্টকল্পনা করে এই মানে দাঁড় করানো যায়—যার বংশ ৪০০ বছর ধরে জমিদারী করে আসছে। মূলে এখানে ৪০০ মনসবের জমিদার বা এই ধরনের কোন কথা ছিল বলে মনে হয়।

গণেশের জাতি বা গোত্র সম্বন্ধে বা পূর্ব্বপুরুষদের নাম সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কিছুই জানা যায়নি।† তবে তাঁর সমসাময়িক দরবেশ নূর কুৎব্ আলম এবং আশ্রফ্ সিম্নানী তাঁদের চিঠিতে গণেশের নাম লিখেছেন 'কান্স্ রায়', কিন্তু

* মৌলভী শামসুদ্দীন আহমদ Inscriptions of Bengal (Vol IV)-এ (p. 48) এই শিলালিপিটি যেভাবে প্রকাশ করেছেন, তাতে "আমীর-এ-দীহ্ ভাতোরিয়া"র বদলে, "আমীর দুদা বিন সুকিয়া (সুতিয়া ?)" পাঠ দেওয়া হয়েছে।

জনাব আবদুল মোমিন চৌধুরী এই অংশের পাঠ ধরেছেন, "আমীর (এ)-দীহ্ সু'তিয়া" (J. A. S. P. Vol VIII, No, I, p. 57 দ্রঃ) এবং তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে, সদর্ অল-মিল্লাৎ ওয়াদ্দীন "সুতী"র (বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত) শাসনকর্তা ছিলেন।

† অনেকের বিশ্বাস, গণেশ "ভাদুড়ী" পদবীধারী বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। আজ পর্যন্ত এই বিশ্বাসের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

মুসলমানরা হিন্দু রাজাদের নামের সঙ্গে প্রায় সর্বদাই 'রায়' শব্দ যোগ করতেন। তাঁদের হাতে পড়ে পৃথীরাজ 'রায় পিথৌরা'য়, লক্ষ্মণসেন 'রায় লখমনিয়া'য়, দনুজমাধব 'রায় দনুজ'এ পরিণত হয়েছেন। সুতরাং এর থেকে কোন আলোক পাওয়া যায় না।

বাংলার শাসনক্ষমতা হস্তগত করার আগে গণেশ ইলিয়াস্ শাহী সুলতানদের অমাত্য ছিলেন, এ কথা কেবলমাত্র ফিরিশ্‌তা বলেছেন। বলা বাহুল্য এ কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য।

গণেশের অভ্যুদয়

সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের মৃত্যুর প্রসঙ্গে আমরা রাজা গণেশের প্রথম উল্লেখ পাচ্ছি এবং গিয়াসুদ্দীনের পরবর্তী সুলতানদের সময়ে তাঁকে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন দেখতে পাচ্ছি। এই ক্ষমতারই পরিণতি হয়েছিল বাংলার সিংহাসন অধিকার করার মধ্যে। এক হিন্দু জমিদারের এতখানি ক্ষমতা অর্জন সত্যিই বিস্ময়ের বিষয়। আপাতদৃষ্টিতে এই ব্যাপারকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র মনে হয়; কিন্তু ঐ সময়ের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য রাখলে ঘটনাটিকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হবে না। হিন্দু জমিদারদের শক্তি ঐ সময় নিতান্ত অল্প ছিল না। ফিরোজ শাহ তোগলক যখন বাংলার বিদ্রোহী সুলতান ইলিয়াস শাহকে দমন করতে বাংলাদেশে আসেন, তখন বাংলার হিন্দু রাজা অর্থাৎ জমিদাররা ইলিয়াস শাহের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করেন, এই কথা জিয়াউদ্দীন বারনির 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী'তে পাওয়া যায়। 'তারিখ-ই-মোবারক-শাহী'তে লেখা আছে, সহদেব নামে একজন হিন্দু বীর ইলিয়াস শাহের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করে প্রাণ দেন। ফিরোজ শাহ্ তোগলকের প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ হয়েছিল, তার জন্য হিন্দু জমিদারদের শক্তি অনেকখানি কৃতিত্ব দাবী করতে পারে। এই যুগের হিন্দু জমিদারদের অন্যতম গণেশও অসামান্য সামরিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। জৌনপুরের বিখ্যাত দরবেশ আশ্‌রফ সিম্‌নানী গণেশের প্রতিপক্ষ নূর কুৎব্ আলমকে এক চিঠিতে লিখেছেন, "As regards what you have written about the overthrowing of the kingdom of Islam by the army of Kāns Rai, the infidel,······everything has become evident." ("কাফের কান্‌স রায়ের সৈন্যবাহিনী কর্তৃক ইসলামের রাজত্বের উচ্ছেদ সম্বন্ধে আপনি যা

লিখেছেন···সে সম্বন্ধে সবই স্পষ্ট হয়েছে।” এই উক্তি থেকে জানা যাচ্ছে, গণেশ প্রধানত সামরিক শক্তির জোরেই ইলিয়াস শাহী বংশের উচ্ছেদ করেছিলেন। ঐ সময়ে তাঁর সামরিক শক্তি ইলিয়াস শাহী সুলতানদের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

প্রশ্ন উঠতে পারে, ইলিয়াস শাহী সুলতানদের এরকম শক্তিহানি ঘটল কেন? এর কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। ইলিয়াস শাহী বংশের প্রথম দু'জন সুলতান ইলিয়াস শাহ ও সিকন্দর শাহ অত্যন্ত সুযোগ্য রাজা ছিলেন। তাঁরা দিল্লীর সম্রাটের কাছেও নতি স্বীকার করেননি। সিকন্দর শাহের ছেলে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের যোগ্যতা পিতা ও পিতামহের তুলনায় কিছুমাত্র কম ছিল না, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নিজের পিতার সঙ্গে তাঁর শত্রুতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তিনি পূর্ববঙ্গে বহুদিন ধরে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন এবং অবশেষে পিতার সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁকে নিহত করে বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন। পিতাপুত্রের এই দ্বন্দ্বের ফলেই যে ইলিয়াস শাহী বংশের সামরিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। তারপর গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের রাজত্বকালে গৌড়ের রাজশক্তি ক্রমাগত একের পর এক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে হীনবল হয়ে যায়। এ সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। গিয়াসুদ্দীনের পরবর্তী তিনজন সুলতান অপদার্থ ছিলেন। সুতরাং অমিতশক্তিধর গণেশের পক্ষে ক্ষমতা অধিকার করা মোটেই কঠিন হয় নি। কীভাবে তিনি ক্ষমতা অধিকার করলেন, সে ইতিহাস আগের অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

গণেশ কি প্রথমেই নিজে রাজা হয়েছিলেন?

আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহকে অপসারিত করে গণেশ সিংহাসন অধিকার করলে আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের পর তাঁর মুদ্রা পাওয়ার কথা। কিন্তু আলাউদ্দীনের ঠিক পরেই ৮১৮ হিজরা থেকে জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে। অথচ প্রত্যেকটি বিবরণ থেকেই জানা যায় যে, গণেশের ছেলে যদু বা জিতমল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জলালুদ্দীন নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেছিলেন। এর থেকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, ইতিমধ্যে রাজা গণেশের মৃত্যু হয়েছিল, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। যে অবস্থার মধ্যে যদু

ইস্‌লামধর্মান্তরিত ও সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েছিলেন, তার বর্ণনা 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' মেলে ; তার সংক্ষিপ্তসার এই—

(১) ইলিয়াস শাহী বংশকে উচ্ছেদ করে গণেশ নিজেই সিংহাসনে বসেন।

(২) সিংহাসনে বসবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমান দরবেশদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বেধে ওঠে। গণেশ তখন অনেক মুসলমান দরবেশকে বধ করেন। দরবেশদের নেতা নূর কুৎব্ আলম তখন জৌনপুরের রাজা ইব্রাহিম শর্কীকে এক চিঠি লিখে গণেশকে দমন করতে আহ্বান জানান।

(৩) ইব্রাহিম সসৈন্যে বাংলায় উপস্থিত হলে গণেশ নতি স্বীকার করেন এবং নূর কুৎব্ আলমের সঙ্গে আপোষ করেন। আপোষের সর্ত অনুযায়ী গণেশের ছেলে যদুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হয়। গণেশ সিংহাসন ত্যাগ করেন, ইব্রাহিমও দেশে ফিরে যান।

বুকাননের বিবরণেতে এই বিবরণের প্রায় সম্পূর্ণ সমর্থন আছে ; অবশ্য ইব্রাহিমের পরিচয় ও পরিণাম সম্বন্ধে তার মধ্যে ভ্রান্ত উক্তি করা হয়েছে, তা আমরা পরে দেখাব। আপাতত আমাদের বিচার্য বিষয় হচ্ছে, উপরে উল্লিখিত বিষয় তিনটি সত্য কিনা? এদের মধ্যে দ্বিতীয়টি সম্পূর্ণ সত্য, কারণ সমসাময়িক চিঠিপত্র থেকে এর সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। তৃতীয়টিরও প্রায় ষোল আনা সমর্থন একটি সমসাময়িক সূত্র থেকে পাওয়া যায়। এসম্বন্ধে পরে আলোচনা দ্রষ্টব্য। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিষয় দুটি ঠিক হলে প্রথমটিও সত্য হতে বাধ্য। অর্থাৎ ইলিয়াস শাহী বংশকে উচ্ছেদ করে গণেশ নিজেই কিছু সময়ের জন্য সিংহাসনে বসেছিলেন। তারপর ইব্রাহিমের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয় এবং তার ফলে তিনি নিজের ধর্মান্তরিত পুত্রের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন। কেউ কেউ মনে করেন, আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের ঠিক পরেই জলালুদ্দীন সিংহাসনে বসেছিলেন। কিন্তু এই অভিমত সমর্থন করা যায় না। কারণ ইব্রাহিমের সঙ্গে সংঘর্ষ পর্যন্ত গণেশ যদি আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের নামেই রাজত্ব করতেন, তাহলে আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহকে সরিয়ে গণেশের ছেলেকে সিংহাসনে বসাবার কথা উঠত না। অতএব এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে, আলাউদ্দীন ফিরোজ ও জলালুদ্দীনের মাঝখানে গণেশ নিজেই সিংহাসনে বসেছিলেন। আলাউদ্দীনের সব মুদ্রাই ৮১৭ হিজরার, জলালুদ্দীনের প্রাচীনতম মুদ্রা ৮১৮ হিজরার ; সুতরাং ৮১৭ হিজরার শেষের দিকে খুব সামান্য সময় এবং ৮১৮

হিজরার প্রথমাংশে কিছু সময়* গণেশ নিজেই সিংহাসনে বসে রাজত্ব করেছিলেন সিদ্ধান্ত করলে কোন দিক্ দিয়ে কোন অসঙ্গতি থাকে না। ইব্রাহিম শর্কীর আক্রমণের প্রাক্কালে আশ্‌রফ সিম্‌নানী যে চিঠি লিখেছেন, তাতেও পাওয়া যায় যে গণেশ তাঁর সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে "ইস্‌লামের রাজত্বের উচ্ছেদ" করেছেন। এর থেকেও মনে হয়, ঐ সময়ে বাংলার সিংহাসনে কোন নামমাত্র মুসলমান রাজাও ছিল না এবং গণেশ নিজেই সিংহাসনে বসেছিলেন।

মুসলমান দরবেশদের সঙ্গে গণেশের বিরোধ

এবার এর পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। 'রিয়াজ' ও বুকাননের বিবরণীতে লেখা আছে, গণেশ সিংহাসনে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমান দরবেশদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বেধে ওঠে। গণেশ কঠোর হাতে দরবেশদের দমন করেন। কীভাবে এই বিরোধ চরমে উঠল সে সম্বন্ধে 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' পাওয়া যায়—গণেশ একদিন সভায় বসেছিলেন, এমন সময় বদ্‌র্-উল্-ইস্‌লাম নামে একজন দরবেশ সেখানে এসে তাঁকে অভিবাদন না করেই বসে পড়েন। গণেশ এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে বদ্‌র্-উল্-ইস্‌লাম বলেন, "শিক্ষিত লোক বিধর্মীকে অভিবাদন করেন না।" গণেশ সেদিনকার মত তাঁকে কিছু বলেন না, কিন্তু আরও একদিন বদ্‌র্-উল্-ইস্‌লাম তাঁকে অপমান করাতে তিনি তাঁকে হত্যা করেন। সেইদিনই পাণ্ডুয়ার অন্যান্য দরবেশ এবং উলেমাকে তাঁর আদেশে জলে ডুবিয়ে বধ করা হয়। বুকাননের বিবরণীতে এই কথাগুলিই সংক্ষিপ্তভাবে পাওয়া যায়।

নূর কুৎব্ আলম ও ইব্রাহিম শর্কী

যাহোক্, গণেশের দমননীতির প্রতিকার করবার জন্যে দরবেশদের নেতা নূর কুৎব্ আলম ('রিয়াজ'-এর মতে ইনি গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের সহপাঠী ছিলেন) জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কীকে এক চিঠি লিখে গণেশকে শাস্তি দিতে অনুরোধ জানান এবং সেই চিঠি পেয়ে ইব্রাহিম নিজেই এক

* সবশুদ্ধ অন্ততঃ ছ'মাস। কারণ এই সময়ের মধ্যে বাংলা থেকে জৌনপুর, জৌনপুর থেকে বাংলায় অনেকগুলি চিঠি আদানপ্রদান হয়েছিল।

বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে গণেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। আগেই বলেছি, এই কথাগুলি 'রিয়াজ-উস্-সলাতীন' ও বুকাননের বিবরণীতে[১] পাওয়া যায়; কিন্তু এসম্বন্ধে সমসাময়িক সূত্রই পাওয়া গিয়েছে[২] বলে আর জল্পনার আশ্রয় নেবার দরকার নেই। জৌনপুরে এই সময় একজন বিখ্যাত দরবেশ ছিলেন, তাঁর নাম আশ্‌রফ সিম্‌নানী। আশ্‌রফ সিম্‌নানীকে স্বয়ং সুলতান ইব্রাহিম অত্যন্ত ভক্তি করতেন এবং ইনি ছিলেন নূর কুৎব্‌ আলমের পিতার শিষ্য। আশ্‌রফ সিম্‌নানীর লেখা তিনখানি চিঠি সৈয়দ হাসান আস্‌কারি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন।[৩] এই চিঠিগুলির মধ্যে আলোচ্য ঘটনার পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়। আমরা চিঠিগুলি উদ্ধৃত করছি।

প্রথম চিঠিখানি স্বয়ং ইব্রাহিম শর্কীকে লেখা। নূর কুৎব্‌ আলমের চিঠি পেয়ে ইব্রাহিম তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে আশ্‌রফ সিম্‌নানীর কাছে উপদেশ চেয়ে এক চিঠি লেখেন। এই চিঠিখানি তারই উত্তর। এতে তিনি লিখেছেন,—

"কাফের কান্‌সের জোর করে ক্ষমতা দখল করার বিরুদ্ধে আপনার সাহায্য চেয়ে কুৎব্‌ আলম আপনাকে যে চিঠি লিখেছেন, তার সারমর্ম এই—

'প্রায় ৩০০ বছর বাদে ঐস্লামিক ভূমি বাংলা দেশে বিশ্বাস(ধর্ম)-ধ্বংসকারী

১. ইব্রাহিম যে জৌনপুরের সুলতান, সেকথা বুকাননের পুঁথিতে লেখা ছিল না। বুকানন ইব্রাহিমের পরিচয় জানতেন না। তাই তিনি লিখেছেন, "The saint Kotub Shah......... wrote to a Sultan Ibrahim, who seems to have retained part of the kingdom, while the remainder fell to the share of Gones."

২. 'তবকাৎ-ই-আকবরী,' 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা' প্রভৃতি বইতে ইব্রাহিমের বাংলা আক্রমণের উল্লেখ নেই বলে ইব্রাহিম সত্যিই আক্রমণ করেছিলেন কিনা সে বিষয়ে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। আচার্য যদুনাথ সরকার মনে করেছিলেন আক্রমণের কথা সত্য হলেও ইব্রাহিম নিজে এই অভিযানের নেতৃত্ব করেন নি। কিন্তু আশ্‌রফ সিম্‌নানীর চিঠি, মুল্লা তকিয়ার বয়াজ, সঙ্গীত-শিরোমণি প্রভৃতি নবাবিষ্কৃত সূত্রগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে ৮১৮ হিজিরায় ইব্রাহিম সত্যিই বাংলা আক্রমণ করেছিলেন এবং তিনি নিজেই সে অভিযানে অধিনায়কতা করেছিলেন।

৩. Bengal, Past and Present, Vol. LXVII, 1948, pp, 32-39 দ্রষ্টব্য। আসকারি সাহেব চিঠিগুলির যে ইংরেজী অনুবাদ দিয়েছিলেন, আমরা তার বঙ্গানুবাদ দিলাম। দরবেশদের চিঠিপত্র তাঁদের ভক্তেরা সংকলন করে রাখতেন। বহু চিঠি-পত্রের সংকলন-গ্রন্থ এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে। এদের ভিতর বহু চিঠি আছে, যেগুলির মধ্যে সূফী দর্শন ও তত্ত্বোপদেশ ছাড়া বিশেষ কিছু নেই। মাত্র কয়েকটি চিঠিতে প্রসঙ্গক্রমে সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনার উল্লেখ আছে।

কাফেরদের কালো ছায়া পড়াতে দেশ অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। মুসলমানরা অমর্যাদার মধ্যে পতিত হয়েছে। দেশের প্রতিটি কোণে ইস্‌লামের প্রদীপ তার জ্যোতি বিকীরণ করে প্রকৃত পথ প্রদর্শন করত, কান্‌স্ রায় অবিশ্বাসের যে ঝড় বইয়ে দিয়েছে তাতে তা নিভে গেছে। আপনার বিজয়ী সেনাবাহিনীর আগুন দিয়ে নূরি (স্বয়ং নূর কুৎব্) আর হোসেনির (শেখ হোসেন নামে আর একজন দরবেশ) প্রদীপকে জ্বালিয়ে দিন।......ইস্‌লামের পীঠস্থানের যখন এই অবস্থা হয়েছে, তখন আপনি কেন শান্ত ও সুখী মনে সিংহাসনে বসে রয়েছেন ? উঠুন এবং ধর্মের সাহায্যে এগিয়ে আসুন। আপনার এত শক্তি যখন রয়েছে, তখন এ কাজ করা আপনার অবশ্যকর্তব্য। সাহেব কিরান* আমীর তৈমুর কেন দিল্লীর সাম্রাজ্য জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন ? ধর্মের ফতোয়াই তার কারণ নয় কি ? তিনি দু' তিনটি খারাপ জিনিস দেখেছিলেন বলেই তো দিল্লীর মত এমন একটা জনাকীর্ণ শহর ধ্বংস করেছিলেন।† আপনি নিজে হিন্দুস্থানের সাহেব কিরান, তবুও যে নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারে বাংলাদেশ ধ্বংস হচ্ছে, তা আপনি সহ্য করছেন ! কাফেরীর আগুন সেখানে দাউ দাউ করে জলছে আর আপনি আপনার তলোয়ার খাপে ভরে রেখেছেন ! এরকম ব্যাপার থেকে কোন বন্ধু যে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন, তা দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি ! বাংলাদেশকে স্বর্গ বলা হয়, কিন্তু তা আজ নরকের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে।·প্রত্যেকের উপর এমন ধরনের অত্যাচার করা হচ্ছে যে, লেখায় তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা যায় না। আর এক ঘণ্টাও সিংহাসনে বসে বিশ্রাম করবেন না। আসুন, এসে বিধর্মীকে আপনার অসি দিয়ে উচ্ছেদ করুন।'

এই হচ্ছে মহাপুরুষ নূরের চিঠির মর্ম, যে চিঠি আপনি পেয়েছেন। আপনি লিখেছেন যে, আপনি আপনার অসংখ্য দিগ্বিজয়ী সৈন্যকে বাংলা আক্রমণের জন্যে সমবেত করেছেন। এসম্বন্ধে আমার মত প্রকাশ করা উচিত। আমি আপনার সাফল্য প্রার্থনা করি। ধার্মিক রাজাদের পক্ষে মুসলমান ধর্মের রক্ষার জন্যে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করার চেয়ে আনন্দের কাজ আর কিছুই নেই।......বাংলাদেশে বড় শহরের তো কথাই নেই,

* দুই শতাব্দীর প্রভু (Lord of two centuries)

† তৈমুর এই অজুহাতই দেখিয়েছিলেন।

এমন ছোট শহর বা গ্রামও মিলবে না, যেখানে দরবেশরা এসে বসতি করেননি। অনেক দরবেশ পরলোকগমন করেছেন ; কিন্তু যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁদের সংখ্যাও অল্প হবে না। তাঁদের সন্তানসন্ততিকে, বিশেষত হজরৎ নূর কুৎব্ আলমের ছেলেকে এবং পরিবারকে যদি দুরাত্মা বিধর্মীদের কবল থেকে উদ্ধার করা যায়, তাহলে খুবই ভাল কাজ হবে।"

ইব্রাহিম শর্কীকে এই চিঠি দেবার পর আশ্রফ সিম্নানী বাংলার দরবেশ শেখ হোসেন "ধোক্করপোশ"* কে একখানি চিঠি লেখেন। শেখ হোসেনের ছেলেকে গণেশ বধ করেছিলেন। তাঁকে সান্ত্বনা জানিয়ে আশ্রফ সিম্নানী লেখেন, "আপনাদের সাহায্য করবার জন্য রাজার সৈন্যবাহিনী এখান থেকে যাচ্ছে ; এর ফল শীঘ্রই বোঝা যাবে।" এই চিঠিতে আশ্রফ সিম্নানী আর্তত্রাতা এবং ইস্লাম ধর্মের রক্ষকদের শিরোমণি হিসাবে তৈমুরলঙ্গের নাম করেছেন।

তৃতীয় চিঠিখানি স্বয়ং নূর কুৎব্ আলমকে লেখা। এই চিঠিখানি আগের তু'খানি চিঠির কিছু পরে লেখা হয় ; কারণ এতে আশ্রফ সিম্নানী বলেছেন যে, ইব্রাহিম ইতিমধ্যে সসৈন্যে বাংলার দিকে রওনা হয়ে গিয়েছেন। এই চিঠির কতকাংশ উদ্ধৃত করছি,—

"কাফের কান্সের সৈন্যবাহিনী কর্তৃক মুসলমান রাজত্বের উচ্ছেদ এবং হতভাগা কান্‌স্বরূপ প্রচণ্ড ঝড়ে 'ভগবানের সন্তানদের' (অর্থাৎ মুসলমানদের) বাসস্থানের ধ্বংসপ্রাপ্তি সম্বন্ধে আপনি যা লিখেছেন, সে সম্বন্ধে সবই স্পষ্ট হয়েছে। প্রসিদ্ধ আলাইয়া এবং খলিদিয়া বংশের লোকেরা যে অত্যাচার সহ্য করছেন তা জানলাম। সুলতানের ধ্বজা এবং তাঁর সৈন্যবাহিনী ইতিমধ্যেই আপনার দেশের দিকে রওনা হয়েছে। সুলতান তাঁর অসংখ্য সৈন্যবাহিনী দ্বারা কাফেরদের তাড়াতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আশা করা যাচ্ছে যে, মুসলমানরা কান্‌স রায় এবং তার লোকদের কবল থেকে মুক্তি পাবে।"

* "ধোক্করপোশ" শব্দের অর্থ 'ধূলায় আবৃত'। এই শেখ হোসেন ধোক্করপোশ নূর কুৎব্ আলমের পিতা আলা-উল-হকের শিষ্য ছিলেন, পূর্ণিয়াতে এঁর খানকা ছিল। ফ্রান্সিস বুকাননের মতে হোসেন শাহের রাজত্বকালেও হোসেন ধোকরপোশ (**Makdum Ghuribal Hoseyn dokorposh**) নামে একজন দরবেশ ছিলেন ; এঁর আচরণের ফলে হিন্দু রাজা মহেশ ঢাকায় চলে যেতে বাধ্য হন এবং এঁর ভাইয়ের সঙ্গে হোসেন শাহ নিজের মেয়ের বিবাহ দেন। হেমতাবাদে এই হোসেন ধোকরপোশের সমাধি আছে।

আশ্‌রফ সিম্‌নানীর এই চিঠিগুলি থেকে সমস্ত ব্যাপারটার একটা পরিষ্কার ছবি পাওয়া যাচ্ছে। গণেশের অভ্যুদয়ে মুসলমান দরবেশরা যে কতদূর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তা এগুলির মধ্য থেকে বোঝা যায়। নূর কুৎব্‌ আলম কতখানি আগ্রহ নিয়ে ইব্রাহিম শর্কীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তাও আমরা উপলব্ধি করি। তেম্‌নি গণেশ যে তাঁর বিরোধীদের প্রতি দমন-নীতি প্রয়োগ করেছিলেন এবং অনেককে বধ করেছিলেন, তা'ও এই চিঠিগুলি থেকে আমরা জানতে পারছি।

ইব্রাহিম শর্কীর বঙ্গাভিযান—মিথিলায় শিবসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ

ইব্রাহিম শর্কী কোন্‌ পথে বাংলায় এসেছিলেন এবং তাঁর অভিযানের মাঝে কোন ঘটনা ঘটেছিল কিনা সে সম্বন্ধে এতদিন কিছু জানা যায়নি; কিন্তু সম্প্রতি-আবিষ্কৃত একটি সূত্রে পাওয়া যাচ্ছে যে, ইব্রাহিম মিথিলা বা ত্রিহুতের উপর দিয়ে এসেছিলেন এবং মাঝপথে মিথিলার রাজা শিবসিংহ তাঁকে বাধা দেন। এর ফলে শিবসিংহ পরাজিত, বন্দী ও রাজ্যচ্যুত হন। এই সূত্রটি হচ্ছে আকবর ও জাহাঙ্গীরের সভাসদ্‌ মুল্লা তকিয়ার লেখা একটি বয়াজ।* সৈয়দ হাসান আস্‌কারি এই সূত্র থেকে আলোচ্য তথ্যটি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি লিখেছেন, "Moulvi Muḥammad Ilyās Raḥmān, a friend of the writer, has disovered a Bayāz of Mullā Taqyya, a courtier of Akbar and Jahāngīr, and copied in 1023 by Mullā Abul Ḥasan of Darbhanga, and in it we find references to 'Rāja Kāns', a Hindu zamīndār, acquiring ascendency in Bengal and instigating Sheo Singh, the 'rebellious son of Deva Sing, the Rājā of Tirhut', to commit depredations upon the Muslims. Sheo Singh is said to have killed many holy personages and contemplated a similar action against 'Makhdūm Shāh Sulṭān Ḥussain', the Khalifa

* 'বয়াজ' শব্দের অর্থ 'পাঁচমিশেলী সংগ্রহ'। এই বয়াজে মুল্লা তকিয়া তাঁর ভ্রমণের বিবরণ এবং ভ্রমণের সময়ে দেখা বিভিন্ন দেশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। মুল্লা তকিয়ার বয়াজের ত্রিহুতের ইতিহাস সম্পর্কিত অংশটি পাটনার উর্দু পত্রিকা 'মাসির' এর মে-জুন ও জুলাই-আগষ্ট (১৯৪৯) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। অন্য কোন অংশ এখনও মুদ্রিত হয় নি।

of Makhdūm 'Ala-ul Ḥuq of Pandua. We are also told that **Sulṭān Ibrāhīm** Sharqī of Jaunpur, being requested by Makhdūm Nūr Quṭb 'Alam, marched against Bengal, but had to face the opposition of Sheo Singh in Tirhut. The latter was defeated, pursued and captured and his stronghold, Lehra, was taken. (Bengal, Past and Present, Vol. LXVII, 1948, p. 36, f. n. 31)

মুল্লা তকিয়ার বয়াজে এ সম্বন্ধে যা লেখা আছে, তার বাংলা অনুবাদ আমরা উদ্ধৃত করলাম।

"যখন হিন্দু জমিদার কানস্ সমগ্র বাংলা প্রদেশের উপর আধিপত্য অর্জন করলেন, তিনি মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার সঙ্কল্প করলেন এবং তাঁর রাজ্য থেকে ইসলামের মূলোচ্ছেদ করাই হয়ে দাঁড়াল তাঁর লক্ষ্য। এই সময়ে ত্রিহুতের জমিদার শিও সিং (শিবসিংহ) তাঁর পিতা ত্রিহুতের রাজা দেব সিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং রাজা কানসের সঙ্গে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হয়ে নিজে ত্রিহুত প্রদেশের স্বাধীন রাজা হয়ে বসেছিলেন। নিজের শক্তি বৃদ্ধি করে তিনি রাজা কানসের প্ররোচনায় তাঁর রাজ্যের মুসলমানদের উপরে লুঠপাট চালাতে লাগলেন, দারভাঙ্গার অধিকাংশ ধর্মপ্রচারক ও ইসলামের নায়কদের শহীদীর পানীয়ের আস্বাদ গ্রহণ করালেন এবং পবিত্রাত্মা মখদুম শাহ সুলতান হোসেনকে আঘাতের পরিকল্পনা করলেন। এখন, মখদুম শাহ পাণ্ডুয়ার আলা-উল-হকের শিষ্য ছিলেন। আলা-উল-হকের সুযোগ্য পুত্র নূর কুৎব্-উল্-ইসলামের অনুরোধে সুলতান ইব্রাহিম শর্কী বাংলার দুর্বৃত্ত কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে এবং রাজা কানসকে দমন করার জন্যে ৮০৫ হিজরায়* এক সৈন্যবাহিনী পাঠান। রাজকীয় সৈন্যবাহিনী যখন ত্রিহুতে

* এই তারিখ ভুল। এই অনুচ্ছেদের শেষে যে শিলালিপি উদ্ধৃত হয়েছে, সেই শিলালিপিটি দেখেই মুল্লা তকিয়া স্থির করেছিলেন ইব্রাহিম ৮০৫ হিজরায় বাংলাদেশ আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু ইব্রাহিম যে ৮১৮ হিজরা বা ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশ আক্রমণ করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ৮০৫ হিজরায় সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ বাংলাদেশ শাসন করছিলেন, তখন ইব্রাহিমের বাংলা আক্রমণের কথা ওঠে না। অবশ্য ঐ শিলালিপির অকৃত্রিমতা সন্দেহের অতীত। আসল কথা, মুল্লা তকিয়া জানতেন না যে ইব্রাহিম শর্কী দুবার ত্রিহুতে এসেছিলেন—প্রথমবার রাজা কীর্তিসিংহের পিতৃরাজ্য-অপহরণকারী অসলানকে শাস্তি দিতে, যার বর্ণনা বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা'য় পাওয়া যায়, আর দ্বিতীয়বার এই বাংলা আক্রমণের সময়। সম্ভবত ইব্রাহিমের প্রথমবারের ত্রিহুতে আগমনই ৮০৫ হিজরায় ঘটেছিল, আর সেই সময়েই তিনি এই শিলালিপি সংবলিত মসজিদটি নির্মাণ করিয়েছিলেন।

পৌঁছোলো, শিও সিং তার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। যদিও সুলতান বাংলার দিকে যাচ্ছিলেন, তিনি যখন খবর পেলেন শিও সিং তাঁর তাঁবুর কাছাকাছি পৌঁছেছেন, সুলতানের রোষানল দাউ দাউ শিখায় জ্বলে উঠল এবং তিনি খুব সাহস নিয়ে তাঁর দিকে মন দিলেন। শেষে শিও সিং বুঝলেন প্রকাশ্য সংগ্রামে ইব্রাহিমের বিরোধিতা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি পালিয়ে অন্যদিকে গিয়ে অবশেষে সেখানকার সবচেয়ে সুদৃঢ় দুর্গ লেহ্‌রায় পৌঁছে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। কিছু সময় পরে ঐ দুর্গের পতন ঘটল এবং তিনি বন্দী হলেন। সমগ্র ত্রিহুত রাজ্য আবার তাঁর পিতাকে ফিরিয়ে দেওয়া হল সুলতানের অনুগত ভৃত্য হিসাবে। যে সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে রাখা হয়েছিল, সেগুলি আবার খুলে দেওয়া হল, তার ফলে সুলতান রাজা কান্‌সকে দমন করার জন্য বাংলার দিকে রওনা হলেন। মখদুম শাহের বাসস্থানের কাছে একটি মসজিদ নির্মাণ করার আদেশ পালিত হল। এখনও সেটি বর্তমান আছে এবং তাতে এই শিলালিপি আছে:—

পবিত্রাত্মা রসুল বলেছেন, যে আল্লার নামে মসজিদ তৈরী করে, সে স্বর্গে প্রবেশ করে। এই মসজিদ বিশ্বাসীদের প্রধান আবুল ফতে ইব্রাহিম শাহ সুলতান ৮০৫ হিজরায় নির্মাণ করিয়েছিলেন।"

এই বিবৃতির অধিকাংশই সত্য বলে মনে হয়, কারণ, গণেশ ও শিব-সিংহের আবির্ভাবকাল সমসাময়িক। গণেশের মত শিবসিংহও মুসলমানদের প্রাধান্য হ্রাস করে হিন্দু অভ্যুদয় ঘটাবার চেষ্টা করেছিলেন। শিবসিংহের সভাকবি বিদ্যাপতি তাঁর দু' একটি পদে লিখেছেন যে, শিবসিংহ যবনদের সঙ্গে যুদ্ধে গুরুতর প্রতাপ দেখিয়েছিলেন। ইব্রাহিমের সঙ্গে শিবসিংহের সম্পর্ক সম্ভবত আগে থেকেই তিক্ত হয়েছিল। তার কারণ, মিথিলা ইব্রাহিমের সামন্ত রাজ্য হওয়া সত্ত্বেও শিবসিংহ স্বাধীন রাজার মত নিজের নামে মুদ্রা চালিয়েছিলেন।* তাছাড়া মিথিলায় প্রাচীন প্রবাদ আছে যে, দিল্লীর সুলতান

* Annual Report of the Archæological Survey of India, 1913-14, pp. 248-49 দ্রষ্টব্য। ইব্রাহিমের সঙ্গে শিবসিংহের যে আগে থাকতেই বিরোধ ছিল, তার আরও প্রমাণ আছে। বিদ্যাপতি শিবসিংহ সম্বন্ধে 'পুরুষপরীক্ষা'তে বলেছেন, "যো গৌড়েশ্বর-গজ্জনেশ্বররণক্ষৌণিষু লব্ধা যশো" এবং 'শৈবসবস্বসারে' বলেছেন, "শৌর্যাবর্জিতগৌড়গজ্জনমহীপালোপ-নম্রীকৃতা"। বিদ্যাপতি-কথিত 'গৌড়েশ্বর' বা 'গৌড়মহীপাল' কে হতে পারেন, সে সম্বন্ধে আগে আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে 'গজ্জনেশ্বর' বা 'গজ্জনমহীপাল' বলতে কাকে

শিবসিংহকে যুদ্ধে হারিয়ে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার দেখিয়েছেন যে, ঐ সময় দিল্লীর সৈয়দ বংশীয় সুলতানেরা এত দুর্বল ছিলেন যে, তাঁদের পক্ষে সুদূর মিথিলায় অভিযান চালিয়ে সেখানকার রাজাকে বন্দী করা সম্ভব ছিল না; সুতরাং, প্রবাদোক্ত দিল্লীর সুলতান আসলে সম্ভবত জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কী। বিমানবিহারীবাবু এতদূর পর্যন্ত অনুমান করেছেন যে, শিবসিংহ "গণেশের সঙ্গে যোগ" দিয়েছিলেন এবং "জৌনপুরের সৈন্যদল ৮১৮ হিজরীতে বাংলা অভিযানের পথে অথবা প্রত্যাবর্তনের সময় শিবসিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল।" মুল্লা তকিয়ার বয়াজে গণেশের উস্কানিতে শিবসিংহের মুসলমানদের উপর অত্যাচার সম্বন্ধে যে কথা পাই তা কতদূর সত্য বলা যায় না; সম্ভবত ত্রিহুতের দরবেশরা নূর কুৎব্ আলম প্রভৃতির পক্ষ নিয়েছিলেন বলে গণেশের অনুরোধে শিবসিংহ তাঁদের দমন করেছিলেন। কিন্তু এই সূত্র থেকে উদ্ধৃত অংশের বাকিটুকু পূর্বোক্ত বিষয়গুলি থেকে সমর্থিত হওয়ায় সত্য বলেই গ্রহণ করা যায়। পূর্ব ভারতের দুই স্বাধীনচেতা হিন্দু রাজা মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং গণেশের বিপদে সাহায্য করতে গিয়ে শিবসিংহ নিজে চরম বিপদ বরণ করেছিলেন, সমসাময়িক ইতিহাসে এই ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার।

ইব্রাহিমের বাংলায় আগমনের ফলে গণেশের সিংহাসনত্যাগ

যাহোক্, শিবসিংহকে পরাজিত করে ইব্রাহিম তো বাংলায় এলেন। ইব্রাহিমের আসার ফলে গণেশের বিরোধী পক্ষের অভিপ্রায় সাময়িকভাবে

বোঝানো হয়েছে? মনোমোহন চক্রবর্তী ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেছিলেন, এই 'গজ্জনেশ্বর' আসলে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কী। এঁদের অনুমান যে ঠিক্, তার প্রমাণ আমি 'সঙ্গীতশিরোমণি'র ইব্রাহিম-প্রশস্তির (পরে এটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হবে) মধ্যে পেয়েছি তাতে রয়েছে,

আদক্ষিণোদধেরা চ হিমাদ্রেবা চ গাজনাৎ।
আগৌড়াদুজ্জ্বলংরাজ্যমিব্রাহিমভূভুজঃ॥

প্রথম চরণের 'গাজনাৎ' শব্দটি থেকে বোঝা যায়, বিদ্যাপতি-কথিত গজ্জনেশ্বর বা গজ্জনমহীপাল হচ্ছেন ইব্রাহিম শর্কী। 'গাজন' ও 'গজ্জন' দুইই 'গজনীর' অপভ্রংশ। 'পুরুষপরীক্ষা' শিবসিংহের রাজত্বকালে অর্থাৎ ১৪১৫ খ্রীঃর মধ্যে লেখা। সুতরাং তারও আগে ইব্রাহিমের (বা তাঁর লোকেদের) সঙ্গে শিবসিংহের যুদ্ধ হয়েছিল।

সিদ্ধ হয়। গণেশ সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং তাঁর ছেলেকে মুসলমান করে সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হয়। 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' এই ঘটনার বর্ণনা অতিরঞ্জিত আকারে পাওয়া যায়। যাহোক্ 'রিয়াজে'র বর্ণনার মূল বিষয়টুকু যে সত্য, তার প্রমাণ সম্প্রতি মিলেছে। ইব্রাহিম শর্কীর অধীনে এলাহাবাদ থেকে পাঁচ মাইল দূরে 'কড়া' নামে একটি জায়গায় মালিক সুলুতা শাহী নামে এক সামন্ত শাসন করতেন। তিনি নানা দেশ থেকে সঙ্গীতশাস্ত্রের বই আনিয়ে সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিতদের নিয়ে একখানি বই লেখান। বইখানির নাম 'সঙ্গীতশিরোমণি'। এর রচনাকাল ১৪৮৫ বিক্রমাব্দ ও ১৩৫০ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দ।* এই বইখানির প্রথমেই জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর এক প্রশস্তি পাওয়া যায়। প্রশস্তিটি এখানে উদ্ধৃত হ'ল,

"সংগ্রাম (ব) ক্সিযু॥
অসপত্নং ব্যধাদ্রাষ্ট্রমিবরাহিমভূপতেঃ।
ব্যানম্রাখিল-ভূমিপাল-মুকুট-প্রত্যগ্র-রত্নপ্রভা-
কির্ম্মীরাভবদংঘ্রিযুগ্মনখরজ্যোতির্বিতানোজ্জ্বলং॥
কীর্ত্তিছত্রসুবর্ণদণ্ড সদৃশস্ফূর্জ্জৎ প্রতাপোচ্চয়ং
লোকেস্মিন্নিবরাহিম ক্ষি (তি) পতিং কোনাশ্রয়েৎ পার্থিবঃ।
ঘনাটোপং গর্জ্জদ্‌গজতুরগসেনাজলধরৈঃ
সমং নীত্বাশঙ্কং শকশলভসপ্তার্চ্চিষময়ং।
তুরুষ্কং নির্ম্মায় প্রকটিতনয়ং তস্য তনয়ং
ব্যধাদ্ গৌড়ান্ প্রৌঢ়ঃ পুনরপি শকানাং জনপদান্॥

আদক্ষিণোদধেরা চ হিমাদ্রেরা চ গাজনাৎ।
আগৌড়াদুজ্জ্বলংরাজ্যমিবরাহিমভূভুজঃ॥"

এই প্রশস্তির নিম্নরেখ অংশটুকুর অনুবাদ :—

'এই প্রবীণ (ইব্রাহিম) প্রচুর গর্বসহকারে গর্জনকারী হস্তী, অশ্ব ও

* দক্ষিণ ভারতীয় পণ্ডিত রামকৃষ্ণ কবি সর্বপ্রথম এই সূত্রটি থেকে আলোচ্য তথ্যটি আবিষ্কার করে Journal of the Andhra Research Society, Vol. XI-এ প্রকাশ করেন। পরে এ সম্বন্ধে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বিশদ আলোচনা করেছেন (প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৬০, পৃঃ ৯০-৯৩ দ্রষ্টব্য)। 'সঙ্গীতশিরোমণি'র পুঁথি বর্তমানে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে আছে।

সেনারূপ মেঘবর্ষণে সেই অগ্নিকে নিঃশঙ্কে নির্বাপণ করেছিলেন, যে অগ্নিতে শকেরা (অর্থাৎ মুসলমানেরা) শলভের মত (পুড়ে মরেছিল) এবং রাজনীতিজ্ঞ * তাঁর পুত্রকে তুরস্ক নির্মাণ করে (মুসলমান করে) গৌড় দেশকে আবার শকরাজ্যে (মুসলমান রাজ্যে) পরিণত করেছিলেন।'

বলা বাহুল্য, এখানে গণেশকেই 'অগ্নি' বলা হয়েছে। এই সমসাময়িক সূত্রের সাক্ষ্য গণেশ এবং ইব্রাহিমের সংঘর্ষের ফলাফল সম্বন্ধে সমস্ত জল্পনার অবসান করছে। 'রিয়াজ'-এ এই সন্ধি সম্বন্ধে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা যে সর্বাংশে সত্য নয়, সে-ও এর থেকে বোঝা যায়। 'রিয়াজ'-এ বলা হয়েছে, নূর কুৎব্ আলমের মধ্যস্থতায় সন্ধি হয় এবং ইব্রাহিম সন্ধির প্রস্তাবে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, ফলে নূর কুৎব্ আলমের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য হয়েছিল। কিন্তু 'সঙ্গীতশিরোমণি'তে বলা হয়েছে, ইব্রাহিম নিজেই গণেশের ছেলেকে ধর্মান্তরিত করে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন।†

*"প্রকটিতনয়ং" কথার আসল অর্থ 'রাজনীতিজ্ঞ'। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এর অনুবাদ করেছিলেন "সুনয়নসম্পন্ন"। কিন্তু তাহলে "প্রকটিতনয়ং"-এর বদলে "প্রকটিতনয়নং" পাঠ ধরতে হয়; এই পরিবর্তনের কোন হেতু নেই এবং এতে ছন্দ থাকে না। আমার 'রাজা গণেশের আমল' বই-এ ঐ অংশটির অনুবাদ করার সময় "প্রকটিতনয়ং"কে আমি দীনেশবাবুর মত অনুযায়ী "সুনয়ন-সম্পন্ন" রূপেই অনুবাদ করেছিলাম। এ সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন লেখেন, "এখানে 'প্রকটিতনয়' কোন যুক্তিতে 'সুনয়ন-সম্পন্ন' মানে করা যায় তা বুঝতে পারছি না। মানে তো এখানে স্পষ্ট. 'যিনি নয় অর্থাৎ রাজনীতিচাতুর্য প্রকট করেছিলেন।' এই কথাটির আসল তাৎপর্য সুখময় বাবু এবং তাঁর অথরিটি ধরতে পারেন নি।" (যাত্রী, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৬৩-৬৪, পৃঃ ৬৭) ডঃ আহমদ হাসান দানী তাঁর Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal পুস্তিকায় (p. 122) "Mr. Mukhopadhyay translates the last two lines as follows" বলে আমার অনুবাদ উদ্ধৃত করেন এবং "প্রকটিতনয়ং"-এর আসল অর্থের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

† 'সঙ্গীত শিরোমণি'র "তুরুষ্কং নির্ম্মায়…তস্য তনয়ং" উক্তি থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয়। কিন্তু ডঃ দানী তা মানতে চান না। তাঁর মতে ইব্রাহিমের আগমনের আগেই গণেশের পুত্র মুসলমান হয়েছিলেন। তিনি "তুরুষ্কং নির্ম্মায…তস্য তনয়ং"-এর অনুবাদ করেছেন, "having established his son, who was a Turushka." এ সম্বন্ধে তিনি বলেন, "nirmāya (meaning 'having constructed, built, or established'. It can hardly be construed to mean "having converted'). ঠিক কথা, কিন্তু "তুরুষ্কং নির্ম্মায়…তস্য তনয়ং"-এর আক্ষরিক অনুবাদ তো আমরা "having converted his son into a Turushka (Muslim)" করছি না, করছি "having made his son a Turushka (Muslim)" এবং এইটিই এর সহজ অর্থ। "নির্ম্মায়" ক্রিয়াপদটি "তুরুষ্কং"-এর পরে এবং "প্রকটিতনয়ং তস্য তনয়ং" এর আগে থাকায় মনে হয়, আমাদের অনুবাদই ঠিক। উদ্ধৃত অংশের রচয়িতা যদি ডঃ দানীর ব্যাখ্যা অনুযায়ী উক্তি করতেন, তাহলে তিনি "নির্ম্মায় তনয়ং তস্য তুরুষ্কং প্রকটিতনয়ং" লিখে বা অন্য কোনভাবে সোজাসুজি নিজের বক্তব্য প্রকাশ করতেন।

কিন্তু উদ্ধৃত অংশটির "প্রকটিতনয়ং তস্য তনয়ং" উক্তিটির অর্থ আরও বেশী গভীর। এর "আসল তাৎপর্য" সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "যদু-জালালুদ্দীন যে চালাকি করে (বাপের সঙ্গে বিরোধ করে?) ধর্মান্তর গ্রহণ করে ইব্রাহিমশাহ শর্কীর সাহায্যে রাজ্য লাভ করেছিলেন এতো তারই ইঙ্গিত।" সুতরাং আসল ব্যাপারটা এখন মোটামুটিভাবে বোঝা যাচ্ছে। ইব্রাহিম শর্কী সসৈন্যে বাংলায় উপস্থিত হলে রাজা গণেশের সমূহ বিপদ উপস্থিত হয়। তাঁর সুচতুর পুত্র তখন সুযোগ বুঝে পিতার বিরোধি-পক্ষে যোগ দেন এবং তাঁরা তাঁকে ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষিত করে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। সম্ভবত নূর কুৎব্ আলমের দলই গণেশ-নন্দনকে নানারকম কৌশল করে নিজেদের দলে টেনেছিলেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহালে রাজা গণেশ তখন কী করছিলেন? এ সম্বন্ধে কতকটা নিঃসংশয়েই অনুমান করা যেতে পারে যে রাজা গণেশ ইব্রাহিমের বিপুল সামরিক শক্তির কাছে দাঁড়াতে না পেরে পলায়ন করেছিলেন। ইব্রাহিমের সঙ্গে গণেশ খুব বেশী যুদ্ধ করেছিলেন বলে মনে হয় না। মোটেও না করতে পারেন।

যা হোক, গণেশের অপসারণ এবং তাঁর ধর্মান্তরিত পুত্রের সিংহাসনে আরোহণের ফলে গণেশের প্রতিপক্ষীয়েরা মনে করলেন তাঁদেরই জয় হ'ল। ইব্রাহিম শর্কীও তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে দেশে ফিরে গেলেন। ডঃ দানী মনে করেন জলালুদ্দীন ইব্রাহিম শর্কীর সামন্ত (feudatory) হিসাবে বাংলাদেশ শাসন করতে সম্মত হয়েছিলেন। আমি এই অভিমত সমর্থন করি। ইতিপূর্বে উদ্ধৃত 'সঙ্গীতশিরোমণি'র "আগৌড়াদুজ্জ্বলরাজ্যমিবরাহিম-ভূভুজঃ" উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, জৌনপুরের লোকেরা গৌড়কে ইব্রাহিমের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলেই মনে করতেন।

জলালুদ্দীনের প্রথম দফার রাজত্ব

যা হোক, আমরা দেখতে পাচ্ছি নূর কুৎব্ আলমের আহ্বানে ইব্রাহিম শর্কী সসৈন্যে বাংলায় এলেন এবং গণেশকে অপসারিত করে, জলালুদ্দীনকে * সিংহাসনে বসিয়ে ফিরে গেলেন।

* 'রিয়াজ-উস-সলাতীন'-এর মতে প্রথম সিংহাসনে আরোহণের সময়ে জলালুদ্দীনের বয়স ১২ বছর ছিল। কিন্তু এ'কথা সত্য হতে পারে না। ১২ বছরের বালকের পক্ষে এই রাজনীতিচতুরতার পরিচয় দেওয়া ও প্রকাশ্যে পিতার পক্ষ ত্যাগ করে শত্রুর পক্ষে যোগ দেওয়া অসম্ভব।

'রিয়াজ-উস-সলাতীনে' লেখা আছে যে জলালুদ্দীনের সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশে আবার "ইসলামের আইন-কানুন জারী হল।" এ' কথা যে সত্য, তার প্রমাণ ফেই-শিন নামক সমসাময়িক চীনা গ্রন্থকারের লেখা 'শিং-ছা-শুং-লান' গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়। এই বই থেকে জানা যায় যে, চীন সম্রাট য়ুং-লো তাঁর রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষে (১৪১৫ খ্রীঃ) একদল প্রতিনিধিকে বাংলার রাজার সভায় পাঠিয়েছিলেন, এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেছিলেন হৌ-শিয়েন। ফেই-শিন স্বয়ং ঐ দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন। এই প্রতিনিধিদল বাংলার রাজধানী পাণ্ডুয়ায় এসে রাজার সভায় যান। সেখানে ('শিং-ছা-শুং-লান'-এর ভাষায়) "প্রধান দরবারে দামী পাথরে খচিত উঁচু এক সিংহাসনে পায়ের উপর পা রেখে রাজা বসেছিলেন। তাঁর কোলের উপর ছিল দু'দিকে ধার-ওয়ালা একটি তলোয়ার।...... তিনি আমাদের প্রত্যভিবাদন করে (চীন) সম্রাটের ফরমানটি একবার মাথায় ঠেকিয়ে তারপর খুলে পড়লেন। রাজা (চীন) সম্রাটের প্রতিনিধিদের এক ভোজসভায় আপ্যায়িত করলেন এবং আমাদের সৈন্যদের অনেক উপহার দিলেন।...তারপর রাজা একটি সোনার আধারে রক্ষিত সোনার পাতের উপরে লেখা এক বাণী (চীন) সম্রাটকে দেবার জন্য দিলেন।

বাংলার রাজা চীনসম্রাটের প্রতিনিধিদের যে ভোজসভায় আপ্যায়িত করেছিলেন, তাতে পরিবেশিত খাদ্য ও পানীয় সম্বন্ধে 'শিং-ছা-শুং-লান'-এ লেখা আছে, "(ভোজে) মেষ ও গোমাংসের কাবাব দেওয়া হয়। মদ্যপান নিষিদ্ধ ছিল, কেন না এতে ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হবার ও শিষ্টাচারের বিধি লঙ্ঘিত হবার আশঙ্কা। তার বদলে আমরা সরবৎ পেলাম।"*

বাংলার এই রাজা নিঃসন্দেহে জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ। ইনি জলালুদ্দীনের পিতা গণেশ হতে পারেন না, কারণ হিন্দু রাজা গণেশের পক্ষে ভোজসভায় গোমাংসের কাবাব পরিবেশন করা সম্ভব নয়।

চীনা প্রতিনিধিরা যে সময়ে বাংলাদেশে এসেছিলেন, তার দিকে লক্ষ রাখলেও বোঝা যাবে যে, এই রাজা জলালুদ্দীন ভিন্ন আর কেউ নন। চীন দেশের 'মিং' রাজবংশের ইতিহাস 'মিং-শ্র্' গ্রন্থে লেখা আছে, "য়ুং-লো'র

---

* বিশ্বভারতী চীনভবনের অধ্যাপক নারায়ণচন্দ্র সেনের অনুবাদ অবলম্বনে। এই অংশের রকহিল যে অনুবাদ করেছিলেন (T'oung Pao, 1915, p. 442 এবং Visva-Bharati Annals, Vol. I, p. 124 দ্রঃ)—তা' নির্ভুল নয়।

রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষের সপ্তম মাসে সম্রাট বাংলা এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে ইচ্ছুক হয়ে হৌ-শিয়েনকে এক নৌবহর সমেত (ঐসব দেশে) যেতে বললেন।" (Visva-Bharati Annals, Vol. I, p. 104 দ্রষ্টব্য) অর্থাৎ য়ুং-লোর রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষের সপ্তম মাসে চীনা রাজপ্রতিনিধি দল চীন থেকে যাত্রা করেন, বাংলাদেশে পৌঁছোন তার কিছুদিন পরে। 'শিং-ছা-শুং-লান' থেকে জানা যায় যে, হৌ-শিয়েনের নেতৃত্বাধীন চীনা রাজপ্রতিনিধিদল চীন থেকে প্রথমে সুমাত্রায় যান এবং সেখান থেকে বাংলার দিকে যাত্রা করে কুড়ি দিন বাদে চট্টগ্রামে পৌঁছোন এবং তারও কয়েকদিন পরে পাণ্ডুয়ায় পৌছোন। সুতরাং চীন থেকে রওনা হবার প্রায় তু'মাস পরে তাঁরা পাণ্ডুয়ায় পৌঁছেছিলেন। য়ুং-লোর রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষের সপ্তম মাস ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই আগস্ট তারিখে আরম্ভ হয় এবং ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে শেষ হয় (A Sino-Western Calender for Two thousand years—1-2000 A. D. by Hsieh Chung-San, 1956, p. 283 দ্রষ্টব্য)। অতএব হৌ-শিয়েনের নেতৃত্বাধীন চীনা রাজপ্রতিনিধিদল ঐ সময়ে চীনদেশ থেকে রওনা হয়ে ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর-নভেম্বর মাসের অর্থাৎ ৮১৮ হিজরার শাবান-রমজান মত মাসের সময়ে পাণ্ডুয়ায় বাংলার রাজার সভায় পৌঁছেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ততদিনে যে বাংলা দেশে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর অভিযান ও তার ফলে রাজা গণেশের আধিপত্যের সাময়িক বিলোপ ঘটে গেছে এবং জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন তা নিঃসংশয়ে বলা যায়। জলালুদ্দীনের ৮১৮ হিজরার মুদ্রার সংখ্যাধিক্য থেকে বোঝা যায়, তিনি ৮১৮ হিঃর অন্তত অর্ধাংশ এবং ১৪১৫ খ্রীঃর অন্তত শেষ এক তৃতীয়াংশতে নিশ্চয়ই রাজত্ব করেছেন। জলালুদ্দীনের প্রথমবার সিংহাসনে আরোহণের পরে কিছুদিন তাঁর উপরে তাঁর পিতার কোন প্রভাব ছিল না, সুতরাং ভোজসভায় গোমাংস পরিবেশন করা জলালুদ্দীনের পক্ষে অসম্ভব হয়নি। জলালুদ্দীন প্রকৃত নিষ্ঠাবান মুসলমানের মত ভোজসভায় মদ্যপান নিষিদ্ধ করেছিলেন।

কিন্তু এইভাবে পিতার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে খাঁটি মুসলমানী রীতিতে রাজ্যশাসন করা জলালুদ্দীনের পক্ষে বেশী দিন সম্ভব হল না। কিছুদিন পরেই আবার বাংলার রাজনৈতিক মঞ্চে রাজা গণেশ আবির্ভূত হলেন এবং রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা তিনি হস্তগত করলেন। এর অকাট্য প্রমাণস্বরূপ

আমরা নূর কুৎব্ আলমের একটি চিঠি উদ্ধৃত করছি। এ চিঠিটিও সৈয়দ হাসান আসকারি আবিষ্কার করেছেন। নূর কুৎব্ আলমের কোন প্রিয়জন তাঁকে ছেড়ে পাণ্ডুয়ার বাইরে চলে গেলে কুৎব্ আলম তাঁকে এই চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিটি জায়গায় জায়গায় একটু দুর্বোধ্য বলে প্রথমে আস্কারি সাহেবের ইংরেজী অনুবাদ উদ্ধৃত* করে তারপর তার বাংলা ভাবানুবাদ দিলাম।

"I, the poor man, reminded that Shah of myself now and then but at this time, when spirits are so low and morbidity so prevalent, I, the poor man, feel extremely unsettled and perturbed. I am so paralysed by the anguish of my existence that I have abandoned the world. May He draw the pen of His forgiveness accross the pages of my shortcomings........ Oh soul of thy father, how strange is the affair and astonishing the time that the river of God, the unapproachable, and unmovable, has become ruffled and thousands of Doctors of religion and learned men and asceties and devotees had fallen under the command of an infidel, a zaminder of 400 years (standing), and benefits of true significance have gone. He has allowed the commands and prohibitions to go under the control of an infidel.........The reins of Islam have gone into the hands of those who associate others with God. He had caused Islam to be replaced by infidelity with the results that the benefits of religion have been destroyed and the standard of unbelief has risen to the sky. He has allowed the ruin of faith..... How exalted is God, He has bestowed, without apparent reason, the robe of faith on the lad of an infidel and installed him on the throne of the kingdom over his friends. Kufry (infidelity) has gained predominance

Bengal, Past and Present, Vol. **LXVII, 1948, pp 38-39** থেকে উদ্ধৃত।

and the Kingdom of Islam has been spoiled. Who knows what divine wisdom ordains and what is fated for what individual existence ? . Alas, Alas, oh, how painful, with one gesture and freak of independence, He caused the consumption of so many souls, the destruction of so many lives, and shedding of so much of bitter tears. Alas, woe to me, the sun of Islam has become obscured and the moon of religion has become eclipsed. .. It is obligatory on every Musalman to render assistance to and champion the cause of the faith of God. Although so far as the apparent signs are concerned there is no possibility of assistance reaching us, yet at the inside of things and returning to God one should make earnest supplication and sincerely pray and lament throughout the night and solicit the aid from God."

"হতভাগা আমি সেই 'শাহ'কে যখন তখন নিজের কথা স্মরণ করিয়ে দিতাম, কিন্তু এই সময়ে মন এত খারাপ এবং বিষাদের ভার এত গুরু যে, আমি অত্যন্ত বিব্রত ও বিচলিত বোধ করছি। নিজের অস্তিত্বের বেদনা আমাকে এত বিকল করে ফেলেছে যে, পৃথিবীর সঙ্গে সব সম্পর্ক আমি ছিন্ন করেছি। ভগবান যেন আমার দোষত্রুটির পৃষ্ঠাগুলির উপর দিয়ে তাঁর ক্ষমার কলম চালিয়ে দেন। হাজার হাজার ধার্মিকশ্রেষ্ঠ ও পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ এবং দরবেশ ও ভক্ত আজ ৪০০ বছরের জমিদার একজন বিধর্মীর অধীনস্থ হয়েছে। প্রকৃত ধর্মের সমস্ত ফলই নষ্ট হয়েছে। ভগবান রাজ্যের সমস্ত কর্তৃত্ব একজন বিধর্মীর হাতে তুলে দিয়েছেন।... ইসলামের রাজত্ব আজ তাদের হাতে গিয়ে পড়েছে, যারা অন্যদের ভগবানের সঙ্গে একাসনে বসায়। ভগবান কাফেরী দিয়ে ইসলামের স্থান অধিকার করিয়েছেন। তার ফল হয়েছে এই যে, ধর্মের মাহাত্ম্য নষ্ট হয়েছে এবং অবিশ্বাসের (বিধর্মের) ধ্বজা আকাশ পর্যন্ত উঠেছে। ভগবান বিশ্বাস (ইসলাম ধর্ম) ধ্বংস হতে দিয়েছেন।...কী মহিমা তাঁর। আপাত কোন কারণ ভিন্নই একজন কাফেরের 'বাচ্চা'কে তিনি বিশ্বাসের (ইস্‌লাম ধর্মের) পোষাক দিয়ে দেশের সিংহাসনে, তার বন্ধুদের

উপরে, অধিষ্ঠিত করেছেন। কাফেরী প্রাধান্যলাভ করেছে এবং ইসলামের রাজ্য ধ্বংস হয়েছে। কে জানে ভগবানের কী ইচ্ছা এবং কার ভাগ্যে কী আছে?………হায়! ওঃ! কি যন্ত্রণাদায়ক! এক লহমায় তিনি এতগুলি আত্মার অপচয় ঘটালেন, এতগুলি জীবন নষ্ট হল, এত চোখের জল পড়ল। হায় কী দুঃখ! ইসলামের সূর্য আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে এবং ধর্মের চাঁদ রাহুগ্রস্ত হয়েছে।…প্রত্যেকটি মুসলমানের অবশ্যকর্তব্য ভগবানের প্রতি বিশ্বাসের প্রয়োজনে সাহায্য করা এবং সেই বিশ্বাসকে জয়যুক্ত করা। যদিও লক্ষণ যা দেখা যাচ্ছে, তাতে আমাদের কাছে কোন সাহায্য আসবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই, তবুও প্রত্যেকের উচিত সারা রাত্রি ধরে প্রার্থনা করা, শোক করা এবং ভগবানের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করা।"

নূর কুৎব্ আলমের এই চিঠিখানির মূল্য অপরিসীম। এটি বিশ্লেষণ করে আমরা দেখতে পাই,

(১) এই চিঠি লেখবার সময় এমন একজন রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট, যিনি কাফেরের সন্তান হয়েও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। বলা বাহুল্য এই রাজা জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ ভিন্ন আর কেউ হতে পারেন না।*

(২) কিন্তু রাজ্যের সমস্ত কর্তৃত্ব গিয়ে পড়েছে একজন বিধর্মীর হাতে। এই "বিধর্মী"টি রাজা গণেশ ভিন্ন আর কে হতে পারেন?

সুতরাং ব্যাপারটা এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। ইব্রাহিমের সৈন্যবাহিনীর সামনে দাঁড়াতে না পেরে রাজা গণেশ পলায়ন করেছিলেন এবং কিছুকাল তিনি অন্তরালেই ছিলেন। তারপর জলালুদ্দীনকে সিংহাসনে বসিয়ে যখন ইব্রাহিম জৌনপুরে ফিরে যান, তার কিছুদিন পরে গণেশ সুযোগ বুঝে আবার প্রত্যাবর্তন করেন এবং হৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেন। জলালুদ্দীনের পক্ষে পিতার প্রাধান্য স্বীকার করে নেওয়া ভিন্ন কোনও উপায়ই ছিল না। হয়তো তিনি প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু অচিরেই পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হন। কারণ তাঁর পিতার হাতে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী এবং জনসাধারণের উপরে তাঁর প্রভাব অপরিসীম। তাছাড়া যিনি একাধিক সুলতানকে

* নূর কুৎব্ আলম জলালুদ্দীনকে "কাফেরের বাচ্ছা" (the lad of an infidel) বলেছেন, এর থেকে কেউ কেউ মনে করেছেন জলালুদ্দীন ঐ সময়ে বালক ছিলেন। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। বৃদ্ধ নূর কুৎব্ যুবক জলালুদ্দীনকেও "বাচ্ছা" (lad) বলতে পারেন। তাছাড়া এই ধরনের উক্তি সব বয়সেরই লোকের সম্বন্ধে করা হয়ে থাকে।

ইতিপূর্বে হাতের পুতুলে পরিণত করেছিলেন, নিজের পুত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করা তাঁর পক্ষে তুচ্ছ ব্যাপার। সুতরাং দেশের শাসনে গণেশের একাধিপত্য আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল, যদিও জলালুদ্দীন নামে-মাত্র সুলতান রয়ে গেলেন। বাংলায় ইসলামের প্রভাব আবার মন্দীভূত হয়ে গেল, তার বদলে হিন্দুধর্মেরই জয়ধ্বজা উড়তে লাগল। নূর কুৎব্ আলম দুঃখ করে লিখেছেন, "আপাত কোন কারণ ভিন্নই" (without apparent reasons) ভগবান এই কাফেরনন্দনকে মুসলমান করে সিংহাসনে বসিয়েছেন। "আপাত কোন কারণ ভিন্নই"—কারণ জলালুদ্দীন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকাতে মুসলমানদের বা ইসলামধর্মের কোন লাভ হচ্ছিল না।

আরও একটি ব্যাপার দেখতে হবে। নূর কুৎব্ আলমের এই চিঠি থেকে বোঝা যায় যে, এর আগে যেমন নূর কুৎব্ আলম গণেশকে দমনের জন্য ইব্রাহিমকে আহ্বান করে এনেছিলেন, এবার যে কোন কারণে সে পথ বন্ধ; কারণ, চিঠির শেষে নূব কুৎব্ বলছেন, "লক্ষণ যা দেখা যাচ্ছে, তাতে আমাদের কাছে কোন সাহায্য আসবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই।" চিঠির প্রথম ছত্রটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—"হতভাগ্য আমি সেই 'শাহ'কে যখন তখন নিজের কথা স্মরণ করিয়ে দিতাম, কিন্তু এই সময়ে···আমি অত্যন্ত বিব্রত ও বিচলিত বোধ করছি।" যদিও 'শাহ' শব্দটির নানারকম মানে হয়, তবু এখানে 'রাজা' অর্থে এবং ইব্রাহিমের প্রতিভূস্বরূপে শব্দটিকে গ্রহণ করলে সব দিক দিয়ে অর্থসঙ্গতি হয়।

দনুজমর্দনদেব ও মহেন্দ্রদেবের মুদ্রা

'রিয়াজ-উস্-সলাতীন' এবং বুকাননের বিবরণীতে পাওয়া যায়, জলালুদ্দীন সিংহাসনে অভিষিক্ত হবার কিছুদিন পরে ইব্রাহিমের মৃত্যু হয় এবং গণেশ তখন ছেলেকে সরিয়ে আবার নিজে সিংহাসনে বসেন। এর মধ্যে ইব্রাহিমের মৃত্যুর কথাটি সর্বৈব মিথ্যা; কারণ ইব্রাহিমের মৃত্যু ৮১৯-২০ হিজরায় হয়নি, তিনি ৮৪৪ হিজরা বা ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। 'রিয়াজ' ও বুকাননের পুঁথিতে মনগড়া কথা লেখা হয়েছিল। কীভাবে ইব্রাহিমের মৃত্যু হয়েছিল, সে সম্বন্ধেও দুই সূত্রের উক্তির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। 'রিয়াজে' বলা হয়েছে, নূর কুৎব্ আলমের অভিশাপের ফলে ইব্রাহিমের মৃত্যু হয়েছিল, আর বুকাননের বিবরণীতে পাওয়া যায়, জলালুদ্দীন তাঁকে যুদ্ধে

পরাজিত ও নিহত করেছিলেন। কল্পনার উপর নির্ভর করাতেই দুই বিবৃতিতে এই পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়।

কিন্তু ছেলেকে সরিয়ে গণেশের সিংহাসনে বসার কথাটি সত্য। কারণ, জলালুদ্দীনের ৮১৮ হিজরার অনেক মুদ্রাই পাওয়া গিয়েছে, তাঁর ৮১৯ হিজরার খুব অল্প মুদ্রাই পাওয়া গিয়েছে। ৮২০ হিজরার একটিও মুদ্রা পাওয়া যায়নি এবং ৮২১ হিজরা থেকে আবার তাঁর মুদ্রা মিলছে। এদিকে যে সময়টুকু জালালুদ্দীনের মুদ্রা মিলছে না, মোটামুটিভাবে সেই সময়েই দু'জন হিন্দু রাজার বাংলা অক্ষরে ক্ষোদিত মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে। এই মুদ্রাগুলির এক পিঠে রাজার নাম, অপর পিঠে টাকশালের নাম, সাল এবং "শ্রীচণ্ডীচরণ-পরায়ণস্য" লেখা আছে। এই হিন্দু রাজাদের নাম, মুদ্রায় উল্লিখিত সাল এবং তাঁদের মুদ্রা যে টাকশালে তৈরী হয়েছিল, তাদের নাম নীচে দেওয়া হল।

	রাজার নাম	মুদ্রায় উল্লিখিত সাল	টাকশালের নাম
১।	দনুজমর্দনদেব	১৩৩৯ শকাব্দ=৮২০ হিজরা ১৩৪০ শকাব্দ=৮২১ হিজরা	পাণ্ডুনগর, সুবর্ণগ্রাম এবং চাটিগ্রাম
২।	মহেন্দ্রদেব	১৩৪০ শকাব্দ=৮২১ হিজরা	পাণ্ডুনগর ও চাটিগ্রাম

স্পষ্টই বোঝা যায়, পাণ্ডুনগর, সুবর্ণগ্রাম ও চাটিগ্রাম যথাক্রমে পাণ্ডুয়া, সোনারগাঁও ও চাটগাঁও-এর সংস্কৃত রূপ। এই সব জায়গার টাকশাল থেকে জলালুদ্দীনের মুদ্রাও বেরিয়েছিল। সুতরাং এই দু'জন রাজা ১৩৩৯ ও ১৩৪০ শকাব্দে যে প্রায় সারা বাংলারই শাসনক্ষমতা লাভ করেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই।

গণেশ ও দনুজমর্দনদেব অভিন্ন লোক

এঁরা কে, সেই প্রশ্নই এখন আলোচ্য। এঁদের মধ্যে মহেন্দ্রদেবের সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে। কিন্তু দনুজমর্দনদেব যে স্বয়ং গণেশ, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই বললেই চলে।* কারণ নূর কুৎব্ আলমের

* গণেশ ও দনুজমর্দনদেবের অভিন্নতা প্রথমে ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী দেখান (Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal, pp. 109-115 দ্রষ্টব্য)।

উদ্ধৃত চিঠি জলালুদ্দীনের প্রথম রাজ্যাভিষেকের পরে লেখা। ঐ সময়ে গণেশ যে জীবিত ও সর্বশক্তিমান ছিলেন, তা ঐ চিঠি থেকেই জানা যায়। সুতরাং তার দুই বছরের মধ্যেই যে দনুজমর্দনদেবের মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে, তিনি গণেশ ছাড়া আর কেউ হতে পারেন বলে মনে করা যায় না। দনুজমর্দন-দেবের এই মুদ্রাগুলিই প্রমাণ করছে যে, জলালুদ্দীনের প্রথম রাজ্যাভিষেকের কিছুদিন পরে গণেশ তাঁকে অপসারিত করে সিংহাসনে বসেছিলেন,—'রিয়াজ' ও বুকাননের বিবরণীর এই কথা সত্য। অন্য কোন হিন্দু, যাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানাশোনা নেই, তিনি আচমকা আবির্ভূত হয়ে সারা বাংলা জয় করে দনুজমর্দনদেব নামে একই সঙ্গে পাণ্ডুয়া, সোনারগাঁও ও চাটগাঁও-এর টাকশাল থেকে মুদ্রা বার করলেন, এ কথা বিশ্বাস করা যায় না।

এই যুক্তি এতই অকাট্য যে যাঁরা অন্য কিছু সিদ্ধান্ত করেছেন, তাঁদের কষ্টকল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন দনুজমর্দনদেবের মুদ্রায় উল্লিখিত পাণ্ডুনগর মালদহ জেলার পাণ্ডুয়া না হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া? ডঃ দানী এই পাণ্ডুনগরকে হুগলী জেলার পাণ্ডুয়ার সঙ্গে অভিন্ন ধরতে চান। কিন্তু হুগলী জেলার পাণ্ডুয়াতে কোন দিন কোন টাকশাল ছিল বলে জানা যায় না। এই পাণ্ডুয়া থেকে মাত্র ১০।১১ মাইল দূরে সাতগাঁওতে একটি চালু টাকশাল এই সময় ছিল বলে এখানে সাময়িকভাবেও কোন টাকশাল স্থাপিত হবার সম্ভাবনা স্বীকার করা যায় না। মুদ্রায় উল্লিখিত পাণ্ডুনগর যে মালদহ জেলার পাণ্ডুয়া, সে সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ আছে। বুকানন প্রায় দেড়শো বছর আগে লিখেছিলেন, মালদহ জেলার পাণ্ডুয়া পাণ্ডববংশের জনৈক রাজা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে স্থানীয় জনসাধারণের বিশ্বাস; শ'খানেক বছর আগে রাভেনশ' লিখেছিলেন যে, পাণ্ডুয়ার সাতাশ-ঘড়া নামে যে দীঘিটি আছে, লোকে বলে সেটি তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন; সাতাশ-ঘড়া দীঘির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি পুরানো বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ আছে, লোকে তাকে বলে 'পাণ্ডপ (পাণ্ডব) রাজা দালান' (Memoirs of Gaur and Pandua, p. 143 দ্রঃ)। অতএব মালদহ জেলার পাণ্ডুয়ার মূল নাম যে পাণ্ডুনগর ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই, দনুজমর্দনদেব ও মহেন্দ্রদেবের মুদ্রাগুলির প্রাপ্তিস্থানের দিকে লক্ষ্য রাখলেও সব সন্দেহ ভঞ্জন হবে। পাণ্ডুনগরের টাকশালে তৈরী অধিকাংশ মুদ্রাই উত্তর বঙ্গে আবিষ্কৃত হয়েছে। দনুজমর্দনদেবের সর্বপ্রথম যে মুদ্রাটি আবিষ্কৃত হয়েছিল, সেটি গৌড়ের

ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল।* খাস পাণ্ডুয়াতেই (মালদহ জেলা) দনুজমর্দনদেব ও মহেন্দ্রদেবের একটি করে মুদ্রা পাওয়া গেছে। দু'টি মুদ্রাই পাণ্ডুনগরের টাকশালে তৈরী। এই সমস্ত প্রমাণ থেকে নিঃসংশয়ে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, দনুজমর্দনদেব ও মহেন্দ্রদেবের মুদ্রায় উল্লিখিত পাণ্ডুনগর বর্তমান মালদহ জেলায় অবস্থিত পাণ্ডুয়া।

আমরা নীচে রিয়াজ-উস্-সলাতীন ও বুকাননের বিবরণীর উক্তি এবং সমসাময়িক সূত্র ও মুদ্রা থেকে লব্ধ তথ্যের সংক্ষিপ্তসার পাশাপাশি দিলাম। এর থেকেই বোঝা যাবে, গণেশ ও দনুজমর্দনদেব একই লোক।

'রিয়াজ' ও বুকাননের বিবরণী	সমসাময়িক সূত্র ও মুদ্রা
গণেশ দরবেশদের উপর অত্যাচার করায় নূর কুৎব্ আলম সুলতান ইব্রাহিমকে আহ্বান জানান—গণেশকে দমন করার জন্য। ইব্রাহিম এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে সসৈন্যে বাংলার দিকে রওনা হন।	আশরফ সিম্নানীর চিঠিতে লেখা আছে, গণেশ দরবেশদের উপর অত্যাচার করেছিলেন এবং তাঁকে দমন করার জন্য নূর কুৎব্ আলম ইব্রাহিম শর্কীকে আহ্বান জানান। ইব্রাহিম এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে সসৈন্যে বাংলার দিকে রওনা হন।
ইব্রাহিম সসৈন্যে উপস্থিত হলে গণেশ নত হন এবং তাঁর পুত্রকে ধর্মান্তরিত করে জলালুদ্দীন নাম দিয়ে সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হয়।	'সঙ্গীতশিরোমণি' থেকে জানা যায় যে, ইব্রাহিমের বাংলায় অভিযানের ফলে গণেশের ক্ষমতার উচ্ছেদ হয়েছিল এবং তাঁর পুত্র মুসলিমধর্মে দীক্ষিত হয়ে সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েছিলেন।
	৮১৮ ও ৮১৯ হিজরায় উৎকীর্ণ জলালুদ্দীনের মুদ্রা পাওয়া গেছে।

* ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে ক্রেটন এটি আবিষ্কার করেন। তিনি রাজার নাম পড়েন 'দনুজমদনদেব'; তাঁর **Ruins of Gaur (1817)** বইয়ে এই মুদ্রার বিবরণ প্রকাশিত হলেও তা তখন সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। বিংশ শতাব্দীর প্রথমে দনুজমর্দনদেব ও মহেন্দ্রদেবের আরও অনেকগুলি মুদ্রা আবিষ্কৃত হয় এবং তখন থেকেই এগুলির সম্বন্ধে আলোচনা সুরু হয়।

'রিয়াজ' ও বুকাননের বিবরণী	সমসাময়িক সূত্র ও মুদ্রা
	নূর কুৎব্ আলমের চিঠি থেকে জানা যায় যে, একজন বিধর্মী ক্ষমতা অধিকার করেছেন এবং জলালুদ্দীন রাজা থাকায় মুসলমানদের কোন লাভ হচ্ছে না।
এর কিছুদিন পরে জলালুদ্দীনকে অপসারিত করে গণেশ নিজেই রাজা হয়ে সিংহাসনে বসলেন।	৮২০ হিজরায় উৎকীর্ণ জলালুদ্দীনের মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে না। ১৩৩৯ ও ১৩৪০ শকাব্দে (=৮২০-৮২১ হিঃ) উৎকীর্ণ দনুজমর্দনদেবের মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে।
এর কয়েক বছর বাদে গণেশের মৃত্যু হয় এবং জলালুদ্দীন আবার রাজা হন।	১৩৪০ শকাব্দে (=৮২১ হিঃ) উৎকীর্ণ মহেন্দ্রদেবের মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে। ৮২১ হিজরা থেকে আবার নিয়মিতভাবে জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে।

অতএব দনুজমর্দনদেব স্বয়ং গণেশ ভিন্ন আর কেউ হতে পারেন না। ফার্সী বইগুলিতে গণেশের 'দনুজমর্দনদেব' উপাধির কথা উল্লিখিত হয়নি বলেই আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়; কিন্তু অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, বুকানন যে পুথিটি ব্যবহার করেছিলেন, তাতে এই উপাধিটি উল্লিখিত ছিল। অধ্যাপক ভট্টাচার্য বলেছেন, "Hakim of Dynwaj পদটি দনুজমর্দন শব্দের ফারসী অনুবাদ—অন্যায় অধিকারী অর্থেও হাকিম শব্দের ব্যবহার আছে। ইহা ছাড়া পদটির কোন অর্থই সঙ্গত হয় না—দিনাজপুর নিতান্তই আধুনিক নাম।......নামটির মধ্যে একটি 'w' অক্ষর আছে—তদ্দ্বারা 'দনুজ'ই প্রতিপন্ন হয়—'দিনাজ' নহে।"* 'Hakim, of Dynwaj'-এর বুকানন ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, 'perhaps a petty Hindu chief of

* প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৬০, পৃঃ ৯৩ থেকে উদ্ধৃত। এই উদ্ধৃতিতে "একটি 'w' অক্ষর"-এর জায়গায় 'প্রবাসী'তে ভুলক্রমে "একটি 'ঘ' অক্ষর" ছাপা হয়েছে। স্বর্গত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের নির্দেশ অনুসারেই আমরা যথাযথভাবে এই ভুলের সংশোধন করেছি।

Dinajpur' ; কিন্তু এই ব্যাখ্যা কী কারণে স্বীকার করা চলে না, তা আগেই দেখানো হয়েছে ; সুতরাং অধ্যাপক ভট্টাচার্য 'Hakim, of Dynwaj'-এর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাই এর যথার্থ ব্যাখ্যা বলে মনে হয়। আমাদের মনে হয়, মূল ফার্সী পুঁথিতে পদটি যেভাবে ছিল, তার প্রকৃত অর্থ, 'দনুজ' নামধারী হাকিম ; ফার্সী লিপিতে 'দনুজ' 'দিনওয়াজ' হয়েছে।

কিন্তু গণেশ ও দনুজমর্দনদেব যে পৃথক লোক, এই মতও কোন কোন গবেষক ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং তাঁদের মতের পিছনে কী কী যুক্তি আছে, তা ভালভাবে বিচার করে দেখা দরকার।

প্রথম যুক্তিটি অনেকটা সংস্কারমূলক। এঁরা বলেন জলালুদ্দীনের প্রথম মুদ্রার তারিখ ৮১৮ হিজরা=১৪১৫-১৬ খ্রীঃ, আর দনুজমর্দনদেবের প্রথম মুদ্রার তারিখ ১৩৩৯ শক=১৪১৭-১৮ খ্রীঃ। সুতরাং গণেশ ও দনুজমর্দনদেবকে অভিন্ন ধরলে স্বীকার করতে হয় যে—আগে পুত্র, এবং তারপরে পিতা রাজা হয়েছিলেন। এ ব্যাপার অস্বাভাবিক। এর উত্তরে বলা যায়, অস্বাভাবিক হলেও এরকম ব্যাপার ঘটেছিল বলে যখন 'রিয়াজ-উস্-সলাতীন' ও বুকাননের বিবরণীতে লেখা আছে এবং বিভিন্ন সমসাময়িক সূত্র থেকে তার সমর্থন মিলছে, তখন একে স্বীকার করে নিতেই হয়।

দ্বিতীয় যুক্তি, দনুজমর্দন নামে একজন স্বতন্ত্র রাজার সন্ধানও পাওয়া গেছে। ইনি চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই সব গবেষকেরা মনে করেন, ইনিই ১৩৩৯ ও ১৩৪০ শকাব্দে প্রায় সারা বাংলার অধীশ্বর হয়েছিলেন এবং পাণ্ডুয়া, সোনারগাঁও ও চাটগাঁও-এর টাকশাল থেকে মুদ্রা প্রকাশ করেছিলেন। এখনও কেউ কেউ এই মতে বিশ্বাস করেন বলে এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা দরকার মনে করি।

চন্দ্রদ্বীপের দনুজমর্দন

প্রথমেই বলা দরকার, চন্দ্রদ্বীপে যে দনুজমর্দন নামে কোনও রাজা ছিলেন, তা কোন প্রামাণিক সূত্র থেকে জানা যায় না। এই দনুজমর্দন কেবলমাত্র কিংবদন্তী ও কুলগ্রন্থে উল্লিখিত। অবশ্য এই কিংবদন্তী ও কুলগ্রন্থের একটা বড় অংশই দনুজমর্দনদেব ও মহেন্দ্রদেবের নামাঙ্কিত মুদ্রা আবিষ্কারের পরে সৃষ্টি হয়েছে ; কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে, তারও ইতিহাস বেশ কৌতুকজনক। প্রথমে এই মুদ্রাগুলির তারিখ পড়তে পারা যায় নি। তখন

কেউ কেউ মত প্রকাশ করলেন, এই দনুজমর্দন এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর রাজা দনুজমাধব বা দনুজ রায় অভিন্ন। এই সময় কতকগুলি কুলগ্রন্থ আবিষ্কৃত হল, যাতে লেখা রয়েছে দনুজমর্দন ও দনুজমাধব অভিন্ন। এর পরে মুদ্রাগুলির তারিখ কেউ কেউ আংশিকভাবে পড়তে পারলেন, কিন্তু তাঁরা মহেন্দ্রদেবকে অগ্রবর্তী ও দনুজমর্দনদেবকে পরবর্তী রাজা মনে করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি কুলগ্রন্থও বেরোল, যাতে লেখা আছে দনুজমর্দন মহেন্দ্রের পুত্র। 'বটুভট্টের দেববংশে'ও (নামান্তর 'দেববংশের ইতিবৃত্তি') এই কথা লেখা আছে ; এইসব জঞ্জাল এই সময়ের সৃষ্টি। আবার তারিখ ঠিকভাবে পড়তে পারার পর সেই অনুযায়ী কুলগ্রন্থও বেরিয়েছে।

এই সব আবর্জনাকে আমরা হিসাবের মধ্যে গণ্য করব না। আমাদের দেখতে হবে দনুজমর্দনদেবের মুদ্রা নিয়ে আলোচনা সুরু হবার আগে এ-সম্বন্ধে কী কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল এবং কুলগ্রন্থে কী লেখা ছিল। তা জানা যায় চার জায়গা থেকে—(১) এইচ এস বেভারিজ রচিত The District of Backergaunj বই (১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত), (২) জেমস ওয়াইজ লিখিত On the Barah Bhuyas of Eastern Bengal প্রবন্ধ (J. A. S. B., 1874, pp 197-214), (৩) খোসালচন্দ্র রায় রচিত 'বাখরগঞ্জের ইতিহাস' (১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত), (৪) রোহিণীকুমার সেন বিরচিত 'বাকলা' (লেখকের মৃত্যুর দশ বছর পরে—১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত)। (আরও কয়েকখানি বইয়ের নাম শুনেছি, কিন্তু এগুলি সংগ্রহ করতে পারিনি।)

একথা জেনে রাখা দরকার, প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য বর্তমান ফরিদপুর জেলার কিয়দংশ, বরিশাল জেলার কিয়দংশ ও নোয়াখালি জেলার কিয়দংশ নিয়ে গঠিত ছিল। মোগল আমলে এই অঞ্চল ছিল 'সরকার বাকলা'র অন্তর্গত। যা হোক্, উপরে যে চারটি বই বা প্রবন্ধের উল্লেখ করা হল, প্রত্যেকটিতেই বলা হয়েছে, চন্দ্রদ্বীপ-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম (বা নামের অংশ) ছিল দনুজমর্দন। কিন্তু এদের উক্তির মধ্যে কিছু কিছু অনৈক্য দেখা যায়। বেভারিজ ও রোহিণীকুমার সেনের মতে চন্দ্রদ্বীপ-রাজবংশ-প্রতিষ্ঠাতার নাম রামনাথ দনুজমর্দন দে (বাঙালীর পক্ষে অদ্ভুত নাম), খোসালচন্দ্র রায়ের মতে এঁর নাম দনুজমর্দন দে এবং এর পুত্রের নাম রামনাথ দে, জেমস ওয়াইজের মতে এঁর নাম দনুজমর্দন দে, 'রামনাথ'-এর কোন উল্লেখ ওয়াইজের লেখায় নেই।

কীভাবে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল, সে সম্বন্ধে বেভারিজ, ওয়াইজ ও রোহিণীকুমার সেন দুটি প্রাচীন কিংবদন্তীর উল্লেখ করেছেন। এই দুটি কিংবদন্তীর সংক্ষিপ্তসার নীচে দেওয়া হল।

(১) কোন এক সময় বিক্রমপুরে চন্দ্রশেখর নামে একজন ব্রাহ্মণ এমন একটি কন্যাকে বিবাহ করেন, যার নাম তাঁর উপাস্যা দেবীর নামের সঙ্গে অভিন্ন। ব্রাহ্মণ এই ব্যাপারে ক্ষুব্ধ হয়ে আত্মহত্যা করবার জন্য একটি ছোট নৌকোয় চড়ে জলপথে আসেন এবং দুদিন পরে এক জায়গায় এসে এক ধীবরকন্যাব দেখা পান। এই ধীবরকন্যা তাঁকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে আত্মহত্যা থেকে নিরস্ত কবেন এবং অবশেষে প্রকাশ পায় ইনিই চন্দ্রশেখরেব উপাস্যা দেবী। দেবী বলেন শীঘ্রই এই জলময় অঞ্চল শস্যশ্যামলা মেদিনীতে পরিণত হবে এবং চন্দ্রশেখর তার রাজা হবেন। চন্দ্রশেখর রাজা হতে অস্বীকাব করেন। শুধু প্রার্থনা করেন যেন তাঁর নাম অনুসারে এই জায়গার নাম হয়। দেবী এই প্রার্থনা পূরণ করেন। ফলে জল সরে গেলে এই অঞ্চল চন্দ্রশেখরের নাম অনুসারে ‘চন্দ্রদ্বীপ’ নামে পরিচিত হয়।

(২) আগে যখন চন্দ্রদ্বীপ অঞ্চল জলমগ্ন ছিল, তখন চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী তাঁর কয়েকজন শিষ্য নিয়ে এই জায়গা দিয়ে নৌকায় চড়ে তীর্থ অভিমুখে যাচ্ছিলেন। এই শিষ্যদের মধ্যে একজনের নাম দনুজমর্দন দে। একদিন রাত্রে জগদম্বা কালিকাদেবী ব্রহ্মচারীকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন, এখানে জলের তলায় তিনটি পাষাণময়ী দেবমূর্তি আছে, এগুলি যদি দনুজমর্দন দে তোলেন, তাহলে জল অপসারিত হয়ে এই অঞ্চল ভূখণ্ডে পরিণত হবে। পরদিন সকালে চন্দ্রশেখরের আদেশ অনুযায়ী দনুজমর্দন দে দুবার জলে ডুব দিয়ে প্রথমবার ক্যাত্যায়নীর এবং দ্বিতীয়বার মদনগোপালের মূর্তি পেলেন, কিন্তু তৃতীয়বার ডুব দিতে সাহস করলেন না। গুরু বললেন, “তৃতীয়বার ডুব দিলে মহালক্ষ্মীর মূর্তি পাওয়া যেত।” যাহোক্, অবিলম্বেই সমস্ত জল সরে গিয়ে অঞ্চলটি ভূখণ্ডে পরিণত হল এবং দনুজমর্দন দে তাঁর প্রথম রাজা হলেন। গুরুর নাম অনুসারে তিনি নতুন রাজ্যের নাম রাখলেন ‘চন্দ্রদ্বীপ’।

বলা বাহুল্য, অলৌকিকরসাশ্রিত এই সব কিংবদন্তী থেকে আমরা ইতিহাসের কোন উপকরণ পাই না।

পূর্বোল্লিখিত চারজন লেখকই প্রাচীন কুলগ্রন্থ বা কিংবদন্তী অবলম্বনে দনুজমর্দন দের অধস্তন বংশধরদের নামের তালিকা দিয়েছেন। কিন্তু চারটি তালিকার পরস্পরের মধ্যে মিল নেই। আমরা চারটি তালিকা থেকেই বংশলতা প্রস্তুত করে নীচে লিপিবদ্ধ করলাম।

বেভারিজ	ওয়াইজ	রোহিণীকুমার সেন	খোসালচন্দ্র রায়
রামনাথ দনুজমর্দন দে	দনুজমর্দন দে	রামনাথ দনুজমর্দন দে	দনুজমর্দন দে
রমাবল্লভ	রমাবল্লভ	রমাবল্লভ	রামনাথ
শ্রীবল্লভ	কৃষ্ণবল্লভ	কৃষ্ণবল্লভ	রমাবল্লভ
হরিবল্লভ	হরিবল্লভ	হরিবল্লভ	শ্রীবল্লভ
কৃষ্ণবল্লভ	জয়দেব	জয়দেব	হরিবল্লভ
	কন্যা		
কমলা = বলভদ্র বসু		কমলা = বলভদ্র বসু	কৃষ্ণবল্লভ
পরমানন্দ	পরমানন্দ	পরমানন্দ	কমলা
জগদানন্দ	জগদানন্দ	জগদানন্দ	প্রেমানন্দ
কন্দর্পনারায়ণ	কন্দর্পনারায়ণ	কন্দর্পনারায়ণ	জগদানন্দ
রামচন্দ্র	রামচন্দ্র	রামচন্দ্র	কন্দর্পনারায়ণ
			রামচন্দ্র

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই চারটি বংশলতার শেষ চারটি নামের মধ্যে বিশেষ কোন বিরোধ না থাকলেও (কেবল খোসালচন্দ্র রায় 'পরমানন্দ'র জায়গায় 'প্রেমানন্দ' লিখেছেন) তার আগের নামগুলি সম্বন্ধে বিরোধ অল্প

নয়। সুতরাং আগের অংশের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে মনে সন্দেহ জাগে। শেষ চারজনের মধ্যে রামচন্দ্র যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যের জামাতা এবং বহু প্রামাণিক সূত্রে উল্লিখিত। কন্দর্পনারায়ণও ঐতিহাসিক ব্যক্তি। জগদানন্দের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিংবদন্তী ও কুলগ্রন্থের বাইরে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কিন্তু পরমানন্দের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত প্রমাণ আছে, তাঁর আবির্ভাবকালও জানা গেছে। পর্তুগীজ ভাষায় লেখা একটি চুক্তিপত্র পাওয়া গেছে; এর থেকে জানা যায় ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল তারিখে বাকলার রাজা (Rae de Bacola) পরমানন্দ রায় পর্তুগীজদের সঙ্গে এক চুক্তি করেন এবং তাঁর দুজন প্রতিনিধি গোয়ায় গিয়ে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। (Surendranath Sen, Studies in Indian History, 1930, p. 3 দ্রঃ। (এই অঞ্চলের আর একজন পরমানন্দের নাম আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী'র দ্বিতীয় খণ্ডে পাওয়া যায়। আবুল ফজল লিখেছেন, আকবরের রাজত্বের ২৯শ বর্ষে অর্থাৎ ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এক বিরাট ঝটিকাবর্ত ও জলপ্লাবন হয়ে 'সরকার বাকলা'কে একেবারে নিমজ্জিত করে দেয়। বাকলার রাজা তখন গীতবাদ্য উপভোগ করছিলেন। প্রাণ বাঁচাবার জন্য নৌকায় উঠেও তিনি আত্মরক্ষা করতে পারেন না। কিন্তু তাঁর পুত্র পরমানন্দ রায় উঁচু মন্দিরের চূড়ায় উঠে কোনরকমে রক্ষা পেয়ে যান।)

যা হোক্, বাকলা বা চন্দ্রদ্বীপের রাজা পরমানন্দ অন্তত ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর ঊর্ধ্বতন পুরুষদের নাম প্রামাণিকভাবে জানা যায় না। কিংবদন্তী ও কুলগ্রন্থ থেকে যা জানা যায়, সে সম্বন্ধেও বিভিন্ন বিবরণের মধ্যে মতৈক্য নেই। বেভারিজ ও রোহিণীকুমার সেনের মত অনুসারে যদি চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দনুজমর্দন পরমানন্দের ঊর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ হন তাহলে তিনি মোটামুটিভাবে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বর্তমান ছিলেন; ওয়াইজের মত অনুসারে যদি তিনি পরমানন্দের ঊর্ধ্বতন ষষ্ঠ পুরুষ হন, তাহলে মোটামুটিভাবে পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে এবং খোসালচন্দ্র রায়ের মত অনুসারে যদি তিনি পরমানন্দের ঊর্ধ্বতন অষ্টম পুরুষ হন, তাহলে মোটামুটিভাবে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ পাদে বর্তমান ছিলেন।

চন্দ্রদ্বীপের দনুজমর্দনের কোন পূর্বপুরুষের নাম কোন প্রাচীন কুলগ্রন্থে পাওয়া যায় না। 'বটুভট্টের দেববংশ' বা 'দেববংশের ইতিবৃত্তি'তে এ সম্বন্ধে

যা লেখা আছে, তার কোন মূল্য নেই। সুতরাং এদিক দিয়ে তাঁর আবির্ভাব-কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করার কোন উপায় নেই।

যাহোক্, চন্দ্রদ্বীপ-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দনুজমর্দনের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁর সম্বন্ধে যে সব কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, সেগুলি অলৌকিক উপাদানে পূর্ণ। তাঁর অধস্তন বংশলতা বিভিন্ন কুলগ্রন্থে যেভাবে পাওয়া যায় তাদের মধ্যে ঐক্য নেই এবং এদের পিছনে কোন প্রামাণিক সূত্রের সমর্থন নেই। কিংবদন্তীর উপর বিশ্বাস করে যদি এই দনুজমর্দনের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তাহলেও তাঁর সম্ভাব্য আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় না। সুতরাং এই চন্দ্রদ্বীপরাজ দনুজমর্দন ১৩৩৯-৪০ শকাব্দে সারা বাংলার অধীশ্বর হয়েছিলেন এবং পাণ্ডুয়া, সোনারগাঁও ও চাটগাঁও থেকে এক সঙ্গে মুদ্রা প্রকাশ করেছিলেন ধরে নিলে তা আষাঢ়ে কল্পনার পর্যায়ে পড়বে। আর একটি বিষয় লক্ষ্য করতে হবে। সমস্ত প্রাচীন কিংবদন্তী ও কুলগ্রন্থ অনুসারে দনুজমর্দন কেবল চন্দ্রদ্বীপেরই রাজা ছিলেন। তিনি যে সারা বাংলাদেশ জয় করেছিলেন, এরকম কোন কথা তাদের মধ্যে বলা হয়নি। সুতরাং মুদ্রার দনুজমর্দনদেব চন্দ্রদ্বীপের দনুজমর্দন হতে পাবেন না, তিনি রাজা গণেশ ছাড়া আর কেউ নন। চন্দ্রদ্বীপের দনুজমর্দন সম্বন্ধে আমাদের ব্যক্তিগত ধারণা এই যে, চন্দ্রদ্বীপে এই নামের একজন রাজা সত্যিই ছিলেন এবং তিনি গণেশ-দনুজমর্দনের পরবর্তী কালের লোক; গণেশ-দনুজমর্দনদেবের অনুকরণেই তিনি 'দনুজমর্দন' নাম নিয়েছিলেন।

গণেশের দ্বিতীয়বার সিংহাসনে আরোহণ ও পরবর্তী ঘটনাবলী

অতএব সিদ্ধান্ত করা গেল, গণেশ ও দনুজমর্দনদেব একই লোক। ১৪১০ খ্রীষ্টাব্দেই যিনি বাংলার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে নায়কের ভূমিকা নিয়ে অবতরণ করেছিলেন, অনিবার্য কারণবশত ১৪১৭ খ্রীষ্টাব্দের আগে তিনি নিজের নামে মুদ্রা বার করতে পারেন নি। ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী দেখিয়েছেন, 'দনুজমর্দন' নামটি বিশেষভাবে ইঙ্গিতপূর্ণ; এর দ্বারা বিধর্মী প্রতিপক্ষদের দমন করার অভিপ্রায় প্রকাশ পাচ্ছে।

জলালুদ্দীনের অন্যান্য বছরের মুদ্রার তুলনায় ৮১৯ হিজরার মুদ্রা অচিন্তনীয় রকমের কম। ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী তাঁর অন্য বছরের বহু মুদ্রা পেয়েছিলেন, কিন্তু ৮১৯ হিজরার মুদ্রা মাত্র একটি পেয়েছিলেন।

অতএব ৮১৯ হিজরাতেই গণেশ জলালুদ্দীনকে অপসারিত করে সিংহাসনে বসেছিলেন এবং পরের বছর থেকে 'দনুজমর্দনদেব' উপাধি নিয়ে মুদ্রা বার করেছিলেন, এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। দনুজমর্দনদেব ১৩৪০ শকাব্দের প্রথমাংশ অবধি অর্থাৎ ৮২১ হিজরার মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দ্বিতীয়বার সিংহাসনে বসে গণেশ প্রায় দু'বছর রাজত্ব করেছিলেন।

আমরা দেখে এসেছি, ইব্রাহিম শর্কীর হস্তক্ষেপের ফলে গণেশ সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, এখন তাঁর এমন কী সুযোগ ঘটল, যাতে তিনি সিংহাসনে বসলেন? ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী অনুমান করেছিলেন যে, ইতিমধ্যে নূর কুৎব্ আলমের মৃত্যু হওয়াতেই গণেশ এই সুযোগ পেয়েছিলেন। বিভিন্ন সূত্রে নূর কুৎব্ আলমের মৃত্যুর বিভিন্ন তারিখ পাওয়া যায়।* বেভারিজ নানা যুক্তি সহকারে দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন যে, তার মধ্যে ৮১৮ হিজরা তারিখটিই গ্রহণযোগ্য।† ডঃ ভট্টশালীর অনুমান

---

* এইসব বিভিন্ন তারিখ হচ্ছে ৮০৮, ৮১৩, ৮১৮, ৮২৮, ৮৩৩ ৮৪৮, ৮৫১ ও ৮৬৩ হিজরা (JASB, 1892, Pt. I, pp. 122-124 : JASB, 1895, Pt. I. p. 207 এবং JASB, 1902, Pt. I. p. 46 দ্রঃ)। ৮৬৩ হিজরা তারিখটি পাওয়া যায় সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহ্মূদ শাহের রাজত্বকালে নির্মিত নূর কুৎব্ আলমের দরগাব রান্নাঘরের একটি শিলালিপিতে। শিলালিপিটিতে একজন দরবেশের মৃত্যুর কথা উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষায় লেখা আছে। ডঃ দানী মনে করেন এই দরবেশ স্বয়ং নূর কুৎব্ আলম। কিন্তু বেভারিজ বহু পূর্বে লিখেছিলেন, "863 is, I think, an impossible date for the death of a man who was a contemporary and fellow student of Sultan Ghiyasuddin and whose father died (after the son was grown up) in 786, or at least in 800." বেভারিজের মতে শিলালিপিটিতে উল্লিখিত তারিখ সমাধি-নির্মাণের, নূর কুৎব্ আলমের মৃত্যুর নয় (JASB, 1895, Pt. I, pp. 207-208 দ্রঃ)। আবিদ আলীর মতে এটি নূর কুৎবের পৌত্র শেখ জাহিদের মৃত্যুর তারিখ। যাহোক শিলালিপিটি বোধহয় সমসাময়িক নয়। কারণ এতে উল্লিখিত সম্পূর্ণ তারিখটি—২৮শে জিলহিজ্জা, সোমবার, ৮৬৩ হিজরা। কিন্তু মনোমোহন চক্রবর্তী জ্যোতিষ-গণনা করে দেখিয়েছিলেন ৮৬৩ হিজরার ২৮শে জিলহিজ্জা সোমবারে পড়েনি—শুক্রবারে পড়েছিল (JASB, 1909, Pt. I, p. 228 দ্রঃ)। সুতরাং এর সাক্ষ্যের খুব একটা মূল্য নেই।

† ইলাহী বখ্শের 'খুর্শিদ-ই-জহান-নামা'তে উল্লিখিত একটি শিলালিপিতে নূর কুৎব্ আলমের মৃত্যুর তারিখ দেওয়া আছে—৭ই জিল্কদ, ৮১৮ হিজরা। ব্রিটিশ মিউজিয়াম রক্ষিত 'মিরাৎ-উল্-আস্রার'-এর এক পুঁথিতে লেখা আছে—১০ই জিল্কদ, ৮১৮ হিজরা।

বেভারিজের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে। তাঁর এই অনুমান খুবই যুক্তিযুক্ত। 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' লেখা আছে, গণেশের দ্বিতীয়বার সিংহাসনে আরোহণের সময়ে নূর কুৎব্ জীবিত ছিলেন। কিন্তু গণেশের মৃত্যুর পরে যখন জলালুদ্দীন দ্বিতীয়বার সিংহাসনে বসলেন, তখন যে নূর কুৎব্ জীবিত ছিলেন, এমন কথা ঐ বইয়ে লেখা নেই। তার বদলে তাতে আমরা দেখি জলালুদ্দীন নূর কুৎবের পৌত্র শেখ জাহিদকে (গণেশ কর্তৃক উৎপীড়িত ও সোনারগাঁওয়ে নির্বাসিত) আনিয়ে সংবর্ধনা করছেন। সুতরাং গণেশের দ্বিতীয়বার রাজত্বের সময় যে নূর কুৎব্ আলমের মৃত্যু হয়েছিল, এই ধারণার সমর্থন 'রিয়াজ' থেকেও পাওয়া যাচ্ছে। নূর কুৎব্ আলমের যে চিঠিটি আগে উদ্ধৃত হয়েছে, সেটি জলালুদ্দীনের প্রথমবার সিংহাসনে আরোহণের কিছু পরেই রচিত। এই চিঠিতে নূর কুৎবের নৈরাশ্য ও ক্ষোভ চরমে পৌঁছেছে। যতদূর মনে হয়, ৮১৮ হিজরার কোন এক সময়ে এই চিঠিটি লেখবার কিছু পরেই নূর কুৎব্ আলম ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন। রাজা গণেশও এই শক্তিশালী দরবেশের মৃত্যুতে নিষ্কণ্টক হন এবং পুত্রকে অপসারিত করে নিজের মস্তকে রাজমুকুট ধারণ করেন। এই সময়ে গণেশের পক্ষে সিংহাসনে বসবার অনুকূল সুযোগ যে অন্য দিক থেকেও এসেছিল, তার স্পষ্ট আভাস নূর কুৎব্ আলমের চিঠিতেই পাওয়া যায়; ঐ চিঠির শেষাংশে তিনি বলেছেন, "লক্ষণ যা দেখা যাচ্ছে, তাতে আমাদের কাছে কোন সাহায্য আসবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই।" এর থেকেই বোঝা যায় যে, বহিঃশত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা থেকে গণেশ এই সময় সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। কীভাবে তিনি এই নিরাপত্তা অর্জন করেছিলেন তা স্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে না, অনুমানে বলা যায় যে, গণেশ প্রায় দু'বছর জলালুদ্দীনকে সিংহাসনে বসিয়ে রেখে ভিতরে ভিতরে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেছিলেন এবং রাজ্যের সীমানা সুরক্ষিত করেছিলেন; তাই ইব্রাহিম শর্কী বা আর কোন বহিঃশত্রুর কাছ থেকে তাঁর আর এখন কোন ভয় ছিল না। সুতরাং তাঁর সিংহাসনে আরোহণেরও আর কোন বাধা ছিল না। নূর কুৎব্ আলম পূর্বোক্ত চিঠিখানি লেখবার অল্প পরেই গণেশ সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন বলে মনে হয়।

গণেশের দ্বিতীয়বার সিংহাসনে আরোহণের আনুষঙ্গিক দু'টি ঘটনা 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' উল্লিখিত হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে জলালুদ্দীনকে তিনি শুদ্ধি করিয়ে হিন্দু করেছিলেন, দ্বিতীয়টি হচ্ছে তাঁর আদেশে নূর কুৎব্

আলমের ছেলে আনোয়ারকে হত্যা করা হয়েছিল। দু'টি ঘটনাই সত্য বলে আমাদের মনে হয়। গণেশ নিজে নিষ্ঠাবান হিন্দু; অবস্থার চাপে পড়ে ছেলেকে মুসলমান হতে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, সুতরাং অনুকূল সুযোগ এলে যে তিনি আবার তাকে হিন্দু করবেন, এটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। উপরন্তু 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা'র বিবৃতিতেও 'রিয়াজ'-এর উক্তির প্রচ্ছন্ন সমর্থন আছে: ফিরিশ্‌তা বলেছেন, "পিতার মৃত্যুর পরে জিতমল (যদু) অমাত্যদের এবং রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় লোকদের আহ্বান করে বললেন যে, 'আমার কাছে ইসলাম ধর্মের সত্য পরিষ্কার এবং এই ধর্ম গ্রহণ করা ভিন্ন আমার আর কোন উপায় নেই'।" এখন আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, যদু বা জিতমল পিতার জীবদ্দশাতেই একবার মুসলমান হয়েছিলেন। সুতরাং মাঝে যদি তাঁর শুদ্ধি না হয়ে থাকে, তাহলে পিতার মৃত্যুর পরে এই কথা বলার কোন কারণ থাকতে পারে না। 'ফিরিশ্‌তা' ও 'রিয়াজ' দুই বিবরণীর উক্তি মিলিয়ে দেখে আমাদের মনে হয়, গণেশ জলালুদ্দীনের শুদ্ধি করিয়েছিলেন। শুদ্ধির প্রক্রিয়া সম্বন্ধে 'রিয়াজ'-এ বলা হয়েছে, জলালুদ্দীনকে স্বর্ণনির্মিত কতকগুলি গাভীর মুখ দিয়ে প্রবেশ করিয়ে অধোদ্বার দিয়ে নির্গত করা হয়েছিল এবং পরে স্বর্ণনির্মিত গাভীর অংশগুলি ব্রাহ্মণদের দান করা হয়েছিল। এই বর্ণনা কতদূর সত্য তা বলা যায় না। 'রিয়াজ'-এ বলা হয়েছে শুদ্ধির পরেও ইসলাম ধর্মের প্রতি জলালুদ্দীনের আকর্ষণ কিছুমাত্র শিথিল হয়নি। এই কথা সম্পূর্ণ সত্য।

'রিয়াজ-উস্-সলাতীন' ও বুকাননের বিবরণীতে লেখা আছে যে রাজা গণেশ জলালুদ্দীনকে বন্দী করে রেখেছিলেন। এ কথাও সত্য বলে আমাদের মনে হয়। কারণ জলালুদ্দীন একবার পিতার বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন। আবার হয়তো যেতে পারেন, এই আশঙ্কায় রাজা গণেশের পক্ষে তাঁকে বন্দী করে রাখা স্বাভাবিক। তাছাড়া যিনি একবার রাজা হবার স্বাদ পেয়েছিলেন, সিংহাসনচ্যুত হয়ে তিনি আবার তা ফিরে পাবার চেষ্টা করবেন, এই আশঙ্কাতেও গণেশের পক্ষে ছেলেকে বন্দী করা স্বাভাবিক। এমনও হতে পারে, জলালুদ্দীন সত্যিই আবার পিতার বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন, তাই তাঁকে বন্দী করা হয়েছিল।

নূর কুৎব্‌ আলমের ছেলে আনোয়ারকে বধ করার কথাও যে সত্য, এ কথা মনে করার কারণ, আশ্‌রফ্‌ সিম্‌নানীর পূর্বোদ্ধৃত একটি চিঠির এক

জায়গায় আছে, "নূর কুৎব্ আলমের ছেলেকে এবং পরিবারকে যদি দুরাত্মা বিধর্মীদের গ্রাস থেকে উদ্ধার করা যায়, তাহলে খুবই ভাল কাজ হবে।" নূর কুৎব্ আলমের ছেলের প্রাণ তখনই গণেশের হাতে বিপন্ন হয়েছিল। সুতরাং গণেশ যে সুযোগ পাবা মাত্র তাঁর প্রাণবধের আদেশ দেবেন, এই ব্যাপার স্বাভাবিক। তবে এই ঘটনা যে গণেশের দ্বিতীয়বার সিংহাসনে আরোহণের পরে ঘটেছিল, সে কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। নূর কুৎব্ আলমের পূর্বোক্ত চিঠি গণেশের দ্বিতীয়বার সিংহাসনে আরোহণের আগেই লেখা। এর মধ্যে যে শোকের উচ্ছ্বাস দেখা যায়, তা ছেলের হত্যাকাণ্ডের দরুণ হতে পারে।

গণেশের মৃত্যু

১৩৪০ শকাব্দের পর আর দনুজমর্দনদেবের মুদ্রা পাওয়া যায় না। ঐ একই বছরে আবার মহেন্দ্রদেব ও জলালুদ্দীনের মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং ১৩৪০ শকাব্দ ব ৮২১ হিজরা বা ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক সময়ে যে গণেশের মৃত্যু হয়েছিল এবং তারপর প্রথমে মহেন্দ্রদেব ও পরে জলালুদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কীভাবে গণেশের মৃত্যু হল, সে সম্বন্ধে 'রিয়াজ'-রচয়িতা বলেছেন, "কেউ কেউ বলেন, "তার (গণেশের) ছেলে, যিনি বন্দী ছিলেন, ভৃত্যদের সঙ্গে যড়যন্ত্র করে পিতাকে হত্যা করেছিলেন।" সমসাময়িক আরবী ঐতিহাসিক ইব্ন্-ই-হজরের লেখা 'ইনবাউ'ল-গুম্‌র্' থেকে জানা যায় যে, গণেশের পুত্র জলালুদ্দীন গণেশকে আক্রমণ করে বধ করেছিলেন।

অপ্রামাণিক সূত্রে রাজা গণেশ

রাজা গণেশের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রামাণিকভাবে যা জানা যায়, সে সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করলাম। ঈশান নাগরের 'অদ্বৈতপ্রকাশ', লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের 'বাল্যলীলাসূত্র', নিত্যানন্দদাসের 'প্রেমবিলাস' প্রভৃতি অপ্রামাণিক গ্রন্থে এবং দুর্গাচরণ সান্যালের 'বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস' নামে গালগল্পে-ভরা বইটিতে রাজা গণেশ সম্বন্ধে কতকগুলি অতিরিক্ত "সংবাদ" পাওয়া যায়। তার মধ্যে কয়েকটি নীচে উল্লেখ করছি,

(১) গণেশ বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন,

(২) তাঁর মন্ত্রীর নাম ছিল নরসিংহ নাড়িয়াল,

(৩) তাঁর সঙ্গে সাঁতোড়ের রাজার নিবিড় বন্ধুত্ব ছিল,

(৪) তাঁর পুত্র যদু ইলিয়াস শাহী বংশের রাজকন্যা আশমানতারার প্রেমে পড়ে মুসলমান হয়েছিলেন।

এদের মধ্যে প্রথম তিনটি বিষয়ের পক্ষে কোন প্রমাণ নেই। চতুর্থ বিষয়টি ষোল আনাই মিথ্যা। গণেশের পুত্র কোন নারীর প্রেমে পড়ে মুসলমান হননি, তিনি যে কারণের জন্য মুসলমান হয়েছিলেন, তা সম্পূর্ণ ভিন্ন; এই বইয়ের ১১৯—১২০ পৃষ্ঠায় তা আলোচিত হয়েছে। 'আশমানতারা' নামটি নিতান্ত আধুনিক, এই নামে পঞ্চদশ শতাব্দীতে কোন মুসলমান রাজকন্যা থাকতেই পারেন না। 'আশমানতারা' প্রকৃতপক্ষে দুর্গাচরণ সান্যালের কল্পনার আশমানের তারা। রাজা গণেশ ও যদু সম্বন্ধে দুর্গাচরণ সান্যাল যা লিখেছেন, সমস্তই তাঁর বানানো, তার কোনই ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

গণেশের রাজ্যের আয়তন

গণেশের রাজ্যের আয়তন যে অত্যন্ত বিশাল ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। উত্তর বঙ্গের পাণ্ডুয়া, উত্তরপূর্ব বঙ্গের সোনারগাঁও এবং দক্ষিণপূর্ব বঙ্গের চট্টগ্রাম থেকে তাঁর মুদ্রা বেরিয়েছিল, এর থেকে বোঝা যায়, উত্তর ও পূর্ববঙ্গের অধিকাংশই তাঁর রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়া মধ্যবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের কতকাংশও যে তাঁর রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তা আলোচনা করে দেখাচ্ছি।

বিখ্যাত জীব গোস্বামী তাঁর লেখা 'লঘু বৈষ্ণবতোষণী'র (রচনাকাল ১৪৭৬ খ্রীঃ) শেষে তাঁর পূর্বপুরুষদের যে পরিচয় দিয়েছেন, তার থেকে জানা যায় যে, রাজা দনুজমর্দন তাঁর বৃদ্ধপ্রপিতামহ, রূপ-সনাতনের প্রপিতামহ পদ্মনাভকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং এই পদ্মনাভ শিখরভূমি (পঞ্চকোট অঞ্চল) পরিত্যাগ করে বাংলাদেশে এসে ভাগীরথীতীরবর্তী "নবহট্টকে" এসে বসতিস্থাপন করেন। জীব গোস্বামী লিখেছেন—

> "বিহায় গুণিশেখরঃ শিখরভূমিবাসস্পৃহাং
> স্ফুরৎসুরতরঙ্গিনীতটনিবাসপর্যুৎসুকঃ।
> ততো দনুজমর্দনক্ষিতিপপূজ্যপাদঃ ক্রমা-
> দুবাস নবহট্টকে স কিল পদ্মনাভঃ কৃতী।"

[রাজা দনুজমর্দন নিত্য যাঁর পাদপূজা করতেন, সেই গুণিশ্রেষ্ঠ কৃতী পদ্মনাভ শিখরভূমি বাসের স্পৃহা পরিত্যাগ করে গঙ্গাতীরে বাস করতে উৎসুক হয়ে নবহট্টকে (নৈহাটিতে) বসতি করেছিলেন।]

রূপ-সনাতন সুলতান হোসেন শাহের (১৪৯৩—১৫১৯ খ্রীঃ) সভাসদ ছিলেন। সুতরাং তাঁদের প্রপিতামহ পদ্মনাভকে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই পাওয়া যাচ্ছে। অতএব যে দনুজমর্দনের মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে, তিনিই পদ্মনাভের পাদপূজা করতেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'নবহট্টক' এখনকার 'নৈহাটি'র পূর্ব-নাম। কিন্তু বাংলা দেশে নৈহাটি নামে দু'টি জায়গা আছে; একটি কাটোয়ার উত্তরে আধুনিক সীতাহাটির কাছে নৈহাটি গ্রাম; অপরটি বর্তমান ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত কুমারহট্ট-হালিশহরের দক্ষিণে অবস্থিত সুপরিচিত নৈহাটি শহর। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোন্ নৈহাটিতে পদ্মনাভ বসতি করেছিলেন? প্রথম নৈহাটি বর্তমানে ছোট একটি গ্রাম হলেও তার ঐতিহ্য বেশ প্রাচীন। এখানে বল্লালসেনের তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছিল এবং এর অনতিদূরবর্তী ঝামটপুর গ্রামে কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিবাস ছিল। কিন্তু সম্প্রতি ডক্টর সুকুমার সেন একটি ছোট পুঁথিতে সংস্কৃত ভাষায় লেখা একটি রূপ-সনাতন-জীবের স্বতন্ত্র বংশপরিচয় পেয়েছেন। এর রচনাকাল ১৬২০ শক ও ১০০৪ সন (মল্লাব্দ) = ১৬৯৮-৯৯ খ্রীঃ, পুঁথিটির লিপিকাল ১৬২৯ শক ও ১০১৩ সন (মল্লাব্দ) = ১৭০৭-০৮ খ্রীঃ।* এতে লেখা আছে, "স চ পদ্মনাভ গঙ্গাতীরবাসলুব্ধ শিখরদেশং পরিত্যজ্য কুমারহট্ট নামা গ্রামে বাসং চকার।" যদিও এই বংশপরিচয় পরবর্তী কালের লেখা এবং কার লেখা জানা নেই, তাহলেও এর সাক্ষ্যকে অগ্রাহ্য করা চলে না, কারণ এর বিরোধী কোন প্রমাণ নেই। অতএব সিদ্ধান্ত করা যাচ্ছে, পদ্মনাভ যে নবহট্টকে বসতি স্থাপন করেছিলেন, তা বর্তমান ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত

* বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ৩য় সং, পূর্বার্ধ, পৃঃ ৩০২-৩০৩। ডঃ সেনের মতে বংশপরিচয়টির রচনাকাল ১৫৩২ শক, কিন্তু ১৫৩২ শক জীব গোস্বামীর মৃত্যু-শক হিসাবে এতে উল্লিখিত (পৃঃ ৩০৩ দ্রঃ)—রচনাকাল হিসাবে নয়। ডঃ সেন পুঁথির যে ফটো প্রকাশ করেছেন (৩০৩ পৃঃর আগে) তাতে ১৬২০ শক ও ১৬২৯ শক দুই তারিখই আছে, শেষেরটি অস্পষ্ট (ফটোর ডান দিকের নীচের অংশ দ্রষ্টব্য)। প্রথমটি রচনাকালের তারিখ, শেষেরটি পুঁথির লিপিকালের। ২৬।১।৫৭ তারিখে আমি পুঁথিটি চাক্ষুষ করেছিলাম, তখন শেষ তারিখটি শকে ও সনে স্পষ্ট করে লেখা ছিল।

নৈহাটি। পদ্মনাভ রাজা দনুজমর্দনের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। সুতরাং তিনি শিখরভূমি ছেড়ে এসে বাংলাদেশের যে অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন, তা যে দনুজমর্দনের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। অতএব অন্তত নৈহাটি পর্যন্ত ভাগীরথীর পূর্বতীরবর্তী অঞ্চল গণেশের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে স্থির করা যায়।

দক্ষিণবঙ্গের কতকাংশও যে গণেশের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তার প্রমাণ আছে। ৮২১ হিজরা পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের সাতগাঁও, উত্তরবঙ্গের পাণ্ডুয়া, পূর্ব-বঙ্গের সোনারগাঁও ও মুয়াজ্জমাবাদ ভিন্ন অন্য কোন জায়গার টাকশাল থেকে জলালুদ্দীন, দনুজমর্দনদেব বা মহেন্দ্রদেবের মুদ্রা বেরোয়নি। কিন্তু ৮২১ হিজরা থেকে ফতেহাবাদ নামে আর একটি জায়গার টাকশাল থেকেও জলালুদ্দীনের মুদ্রা বেরোতে দেখা যাচ্ছে। ফতেহাবাদ ফরিদপুরেরই প্রাচীন নাম। পঞ্চদশ শতাব্দীতে দ্বিতীয় কোন ফতেহাবাদ ছিল বলে জানা যায় না।* ৮২১ হিজরার বেশীর ভাগ সময়েই দনুজমর্দনদেব ও মহেন্দ্রদেব এবং শেষের দিকে খুব অল্প সময়ের জন্য জলালুদ্দীন রাজত্ব করেছিলেন। সুতরাং ফতেহাবাদের যে টাকশাল থেকে ৮২১ হিজরার একেবারে শেষের দিকে জলালুদ্দীনের মুদ্রা বেরিয়েছিল, তার প্রতিষ্ঠা নিশ্চয়ই অন্তত ৮২১ হিজরার মাঝামাঝি সময়ে হয়েছিল এবং ঐ সমস্ত অঞ্চল তারও আগে গৌড়-রাজ্যের অধীনে এসেছিল। ৮২১ হিজরার মাঝামাঝি অবধি গণেশ বা দনুজমর্দনদেব ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং ফতেহাবাদ সমেত দক্ষিণবঙ্গের কতকাংশ যে গণেশের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। দক্ষিণবঙ্গের খুলনা জেলায় দনুজমর্দনদেবের মুদ্রা মেলাতে এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হচ্ছে। আর একটি জিনিস দেখতে হবে। বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপ অঞ্চল ফতেহাবাদের কাছেই। আগে আমরা অনুমান করে এসেছি, গণেশ-দনুজমর্দনের কিঞ্চিৎ পরবর্তী কালে

* আলোচ্য সময়ের প্রায় ১০০ বছর পরে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে হোসেন শাহের রাজত্বকালে যুবরাজ নসরৎ শাহ চট্টগ্রাম অঞ্চল জয় করে চট্টগ্রামের অদূরবর্তী একটি শহরের নাম ফতেহাবাদ রাখেন—এই কথা 'তারিখ-ই-হামিদী' নামে একটি ফার্সী বইয়ে পাওয়া যায়। অবশ্য 'তারিখ-ই-হামিদী' ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রচিত বলে এর উক্তির খুব বেশী মূল্য নেই; কিন্তু চট্টগ্রামের নিকটবর্তী ফতেহাবাদের নামকরণ সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী এর মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে তার বিরোধী কোন প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত ঐ নামের ইতিহাস ষোড়শ শতাব্দীর চেয়ে প্রাচীনতর বলে গণ্য করা যায় না।

বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপ অঞ্চলের রাজা দনুজমর্দন আবির্ভূত হয়েছিলেন। এর থেকেও অনুমান করা যেতে পারে এই অঞ্চল গণেশ দনুজমর্দনের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাই এখানকার পরবর্তী এক রাজা এই নামটিই গ্রহণ করতে উৎসাহিত হয়েছিলেন।

ভাগীরথীর পশ্চিম দিকের অঞ্চলে গণেশের কোন অধিকার ছিল বলে এখনও কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত সাতগাঁও-তে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমে একটি চালু টাকশাল ছিল। সাতগাঁও-এর টাকশালে উৎকীর্ণ দনুজমর্দনদেবের কোন মুদ্রা এপযন্ত পাওয়া যায়নি। এর থেকে মনে হয়, ভাগীরথীর পশ্চিমে গণেশের অধিকার বিস্তৃত হয়নি। পদ্মনাভের বসতিস্থান নবহট্টক যে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরবর্তী কাটোয়ার নিকটবর্তী নৈহাটি নয়, তা এর থেকেও বলা যেতে পারে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রায় সারা বাংলাই গণেশের অধীনে ছিল। আগেই দেখানো হয়েছে, ১৪১০ খ্রীষ্টাব্দের অল্প কিছু পরেই গণেশ কার্যত বাংলার রাজা হয়ে বসেন এবং ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। অতএব পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের অধিকাংশ সময়ই তিনি বাংলা শাসন করেছিলেন বলা চলে।

গণেশের চরিত্র

রাজা গণেশের চরিত্র সম্বন্ধেও সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। বাংলাদেশে মুসলমানদের একচ্ছত্র আধিপত্যের যুগে যিনি সারা বাংলা অধিকার করে হিন্দু-শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তিনি যে অসামান্য লোক এবং দুর্জয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বেভারিজ বলেছেন, "Raja Kāns is the most interesting figure among the kings of Bengal. We feel that this obscure Hindu, who rose to supreme power in Bengal, and who for a time broke the bonds of Islam, must have been a man of vigour and capacity." অন্যান্য ঐতিহাসিকেরাও গণেশের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে বিস্ময়মুগ্ধ প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করেছেন।

গণেশ একজন জন্মগত প্রতিভাসম্পন্ন কুশাগ্রবুদ্ধি কূটনীতিজ্ঞ ছিলেন। ইব্রাহিম শর্কী যখন বাংলাদেশ আক্রমণ করলেন, তখন তিনি প্রতিরোধ

নিষ্ফল বুঝে নিজের অধিকার ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন, তাঁর পুত্র ধর্মান্তরিত হয়ে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করলেন। কিন্তু ইব্রাহিম চলে গেলেই তিনি আবার আত্মপ্রকাশ করে পুত্রের কাছ থেকে সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেন। এর থেকে তাঁর তীক্ষ্ণ কূটনীতিজ্ঞানের পরিচয় মেলে। ইব্রাহিম শর্কীর সামরিক শক্তি ও নূর কুৎব্ আলমের নামডাক গণেশের তুলনায় অনেক বেশী ছিল বটে, কিন্তু কূটনৈতিক বুদ্ধিতে যে গণেশ তাঁদের অনেক উপরে, তা এই ব্যাপার থেকেই প্রমাণ হচ্ছে। তাঁদের সমবেত বিরোধিতা সত্ত্বেও তাই গণেশের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নি। তবে গণেশের কূটনীতিজ্ঞানের প্রশংসা করা সত্ত্বেও আমরা তাঁকে আদর্শ বীর বলব না; সে দিক দিয়ে শিবসিংহকে আদর্শ বীর বলতে পারি। তিনি প্রধানত গণেশের জন্যেই ইব্রাহিমের মত প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজে শোচনীয় পরিণাম বরণ করেছিলেন।

গণেশের ধর্ম-সম্বন্ধীয় নীতি বিশেষভাবে আলোচ্য। তিনি নিজে নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। মুদ্রাতে 'চণ্ডীচরণপরায়ণস্য' লেখা এবং ব্রাহ্মণ পদ্মনাভের চরণপূজা করা থেকে তা বোঝা যায়। নূর কুৎব্ আলমের চিঠি থেকেও বুঝতে পারা যায় যে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার সময় গণেশ সর্বপ্রকারে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতির পুনরভ্যুদয় ঘটিয়েছিলেন।

এই হিন্দু রাজা বাংলার মুসলমান জনসাধারণের প্রতি কীরকম ব্যবহার করতেন, তা জানতে বিশেষ কৌতূহল হয়। তাঁর সমসাময়িক দরবেশ নূর কুৎব্ আলম ও আশ্‌রফ সিম্‌নানী তাঁদের চিঠিতে লিখেছেন তিনি মুসলমানদের উপর অকথ্য নির্যাতন করেছিলেন। গণেশের প্রতিপক্ষ ইব্রাহিম শর্কীর দেশের লোকের লেখা 'সঙ্গীতশিরোমণি'তে গণেশকে আগুনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, এই আগুনে মুসলমানেরা পতঙ্গের মত পুড়ে মরেছিল। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এগুলি গণেশের শত্রুপক্ষের উক্তি। গণেশের সঙ্গে এক শ্রেণীর মুসলমানের তীব্র বিরোধ হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু এই বিরোধের জন্যে সম্ভবত তাঁর প্রতিপক্ষেরাই দায়ী। 'রিয়াজ-উস-সলাতীন' এবং বুকাননের বিবরণীতে পাওয়া যায় যে, বদ্‌র্-উল্-ইস্‌লাম গণেশকে অপমান করাতেই বিরোধ ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল। নূর কুৎব্ আলম ও আশ্‌রফ সিম্‌নানীর চিঠিতে এই সব কথা পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁদের হিন্দুবিদ্বেষ যে কত প্রচণ্ড ছিল তা বোঝা যায় যখন দেখি তাঁরা

তৈমুরলঙ্গকে কাফেরদের দমনকারী এবং মুসলমানদের ত্রাণকর্তা বলে প্রশস্তি করেছেন; অথচ এঁদের জীবৎকালেই তৈমুরলঙ্গ ভারত আক্রমণ করে নৃশংসতার চূড়ান্ত পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন। এই শ্রেণীর হিন্দুবিদ্বেষ্টারা গণেশের প্রাধান্যলাভে রুষ্ট হয়ে প্রথম থেকেই তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন, ফলে গণেশও বাধ্য হয়ে তাঁদের দমন করেছিলেন বলে মনে হয়। অবশ্য নূর কুৎব্ আলম যে ভাবে গণেশের অত্যাচার বর্ণনা করেছেন, তাকে সম্পূর্ণ সত্য বলে গ্রহণ করলে ভুল করা হবে। ইব্রাহিম শর্কীকে উত্তেজিত করার জন্যই নূর কুৎব্ আলম—কয়েকজন প্রতিপক্ষের উপরে গণেশ যে দমননীতি প্রয়োগ করেছিলেন তাকে অতিরঞ্জিত করে এইভাবে দাঁড় করিয়েছেন সন্দেহ নেই। সুতরাং গণেশ যে মুসলমানদের উপর অত্যাচার করেছিলেন, তাঁর শত্রুপক্ষের উক্তি থেকেই সেই সিদ্ধান্ত করলে তাঁর উপর অবিচার করা হবে। এই সমস্ত উক্তি থেকে কেবলমাত্র এইটুকু বোঝা যায় যে গণেশ তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে কয়েকজনকে শাস্তি দিয়েছিলেন।

'রিয়াজ উস্-সলাতীন', বুকাননের ব্যবহৃত পুঁথি এবং মুল্লা তকিয়ার বয়াজেও গণেশের মুসলমানদের প্রতি অত্যাচারের কথা আছে। এই সমস্ত সূত্রের লেখকরা গণেশের শত্রুপক্ষের উক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। কারণ এগুলির মধ্যে, বিশেষত 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' গণেশের প্রতি একটা বিদ্বেষের ভাব লক্ষ্য করা যায়।

যে সব মুসলমান গণেশের বিরোধিতা করে নি, গণেশ তাঁদের উপর কোন রকম অত্যাচার করেছিলেন বলে মনে হয় না। কারণ গণেশ সহজাত প্রতিভাসম্পন্ন কুশলী রাজনীতিক ছিলেন সন্দেহ নেই। তিনি মুসলমান প্রজাদের প্রতি অহেতুক অত্যাচার করে অযথা সমস্যা সৃষ্টি করবেন বলে মনে হয় না, মানবতার প্রশ্ন ছেড়েই দিলাম। মুসলমানদের প্রতি গণেশের আচরণ সম্বন্ধে ফিরিশ্তা বলেছেন, "যদিও রাজা কান্স্ মুসলমান ছিলেন না, তাহলেও তিনি মুসলমানদের সঙ্গে এতখানি বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতার সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পরে কোন কোন মুসলমান তাঁকে মুসলমান বলে ঘোষণা করে ইস্লামের প্রথা অনুযায়ী কবর দিতে চেয়েছিলেন।" অবশ্য ফিরিশ্তার অন্যান্য উক্তির মত এই উক্তিও অতিরঞ্জন-দোষে দুষ্ট। কিন্তু এই উক্তির যে একেবারে কোনই ভিত্তি নেই, তা'ও বিনা প্রমাণে বলা চলে না। এই উক্তির মধ্যে অন্তত একটু সত্য আছে

বলেই মনে হয়। সেটুকু এই,—গণেশের কিছু কিছু মুসলমান বন্ধুও ছিলেন, যারা তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতেন এবং তিনিও তাঁদের সঙ্গে পরিপূর্ণ সদ্ভাব ও সম্প্রীতি রক্ষা করে চলতেন। অবশ্য ফিরিশ্‌তার উক্তি থেকে অনেকে সিদ্ধান্ত করেছেন যে গণেশকে হিন্দু ও মুসলমানেরা সমানভাবে ভালবাসতেন এবং গণেশ বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের পরিপূর্ণ সমর্থন লাভ করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এই ধারণা সত্য বলে আমার মনে হয় না। কারণ ঐ যুগের মুসলমান সম্প্রদায়ের (যে কোন সম্প্রদায়েরই) মধ্যে এতখানি উদারতা আশা করা যায় না। আসল কথা, গণেশ তাঁর বিপুল সামরিক শক্তির বলেই ক্ষমতা অধিকার করেছিলেন এবং তাঁর সাফল্যের প্রধান কারণ তাঁর ব্যক্তিত্ব, যে ব্যক্তিত্ব কোটিতে একজনেরও দেখা যায় কিনা সন্দেহ। এই ব্যক্তিত্বের বলেই তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন,—অবিচ্ছিন্ন মুসলিম শাসনের মধ্যে কয়েক বছর বাংলায় হিন্দু রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এজন্যে তাঁর বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে আপোষ করার দরকার হয় নি। গণেশের হিন্দু উত্তরাধিকারীদের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্বের কণামাত্রও ছিল না, তাই তাঁর মৃত্যুর অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই বাংলায় হিন্দু রাজত্বের অবসান হয়েছিল।

ফিরিশ্‌তা গণেশকে দক্ষ সুশাসক বলেছেন। তাঁর কথায় গণেশ "মাথায় রাজমুকুট ধারণ করে এবং ছত্র প্রভৃতি রাজকীয় প্রতীকচিহ্নে ভূষিত হয়ে পরিপূর্ণ প্রাধান্যের সঙ্গে অত্যন্ত চমৎকারভাবে সাত বছর রাজত্ব করেছিলেন।"

গণেশ সাহিত্য ও বিদ্যার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বাংলা রামায়ণের রচয়িতা কৃত্তিবাস তাঁর কাছে সংবর্ধনা পেয়েছিলেন বলে অনেকে অভিমত পোষণ করেন, কিন্তু আমার লেখা 'কৃত্তিবাস-পরিচয়' বইয়ে আমি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি, কৃত্তিবাস যে গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়েছিলেন, তিনি গণেশ নন, রুকনুদ্দীন বারবক শাহ্‌।

পাণ্ডুয়া এবং গৌড়ে যে সমস্ত স্থাপত্যকীর্তি বর্তমান ছিল বা আছে, তাদের মধ্যে কয়েকটি রাজা গণেশ কর্তৃক নির্মিত বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। এদের মধ্যে সর্বপ্রথমে পাণ্ডুয়ার একলাখী প্রাসাদের নাম উল্লেখযোগ্য। সৌন্দর্যের দিক দিয়ে এই প্রাসাদটি অতুলনীয়। এর স্থাপত্যরীতি থেকে অনুমান করা যায় যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে এই প্রাসাদটি তৈরী

হয়েছিল। এসম্বন্ধে আবিদ আলী লিখেছেন, "The architechture of this building is of the usual Indo-Saracenic style, and the period seems to be about that of Jalāluddīn's reign. Possibly it was built by his father, Rājā Kāns." (Memoirs of Gaur and Pandua, p. 126 দ্রষ্টব্য)।

প্রায় সাড়ে চারশো বছরের পুরোনো এই প্রাসাদটি এখনও মোটামুটি অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। এটি প্রায় আগাগোড়াই ইট দিয়ে তৈরী। এই প্রাসাদটির মাথায় একটিমাত্র বিশাল গোলাকৃতি গম্বুজ আছে। একলাখী প্রাসাদ তৈরী করতে নাকি একলাখ টাকা খরচ হয়েছিল (তখনকার দিনের তুলনায় যা অত্যধিক), তাই এর এরকম নাম। প্রাসাদটি বিরাট এবং অত্যন্ত সুন্দর, এটি সে যুগের স্থাপত্যশিল্পের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। আবিদ আলী এটিকে "handsomest building in the place" বলেছেন। আবিদ আলী মনে করেন রাজা গণেশই এই প্রাসাদ তৈরী করিয়েছিলেন। স্থানীয় প্রবাদও এই মতের পোষকতা করে। প্রাসাদটির মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধ স্থাপত্যের বহু নিদর্শন আছে; এর প্রধান প্রবেশদ্বারের শীর্ষে দেবতা গণেশের মূর্তি ক্ষোদিত। এই কারণেই মনে হয় হিন্দু রাজা গণেশ এই প্রাসাদটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। অবশ্য মুসলমানদের নির্মিত যে সব প্রাসাদ বা মসজিদ ভাঙা হিন্দু মন্দিরের উপকরণে তৈরী, সেগুলির দেওয়ালেও কোন কোন সময় হিন্দু দেবমূর্তি থেকে যেত। কিন্তু মুসলমানরা প্রাসাদ-মসজিদ নির্মাণের সময় হিন্দু দেব-মূর্তিগুলিকে হয় ঘসে তুলে দিতেন, না হয় বিকৃত করতেন, নয় তো উল্টো করে বসাতেন। একলাখী প্রাসাদে গণপতির মূর্তিকে যেরকম সসম্মানে প্রধান প্রবেশদ্বারের উপরে বসানো হয়েছে, তার থেকে মনে হয় প্রাসাদটি হিন্দুরই নির্মিত। আবিদ আলী ঠিকই লিখেছেন, "Over the entrance door is a lintel with a Hindu idol carved on it, and round the doorway are other stones on which may be detected partial representations of the human figure: the original carvings must therefore have been of Hindu origin."

'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' রয়েছে, রাজা গণেশ একদিন এমন একটি ঘরে বসেছিলেন, যার দরজার উচ্চতা খুব কম; মাথা হেঁট না করে সেই দরজা

দিয়ে ঢোকবার উপায় নেই ; দরবেশ শেখ বদ্‌র্‌-উল্‌-ইসলাম কাফেরের কাছে মাথা হেঁট করতে রাজী না হওয়ায় ঐ দরজা দিয়ে প্রথমে পা ঢুকিয়ে তারপর ঘরে ঢুকেছিলেন। একলাখী প্রাসাদের প্রধান দরজাটি অবিকল এই ধরনের। এই সব থেকে মনে হয় রাজা গণেশই এই প্রাসাদটি তৈরী করিয়েছিলেন। তাই যদি হয়, তাহলে এর থেকে তাঁর আড়ম্বরপ্রিয়তা ও শিল্পানুরাগের পরিচয় পাওয়া যাবে। এই প্রাসাদটির মধ্যে তিনটি সমাধি রয়েছে, 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে'র মতে এই সমাধি তিনটি সুলতান জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ এবং তাঁর স্ত্রী ও পুত্রের।

পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত আদিনা মসজিদকে রাজা গণেশ তাঁর কাছারী-বাড়ীতে পরিণত করেছিলেন বলে প্রবাদ আছে। ইতিপূর্বে আমরা সিকন্দর শাহ সংক্রান্ত অধ্যায়ে (পৃঃ ৫৪-৫৫) এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি এবং দেখিয়েছি যে এই প্রবাদ সত্য হওয়া অসম্ভব নয়।

গৌড়ে 'ফতে খানের সমাধি-ভবন' নামে পরিচিত যে ছোট বাড়ীটি আছে, সেটি সম্ভবত মূলে একটি হিন্দু মন্দির ছিল ; কোন হিন্দু রাজা এটি তৈরী করিয়েছিলেন বলে মনে হয়। এসম্বন্ধে আবিদ আলী লিখেছেন, "It seems to the author that the building is of the time of the Hindu Kings (possibly Rājā Kans) and that it was used for a temple. An arrangement for hanging a chain and bell by an iron hook in the central part of the ceiling is still visible and the building itself lies north to south. There are door openings on three sides only. From all these facts it may be concluded that a Hindu God was worshipped here." সুতরাং যতদূর মনে হয়, মুসলিম যুগের হিন্দু গৌড়েশ্বর রাজা গণেশই এই ভবনটি তৈরী করিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজা গণেশের বংশ

মহেন্দ্রদেব কে ?

১৩৪০ শকাব্দের পর আর দনুজমর্দনদেবের মুদ্রা পাওয়া যায়নি। ঐ বছরেই মহেন্দ্রদেব নামে আর একজন রাজার মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে। তাঁর মুদ্রাগুলি দনুজমর্দনদেবেরই মত, তাদেরও এক পিঠে তাঁর নাম এবং অপর পিঠে 'চণ্ডীচরণপরায়ণস্য' লেখা আছে এবং এইগুলি পাণ্ডুয়া ও চাটগাঁও-এর টাকশালে তৈরী হয়েছিল।

এর থেকে বোঝা যায়, মহেন্দ্রদেব দনুজমর্দনদেবের উত্তরাধিকারী এবং সম্ভবত ছেলে। আমরা গণেশের একজন ছেলের কথাই জানি, তিনি যদু বা জলালুদ্দীন। মহেন্দ্রদেবের ঠিক পরেই আবার তাঁর মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে।

এর থেকে কেউ কেউ মনে করেছেন, মহেন্দ্রদেব ও জলালুদ্দীন অভিন্ন লোক, জলালুদ্দীন নতুনভাবে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবার আগে কিছুদিন মহেন্দ্রদেব নামে মুদ্রা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। কারণ জলালুদ্দীনের ইসলাম ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা অন্যান্য মুসলমানের চেয়ে অনেক বেশী ছিল (এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা দ্রষ্টব্য)। তিনি যে কিছু সময়ের জন্য মুদ্রাতে 'চণ্ডীচরণপরায়ণস্য' বলে নিজের পরিচয় দেবেন, এ কথা বিশ্বাস করা যায় না। পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যে জলালুদ্দীন ইসলাম ধর্মের প্রতি নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, এ সম্বন্ধে 'ফিরিশ্‌তা' ও 'রিয়াজ' এক মত। এই কারণে মনে হয়, মহেন্দ্রদেব গণেশের ছেলে; কিন্তু জলালুদ্দীন নয়, অন্য আর এক ছেলে।* এখন কোন সূত্র থেকে গণেশের দ্বিতীয় কোন পুত্রের কথা জানা যায় কিনা দেখি। 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা'য় গণেশের মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনার যে বিবরণ দেওয়া আছে, তাতে গণেশের দ্বিতীয় পুত্রের উল্লেখ রয়েছে। শুধু তাই নয়, গণেশের মৃত্যুর পর

* এইচ এস স্টেপলটন সর্বপ্রথম এই মত প্রতিষ্ঠা করেন (J. A. S. B., Vol. XXVI, 1930, N. S., pp. 12-13 দ্রষ্টব্য)। আচার্য যদুনাথ সরকারও এই মত সমর্থন করেছেন (History of Bengal, Vol. II, p. 122 দ্রষ্টব্য)।

তাঁর সিংহাসনে আরোহণের সুস্পষ্ট ইঙ্গিতও আছে। 'ফিরিশ্‌তা'র বিবৃতিটি নীচে উদ্ধৃত হল,—

"পিতার মৃত্যুর পরে জিৎমল অমাত্যদের এবং রাজ্যের অন্য সব শীর্ষস্থানীয় লোকদের আহ্বান করে বললেন, 'ইসলাম ধর্মের সত্য আমার কাছে পরিষ্কার, তাকে গ্রহণ করা ভিন্ন আমার কোন উপায় নেই। তোমরা যদি আমাকে মানো এবং আমার সার্বভৌমতা অস্বীকার না কর, তাহলেই আমি এই পবিত্র সিংহাসনে পদার্পণ করব। নয়ত আমার ছোট ভাই রাজা হোক্‌, আমাকে ক্ষমা কর।' সমস্ত রাজপুরুষ তখন একবাক্যে ঘোষণা করলেন, 'আমরা রাজাকে কেবল জাগতিক ব্যাপারে অনুসরণ করি, (তাঁর) ধর্মের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।' তখন জিৎমল লখ্‌নৌতির শিক্ষিত ও গণ্যমান্য লোকদের আমন্ত্রণ করে এনে কল্‌মা উচ্চারণ করলেন এবং জলালুদ্দীন উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করলেন।"

'ফিরিশ্‌তার' এই বিবৃতির মধ্যে অতিরঞ্জন অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এর মধ্যে জলালুদ্দীনকে অতিমাত্রায় নিঃস্বার্থপরায়ণ করে দেখানো হয়েছে এবং গণেশের অমাত্যদের (যাঁদের মধ্যে নিশ্চয়ই অনেকে হিন্দু) অতিমাত্রায় উদার ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন করে তোলা হয়েছে। 'ফিরিশ্‌তা'র এই বিবৃতির সঙ্গে মহেন্দ্রদেবের মুদ্রার সাক্ষ্য মিলিয়ে নিলে আমাদের এই সিদ্ধান্তই করতে হয় যে, মহেন্দ্রদেব জলালুদ্দীনের ছোট ভাই। গণেশের মৃত্যুর পরে তিনি সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েছিলেন; কিন্তু জলালুদ্দীন রাজ্যের বহু ক্ষমতাশালী লোককে নিজের দলে ভিড়িয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁকে অপসারিত করে সিংহাসন পুনরধিকার করেন। 'ফিরিশ্‌তা' যে কাহিনীটি লিপিবদ্ধ করেছেন, তা জলালুদ্দীনের তরফের বিবৃতি। এর মধ্যে ছোট ভাইকে অপসারিত করে জলালুদ্দীনের সিংহাসন পুনরধিকারের ব্যাপারটি একটু ঘুরিয়ে মনোহর ভঙ্গীতে পরিবেশন করা হয়েছে। এর মধ্যে বলতে চাওয়া হয়েছে জলালুদ্দীনের কোন দোষ নেই, তিনি তো ছোট ভাইকে সিংহাসন ছেড়ে দিতেই চেয়েছিলেন, কিন্তু হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত অমাত্য তাঁকে ছাড়তে রাজী না হওয়ায় তিনি সিংহাসনে বসেছেন ইত্যাদি। মোটের উপর, মহেন্দ্রদেব যে গণেশের দ্বিতীয় পুত্র, সে সম্বন্ধে উপরে বর্ণিত বিষয়গুলি মিলিয়ে দেখলে সন্দেহ থাকে না বলেই মনে হয়।

মহেন্দ্রদেবের কেবলমাত্র ১৩৪০ শকাব্দেরই মুদ্রা পাওয়া গেছে; কিন্তু

১৩৪০ শকাব্দেরই প্রথমাংশে তাঁর পিতা দনুজমর্দনদেব রাজত্ব করে গিয়েছেন। এদিকে জলালুদ্দীনেরও ৮২১ হিজরার মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে। ১৩৪০ শকাব্দ= ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল থেকে ১৪১৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল এবং ৮২১ হিজরা= ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৪১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী। অতএব দেখা যাচ্ছে, ১৩৪০ শকাব্দের তিন-চতুর্থাংশ শেষ হবার আগেই মহেন্দ্রদেবের রাজত্ব শেষ হয়ে জলালুদ্দীনের রাজত্ব সুরু হয়েছে। মহেন্দ্র-দেবের রাজত্বকাল যে কত সংক্ষিপ্ত হয়েছিল, তা এর থেকে বোঝা যায়। ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল থেকে ১৪১৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী—মাত্র এই নয় মাসের মধ্যে দনুজমর্দনদেব, মহেন্দ্রদেব ও জলালুদ্দীন—এই তিনজন রাজাই রাজত্ব করেছিলেন।

জলালুদ্দীনের দ্বিতীয় দফার রাজত্ব

৮২১ হিজরার শেষের দিকে জলালুদ্দীন সিংহাসন পুনরধিকার করেন এবং ৮৩৬ হিজরা অবধি রাজত্ব করেন।

মুসলমান ঐতিহাসিকরা শাসক হিসাবে জলালুদ্দীনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। ফিরিশ্‌তা বলেছেন, "তিনি ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে শাসন করে সে যুগের নওশেরোয়াঁ হয়েছিলেন। অপূর্ব দৃঢ়তা ও শক্তির সঙ্গে সতেরো বছর ধরে বাংলা ও লখ্‌নৌতি শাসন করবার পরে তিনি পরলোক গমন করেন।" বখ্‌শী নিজামুদ্দীন 'তবকাৎ-ই-আকবরী'তে বলেছেন, "তাঁর রাজত্ব-কালে জনসাধারণ সুখী ও সন্তুষ্ট ছিল।" 'রিয়াজ'-রচয়িতা গোলাম হোসেন বলেছেন, "তিনি যোগ্যভাবে শাসনকার্য সংক্রান্ত ব্যাপার পরিচালনা করতেন তাঁর রাজত্বকালে লোকেরা আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্য দিয়ে দিন কাটাত। কথিত আছে, তাঁর সময়ে পাণ্ডুয়া এত জনাকীর্ণ হয়েছিল যে তা বর্ণনার অতীত।" 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' বলা হয়েছে, জলালুদ্দীন বাংলার রাজধানী পাণ্ডুয়া থেকে গৌড়ে স্থানান্তরিত করেন।

জলালুদ্দীনের রাজ্যের আয়তন খুবই বিশাল ছিল। ফিরোজাবাদ বা পাণ্ডুয়া, সোনারগাঁও, মুআজ্জমাবাদ, সাতগাঁও, চাটগাঁও, ফতেহাবাদ ও রোটাসপুর থেকে তাঁর মুদ্রা বেরিয়েছিল, এর থেকে বোঝা যায়, উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সবটাই, দক্ষিণবঙ্গের এক বৃহৎ অংশ এবং সম্ভবত দক্ষিণ বিহারের কিয়দংশ তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ডক্টর

দানী তাঁর মুদ্রার সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করে অনুমান করেছেন যে, তিনি ত্রিপুরা ও দক্ষিণ বিহারের কিয়দংশ অন্তত সাময়িকভাবেও অধিকার করেছিলেন। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখতে পাব, ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে আরাকান জলালুদ্দীনের সামন্ত রাজ্যে পরিণত হয়েছিল।

জলালুদ্দীনের রাজত্বকালে ইব্রাহিম শর্কীর দ্বিতীয়বার বাংলা আক্রমণ

প্রামাণিক সূত্র থেকে জলালুদ্দীনের রাজত্বকালের কয়েকটি মাত্র ঘটনার কথা জানতে পারা যায়। সেগুলির এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথম ঘটনাটি জানতে পারা যায় চীনের 'মিং' রাজবংশের ইতিহাস 'মিং-শ্‌র্' থেকে। 'মিং-শ্‌র্'-এর ৩২৬শ অধ্যায়ে জৌনপুরের সঙ্গে চীনের রাজনৈতিক সম্পর্ক বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে এই কথাগুলি পাওয়া যায়,—

"সসে-ন-পূ-আড় (Sse na-pu-eul—জৌনপুর) বাংলার পশ্চিমে অবস্থিত। একে মধ্যভারতও বলা হয়। প্রাচীন যুগে এখানে বুদ্ধ থাকতেন। য়ুং লো'র রাজত্বের দশম বর্ষে (১৪১২ খ্রীঃ) তাদের রাজা য়ি-পু-লা (ইব্রা = ইব্রাহিম শর্কী)-র কাছে······একজন দূত পাঠানো হয়। য়ুং লো'র রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষে (১৪২০ খ্রীঃ) বাংলার রাজদূত (চীনের সম্রাটকে) জানান যে, তাঁদের (জৌনপুরের) রাজা কয়েকবার বাংলা আক্রমণ করেছেন।····· হৌ-শিয়েনকে তখন (চীন)-সম্রাটের আদেশ দিয়ে পাঠানো হল তাঁকে (জৌনপুরের রাজাকে) বলবার জন্য যে, প্রতিবেশীর প্রতি ভাল ব্যবহার করেই তিনি নিজের সম্পত্তি রক্ষা করতে পাবেন। তাঁকে রেশম ও টাকাকড়ি উপহার দেওয়া হল।"

'মিং-শ্‌র্'-এর ৩৪০শ অধ্যায়ে এই ঘটনাটির বিবরণ একটু ভিন্ন ভাষায় পাওয়া যায়। এই বিবরণের শেষাংশ নীচে উদ্ধৃত হল,—

"য়ুং-লো'র রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষের (১৪২০ খ্রীঃ) নবম মাসে (চীন)-সম্রাট হৌ-শিয়েনকে আদেশ দিলেন, (জৌনপুরে) গিয়ে তাঁদের (জৌনপুর ও বাংলার রাজাদের) শান্ত করতে। (জৌনপুরের রাজাকে) সোনা এবং টাকাকড়ি উপহার দিয়ে যুদ্ধ বন্ধ করা হল।

১৪২০ খ্রীষ্টাব্দে জলালুদ্দীনই বাংলার রাজা ছিলেন। ঐ বছরেই জৌনপুরের রাজা বাংলা আক্রমণ করেছিলেন। 'মিং-শ্‌র্'-এর ৩২৬শ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, ইব্রাহিম শর্কী কয়েকবার বাংলা আক্রমণ করেছিলেন ; এর

দ্বারা সম্ভবত ১৪১৫ ও ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দ, এই দু'বারের আক্রমণের কথাই বোঝাচ্ছে।

তৈমুরের পুত্র শাহ্‌রুখ কর্তৃক দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে প্রেরিত দূত আবদুর রজ্জাকের লেখা বিখ্যাত বই 'মৎলা ই-সদাইনে' (রচনাকাল ১৩৪২ খ্রীঃ) জৌনপুররাজ ইব্রাহিম শকীর বাংলা আক্রমণের কথা পাওয়া যায়, —যদিও আক্রমণের সাল এবং বাংলার রাজার নাম তার মধ্যে মেলে না। আবদুর রজ্জাক লিখেছেন,—

"বাংলা থেকে সম্রাটের (শাহ্‌রুখ, রাজত্বকাল ১৪০৪—৪৭ খ্রীঃ) রাজদূতেরা যখন দেশে ফিরে যাচ্ছিলেন, এমন সময় কালিকটে এক দুর্ঘটনা ঘটে। ঐ জায়গার রাজার কাছে সম্রাটের শক্তির কথা পৌঁছেছিল। তিনি বিশ্বস্ত লোকেদের কাছে শুনেছিলেন যে, মহামান্য সম্রাটের দরবারে সমস্ত দেশের রাজারা দূত এবং আবেদন-নিবেদন পাঠিয়ে থাকেন। তাঁরা জানেন যে, এইখানে সমস্ত প্রয়োজন মেটে, সমস্ত প্রার্থনা সফল হয় এবং ঐ সময়ে বাংলার রাজা সুলতান ইব্রাহিম জৌনপুরীর জুলুমের বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন; সম্রাট (শাহ্‌রুখ) জনাব শেখ অল-ইসলাম-খওয়াজা-করিমের মারফৎ এই মর্মে একটি ফরমান পাঠান যে, তিনি (ইব্রাহিম) বাংলার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন না, করলে তাঁকে ফলভোগ করতে হবে। জৌনপুরের রাজা এই পবিত্র ফরমানের মর্ম শুনে, বাংলাদেশ থেকে হিংসার হস্ত প্রত্যাহার করে নিলেন।"

'মৎলা-ই-সদাইনে' ইব্রাহিমের ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দের আক্রমণের কথাই বলা হয়েছে বলে আমাদের ধারণা। এরকম ধারণার কারণ, 'মিং-শ্‌-র্‌'-এ ১৪২০

---

* স্টুয়ার্ট তাঁর 'History of Bengal'-এ (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯১০, পৃঃ ১২০—১২৩) লিখেছেন যে, এই আক্রমণ জলালুদ্দীনের ছেলে শামসুদ্দীনের রাজত্বকালে ঘটেছিল। কিন্তু তাঁর এরকম ধারণার কারণ তিনি ব্যাখ্যা করেন নি। শামসুদ্দীন আহ্‌মদ শাহের স্বল্পস্থায়ী রাজত্বকালে ইব্রাহিম বাংলা আক্রমণ করেছিলেন, এরকম কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

তবে এখানে একটা কথা আছে। স্টুয়ার্টের বইয়ে শামসুদ্দীন আহ্‌মদ শাহের রাজত্বকাল দেওয়া আছে ৮১২-৮৩০ হিজরা। কিন্তু এখন শিলালিপি ও মুদ্রার প্রমাণ থেকে জানা যাচ্ছে, ৮৩৬ হিজরা অবধি শামসুদ্দীনের পিতা জলালুদ্দীন সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। সুতরাং এমনও হতে পারে যে, স্টুয়ার্ট শামসুদ্দীনের রাজত্বকাল সম্বন্ধে ভুল ধারণার দ্বারা চালিত হয়েই 'মৎলা-ই-সদাইনে' বর্ণিত ঘটনাকে শামসুদ্দীনের রাজত্বকালে স্থাপন করেছেন। স্টুয়ার্ট হয়ত কোন সূত্র থেকে জানতে পেরেছিলেন, ঐ আক্রমণ ৮১২-৮৩০ হিজরার মধ্যে ঘটেছিল (১৪২০ খ্রীষ্টাব্দ বা ৮২৩ হিজরা যার অন্তর্গত), তাই শামসুদ্দীনের নাম এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। ডঃ দানী স্টুয়ার্টের নিষ্প্রমাণ উক্তিকেই সত্য বলে গ্রহণ করেছেন।

খ্রীষ্টাব্দের আক্রমণের যে বর্ণনা পাই, তার সঙ্গে 'মংলা-ই-সদাইনে'র বর্ণনার বেশ মিল আছে। দুই বিবরণীতেই দেখি, বাংলার রাজা ইব্রাহিমের আক্রমণের বিরুদ্ধে বিদেশের সম্রাটের কাছে নালিশ জানাচ্ছেন এবং বিদেশী সম্রাটের কথাতে ইব্রাহিম আক্রমণ প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। অতএব দুই বিবরণীতে একই ঘটনার কথা বলা হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত করা যায়।

কেন ইব্রাহিমের সঙ্গে জলালুদ্দীনের বিরোধ হয়েছিল তা স্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে না। তবে 'মংলা-ই-সদাইনে' দেখছি শাহ্ রুখ ইব্রাহিমকে আদেশ করেছেন, তিনি যেন বাংলার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করেন। এর থেকে মনে হয়, ইব্রাহিম বাংলার কোন আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছিলেন এবং জলালুদ্দীন তা বরদাস্ত না করায় বিরোধ বেধে উঠেছিল। ৮১৮ হিজরাতে গণেশের সঙ্গে সংঘর্ষ হবার পর থেকে ইব্রাহিম সম্ভবত বাংলাকে তাঁর সামন্ত-রাজ্য বলেই মনে করতেন। 'সঙ্গীতশিরোমণি'র "আগৌড়াদুজ্জ্বলংরাজ্যমিব-রাহিমভূভুজঃ" ছত্রটিও এই ধারণা জন্মায়। জলালুদ্দীনকে প্রথমবার ইব্রাহিম নিজেই সিংহাসনে বসিয়েছিলেন বলে জলালুদ্দীনকে সামন্ত রাজা মনে করা তাঁর পক্ষে আরও স্বাভাবিক এবং আগেই বলেছি, ইব্রাহিমের কৃপায় প্রথম রাজ্যলাভের সময় জলালুদ্দীন সম্ভবত ইব্রাহিমের সামন্ত হিসাবে বাংলা দেশ শাসন করতে সম্মত হয়েছিলেন। এই কারণেই ইব্রাহিম হয়তো বাংলার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছিলেন।

যাহোক্ আমরা দেখছি জলালুদ্দীন ইব্রাহিমের আক্রমণের সময় একই সঙ্গে পারস্যের শাহ্ রুখ ও চীনের সম্রাট য়ু-লো'র কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন এবং পেয়েও ছিলেন। শক্তিশালী বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যে তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল, তা এর থেকে প্রমাণ হচ্ছে। এই পররাষ্ট্রনীতি নিঃসন্দেহে জলালুদ্দীনের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক।

জলালুদ্দীন ও আরাকানরাজ

আরাকান দেশের ইতিহাস থেকে জলালুদ্দীনের রাজত্বের আর একটি ঘটনার কথা জানা যায়। ফেয়ার এবং হার্ভের সঙ্কলিত বিবরণে এই ঘটনার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, * তার সংক্ষিপ্তসার এই :—

* Phare : History of Burma, pp. 77-78 ; J. A. S. B., Pt. I, 1844, pp. 44-46 এবং Harvey : History of Burma, p. 139 দ্রষ্টব্য।

আরাকান দেশের একজন রাজা ব্রহ্মের রাজার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নিজের রাজ্য হারান। হারিয়ে তিনি দেশ ছেড়ে পালান এবং বাংলার রাজার কাছে আশ্রয় নেন। বাংলার রাজাকে তিনি শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে সাহায্য করায় বাংলার রাজা তাঁর রাজ্য উদ্ধারের জন্য সাহায্য করেন। প্রথমে একজন মুসলমান সেনাপতিকে (ফেয়ারের বিবরণীতে এঁর নাম বলা হয়েছে উলুখেং বা ওয়ালি খান) তাঁর সঙ্গে দেওয়া হয়; কিন্তু সে বিশ্বাসঘাতকতা করে আরাকানরাজের শত্রুর সঙ্গে যোগ দেয় এবং আরাকানরাজকে বন্দী করে। আরাকানরাজ কোনক্রমে পালিয়ে এসে বাংলার রাজাকে সব জানান। তখন বাংলার রাজা বিশ্বস্ততর লোকের উপর তাঁর রাজ্য উদ্ধারের ভার দেন এবং এইবার আরাকানরাজের রাজ্য উদ্ধার হয়। কিন্তু এই উপকারের বিনিময়ে তাঁকে বাংলার রাজার সামন্ত হতে হয়। তখন থেকে আরাকানের রাজাদের মুদ্রার উপরে ফার্সী অক্ষরে মুসলমানী নাম লেখার প্রথাও চালু হল।

আরাকানরাজের নাম ফেয়ারের বিবরণীতে পাওয়া যায় Meng-tsau-mwun এবং হার্ভের বিবরণীতে পাওয়া যায় Narameikhla। এর থেকে বোঝা যায়, তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন সূত্র ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু দুজনেই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানরাজ হৃত রাজ্য ফিরে পান। ঐ সময়ে বাংলার রাজা ছিলেন জলালুদ্দীন। * সুতরাং বাংলার যে রাজা আরাকানরাজকে হৃতরাজ্য ফিরে পেতে সাহায্য করেছিলেন, তিনি জলালুদ্দীন ভিন্ন আর কেউ হতে পারেন না।

আরাকান দেশে প্রচলিত কিংবদন্তীর আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যও এই সিদ্ধান্তের অনুকূল। এতে বলা হয়েছে, যে বহিঃশত্রুর আক্রমণের সময় আরাকানরাজ

* ফেয়ার তাঁর 'History of Burma' (London, 1884, p. 78)-তে ভুল করে বলেছেন বাংলার এই রাজার নাম নাজির শাহ। ফেয়ারের ভুল হবার কারণ তাঁর নিজের উক্তির মধ্য দিয়েই উদ্ঘাটিত হয়েছে। তিনি বলেছেন বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর সমস্ত জ্ঞান মার্শম্যানের 'History of Bengal' থেকে পাওয়া (History of Burma, p. 77, f.n. দ্রষ্টব্য)। মার্শম্যানের বইয়ে স্টুয়ার্টের History of Bengal'এর অনুকরণে ১০২৬-১৪৫৭ খ্রীষ্টাব্দ নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের রাজত্বকাল বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। এই জন্যে ফেয়ার ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দ নাজির শাহ বা নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের রাজত্বকাল ভেবেছিলেন। ডঃ দানী ফেয়ারের এই উক্তিকে যাচাই না করেই সত্য বলে গ্রহণ করেছেন।

বাংলার রাজাকে সাহায্য করেছিলেন, তিনি দিল্লীর রাজা।* এ সম্বন্ধে ফেয়ার মন্তব্য করেছেন, "As the Arakanese make sad confusion of all cities and countries in India, this may mean any king between Bengal and Dehli, probably the king of Juanpur. The fugitive (Meng-tsau-mwun) must have reached Thu ratan (Bengal) about the year A.D. 1407, when, and for some years after, in consequence of Timur's invasion, the Dehli sovereign was not in a condition to attack Bengal." জলালুদ্দীনের রাজত্বকালে ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দে ইব্রাহিম শর্কী যে আক্রমণ করেছিলেন সম্ভবত তাইতেই আরাকানরাজ জলালুদ্দীনকে সাহায্য করেছিলেন।

জলালুদ্দীনের পূর্ব-নাম

জলালুদ্দীন যখন হিন্দু ছিলেন, তখন তাঁর কি নাম ছিল, তা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে'র মতে তাঁর নাম ছিল যদু। বুকাননের বিবরণীতে লেখা আছে তাঁর নাম ছিল Godusen (গদুসেন)। বুকানন মুসলমান রাজাদের নাম ও রাজত্বকালের যে তালিকা পরিশিষ্টে দিয়েছেন (Martin's Eastern India, Vol II, Book III, Appendix N), তাতে জলালুদ্দীনের পূর্ব নাম দেওয়া হয়েছে Juddoo Sein (যদু সেন)। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মুন্‌শী শ্যামপ্রসাদ গৌড়ের যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাতেও তিনি লিখেছেন যে জলালুদ্দীনের পূর্ব নাম ছিল "যদু সেন"। 'তারিখ ই-ফিরিশ্‌তা'র মতে জলালুদ্দীনের পূর্ব নাম জিৎমল, স্টুয়ার্টের মতে চেৎমল। যদু যদুসেনের সংক্ষিপ্ত রূপ, গদুসেন যদুসেনের বিকৃত রূপ। সেইরকম চেৎমল জিৎমল-এর বিকৃতরূপ। "যদুসেন" ই জলালুদ্দীনের প্রকৃত পূর্ব-নাম বলে মনে হয়। অবশ্য এ সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না।

* ফেয়ারের সঙ্কলিত আরাকানী কিংবদন্তীর মধ্যে দিল্লীর রাজার সঙ্গে বাংলার রাজার যুদ্ধের এক আষাঢ়ে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে; যুদ্ধের ফলাফলও বিকৃত ও অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। (J.A.S.B., 1844, Pt. I., pp. 45 দ্রষ্টব্য।)

জলালুদ্দীনের ধর্ম-নিষ্ঠা

'সঙ্গীতশিরোমণি'র সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, জলালুদ্দীন রাজ্যের লোভে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয়েছিলেন। মুস্লিম সাধুদের জীবনী-গ্রন্থ 'মিরাৎ-উল্-আস্রারে' জলালুদ্দীন সম্বন্ধে কিছু কিছু ভুল উক্তি থাকলেও এই একটি কথা এতে সঠিকভাবেই লেখা আছে। এতে আছে, "... he became a convert to Islam because of his lust for kingdom." (ডঃ দানীর অনুবাদ—J. A. S., 1952, p. 138 দ্রঃ)।

কিন্তু জলালুদ্দীনের ইস্লাম-ধর্ম গ্রহণের কারণ যা-ই হোক না কেন, ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পরে এই ধর্মে তাঁর গভীর নিষ্ঠা জন্মেছিল। তাঁর পিতা সম্ভবত তাঁর শুদ্ধি করিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে কোনই ফল হয়নি। পিতার মৃত্যুর পরেই তিনি নিজের ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসের কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন। ধর্মনিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী জাত-মুসলমান সুলতানদেরও অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। তাঁর আগে প্রায় ২০০ বছর ধরে বাংলায় মুসলমান সুলতানরা তাঁদের মুদ্রায় কল্মা খোদাই করাতেন না। জলালুদ্দীন কিন্তু তাঁর মুদ্রায় কল্মা খোদাই করে বাংলাদেশে আবার এই প্রথা চালু করেন। তিনি আরাকানরাজকে তাঁর হৃত সিংহাসনে পুনরধিষ্ঠিত করার পর থেকে ঐ রাজা ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের মুদ্রায় ফার্সী অক্ষরে মুসলমানী নাম লেখার প্রথা চালু হয়, এর পিছনেও সম্ভবত জলালুদ্দীনের নির্দেশ ছিল এবং তাঁর ধর্মপ্রীতিই এর কারণ বলে মনে হয়।

শুধু তাই নয়, আর এক ব্যাপারেও জলালুদ্দীন নতুনত্ব দেখিয়েছিলেন। তাঁর পূর্ববর্তী সুলতানরা সকলেই খলীফার আনুগত্য স্বীকার করতেন এবং কখনও কখনও তাঁদের মুদ্রায় বা শিলালিপিতে নিজেকে 'খলীফার সহায়ক' বলে অভিহিত করেছেন। জলালুদ্দীনও প্রথমদিকে তাই করেছেন। কিন্তু জলালুদ্দীন তাঁর শেষ দিককার মুদ্রা ও শিলালিপিতে 'খলীফৎ-আল্লাহ্' উপাধি ধারণ করেছেন অর্থাৎ নিজেকেই খলীফা বা ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে দাবী করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আহ্মদ শাহ নাবালকত্বের জন্য এই উপাধি ধারণ করেন নি, কিন্তু আহ্মদ শাহের পরবর্তী সুলতানদের মধ্যে অনেকেই এই উপাধি ধারণ করেছিলেন। জলালুদ্দীনের ধর্ম-নিষ্ঠা সম্বন্ধে সম্প্রতি আরও কতকগুলি তথ্য পাওয়া গিয়েছে। সমসাময়িক আরবী গ্রন্থকার

ইবন্-ই-হজরের (১৩৭২-১৪৪৯ খ্রীঃ) লেখা 'ইন্‌বাউ'ল-গুম্‌র্' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, জলালুদ্দীন ইসলামের উন্নতি-সাধন করেন, ইসলামের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন, তাঁর পিতা যে সমস্ত মসজিদ প্রভৃতি ধ্বংস করেছিলেন, সেগুলি সংস্কার করেন এবং আবু হানিফার সম্প্রদায়ের মতবাদ গ্রহণ করেন। মক্কাধামে তিনি অনেকগুলি ভবন, বিশেষত একটি সুন্দর মাদ্রাসা তৈরী করান। ৮৩২ হিজরায় তিনি মক্কার অধিবাসীদের দান করার জন্য অনেক অর্থ পাঠিয়েছিলেন। পরে জলালুদ্দীন মিশরের রাজা আশরফ অর্থাৎ অল-আশরফ বার্‌স্‌বায়-এর কাছে উপহার পাঠিয়েছিলেন এবং খলীফার অনুমোদন প্রার্থনা করেছিলেন; খলীফা ৮৩৩ হিজরায় সুহৈল ও য়রগাব (?) নামক দু'জন দূত মারফৎ জলালুদ্দীনকে সম্মান-পরিচ্ছদ পাঠান, জলালুদ্দীন সম্মান-পরিচ্ছদ অঙ্গে ধারণ করেন এবং খলীফাকে অনেক উপহার পাঠান। শেখ আলাউদ্দীন বুখারি নামে একজন প্রবাসী ভারতীয় সাধুকে এবং মিশর ও দামাস্কাসের অনেক লোককেও তিনি উপহার পাঠিয়েছিলেন। (Islamic Culture, 1958, p. 204 দ্রঃ।)

জলালুদ্দীনের ৮৩৪ হিজরার মুদ্রায় সর্বপ্রথম 'খলীফৎ-আল্লাহ্' উপাধি মুদ্রিত দেখা যায়। এর ঠিক আগের বছর তিনি খলীফার কাছ থেকে সম্মান-পরিচ্ছদ লাভ করেছিলেন। সুতরাং তিনি তাঁর মুদ্রায় খলীফার প্রতি আনুগত্য স্বীকার না করে নিজেকে 'আল্লাহ্‌র খলীফা' বলে ঘোষণা করলেন কেন? যতদূর মনে হয়, জলালুদ্দীন খলীফার অনুমতি নিয়েই নিজেকে 'আল্লাহ্‌র খলীফা' বলে ঘোষণা করেছিলেন; খলীফার জলালুদ্দীনকে সম্মান-পরিচ্ছদ দান আসলে এই ঘোষণা করারই অনুমোদন দান বলে মনে হয়।

এই সমস্ত বিষয় থেকে বোঝা যায়, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পরে জলালুদ্দীন মনে প্রাণে একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান হয়ে উঠেছিলেন এবং নানা সাধারণ ও অসাধারণ বিষয়ের অনুষ্ঠান করে তিনি তাঁর ধর্ম-প্রীতি চারিতার্থ করেছিলেন।

অবশ্য মিশরের সুলতান এবং দামাস্কাসের খলীফার কাছে উপহার পাঠানোর পিছনে জলালুদ্দীনের আরও দুটি উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয়। প্রথমত, জলালুদ্দীন কাফেরের সন্তান এবং বাংলার পূর্বতন মুসলিম রাজবংশের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। এই কারণে বাংলার সিংহাসনে তাঁর অধিকার

এবং তাঁর মর্যাদা সম্বন্ধে সকলে হয়তো একমত ছিলেন না। তাঁর কায়রো ও দামাস্কাসে উপহার পাঠানোর পরোক্ষ উদ্দেশ্য, মুসলিম দুনিয়ার অধিনায়কদের কাছে নিজের অধিকার ও মর্যাদার স্বীকৃতি লাভ। দ্বিতীয়ত, আগেই আমরা দেখে এসেছি, জলালুদ্দীন সম্ভবত ইব্রাহিম শর্কীর সামন্ত রাজা হয়ে থাকার সর্তে বাংলার সিংহাসন লাভ করেছিলেন, অথচ তিনি স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করতেন এবং ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দে ইব্রাহিমের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল; তাই ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে যথাসম্ভব শক্তিশালী হয়ে থাকবার জন্যও তিনি মুসলিম জহানের নেতাদের সঙ্গে এইভাবে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন বলে মনে হয়।

যাহোক্, বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে জলালুদ্দীন এক বিষয়ে সকলকে অতিক্রম করেছেন। এতগুলি পররাষ্ট্রের অধিনায়কের কাছে আর কেউ দূত পাঠিয়েছিলেন বলে জানা যায় না। তাঁর পূর্ববর্তী সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ চীন-সম্রাটের কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন, পারস্যের কবি হাফেজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং মক্কায় মাদ্রাসা তৈরী করিয়েছিলেন। কিন্তু জলালুদ্দীন চীনসম্রাট য়ুং-লো, পারস্যের হিরাটে অবস্থানকারী শাহরুখ, মিশরের সুলতান অল আশরফ বারস্‌বায় এবং দামাস্কাসের খলীফার কাছে দূত পাঠিয়ে তাঁকেও অতিক্রম করেছেন।

জলালুদ্দীনের হিন্দু সেনাপতি

জলালুদ্দীনের একটি কাজের কথা আমরা সমসাময়িক পণ্ডিত বৃহস্পতি মিশ্রের 'স্মৃতিরত্নহার' গ্রন্থের ভূমিকা থেকে জানতে পারি। বৃহস্পতি লিখেছেন, জলালুদ্দীন মূর্দ্ধাভিষিক্ত-কুলোৎপন্ন জগদত্তের পুত্র রায় রাজ্যধরের গুণরাশিতে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে সেনাপতির পদে নিযুক্ত করেছিলেন এবং নিয়োগ উপলক্ষে বিরাট আড়ম্বর অনুষ্ঠান করে তাঁকে হাতী, ঘোড়া, সোনা, রূপো, ছাতার সারি প্রভৃতি দান করে তূর্য ও শঙ্খের ধ্বনিতে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন।

> সৈনাধিপত্যমিভসৈন্ধবতূর্য্যশঙ্খ-
> চ্ছত্রাবলীললিতকাঞ্চনরূপ্য···
> ····· দান বহুভূষণাঙ্ক
> জল্লালদীননৃপতির্মুদিতো গুণৌঘৈঃ ॥

ঘটনাটি আপাতদৃষ্টিতে অসামান্য বলে মনে না হলেও জলালুদ্দীনের রাজত্বকালে হিন্দুদের অবস্থা সম্বন্ধে মূল্যবান আলোকপাত করে। এবার সেই আলোচনাতেই আসা যাচ্ছে।

হিন্দুদের সম্বন্ধে জলালুদ্দীনের নীতি

কোন হিন্দু মুসলমান হলে সাধারণত যা হয়, জলালুদ্দীনের বেলায়ও তাই হয়েছিল। তাঁর হিন্দুধর্মের প্রতি বিদ্বেষ জন্ম-মুসলমানদের চেয়েও বেশী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পিতার মৃত্যুব পর সিংহাসন অধিকার করেই তিনি অনেক হিন্দুব উপর অত্যাচার করেন, একথা দু'টি বিবরণীতে পাই। 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' পাই, "তিনি বহু হিন্দুকে মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত করেন এবং যে সমস্ত ব্রাহ্মণ তাঁর শুদ্ধি-অনুষ্ঠানে স্বর্ণনির্মিত গাভীর অংশ নিয়েছিল, তাদের যন্ত্রণা দিয়ে শেষ পর্যন্ত গোমাংস খেতে বাধ্য করেন।" বুকাননের বিবরণীতে পাই, "সিংহাসন অধিকার করে জলালুদ্দীন হিন্দুদের উপর অত্যাচার করতে সুরু করেন এবং তাদের মুসলমান হতে বাধ্য করেন, ফলে অনেক হিন্দু করতোয়া নদীর ওপারে কামরূপ দেশে পালিয়ে যায়।" এদের কথা সত্য বলেই মনে হয়। অথচ এই জলালুদ্দীনের সেনাপতিব পদ পেলেন রায় রাজ্যধর, যিনি শুধু হিন্দু নন, নিষ্ঠাবান হিন্দু এবং বৃহস্পতি মিশ্রের উক্তি অনুসারে যিনি ব্রাহ্মণদের দারিদ্র্য দূর করে ও নানারকম যজ্ঞ করে 'ধর্মপুত্র' আখ্যা পেয়েছিলেন। আমাদের মনে হয় নিষ্ঠাবান মুসলমান জলালুদ্দীনের পক্ষে এই রকম গুরুত্বপূর্ণ সামরিক পদে হিন্দুব নিয়োগ আসলে বাস্তব অবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ। রাজা গণেশের আমলে হিন্দুবা ক্ষমতাব যে শীর্ষে পৌঁছেছিল, আত্যন্তিক ইস্লামধর্মনিষ্ঠা ও হিন্দুদ্বেষ সত্ত্বেও তাদের সেখান থেকে নামিয়ে আনা জলালুদ্দীনের সাধ্য ছিল না। তিনি যখনই সুযোগ পেয়েছেন, উৎকট সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পদে হিন্দুদের নিয়োগ করতেও বাধ্য হয়েছেন। অতএব গণেশের মৃত্যুর পরেও যে বাংলাদেশে হিন্দুদের প্রাধান্য লোপ পায়নি, তা দেখা যাচ্ছে।

জলালুদ্দীনের দু'টি মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে, যাদের উল্টোপিঠে লম্ফনোদ্যত সিংহের ছবি আঁকা। কোনরকম প্রাণীর ছবি আঁকা ইস্লাম ধর্মের অনুশাসনেব বিরোধী। সুতরাং কোন হিন্দু এই জাতীয় মুদ্রার পরিকল্পনা করেছিলেন এবং এক্ষেত্রে সুলতানের উপর তাঁর প্রভাব কাযকরী হয়েছিল বলে অনুমান

করা যায়। * জলালুদ্দীনের আমলে হিন্দুদের প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্বন্ধে এ থেকেও একটা ধারণা করা যায়।

অবশ্য একটা কথা আছে। ত্রিপুরার রাজাদের মুদ্রাতেও এই ছবি থাকত। তার সঙ্গে এই মুদ্রাগুলির কোন সম্বন্ধ আছে বলে কেউ কেউ অনুমান করেছেন। ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী লিখেছেন—"Reference may be made for similar figures of lion on coins, to those of Hill Tippera...The design on the coins of the neighbouring Hindu state may have suggested the adoption of a similar design on his own coins to the renegade Hindu king, but the dictates of the faith which he adopted soon led to its abandonment." ডঃ দানী এ সম্বন্ধে বলেন—"The adoption of this new design calls for some better explanation. We know that, the Scythians adopted the coin designs of the Indo-Bactrians when they conquered their territory. The same was the case with the Kushans. Chandra Gupta II, Vikramāditya of the Gupta dynasty, adopted the coins of the Western Kṣatrapas after conquering their territory of Gujarat and Malwa. Can we, likewise, not suppose that some portion of Tripura was conquered by Jalāl-ud dīn and this type of coinage was issued in order to make it acceptable to the local people? The fact that both the coins, so far discovered, were found in Dacca district, lend support to this suggestion. From the Tripura Rājamala... we learn that at this time insignificant rulers like Mukuṭa-māṇikya and Mahā-māṇikya were on the throne of Tripura. Therefore, there is a strong probability that a portion of

* এই মুদ্রাগুলির মাথায় অস্পষ্টভাবে কিছু লেখা আছে; ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে ঐ লেখার পাঠ "বিন্ কানস্ শাহ" ('কানস শাহের পুত্র')। জলালুদ্দীনের অন্য কোন মুদ্রা বা শিলালিপিতে তাঁর বিধর্মী পিতার নাম পাওয়া যায় না।

Tripura State was conquered by Jalāl-ud-dīn. But soon after the losses must have been made good by Dharmamāṇikya, the famous successor of Mahā māṇikya. Hence, this type of coin soon went out of vogue.'' ডঃ দানীর এই অনুমান অযৌক্তিক বলে মনে হয় না। তবে জলালুদ্দীন যে সাময়িকভাবে ত্রিপুরার কিয়দংশ দখল করেছিলেন, এরকম সিদ্ধান্তে সুনিশ্চিতভাবে পৌঁছোতে হলে আরও জোরালো প্রমাণের দরকার।

জলালুদ্দীনের মুদ্রা

জলালুদ্দীনের মুদ্রাগুলি থেকে দেখা যায়, পূর্ববর্তী রাজাদের তুলনায় তাঁর রাজত্বকালে টাকশালের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর আমলে নতুন যে সমস্ত জায়গার টাকশালের নাম পাওয়া যায়, তার মধ্যে একটি হল ফতেহাবাদ। আর একটি রোটাসপুর। এই সব নতুন নতুন জায়গায় টাকশাল খোলা থেকে কেউ কেউ মনে করেছেন, জলালুদ্দীন এই সব জায়গা দখল করে নিজের রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু আমরা আগে দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, ফতেহাবাদ অন্তত গণেশের সময় থেকে গৌড়রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রোটাসপুরের অবস্থান আজও পর্যন্ত ঠিক করা যায়নি বলে এ সম্বন্ধে কোন সঠিক মত প্রকাশ করা যায় না। তবে এ সম্বন্ধে ডঃ দানী যা লিখেছেন, তা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। তিনি লিখেছেন "...what town is meant by Rhoṭāspur ? A near possibility is Rhoṭās or Rhoṭāsgarh on the river Son in South Bihar. But South Bihar was, then, under Ibrāhim Sharkı of Jaunpur. If this identification is held, we will have to suppose that this portion of Ibrāhim's dominion was conquered by Jalāl-ud-dīn." হয়তো জলালুদ্দীন এই অঞ্চল অধিকার করাতেই ইব্রাহিম শর্কী রুষ্ট হয়ে ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশ আক্রমণ করেছিলেন। আবার এমনও হতে পারে ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধেই জলালুদ্দীন এই অঞ্চল জয় করেছিলেন।

অবশ্য নতুন টাকশাল খোলাতে রাজ্যের সম্প্রসারণই যে সব ক্ষেত্রে বোঝায় তা নয়, এতে রাজ্যের ঐশ্বর্যবৃদ্ধিই বিশেষভাবে বোঝায়। জলালুদ্দীনের রাজত্বকালে দেশের ঐশ্বর্য যে বৃদ্ধি পেয়েছিল, এই সব নতুন টাকশাল তার প্রমাণ।

জলালুদ্দীন ও বৃহস্পতি মিশ্র

জলালুদ্দীন সম্বন্ধে আর একটি কথা বহু গবেষক লিখেছেন। তাঁরা বলেন জলালুদ্দীন মহিন্তা-বংশীয় বিখ্যাত পণ্ডিত এবং 'স্মৃতিরত্নহার', 'পদচন্দ্রিকা' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা বৃহস্পতি মিশ্রকে বিশেষভাবে সংবর্ধিত করেছিলেন এবং 'রায়মুকুট' ও 'পণ্ডিতসার্বভৌম' উপাধি দিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা রুকনুদ্দীন বারবক শাহ সংক্রান্ত অধ্যায়ে আলোচনা করে দেখাবার চেষ্টা করব বারবক শাহই বৃহস্পতিকে বিশেষভাবে সংবর্ধনা করেছিলেন ও এইসব উপাধি দিয়েছিলেন। কিন্তু বৃহস্পতি যে জলালুদ্দীনের কাছেও কিছু সম্মান পেয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। কারণ বৃহস্পতির পৃষ্ঠপোষক ও শিষ্য ছিলেন জলালুদ্দীনের সেনাপতি রায় রাজ্যধর এবং বৃহস্পতির প্রথম দিককার বইগুলি—রঘুবংশটীকা, শিশুপালবধটীকা প্রভৃতি রায় রাজ্যধরের পৃষ্ঠপোষণে লেখা। এই বইগুলিতে বৃহস্পতি নিজের সম্বন্ধে এই শ্লোকটি লিপিবদ্ধ করেছেন,

বিদ্যাসু তাসু বিনয়ী প্রণয়ী গুণেষু
গৌড়াধিপাদুপচিতপ্রচুরপ্রতিষ্ঠঃ।
সোঽহং যথামতি বৃহস্পতিরাতনোমি
ব্যাখ্যাবৃহস্পতিমলংকৃতিকাব্যলগ্নম্॥

যে "গৌড়াধিপ" বৃহস্পতি মিশ্রকে "প্রচুর প্রতিষ্ঠা" দিয়েছেন, তিনি নিশ্চয়ই রায় রাজ্যধরের প্রভু জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ। কিন্তু হিন্দুধর্মত্যাগী জলালুদ্দীন হিন্দু পণ্ডিত বৃহস্পতিকে প্রতিষ্ঠা দিলেন, এর কারণ কী? কারণ এই, জলালুদ্দীন প্রথম জীবনে যখন হিন্দু ছিলেন, তখন নিশ্চয় সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা পেয়েছিলেন এবং ধর্মান্তরিত হয়েও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ছাড়তে পারেননি। তাই সংস্কৃত-পণ্ডিত বৃহস্পতি মিশ্রকে তিনি সমাদর করেছিলেন।

অন্যান্য তথ্য

বর্তমানে জলালুদ্দীন সম্বন্ধে আর বিশেষ কোন তথ্য জানা যাচ্ছে না। ঢাকা জেলার মান্দ্রায় এক ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদে এবং রাজশাহী জেলার জাহানাবাদে এক সমাধিস্থলে সম্প্রতি দু'টি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, এ দু'টি

জলালুদ্দীনের রাজত্বকালেই খোদাই হয়েছিল। প্রথমটি একটি মসজিদের শিলালিপি—এর নির্মাতা শিকদার উলুগ খান মুআজ্জম দীনার খান। দ্বিতীয়টি একটি মাদ্রাসা-সংলগ্ন মসজিদের শিলালিপি—এর নির্মাতা মালিক সদ্‌র্‌-অল্‌-মিল্লাৎ ওয়াদ্দীন সুলতানী। দু'টিতেই জলালুদ্দীনের নাম আছে।*

রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনের মতে জলালুদ্দীন এবং তাঁর স্ত্রী ও পুত্র পাণ্ডুয়ার একলাখী প্রাসাদে সমাধিস্থ হন। ঐ প্রাসাদের মধ্যে তিনটিই সমাধি রয়েছে। এগুলি জলালুদ্দীন এবং তাঁর স্ত্রী ও পুত্রের সমাধি বলে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে।

জলালুদ্দীনের মৃত্যুর সময়

এপর্যন্ত সকলেরই ধারণা ছিল জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ ৮৩৫ হিজরায় পরলোকগমন করেন, কারণ ঐ বছরেব পরে আর তাঁর মুদ্রা পাওয়া যায় নি। কিন্তু এখন সুনিশ্চিতভাবে জানা যাচ্ছে, তিনি ৮৩৬ হিজরা অবধি জীবিত ছিলেন। জনৈক ব্যক্তি আমাকে বলেছিলেন, তিনি সুলতান জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের নামাঙ্কিত ৮৩৬ হিজরাব কয়েকটি মুদ্রা পেয়েছিলেন। এই মুদ্রাগুলি আমি দেখতে পাইনি, কাজেই এ সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারলাম না। তবে সম্প্রতি রাজশাহী জেলার জাহানাবাদ গ্রামে জলালুদ্দীনের যে শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে, তার তারিখ ৮৩৫ হিজরার ৫ই জমাদী-অল-আউয়ল। ৮৩৫ হিজরার পঞ্চম মাসে যিনি জীবিত ছিলেন, তাঁর ৮৩৬ হিজরার মুদ্রা পাওয়া খুবই সম্ভাব্য ব্যাপার। ইতিপূর্বে ঢাকা জেলার মান্দ্‌রা গ্রামে জলালুদ্দীনের যে শিলালিপি পাওয়া গিয়েছিল, তার তাবিখ প্রথমে পড়া হয়েছিল ৮৩০ হিজরার ১০ই জমাদী-অল-আউয়ল। কিন্তু এখন বিশেষজ্ঞেরা স্থির করেছেন সালাঙ্কের প্রকৃত পাঠ ৮৩০ নয়—৮৩৬ হিজরা (Islamic Culture, 1958, pp. 204-205 দ্রঃ)। অতএব জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ অন্তত ৮৩৬ হিজরার ১০ই জমাদী-অল-আউয়ল বা ১৪৩৩ খ্রীঃর ২রা জানুয়ারী পর্যন্ত নিঃসন্দেহে জীবিত ছিলেন। ঐ সময়ের অল্পকাল পরেই তিনি পরলোকগমন করেন, কারণ তাঁর পুত্র শামসুদ্দীন আহ্‌মদ শাহের ৮৩৬ হিজরার মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে।

* এই শিলালিপি দু'টির বিবরণের জন্য ডঃ আহমদ হাসান দানী সঙ্কলিত **Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal**, (p. 14) এবং মৌলভী শামসুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত **Inscriptions of Bengal, Vol. IV** (pp. 44-48) দ্রষ্টব্য।

ইব্‌ন্‌-ই-হজরের মতে ৮৩৭ হিঃর রবি-অস্‌-সানী মাসে জলালুদ্দীনের মৃত্যু হয়। সম্ভবত তিনি '৮৩৬'এর জায়গায় '৮৩৭' লিখেছেন।

জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের ৮৪০ হিজরার একটি মুদ্রাও নাকি পাওয়া গিয়েছে (I. M. C. Coin no. 104)। এই মুদ্রাটি সম্বন্ধে আচার্য যদুনাথ সরকার লিখেছেন, "It was probably posthumus." কিন্তু ৮৪০ হিজরায় শুধু জলালুদ্দীন নন, তাঁর পুত্র শামসুদ্দীন আহ্‌মদ শাহও সম্ভবত জীবিত ছিলেন না ; সুতরাং এই সময়ে জলালুদ্দীনের নামে "posthumus" মুদ্রা বার হওয়া অসম্ভব ব্যাপার।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, মহেন্দ্রদেবের সব মুদ্রা ১৩৪০ শকাব্দের হলেও দুটি মুদ্রায় তারিখের অঙ্ক অস্পষ্ট। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, প্রথমটির তারিখ ১৩৩৯ শকাব্দ হতে পারে (বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ, ১৩২৪, পৃঃ ১৮৯)। স্টেপলটনের মতে অপর মুদ্রাটির তারিখ সম্ভবত ১৩৪১ শকাব্দ (J. A. S. B, 1930, N.S., p. 8)। দুটি মুদ্রাই পাণ্ডুনগরের টাকশালে উৎকীর্ণ। এর থেকে কেউ কেউ মনে করেছেন মহেন্দ্রদেব ১৩৩৯ শকে দনুজমর্দনদেবের রাজত্বকালে একবার বিদ্রোহী হয়েছিলেন এবং ১৩৪১ শক বা ৮২২ হিজরায় জলালুদ্দীনের রাজত্বকালে সাময়িকভাবে জলালুদ্দীনের কাছ থেকে পাণ্ডুয়া অধিকার করে নিয়েছিলেন।

কিন্তু এইসব মুদ্রার উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করা অনুচিত। কারণ নেলসন রাইট বলেছেন, "In many cases the execution of the Bengal coins is very poor owing to mistakes made by ignorant or careless engravers, and the difficulty of deciphering them is greatly increased by the frequency of counter-stamps and cuts with a chisel : it is believed that these were made by the money-changers and bankers in order to give an artificial depreciation to coins of a previous year or a previous reign."

মহেন্দ্রদেবের ১৩৩৯ ও ১৩৪১ শকাব্দের মুদ্রা এবং জলালুদ্দীনের ৮৪০ হিজরার মুদ্রার সৃষ্টি এইভাবেই হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। অবশ্য এই সব মুদ্রার তারিখ ঠিকমত পড়া হয়েছে কিনা, তা'ও সন্দেহের বিষয়।

শামসুদ্দীন আহ্মদ শাহ

জলালুদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে শামসুদ্দীন আহ্মদ শাহ রাজা হন। শামসুদ্দীনের কেবলমাত্র ৮৩৬ হিজরার মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে। কোন্ সময়ে শামসুদ্দীনের রাজত্ব শেষ হয়েছিল, তা বর্তমানে বলবার উপায় নেই। তবে ইব্ন্-ই-হজরের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে শামসুদ্দীন ৮৩৯ হিজরায় জীবিত ছিলেন (Islamic Culture, 1958, p. 206)। পরবর্তী সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহ্মুদ শাহের ৮৪১ হিজরার মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। এর থেকেই বোঝা যায়, শামসুদ্দীনের রাজত্ব তার আগেই শেষ হয়েছিল এবং 'আইন-ই আকবরী', 'তবকাৎ-ই আকবরী', 'তারিখ ই-ফিরিশ্তা', 'রিয়াজ-উস্-সলাতীন' প্রভৃতিতে যে বলা হয়েছে শামসুদ্দীন ১৬ বা ১৮ বছর রাজত্ব করেছিলেন, সে কথা সত্য হতে পারে না। বুকাননের বিবরণীতে বলা হয়েছে শামসুদ্দীন তিন বছর রাজত্ব করেছিলেন; এই উক্তি যথার্থ হতে পারে। ইব্ন্ ই-হজরের সাক্ষ্য ও মুদ্রার সাক্ষ্যের সঙ্গে এর কোন বিরোধ নেই।

আজ অবধি কোন সমসাময়িক বিবরণে শামসুদ্দীন আহ্মদ শাহ সম্বন্ধে কোন তথ্য পাওয়া যায় নি। পরবর্তী সময়ে রচিত বিবরণীগুলির মধ্যে 'তারিখ-ই-ফিরিশ্তা' ও 'রিয়াজ-উস্-সলাতীন' ভিন্ন অন্যান্য বিবরণীতে তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা মেলে না। 'ফিরিশ্তা' ও 'রিয়াজে'র উক্তি পরস্পরবিরোধী এবং বিভ্রান্তিকর। ফিরিশ্তা বলেছেন, "তিনি (শামসুদ্দীন) তাঁর মহান পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন এবং ন্যায়পরায়ণতা ও উদারতার আদর্শ প্রাণপণে রক্ষা করেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে উপহার পেয়ে বহু লোক বাধিত হয়েছিল।" কিন্তু 'রিয়াজ'এ পাওয়া যাচ্ছে, "তিনি (শামসুদ্দীন) অত্যন্ত বদমেজাজী, অত্যাচারী এবং রক্তপিপাসু ছিলেন। বিনা কারণে তিনি রক্তপাত করতেন এবং গর্ভবতী মেয়েদের পেট চিরতেন। অত্যাচার যখন চরম সীমায় পৌছোলো এবং উচ্চনীচনির্বিশেষে সকলেই যখন তাঁর নৃশংসতায় শোচনীয়ভাবে পীড়িত হতে লাগল, তখন সাদী খাঁ এবং নাসির খাঁ নামে তাঁর দুই ক্রীতদাস, যাঁরা অমাত্যের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, ষড়যন্ত্র করে আহ্মদ শাহকে হত্যা করেন।" শামসুদ্দীন ভাল ছিলেন না মন্দ ছিলেন, সে সম্বন্ধে নতুন কোন নির্ভরযোগ্য সূত্র আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত কিছুই বলা যাবে না। বর্তমান অবস্থায় 'ফিরিশ্তা'র অতি প্রশংসা এবং

'রিয়াজ'-এর অতি নিন্দা—এই দুইয়ের মাঝখান থেকে সত্য নির্ধারণ করা দুরূহ।

সমসাময়িক আরবী ঐতিহাসিক ইব্‌ন্‌-ই-ইজরের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় শামসুদ্দীন মাত্র ১৪ বছর বয়সে রাজা হয়েছিলেন (Islamic Culture, 1958, pp. 205-206 দ্রঃ।) এ অবস্থায় শামসুদ্দীন সম্বন্ধে ফিরিশ্‌তার প্রশংসা ও 'রিয়াজ'-এর নিন্দা দুই-ই অতিরঞ্জিত বলতে হবে।

'রিয়াজ'এর নিন্দাসূচক উক্তি সম্বন্ধে ডঃ দানী বলেন, "·· this statement of the Riyād was born out of his (or his informant's) desire to justify the action of the usurpers,......Such aspersion of personal and private character was the only justification for usurpation in the eyes of old historians." কিন্তু শামসুদ্দীনকে যারা উচ্ছেদ করেছিল, সেই সাদী খাঁ ও নাসির খাঁর পক্ষ সমর্থন 'রিয়াজ'-এ দেখা যায় না। বরং তাদের হেয় করেই আঁকা হয়েছে ঐ বইয়ে।

শামসুদ্দীনের মৃত্যু কীভাবে হল, সে সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণীগুলি নীরব, কেবল 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীন' এবং বুকাননের বিবরণীতে পাওয়া যায় যে, শামসুদ্দীনের দুই ক্রীতদাস সাদী খাঁ ও নাসির খাঁ ষড়যন্ত্র করে তাঁকে হত্যা-করেছিল। শামসুদ্দীনের স্বল্পস্থায়ী রাজত্বের কথা স্মরণ রাখলে এই কথা সত্য বলেই মনে হবে। পাণ্ডুয়ার একলাখী প্রাসাদের মধ্যে জলালুদ্দীনের ও শামসুদ্দীনের সমাধিফলক বলে পরিচিত যে দুটি সমাধি-ফলক রয়েছে, সে সম্বন্ধে আবিদ আলী লিখেছেন, "There are two stone posts at the head of the tombs of Jalāluddin and Ahmed Shah. The stone on that of the latter is raised a little above the tomb, which shows that the grave belongs to a martyr." (Memoirs of Gaur and Pandua, p. 126)। সুতরাং শামসুদ্দীনকে যে হত্যা করা হয়েছিল, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই বলা চলে। শামসুদ্দীনের পিতা জলালুদ্দীনের যে স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল, তাঁর কবর থেকে তা বোঝা যায়।

ঢাকা জেলার মুআজ্জমপুরের শাহ লঙ্গর দরগার একটি মসজিদে একটি খণ্ডিত শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে, এতে তারিখ পাওয়া যায়নি, সমসাময়িক রাজার নামের একাংশ পাওয়া গিয়েছে; এতে লেখা আছে, "মস্‌নদ শাহী

আহ্‌মদ শাহ”। বাংলার সিংহাসনে একমাত্র শামসুদ্দীন আহ্‌মদ শাহ ভিন্ন অন্য কোন “আহ্‌মদ শাহ” বসেছিলেন বলে জানা যায় না। সুতরাং এটি তাঁরই শিলালিপি বলে মনে হয়।

পরবর্তী সুলতান নাসিরুদ্দীনের সঙ্গে গণেশের বংশের কোন সংস্রব নেই। শামসুদ্দীনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশে গণেশের বংশের রাজত্ব চিরদিনের মত শেষ হল।

তৃতীয় অধ্যায়

মাহ্‌মূদ শাহী বংশ

("পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ")

নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহ

শামসুদ্দীন আহ্‌মদ শাহের মৃত্যুর প্রকৃত বৎসরটি যতদিন না সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা যাচ্ছে, ততদিন নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের সিংহাসনে আরোহণের সময়ও স্থিরভাবে নির্ণয় করা যাবে না। এক সময়ে সকলের ধারণা ছিল নাসিরুদ্দীন ৮৪৬ হিজরায় (১৪৪২-৪৩ খ্রীঃ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু নাসিরুদ্দীন যে তার কয়েক বছর আগেই রাজা হয়েছিলেন, তাঁর বহু প্রমাণ আছে। সেগুলি এই :—

(১) ৮৪১ হিজরায় (১৪৩৭-৩৮ খ্রীঃ) উৎকীর্ণ নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের একটি মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে (Journal of the Numismatic Society of India, Vol. IX, Pt. I, p. 47 দ্রষ্টব্য)।

(২) ৮৪২ হিজিরায় (১৪৩৮-৩৯ খ্রীঃ) উৎকীর্ণ নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের দুটি মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। এদের মধ্যে একটি চাটগাঁওয়ের টাকশালে এবং অপরটি সম্ভবত ফিরোজাবাদের টাকশালে তৈরী (P.A.S.B., 1893, p. 143 এবং J.A.S.B., 1893, pp. 232-33 দ্রষ্টব্য)। নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের ৮৪৩ হিঃর মুদ্রাও পাওয়া গিয়েছে।

(৩) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় একটি দাসবিক্রয়পত্র রক্ষিত আছে ; এটির তারিখ ২৩৮ পরগণাতি সংবৎ (১৪৪০ খ্রীঃ) ; এতে তৎকালীন রাজা হিসাবে "সুলতান মাহামুদ সাহ গজন"-এর উল্লেখ আছে (Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal, p. 133)।

সুতরাং নাসিরুদ্দীন যে পঞ্চদশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকেই সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। শামসুদ্দীনের আনুমানিক মৃত্যু-সাল ৮৩৯ হিঃ (১৪৩৫-৩৬ খ্রীঃ)। ঐ বছরেই নাসিরুদ্দীন রাজা হয়েছিলেন বলে আপাতত স্থির করা যেতে পারে।

কী করে নাসিরুদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করলেন, সে সম্বন্ধে 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীন'-এ এই বিবরণ পাওয়া যায়।

"আহ্‌মদ শাহের মৃত্যুর ফলে যখন সিংহাসন খালি হল, তখন সাদী খান নাসির খানকে নিজের পথ থেকে সরিয়ে রাজ্যের সর্বময় কর্তা হতে চাইলেন। কিন্তু নাসির খান তাঁর মৎলব অনুমান করে তাঁর উপরে টেক্কা দিলেন। তিনি সাদী খানকে হত্যা করলেন এবং সাহস করে নিজেই সিংহাসনে আরোহণ করে আদেশ জারী করতে লাগলেন। আহ্‌মদ শাহের অমাত্য এবং সচিবেরা তাঁর কাছে বশ্যতা স্বীকার না করে তাঁকে বধ করলেন। তার রাজত্বকাল কারও মতে সাতদিন স্থায়ী হয়েছিল, কারও মতে আধ দিন।

"ক্রীতদাস নাসির খান যখন তার দুষ্কার্যের ফলস্বরূপ নিহত হল, অমাত্য এবং সেনানায়কেরা তখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে সুলতান শামসুদ্দীন ভাঙ্গরার (শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্‌) এক পৌত্রকে সিংহাসনে বসালেন। এর এই গুরু দায়িত্ব বহনের যোগ্যতা ছিল। এঁর উপাধি হল নাসির শাহ্‌।"

'তবকাৎ-ই-আকবরী' ও 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা'তে এই বিবরণের সমর্থন আছে; তবে সাদী খান ও নাসির খান যে শামসুদ্দীন আহ্‌মদ শাহকে হত্যা করেছিলেন, একথা তাদের মধ্যে বলা হয়নি। ফিরিশ্‌তার মতে শামসুদ্দীনের স্বাভাবিক মৃত্যুর পরে সাদী খান ও নাসির খানের ক্ষমতা অধিকার, তাদের নিধন প্রাপ্তি এবং শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের বংশধর নাসির শাহের (নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ্‌) সিংহাসন লাভ সংঘটিত হয়েছিল। 'তবকাৎ'-এ সাদী খানের নাম নেই; এই বইয়ের মতে আহ্‌মদ শাহের মৃত্যুর পরে নাসির নামক ক্রীতদাস সিংহাসনে আরোহণ করেছিল এবং আমীর ও মালিকদের হাতে সে নিহত হয়েছিল, তার পরে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের পৌত্র নাসিরুদ্দীন রাজা হয়েছিলেন। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা এই তিনটি বিবরণীর উক্তিকে সত্য বলেই গ্রহণ করেছেন এবং নাসিরুদ্দীন যে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের বংশধর ছিলেন, এ সম্বন্ধে তাঁদের মনে কোন সন্দেহ নেই। তার ফলে তাঁরা নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের বংশকে "পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ" আখ্যায় অভিহিত করে থাকেন।

কিন্তু বুকাননের বিবরণীতে লেখা আছে, "Ahmed Shah ··· reigned three years. He was destroyed by two of his nobles, Sadi Khan and Nasir Khan, the latter of whom was made king, and erected many buildings at Gaur, to which he seems to

have transferred the royal residence. He governed 27 years, and was succeeded by Sultan Barbuck Shah." অন্যান্য বিবরণীর মতে শামসুদ্দীন আহ্‌মদ শাহের হত্যাকারী (বা তাঁর মৃত্যুর পরে ক্ষমতা-অধিকারী) নাসির খান এবং নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ আলাদা লোক, কিন্তু বুকানন-বিবরণীর মতে তাঁরা একই লোক (Cambridge History of India-তেও এঁদের একই লোক বলা হয়েছে)। এই অবস্থায় নাসিরুদ্দীন সত্যিই শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের বংশধর ছিলেন কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। সন্দেহের আরও একটি কারণ আছে। শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁরই পৌত্র নাসিরুদ্দীনের পক্ষে ১৪৫৯ খ্রীঃ অবধি বেঁচে থাকা অসম্ভব না হলেও অস্বাভাবিক ব্যাপার। এ অবস্থায় ইলিয়াস শাহ ও নাসিরুদ্দীনের সম্পর্ক সম্বন্ধে অতিনিশ্চিত হওয়া এবং নাসিরুদ্দীনের বংশকে "পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ" নাম দেওয়া অবৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচায়ক।* আমার মনে হয়, নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের বংশকে তাঁর নাম অনুসারে 'মাহ্‌মুদ শাহী বংশ' নাম দেওয়া উচিত।

'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা'য় লেখা আছে যে সিংহাসন লাভের আগে নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ লোকচক্ষের অন্তরালে গ্রামাঞ্চলে কৃষিকার্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং বাংলার রাজা হবার কথা স্বপ্নেও কোনদিন ভাবতে পারেন নি। রাজা গণেশ, জলালুদ্দীনের মুহম্মদ শাহ ও শামসুদ্দীন আহ্‌মদ শাহের রাজত্ব-কালে ইলিয়াস শাহী বংশের লোকেরা ও তাঁদের সমর্থকেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন, নাসিরুদ্দীন রাজা হলে তাঁরা আবার একত্র সমবেত হলেন। ফিরিশ্‌তা আরও লিখেছেন যে নাসিরুদ্দীনের রাজত্বকালে জৌনপুর, দিল্লী ও বাংলার সুলতানদের মধ্যে রেষারেষি দূর হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

'রিয়াজ'-এ নাসিরুদ্দীন সম্বন্ধে এই কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে,

"নাসির শাহ সমস্ত কাজ ন্যায়পরায়ণতা এবং উদারতার সঙ্গে করতেন।

* মনোমোহন চক্রবর্তী বহুদিন আগেই এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের বংশকে "Later Ilyas Shahi Dynasty" না বলে "Mahmudi Dynasty" নামে অভিহিত করেছিলেন (JASB, 1909, p. 205 দ্রঃ)।

যার ফলে বৃদ্ধ-যুবা নির্বিশেষে সমস্ত লোকে তৃপ্ত হল এবং আহ্‌মদ শাহের অত্যাচার-জনিত ক্ষত শুকিয়ে গেল। এই মহান্‌ রাজা গৌড়ের দুর্গ ও প্রাসাদগুলি নির্মাণ করান।"

এই কথাগুলি যে মোটামুটিভাবে সত্য, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ সুশাসক না হলে নাসিরুদ্দীনের পক্ষে সুদীর্ঘ ২৪।২৫ বছর ধরে অপ্রতিহতভাবে রাজত্ব করা সম্ভব হত বলে মনে হয় না। রজনীকান্ত চক্রবর্তীর মতে গৌড়ের বিখ্যাত "সেনানী দরওয়াজা" বা "কোৎওয়ালী দরওয়াজা"র নির্মাতা নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ্‌।

কেউ কেউ অনুমান করেন নাসিরুদ্দীনের রাজত্বকালটা পরিপূর্ণ শান্তিতেই কেটেছিল, কোন যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে তিনি যান নি। এই ধারণা যে সম্পূর্ণ সত্য নয়, তা পরবর্তী আলোচনা থেকে দেখা যাবে :

প্রথমত, উড়িষ্যারাজ কপিলেন্দ্রদেবের এক শিলালিপিতে লেখা আছে যে তিনি গৌড়েশ্বরকে পর্যুদস্ত করেছিলেন। কপিলেন্দ্রদেবের অন্যতম সামন্ত কোণ্ডাবিডুর গণদেব প্রদত্ত ১৩৭৭ শকের ভাদ্রমাসের (=১৪ ৫ খ্রীঃ) এক শাসন থেকে জানা যায় যে তিনি দুজন "তুরুষ্ক-নৃপতি"কে পরাজিত করেছিলেন। ঐ সময়ে উড়িষ্যার পাশে মাত্র দুজন "তুরুষ্ক" (মুসলমান) নৃপতিই ছিলেন—বাহমনীর রাজা এবং বাংলার রাজা। ঐ সময়ে নাসিরুদ্দীনই বাংলার রাজা ছিলেন। কপিলেন্দ্রদেব তাঁর শিলালিপিতে "গৌড়েশ্বর" উপাধি ধারণ করেছেন। সুতরাং নাসিরুদ্দীনের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল বলেই মনে হয়।

দ্বিতীয়ত, খুলনা-যশোহর অঞ্চলে ব্যাপক প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, খান-জহান নামে বাংলার সুলতানের একজন সেনাপতি এই অঞ্চলে প্রথম মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। সম্ভবত এই কথা সত্য এবং বাংলার এই সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ্‌। কারণ তাঁর রাজত্বকালে—৮৬৩ হিজরায় ২৬শে জিলহিজ্জা তারিখে উৎকীর্ণ এক শিলালিপি বাগেরহাট অঞ্চলে পাওয়া গেছে—এতে খান-জহানের মৃত্যুর উল্লেখ আছে। সুতরাং নাসিরুদ্দীনের সামরিক অভিযানের এটি একটি নিদর্শন বলে গৃহীত হতে পারে

তৃতীয়ত, মিথিলার বিখ্যাত কবি ও পণ্ডিত বিদ্যাপতি তাঁর 'দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী' গ্রন্থে তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজা নরসিংহের দ্বিতীয় পুত্র ভৈরবসিংহ সম্বন্ধে লিখেছেন,

শৌর্য্যাবর্জিতপঞ্চগৌড়ধরণীনাথোপনম্রীকৃতা-
হনেকোত্তুরঙ্গতুরঙ্গসঙ্গতসিতচ্ছত্রাভিরামোদয়ঃ।
শ্রীমদ্‌ভৈরবসিংহদেবনৃপতির্যস্যানুজন্মাজয়-
ত্যাচন্দ্রার্কমখণ্ডকীর্ত্তিসহিতঃ শ্রীরূপনারায়ণঃ ॥

'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' ১৪৫০ খ্রীঃর কাছাকাছি সময়ে রচিত হয়েছিল (প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম, পৃঃ ৪৬ দ্রষ্টব্য)। এই সময়ের দু'এক বছর এদিক-ওদিক হতে পারে কিন্তু এই বই যে ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দের আগে লেখা হয়েছিল, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' রচনার আগে ভৈরবসিংহ যে "পঞ্চগৌড়ধরণীনাথ" অর্থাৎ বাংলার রাজাকে "নম্রীকৃত" করেছিলেন, তিনি নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহ ভিন্ন আর কেউই হতে পারেন না। 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' রচনার সময়ে ভৈরবসিংহের বয়স খুব বেশী ছিল না, কারণ তাঁর পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দু'জনেই ঐ সময়ে জীবিত ছিলেন। সুতরাং নাসিরুদ্দীনের সিংহাসনে আরোহণের আগে অর্থাৎ 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' রচনার ১৫ বছরেরও বেশী আগে ভৈরবসিংহের কোন গৌড়েশ্বরকে "নম্রীকৃত" করবার মত বয়স নিশ্চয়ই হয়নি।

সুতরাং ভৈরবসিংহ কর্তৃক "নম্রীকৃত" গৌড়েশ্বর যে নাসিরুদ্দীন, তা জানা গেল। কিন্তু ত্রিহুতের এক ক্ষুদ্র ভূস্বামীর পুত্র ভৈরবসিংহ প্রবলপ্রতাপ গৌড়েশ্বরকে নম্রীকৃত করেছিলেন, এ ব্যাপার কেমন করে সম্ভব হয়? আমার মনে হয়, নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহ মিথিলার অঞ্চলবিশেষ নিজের অধিকারভুক্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন এবং ভৈরবসিংহ প্রশংসনীয় বীরত্ব দেখিয়ে সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। মোটের উপর, ভৈরবসিংহ তথা মিথিলার রাজাদের সঙ্গে যে নাসিরুদ্দীনের যুদ্ধ হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ত্রিহুতের পাশে ভাগলপুর ও মুঙ্গের অঞ্চলে নাসিরুদ্দীনের অধিকার ছিল। এ কথা নাসিরুদ্দীনের এই অঞ্চলে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে জানা যায়। সুতরাং নাসিরুদ্দীনের সঙ্গে ত্রিহুতের রাজাদের যুদ্ধ হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

পঞ্চদশ শতাব্দীর একেবারে প্রথমে চীনের সঙ্গে বাংলার রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ৩৪ বছর ধরে এই সম্পর্ক অব্যাহত থাকবার পর নাসিরুদ্দীনের রাজত্বকালেই তা ছিন্ন হয়। চীনদেশের ইতিহাসগ্রন্থগুলির মধ্যে চীন-বাংলা রাজনৈতিক সংযোগের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা এখানে উল্লেখ করা দরকার মনে করি।

যে সমস্ত চীনা বইতে বাংলার সঙ্গে চীনের সম্পর্কের বিশদ ও ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়, তার মধ্যে তিনখানি বই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই তিনখানি বইয়ের নাম 'শি-য়াং-ছাও-কুং-তিয়েন-লু', 'শু-যু-চৌ-ৎজ-লু' এবং 'মিং-শ্‌র্‌'। এই বইগুলির রচনাকাল আলোচ্য সময়ের পরবর্তী হলেও এগুলি সমসাময়িক দলিলপত্র অবলম্বনে লেখা বলে এদের প্রামাণিকতা অবিসংবাদিত। এই তিনখানি বই থেকে যা জানতে পারা যায়, তা নীচে দেওয়া হল।*

'শি-য়াং-ছাও-কুং-তিয়েন-লু' (রচনাকাল ১৫২০ খ্রীঃ—রচয়িতা হোয়াং-শিং-ৎসাং)-তে এইটুকু বিবরণ পাওয়া যায়,—

"সম্রাট্‌ য়ুং-লো'র রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে (১৪০৮ খ্রীঃ) (বাংলার) রাজা ঙ্গায়-য়া-স্‌জ্‌-তিং (গি-য়া-স্থ-দ্দীন) চীনদেশে ভেট সমেত এক দূত পাঠান। একজন দূত য়ুং-লো'র রাজত্বের নবম বর্ষে (১৪১২ খ্রীঃ) থাই-ৎ-সাং-এ পৌছোন। পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন রাজকর্মচারীকে সেখানে পাঠানো হয় তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে। য়ুং-লো'র রাজত্বে দ্বাদশ বর্ষে (১৪১৪ খ্রীঃ) বাংলা থেকে পা-য়ি-চি (বায়াজিদ) নামে একজন মন্ত্রী কি-লিন (জিরাফ) এবং অন্যান্য উপহার সমেত চীনে আসেন। সম্রাট চেন্‌-থুং-এর রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে (১৪৩৮ খ্রীঃ) বাংলা থেকে একই ধরনের উপহার সমেত আর একজন দূত আসেন।"

'শু-য চৌ-ৎজ-লু' (রচনাকাল ১৫৭৪ খ্রীঃ—রচয়িতা য়েন-ৎসুং-চিয়েন)-এ বলা হয়েছে,—

"য়ুং-লো'র রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে (১৪০৫ খ্রীঃ) বাংলার রাজা ঙ্গায়-য়া-স্‌জ্‌ তিং চীনের রাজসভায় দূত পাঠান। (চীন)-সম্রাটও বাংলার রাজা ও রাণীকে নানারকম রেশমী কাপড় উপহার পাঠাতে আদেশ দেন। য়ুং-লোর রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে (১৪০৮ খ্রীঃ) ঐ দেশের (বাংলার) রাজা আবার দূত পাঠালেন। এই দূত ভেট সমেত থাই-ৎ-সাং বন্দরে এসে পৌছোলেন। (চীনের) সম্রাট তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে পররাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রীকে

* এই অংশটি লেখার সময় JRAS, 1895, pp. 529-33এ প্রকাশিত ফিলিপ্‌সের প্রবন্ধ, T'oung Pao, 1915, pp. 440-444এ প্রকাশিত রকহিলের প্রবন্ধ, VBA,I, pp. 96-134এ প্রকাশিত ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচীর প্রবন্ধ, এবং প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৫১, পৃঃ ৫৪-৫৭তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ থেকে সাহায্য পেয়েছি।

সেখানে পাঠালেন। য়ুং-লোর রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে (১৪১৪ খ্রীঃ) বাংলার রাজা পা-য়ি-চি* নামে তাঁর একজন মন্ত্রীকে চীনে পাঠালেন, জিরাফ এবং অন্যান্য উপহার সঙ্গে দিয়ে। তাইতে আচার-অনুষ্ঠান দপ্তরের মন্ত্রী (চীন)-সম্রাটকে অভিনন্দন জানালেন। সম্রাট উত্তরে বললেন, "দেশের শাসনকার্যে তোমরা আমাকে রাত্রিদিন সাহায্য কর, এতেই দেশের উপকার হচ্ছে। জিরাফ দেশে থাকুক বা না থাকুক, কিছু আসে যায় না।" (চীন)-সম্রাট ও বাংলার রাজাকে ভেট পাঠালেন। বাংলার প্রতিনিধিদলের লোকদেরও পদমর্যাদা অনুসারে নানারকম উপহার দেওয়া হল। য়ুং-লো'র রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষে (১৪১৫ খ্রীঃ) চীন-সম্রাট হৌ-শিয়েন নামে একজন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষকে অনেক লোকজন এবং এক বিরাট নৌবহর ও সৈন্যসামন্ত সমেত বাংলায় পাঠিয়েছিলেন।"

চীনের 'মিং' রাজবংশের সরকারী ইতিহাসগ্রন্থ 'মিং-শ্‌র্' (রচনাকাল ১৭৩৪ খ্রীঃ) থেকে এই দুই বিবরণীরও অতিরিক্ত কিছু তথ্য পাওয়া যায়। 'মিং-শ্‌র্-এর 'ওয়াই-কুও-চোয়ান' (বিদেশ সংক্রান্ত নথীপত্র) অধ্যায়ে বাংলা সম্বন্ধে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা নীচে উদ্ধৃত হল :—

"য়ুং-লো'র রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে (১৪০৮) বাংলার রাজা উপহার সমেত চীনে একজন দূত পাঠান। চীনও প্রতিদানস্বরূপ অনেক উপহার পাঠায়। য়ুং-লো'র রাজত্বের সপ্তম বর্ষে (১৪০৯) তাঁদের দূত ২৩০ জন রাজকর্মচারী সঙ্গে নিয়ে চীনে এসেছিলেন। (চীন)-সম্রাট সেই সময় বিদেশের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। কাজেই তিনি বাংলা দেশে অনেক উপহার পাঠালেন। এর পর থেকে তারা (বাংলার রাজদূতেরা) প্রতি বছরই (চীনে) আসত।† য়ুং-লো'র রাজত্বের দশম বর্ষে (১৪১২) বাংলার রাজদূতেরা চীনে পৌঁছোবার পূর্বাহ্ণে সম্রাট তাঁদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করার

* ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী মনে করেন 'পা-য়ি-চি' 'বায়াজিদ' নামের অপভ্রংশ। এই মত খুবই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু এখানে একটা কথা আছে। ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ বাংলার সুলতান ছিলেন। 'বায়াজিদ' নামে তিনিও অভিহিত হতে পারেন। অতএব তাঁর নামটিই 'শু-য়ূ-চৌ-ৎজ-লু'তে তাঁর প্রেরিত মন্ত্রীর উপরে ভুলক্রমে আরোপিত হয়েছে, এমনও হতে পারে।

† "প্রতি বছর"ই বাংলার রাজদূতেরা চীনে যেত কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। চীনা বিবরণীগুলিতে বিশেষভাবে যে সালগুলির উল্লেখ করা হয়েছে, সেই সব বছরে যে বাংলা থেকে চীনে রাজদূত গিয়েছিল, তাতে কোন সংশয় নেই।

জন্য কয়েকজন মন্ত্রীকে চেন-চিয়াং-এ পাঠালেন। ব্যবস্থা যখন সম্পূর্ণ, এমন সময় বাংলার দূতেরা তাদের রাজার মৃত্যু-সংবাদ নিয়ে পৌছোলো। মৃত রাজার শোকানুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য চীন থেকে রাজপুরুষদের পাঠানো হল। তার পুত্র সাই-উ-তিং (সৈফুদ্দীন)-কে বাংলার রাজারূপে নিযুক্ত করা হ'ল। য়ুং-লো'র রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে (১৪১৪) নতুন এক রাজা ধন্যবাদ জানিয়ে এক লিপি পাঠালেন, সেই সঙ্গে নানারকম উপহার পাঠালেন—তার মধ্যে ছিল জিরাফ, বাংলার বিখ্যাত ঘোড়া এবং সেখানকার নানারকম উৎপন্ন দ্রব্য। চীনের রাজপুরুষেরা এর জন্য সম্রাটকে অভিনন্দন জানাবার প্রস্তাব করলেন, কিন্তু সম্রাট এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেন। পরের বছর (১৪১৫) রাজা, রানী এবং রাজপুরুষদের জন্য অনেক উপহার সমেত হৌ-শিয়েনকে ঐ দেশে পাঠানো হ'ল। তারপর চেন-থুং এর রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে (১৪০৮) তারা আর একবার জিরাফ উপহার পাঠায়। সমস্ত রাজপুরুষ এই ঘটনা উপলক্ষে সম্রাটকে অভিনন্দন জানান। পরের বছর (১৫৩৯) আবার ঐ দেশ থেকে উপহার আসে। তারপর থেকে ঐ দেশের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক ছিন্ন হয়।"

কিন্তু 'মিং-শ্‌র্'-এর অন্য কয়েকটি অধ্যায়ে প্রাসঙ্গিক উল্লেখের মধ্য দিয়ে বাংলার সম্বন্ধে আরও নতুন ও মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। 'মিং-শ্‌র্', 'শিং-ছা-শুং-লান' প্রভৃতি বইগুলিতে বলা হয়েছে এই সময় স্‌নে-না-পু-আড় বা চাও-না-ফু-আড নামে ভারতের একটি রাজ্যের সঙ্গে চীনের রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল, যে রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বুদ্ধদেবের সিদ্ধিলাভের স্থানটি। এই স্‌সে-না-পু-আড় বা চাও-না-ফু-আড় হচ্ছে জৌনপুর রাজ্য ; বুদ্ধদেবের সিদ্ধিলাভের স্থান গয়া ঐ সময়ে এই রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। 'মিং-শ্‌র্'-এর ৩২৬শ অধ্যায়ে জৌনপুরের সঙ্গে চীনের সম্পর্কের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়, তার মধ্যে বাংলা সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মেলে। নীচে এই বিবরণটি উদ্ধৃত হল :—

স্‌সে-না-পু-আড়—বাংলার পশ্চিমে অবস্থিত। একে মধ্য ভারতও বলা হয়। প্রাচীন যুগে এখানে বুদ্ধ থাকতেন। য়ুং-লো'র রাজত্বের দশম বর্ষে (১৪১২ খ্রীঃ) (চীনের) একজন রাজদূতকে রাজকীয় সনদ দিয়ে এই রাজ্যে পাঠানো হয়। তাদের রাজা য়ি-পুলা (ইব্রা=ইব্রাহিম শর্কী)-কে সোনালী জরির কাজ করা রেশমী কাপড় উপহার দেওয়া হয়। য়ুং-লো'র রাজত্বের

অষ্টাদশ বর্ষে (১৪২০ খ্রীঃ) বাংলার রাজদূত (চীন-সম্রাটকে) জানান যে, তাদের (জৌনপুরের) রাজা কয়েকবার বাংলা আক্রমণ করেছেন। হৌ-শিয়েনকে তখন সম্রাটের আদেশ দিয়ে পাঠানো হল তাঁকে (জৌনপুররাজকে) বলবার জন্য যে, প্রতিবেশীর প্রতি ভাল ব্যবহার করেই তিনি নিজের সম্পত্তি বাঁচাতে পারেন। তাঁকে রেশম এবং টাকাকড়ি দেওয়া হল। হৌ-শিয়েন তখন বজ্রাসন (গয়া) পরিদর্শন করে সেখানে কিছু দান করলেন। এই রাজ্যটি চীন থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। তাই এরা চীনে কোন ভেট পাঠাতে পারে নি।"

উপরের বিবরণে হৌ-শিয়েন নামে যে চীনা রাজপুরুষের নাম করা হয়েছে, "মিং-শ্ র্-এর ৩৪০শ অধ্যায়ে তাঁর জীবনী পাওয়া যায়। এই জীবনীর মধ্যেও এক জায়গায় বাংলা ও জৌনপুর সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য তথ্য মেলে। এই অংশটি নীচে উদ্ধৃত করছি :—

"য়ুং-লো'র রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষের (১৪১৫) সপ্তম মাসে সম্রাট বাংলা এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে ইচ্ছুক হয়ে হৌ-শিয়েনকে এক নৌবহর সমেত পাঠালেন।* এই দেশটি (বাংলা) হচ্ছে ভারতবর্ষের পূর্ব দিকে। চীন থেকে এর দূরত্ব খুব বেশী। তাদের রাজা সাই-ফু-তিং†

* হৌ-শিয়েনের দৌত্য 'শিং-চা-শ্যং-লান' বইয়ে বর্ণিত আছে।

† 'সাই-ফু-তিং'-এর সঙ্গে বাংলার যে রাজার নামের মিল আছে, তিনি হচ্ছেন সৈফুদ্দীন (হমজা শাহ)। কিন্তু মুদ্রার সাক্ষ্য থেকে দেখা যায়, সৈফুদ্দীনের রাজত্বকাল ৮১৩-৮১৫ হিজরা। সুতরাং ১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দের পরে সৈফুদ্দীন রাজত্ব করতে পারেন না। অথচ উপরে উদ্ধৃত বিবরণীতে বলা হয়েছে, সাই-ফু-তিং ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশে ভেট পাঠিয়েছিলেন এবং ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দে জৌনপুররাজ বাংলা আক্রমণ করায় চীন-সম্রাটকে খবর দিয়েছিলেন। সুতরাং এই বিবরণীতে বাংলার রাজার নাম নির্দেশে যে ভুল হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই ভুল কেন হ'ল তাও বোঝা যায়। 'মিং-শ্ র্'-এর অন্যত্র রয়েছে, ১৪১২ খ্রীষ্টাব্দে চীনসম্রাটের প্রতিনিধিরা সৈফুদ্দীনের অভিষেক-উৎসবে যোগ দিতে এসেছিলেন। ১৪১২ খ্রীষ্টাব্দে যাঁর অভিষেক হয়েছিল, ১৪১৪ ও ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনিই বাংলার রাজা ছিলেন, এই সরল বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই হৌ-শিয়েনের জীবনী-লেখক ঐ দুই সালের ঘটনার উল্লেখের সময় 'সাই-ফু-তিং' নামটি বসিয়ে দিয়েছেন। নামটি যে তাঁর নিজেরই সংযোজনা, তার প্রমাণ হচ্ছে, 'মিং-শ্ র্'-এর ৩২৬শ অধ্যায়ে ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দের বাংলা-জৌনপুর সংঘর্ষের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে বাংলার রাজার নাম উল্লিখিত হয়নি। উপরের বিবরণটি বর্ণিত ঘটনার তিনশো বছর পরে লেখা এবং লেখকও বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন ; সুতরাং তাঁর পক্ষে এটুকু ভুল হওয়া স্বাভাবিক।

(চীনেতে) কি-লিন (জিরাফ) এবং অন্যান্য দেশজ সামগ্রী ভেট পাঠিয়েছিলেন।* সম্রাট এতে খুব খুশী হয়েছিলেন। তিনিও প্রতিদানে অনেক জিনিস পাঠিয়েছিলেন। বাংলার পশ্চিমে স্সে-না-পু আড নামে একটি রাজ্য আছে। রাজ্যটি ভারতবর্ষের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত। এই হচ্ছে বুদ্ধের আদি পীঠস্থান। এই দেশের রাজা বাংলা আক্রমণ করেছিলেন। সাই-ফু-তিং তখন চীনসম্রাটকে খবর দেন। যুং লো'র রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষের (১৪২০ খ্রীঃ) নবম মাসে সম্রাট হৌ শিয়েনকে আদেশ দেন (ভারতবর্ষে) গিয়ে তাঁদের (বাংলা ও জৌনপুরের রাজার) মধ্যে শান্তি স্থাপন করতে। (জৌনপুরের রাজাকে) সোনাদানা এবং টাকাকড়ি উপহার দিয়ে যুদ্ধ বন্ধ করা হল।"

উদ্ধৃত অংশগুলি থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, ১৪০৫, ১৪০৮, ১৪০৯, ১৪১১, ১৪১২, ১৪১৪, ১৪২০, ১৪৩৮ ও ১৪৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা থেকে চীনে দূত গিয়েছিল এবং ১৪০৯, ১৪১২ ও ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে চীন থেকে বাংলায় দূত এসেছিল। বাংলার সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে চীনের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। গিয়াসুদ্দীনের মৃত্যুর পরে দেশের শাসনক্ষমতার অধিকারী হন রাজা গণেশ ও তাঁর উত্তরাধিকারীরা। তাঁদের আমলেও চীনের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু গণেশের বংশ ক্ষমতাচ্যুত হবার এবং নাসিরুদ্দীন মাহ্মূদ শাহের সিংহাসনে আরোহণের অল্পদিন বাদেই এই সম্পর্ক ছিন্ন হয়।

চীনা বিবরণীগুলি থেকে জানা যাচ্ছে যে বাংলার রাজা কয়েকবার চীনসম্রাটকে জিরাফ পাঠিয়েছিলেন। এই তথ্যটুকু নানাদিক দিয়ে বিশেষ মূল্যবান। জিরাফ আফ্রিকারই জন্তু অথচ বাংলার রাজা চীনসম্রাটকে জিরাফ উপহার পাঠিয়েছিলেন। এর থেকে বোঝা যায়, ঐ সময় সুদূর আফ্রিকার সঙ্গেও বাংলার সংযোগ ছিল। বাংলার রাজা ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে চীন-সম্রাটকে যে জিরাফটি উপহার পাঠিয়েছিলেন, তার একটি সমসাময়িক ছবি পাওয়া

* বাংলার রাজার এই জিরাফ ও অন্যান্য দেশজ সামগ্রী প্রেরণ যে ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দের আগেকার ঘটনা তা বর্ণনার ভাষা থেকেই বোঝা যায়। আসলে এগুলি ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রেরিত হয়েছিল (১৭৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। পরবর্তী ছত্রে চীন-সম্রাটের যে প্রতিদানে অনেক জিনিস পাঠানোর কথা বলা হয়েছে, সেগুলিই হৌ-শিয়েনের মারফৎ পাঠানো হয়।

গিয়েছে। ছবিটির উপরে একটি কবিতা লেখা আছে, এতে চীন-সম্রাটকে জিরাফ পাওয়ার জন্য অভিনন্দন জানানো হয়েছে। শ্যেন্-তু নামে একজন কবি-শিল্পী এই ছবিটি এঁকেছিলেন ও কবিতাটি লিখেছিলেন। কবিতাটি থেকে জানা যায়, য়ুং-লোর রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষের নবম মাসে (অক্টোবর-নভেম্বর, ১৪১৪ খ্রীঃ) জিরাফটি চীনে পৌঁছোয় (শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ, প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৫১, পৃঃ ৫৪-৫৭ দ্রষ্টব্য)। চীনদেশে বাংলার পাঠানো জিরাফ যে বিরাট উদ্দীপনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল, তা সম্রাটকে এত অভিনন্দন জানানো থেকেই বোঝা যায়। চীনের বিখ্যাত কবিরা বাংলার পাঠানো জিরাফকে নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছিলেন। ক্রমশ এই জিরাফকে নিয়ে নানারকম রূপকথার গল্প রটল—একবার রটে গেল, একটি জিরাফ এক বাঘের ছানা প্রসব করেছে, তার আবার গরুর মত ক্ষুর আছে, লেজটিও গরুরই মত। এই গল্পগুলি পড়লে অনাবিল কৌতুকরস উপভোগ করা যায়।

চীন থেকে যে সব প্রতিনিধিরা বাংলায় এসেছিলেন, তাঁরা তাঁদের দেখা বাংলার বিবরণও লিখে রেখে গিয়েছেন। এই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণগুলি দু'খানি সমসাময়িক বইতে প্রথম সঙ্কলিত হয়; তাদের মধ্যে একখানির নাম 'য়িং-য়া-শ্যং-লান'; এর রচনাকাল ১৪২৫ থেকে ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে, লেখকের নাম মা-হোয়ান। দ্বিতীয় বইটির নাম 'শিং-চা-শ্যং-লান'; এর রচনাকাল ১৪৩৬ খ্রীষ্টাব্দ, লেখকের নাম ফেই-শিন। আমরা এই বইয়ের অন্যত্র এই দুটি বিবরণ সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করেছি।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে চীন এবং বাংলার মধ্যে যে রাজনৈতিক সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল, তার ইতিহাস সংক্ষেপে এই। আগেই বলা হয়েছে যে, এই সংযোগের প্রথম সূচনা করেছিলেন বাংলার রাজা গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ এবং তাঁর পরবর্তী রাজারা অনেকদিন পর্যন্ত এই নীতি অনুসরণ করেছিলেন। বাংলার রাজার পক্ষে এই বিচক্ষণ পররাষ্ট্র-নীতি অনুসরণ বিশেষ প্রশংসার্হ সন্দেহ নেই, তবে বাংলার রাজার এই আচরণ চীন-সম্রাট ও তাঁর প্রজাদের দম্ভ বাড়িয়েছিল। কারণ চীনে প্রাচীনকাল থেকে সকলের মধ্যে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে চীন-সম্রাট সমগ্র পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি, অন্য সব রাজারা তাঁর সামন্ত মাত্র। বাংলার রাজার দূত ও উপহার পাঠানোকেও চীনা বইগুলিতে এই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই দেখা হয়েছে। এই

বইগুলিতে বাংলার রাজার বন্ধু নৃপতির মত চীন-সম্রাটকে উপহার পাঠানো ব্যাপারকে "ভেট পাঠানো" বলা হয়েছে, বাংলার রাজার কাছে পাঠানো চীন-সম্রাটের চিঠিকে "সার্বভৌম অধিরাজের আদেশলিপি" বলা হয়েছে এবং গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের মৃত্যুর পর সৈফুদ্দীন হম্‌জা শাহের সিংহাসনে আরোহণের উল্লেখ করবার সময়ে বলা হয়েছে যে চীনসম্রাট সৈফুদ্দীনকে বাংলার "রাজারূপে নিযুক্ত" করেছিলেন।

বাংলার সঙ্গে চীনের এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবার জন্যও চীনই দায়ী। চীনা বিবরণ থেকেই জানা যাচ্ছে, নাসিরুদ্দীন মাহ্মূদ শাহ দুবার—১৪৩৮ ও ১৪৩৯ খ্রীষ্টাব্দে চীন-সম্রাটের কাছে উপহারসমেত রাজদূত পাঠিয়েছিলেন। একবার তিনি জিরাফও পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এ বিষয়ে নাসিরুদ্দীন তাঁর পূর্ববর্তী সুলতানদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছিলেন। কিন্তু তাঁর সমসাময়িক চীন-সম্রাট চেন্-থুং এ বিষয়ে যুং-লোর (১৪০২-২৫ খ্রীঃ) পদাঙ্ক অনুসরণ করেন নি। যুং-লো বিদেশের, বিশেষত এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু তাঁর পরবর্তী চীন-সম্রাটদের, বিশেষভাবে চেন্-থুং-এর সে বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ ছিল না। তার প্রমাণ, নাসিরুদ্দীন তাঁকে পরপর দু'বছর উপহার পাঠালেও তিনি বাংলার রাজাকে কোন উপহার পাঠান নি। বলা বাহুল্য, এই একতরফা উপহার প্রেরণ বেশী দিন চলা সম্ভব ছিল না। ফলে উভয় দেশের সংযোগও ছিন্ন হয়ে যায়।

নাসিরুদ্দীন মাহ্মূদ শাহের যে সমস্ত মুদ্রা এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি ফতেহাবাদ ও মাহ্মূদাবাদের টাকশালে তৈরী। ফতেহাবাদ বর্তমান ফরিদপুর অঞ্চলের সঙ্গে অভিন্ন। কিন্তু মাহ্মূদাবাদের অবস্থান আজও পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে নির্ণীত হয়নি। আজ পর্যন্ত এই সব জায়গায় তাঁর শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে—বালিয়াঘাটা (জঙ্গীপুর), গৌড়, সাতগাঁও, হজরৎ পাণ্ডুয়া, নসওয়ালাগলী (ঢাকা), ভাগলপুর, মুঙ্গের, ঘঘরা (ময়মনসিংহ) ও কিওয়ারজোর (ময়মনসিংহ)। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ এবং বিহারের কতকাংশ নাসিরুদ্দীনের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। এ ছাড়া নরিণ্ডা (ঢাকা), ত্রিবেণী ও বাগেরহাটে তিনটি শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে, এগুলি নাসিরুদ্দীনেরই রাজত্বকালে উৎকীর্ণ হলেও এদের মধ্যে রাজা হিসাবে তাঁর নাম উল্লিখিত হয় নি। ত্রিবেণীর

শিলালিপির তারিখ ৮৬০ হিজরা এবং এতে তাঁর পুত্র বারবক শাহের নাম আছে। এর কারণ সম্বন্ধে আমরা বারবক শাহ সংক্রান্ত অধ্যায়ে আলোচনা করব।

নাসিরুদ্দীন ৮৬৩ হিজরা অবধি নিশ্চয়ই জীবিত ছিলেন, কারণ ঐ বছর অবধি তাঁর মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। পাণ্ডুয়ায় হজরৎ নূর কুৎব্ আলমের দরগার রান্নাঘরে উৎকীর্ণ এক শিলালিপিতে লেখা আছে, নাসিরুদ্দীন মাহ্মুদ শাহ ৮৬৩ হিজরার ২৮শে জিলহিজ্জা তারিখে (৬ঠা নভেম্বর, ১৪৫৮ খ্রীঃ) রাজা ছিলেন। সম্ভবত ৮৬৪ হিজরার গোড়ার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।

বিভিন্ন শিলালিপিতে নাসিরুদ্দীন মাহ্মুদ শাহের যে সমস্ত কর্মচারীর নাম পাওয়া যায়, নীচে তা উল্লিখিত হল।

(১) খান জহান। (২) সরফরাজ খান, খান মজলিশ। (৩) তর্বিয়ৎ খান। (৪) লতিফ খান। (৫) খওয়াজা জহান। (৬) হিলাৎ, বান্দা-ই-দরগাহ্। (৭) কদর খান।

রুকনুদ্দীন বারবক শাহ

রুকনুদ্দীন বারবক শাহ নাসিরুদ্দীন মাহ্মুদ শাহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী। ইনি বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান তো বটেই, সর্বদেশের ও সর্বকালের নরপতিদের মধ্যে তাঁর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে বললেও অত্যুক্তি হবে না। অথচ এঁর সম্বন্ধে এতদিন আমাদের বিশেষ কিছুই জানা ছিল না। পরবর্তী কালে লেখা ফার্সী বিবরণীগুলিতে বারবক শাহ সম্বন্ধে যে বিবরণী আছে, তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর এবং আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়। একটি সমসাময়িক ফার্সী গ্রন্থ (ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী রচিত 'শর্ফ্নামা') ও কয়েকটি শিলালিপি থেকে তাঁর সম্বন্ধে সামান্য কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। এ ছাড়া সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় লেখা কয়েকটি গ্রন্থে বারবক শাহ সম্বন্ধে কিছু তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। এই বইগুলির মধ্যে কয়েকটি তাঁর সমসাময়িক। এদের সাক্ষ্যই সবচেয়ে মূল্যবান। কারণ বারবক শাহ যে কত বড় ছিলেন, তার স্পষ্ট আভাস কেবল মাত্র এদের মধ্য থেকেই পাওয়া যায়।

বারবক শাহ একুশ বছর বা তারও বেশী সময় রাজত্ব করেন। ৮৬৩ থেকে ৮৭৮ হিঃ পর্যন্ত তাঁর মুদ্রা পাওয়া যায়। এই কারণে ঐতিহাসিকেরা ঐ সময়ই

তাঁর রাজত্বকাল বলে নির্দিষ্ট করেছেন। History of Bengal (D.U., Vol. II)-তেও ঐ তারিখই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আসলে বারবক শাহ্‌ ৮৬৩ হিঃর কিছু আগে থাকতেই রাজত্ব করছিলেন এবং ৮৭৮ হিঃর কয়েক বছর পরেও রাজত্ব করেছিলেন বলে আমরা প্রমাণ পেয়েছি। বারবক শাহের ৮৬২ হিজরায় উৎকীর্ণ চারটি মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে (JASP, Vol. IV, 1959, pp. 169-172 দ্রঃ) ; তা' ছাড়া ত্রিবেণীতে বারবক শাহের নামাঙ্কিত একটি শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে, তার তারিখ ৮৬০ হিঃ ; ঐ সময় যে "ন্যায়বিচারক, উদারপ্রকৃতি, বিদ্বান এবং আদর্শচরিত্র মালিক বারবক শাহ" রাজত্ব করছিলেন, তা' শিলালিপিটিতে স্পষ্ট উল্লিখিত হয়েছে। অথচ বারবক শাহের পিতা নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহ তখনও জীবিত ছিলেন। তাঁর ৮৬৩ হিঃ অবধি মুদ্রা ও শিলালিপি পাওয়া যায়।

এদিকে সমসাময়িক স্মৃতিগ্রন্থকার বিশারদের একটি বচনে দেখছি, বারবক শাহ ১৩৯৭ শকাব্দ বা ৮৮০ হিজরাতেও সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বচনটি হরিদাসের শ্রাদ্ধবিবেকে ধৃত হয়েছে। নীচে সেটি উদ্ধৃত হল। ১৩৯৭ শকাব্দে যে দুটি মলমাস ও একটি ক্ষয়মাস ছিল—এই জ্যোতিষিক তথ্য এতে লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং এটি সম্পূর্ণ সত্য ;

"তথা গৌড়প্রৌঢ়পৃথ্বিবৃঢ় বারবকে রাজ্যং শাসতি সপ্তনবত্যধিকত্রয়োদশশতীমিতশকাব্দে চান্দ্রাশ্বিনসংক্রান্তিং কৃত্বা প্রতিপদ্যেব সংচর্য্য বরেরমাবস্যায়াং কুম্ভসংক্রমে প্রতিপদি মীনসংক্রামাবেকস্মিন্নব্দে দ্বয়োঃ সংক্রান্তিশূন্যত্বং দৃষ্টমিতি বিশারদেনোক্তং।" (বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, পৃঃ ৪৯)

অথচ বারবক শাহের পুত্র শামসুদ্দীন যুসুফ শাহের নামাঙ্কিত একটি শিলালিপির তারিখ ৮৭৯ হিঃ। তাহলে দেখা যাচ্ছে, বারবক শাহ্‌ অন্তত ৮৬০-৮৬৩ হিঃ অবধি তাঁর পিতার সঙ্গে এবং অন্তত ৮৭৯-৮৮০ হিঃ অবধি তাঁর পুত্রের সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করেছিলেন।

তা'হ'লে প্রশ্ন উঠবে, বারবক শাহ্‌ কি তাঁর পিতার রাজত্বের শেষ দিকে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নিজে রাজা হয়েছিলেন এবং তাঁর নিজের রাজত্বের শেষ দিকেও কি তাঁর পুত্র য়ুসুফ শাহ্‌ বিদ্রোহী হয়েছিলেন? আমাদের মনে হয়, তা নয়। সম্ভবত নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের বংশে এই নতুন নিয়ম চালু হয়েছিল যে রাজার পুত্র যুবরাজপদে অভিষিক্ত হবার সময় থেকে পিতার সঙ্গে যৌথভাবে রাজত্ব করবেন এবং ঐ সময় থেকেই পিতার মত

তাঁরও নামে মুদ্রা, শিলালিপি প্রভৃতি উৎকীর্ণ হবে।* হোসেন শাহী বংশেও এই নিয়ম প্রচলিত ছিল, হোসেন শাহের জীবিতকালেই তাঁর পুত্র নসরৎ শাহের নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রকাশিত হয়েছিল। রাজার মৃত্যুর পর যাতে তাঁর পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে সংঘর্ষ না ঘটে, সেই জন্যই সম্ভবত এই ব্যবস্থা হয়েছিল।

'মাসির-ই-রহিমী', 'তবকাৎ-ই-আকবরী', 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা', 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীন' প্রভৃতি ইতিহাস-গ্রন্থে বারবক শাহ সম্বন্ধে কোন উল্লেখযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় না, তাদের মধ্যে দু' একটা মামুলী প্রশংসাসূচক কথা ভিন্ন আর বিশেষ কিছু লেখা নেই। পরে প্রসঙ্গক্রমে এগুলির উক্তি উদ্ধৃত করব। আপাতত আমরা অন্যান্য সূত্র অবলম্বনে বারবক শাহের ইতিহাসটি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করব।

বাংলাদেশে দু'জায়গায়—রংপুর জেলার কাঁটাদুয়ার এবং হুগলী জেলার মান্দারণে ইসমাইল গাজী নামে একজন মুসলমান বীরের সমাধি আছে। কাঁটাদুয়ারের সমাধি-ক্ষেত্রে একজন ফকিরের কাছে 'রিসালৎ-ই-শুহাদা' নামে একটি ফার্সী ভাষায় লেখা বই আছে। এই বইতে ইসমাইল গাজী সম্বন্ধে অনেক কথা লিপিবদ্ধ আছে। এতে বলা হয়েছে, ইসমাইল বারবক শাহের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন এবং সুলতানের আজ্ঞায় ৭৮ (৮৭৮) হিজরায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। 'রিসালৎ-ই-শুহাদা' শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল (JASB, 1874, Pt. I, p. 217)। এতে ইব্রাহিম সম্বন্ধে যা' লেখা আছে, তার সংক্ষিপ্তসার এই:—

ইসমাইল গাজী কোরেশ-বংশীয় আরব, মক্কাতে তাঁর জন্ম হয়। যৌবন থেকেই তিনি ধর্মগতপ্রাণ। একদল সঙ্গী নিয়ে তিনি আরব থেকে রওনা হয়ে পারস্যের ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষে আসেন এবং সুলতান বারবকের রাজধানী লখনৌতিতে এসে উপস্থিত হন। এঁর রাজ্যের মধ্যে ছুটিয়া-পটিয়া নামে একটি খরস্রোতা নদী ছিল। এই নদীতে বর্ষাকালে প্রবল বন্যা হয়ে বহু লোকের

* ইতিপূর্বে শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের (রাজত্বকাল ৭০১-৭২২ হিঃ) কয়েকজন পুত্র পিতার জীবদ্দশায় নিজেদের নামে মুদ্রা প্রকাশ করেছিলেন, তার কারণ তাঁরা পিতার রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ তাঁর পিতা সিকন্দর শাহের রাজত্বের শেষ দিকে নিজের নামে মুদ্রা প্রকাশ করেছিলেন, তার কারণ তিনি ঐ সময়ে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন।

জীবন ও সম্পত্তি ন করত। সুলতান অনেক চেষ্টা করেও এই নদীকে বাঁধতে পারেন নি। অবশেষে একদিন জনসাধারণের মধ্যে আদেশ জারী করা হল, তারা কোন একদিন নদীর ধারে জমায়েৎ হয়ে নদীতে মাটি ফেল্‌বে, সুলতান নিজে এক ঝুড়ি মাটি ফেলবেন। একথা শুনে ইসমাইল সুলতানকে বললেন তিনদিন সময় পেলে তিনি এর প্রতিকারের উপায় নির্দেশ করতে পারবেন। রাজা তাতে রাজী হলেন এবং ইসমাইলের কাছ থেকে তাঁর বিস্তৃত পরিচয় জেনে নিলেন।

তিন দিন ধরে চিন্তা করে এবং জ্ঞানী লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করে ইসমাইল ছুটিয়া-পটিয়া নদীর উপর এক সেতু নির্মাণের একটি পরিকল্পনা তৈরী করলেন। তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী এমন একটি মজবুত সেতু তৈরী করা সম্ভব হল, যার উপর দিয়ে হাতী-ঘোড়াও চলে যেতে পারত। এতে খুব খুশী হয়ে রাজা ইসমাইলকে সম্মানিত করলেন এবং তাঁর উপর আরও কঠিন কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত করলেন।

এর কয়েক বছর বাদে মান্দারণের রাজা গজপতি বাংলার সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। তাঁর বিরুদ্ধে প্রেরিত সৈন্যবাহিনী যখন পরাজিত হল, তখন ইসমাইলকে এ কাজের ভার দেওয়া হল। গজপতি পিতল দিয়ে এক দুর্ভেদ্য দুর্গ তৈরী করেছিলেন। গজপতি যখন শুনলেন ইসমাইল নামে একজন ফকির ১২০ জন জ্ঞানী লোককে সঙ্গে নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করতে এসেছে, তখন তিনি হাসলেন। কিন্তু তার রানী "ভগবানের সৈনিক" ইসমাইলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে তাঁকে নিষেধ করলেন। রাজা কিন্তু যুদ্ধ করলেন এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বন্দী হলেন এবং তাঁর মাথা কাটা গেল। ইসমাইল সুলতানের কাছে তখন আরও বেশী সম্মান পেলেন।

এর কয়েক বছর বাদে ইসমাইলের উপর কামরূপের রাজা কামেশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযানে নেতৃত্ব করার ভার পড়ল। এর আগে বারবার এই রাজা বাংলার সুলতানের সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন। ইসমাইল এবং তাঁর সঙ্গীরা এই রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যথেষ্ট বীরত্ব দেখালেন, কিন্তু এই রাজা ছিলেন তাঁর সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ বীর এবং উৎকৃষ্ট সামরিক প্রতিভার অধিকারী। সন্তোষের রণক্ষেত্রে দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হ'ল এবং তাতে বাংলার সুলতানের সৈন্যবাহিনীর সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটল। এই পক্ষে ইসমাইল, তাঁর ভাইপো

মুহম্মদ শাহ এবং বারোজন পাইক ভিন্ন আর সকলেই নিহত হলেন। বারোপাইকা-তে ইসমাইলদের দুর্গ ছিল। মুহম্মদ শাহকে এই দুর্গের রক্ষা-ভার দিয়ে ইব্রাহিম দুজন সৈন্য নিয়ে জল-মকাম নামক জায়গায় গিয়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন এখানে শুধুই জল। ইসমাইল ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে উপাসনার জন্য একটু ডাঙা চাইলেন। আকাশবাণী হল "একটা ঢাল মাটিতে ভর্তি করে ফেলে দাও, ডাঙা তৈরী হবে।" হ'লও তাই। ইসমাইল তখন রাজার কাছে এক দূত পাঠিয়ে তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে বললেন। রাজা সদর্পে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন আবার যুদ্ধ বাধল, কিন্তু যুদ্ধের মীমাংসা হবার আগেই রাত্রি এসে গেল। রাত্রির অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে ইসমাইল ঘোড়ায় চড়ে রাজার প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং তার শোবার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে রাজা-রানী আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে ঘুমোচ্ছিলেন, ইসমাইল তাঁদের বধ করার সুযোগ পেয়েও করলেন না, তার বদলে তাঁদের চুলে চুলে বেঁধে দিয়ে এবং দুজনের বুকের উপরে একখানি খোলা তলোয়ার রেখে দিয়ে সেখান থেকে চলে এলেন। পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে এই ব্যাপার দেখে রাজা-রানী অবাক্। গোড়ায় তাঁরা ভাবলেন দুষ্ট কোন প্রেতাত্মা এ কাজ করেছে, কিন্তু পরে ঘোড়ার মল এবং খুরের চিহ্ন প্রাসাদের মধ্যে দেখে তাঁরা বুঝলেন এ কাজ মানুষেরই। রাজা অনেক অনুসন্ধান ও জিজ্ঞাসাবাদ করেও এ ব্যাপারের কিনারা করতে পারলেন না। এদিকে সেদিন রাত্রেও সেই একই ব্যাপার। তার পরদিন রাত্রেও তাই। রাজা তখন বুঝলেন এ কাজ করেছেন শাহ ইসমাইল গাজী, তিনি ছাড়া আর কারও পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয়। রাজা তখন ইসমাইলের কাছে গিয়ে বশ্যতা স্বীকার করলেন এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। ইসমাইল তাঁর এই স্বেচ্ছামূলক আত্মসমর্পণের পুরস্কারস্বরূপ তাঁকে "বড়া লড়াইয়া" উপাধি দিলেন এবং বাংলার সুলতানের কাছে খবর পাঠালেন। সুলতান এ খবর শুনে আহ্লাদে আত্মহারা হলেন এবং ইসমাইলকে নানা-রকম রত্ন বসানো ঘোড়া, তলোয়ার ও কটিবন্ধনী প্রভৃতি উপহার দিয়ে সম্মানিত করলেন।

এর কিছুদিন পরে ঘোড়াঘাটের হিন্দু সেনাধ্যক্ষ ভান্দসী রায় ইসমাইলের কাছে রাজ্যের সীমান্তে একটি দুর্গ তৈরী করার প্রার্থনা জানালেন। এই অনুরোধ মঞ্জুর করা হল। কিন্তু ভান্দসী রায় তাঁর উপকারী ইসমাইলের উপর

ঈর্ষ্যাপরায়ণ হয়ে তাঁর সর্বনাশ সাধনের চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি সুলতানের কাছে এই মিথ্যা অভিযোগ করলেন যে ইসমাইল কামরূপের রাজার সঙ্গে যোট বেঁধে এক স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টায় আছেন। সুলতান এই হিন্দুর চক্রান্তে ইসমাইলকে শেষ পর্যন্ত অবিশ্বাস করলেন ও তাঁর উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে এক সৈন্যবাহিনী পাঠালেন।

ইসমাইল অশেষ বীরত্ব দেখিয়ে সুলতানের সৈন্যবাহিনীকে বহুবার প্রতিহত করলেন, কিন্তু যখন তাঁর সঙ্গীরা সকলেই নিহত হল, তখন তিনি নিজে বেঁচে থাকতে অনিচ্ছুক হয়ে আত্মসমর্পণ করলেন।

সুলতানের আদেশে ১৪ই শাবান, ৭৮ (৮৭৮) হিজিরা (৪ঠা জানুয়ারী, ১৪৭৪ খ্রীঃ) তারিখে তাঁর মাথা কেটে ফেলা হল। মৃত্যুকালে তাঁর সঙ্গীদের তিনি দূরে পাঠিয়ে দিলেন, কেবল শেখ মুহম্মদ নামে একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য তাঁকে ছাড়তে রাজী হ'ল না। ইব্রাহিমের কাটা মাথা যখন সুলতানের কাছে এল, তখন তিনি আসল ব্যাপার জানতে পেরেছেন। তিনি আদেশ দিলেন রাজাদের জন্য নির্দিষ্ট সমাধি-ক্ষেত্রে যেন ইসমাইলকে সমাবিষ্ট করা হয়। কিন্তু ইসমাইল তাঁকে সশরীরে দেখা দিয়ে বললেন তাঁর কাটা মাথাকে যেন কাঁটাদুয়ারেই কবর দেওয়া হয়।

ইসমাইলের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হ'ল এবং মান্দারণ ও ঘোড়াঘাটে রক্ষিত তাঁর সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি সুলতানের দরবারে পাঠানো হ'ল। যারা এইসব জিনিস নিয়ে যাচ্ছিল, তাদের সামনে ইসমাইল আবির্ভূত হলেন। এতে তারা অত্যন্ত ভয় পেয়ে তাঁকে সব সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে চাইল। কিন্তু ইসমাইল তাদের বললেন ভগবানের দয়াই তাঁর কাছে যথেষ্ট। এই সব বাহকেরা সুলতানের দরবারে যাবার পথে যেখানে যেখানে থামছিল, সেখানে সেখানে একটি করে দরগা উঠল। অবশেষে তাঁর মাথা কাঁটাদুয়ারে এবং তাঁর দেহ মান্দারণে সমাধিস্থ করা হল। দুটি জায়গাই বিখ্যাত তীর্থস্থানে পরিণত হল। স্বয়ং বারবক শাহ্ এবং তাঁর বেগম মান্দারণ ও কাঁটাদুয়ারে আগমন করে সমাধিক্ষেত্রে বহুমূল্যবান অনেক অর্ঘ্য দিয়েছিলেন।

'রিসালৎ-উ-শুহাদা'র এই বিবরণীতে অনেক অতিপ্রাকৃত উপাদান আছে এবং এটি বারবক শাহের রাজত্বকালের দেড়শো বছরেরও বেশী পরে লেখা। সুতরাং তার উক্তির উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করার আগে তাকে যাচাই করে নেওয়া দরকার। অলৌকিক ঘটনাগুলি বাদ দিলে এই বিবরণীর উক্তি

যে মোটামুটি ভাবে ঠিক, তা মনে করা চলে। কারণ এতে বলা হয়েছে ইসমাইল বারবক শাহের সেনাপতি ছিলেন এবং (৮)৭৮ হিজরায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। ঐ সময়ে বারবক শাহ সত্যিই বাংলার সুলতান ছিলেন। দ্বিতীয়ত, এতে বলা হয়েছে গজপাত নামে একজন রাজার কাছ থেকে ইসমাইল মান্দারণ দুর্গ জয় করেছিলেন; ঐ সময় উড়িষ্যায় গজপতি-বংশীয় কপিলেন্দ্রদেব রাজত্ব করছিলেন, তার শিলালিপি থেকে জানা যায় মান্দারণ অঞ্চল পর্যন্ত তাঁর অধিকার বিস্তৃত ছিল। কিন্তু গজপতি একজন স্থানীয় রাজা মাত্র ছিলেন এবং তাঁকে পরাজিত ও বন্দী করে ইসমাইল মান্দারণ দুর্গ অধিকার করেছিলেন, ইত্যাদি উক্তি অতিরঞ্জিত। আসল ব্যাপার সম্ভবত এই যে, মান্দারণ দুর্গ ঐ সময়ে কপিলেন্দ্রদেবের অধিকারে ছিল; তাঁর অধীনস্থ শাসনকর্তাকে পরাজিত ও বন্দী করে ইসমাইল মান্দারণ দুর্গ জয় করেছিলেন।

'রিসালৎ-ই-শুহাদা'র মতে ইসমাইলের সঙ্গে কামরূপরাজ কামেশ্বরের যুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু কামরূপে ঐ সময় কামেশ্বর নামে কোন রাজা ছিলেন না। সম্ভবত 'রিসালৎ-ই-শুহাদা'য় "ত্রিহুত"-এর জায়গায় ভ্রমবশত কামরূপ লেখা হয়েছে। ত্রিহুতে ঐ সময় কামেশ্বর নামে কোন রাজা না থাকলেও কামেশ্বর-বংশীয় রাজারা সেখানে তখন রাজত্ব করছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্তত একজন—ভৈরবসিংহের সঙ্গে বারবক শাহের সত্যিই সংঘর্ষ হয়েছিল। অবশ্য এমনও হতে পারে কামরূপের রাজার সঙ্গেই ইসমাইলের যুদ্ধ হয়েছিল, 'রিসালৎ'-এ রাজার নাম ভুল লেখা হয়েছে, "কামেশ্বর" "কামতেশ্বর" (কামতার রাজা)-এরও বিকৃতি হ'তে পারে, সে সময় কামরূপ ও কামতা একই রাজার অধীনে ছিল। 'রিসালৎ-ই শুহাদা'য় রাজা কামেশ্বরের জয় লাভ করেও ইসমাইলের গুণপনায় অভিভূত হয়ে নতি স্বীকার ও ইসলামধর্ম গ্রহণের যে কথা লেখা হয়েছে, তার মধ্যে অতিরঞ্জনের ছাপ সুস্পষ্ট। সম্ভবত এর ভিতরে রাজার জয়লাভের ঘটনাটুকুই সত্য, ইসমাইলের পরাজয়ের গ্লানি ঢাকবার জন্য বাকীটুকু ইসমাইলের ভক্তরা পরে রচনা করেছেন।

ইসমাইলের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তায় ঈর্ষ্যান্বিত হয়ে ঘোড়াঘাটের হিন্দু শাসনকর্তা ভান্দসী রায় তাঁর নামে বারবক শাহের কাছে মিথ্যা নালিশ করেছিলেন এবং সেই অভিযোগের উপর নির্ভর করে বারবক ইসমাইলের প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন, এ কথা সত্য বলে মনে হয় না। বারবক শাহের মত

একজন শ্রেষ্ঠ সুলতান উপযুক্ত তদন্ত না করে একজন হিন্দু কর্মচারীর উস্কানিতে ইসমাইলের মত একজন বীর সেনাপতির প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন, এরকম ব্যাপার সম্ভবপর বলে মনে হয় না। 'রিসালৎ-ই-শুহাদা'র লেখক ইসমাইলের অন্ধ ভক্ত, তাই এক্ষেত্রে তাঁর উক্তির উপর নির্ভর করা চলে না। সম্ভবত ইসমাইল সত্যিই "কামরূপের" রাজার সঙ্গে যোট বেঁধে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছিলেন। তাই বারবক তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন।

যাহোক, ইসমাইল তাঁর মৃত্যুর পরে যে মর্যাদা ও সম্মান অর্জন করেছেন, তা সত্যিই অসামান্য। মুসলমানেরা তাঁকে শুধু গাজী আখ্যা দেন নি, পীর বলে পূজা করেছেন। কালক্রমে পীর ইসমাইল হিন্দু জনসাধারণের মনেও শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছেন। কাঁটাদুয়ার ও মান্দারণে ইসমাইলের সমাধি শুধু মুসলমানের নয়, হিন্দুরও তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছিল। এই দুই সমাধি আজ পর্যন্ত বর্তমান আছে। মধ্যযুগের বহু মঙ্গলকাব্যের দিক্‌বন্দনা পালায় কবিরা বিভিন্ন দেবদেবী ও পীরের সঙ্গে পীর ইসমাইলেরও বন্দনা করেছেন। ইসমাইল গাজীর কাহিনী নিয়ে বহু কবি কাব্য রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে একজন গোরক্ষবিজয়-রচয়িতা শেখ ফয়জুল্লাহ। শেখ ফয়জুল্লাহ তাঁর 'সত্যপীরের পাঁচালী'র ভূমিকায় লিখেছেন—

ঘোড়াদূরের পীর ইসমাইল গাজী।
গাজীর বিজয়ে সেহ মোক হইল রাজী॥

ইসমাইলের অধিনায়কত্বে বারবকের সৈন্যবাহিনী যে সমস্ত যুদ্ধাভিযান করেছিল, তার কিয়ৎপরিমাণে অতিরঞ্জিত বর্ণনা পেলাম 'রিসালৎ-ই-শুহাদা'য়। কিন্তু বারবক ত্রিহুতেরও কতকাংশ জয় করেছিলেন। এর বিস্তৃত বিবরণ পাই মুল্লা তকিয়ার বয়াজে। এই সূত্রটির পরিচয় আমরা আগেই দিয়েছি। মুল্লা তকিয়া এ সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তার বঙ্গানুবাদ নীচে দেওয়া হ'ল।

"সুলতান ফিরোজ শাহ তোগলক (বাংলার) সুলতান শামসুদ্দীন হাজী ইলিয়াসকে তাঁর অধীনে এনেছিলেন এবং ত্রিহুত নিজের অধিকারভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু ১২১ বছর পরে, অর্থাৎ ৮৭৫ সালে (হিজরায়) বাংলার সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক শাহ তাঁর সৈন্যবাহিনীতে বহু আফগান—যারা সংখ্যায় পঙ্গপালের চেয়েও বেশী—সংগ্রহ করে ত্রিহুত রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন। ঐ রাজ্য (জৌনপুরের) সুলতান হোসেন শাহ শর্কীর অধিকারভুক্ত ছিল। অনেক যুদ্ধের পরে তিনি (বারবক শাহ) সম্পূর্ণভাবে জয়ী হলেন।

ফলে হাজীপুর দুর্গ এবং তার সন্নিহিত অঞ্চলগুলি, যে পর্যন্ত হাজী ইলিয়াসের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সবই তাঁর অধিকারে এল। এর সঙ্গে উত্তরে বুড়ি গণ্ডক নদী পর্যন্ত তাঁর রাজ্যের সীমা বিস্তৃত হল। এই অংশ ত্রিহুতের জমিদারের হাতে ছিল (অর্থাৎ ত্রিহুতের জমিদার বারবক শাহের অধীনে করদ ভূস্বামী হিসাবে এই অংশ শাসন করতে লাগলেন)। এখানে তিনি (বারবক শাহ) কেদার রায়কে রাজস্ব আদায় ও সীমান্ত রক্ষার জন্য তাঁর নায়েব নিযুক্ত করলেন, কিন্তু জমিদারের পুত্র ভরতসিংহ তাঁকে উচ্ছেদ করে নিজে প্রভু হয়ে বসল। সুলতান বারবক শাহ এই খবর শোনবামাত্র জমিদারকে শাস্তি দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু (ত্রিহুতের) রাজা তাঁর কাছে বশ্যতা স্বীকার করলেন এবং সুলতানকে আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন।"

এই বিবরণ থেকে কয়েকটি অত্যন্ত মূল্যবান সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। এই সময়ে ত্রিহুতের রাজনৈতিক অবস্থা যে কী ছিল, এ পর্যন্ত তা সঠিক ভাবে জানা যায় নি। চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাংলার সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ত্রিহুত জয় করেছিলেন। কিন্তু দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ তোগলক তাঁর কাছ থেকে ঐ অঞ্চল জয় করে নেন। তোগলক বংশের প্রতিপত্তি হ্রাস পেলে তাঁদের সাম্রাজ্যের অধিকাংশই পরহস্তগত হয়ে যায়। এই সময় জৌনপুরের সুলতানেরা প্রবল হয়ে ওঠেন এবং তাঁরাই ত্রিহুত অধিকার করেন। ইব্রাহিম শাহ শর্কীর আমলে ত্রিহুতে জৌনপুরের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং অনেকদিন তা অক্ষুণ্ণ থাকে।* কিন্তু শর্কী বংশের শেষ সুলতান হোসেন শাহের অক্ষমতার জন্য তাঁর আমলে জৌনপুর সাম্রাজ্য ভেঙে খান্ খান্ হয়ে যায়। ফলে ত্রিহুত রাজ্যেরও অধিকারী পরিবর্তন ঘটে। বিহারের ভাগলপুর ও মুঙ্গের প্রভৃতি অঞ্চলে বাংলার সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহ্মুদ শাহের শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ত্রিহুত বাংলার সুলতানদের অধিকারে ছিল বলে কোন কোন ঐতিহাসিক অনুমান

* 'তারিখ-ই-মুবারক-শাহী' থেকে জানা যায় যে, স্বাধীন জৌনপুর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মালিক সারওয়ারই চতুর্দশ শতকের শেষ দশকে ত্রিহুত জয় করে তাকে জৌনপুর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু প্রথম দিকে ত্রিহুতের উপর জৌনপুরের অধিকার খুব সুদৃঢ় ছিল না। ইব্রাহিম শর্কী জৌনপুরের সুলতান হয়ে দু'বার ত্রিহুতে অভিযান করে বিদ্রোহী রাজাদের পর্যুদস্ত করেন। তার ফলে তাঁরই রাজত্বকালে ত্রিহুতে জৌনপুরের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

করেছিলেন। এই অনুমান যে সত্য, মুল্লা তকিয়ার বয়াজ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, মুল্লা তকিয়ার উক্তি যে অভ্রান্ত, তারই বা প্রমাণ কী? তারও প্রমাণ আছে। মিথিলা বা ত্রিহুতের রাজা ভৈরবসিংহের রাজত্বকালে বিখ্যাত স্মার্ত গ্রন্থকার বর্ধমান উপাধ্যায় তাঁর 'দণ্ডবিবেক' লেখেন। ভৈরবসিংহের পিতা নরসিংহের ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে। ভৈরবসিংহ স্বয়ং ১৪৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন, কারণ তাঁর কতকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে, যেগুলিতে স্পষ্টই লেখা আছে যে ভৈরবসিংহের রাজত্বের ১৬শ বর্ষে ও ১৪১১ শকাব্দে (১৪৮৯-৯০ খ্রীঃ) সেগুলি উৎকীর্ণ হয়েছিল। সুতরাং ভৈরবসিংহ বারবক শাহের সমসাময়িক। 'দণ্ডবিবেকের' সূচনায় ভৈরবসিংহের একটি প্রশস্তি আছে। তার একটি শ্লোক এই,

> যঃ শ্রীহুসেনমপনীতসমস্তসেন-
> মাত্মীয় সৈনিকমিবাত্মমতে নিযুংক্তে।
> গৌড়েশ্বরপ্রতিশরীরমতিপ্রতাপঃ (?)
> কেদারবায়মবগচ্ছতি দারতুল্যম্॥

(ছাপা বইয়ে 'শ্রীহুসেন'-এর জায়গায় 'শ্রীকসেন' পাঠ মেলে।)

এই শ্লোকের শেষ দুই ছত্রে বলা হয়েছে যে রাজা ভৈরবসিংহ গৌড়েশ্বরের প্রতিশরীর অতিপ্রতাপ কেদার রায়কে স্ত্রীলোকের মত দেখেন।

৺মনোমোহন চক্রবর্তী 'প্রতিশরীর'-এর অর্থ করেছিলেন 'প্রতিনিধি' (JASB, 1915, p. 527 দ্রঃ)। এই অর্থ যে ঠিক, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মিথিলাতে যে এই সময় তৎকালীন গৌড়েশ্বর বারবক শাহের কেদার রায় নামে একজন প্রতিনিধি ছিলেন, সে কথা মুল্লা তকিয়ার বয়াজে লেখা আছে, 'দণ্ডবিবেকে' এরই সমর্থন পাওয়া গেল। উপরে উদ্ধৃত শ্লোকে যে 'হুসেন'-এর উল্লেখ আছে, তিনি বোধ হয় হুসেন শাহ্ শর্কী। যা হোক, 'দণ্ডবিবেকে'র মত প্রামাণ্য সূত্রের দ্বারা সমর্থিত হওয়ায় এবং বারবক শাহের রাজত্বকালের একটি বছর (৮৭৫ হিঃ) সঠিকভাবে উল্লিখিত হওয়ায় এ বিষয়ে মুল্লা তকিয়ার বয়াজের উক্তিকে সঠিক্ বলেই গ্রহণ করতে হবে।

সুতরাং বারবক শাহ মিথিলা বা ত্রিহুত অধিকার করেছিলেন বলে জানা যাচ্ছে।

কেবলমাত্র যুদ্ধবিগ্রহে সাফল্যলাভ ও রাজ্যজয়ই বারবক শাহের একমাত্র কীর্তি নয়। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব কোন্‌খানে, সেই বিষয়ই এবার আলোচনা করা হবে।

বারবক শাহ্ নিজে ছিলেন মহাপণ্ডিত। তাঁর বিভিন্ন শিলালিপিতে তাঁর নাম এবং বিভিন্ন রাজকীয় উপাধির সঙ্গে আরও দুটি উপাধি যুক্ত দেখা যায়,— অল-ফাজিল এবং অল-কামিল। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক আহ্‌মদ হাসান দানী বলেন, "The titles al-Fāḍil and al-Kāmil suggest that he attained the highest academic qualifications."

কিন্তু বারবক শাহ্ শুধুমাত্র নিজে পাণ্ডিত্য অর্জন করে সন্তুষ্ট ছিলেন না, তিনি অন্যান্য পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষণ করতেন। শুধু পণ্ডিত নয়, কবিরাও তাঁর পৃষ্ঠপোষণ লাভ করতেন। আর শুধু মাত্র মুসলমান কবি-পণ্ডিত নয়, হিন্দু কবি-পণ্ডিতদের উপরও তিনি মুক্তহস্তে দাক্ষিণ্যবর্ষণ করতেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষিত কবি-পণ্ডিতদের মধ্যে এমন কয়েকজন রয়েছেন, শত শত বৎসরের ব্যবধানেও যাঁদের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অম্লান রয়েছে। এঁদের নাম নীচে দেওয়া হল।

(ক) বিশারদ

বারবক শাহের রাজত্বকাল সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরা এক বিশারদের একটি বচন উদ্ধৃত করেছি। বচনটি যেভাবে "তথা গৌড়প্রৌঢ়পারবুঢে বারবকে রাজ্যং শাসতি" দিয়ে সুরু হয়েছে, তার থেকে মনে হয়, বিশারদ বারবক শাহের সাক্ষাৎ পৃষ্ঠপোষণ লাভ করেছিলেন। ৺ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে এই বিশারদ বিখ্যাত নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক বাসুদেব সার্বভৌমের পিতা। এই মত সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত।

(খ) রায়মুকুট

রায়মুকুট উপাধিধারী বৃহস্পতি মিশ্র বাংলার একজন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। তাঁর লেখা অমরকোষের টীকা 'পদচন্দ্রিকা' অত্যন্ত বিখ্যাত। এছাড়া তিনি গীতগোবিন্দ, কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, মেঘদূত ও শিশুপালবধের উপরও টীকা লিখেছিলেন। তাঁর লেখা স্মৃতিগ্রন্থ 'স্মৃতিরত্নহার' "বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ইতিহাসে একখানি অমূল্য রত্ন।" বৃহস্পতির

কৌলিক পদবী ছিল মহিন্তাপনীয়। তাঁর বিরাট পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি জীবনের বিভিন্ন সময়ে মিশ্র, আচার্য, কবিচক্রবর্তী, পণ্ডিতচূড়ামণি, মহাচার্য, রাজপণ্ডিত, পণ্ডিতসার্বভৌম এবং রায়মুকুট—এতগুলি উপাধি লাভ করেন। কুমারসম্ভবটীকা, রঘুবংশটীকা ও শিশুপালবধটীকার সূচনাতে বৃহস্পতি গৌড়েশ্বরের কাছে তাঁর প্রচুর প্রতিষ্ঠা লাভের কথা বলেছেন। 'স্মৃতিরত্নহারে'র ভূমিকায় তিনি লিখেছেন রায় রাজ্যধর উপাধিধারী একজন সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষের কাছে তিনি আচার্য এবং কবিচক্রবর্তী উপাধি পেয়েছিলেন। তাঁর 'পদচন্দ্রিকা'র ভূমিকা থেকে জানা যায় যে, গৌড়াধিপের কাছে তিনি "পণ্ডিতসার্বভৌম" উপাধি লাভ করেছিলেন এবং কোন একজন "নৃপ" তাঁকে উজ্জ্বল মণিময় হার, দ্যুতিমান দুটি কুণ্ডল, রত্নখচিত দশ আঙুলের আংটি দিয়ে হাতীর পিঠে চড়িয়ে কনকস্নান † অর্থাৎ স্বর্ণ-কলসের জলে স্নান করিয়ে ছাতা ও ঘোড়া সমেত শোভাময় "রায়মুকুট" উপাধি দান করেছিলেন।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত সকলের ধারণা ছিল, রাজা গণেশের পুত্র জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহই একমাত্র গৌড়েশ্বর, যিনি বৃহস্পতিকে পৃষ্ঠপোষণ ও উপাধিদান করেছিলেন। এরকম ধারণার কারণ,

(১) 'স্মৃতিরত্নহারে'র ভূমিকায় বৃহস্পতি লিখেছেন তাঁর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক রায় রাজ্যধর "জল্লালদীন" (জলালুদ্দীন) নৃপতির সেনাধিপতি ছিলেন।

* 'পদচন্দ্রিকা'র ভূমিকা থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ আমরা নীচে উদ্ধৃত করলাম

> ভোগ্যভূষন্মণিপুঞ্জমঞ্জুলরুচং হারং জ্বলৎকুণ্ডলে
> রত্নৌঘস্ফুরিতা দশাঙ্গুলিজুষঃ শোচিষ্মতীকর্ম্মিকাঃ।
> যঃ প্রাপ দ্বিরদোপবিষ্টকনকস্নানৈরবিন্দৎ পুনঃ-
> চ্ছত্রৈতিস্তুরগৈশ্চ রায়মুকুটাভিখ্যামভিখ্যাবতীম্।
>
> পুণ্যাং পণ্ডিতসার্ব্বভৌমপদবীং গৌড়াবনীবাসবাদ
> সং প্রাপ্য প্রথিতো বৃহস্পতিরিতি শ্মালোকবাচস্পতিঃ।
> কোষস্যামরনির্ম্মিতস্য বিবিধব্যাখ্যানদীক্ষাগুরু,
> সানন্দং পদচন্দ্রিকাং স কুরুতে টীকামিমাং কীর্ত্তয়ে।

† এর থেকে বোঝা যায় হিন্দুদের অনেক আচার-অনুষ্ঠান বাংলার মুসলমান নৃপতিরা গ্রহণ করেছিলেন। "কনকস্নান" বিশুদ্ধ হিন্দু অনুষ্ঠান। উড়িষ্যার 'মাদলা পাঞ্জী'তে লেখা আছে যে উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্র গোবিন্দ ভোই বিদ্যাধরকে কনকস্নান করিয়ে পাত্রের পদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন।

(২) 'পদচন্দ্রিকা'র প্রথমাংশে এই অনুচ্ছেদটি পাওয়া যায়।

"ইদানীং চ শকাব্দাঃ ১৩৫৩ দ্বাত্রিংশদব্দাধিকপঞ্চবর্ষোত্তরচতুঃসহস্রবর্ষাণি কলিসন্ধ্যায়া ভূতানি ৪৫৩২।"

১৩৫৩ শকাব্দ (=১৪৩১-৩২ খ্রীঃ) জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের রাজত্বের অন্তর্গত।

কুমারসম্ভবটীকা, রঘুবংশটীকা, ও শিশুপালবধটীকা প্রভৃতি বৃহস্পতির প্রথম জীবনের গ্রন্থগুলিতে যে গৌড়াধিপের উল্লেখ আছে, তিনি জলালুদ্দীনের সঙ্গে অভিন্ন হতে পারেন। বৃহস্পতির 'পদচন্দ্রিকা'র প্রথমাংশ জলালুদ্দীনের রাজত্বকালেই লেখা হয়। কিন্তু 'পদচন্দ্রিকা' সম্পূর্ণ হয়েছিল অনেক পরে—১৩৯৬ শকাব্দে। ৺দীনেশচন্দ্র ভট্টাচায একটি পুঁথিতে 'পদচন্দ্রিকা'র এই রচনাসমাপ্তি-কালবাচক শ্লোকটি আবিষ্কাব করেছিলেন,

সেনানীবদনগ্রহাগ্নিবিধুভিঃ শাকে মিতে হায়নে
শুক্রে মাস্যসিতে দিনাধিপতিথৌ সৌরেহ্নি মধ্যন্দিনে।
সদ্যঃ সংশয়সঞ্চয়াপচয়কৃদ্ব্যাখ্যাবিশেষোজ্জ্বলা
পর্য্যাপ্তা পদচন্দ্রিকাভবদিয়ং সংরক্ষণীয়া বুধৈঃ॥

বৃহস্পতির প্রথম দিককার বইগুলিতে তাঁর বিভিন্ন উপাধি উল্লিখিত হয়েছে—কিন্তু 'পণ্ডিতসার্বভৌম' ও 'রায়মুকুট' উপাধির ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ নেই। সুতরাং অনিবার্যভাবেই এই সিদ্ধান্ত আসে যে, ঐ বইগুলি লেখার পরে ও 'পদচন্দ্রিকা' সম্পূর্ণ হবার কিছু আগে তিনি ঐ উপাধি দুটি পান। ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন বারবক শাহ বাংলার সুলতান ছিলেন, তখন তিনিই যে বৃহস্পতিকে ঐ দুটি উপাধি দিয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ'সম্বন্ধে পরিশিষ্টে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি।

(গ) মালাধর বসু

মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় বাংলা সাহিত্যের অমর গ্রন্থ। তিনি "গুণরাজ খান" নামেই বেশী পরিচিত। তিনি নিজে বলেছেন গৌড়েশ্বর তাঁকে এই উপাধি দিয়েছিলেন—"গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান।" অনেকের ধারণা এই গৌড়েশ্বর আলাউদ্দীন হোসেন শাহ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের প্রাচীনতম পুঁথিতে (লিপিকাল ১৪৮৪ খ্রীঃ) তার এই রচনাকালবাচক শ্লোকটি পাওয়া যায়,

তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভণ।
চতুর্দশ দুই শকে হৈল সমাপন॥

১৪৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রচনা সুরু হয় এবং ১৪৮০-৮১ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রচনাকাল তো বটেই, পুঁথির লিপিকালও তার পূর্ববর্তী। সুতরাং হোসেন শাহ মালাধর বসুর পৃষ্ঠপোষক হতে পারেন না।

অনেকে বলেন শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহ মালাধরকে "গুণরাজ খান" উপাধি দিয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের আরম্ভই যখন ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে, তখন তার বেশ কিছুকাল আগে মালাধর এই উপাধি পেয়েছিলেন সন্দেহ নেই। কাব্যের সুরু থেকেই "গুণরাজ খান" ভনিতা পাওয়া যায়। অতএব য়ুসুফ শাহ নয়, বারবক শাহই মালাধরের পৃষ্ঠপোষক। তিনিই তাঁকে "গুণরাজ খান" উপাধি দান করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রচনা আরম্ভের কয়েক বছর পরেও বারবক শাহ জীবিত ছিলেন।

(ঘ) কৃত্তিবাস

এইবার আমাদের সবচেয়ে বিস্ময়কর সিদ্ধান্ত পাঠকদের কাছে উপস্থিত করছি। বাংলার বাল্মীকি কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী যাঁরাই পড়েছেন, তাঁরাই জানেন তিনি এক গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়েছিলেন এবং তাঁর কাছে বিপুল সংবর্ধনা লাভ করেছিলেন। এই গৌড়েশ্বর যে কে, তাই নিয়ে আজ ৭০ বছর ধরে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক চলে আসছে। কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের নাম করেন নি, কিন্তু তাঁর কয়েকজন সভাসদের নাম করেছেন; তাঁরা সকলেই হিন্দু। এর থেকে পণ্ডিতেরা মনে করেছিলেন এই গৌড়েশ্বরও হিন্দু এবং তিনি রাজা গণেশ ভিন্ন আর কেউ নন। আমার "প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম" গ্রন্থে আমি সর্বপ্রথম বলি যে এই রাজা মুসলমান এবং কৃত্তিবাস গণেশের রাজত্বকালের অনেক পরে—১৪৬০ থেকে ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন। সেই সিদ্ধান্তেই এখনও অবিচল আছি। উপরন্তু এই গৌড়েশ্বরের নামটিও স্থির করতে পেরেছি। ইনি আর কেউই নন, এতক্ষণ যাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করছি, সেই রুকনুদ্দীন বারবক শাহ। প্রমাণগুলি এক এক করে উপস্থাপিত করছি।

প্রথম প্রমাণ, ধ্রুবানন্দের 'মহাবংশাবলী'তে পাওয়া যায়, কৃত্তিবাসের পিতৃব্য অনিরুদ্ধের সুষেণ নামে এক প্রপৌত্র ছিলেন। কৃত্তিবাসের সম্পর্কিত পৌত্র

এই সুষেণ * যে হরিদাসের ফুলিয়া ত্যাগ করে নীলাচল যাত্রার সময় জীবিত ছিলেন, সেকথা জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল থেকে জানা যায়। জয়ানন্দ লিখেছেন,

শুনিঞা শ্রীহরিদাস চলিলা উৎকল।
ফুল্যার স্ত্রীপুরুষ কান্দে হয়্যা চঞ্চল॥
হরিদাসপ্রিয় বড় সুষেণ পণ্ডিত।
মুরারি হৃদয়ানন্দ সংসারে বিদিত॥
দুর্গাবর মনোহর মহা কুলীন। †
তাহার নন্দন সুষেণ পণ্ডিত প্রবীণ॥

(এসিয়াটিক সোসাইটির G-5398-6-c.4 নং পুঁথি থেকে উদ্ধৃত।)

আনুমানিক ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে হরিদাস ফুলিয়া ত্যাগ করে নীলাচলে যান। ঐ সময়ে সুষেণ পণ্ডিত জীবিত ছিলেন। পিতামহের সঙ্গে পৌত্রের সময়ের স্বাভাবিক ব্যবধান ৫০ বছর। এই হিসাবে ১৪৬৬ খ্রীষ্টাব্দে আমরা কৃত্তিবাসকে জীবিত পাই। তখন বারবক শাহ বাংলার সুলতান ছিলেন।

কিন্তু কৃত্তিবাস যে বারবক শাহের সভায় গিয়েছিলেন, তা বলার স্বপক্ষে এর চাইতেও ভাল প্রমাণ আছে। আত্মকাহিনীতে কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের সভাসদদের এই তালিকা দিয়েছেন,

রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগতানন্দ।
তাহার পাছে বস্যা আছেন ব্রাহ্মণ সুনন্দ॥
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ।
পাত্রমিত্রে বস্যা রাজা পরিহাসে মন॥

* বংশলতা.

মুরারি
├ অনিরুদ্ধ
│ └ লক্ষ্মীধর
│   ├ দুর্গাবর
│   └ মনোহর
│   └ সুষেণ
└ বনমালী
  └ কৃত্তিবাস

† এখানে বিশেষ লক্ষ্যণীয়, জয়ানন্দ সুষেণ পণ্ডিতের বংশের চারজন লোকের নাম করেছেন। এঁদের মধ্যে মুরারি, দুর্গাবর ও মনোহরের নাম পাশের বংশলতায় দ্রষ্টব্য। হৃদয়ানন্দের নাম অন্য কোন সূত্রে পাওয়া যায় না।

গন্ধর্ব্ব রায় বসি আছে গন্ধর্ব্ব-অবতার।
রাজসভাপূজিত তিহোঁ গৌরব আপার॥
তিন পাত্র দাণ্ডাইয়া আছে রাজপাশে।
পাত্রমিত্রে বস্যা রাজা করে পরিহাসে॥
ডাহিনে কেদার রায় বামেতে তরণী।
সুন্দর শ্রীবৎস্য আদি ধর্ম্মাধিকারিণী॥
মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর।
জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর॥

এই তালিকায় কেদার রায় ও নারায়ণের নাম পাওয়া যাচ্ছে। ১৪৬০ থেকে ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলার সুলতানের এই নামের দুজন Officer-এর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। নারায়ণ বা নারায়ণদাস ছিলেন গৌড়েশ্বরের চিকিৎসক, ভরত মল্লিক তাঁর 'চন্দ্রপ্রভা'তে বলেছেন নারায়ণের "অন্তরঙ্গ" উপাধি ছিল, বাংলার রাজাদের চিকিৎসকরাই এই উপাধি লাভ করতেন। ষোড়শ শতাব্দীর চৈতন্যচরিতকার চূড়ামণিদাস তাঁর 'গৌরাঙ্গবিজয়ে' নারায়ণদাসকে "রাজবৈদ্য" বলেছেন। নারায়ণদাসের পুত্র মুকুন্দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহের চিকিৎসক ছিলেন। হোসেন শাহের অধীনস্থ চট্টগ্রাম অঞ্চলের শাসক পরাগল খানের পিতা রাস্তি খান বারবক শাহের কর্মচারী ছিলেন। সেই নজীরে আমরা বলতে পারি, মুকুন্দের পিতা নারায়ণও সম্ভবত বারবক শাহেরই চিকিৎসক ছিলেন।

তারপর কেদার রায়। কেদার রায় যে বারবক শাহেরই কর্মচারী ছিলেন, সে কথা মুল্লা তকিয়ার বয়াজ থেকে স্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে। মুল্লা তকিয়া লিখেছেন ত্রিহুত জয় করে সেখানে বারবক শাহ "কেদার রায়কে" তাঁর নায়েব (ফার্সী ভাষায় নায়েব শব্দের মূল অর্থ প্রতিনিধি) নিযুক্ত করলেন এবং রাজস্ব আদায় ও সীমান্ত রক্ষার ভার দিলেন।

"কেদার রায়"-এর নাম বর্ধমান উপাধ্যায়ের 'দণ্ডবিবেকে'ও উল্লিখিত হয়েছে। বর্ধমান উপাধ্যায় লিখেছেন যে, তাঁর পৃষ্ঠপোষক (বারবক শাহের সমসাময়িক) রাজা ভৈরবসিংহ

গৌড়েশ্বরপ্রতিশরীরমতিপ্রতাপঃ (?)
কেদাররায়মবগচ্ছতি দারতুল্যম॥

কৃত্তিবাস যে বারবক শাহের সমসাময়িক ছিলেন, তা উপরে দেখানো হয়েছে। তার সঙ্গে মুল্লা তকিয়া ও বর্ধমানের উক্তিকে মিলিয়ে নিলে এবং বারবক শাহের বিদ্যা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণের কথা স্মরণ রাখলে—কৃত্তিবাস যে বারবক শাহেরই সভাতে গিয়েছিলেন ও তাঁরই কাছে সংবর্ধনা লাভ করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ থাকে না। বারবক শাহের বিদ্যোৎসাহিতা ও সাহিত্যানুরাগের খবর পেয়েই কৃত্তিবাস সাতটি শ্লোক নিয়ে তাঁর সভায় গিয়েছিলেন বলে মনে হয়।

কৃত্তিবাস রাজার সভাসদদের মধ্যে গন্ধর্ব রায়েরও নাম করেছেন। কায়স্থদের কুলপঞ্জীতে এক "গন্ধর্ব খান"-এর নাম পাওয়া যায়, ইনি মালাধর বসুর জ্ঞাতি এবং বাংলার সুলতানের "ধনাধ্যক্ষ" ছিলেন বলে প্রকাশ। মালাধর বসু যখন বারবক শাহের কাছে পৃষ্ঠপোষণ লাভ করেছিলেন, তখন তাঁর এই জ্ঞাতিও বারবক শাহের সমসাময়িক ছিলেন ও তাঁরই কর্মচারী ছিলেন বলে মনে হয়। এঁকেই সম্ভবত কৃত্তিবাস "গন্ধর্ব রায়" বলেছেন।

এই সমস্ত বিষয় থেকেই বোঝা যায়, কৃত্তিবাস বারবক শাহের সভাতেই গিয়েছিলেন।

বারবক শাহ যে সমস্ত মুসলমান কবি ও পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষণ করেছিলেন, তাঁদের সম্বন্ধে এতদিন কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। সম্প্রতি ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী নামে বারবক শাহের সমসাময়িক একজন পণ্ডিত কৃত একটি ফার্সী ভাষার শব্দকোষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এর নাম 'ফরঙ্গ-ই-ইব্রাহিমী', কিন্তু এটি 'শরফ্‌নামা' নামেই বিশেষভাবে পরিচিত। এই বইয়ে ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী সুলতান বারবক শাহ সম্বন্ধে এই প্রশস্তি লিপিবদ্ধ করেছেন,

"আবুল-মুজাফফর বারবক শাহ শাহ-ই-আলম (পৃথিবীপতি) হোন্ এবং তিনি তা'ই। জমশিদের রাজ্য তাঁর অধীনে থাকুক এবং তা' আছে। ......যিনি প্রার্থীকে বহু ঘোড়া দিয়েছেন। যারা পায়ে হেঁটে যায়, তারা হাজার হাজার ঘোড়া দানস্বরূপ পেয়েছে। এই মহান আবুল মুজাফফর, ইনি অনুগ্রহের সাগর, যাঁর সবচেয়ে সামান্য ও সাধারণ উপহার একটি ঘোড়া।"

এই প্রশস্তি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী বারবক শাহের পৃষ্ঠপোষণ লাভ করেছিলেন এবং তাঁর কাছে তিনি (অন্তত কয়েকটি) ঘোড়া উপহার পেয়েছিলেন। বারবক শাহ যে একজন শ্রেষ্ঠ দাতা ছিলেন, তা'ও এর থেকে বোঝা যায়। তিনি প্রার্থীদের বিশেষভাবে ঘোড়া দান

করতেন। কৃত্তিবাস তাঁর আত্মকাহিনীতে লিখেছেন, তাঁর সম্পর্কিত পিতৃব্য নিশাপতি গৌড়েশ্বরের কাছে একটি ঘোড়া উপহার পেয়েছিলেন। এই গৌড়েশ্বর নিশ্চয়ই বারবক শাহ্‌। কৃত্তিবাস যে বারবক শাহের সমসাময়িক ছিলেন, এটি তার আর একটি প্রমাণ।* ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী 'শরফ্‌নামা'তে তাঁর সমসাময়িক আরও কয়েকজন কবি ও পণ্ডিতের নাম করেছেন। নীচে এঁদের একটি তালিকা দেওয়া হল।

(১) আমীর জৈনুদ্দীন হারাওয়ী। এঁকে ফারুকী বলেছেন "রাজকবি" ("মালেকুশ শোয়ারা")।

(২) আমীর শহাবুদ্দীন হকীম কিরমানী। এঁকে ফারুকী "চিকিৎসকদের (বা জ্ঞানীদের) গর্ব" ("ইফতেখারুল হোকামা") আখ্যায় অভিহিত করেছেন। ইনিও কবি ছিলেন এবং 'ফরঙ্গ-ই-আমীর শহামুদ্দীন হকীম কিরমানী' নামে একখানি ফার্সী শব্দকোষ রচনা করেছিলেন।

(৩) মনশূর শিরাজী। ইনি ফার্সী ভাষায় কবিতা রচনা করতেন।

(৪) মালিক য়ুসুফ বিন হামিদ। ইনি কবি ছিলেন।

(৫) সৈয়দ জলাল। ইনিও কবি ছিলেন।

(৬) সৈয়দ মুহম্মদ রুকন্‌। ইনিও কবি ছিলেন।

(৭) সৈয়দ হাসান। ইনিও কবি ছিলেন।

এঁদের মধ্যে "রাজকবি" আখ্যায় অভিহিত আমীর জৈনুদ্দীন হারাওয়ী বারবক শাহের সভাকবি ছিলেন বলেই মনে হয়। অন্যদেরও বিদ্যোৎসাহী ও কাব্যামোদী সুলতান বারবক শাহের সঙ্গে যোগাযোগ থাকা অসম্ভব নয়।

---

* ডঃ হবীবুল্লাহ এক চিঠিতে আমাকে লিখেছিলেন যে ঘোড়া দেওয়া যদি বারবক শাহের রোগ-বিশেষ হয়, তা'হলে কৃত্তিবাসকেও তিনি ঘোড়া দিলেন না কেন? তাঁর প্রশ্নের উত্তর কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীর মধ্যেই রয়েছে ; আত্মকাহিনীতে লেখা আছে যে কৃত্তিবাসকে চন্দনচর্চিত করে পাটের পাছড়া দেওয়ার পরে "রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান।" কৃত্তিবাস তখন দান গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হয়ে বলেন, "কার কিছু নাঞি লই করি পরিহার॥" কৃত্তিবাস যখন রাজার কাছে কোন দান নেননি, তখন তাঁর কাছ থেকে তাঁর ঘোড়া পাবার কোন প্রশ্ন ওঠে না। তিনি রাজার কাছ থেকে যৎসামান্য মূল্যের "পাটের পাছড়া" নিয়েছিলেন ; কিন্তু "পাটের পাছড়া" দান নয়, সম্মান-অভিজ্ঞান, কৃত্তিবাসের কবিত্বের স্বীকৃতির প্রতীক। বিশ্বভারতীর সমাবর্তনে কোন বিশিষ্ট গুণী ব্যক্তিকে "দেশিকোত্তম" উপাধি দেওয়ার সময় যে উত্তরীয় দেওয়া হয়, এই "পাটের পাছড়া" তারই সমপর্যায়ভুক্ত।

(ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকীর "শরফ্‌নামা"র পুঁথি ঢাকার আলীয়াহ মাদ্রাসাহ্‌ লাইব্রেরীতে আছে। এর বিবরণ করাচী থেকে প্রকাশিত 'উর্দূ' নামক পত্রিকায় ১৯৫২ খ্রীঃর অক্টোবর মাসের সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে ডঃ আবদুল করিম তাঁর Social History of the Muslims in Bengal বইয়ে এর কয়েকটি তথ্যের উল্লেখ করেছেন। এই বই থেকেই আমার উপরের বিবরণ সঙ্কলিত হয়েছে।)

আশা করি, বারবক শাহের অসামান্যতা এবং বাংলার ইতিহাসে তাঁর বিশিষ্ট স্থান এখন সকলেই উপলব্ধি করবেন। বাংলার পণ্ডিত ও কবিদের পৃষ্ঠপোষণ করে, উৎসাহ দিয়ে তিনি সর্বকালের বাঙালীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের দু'জন শ্রেষ্ঠ কবি—কৃত্তিবাস ও মালাধর বসু তাঁর পৃষ্ঠপোষণ লাভ করেছিলেন, এটি একটি বিরাট উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। আরও একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা দরকার মনে করি। প্রচলিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসগ্রন্থগুলিতে লেখা আছে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে গৌড় দরবার কর্তৃক বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণ সুরু হয় এবং বিভিন্ন সুলতান এই সময়ে বিভিন্ন কবি ও সাহিত্যিককে সংবর্ধিত করেছিলেন। কিন্তু আসলে পণ্ডিত বা কবিদের পৃষ্ঠপোষণের সবটুকুই প্রায় বারবক শাহ একা করেছেন। তাঁর আগে জলালুদ্দীনের কাছে বৃহস্পতি মিশ্রের প্রতিষ্ঠালাভ ভিন্ন গৌড়েশ্বরের কাছে কবি-পণ্ডিতের পৃষ্ঠপোষণ লাভের আর কোন উদাহরণ পাই না; তাঁর পরবর্তী সুলতানদের মধ্যেও হোসেন শাহ ও তাঁর বংশধরদের রাজত্বকালের দুই একটি নিদর্শন (?) ছাড়া অন্য কোন সুলতানের এই বিষয়ে সক্রিয়তার কোন উদাহরণ পাই না। হোসেন শাহ এবং তাঁর বংশধররাও এ ব্যাপারে বারবক শাহের কাছে একান্তই নিষ্প্রভ।

হিন্দু কবি-পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষণ থেকে বারবক শাহকে অসাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন মনে করলে ভুল হবে না। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মত অসাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন নরপতি বাংলার ইতিহাসে তো বটেই, ভারতবর্ষের ইতিহাসেও দুর্লভ। তিনি যেমন প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ফার্সী ভাষায় নিজের মুদ্রা প্রকাশ করেছেন, তেমনি হিন্দুদের ভাষা সংস্কৃতেও মুদ্রা প্রকাশ করেছেন। অধ্যাপক সৈয়দ হাসান আসকারির কাছে একবার রুকনুদ্দীন বারবক শাহের ছয়টি নতুন মুদ্রা পরীক্ষার জন্য এসেছিল, তাদের মধ্যে একটির ভাষা আগাগোড়াই সংস্কৃত।

কিন্তু বারবক শাহের উদার অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের সবচেয়ে বড় নিদর্শন দেওয়া এখনও বাকী রয়েছে। তিনি হিন্দুদের তাঁর রাজ্যের উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করতেন। এই পদগুলির মধ্যে অনেকগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে সমস্ত হিন্দুকে তিনি বিভিন্ন পদে নিয়োগ করেছিলেন, নীচে তাঁদের একটি তালিকা দেওয়া হল।

(১) অনন্ত সেন

ইনি বারবক শাহের চিকিৎসক। এঁর পুত্র শিবদাস সেন চরকের দ্রব্য-গুণের বিখ্যাত টীকাকার। দ্রব্যগুণের টীকায় শিবদাস সেন স্পষ্টই বলেছেন, তাঁর পিতা অনন্ত সেন বারবক শাহের কাছে "অন্তরঙ্গ" অর্থাৎ খাস চিকিৎসকের পদবী লাভ করেন,

যোঽন্তরঙ্গপদবীং দুরবাপাং, ছত্রমপ্যতুলকীর্ত্তিমবাপ।
গৌড়ভূমিপতিবার্ব্বকশাহাৎ, তৎসুতস্য কৃতিনঃ কৃতিরেষা॥

(২) কেদার রায়

মুল্লা তকিয়ার বয়াজ, বর্ধমান উপাধ্যায়ের দণ্ডবিবেক ও কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীতে এঁর নাম পাওয়া যায়।

ইনি বারবক শাহের একজন বিশিষ্ট সভাসদ ছিলেন। কৃত্তিবাস যখন গৌড়েশ্বরের সভায় যান, তখন অন্য সভাসদের সঙ্গে এঁকেও সভায় বসে থাকতে দেখেছিলেন। বারবক শাহ এঁকে ত্রিহুতে তাঁর প্রতিনিধি (প্রতিশরীর) বা নায়েব নিযুক্ত করে পাঠান এবং রাজস্ব আদায়ের ভার অর্পণ করেন। কৃত্তিবাস বোধহয় তার আগেই গৌড়-রাজসভায় গিয়েছিলেন।

(৩) ভান্দসী রায়

'রিসালৎ-ই-শুহাদা' অনুসারে ইনি বারবক শাহের রাজ্যের সীমান্তে, কাঁটাদুয়ার থেকে কয়েক ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে করতোয়া নদীর তীরে ঘোড়া-ঘাট অঞ্চলে দুর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন; ইনিই ইসমাইলের বিরুদ্ধে বারবক শাহের কাছে অভিযোগ করেন, যার ফলে ইসমাইলের প্রাণদণ্ড হয়। বারবক যে হিন্দু ভান্দসী রায়ের অভিযোগ অনুসারে বিচার করে মুসলমান ইসমাইলকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন, এর থেকে তাঁর অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

(৪) **বিশ্বাস রায়**

ইনি রায়মুকুট বৃহস্পতি মিশ্রের পুত্র। রায়মুকুটের 'পদচন্দ্রিকা'র সূচনায় তাঁর পুত্রদের সম্বন্ধে এই বর্ণনা পাওয়া যায়,

যৎপুত্রা নৃপমন্ত্রিমৌলিমণয়ো বিশ্বাসরায়াদয়ঃ
খ্যাতা দিগ্‌জয়িনামপীহ জয়িনো লোকে কবীন্দ্রাশ্চ যে।
ব্রহ্মাণ্ডামরপাদপাদিসহিতং যেঽতুস্তুলাপুরুষং
তত্তদ্‌গ্রন্থবিশেষনির্ম্মিতকৃতঃ কৃৎস্নেষু শাস্ত্রেষু তে॥

(যাঁর বিশ্বাস রায় প্রভৃতি পুত্রেরা রাজার মন্ত্রীদের মধ্যে মুকুটমণি, দিগ্‌-বিজয়ী পণ্ডিত ও কবি হিসাবে যাঁরা পৃথিবীতে বিখ্যাত, যাঁরা ব্রহ্মাণ্ড, কল্পতরু ও তুলাপুরুষ দান অনুষ্ঠান করেছেন এবং নানা শাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করিয়েছেন।)

বিশ্বাস রায় রাজার অন্যতম মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বলে এই শ্লোক থেকে জানা যায়। বিশ্বাস রায়ের ভ্রাতারাও যে রাজার মন্ত্রীদের মধ্যে মুখ্য ছিলেন, তা'ও এই শ্লোকটিতে বলা হয়েছে। কিন্তু তাঁদের নাম বা বিস্তৃত পরিচয় জানা যায় না। যাহোক্, 'পদচন্দ্রিকা' ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়। সুতরাং বিশ্বাস রায় ও তাঁর ভ্রাতারা যে তৎকালীন গৌড়েশ্বর বারবক শাহেরই মন্ত্রী ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শ্লোকটিতে আরও বলা হয়েছে, বিশ্বাস রায় ও তাঁর ভ্রাতারা পণ্ডিতদের দিয়ে নানা শাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করিয়েছিলেন। এইরকম একজন পণ্ডিতের নাম জানা গিয়েছে। ইনি মহাভারতের বিখ্যাত টীকাকার অর্জুন মিশ্র। অর্জুন মিশ্র তাঁর 'মোক্ষধর্মার্থদীপিকা'তে বলেছেন, তিনি গৌড়েশ্বরের মহামন্ত্রী বিশ্বাস রায়ের অনুজ্ঞা পেয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন,

গৌড়েশ্বরমহামন্ত্রিশ্রীমদ্বিশ্বাসরায়তঃ।
লব্ধানুজ্ঞেন লিখিতা মোক্ষধর্মার্থদীপিকা॥

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, এই বিশ্বাস রায়ই যে রায়মুকুটের পুত্র বিশ্বাস রায়, তার প্রমাণ কী? তারও প্রমাণ আছে। অর্জুন মিশ্রের আর একজন পৃষ্ঠপোষকের নাম সত্য খান। সত্য খান উপাধিধারী একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বারবক শাহের রাজত্বকালেই বর্তমান ছিলেন, এঁর কথা এক্ষুনই আমরা বলব। সুতরাং অর্জুন মিশ্রের পৃষ্ঠপোষক বিশ্বাস রায়ও বারবক শাহেরই সমসাময়িক

এবং তাঁরই মহামন্ত্রী। সুতরাং তিনি রায়মুকুটের পুত্র ভিন্ন আর কেউ হতে পারেন না।

(৫) **সত্য খান** বা **শুভরাজ খান**

এঁর প্রকৃত নাম কুলধর, জাতিতে ইনি সুবর্ণবণিক। এঁর আজ্ঞায় গোবর্ধন নামে একজন ব্রাহ্মণ ১৩৯৫ শকাব্দ বা ১৪৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দে 'পুরাণসর্বস্ব' নামে একটি গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় গোবর্ধন বলেছেন, কুলধর গৌড়েশ্বরের কাছে প্রথমে সত্য খান এবং পরে শুভরাজ খান উপাধি লাভ করেন,

শ্রীমদ্ গৌড়মহীমহীপতিপতিপ্রাপ্তপ্রসাদোদয়ঃ
পুণ্যাৎ প্রাক্তনকর্মণোঽতিপদবী শ্রীসত্যখানাঙ্কিতা।
পশ্চাৎ শ্রীশুভরাজখানপদবী লব্ধা ধরামণ্ডলে
জীয়াদ্ধর্মধুরন্ধরঃ কুলধরো ধীরো গভীরো গুণৈঃ॥

(মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী, সুকুমার সেন, পৃঃ ১৬-১৭ দ্রষ্টব্য।)

গৌড়েশ্বর কর্তৃক বারবার এই উপাধি দান থেকে মনে হয়, কুলধর তৎকালীন গৌড়েশ্বর বারবক শাহের অধীনে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। বারবক শাহ্ নিজে যেমন বিদ্যা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তেমনি তাঁর মন্ত্রী ও কর্মচারীদের মধ্যে কেউ কেউ বিদ্যা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণ করতেন। বিশ্বাস রায় ও তাঁর ভ্রাতারা এবং শুভরাজ খান এর দৃষ্টান্ত। এক্ষেত্রে সম্ভবত তাঁদের উপর সুলতানের প্রভাবই কার্যকরী হয়েছিল।

(৬) **নারায়ণদাস**

ইনিও পঞ্চদশ শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক। এঁর এক পুত্র মুকুন্দ হোসেন শাহের চিকিৎসক হন। মুকুন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরহরি সরকার এবং পুত্র রঘুনন্দন। মুকুন্দ, নরহরি ও রঘুনন্দন তিনজনেই চৈতন্যদেবের পার্ষদ ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে শেষোক্ত দুজন বাংলার বৈষ্ণব-মহলে বিশেষ সম্মান ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। বিখ্যাত ভরত মল্লিক বলেছেন, নারায়ণদাস "অন্তরঙ্গ" পদবী অর্জন করেছিলেন। আগেকার দিনে গৌড়েশ্বরের

চিকিৎসকরাই "অন্তরঙ্গ" উপাধি পেতেন। চৈতন্যচরিতকার চূড়ামণিদাস নারায়ণদাসকে "রাজবৈদ্য" বলেছেন। নারায়ণদাস যে বারবক শাহের সমসাময়িক ছিলেন, তা আমরা আগেই দেখিয়েছি। কৃত্তিবাস তাঁকে গৌড়েশ্বরের সভায় বসে থাকতে দেখেছিলেন। সুতরাং তিনি বারবক শাহেরই "অন্তরঙ্গ" ছিলেন।

এখানে একটা কথা আছে। অনন্ত সেনও বারবক শাহের "অন্তরঙ্গ" ছিলেন। সেইজন্য নারায়ণ ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন না, এমন কথা কেউ কেউ বলতে পারেন। কিন্তু বারবক শাহের মত একজন প্রবল প্রতাপান্বিত গৌড়েশ্বরের দু'জন "অন্তরঙ্গ" বা খাস চিকিৎসক থাকা মোটেই অসম্ভব ব্যাপার নয়। তাছাড়া প্রথমে একজন এবং পরে একজন ঐ পদে নিযুক্ত হতে পারেন।

(৭)-(১৪) জগদানন্দ রায়, সুনন্দ, কেদার খাঁ, গন্ধর্ব রায়, তরনী, সুন্দর, শ্রীবৎস্য ও মুকুন্দ

এই নামগুলি কেবলমাত্র কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীতে পাওয়া যায়। এঁদের সঙ্গে পূর্বোল্লিখিত কেদার রায় ও নারায়ণের নামও রয়েছে। এইসব সভাসদেরা সকলেই হিন্দু বলে রাজা নিজেও হিন্দু, এই ধারণা অনেক গবেষক করেছিলেন। কিন্তু এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই রাজা বারবক শাহ ভিন্ন আর কেউ নন। বারবক শাহ যে হিন্দুদের প্রতি কতখানি অনুকূল মনোভাব-সম্পন্ন ছিলেন, তার পরিচয় এতক্ষণ আলোচনার পরে সকলেই পেয়েছেন। কেদার রায় ও ভান্দসী রায়কে তিনি তো রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। তাঁর চিকিৎসার ভারও তিনি হিন্দুদের উপরেই অর্পণ করেছিলেন। সুতরাং তাঁর সভা যে হিন্দু সভাসদে পরিপূর্ণ হবে, তাতে বিস্ময়ের কারণ কিছু নেই। অবশ্য কৃত্তিবাস যাঁদের নাম করেছেন, মাত্র সেই ক'জনই যে গৌড়েশ্বরের সভায় ছিলেন না, তা বলাই বাহুল্য। আরও লোক যে ছিল, তা'ও তিনি বলেছেন। তাদের মধ্য থেকে তিনি বাছা বাছা মাত্র আট নয় জনের নাম করেছেন। এঁদের মধ্যে "কেদার খাঁ" হিন্দু না মুসলমান, তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। কেদার খাঁ= **Qadar khan** হতে কোন বাধা নেই। বারবক শাহের পিতা নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের ময়মনসিংহের কিওয়াজোরে প্রাপ্ত ৮৬৩ হিজরার জিল্‌দ মাসের

এক শিলালিপিতে Qadar Khan নামে তাঁর এক পদস্থ কর্মচারীর নাম পাওয়া যায়। তিনিই ইনি হতে পারেন।

কৃত্তিবাসের উক্তি থেকে জানা যায়—এই সব সভাসদের মধ্যে জগদানন্দ রায় রাজার মহাপাত্র ছিলেন। রূপ গোস্বামী তাঁর 'পদ্যাবলী'তে এক জগদানন্দ রায়ের একটি পদ উদ্ধৃত করেছেন। 'পদ্যাবলী'তে গৌড়রাজসভার বহু অমাত্য ও কর্মচারীর লেখা পদ আছে। এই কারণে মনে হয়, এই জগদানন্দ রায়ই 'পদ্যাবলী'তে ধৃত ঐ পদটির লেখক। মুকুন্দ জগদানন্দ রায়ের পুত্র, তিনি ছিলেন রাজার পণ্ডিত। 'পদ্যাবলী'তে মুকুন্দ ভট্টাচার্যের তিনটি পদ মেলে, ইনিই বোধ হয় তিনি। মুসলমান রাজা বারবক শাহেরও যে সভাপণ্ডিত ছিল, তাতে এখন আর কারো নিশ্চয়ই বিস্ময় লাগবে না, কারণ বারবক শাহের পাণ্ডিত্য, বিদ্যোৎসাহিতা এবং সংস্কৃত ভাষায় অনুরাগের বহু নিদর্শন আমরা এপর্যন্ত পেয়েছি। বারবকের পৃষ্ঠপোষিত বৃহস্পতি মিশ্রেরও অন্যতম উপাধি ছিল "রাজপণ্ডিত"। সুনন্দ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁর পদ কী ছিল তা কৃত্তিবাস বলেন নি। তরণীর পদ সম্বন্ধেও তিনি নীরব। গন্ধর্ব রায় সম্ভবত কুলগ্রন্থে বর্ণিত "গৌড়েশ্বরের ধনাধ্যক্ষ" বলে অভিহিত গন্ধর্ব খানের সঙ্গে অভিন্ন। গন্ধর্ব রায়কে কৃত্তিবাস "গন্ধর্ব অবতার" বলেছেন, এর থেকে মনে হয়—গন্ধর্ব রায় অত্যন্ত সুপুরুষ ও সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। সুন্দর ও শ্রীবৎস্য ছিলেন ধর্মাধিকারিণী অর্থাৎ বিচার-বিভাগীয় কর্মচারী। কেদার খাঁ কী পদ অধিকার করেছিলেন তা জানা যায় না, তবে গৌড়েশ্বর কৃত্তিবাসের শ্লোক শুনে প্রীত হলে তিনিই কবির মাথায় চন্দনের ছড়া ঢেলেছিলেন।

বারবক শাহের বিভিন্ন শিলালিপি থেকে তাঁর এইসব মুসলমান কর্মচারীর নাম পাওয়া যায়:—

(১) **ইকরার খান**—এঁর নাম প্রথম পাওয়া যাচ্ছে ত্রিবেণী শিলালিপিতে; তাতে এঁকে বলা হয়েছে "জামদার গৈর মহলী, সর-এ-লস্কর ওয় ওয়াজীর'অরসহ্ সাজলা মংখবাদ ওয় শহর লাওবলা"। অতঃপর এঁর নাম পাই প্রথম মহীসন্তোষ শিলালিপিতে। তৃতীয়বার এঁর নাম পাচ্ছি দ্বিতীয় মহীসন্তোষ শিলালিপিতে। চতুর্থবার নাম নয়, শুধু উপাধিটুকু তৃতীয় মহীসন্তোষ শিলালিপিতে পাওয়া যায়।

(২) **আজমল খান**—ত্রিবেণী শিলালিপিতে এঁর নাম পাওয়া যায় পূর্বোক্ত ইকরার খানের "সর-এ-খৈল" হিসাবে।

(৩) **নসরৎ খান**—দ্বিতীয় মহীসন্তোষ শিলালিপিতে এঁর নাম মেলে। এঁর পরিচয়স্বরূপ তাতে বলা হয়েছে "জঙ্গদার ওয় শিকদার মু'আমলাৎ জোর বারোর ওয় মহল্লিহা-এ দীগর"।

(৪) **খান জহান**—গৌড় শহরে এক শিলালিপিতে এঁর নাম পাওয়া যায়। এর থেকে জানা যায় যে, এই খান জহান ৮৭০ হিজরা বা ১৪৬৫-৬৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি ফটক তৈরী করিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বিভিন্ন সূত্র থেকে আমরা তিনজন খান জহানের উল্লেখ পাই, এঁরা তিনজনে একই সময়ে বর্তমান ছিলেন। প্রথম খান জহানের নাম পাওয়া যায় বাগেরহাটে প্রাপ্ত ৮৬৩ হিজরার এক শিলালিপিতে, এতে তাঁর মৃত্যুর উল্লেখ আছে। বারবক শাহের সমসাময়িক এই খান জহান দ্বিতীয় খান জহান। তৃতীয় খান জহানের নাম 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা' ও 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে' পাওয়া যায়। এই দুই বইয়ের মতে এই খান জহান ছিলেন জলালুদ্দীন ফতেহ্‌ শাহের উজীর। ফিরিশ্‌তার মতে এই খান জহান নপুংসক ছিলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খান জহান এক ব্যক্তি হওয়া অসম্ভব নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের জনৈক উজীরেরও নাম "খান-ই-জহান" ছিল বলে কোন কোন সূত্রে পাওয়া যায়।

(৫) **রাস্তি খান**—চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার অন্তর্গত জোবরা গ্রামের এক মসজিদের শিলালিপিতে এঁর নাম আছে। এর থেকে জানা যায় যে, সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক শাহের রাজত্বকালে ৮৭৮ হিজরার ২৫শে রমজান তারিখে "মজলিস আলা" রাস্তি খান এই মসজিদ তৈরী করিয়েছিলেন। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে নানা জায়গায় এই রাস্তি খানের নাম পাওয়া যায়। কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁর মহাভারতে তাঁর পৃষ্ঠপোষক পরাগল খান সম্বন্ধে বলেছেন, "রাস্তি খান তনয় বহুল গুণনিধি"। পরাগল খান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকালে চট্টগ্রাম অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন। সুতরাং তাঁর পিতা রাস্তি খান বারবক শাহের আমলে চট্টগ্রামে খুব উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলে মনে হয়। রাস্তি খান কী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তা জানা যায় তাঁর অধস্তন অষ্টম পুরুষ মুহম্মদ খানের লেখা "মক্তুল হোসেন' কাব্য থেকে। এই কাব্যে মুহম্মদ খান তাঁর বিস্তৃত বংশপরিচয় দিয়েছেন এবং লিখেছেন যে রাস্তি খান "চাটিগ্রাম দেশপতি" ছিলেন। সুতরাং রাস্তি খান এবং তাঁর পুত্র পরাগল খান উভয়েই চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন। রাস্তি খানের

বংশধররা বহুদিন পর্যন্ত চট্টগ্রাম অঞ্চল শাসন করেছিলেন। এ সম্বন্ধে পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হবে।

(৬) **অজলকা (?) খান**

এঁর নাম মেলে বারা শিলালিপিতে। তাতে এঁর পিতার নাম পাওয়া যায় বখ্‌শিশ্‌ খান এবং তাঁকে "ঢাখা খাস"-এর "সর-ই-গুমাশ্‌তাহ্‌" বলা হয়েছে। এই "ঢাখা খাস" সম্ভবত ঢাকা শহরের সঙ্গে অভিন্ন।

(৭) **মরাবৎ খান**

(৮) **আশরফ খান**

(৯) **খুর্শীদ খান**

(১০) **উজৈল (র) খান**

(১১) **মজলিস আজম**

(১২) **খান মজলিস আলী**

শেষের দুটি নাম সম্ভবত উপাধিমাত্র।

এছাড়া 'তারিখ-ই-ফিরিশতা'য় লেখা রয়েছে, বারবক শাহ্ এদেশে ৮০,০০০ হাব্‌শী আমদানী করেছিলেন এবং তাদের প্রাদেশিক শাসনকর্তা, মন্ত্রী, অমাত্য প্রভৃতি রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেছিলেন। গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের রাজারাও এই ব্যাপারে বারবক শাহের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। সমালোচকেরা ফিরিশ্‌তার উক্তির উপর নির্ভর করে বারবক শাহের বিরূপ সমালোচনা করেছেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "ওম্‌রাহ্‌দিগের ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার জন্য সুলতান রুকন্-উদ্দীন্ বারবক্ শাহ, আফ্রিকা হইতে হাব্‌শী খোজা আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে প্রাসাদ রক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন।" কিন্তু বারবক শাহ যে অমাত্যদের ক্ষমতা খর্ব করবার জন্য হাব্‌শী ক্রীতদাসদের আনিয়েছিলেন, একথা কোন সূত্রেই পাওয়া যায় না। বরঞ্চ বারবক শাহের যে বহু সম্ভ্রান্ত হিন্দু ও মুসলমান অমাত্য ছিলেন, এবং রাজসভায় তাঁদের যে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, সে কথা আমরা বিভিন্ন সূত্র থেকে জানতে পারি। এসম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। বারবক শাহ যে কিছু হাব্‌শীকে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেছিলেন, তাতে সন্দেহের কারণ নেই। কারণ পঞ্চদশ শতাব্দীর নবম দশকে হাব্‌শীরা এত প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন যে তাঁরা বাংলার সিংহাসন অবধি দখল করেছিলেন; সুতরাং আর অন্তত দুই দশক আগে তাঁদের ক্ষমতা লাভের সূচনা হয়েছিল বলেই মনে হয়।

বারবক শাহ হাব্‌শীদের শারীরিক পটুতার জন্য তাদেরই উপযুক্ত বিভিন্ন পদে তাদের নিয়োগ করেছিলেন বলে মনে হয়, হিন্দু ও মুসলমান অমাত্যদের প্রাধান্য কমানো তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। এই সব হাব্‌শীরা যে ক্রমশ সর্বশক্তিমান হয়ে উঠেছিল, এর জন্য বারবক শাহের পরবর্তী সুলতানেরাই দায়ী। তাছাড়া সমস্ত হাবশীই যে দুরাত্মা ছিল, তা'ও নয়। এদের মধ্যে মালিক আন্দিলের (যিনি পরবর্তীকালে সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ নামে বাংলার সুলতান হয়েছিলেন) মত সৎ ও প্রভুভক্ত লোকও ছিলেন। সুতরাং হাব্‌শীদের নিয়োগকে বারবক শাহের অদূরদর্শিতার দৃষ্টান্ত বলে যে মনে করা হয়ে থাকে, তা ঠিক নয়। বারবক শাহের রাজত্বাবসানের ১১।১২ বছর বাদে যা ঘটেছিল, তার জন্য সেই সময়ের সুলতানই দায়ী। বারবক শাহ আসলে জাতিধর্মনির্বিশেষে বিভিন্ন কাজে দক্ষ লোক নিযুক্ত করতেন। হিন্দুরা তাঁর মন্ত্রী, অমাত্য, সভাপণ্ডিত, চিকিৎসক প্রভৃতি পদে নিযুক্ত হতেন। মুল্লা তকিয়ার বয়াজে লেখা আছে, ত্রিহুত অভিযানের সময় তিনি বহু আফগান সৈন্য সংগ্রহ করেছিলেন। এই রকম তিনি যোগ্য হাব্‌শীদের বিভিন্ন পদে নিয়োগ করেছিলেন।

বারবক শাহের মুদ্রাগুলি বারবকাবাদ, ফিরোজাবাদ (পাণ্ডুয়া), মুজাফফরাবাদ প্রভৃতি জায়গার টাকশাল থেকে বেরিয়েছিল। এদের মধ্যে মুজাফফরাবাদ সম্ভবত পাণ্ডুয়ার নিকটে অবস্থিত ছিল। 'আইন-ই-আকবরী'র সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, বারবকাবাদ উত্তর বঙ্গে অবস্থিত ছিল। বারবক শাহের অনেক মুদ্রায় শুধু মাত্র "দার-উজ-জরব" (টাকশাল) এবং "খজানাহ্‌" উৎকীর্ণ হবার স্থান হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে। অনেক মুদ্রার টাকশালের নাম সন্দেহজনকভাবে পড়া হয়েছে 'সাতগাঁও' ও 'জন্নতাবাদ'। শেষোক্ত নাম বিশেষভাবে সন্দেহজনক এই কারণে যে, ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুন গৌড় নগরীর নাম 'জন্নতাবাদ' রেখেছিলেন, পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলার কোন 'জন্নতাবাদ'-এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁর বহু শিলালিপি এপর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে। এগুলি এই সমস্ত স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে :—

ত্রিবেণী (হুগলী), বারা (বীরভূম), গৌড়, মহীসন্তোষ (দিনাজপুর), হাটখোলা (শ্রীহট্ট), দেওতলা (মালদহ), পেরিল (ঢাকা), মীর্জাগঞ্জ (বাখরগঞ্জ), গুরাই (ময়মনসিংহ) বসিরহাট (২৪ পরগণা), জোবরা

(চট্টগ্রাম)। মহীসন্তোষের একটি শিলালিপিতে জোর ও বারোর-এর শিকদার নসরৎ খানের উল্লেখ পাওয়া যায়। এর মধ্যে বারোর বর্তমান পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত, এর আধুনিক নাম বারুর।

এর থেকে বোঝা যাবে, বারবক শাহের রাজ্যের আয়তন কত বিশাল ছিল। উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ এবং বিহারের কতকাংশ তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুল্লা তকিয়ার বয়াজে লেখা আছে যে বারবক শাহ ত্রিহুতের বুড়িগণ্ডক নদী পর্যন্ত অঞ্চল অধিকার করেছিলেন। তার মধ্যে হাজীপুর এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি তাঁর খাস শাসনে এসেছিল, বাকী অংশ ত্রিহুতের জমিদারকে শাসন করতে দেওয়া হয়, কর দেবার সর্তে। এই ত্রিহুত অধিকার থেকে মনে হয়, নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ কর্তৃক অধিকৃত ভাগলপুর ও মুঙ্গের অঞ্চলে বারবক শাহের অধিকার অটুটই ছিল। 'রিসালৎ-ই-শুহাদা'র উক্তি বিশ্বাস করলে (এক্ষেত্রে অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই) বলতে হবে, বারবক শাহের রাজ্যের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত ছিল ঘোড়াঘাট।

আরাকান দেশের ইতিহাসে লেখা আছে যে পঞ্চদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে আরাকানের রাজারা বাংলাদেশের কিছু অংশ জয় করেছিলেন। ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানরাজ মেং-সোআ-মৃউন যখন বাংলার সুলতান জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের সাহায্যে নিজের রাজ্য ফিরে পান, তখন তিনি বাংলার রাজার সামন্তে পরিণত হন। কিন্তু তাঁর ভ্রাতা ও পরবর্তী রাজা মেং-খরি (১৪৩৪-৫৯ খ্রীঃ) শুধু যে বাংলার রাজার অধীনতা স্বীকার করেননি, তাই নয়—তিনি রামু পর্যন্ত বাংলার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল অধিকার করে নিয়েছিলেন। এই 'রামু' সম্ভবত বর্তমান চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত 'রামু' গ্রামের সঙ্গে অভিন্ন। সপ্তদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে শিহাবুদ্দীন তালিশ লিখেছেন যে রাম্বু (রামু) একটি বন্দর; চট্টগ্রাম থেকে সেখানে যেতে চারদিন লাগে এবং এই বন্দরটি চট্টগ্রাম ও আরাকানের মধ্যপথে অবস্থিত (Studies in Mughal India, Sarkar, p. 150 দ্রষ্টব্য)। মেং-খরির পুত্র ও পরবর্তী রাজা বসোআহ্‌প্যু (১৪৫৯-৮২ খ্রীঃ) চট্টগ্রাম শহর অধিকার করেন বলে আরাকানের ইতিহাসে লেখা আছে (Phayre, History of Burma, p. 78 এবং JASB, 1945, p. 35 দ্রষ্টব্য।) ফেয়ারের মতে বসোআহ্‌প্যুর চট্টগ্রাম অধিকার বারবক শাহের রাজত্বকালেই ঘটেছিল।

কিন্তু যদি এই সমস্ত কথা সত্যও হয় তাহলেও বারবক শাহ ৮৭৮ হিজরা

বা ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যে চট্টগ্রাম অঞ্চল পুনরধিকার করে নিয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই, কারণ রাস্তি খান কর্তৃক নির্মিত চট্টগ্রামের জোবরা গ্রামের মসজিদের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে ৮৭৮ হিজরার ২৫শে রমজান তারিখে রুকনুদ্দীন বারবক শাহই ঐ অঞ্চলের অধীশ্বর ছিলেন।

এখন রুকনুদ্দীন বারবক শাহের চরিত্রের কয়েকটি বিশিষ্ট দিক সম্বন্ধে আলোচনা করে আমরা তাঁর প্রসঙ্গ শেষ করব।

বারবক শাহের অসম্প্রদায়িক মনোভাবের কয়েকটি নিদর্শন আমরা ইতি-পূর্বেই দিয়েছি। তাঁর অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের আর একটি প্রমাণ এই যে অপরাধীকে শাস্তি দেবার সময় তিনি মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাত দেখাননি। এমন কি মুসলমান সাধু ও ধর্মগুরুরাও কোন অন্যায় আচরণ করলে তিনি তাঁদের কঠোর শাস্তি দিতে কুণ্ঠিত হতেন না। আমরা আগেই দেখে এসেছি, দরবেশ-সেনাপতি ইসমাইল গাজীকে তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। আরও একজন দরবেশ তাঁর হাতে অনুরূপ শাস্তি লাভ করেছিলেন বলে মনে হয়। আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে রচিত সুফী দরবেশদের জীবনীগ্রন্থ 'অখ্‌বার অল-অখিয়ার'-এ (রচয়িতা শেখ আবদুল হক দেহ্‌লবী) এই কাহিনীটি পাওয়া যায়।

শেখ পিয়ারার শিষ্য শাহ জলাল দকীনী একজন মস্তবড় দরবেশ ছিলেন। তিনি বাংলাদেশে আসেন। এখানে এসে তিনি রাজার মত সিংহাসনে উপবেশন করতেন। জনসাধারণের উপর তিনি বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে গৌড়ের সুলতানের সন্দেহ হল এবং তিনি তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। সুলতানের আদেশে রাজকীয় সৈন্যবাহিনী গিয়ে শাহ জলাল দকীনী এবং তাঁর অনুগামীদের মাথা কেটে ফেলল।

এর পরে কিছু অলৌকিক ব্যাপারের উল্লেখ আছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে রচিত 'খজীনৎ অল-আশফিয়া' (রচয়িতা গোলাম সারোয়ার) নামে আর একটি সুফী গ্রন্থেও এই কাহিনী পাওয়া যায়। এতে বলা হয়েছে শাহ জলাল দকীনী ৮৮১ হিজরায় নিহত হয়েছিলেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোন্ সুলতান শাহ জলাল দকীনীকে বধ করেছিলেন (অবশ্য যদি এই দুই বইয়ের বিবরণ সত্য হয়)? মুদ্রার সাক্ষ্য অনুযায়ী ৮৮১ হিজরায় (১৪৭৬-৭৭ খ্রীঃ) শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহ বাংলার সুলতান ছিলেন। কিন্তু

রুকনুদ্দীন বারবক শাহ যে ১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ও সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তার প্রমাণ আছে। য়ুসুফ শাহ ধর্মগতপ্রাণ নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন বলে বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। এসম্বন্ধে পরে আলোচনা দ্রষ্টব্য। সুতরাং য়ুসুফ শাহ শাহ জলালের মত একজন প্রতিপত্তিশালী ও মুসলমানদের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন দরবেশের প্রাণবধ করতে পারেন বলে বিশ্বাস করা যায় না। এই কারণে মনে হয়, তাঁর পিতা বারবক শাহই শাহ জলালকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। বারবক শাহ কর্তৃক ইসমাইল গাজীর প্রাণদণ্ড বিধানের উদাহরণ যখন রয়েছে, তখন এ কাজও তাঁরই বলে মনে হয়।

দরবেশদের এই প্রাণদণ্ড বিধান থেকে বারবক শাহের শুধু অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না, তাঁর দৃঢ়তা ও শাসনদক্ষতারও পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর আগে অনেক ধর্মপ্রাণ সুলতানের রাজত্বকালে দরবেশরা অত্যধিক প্রাধান্য লাভ করেছিলেন, এমন কি তাঁরা দেশের শাসনব্যাপারেও প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। বারবক শাহ তাঁদের কর্তৃত্ব করতে দেননি, উপরন্তু তাঁরা দণ্ডার্হ হলে দণ্ড দিতে ইতস্তত করেননি।

বারবক শাহ একজন প্রকৃত সৌন্দর্যরসিক ছিলেন। তাঁর এমন অনেক মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে, সেগুলির গঠন অত্যন্ত সুন্দর ও শিল্পোচিত। গৌড় নগরে যে রাজপ্রাসাদে বারবক শাহ বাস করতেন, সেটি তাঁর সৌন্দর্যরসিকতার আর একটি নিদর্শন। এই প্রাসাদটি এখন আর বর্তমান নেই, কিন্তু এর একটি শিলালিপি অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। এই শিলালিপিটি আরবী কবিতায় লেখা। এটি বর্তমানে পেন্‌সিল্‌ভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের যাদুঘরে আছে। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ১৯৪০ সালের Ars Islamica নামক পত্রিকায় (pp. 141-147) এর পূর্ণ বিবরণ বার হয়েছিল। এই শিলালিপিতে বারবক শাহের প্রাসাদের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ চমৎকার বিবরণ পাওয়া যায়, সেটি আমরা বাংলায় অনুবাদ করে দিলাম।

তাঁর (বারবক শাহের) আবাস বাগানের মত, শান্ত এবং আনন্দদায়ক,
তা আনন্দ সঞ্চয় করে এবং দুঃখ বিদূরিত করে।
এর নীচ দিয়ে একটি জলধারা বয়ে যায়,
স্বর্গের নির্ঝরের কথা মনে করিয়ে দিয়ে,
এর বুদ্‌বুদগুলি মুক্তোর মত, তারা ভুলিয়ে দেয় দারিদ্র্য ও বেদনা।

তার তোরণ আশ্রয় দান করে, আত্মাকে সুগন্ধ ওষধির মত (অর্থাৎ আত্মাকে সুগন্ধ ওষধির সুবাস দান করার মত)
বন্ধুদের। শত্রুদের কাছে এ (প্রাসাদ) নিষিদ্ধ এবং সুদূর।
একটি অনির্বচনীয় তোরণ, তৃপ্তিদায়ক ও স্ফূর্তিজনক। যাকে বলা হয়
মধ্য-তোরণ, বিশেষ প্রবেশপথ হিসাবে এটি নির্মিত
আটশো একাত্তর সালে (হিজরায়)।
জীবন, আশা এবং বিশ্রামের আবাস।

সুতরাং শিলালিপিটি ৮৭১ হিজরায় প্রাসাদটির মধ্য-তোরণ নির্মাণের সময় উৎকীর্ণ হয়েছিল। Ars Isamica পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণ থেকে জানা যায়, শিলালিপিটির শিলা এবং লিপি দুইই অত্যন্ত সুন্দর ("magnificent")। এর থেকেও বারবক শাহের সৌন্দর্যরসিকতার নিদর্শন পাওয়া যায়।

গৌড়ের 'দাখিল দরওয়াজা' নামে পরিচিত বিরাট ও সুন্দর তোরণটি বারবক শাহই নির্মাণ করিয়েছিলেন বলে প্রসিদ্ধি আছে।

রুকনুদ্দীন বারবক শাহ কোন্ সময়ে পরলোক গমন করেছিলেন তা বলা কঠিন। এর আগে (বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ১৮৩) স্মার্ত গ্রন্থকার বিশারদের যে বচন উদ্ধৃত করেছি, তার থেকে জানা যায় যে তিনি ১৩৯৭ শকাব্দের মীন-সংক্রান্তি অর্থাৎ ১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের শেষ দিক পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। সম্ভবত এর কিছুদিন পরে তিনি পরলোকগমন করেন।

বাংলাদেশের এই অসাধারণ নরপতি সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায়, সেগুলি আমরা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করলাম। বারবক শাহ—যাঁর রাজ্যের আয়তন ছিল সুবিশাল, যিনি নানা রাজ্য জয় করেছিলেন, যিনি নিজে বিদ্বান ছিলেন, বিদ্বান ও সাহিত্যিকদের যিনি পৃষ্ঠপোষণ করতেন, যাঁর মনোভাব ছিল উদার ও অসাম্প্রদায়িক এবং যিনি ছিলেন একজন সত্যকার সৌন্দর্যরসিক—তাঁর সম্বন্ধে যে আমরা বিশেষ কিছু জানিনা, এ অত্যন্ত দুঃখ ও লজ্জার বিষয়। বারবক শাহের মত একাধারে এতগুলি বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ বাংলার আর কোন রাজার মধ্যেই দেখা যায়নি। পেন্‌সিল্‌ভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত বারবক শাহের পূর্বোক্ত শিলালিপিতে আরবী কবিতায় তাঁর যে প্রশস্তি রয়েছে (Ars Islamica, 1940, pp. 142-143 দ্রষ্টব্য), তার মধ্যে বিশেষ অতিরঞ্জন নেই। প্রশস্তিটি আমরা নীচে বাংলায় অনুবাদ করে দিলাম।

আশা করি, আমাদের এই দীর্ঘ আলোচনার পরে এই প্রশস্তি সুলতানের প্রসাদপুষ্ট একজন কর্মচারীর চাটুবাক্য বলে বোধ হবে না।

শাহ সুলতান রুক্‌ন্ উদ্-দুনিয়া ওয়াদ্-দীন
আমাদের সুলতান বারবক শাহ, জ্ঞানী এবং মহীয়ান,
তাঁর পুত্র,—যাঁর খ্যাতি দেশে দেশে বিস্তৃত হয়েছে—
সুলতান মাহ্‌মূদ শাহ, ন্যায়পরায়ণ এবং ভদ্র।
দুই ইরাকে কি এমন মহানুহৃদয় সুলতান আছেন
বারবক শাহের মত? সিরিয়া এবং অল-ইয়েমেনেও কি আছেন?
না। বিধাতার সমগ্র রাজ্যে আর কেউই নেই,
যিনি মহত্ত্বে তাঁর সমান। তাঁর সময়ে তিনি অদ্বিতীয় এবং অতুলনীয়।

শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহ

পরবর্তী রাজার নাম শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহ। ইনি রুকনুদ্দীন বারবক শাহের পুত্র। আমরা আগেই দেখে এসেছি, অন্তত ৮৮১ হিজরা পর্যন্ত কয়েক বছর য়ুসুফ শাহ বারবক শাহের সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করেছিলেন। য়ুসুফ শাহের ৮৮৫ হিঃ পর্যন্ত মুদ্রা ও শিলালিপি পাওয়া যায়। ৮৮৬ হিঃ থেকে সুলতান জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহের মুদ্রা ও শিলালিপি সুরু হয়েছে। সুতরাং য়ুসুফ শাহ যে ৮৮৫ বা ৮৮৬ হিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বুকাননের বিবরণীতে য়ুসুফ শাহকে "a very learned prince" বলা হয়েছে। ফার্সী ভাষায় লেখা ইতিহাস-গ্রন্থগুলির মধ্যে কয়েকটিতে য়ুসুফ শাহকে উচ্চশিক্ষিত, ধর্মপ্রাণ এবং শাসনদক্ষ বলে প্রশংসা করা হয়েছে। 'তবকাৎ-ই-আকবরী'র ভাষায় "তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল, প্রজাহিতৈষী এবং ধর্মনিষ্ঠ বাদশাহ।" কিন্তু কোন বইয়েই তাঁর সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা'য় কয়েকটি কথা পাওয়া যায়। ফিরিশ্‌তা লিখেছেন, "তিনি ছিলেন বিদ্বান, ধার্মিক এবং কৌশলী নরপতি। তিনি ভাল কাজ করতে আদেশ দিতেন এবং মন্দ কাজ নিষিদ্ধ করতেন। তাঁর আমলে কেউ প্রকাশ্যে মদ্যপান করতে বা তাঁর আদেশ অমান্য করতে সাহস পেত না। মাঝে মাঝে তিনি প্রধান প্রধান আলিমদের তাঁর সভায়

ডেকে বলতেন, 'তোমরা ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ের নিষ্পত্তি করতে গিয়ে কারও পক্ষ অবলম্বন করবে না; করলে তোমাদের সঙ্গে আমার ভাল সম্পর্ক থাকবে না এবং আমি তোমাদের শাস্তি দেব।' তিনি নিজে বহু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, তাই যে সমস্ত মামলায় কাজীরা ব্যর্থ হত, তাদের অধিকাংশেরই তিনি নিজে নিষ্পত্তি করতেন।"

ফিরিশ্‌তার বিবৃতি সত্য হলে বলতে হবে যুসুফ শাহ ছিলেন সচ্চরিত্র, আদর্শবাদী, ন্যায়নিষ্ঠ ও সুদক্ষ নরপতি। উপরন্তু তিনি ছিলেন ধর্মগতপ্রাণ মুসলমান। এই শেষোক্ত বিষয়টি সম্বন্ধে আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর ও তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের আদেশে তাঁর রাজত্বকালে কয়েকটি বিশিষ্ট মসজিদ নির্মিত হয়েছিল; এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মালদহের সাকোমোহন মসজিদ এবং গৌড়ের 'কদমরসুল' মসজিদ, দরাসবাড়ী জামী মসজিদ ও তাঁতীপাড়া মসজিদ। ক্রেটন ও কানিংহামের মতে গৌড়ের লোটন মসজিদ নামে চমৎকার মসজিদটি এবং চামকাটি মসজিদ শামসুদ্দীন যুসুফ শাহই নির্মাণ করিয়েছিলেন। যুসুফ শাহের শিলালিপিগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি "জিল্-আল্লাহ্ ফি অল্-আলামিন্" প্রভৃতি প্রাচীনতর এবং বহুদিন-অব্যবহৃত উপাধি আবার ধারণ করেছেন (Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal, p. 87 দ্রষ্টব্য)। এই সমস্ত বিষয় থেকে অনায়াসেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে যুসুফ শাহ একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। তিনি তাঁর পিতার মত অসাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন তো ছিলেনই না, উপরন্তু সে যুগের অনেক নিষ্ঠাবান মুসলমানের মত পরধর্ম-বিদ্বেষী ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণও আছে। বর্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুয়ায় তাঁর রাজত্বকালে হিন্দুর মন্দির ভেঙে মসজিদ তৈরী করা হয়েছিল; নারায়ণ ও সূর্যের মন্দিরকে মসজিদ ও মিনারে পরিণত করা হয়েছিল। একটি ব্রহ্মশিলা-নির্মিত বিরাট সূর্যমূর্তির পিছন দিকে শিলালিপি খোদাই করা রয়েছে যে, 'খলীফৎ আল্লাহ' সুলতান শামসুদ্দীন যুসুফ শাহের রাজত্বকালে ৮৮২ হিজরার ১লা মহরম (১৫ই এপ্রিল, ১৪৭৭ খ্রীঃ) তারিখে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। এই মসজিদই সম্ভবত বর্তমানে 'বাইশ দরওয়াজা' নামে পরিচিত; এই মসজিদে হিন্দু মন্দিরের বহু শিলাস্তম্ভ ও অন্যান্য ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়।

জৈনুদ্দীন নামে একজন মুসলমান কবির লেখা 'রসুলবিজয়' নামে একখানি

বাংলা কাব্য পাওয়া গিয়েছে।* এর ভণিতায় কবি জনৈক রাজা "ইছপ খান" বা "য়ুসুফ খান"-এর উল্লেখ করেছেন এবং লিখেছেন,

দানে ধর্মে হরিশ্চন্দ্র মান্য গুরু সম ইন্দ্র রাজরত্ন মহিমা প্রধান।
শ্রীযুত ইছপ খান আরতি কারণ জান বিরচিলুম পাঞ্চালি সন্ধান॥

কেউ কেউ মনে করেন এই "য়ুসুফ খান" সুলতান শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহ এবং 'রসুলবিজয়'-রচয়িতা জৈনুদ্দীন—ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকীর 'শরফ্‌নামা'য় উল্লিখিত "মালেকুশ শোয়ারা" ("রাজকবি") আমীর জৈনুদ্দীন হারাওয়ী। কিন্তু এই মত সত্য হতে পারে না। কারণ "মালেকুশ শোয়ারা" জৈনুদ্দীনের "হারাওয়ী" বিশেষণ থেকে বোঝা যায়, তিনি পারস্যের হিরাটের লোক। পক্ষান্তরে 'রসুলবিজয়' খাঁটি বাঙালী কবির লেখা এবং এই কাব্যে হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাবের যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। 'রসুলবিজয়' কাব্যের ভাষা বিচার করেও নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে, এই কাব্য পঞ্চদশ শতাব্দীর রচনা হতে পারে না। জনাব এ. টি. এম. রুহুল আমিনের মতে 'রসুলবিজয়' ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধের রচনা এবং কবির পৃষ্ঠপোষক "ইছপ খান" গৌড়েশ্বর তাজ খান কররানীর (১৫৬৪-৬৫) পুত্র য়ুসুফ খান (মাসিক মোহাম্মদী, শ্রাবণ, ১৩৭১, পৃঃ ৭১০ দ্রঃ)।

য়ুসুফ শাহের একটি ভিন্ন অন্য কোন মুদ্রায় কোন স্থানের নাম পাওয়া যায় না, এগুলি সবই "খজানাহ্‌" (কোষাগার) থেকে মুদ্রিত হয়েছিল। একটি মুদ্রা সম্ভবত সোনারগাঁও-য়ের টাকশালে তৈরী হয়েছিল—এতে স্থানের নামটি খুব অস্পষ্টভাবে লেখা আছে। এইসব জায়গায় তাঁর শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে—গৌড়, জাহানাবাদ (রাজশাহী), শ্রীহট্ট, ছোট পাণ্ডুয়া (হুগলী), হজরৎ পাণ্ডুয়া (মালদহ), ঢাকা। এর মধ্যে ছোট পাণ্ডুয়ার শিলালিপিটি থেকে মনে হয়, তাঁর আমলে পশ্চিম বঙ্গে মুসলিম অধিকার আর একটু প্রসারিত হয়েছিল। অন্যান্য শিলালিপি থেকে বোঝা যায়, উত্তর ও পূর্ববঙ্গের এক বৃহৎ অঞ্চল তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাঙ্গালার ইতিহাস' দ্বিতীয় ভাগে (পৃঃ ২১৫) লিখেছেন যে শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহের "রাজ্যকালে শ্রীহট্ট মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম পাদে শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে মুসলমানরা

* অধ্যাপক আহমদ শরীফ কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে 'সাহিত্য পত্রিকা'র সপ্তম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

প্রথম শ্রীহট্ট জয় করেন (History of Bengal, D. U., Vol. II, pp. 78-80 দ্রঃ)।

বিভিন্ন শিলালিপি থেকে য়ুসুফ শাহের এই সব কর্মচারীর নাম পাওয়া গিয়েছে :—

(১) **মির্শাদ খান**

(২) **সূফী খান**

(৩) **মজলিস আলা**

(৪) **মজলিস আজম**

(৫) **বহ্‌লূভী অল-অশ্‌র্‌ ওয়াজ্জমান**

শেষোক্ত তিনজনের নাম পাওয়া যায় না, কেবল উপাধিটুকু উল্লিখিত হয়েছে। "মজলিস আলা" পূর্বোল্লিখিত বারবক্‌ শাহের কর্মচারী মজলিস আলা রান্তি খানের সঙ্গে অভিন্ন হতে পারেন।

জলালুদ্দীন ফতেহ্‌ শাহ

'তবকাৎ-ই-আকবরী', 'মাসির-ই-রহিমী', 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা', 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীন' এবং স্টুয়ার্টের History of Bengal-এর মতে শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহের মৃত্যুর পর সিকন্দর শাহ নামে একজন রাজপুত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তিনি সিংহাসনচ্যুত হন এবং ফতেহ্‌ শাহ নামে আর একজন রাজপুত্র রাজা হন। সিকন্দর শাহের সিংহাসনচ্যুতির কারণ সম্বন্ধে কোন কোন বই নীরব; 'রিয়াজে'র মতে সিকন্দরের মস্তিষ্ক বিকৃতির দরুণ এবং তবকাৎ, ফিরিশ্‌তা ও স্টুয়ার্টের মতে সিকন্দর শাহ রাজা হবার পক্ষে অনুপযুক্ত প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়েছিল। কিন্তু সিকন্দর শাহের রাজত্বকাল সম্বন্ধে বিভিন্ন সূত্রের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়। ফিরিশ্‌তার মতে সিকন্দর শাহ যেদিন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, সেই দিনই সিংহাসনচ্যুত হন। 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে' লেখা আছে, "তিনি কিঞ্চিৎ উন্মাদ-রোগগ্রস্ত ছিলেন। এজন্য অমাত্যেরা তাঁকে রাজ্যের গুরুভার বহনে অক্ষম বিবেচনা করে সেই দিনই (অর্থাৎ সিংহাসনে আরোহণের দিন) তাঁকে পদচ্যুত করে…ফতেহ্‌ শাহকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন।" কিন্তু একথা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। কারণ অমাত্যেরা নিশ্চয়ই সিকন্দরকে আগে থেকে

জানতেন। সুতরাং আগে তাঁর উন্মত্ততার কোন খবর পেলেন না, সিংহাসনে অভিষেকের পরমুহূর্তেই সে কথা জানলেন, এ ব্যাপার কেমন করে সম্ভব হয়? 'আইন-ই-আকবরী'র মতে সিকন্দর শাহের রাজত্বকাল আধ দিন, 'তবকাৎ-ই-আকবরী'র মতে আড়াই দিন এবং স্টুয়ার্টের মতে দু' মাস। স্টুয়ার্টের উক্তিই এক্ষেত্রে সত্য বলে মনে হয়। কারণ যে যুবককে সুস্থ এবং শাসনক্ষম জেনে অমাত্যেরা সিংহাসনে বসিয়েছিলেন, তার অক্ষমতা আবিষ্কৃত হতে কিছু সময় অন্তত অতিবাহিত হয়েছিল বলেই ধরতে হয়।

স্টুয়ার্টের উক্তিকে সত্য ধরার আর একটি কারণ, সিকন্দর শাহের সঙ্গে পরবর্তী সুলতান ফতেহ্‌ শাহের সম্পর্ক সম্বন্ধে একমাত্র তিনিই কতকটা খাঁটি খবর দিয়েছেন। কয়েকটি গ্রন্থের মতে ফতেহ্‌ শাহ শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহের পুত্র। কিন্তু একথা ভুল। ফতেহ্‌ শাহের বহু মুদ্রা ও শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে, তার থেকে জানা যায় ফতেহ্‌ শাহ নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের পুত্র। সিকন্দর শাহের সঙ্গে য়ুসুফ শাহের সম্পর্ক সম্বন্ধে অধিকাংশ বিবরণীতেই কিছু লেখা নেই; স্টুয়ার্ট সিকন্দরকে "a youth of the royal family" বলেছেন; 'রিয়াজ'-এর মতে তিনি য়ুসুফ শাহের পুত্র এবং এই কথাই যথার্থ বলে মনে হয়। স্টুয়ার্ট ফতেহ্‌ শাহকে সিকন্দর শাহের "uncle" বলেছেন। সুতরাং স্টুয়ার্টের উক্তিই সত্যের কাছ ঘেঁসে গিয়েছে। অবশ্য ফতেহ্‌ শাহ য়ুসুফ শাহের খুল্লতাত! সিকন্দর য়ুসুফের পুত্র হলে ফতেহ্‌ শাহ সিকন্দরের খুল্লপিতামহ বা "great uncle" হন। কিন্তু ইংরেজরা সাধারণত "great uncle"-কেও "uncle" বলেই অভিহিত করে।

যাহোক, এই সিকন্দর শাহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে পরবর্তী কালে রচিত গ্রন্থগুলির উক্তি ছাড়া আর কোন প্রমাণ নেই। তাঁর কোন মুদ্রা বা শিলালিপি বা এমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নি, যার থেকে বলা যেতে পারে যে তিনি কিছু সময়ের জন্য রাজত্ব করেছিলেন। বুকাননের বিবরণীতে সিকন্দরের নামই নেই, সেখানে ফতেহ্‌ শাহকেই য়ুসুফ শাহের পরবর্তী সুলতান বলা হয়েছে। এ অবস্থায় সিকন্দর শাহ বলে একজন লোক সত্যিই য়ুসুফ শাহ ও ফতেহ্‌ শাহের মাঝখানে সিংহাসনে বসেছিলেন, এ সম্বন্ধে একেবারে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। তবে, য়ুসুফ শাহের কোন মুদ্রা বা শিলালিপি ৮৮৫ হিঃর পরবর্তী নয় এবং ফতেহ্‌ শাহের কোন মুদ্রা বা শিলালিপি ৮৮৬ হিঃর পূর্ববর্তী নয়। এই কারণে মনে হয়, এঁদের মাঝখানে আর একজন রাজা—সিকন্দর শাহ—সত্যিই সিংহাসনে

বসেছিলেন এবং তিনি ৮৮৫ হিঃর শেষ দিকে ও ৮৮৬ হিঃর গোড়ার দিকে রাজত্ব করেছিলেন।

সিকন্দর শাহের প্রসঙ্গের এইখানেই ইতি করে এখন তাঁর পরবর্তী সুলতান বলে অভিহিত ফতেহ্ শাহের সম্বন্ধে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাক্। এঁর বহু মুদ্রা ও শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে, তাদের থেকে দেখা যায় এঁর পুরো নাম জলালুদ্দীন আবুল মুজাফফর ফতেহ্ শাহ। এঁর মুদ্রা ও শিলালিপির আরম্ভ ৮৮৬ হিজরায় ও শেষ ৮৯২ হিজরায়। এঁর অধিকাংশ মুদ্রাতেই এঁর রাজকীয় নামের পরে "হোসেন শাহী" কথাটি উল্লিখিত হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় এঁর দ্বিতীয় নাম বা জনপ্রিয় নাম ছিল 'হোসেন শাহ'। এসম্বন্ধে ডঃ হবীবুল্লাহ বলেন, "Most of his coins bear, after the regnal titles, the words 'Husain Shāhī', which like the 'Badr Shāhī' of Ghiyasuddin Mahmud Shah of the Husainī dynasty, must refer to his popular name." (HB II, p. 136)

'তবকাৎ-ই-আকবরী'তে লেখা আছে যে ফতেহ্ শাহ বিজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান ছিলেন। প্রাচীন রাজা ও সম্রাটদের প্রথা বিচক্ষণভাবে অনুসরণ করে তিনি প্রত্যেক লোককে তার অবস্থা ও মর্যাদার অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা দিতেন। তাঁর সময়ে বাংলার লোকদের সামনে সুখ ও ভোগের দরজা খোলা ছিল। 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে'ও এই কথা আছে। 'রিয়াজ'-এ অধিকন্তু লেখা আছে, "প্রজাদের সম্পর্কে তিনি উদার নীতি অনুসরণ করে চলতেন।"

আগে যে ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী রচিত 'শরফ্‌নামা'র উল্লেখ করেছি, তার মধ্যে একটি কবিতায় জনৈক জলালুদ্দীনের প্রশস্তি করা হয়েছে দেখতে পাই। ডঃ আবদুল করিমের Social History of the Muslims in Bengal বইয়ের ১২১ পৃষ্ঠায় এই কবিতাটি উদ্ধৃত হয়েছে, নীচে তার বাংলা অনুবাদ দিলাম। (শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন মৈত্রের সাহায্যে এই অনুবাদ করা হয়েছে।)

"কী চমৎকার! স্বর্গলোকই তোমার অত্যুচ্চ প্রাসাদের চূড়া। এর ফটককে যথার্থই বলা যায়, 'জন্নৎ অল-মাওয়া' (চিরন্তন স্বর্গ)। বাকেলের হাত থেকে যেমন হরিণ পালিয়ে গিয়েছিল, * তেম্‌নি তোমার শত্রুর হাত

* শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন মৈত্র আমায় বলেছেন যে এখানে একটি প্রচলিত গল্পের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। গল্পটি এই। বাকেল নামে একটা বোকা লোক একটা হরিণ কিনে দড়ি দিয়ে বেঁধে

থেকে সৌভাগ্য চলে যাচ্ছে। ওয়ামক যেমন আজরার অঞ্চল ধারণ করেছিলেন, তেমনি তোমার উচ্চ মর্যাদা স্বর্গকে স্পর্শ করছে। স্বর্গের দেবদূতেরা এবং আমি—আমরা প্রতি মুহূর্তে বলছি যে তুমি মহিমান্বিত (your majesty) জলাল উদ্‌-দীন ওয়াদ্‌-দুনিয়া (ধর্মের ও বিশ্বের গৌরব)।"

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই জলাল উদ্‌-দীন কে? ডঃ এন বি বলোখের মতে ইনি দরবেশ শাহ জলাল দকীনী। কিন্তু শাহ জলাল দকীনী গৌড়ের সুলতানদের অপ্রীতিভাজন ছিলেন, এবং সুলতানের আদেশে তাঁর মাথা কাটা যায়। সুতরাং গৌড়ের সুলতানের প্রসাদপুষ্ট ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী তাঁর প্রশস্তি কীর্তন করতে ও "তোমার শত্রুর হাত থেকে সৌভাগ্য চলে যাচ্ছে" বলতে পারেন বলে মনে হয় না। প্রশস্তিটি পড়লে বোধ হয় এটি কোন রাজার উদ্দেশ্যে নিবেদিত। এই কারণে মনে হয়, এর মধ্যে উল্লিখিত জলালুদ্দীন সুলতান জলালুদ্দীন ফতেহ্‌ শাহ ভিন্ন আর কেউ নন। কিন্তু 'শরফ্‌নামা'র একটি কবিতায় সমসাময়িক সুলতান হিসাবে বারবক শাহের প্রশস্তি আছে (বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ১৯৮ দ্রষ্টব্য) বলে তাঁর পরবর্তী আর একজন সুলতানের প্রশস্তি তার মধ্যে থাকা সম্ভব নয় বলে কেউ কেউ মনে করতে পারেন। কিন্তু 'শরফ্‌নামা'র মত শব্দকোষ-গ্রন্থ সংকলন করতে অনেক সময় লাগবার কথা। এর অন্তর্ভুক্ত বারবক শাহের নামাঙ্কিত কবিতাটি নিশ্চয়ই তাঁর রাজত্বকালে রচিত হয়েছিল, কিন্তু সমস্ত বইখানাই যে বারবক শাহের রাজত্বকালে রচিত হয়েছিল, এমন কথা মনে করার কোন কারণ নেই। এটাই বেশী সম্ভব যে ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী বারবক শাহের রাজত্বকালে তাঁর নামে কবিতা লিখেছেন; এবং জলালুদ্দীন ফতেহ্‌ শাহের রাজত্বকালে তাঁর নামেও কবিতা লিখেছেন; 'শরফ্‌নামা' তার পরে সম্পূর্ণ হয় এবং দুটি কবিতাই তার মধ্যে স্থান পায়। সুতরাং ফারুকী যে জলালুদ্দীন ফতেহ্‌ শাহেরই প্রশস্তি কীর্তন করেছেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই বলা চলে।

কয়েকটি বাংলা গ্রন্থে জলালুদ্দীন ফতেহ্‌ শাহের রাজত্বকালের কোন

টানতে টানতে নিয়ে আসছিল। রাস্তায় একজন লোক জিজ্ঞাসা করল, "কত টাকায় কিনলে?" সে এক হাতের পাঁচটা আঙুল দেখিয়ে জানাল পাঁচ টাকায়। তখন ঐ লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করল, "কত টাকায় বিক্রী করবে?" বাকেল দু' হাতের দশটা আঙুল দেখিয়ে জানাল দশ টাকায়। এদিকে তার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে হরিণটা ছুটে পালিয়ে গেল।

কোন ঘটনা সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। এখন সে কথায় আসছি।

ফতেহাবাদ "মুল্লুকে"র অন্তর্ভুক্ত ফুল্লশ্রী গ্রাম (বর্তমান বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত) নিবাসী বিজয়গুপ্তের বিখ্যাত মনসামঙ্গল কাব্য জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহের রাজত্বকালেই রচিত হয়েছিল। এই কাব্যের অধিকাংশ পুঁথিতেই এই রচনাকালসূচক শ্লোকটি পাওয়া যায়,

ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।
স্থলতান হোসেন সাহা নৃপতি-তিলক ॥

"ঋতু শূন্য বেদ শশী" অর্থাৎ ১৪০৬ শক অর্থাৎ ১৪৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এই কাব্য লেখা হয়েছিল। এই শ্লোকের দ্বিতীয় ছত্রের "স্থলতান হোসেন সাহা" বলতে সকলেই আলাউদ্দীন হোসেন শাহকে বোঝেন। কিন্তু আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকাল ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ। এই কারণে কেউ কেউ এই রচনাকাল-সূচক শ্লোকটিকে জাল বলেন আবার কেউ কেউ "ঋতু শূন্য বেদ শশী"র জায়গায় "ঋতু শশী বেদ শশী" পাঠ কল্পনা করে আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকালের সঙ্গে কোনরকমে খাপ খাওয়াবার চেষ্টা করেন। কিন্তু "ঋতু শশী বেদ শশী" পাঠ কোন পুঁথিতেই আমরা পাইনি। অনেকে বলেন, একটি পুঁথিতে নাকি এই পাঠ পাওয়া গিয়েছিল; কিন্তু কেউ সে পুঁথির দর্শন পাননি।* যাহোক্, "ঋতু শূন্য বেদ শশী"র জায়গায় "ঋতু শশী বেদ শশী" পাঠ ধরার কোন প্রয়োজন নেই, শ্লোকটিকে জাল বলারও কোন কারণ নেই। "ঋতু শূন্য বেদ শশী"ই প্রকৃত পাঠ। এই শকেই বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল রচিত হয়েছিল। ১৪৮৩-৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহ বাংলার স্থলতান ছিলেন; তাঁর নামান্তর বা জনপ্রিয় নাম যে হোসেন শাহ ছিল তা আমরা আগেই দেখে এসেছি। অতএব "স্থলতান হোসেন সাহা" বলতে বিজয়গুপ্ত তাঁকেই বুঝিয়েছেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

"ঋতু শূন্য বেদ শশী"র জায়গায় "ঋতু শশী বেদ শশী" পাঠ ধরা যে কতখানি অসার্থক, তা অন্য দিক থেকে বিচার করলেও বোঝা যায়।

* জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত সম্পাদিত ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত (১৯৬২) সংস্করণে যে তিনটি পুঁথি ব্যবহৃত হয়েছিল, তার একটিতে নাকি "ঋতু…শী বেদ শশী পাঠ আছে, অন্য দু'টি পুঁথিতে "ঋতু শূন্য বেদ শশী" আছে (ঐ সংস্করণ, পৃঃ ৮)। সম্পাদক যাকে "শী" মনে করেছেন, তা "শূন্য"-ই, সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই।

আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ১৪৯৩ খ্রীঃর নভেম্বর থেকে ১৪৯৪ খ্রীঃর জুলাইয়ের মধ্যে কোন এক সময়ে সিংহাসনে বসেন। "ঋতু শশী বেদ শশী" অর্থাৎ ১৪১৬ শক বা ১৪৯৪-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়গুপ্ত কাব্য রচনা করেছিলেন বললে স্বীকার করতে হয় যে বিজয়গুপ্ত আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সিংহাসনে আরোহণের কয়েক মাসের মধ্যেই কাব্য রচনা করেন। কিন্তু আলাউদ্দীন হোসেন শাহ সিংহাসনে আরোহণের কয়েক মাসের মধ্যেই সুদূর বরিশাল অঞ্চলের কবির বচনায় "নৃপতি-তিলক" আখ্যায় উল্লিখিত হতে পারেন বলে বিশ্বাস করা যায় না।

"সুলতান হোসেন সাহা"র নাম উল্লেখের পরে বিজয়গুপ্ত তাঁর সম্বন্ধে এই প্রশংসোক্তি লিপিবদ্ধ করেছেন,

সংগ্রামে অর্জুন রাজা প্রভাতের রবি।
নিজ বাহুবলে রাজা শাসিল পৃথিবী॥
রাজার পালনে প্রজা সুখ ভুঞ্জে নিত।

সন্ত সিংহাসনে-অধিষ্ঠিত রাজার সম্বন্ধে কেউ এই জাতীয় প্রশংসা করতে পারেন বলে মনে হয় না, অন্তত কয়েক বছর ধরে যিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রয়েছেন, তাঁর সম্বন্ধেই এই রকম প্রশংসা করা চলে।

অতএব এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে বিজয়গুপ্ত ১৪৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন এবং তিনি যে "সুলতান হোসেন সাহা নৃপতি-তিলক"-এর উল্লেখ করেছেন, তিনি জলালুদ্দীন ফতেহ্‌ শাহ্‌।

বিজয়গুপ্ত জলালুদ্দীন ফতেহ্‌ শাহ্‌ সম্বন্ধে বলেছেন, "রাজার পালনে প্রজা সুখ ভুঞ্জে নিত।" 'তবকাৎ-ই-আকবরী'তেও ঠিক এই কথা লেখা আছে। তাতে আছে, "তাঁর (জলালুদ্দীন ফতেহ্‌ শাহের) সময়ে লোকদের সামনে ভোগ ও সুখের দরজা খোলা ছিল।" 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে'ও এই কথা লেখা আছে। সুতরাং জলালুদ্দীন ফতেহ্‌ শাহ যে সুশাসক ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলেরই হাসন-হোসেন পালায় হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের অত্যাচারের যে বর্ণনা পাই, তার থেকে মনে হয় যে জলালুদ্দীন ফতেহ্‌ শাহের রাজত্বকালে হিন্দু-প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষের যথেষ্ট কারণ ছিল। অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে এই পালাটি এখন যেভাবে পাওয়া যাচ্ছে তা বিজয়-গুপ্তের নিজের লেখা কিনা এবং এর মধ্যে যে অত্যাচারের বর্ণনা দেওয়া

হয়েছে, তাকে বিজয়গুপ্তের সমসাময়িক পরিস্থিতির প্রতিফলন বলে গ্রহণ করা যায় কিনা। কিন্তু সমগ্র পালাটির বর্ণনা এত সরল ও জীবন্ত যে এটি বিজয়-গুপ্তের নিজের লেখা বলেই মনে হয় এবং তিনি এর মধ্যে নিজের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাই লিপিবদ্ধ করেছেন বলে বোধ হয়। যা হোক্, বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলে যা লেখা আছে, তা উদ্ধৃত করছি,

দক্ষিণে হোসেনহাটী গ্রামের নিকট।
তথায় যবন বসে দুই বেটা শঠ॥
হাসন হোসেন তারা দুই ভাইর নাম।
দুইজনে করে তারা বিপরীত কাম॥
কাজিয়ালী করে তারা জানে বিপরীত।
তাদের সম্মুখে নাহি হিন্দুয়ালি রীত॥
এক বেটা হালদার তার নাম দুলা।
বড় অহঙ্কারে করে হোসেনের শালা॥
সর্ব্বক্ষণ হোসেনের আগে আগে আসে।
তার ভয়ে হিন্দু সব পলায় তরাসে॥
যাহার মাথায় দেখে তুলসীর পাত।
হাতে গলে বান্ধি নেয় কাজির সাক্ষাৎ॥
বৃক্ষতলে থুইয়া মারে বজ্র কিল।
পাথরের প্রমাণ যেন ঝড়ে পড়ে শিল॥
পরেরে মারিতে কিবা পরের লাগে ব্যথা।
চোপড় চাপড় মারে দেয় ঘাড়কাতা॥
যে যে ব্রাহ্মণের পৈতা দেখে তারা কান্ধে।
পেয়াদা বেটা লাগ পাইলে তার গলায় বান্ধে॥
ব্রাহ্মণ পাইলে লাগ পরম কৌতুকে।
কার পৈতা ছিঁড়ি ফেলে থুথু দেয় মুখে॥
ব্রাহ্মণ সুজন তথায় বসে অতিশয়।
গৃহঘর তোলায় না দুর্জনের ভয়॥

এই রাজ্যের তকাই নামে একজন মোল্লা একদিন বনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় প্রবল ঝড়বৃষ্টি এল। তকাই একটি কুটির দেখতে পেয়ে তার মধ্যে ঢুকল। ঢুকে দেখল একদল রাখাল বালক সেখানে ঢাক ঢোল মৃদঙ্গ বাজিয়ে

মনসার ঘট পূজা করছে। তাই দেখে ঐ মোল্লা রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে "খোদা খোদা বলি যায় ঘট ভাঙ্গিবার।" কিন্তু তা সে পারল না, তার বদলে মার খেয়ে ও অশেষ লাঞ্ছনা সহ্য করে অবশেষে নাকে খৎ দিয়ে ক্ষমা চেয়ে ফিরে আসতে হল। মোল্লা হাসন-হোসেনের কাছে কিছু বলবে না বলে শপথ করেছিল। কিন্তু শপথ ভঙ্গ করে সে তাদের সমস্ত ব্যাপার জানাল। এই খবর

শুনিয়া কুপিল কাজি চারিদিকে চায়॥
হারামজাদা হিন্দুর হয় এতবড় প্রাণ।
আমার গ্রামেতে বেটা করে হিন্দুয়ান॥
গোটে গোটে ধরিব গিয়া যতেক ছেমরা।
এড়া রুটী খাওয়াইয়া করিব জাতিমারা॥
ওস্তাদ মোল্লা মোর অপমান (আপন জন ?) হয়।
তাহারে এমন করে প্রাণে নাহি ভয়॥
সাজ সাজ বলিয়া কটকে পড়ে সাড়া।
ছোট বড় সাজিয়া আসিল হোসেন পাড়া॥
যতেক যবন আছে হোসেনের পাড়া।
নগর হইতে পুরুষ আসিল মাথা মুড়া॥

দুই ভাই অনেক সশস্ত্র মুসলমানকে একসঙ্গে জড়ো করে রাখালদের কুঁড়ে-ঘরের উপর চড়াও হল। কাজীদের মা ছিল হিন্দুর মেয়ে, ভূতপূর্ব কাজী তাকে জোর করে বিবাহ করেছিল। সে তার ছেলেদের বারণ করল, কিন্তু তারা শুনল না। কাজীদের আদেশে সৈয়দেরা "ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলে সমুদ্রের জলে" এবং "কোদালে কাটিয়া ফেলে ঘর ভিটার মাটি"। তাছাড়া "মাটির গঠন ঘট কনকের চূড়া। দারুণ যবনে ঘট করিলেক গুঁড়া॥"

রাখালরা ভয়ে বনের মধ্যে লুকিয়েছিল। কিন্তু কাজীর লোকেরা বন তোলপাড় করে তাদের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করল। তাদের "কাজি বলে আরে বেটা ভূতের গোলাম। পীর থাকিতে কেন ভূতেরে সেলাম॥"

এর আগে কয়েকজন গবেষক বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলের রচনাকাল সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার বশবর্তী হয়ে এই ঘটনাকে আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকালে হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের অত্যাচারের একটি নিদর্শন বলে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল যখন জলালুদ্দীন ফতেহ্‌ শাহের রাজত্বকালেই রচিত হয়েছিল, তখন এই ঘটনাকে তাঁরই রাজত্বকালে

হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের দুর্ব্যবহারের একটি চিত্র বলে গ্রহণ করা উচিত। জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহের আমলে মুসলমান কাজীদের উৎকট ধর্মোন্মত্ততা ও হিন্দু-বিদ্বেষের নিদর্শন অন্য সূত্র থেকেও পাওয়া যায়। একটু বাদেই সে সম্বন্ধে আলোচনা করব।

জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহের রাজত্বকালের একটি বিশিষ্ট ঘটনা শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম। অবশ্য বলা বাহুল্য, এই ঘটনার অসামান্যত্ব কেউই তখন উপলব্ধি করতে পারেননি। শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের বিশিষ্ট ভক্ত যবন হরিদাস তাঁর অনেক আগেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মুসলমান হয়েও তিনি কৃষ্ণ নাম করতেন, এই "অপরাধে" তাঁকে মুসলিম রাজশক্তির হাতে নিষ্ঠুর নির্যাতন সহ্য করতে হয়। 'চৈতন্যভাগবতের' আদিখণ্ডের একাদশ অধ্যায় থেকে এই ঘটনার বিবরণ উদ্ধৃত করছি,

ফুলিয়ারে রহিলেন প্রভু হরিদাস॥
গঙ্গাস্নান করি নিরবধি হরিনাম।
উচ্চ করিয়া লইয়া বুলেন সর্ব্বস্থান॥
কাজী গিয়া মুলুকের অধিপতি স্থানে।
কহিলেন তাহান সকল বিবরণে॥
"যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।
ভালমতে তারে আনি করহ বিচার"॥
পাপীর বচন শুনি সেই পাপমতি।
ধরি আনাইল তারে অতি শীঘ্রগতি॥
কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাস মহাশয়।
যবনের কি দায় কালেরো নাহি ভয়॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে চলিলা সেইক্ষণে।
মুলুক-পতির দ্বারে দিলা দরশনে॥

অতি মনোহর তেজ দেখিয়া তাহান।
পরম-গৌরবে দিল বসিবারে স্থান॥
আপনে জিজ্ঞাসে তানে মুলুকের পতি।
"কেনে ভাই! তোমার বিরূপ দেখি মতি॥

কত ভাগ্যে দেখ তুমি হৈয়াছ যবন।
তবে কেনে হিন্দুর আচারে দেহ মন ॥
আমরা হিন্দুরে দেখি নাই খাই ভাত।
তাহা তুমি ছোড় হই মহাবংশজাত ॥
জাতি-ধর্ম লঙ্ঘি কর অন্য ব্যবহার।
পরলোকে কেমতে বা পাইবে নিস্তার ॥
না জানিঞা যে কিছু করিলা অনাচার।
সে পাপ ঘুচাহ করি কলিমা-উচ্চার ॥
শুনি মায়ামোহিতের বাক্য হরিদাস।
"অহো বিষ্ণু-মায়া" বলি কৈল মহাহাস ॥
বলিতে লাগিলা তারে মধুর উত্তর।
"শুন বাপ! সভারই একই ঈশ্বর ॥

শুনিঞা সন্তোষ হৈল সকল যবন।
হরিদাস ঠাকুরের সুসত্য-বচন ॥
সবে এক পাপী কাজী মুলুকপতিরে।
বলিতে লাগিলা "শাস্তি করহ ইহারে ॥
এই দুষ্ট আরো দুষ্ট করিব অনেক।
যবনকুলের অমহিমা আনিবেক ॥
এতেক উহার শাস্তি কর ভালমতে।
নহে বা আপন শাস্ত্র বলুক মুখেতে ॥"
পুন বোলে মুলুকের পতি "আরে ভাই।
আপনার শাস্ত্র বোল তবে চিন্তা নাই ॥
অন্যথা করিবা শাস্তি সব কাজীগণে।
বলিবাও পাছে আর লঘু হইবা কেনে ॥"
হরিদাস বোলেন "যে করান ঈশ্বরে।
তাহা বই আর কেহো করিতে না পারে।
অপরাধ-অনুরূপ যার যেই ফল।
ঈশ্বরে সে করে ইহা জানিহ সকল ॥

খণ্ড খণ্ড করি দেহ যদি যায় প্রাণ।
তভো আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥"
শুনিঞা তাহান বাক্য মুলুকের পতি।
জিজ্ঞাসিল "এবে কি করিবা ইহা প্রতি॥"
কাজী বোলে "বাইশ বাজারে নিঞা মারি
প্রাণ লহ, আর কিছু বিচার না করি॥
বাইশ বাজারে মারিলেই যদি জীয়ে।
তবে জানি জ্ঞানী সব সাঁচা কথা কহে॥"

বাজারে বাজারে সব বেড়ি দুষ্টগণে।
মারয়ে নির্জীব করি মহা-ক্রোধ মনে॥

কিন্তু বাইশ বাজারে প্রহার করা সত্ত্বেও হরিদাসের প্রাণ বার হল না, অবশেষে যবনদের অনুনয়ে তিনি মৃতের মত হয়ে পড়ে রইলেন। মুলুক-পতি তাঁকে কবর দিতে বললেন, কিন্তু কাজী তাঁর পরলোকের পথ রুদ্ধ করার জন্য তাঁকে নদীতে ফেলে দিতে বললেন। হরিদাস প্রথমে যোগবলে অনড় অটল হয়ে রইলেন, পরে যোগবল সংবরণ করে নিয়ে মুসলমানদের কাঁধে উঠলেন। তাঁকে গঙ্গায় ফেলে দেবার পরে তিনি আবার জীবিত হয়ে তীরে উঠে এসে কৃষ্ণনাম করলেন। তাই দেখে মুলুকপতি এসে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাঁকে বললেন আর কেউ তাঁর কৃষ্ণনামে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না।

এই সব ব্যাপার কতখানি সত্য তা বলা যায় না। এর মধ্যে অনেকখানি অতিরঞ্জন আছে বলেই মনে হয়। তবে যোগবিদ্যার বলে আধুনিক কালেও কোন কোন যোগী হরিদাসের অনুরূপ কার্য অনুষ্ঠান করে দেখিয়েছেন বলে শোনা যায়।

যাহোক্, হরিদাস ঠাকুরের নির্যাতনের এই কাহিনী সকলেই জানেন। কিন্তু এই ঘটনা কোন্ সময়ে ঘটেছিল, সে সম্বন্ধে বোধ হয় কারোই সঠিক ধারণা নেই। সকলেই মনে করেন, এই সময়ে বাংলার সুলতান ছিলেন আলাউদ্দীন হোসেন শাহ। কিন্তু 'চৈতন্যভাগবতে' বৃন্দাবনদাস স্পষ্টাক্ষরে লিখেছেন যে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মের অব্যবহিত আগে হরিদাস নির্যাতিত হয়েছিলেন। 'চৈতন্যভাগবতে'র মধ্যখণ্ডে দশম অধ্যায়ে দেখি শ্রীচৈতন্যদেব হরিদাসকে বলছেন,

পাপিষ্ঠ যবনে তোমা বড় দিল দুখ।
তাহা স্মঙরিতে মোর বিদরয়ে বুক ॥
শুন শুন হরিদাস তোমারে যখনে।
নগরে নগরে মারি বেড়ায় যবনে।
দেখিয়া তোমার দুঃখ চক্র ধরি করে।
নাম্বিলু বৈকুণ্ঠ হৈতে সভা কাটিবারে ॥
প্রাণান্ত করিয়া তোমা মারে যে সকল।
তুমি মনে চিন্ত তাহা সভার কুশল ॥
আপনে মারণ খাও তাহা নাহি লেখ।
তখনেহ তা সভারে মনে ভাল দেখ ॥
তুমি ভাল চিন্তিলেঁ না করোঁ মুঞি বল।
তোলোঁ চক্র তোমা লাগি সে হয় বিফল ॥
কাটিতে না পারোঁ তোর সঙ্কল্প লাগিয়া।
তোর পৃষ্ঠে পড়োঁ তোর মারণ দেখিয়া ॥
তোহোর মারণ নিজ অঙ্গে করি লঙ্।
এই তার চিহ্ন আছে মিছা নাহি কঙ্ ॥
যেবা গৌণ ছিল মোর প্রকাশ করিতে।
শীঘ্র আইলুঁ তোর দুঃখ না পারোঁ সহিতে ॥

এই ছত্রগুলির মধ্যে চৈতন্যদেবকে দিয়ে যে সমস্ত কথা বলানো হয়েছে, তাকে ভক্তেরা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে মনে করলে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ঐতিহাসিক এর মধ্য থেকে এই সত্যই আবিষ্কার করবেন যে মুসলমানদের হাতে হরিদাসের নির্মম নির্যাতনের সময় চৈতন্যদেবের জন্ম হয় নি; তার সামান্য পরেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

[গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী তাঁর 'শ্রীচৈতন্যদেব ও তাহার পার্ষদগণ' বইয়ের ৪৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "তখন (হরিদাসের নির্যাতনের সময়) তিনি (চৈতন্যদেব) বৈকুণ্ঠে ছিলেন না। নবদ্বীপে টোলে ছাত্রদের ব্যাকরণ পড়াইতেছিলেন।" গিরিজাবাবুর এরকম ধারণার কারণ, চৈতন্যভাগবত আদিখণ্ডের একাদশ অধ্যায় অর্থাৎ 'শ্রীহরিদাসমহিমাবর্ণন' শীর্ষক অধ্যায়ের গোড়ার দিকে আছে, "হেন মতে বৈকুণ্ঠনায়ক নবদ্বীপে। গৃহস্থ হইয়া পড়ায়েন বিপ্ররূপে ॥" কিন্তু বৃন্দাবনদাস স্পষ্টাক্ষরে লিখেছেন, "হেনকালে

তথাই আইলা হরিদাস। শুদ্ধ বিষ্ণুভক্তি যার বিগ্রহে প্রকাশ॥" এই বলে বৃন্দাবনদাস হরিদাসের পূর্ব-প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ হরিদাস যখন নবদ্বীপে প্রথম এসেছিলেন, সেই সময়েই চৈতন্যদেব নবদ্বীপের টোলে ছাত্রদের পড়াচ্ছিলেন। মুসলমানদের হাতে হরিদাসের নির্যাতন অনেক আগেকার কথা। তখন যে চৈতন্যদেবের জন্ম হয়নি, তা উপরে দেখানো হয়েছে।]

সুতরাং চৈতন্যদেবের জন্মের সময়ে এবং তারও ৫।৬ বছর আগে থেকে যিনি বাংলার সুলতান ছিলেন, সেই জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহের রাজত্বকালেই এই ব্যাপার সংঘটিত হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, 'চৈতন্যভাগবতে' হরিদাস ঠাকুরের প্রসঙ্গে বারবার যে 'মুলুক-পতি'র উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি কে? প্রথমে আমাদের দেখা দরকার 'মুলুক' শব্দের অর্থ কী? 'মুলুক' শব্দের দ্বারা সেযুগে সমগ্র দেশ বোঝাত না, দেশের একটা বিশেষ অঞ্চল বোঝাত। সমসাময়িক কবি বিজয় গুপ্ত লিখেছেন "মুল্লুক ফতেয়াবাদ বাঙ্গরোড়া তকসিম।" বৃন্দাবনদাস 'চৈতন্যভাগবতে'র অন্ত্যখণ্ডের ৫ম অধ্যায়ে লিখেছেন, "এইমতে সপ্তগ্রামে আম্বুয়া মুলুকে বিহরেন নিত্যানন্দস্বরূপ কৌতুকে॥ "('সপ্তগ্রাম' ও 'আম্বুয়া' দুটি ভিন্ন ভিন্ন 'মুলুক'।) কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র অন্ত্যলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে লিখেছেন, "হেনকালে মুলুকের এক ম্লেচ্ছ অধিকারী। সপ্তগ্রাম মুলুকের সে হয় চৌধুরী॥ হিরণ্যদাস মুলুক নিল মোকতা করিয়া।" ইত্যাদি। সুতরাং বৃন্দাবনদাস 'মুলুক-পতি' অর্থে আঞ্চলিক শাসন-কর্তা বুঝিয়েছেন সন্দেহ নেই। হরিদাসের ব্যাপারে এই মুলুক-পতির ভূমিকাটি একটু বিচিত্র ধরণের। হরিদাসকে হিন্দুর আচার বর্জন করতে ও কলিমা উচ্চারণ করতে উপদেশ দিয়ে তিনি যে সব কথা বলেছিলেন, তাতে তাঁর হিন্দু-বিদ্বেষ ও ইসলামধর্মে নিষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে বটে, কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাতেই তাঁকে কাজীদের তুলনায় অনেকখানি উদার মনোভাব অবলম্বন করতে দেখতে পাই। শেষ পর্যন্ত তিনি হরিদাসের অপার্থিব মহিমা স্বীকার করে নিয়ে তাঁকে ইচ্ছামত ধর্মাচরণের স্বাধীনতাও দিয়েছেন।

আসল কথা—কাজীরা সচরাচর যেমন হত, জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহের কাজীরাও ছিল সেই প্রকৃতির। তারা ইসলাম ধর্মের আইনকানুন বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত এবং ধর্ম নিয়ে গোঁড়ামির পরাকাষ্ঠা দেখাত। হরিদাস মুসলমান হয়েও হিন্দুর মত আচরণ ও হরিনাম করেন, এ

ব্যাপারকে তারা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ বলেই মনে করেছিল। (হরিদাস জন্ম-মুসলমান ছিলেন কিনা তা বিতর্কের বিষয়। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে লেখা আছে যে হরিদাস আসলে হিন্দুর সন্তান এবং তাঁর পিতামাতার নাম যথাক্রমে মনোহর ও উজ্জ্বলা। অবশ্য প্রাচীনতম চৈতন্যচরিতকার মুরারি গুপ্ত তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্' গ্রন্থে লিখেছেন যে হরিদাস "যবনকুলে" জন্মগ্রহণ করেছিলেন।)

কিন্তু 'মুলুক-পতি' এইসব কাজীদের মত উগ্র সাম্প্রদায়িক-মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন না। যদিও তিনি কাজীর নির্বন্ধে হরিদাসের মত পরিবর্তনের চেষ্টা করেছেন এবং সেই চেষ্টা করতে গিয়ে হিন্দুদের বিরুদ্ধে কয়েকটি কথা বলেছেন, কিন্তু হরিদাসের সঙ্গে ব্যবহারে তিনি ভদ্রতা রক্ষা করেছেন ও উদার মনোভাব দেখিয়েছেন। হরিদাসকে যে নিষ্ঠুর শাস্তি দেওয়া হল, তা কাজীদেরই কথায়, তাঁর নিজের ইচ্ছায় নয়। হরিদাস যখন মৃতবৎ প্রতীয়মান হলেন, তখন মুলুক-পতি তাঁকে কোন অসম্মান দেখাননি, ইসলামের রীতি অনুযায়ী কবর দিতেই বলেছেন, কাজীরাই তার বিরুদ্ধাচরণ করল। 'মুলুক-পতি'র উদার মনোভাবের চরম দৃষ্টান্ত দেখা যায় হরিদাসের মহিমা স্বীকার ও ধর্মাচরণের সুযোগ দানের মধ্যে।

কোন কোন চৈতন্যচরিতগ্রন্থে চৈতন্যদেবের জন্মের উল্লেখ প্রসঙ্গে তৎকালীন গৌড়েশ্বর সম্বন্ধে দু' একটি কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। যেমন জয়ানন্দের 'চৈতন্য-মঙ্গলে' লেখা আছে চৈতন্যদেবের জন্মের অব্যবহিত আগে নবদ্বীপে এই ঘটনা ঘটেছিল,

> আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়।
> ব্রাহ্মণ ধরিঞা রাজা জাতি প্রাণ লয়॥
> নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে।
> ধন প্রাণ লয়ে তার জাতি নাশ করে॥
> কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কান্ধে।
> ঘর দ্বার লোটে তার সেই পাশে বান্ধে॥
> দেউলে দেহরা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী।
> প্রাণভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপবাসী॥
> গঙ্গাস্নান বিরোধিল হাট ঘাট যত।
> অশ্বত্থ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত॥

পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ ॥
ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে।
বিষম পিরল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে ॥
গৌড়েশ্বর বিদ্যমানে দিল মিথ্যাবাদ।
"নবদ্বীপ বিপ্র তোমার করিল প্রমাদ ॥
'গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হব' হেন আছে।
নিশ্চিন্তে না থাকিও প্রমাদ হব পাছে ॥
নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ অবশ্য হব রাজা।
গন্ধর্ব্বে লিখন আছে ধনুর্দ্ধর প্রজা ॥"
এই মিথ্যা কথা রাজার মনেতে লাগিল।
নদীয়া উচ্ছন্ন কর রাজা আজ্ঞা দিল ॥
বিশারদসুত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
সবংশে উৎকল গেলা ছাড়ি গৌড় রাজ্য ॥
উৎকলে প্রতাপরুদ্র ধনুর্দ্ধর রাজা।
রত্নসিংহাসনে সার্ব্বভৌমে কৈল পূজা ॥
তার ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি গৌড়ে বসি।
বিশারদ নিবাস করিল বারাণসী ॥
বিদ্যাবিরিঞ্চি বিদ্যারণ্য নবদ্বীপে।
ভট্টাচার্য্যশিরোমণি সভার সমীপে ॥
নদীয়া উচ্ছন্ন হেন শুনি গৌড়েশ্বর।
রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখে মহা ঘোরতর ॥
কালী খড়্গ-খর্পরধারিণী দিগম্বরী।
মুণ্ডমালা গলে কাট কাট শব্দ করি ॥
ধরিয়া রাজার কেশে বুকে মারে শেল।
কর্ণরন্ধ্রে নাসারন্ধ্রে ঢালে তপ্ত তেল ॥
"আজি তোর গঙ্গায় পেলিমু গৌড়পাট।
সবংশে কাটিমু তোর হস্তী ঘোড়া ঠাট ॥"
গৌড়েন্দ্র বলিল "মাতা মোর দেহে থাক।
নবদ্বীপে বসাইব আজি প্রাণ রাখ ॥"

নাকে খত দিল রাজা তবে কালী ছাড়ে।
মূর্ছা গেল গৌড়েন্দ্র ধরণীতলে পড়ে ॥
প্রভাতে কহিল স্বপ্ন রাজবিশ্বাসে।
শুনিয়া আশ্চর্য স্বপ্ন সর্ব্বলোক ত্রাসে ॥
গৌড়েন্দ্রের আজ্ঞা "নবদ্বীপ সুখে বসু।
রাজকর নাহি সর্ব্বলোক চাষ চষু ॥
আজি হৈতে হাট ঘাট বিরোধ যে করে।
রাজকর দণ্ডী হয়ে ত্রিশূল সে পরে ॥
দেউল দেহরা ভাঙ্গে অশ্বথ যে কাটে।
ত্রিশূলে চড়াহ তাকে নবদ্বীপের হাটে ॥
বৈদ্য ব্রাহ্মণ জত নবদ্বীপে বসে।
নানা মহোৎসব কর মনের হরিষে ॥
নাট গীত বাদ্য বাজু প্রতি ঘরে ঘরে।
কলসে পতাকা উড়ু মন্দির উপরে ॥
পুষ্পের বাজার পড়ু গন্ধের উভার।
শঙ্খ ঘণ্টা বাজুক যন্ত্র জয় জয়কার ॥
পূর্ব্বে জেমত ছিল নবদ্বীপ রাজধানী।
তার শতগুণ অধিক জেন শুনি ॥
নবদ্বীপ সীমাএ যবন যদি দেখ।
আপন ইৎসাএ মার প্রাণে পাছে রাখ ॥
দেবপূজা কর সুখে যজ্ঞ হোম দান।
হাট ঘাট মানা নাহি কর গঙ্গাস্নান ॥
নবদ্বীপে প্রজাএ কি মোর অধিকার।
সত্য সত্য বলি আমি সংসারের সার ॥"
রাজার আজ্ঞাএ নবদ্বীপ পুন সৃষ্টি।
শরৎকালে রাত্রিশেষে হৈল পুষ্পবৃষ্টি ॥
মহা মহাজন যে ছাড়িঞা ছিল গ্রাম।
নবদ্বীপে আইলা সভে পূর্ণ হৈল কাম ॥

জয়ানন্দের এই বিবরণের প্রত্যক্ষ সমর্থন অন্য কোন সূত্র থেকে পাওয়া যায় না বটে, তবে বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবতে' এর পরোক্ষ সমর্থন মেলে।

'চৈতন্যভাগবত' আদিখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বৃন্দাবনদাস লিখেছেন যে চৈতন্যদেবের জন্মের কিছু আগে

চারি ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজঘরে।
নিশা হৈলে হরিনাম গায় উচ্চৈঃস্বরে॥
শুনিয়া পাষণ্ডী বোলে "হইল প্রমাদ।
এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ॥
মহাতীব্র নরপতি যবন ইহার।
এ আখ্যান শুনিলে প্রমাদ নদীয়ার॥

শেষ দুই ছত্র থেকে বোধ হয় হিন্দু ধর্মের প্রতি ও নবদ্বীপের হিন্দুদের প্রতি তৎকালীন সুলতান জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহের পূর্ব-ব্যবহার সুবিধাজনক ছিল না এবং তার কথা মনে রেখেই "পাষণ্ডী" রা এই কথা বলেছে। এই জন্য মনে হয়, জয়ানন্দের বিবরণ মূলত সত্য এবং জয়ানন্দ-বর্ণিত ঘটনার কথা মনে করেই "পাষণ্ডী"রা এই উক্তি করেছিল।

জয়ানন্দ লিখেছেন যে পিরল্যা গ্রামের মুসলমানরা গৌড়েশ্বরের কাছে বলেছিল,

'গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হব' হেন আছে।

অর্থাৎ গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হবে বলে প্রবাদ আছে। এই প্রবাদ যে তখন সত্যিই ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল, তা বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবতে'র একাধিক অংশ থেকে জানতে পারি। চৈতন্যভাগবতের আদিখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বৃন্দাবনদাস লিখেছেন যে সদ্যোজাত চৈতন্যদেবের রূপ এবং লগ্নে "মহারাজ-লক্ষণ" দেখে তাঁর মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী বলেছিলেন,

'বিপ্ররাজা গৌড়ে হইবেক' হেন আছে।
বিপ্র বোলে 'সেই বা জানিব তা পাছে'॥

আবার বৃন্দাবনদাস আদিখণ্ডের অষ্টম অধ্যায়ে লিখেছেন যে যুবক অধ্যাপক চৈতন্যদেব যখন শিষ্যদের সঙ্গে গঙ্গাতীরে বসেছিলেন, সেই সময় তাঁর অনিন্দ্য সুন্দর মূর্তি দেখে

কেহো বোলে 'বিপ্র রাজা হইবেক গৌড়ে।
সেই এই, হেন বুঝি কখনো না নড়ে'॥

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের আর একটি অংশ থেকে জয়ানন্দের বিবরণের

স্পষ্টতর সমর্থন পাওয়া যায় বলে আমরা মনে করি। এখন সে সম্বন্ধে আলোচনা করছি।

গঙ্গাদাস পণ্ডিত ছিলেন চৈতন্যদেবের শিক্ষাগুরু এবং নবদ্বীপের বিশিষ্ট পণ্ডিতদের অন্যতম। 'চৈতন্যভাগবত' মধ্যখণ্ডের নবম অধ্যায়ে লেখা আছে যে গঙ্গাদাস পণ্ডিত একবার রাজভয়ে দেশ (সম্ভবত নবদ্বীপ) ছেড়ে পালিয়েছিলেন। 'চৈতন্যভাগবতে'র মতে নবদ্বীপলীলার সময় মহাপ্রভু যখন শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে ঐশ্বর্য ভাব প্রকাশ করেছিলেন, সেই সময়ই তিনি গঙ্গাদাস পণ্ডিতকে এই অতীত কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। 'চৈতন্যভাগবতে'র উক্তি আমরা নীচে উদ্ধৃত করছি,

> গঙ্গাদাসে দেখি বোলে, তোর মনে জাগে।
> রাজ-ভয়ে পলাইস্ যবে নিশাভাগে॥
> সর্ব্ব-পরিকর সনে আসি খেয়াঘাটে।
> কোথায় নাহিক নৌকা পড়িলা সঙ্কটে॥
> রাত্রি শেষ হৈল তুমি নৌকা না পাইয়া।
> কান্দিতে লাগিলা অতি দুঃখিত হইয়া॥
> মোর আগে যবনে স্পর্শিবে পরিবার।
> গাঙ্গে প্রবেশিতে মন হইল তোমার॥
> তবে আমি নৌকা নিয়া খেয়ারির রূপে।
> গঙ্গায় বাহিয়া যাই তোমার সমীপে॥
> তবে নৌকা দেখি তুমি সন্তোষ হইলা।
> অতিশয় প্রীত করি কহিতে লাগিলা॥
> আরে ভাই আমারে রাখহ এইবার।
> জাতি প্রাণ ধন দেহ সকলি তোমার॥
> রক্ষা কর পরিকর সঙ্গে কর পার।
> এক তঙ্কা এক যোড় বস্ত্র সে তোমার॥
> তবে তোমা সঙ্গে পরিকর করি পার।
> তবে নিজ বৈকুণ্ঠে গেলাঙ আরবার॥

উদ্ধৃত অংশে বলা হয়েছে যে চৈতন্যদেব সে সময় বৈকুণ্ঠে ছিলেন এবং গঙ্গাদাস পণ্ডিতের বিপদের সময় তিনি বৈকুণ্ঠ থেকে নেমে এসে মাঝির মূর্তি ধরে গঙ্গাদাসকে নির্বিঘ্নে গঙ্গা পার করিয়ে দিয়ে বৈকুণ্ঠে ফিরে গিয়েছিলেন।

সুতরাং গঙ্গাদাসের রাজভয়ে দেশত্যাগ চৈতন্যদেবের জন্মের আগে ঘটেছিল সন্দেহ নেই (বলা বাহুল্য, আসলে সাধারণ একজন মাঝিই গঙ্গাদাসকে গঙ্গা পার করিয়ে দিয়েছিল)। যে সময় জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহের আদেশে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের উপর ব্যাপকভাবে এই ধরণের অত্যাচার করা হয়েছিল বলে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে লেখা আছে, তার সঙ্গে এই ঘটনার সময় প্রায় মিলে যায়। জয়ানন্দ গৌড়েশ্বরের যে অত্যাচারের বর্ণনা দিয়েছেন, বৃন্দাবনদাস তারই একটি অংশ উপরে উদ্ধৃত বিবরণের মধ্যে উপস্থাপিত করেছেন বলে মনে হয়।

সুতরাং জয়ানন্দের উল্লিখিত বিবরণ মোটামুটিভাবে সত্য বলেই মনে হয়। অবশ্য বলা বাহুল্য, ঐ বর্ণনা আক্ষরিকভাবে সত্য হতে পারে না। কারণ কোন মুসলমান গৌড়েশ্বর নবদ্বীপের হিন্দুদের ঢালাও হুকুম দিতে পারেন না যে,

নবদ্বীপ সীমাএ যবন যদি দেখ।
আপন ইৎসাএ (ইচ্ছায়) মার প্রাণে পাছে রাখ ॥

এর মধ্যে উল্লিখিত আরও কোন কোন বিষয়ের যাথার্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে। এতে বলা হয়েছে এই সঙ্কটের সময়েই (বাসুদেব) সার্বভৌম বাংলাদেশ ছেড়ে উৎকলে চলে যান এবং উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্র তাঁকে বরণ করে নেন। কিন্তু এই ঘটনা ঘটেছিল চৈতন্যদেবের জন্মের আগে আর উৎকলরাজ প্রতাপ-রুদ্র চৈতন্যদেবের জন্মের ১১ বছর পরে, ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। অবশ্য সার্বভৌমের উৎকলে গমনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতাপরুদ্রের কাছে সংবর্ধনালাভ ঘটেছিল, একথা বলা জয়ানন্দের অভিপ্রেত না-ও হতে পারে। এছাড়া কোন কোন কোন পণ্ডিত প্রশ্ন তুলেছেন যে, সার্বভৌমের উপর যদি রাজরোষ গিয়ে পড়ল, তাহলে তাঁর ভাই তার থেকে অব্যাহতি পেলেন কেমন করে? সার্বভৌম উড়িষ্যায় চলে যাবার পরও তাঁর ভাই বিদ্যাবাচস্পতি বাংলাদেশেই থেকে গিয়েছিলেন। জয়ানন্দ নিজেই লিখেছেন, "তার ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি গৌড়ে বসি"।* এ সম্বন্ধে আরও বহু প্রমাণ আছে। সুতরাং

* এর অর্থ এ' ও হতে পারে যে—'বিদ্যাবাচস্পতি গৌড় নগরে বাস করছিলেন।' ভক্তিরত্নাকরের মতে বিদ্যাবাচস্পতি গৌড় নগরের সংলগ্ন রামকেলি গ্রামে মাঝে মাঝে বাস করতেন। জয়ানন্দের বিবরণ থেকে দেখা যায় যে, গৌড়েশ্বর নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের উপরেই রুষ্ট হয়ে তাঁদের "জাতি প্রাণ" নিতে আদেশ দিয়েছিলেন। গৌড় নগরের ব্রাহ্মণদের উপর তাঁর রুষ্ট হওয়ার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। বিদ্যাবাচস্পতি গৌড় নগরে থাকার জন্যই হয়তো রাজরোষ থেকে অব্যাহতি পেয়ে-ছিলেন।

আলোচ্য বিবরণে উল্লিখিত সার্বভৌমের রাজভয়ে দেশত্যাগের প্রসঙ্গটির ঐতিহাসিকতা সন্দেহের অতীত নয়। গৌড়েশ্বরকে কালী দেবী স্বপ্নে দেখা দিয়ে ভয় দেখিয়েছিলেন এবং গৌড়েশ্বর ভীত হয়ে অত্যাচার বন্ধ করেছিলেন—এই কথা কবিকল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এ সমস্ত বিষয় বাদ দিলে যেটুকু থাকে, তা বাস্তব ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত বলে মনে হয়। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের উপর মুসলমানদের যে ধরনের অত্যাচারের কথা জয়ানন্দ লিখেছেন, জলালুদ্দীন ফতেহ্‌ শাহের রাজত্বকালে রচিত বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলের হাসন-হোসেন পালাতেও সেই ধরনের অত্যাচারের বর্ণনা পাওয়া যায়। গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হবে বলে লোকে বলাবলি করছে, এ খবর গৌড়ের সুলতানের কানে নিশ্চয়ই উঠেছিল। চৈতন্যদেবের জন্মের কিছু আগেই নবদ্বীপ বাংলা তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হিসাবে গড়ে ওঠে এবং এখানকার ব্রাহ্মণেরা সব দিক দিয়েই সমৃদ্ধি অর্জন করেন। বাইরের থেকেও অনেক ব্রাহ্মণ নবদ্বীপে আসতে থাকেন। এই সব ব্যাপার দেখে গৌড়েশ্বরের বিচলিত হওয়া এবং এতগুলি ঐশ্বর্যবান ব্রাহ্মণ এক জায়গায় মিলে হয়তো গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হওয়ার প্রবাদ সার্থক করে তোলার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে ভাবা খুব স্বাভাবিক। এর কয়েক দশক আগে বাংলাদেশে রাজা গণেশের অভ্যুত্থান হয়েছিল। দ্বিতীয় কোন হিন্দু অভ্যুত্থানের আশঙ্কায় পরবর্তী গৌড়েশ্বররা নিশ্চয়ই সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতেন। সুতরাং এক শ্রেণীর মুসলমানের উস্কানিতে তৎকালীন গৌড়েশ্বর জলালুদ্দীন ফতেহ্‌ শাহ্‌ নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার করেছিলেন এবং পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে অত্যাচার বন্ধ করে নবদ্বীপের ক্ষতিপূরণ করেছিলেন, একথা সত্য বলেই আমি মনে করি।

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' (সাহিত্য-পরিষদ-সংস্করণ, নদীয়া খণ্ড, পৃঃ ১৯) লেখা আছে যে চৈতন্যদেব যখন শিশু, তখন একবার ছেলেধরা রাজার দূতেরা তাঁকে ধরতে এসেছিল, কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। উপরন্তু সর্পাঘাতে এইসব রাজদূতের মৃত্যু হয়। জয়ানন্দ লিখেছেন,

রাত্রি দিনে গৌরচন্দ্র নদীয়া নগরে।
বালক্রীড়া করি বুলে সভার মন্দিরে॥
ছালিআ ধরা রাজার দূত দেখি আচম্বিতে।
পন্থে দিশা না পাইঞা কান্দিতে কান্দিতে॥

অন্ধকূপে পড়িঞা রহিলা দূতের ডরে।
চাহিঞা বুলে দূত সব প্রতি ঘরে ঘরে॥
উদ্দেশ পাইঞা দূত ধরিয়া আনিল।
কূপে হৈতে মহাসর্প দূতেরে খাইল॥
সর্পাঘাতে রাজদূত মইল রাজপথে।
ঘরে আসি হাসে নাচে গৌর জগন্নাথে॥

এই ঘটনা যদি সত্যই ঘটে থাকে, তাহলে চৈতন্যদেবের দেড় থেকে সাত বছর বয়সের মধ্যে অর্থাৎ ১৪৮৭ থেকে ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ঘটেছিল। ঐ কয় বছরের মধ্যে অনেকজন রাজা পর পর সিংহাসনে বসেছিলেন। সুতরাং কোন্ রাজার দূত শিশু গৌরাঙ্গকে চুরি করতে এসেছিল, তা বলার বর্তমানে কোন উপায় নেই। কিন্তু রাজদূতেরা একটি অবোধ শিশুকে কেন হরণ করতে আসবে, তার কোন ব্যাখ্যা জয়ানন্দ দেন নি। কোন ধর্মোন্মাদ সুলতান কি তখন হিন্দু বালকদের অপহরণ করিয়ে মুসলমান করছিলেন? অবশ্য এই শিশু-হরণের পিছনে আরও একটি কারণ থাকতে পারে। পর্তুগীজ পর্যটক বারবোসা ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি লিখেছেন যে, সে সময় একদল লোক—"পৌত্তলিক" (হিন্দু) বালকদের অপহরণ করে "মুরিশ" (মুসলমান) বণিকদের কাছে বিক্রয় করত, তারপর সেইসব হতভাগ্য বালকদের খোজা করা হত। জয়ানন্দের এই বিবরণ পড়ে মনে হয়, সে সময় কোন কোন সুলতানও হিন্দু বালকদের অপহরণ করিয়ে খোজা বানাতেন, ভবিষ্যতে নিজের কাজে তাদের লাগাবার জন্যে। অবশ্য জয়ানন্দের উক্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নেই। অন্যত্র (সা. প. সং., উত্তর খণ্ড, পৃঃ ১৪৭) জয়ানন্দ লিখেছেন,

রাজার মানুষ আসি ধরি লৈঞা জাএ।
হরি বোলাইঞা প্রভু তাহারে কান্দাএ॥

এখানে আবার তিনি একটু ভিন্ন রকমের কথা বললেন; শিশু নিমাই শুধু ছেলেধরা রাজদূতদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করেন নি, তাদের হরি বলিয়ে কাঁদিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, এই উক্তি আরো অবিশ্বাস্য।

ইতিপূর্বে আমরা 'চৈতন্যভাগবতে'র কয়েকটি বিবরণের উল্লেখ করেছি। এগুলি থেকে জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহের রাজত্বকালে দেশের, বিশেষত হিন্দু সম্প্রদায়ের কীরকম অবস্থা ছিল, সে সম্বন্ধে খানিকটা আভাস পাওয়া যায়।

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত থেকে জলালুদ্দীন ফতে শাহের রাজত্বকালের আরও কয়েকটি ঘটনার কথা জানা যায়। আদিখণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে বৃন্দাবনদাস গৌরাঙ্গের নামকরণের এই বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন,

বোলেন বিদ্বান সব করিয়া বিচার।
"এক নাম যোগ্য হয় রাখিতে ইহার॥
এ শিশু জন্মিলে মাত্র সর্ব্ব দেশে দেশে।
দুর্ভিক্ষ ঘুচিল বৃষ্টি পাইল কৃষকে॥
জগৎ হইল সুস্থ ইহান জনমে।
পূর্ব্বে যেন পৃথিবী ধরিলা নারায়ণে॥
অতএব ইহান শ্রীবিশ্বম্ভর নাম।"

এখানে গৌরাঙ্গের 'বিশ্বম্ভর' নাম হওয়ার যে কারণ লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা অবিশ্বাস করার কোন হেতু নেই। সুতরাং চৈতন্যদেবের জন্মের ঠিক আগের বছর অর্থাৎ ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে যে জলালুদ্দীন ফতেহ্‌ শাহের রাজ্যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, সেই তথ্য এখানে পাচ্ছি।

হরিদাস ঠাকুর মুসলমান রাজকর্মচারীদের হাতে নির্যাতিত হবার পর যখন ফুলিয়ায় ফিরে গিয়ে সংকীর্তন সুরু করেছিলেন, তখন সেখানকার ব্রাহ্মণেরাও তাতে যোগ দিয়েছিলেন। তাই দেখে "পাষণ্ড" লোকেরা এই কথা বলেছিল বলে বৃন্দাবনদাস আদিখণ্ড ১১শ অধ্যায়ে লিখেছেন,

"এ বামনগুলা রাজ্য করিবেক নাশ।"

কেহো বোলে "যদি ধানে কিছু মূল্য চড়ে।
তবে এগুলারে ধরি কিলাইমু ঘাড়ে॥"

এর থেকে বোঝা যায়, সে সময় লোকে সর্বদা দুর্ভিক্ষের ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকত। ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষই সম্ভবত তাদের মনে এই আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল।

'চৈতন্যভাগবত' আদিখণ্ডের একাদশ অধ্যায়েই বৃন্দাবনদাস লিখেছেন যে 'মুলুক-পতি'র আদেশে যখন হরিদাসকে বন্দিশালায় প্রেরণ করা হয়, তখন অনেক বড় বড় লোক কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন এবং হরিদাস তাদের মধ্যে আসছেন শুনে তাঁরা খুব খুশী হয়েছিলেন,

বড় বড় লোক যত আছে বন্দি-ঘরে।
তারা সব হৃষ্ট হৈলা শুনিয়া অন্তরে॥

এইসব "বড় বড় লোক"রা যে হিন্দু ছিলেন ও রাজা-জমিদারের পর্যায়ভুক্ত ছিলেন, তা এর অব্যবহিত পরবর্তী অংশ থেকে জানা যায়। বৃন্দাবনদাস লিখেছেন যে হরিদাস এই সমস্ত বন্দীদের আশীর্বাদ করার সময় বললেন,

"এবে নিত্য কৃষ্ণনাম কৃষ্ণের চিন্তন।
সভে মিলি করিতে আছহ অনুক্ষণ॥
এবে হিংসা নাহি—নাহি প্রজার পীড়ন।
কৃষ্ণ বলি কাকুর্বাদে করহ চিন্তন॥
আর বার গিয়া বিষয়েতে প্রবর্তিলে।
সভে ইহা পাসরিবে গেলে দুষ্ট-মেলে॥"

এর থেকে বোঝা যায়, জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহের রাজত্বকালে অনেক ধনী হিন্দু ভূস্বামীকে কোন কোন সময় কারাগারে আবদ্ধ করে রাখা হত। কিন্তু কেন? অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুর্শিদকুলী খাঁ হিন্দু জমিদারদের খাজনা বাকী পড়লে তাঁদের কারাগারে আবদ্ধ করতেন এবং নানারকম দুর্ব্যবহার করতেন। জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহের এই আচরণের পিছনেও কি অনুরূপ কারণ বর্তমান ছিল? না এটা নিছক হিন্দু-বিদ্বেষের ফল? বর্তমানে এইসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া যাবে না।

জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহের রাজত্বকালের যে সমস্ত ঘটনার কথা জানা যায়, সেগুলি আমরা উল্লেখ করলাম। এদের থেকে রাজা হিসাবে তিনি কীরকম ছিলেন সে সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা যায়। হিন্দু প্রজাদের উপর তিনি অন্তত কয়েকবার অত্যাচার করেছেন এবং তাঁর পূর্ববর্তী সুলতান শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহের মত তিনিও হিন্দু-বিদ্বেষ হতে মুক্ত হতে পারেননি। রুকনুদ্দীন বারবক শাহ যে উদার অসাম্প্রদায়িক নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তা এই দু'জন সুলতান অনুসরণ করেননি। সেই হিসাবে জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহকে প্রশংসা করা যায় না। তাঁর রাজত্বকালে রাজ্যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, এটাও তাঁর পক্ষে অগৌরবের বিষয়। কিন্তু মোটের উপর জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহ সুশাসক ছিলেন এবং শাসনদক্ষতার পরিচয় দিয়ে ও নানা জনহিতকর কাজ করে জনসাধারণের মনে রেখাপাত করেছিলেন, সমসাময়িক কবি বিজয় গুপ্তের উক্তি এবং 'তবকাৎ-ই-আকবরী' ও 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে'র বিবরণ পড়ে এই

কথাই মনে হয়। জলালুদ্দীন ফতেহ্‌ শাহের অধীনস্থ কর্মচারী এবং আঞ্চলিক শাসনকর্তাদের মধ্যে যে উৎকট সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা প্রাধান্য লাভ করেছিল,—বিজয় গুপ্ত, বৃন্দাবনদাস এবং জয়ানন্দের বিবরণ পড়লে তা পরিষ্কার বোঝা যায়। অবশ্য এঁদের মধ্যেও যে ভদ্র এবং উদার প্রকৃতির লোকের অভাব ছিল না, হরিদাস ঠাকুরের প্রসঙ্গে উল্লিখিত 'মুলুক-পতি'ই তার দৃষ্টান্ত।

যাহোক, এবিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, জলালুদ্দীন ফতেহ্‌ শাহ্‌ জবরদস্ত প্রকৃতির রাজা ছিলেন। বৃন্দাবনদাস যে তাঁকে "মহাতীব্র নরপতি" বলেছেন, তা অযথার্থ নয়। কেউ অন্যায় করলেই তিনি কঠোর হাতে তাকে শাস্তি দিতেন এবং এই কঠোর আচরণের ফলেই তাঁকে অকালে রাজ্য ও প্রাণ দুইই হারাতে হয়। নীচে তাঁর সেই করুণ পরিণতির বিবরণ লিপিবদ্ধ হল। এই বিবরণ পড়লে মনে হয়, জলালুদ্দীন ফতেহ্‌ শাহের চরিত্রে বলিষ্ঠতা ছিল, কিন্তু তিনি কৌশলী ছিলেন না। তাই দুর্বিনীত কর্মচারীদের তিনি বশে রাখতে পারেন নি।

এই সময়ে হাব্‌শীদের প্রতিপত্তি খুবই বেড়েছিল। রাজধানী, রাজপ্রাসাদ—সর্বত্রই তারা মারাত্মক রকমের প্রতাপশালী হয়ে উঠেছিল। তারা অনেক সময় রাজার আদেশও মানত না। ফিরিশ্‌তা লিখেছেন, ফতেহ্‌ শাহ খোজা ও হাব্‌শী ক্রীতদাসদের সংশোধন করেছিলেন। তাদের মধ্যে যারা সুলতানের আদেশ অমান্য করত, ফতেহ্‌ শাহ তাদের উপরে কঠোর হাতে "ন্যায়ের চাবুক" প্রয়োগ করতেন। এইভাবে তিনি বারবক শাহ ও য়ুসুফ শাহের আমলে হাব্‌শীরা যে প্রতিপত্তি লাভ করেছিল, তা খানিকটা কমালেন। যাদের তিনি শাস্তি দিতেন, তারা খওয়াজা সেরা (প্রাসাদের প্রধান খোজা) এবং প্রাসাদ-রক্ষী পাইকদের সর্দার বারবকের সঙ্গে মিলে রাজার বিরুদ্ধে দল পাকাত। বারবকেরই হাতে রাজপ্রাসাদের সব চাবি ছিল।

এর পরের ঘটনা সম্বন্ধে 'তবকাৎ-ই-আকবরী', 'মাসির-ই-রহিমী', 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা', 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীন'—সব গ্রন্থই একমত। নীচে 'তবকাৎ-ই-আকবরী'র বর্ণনা উদ্ধৃত হল।

"বাংলাদেশে একটি প্রথা ছিল এই যে প্রতি রাত্রিতে পাঁচ হাজার পাইক (রাজাকে) পাহারা দিত। অতি প্রত্যুষে বাদশাহ বেরিয়ে এসে মুহূর্তকাল সিংহাসনে বসে তাদের অভিবাদন গ্রহণ করতেন এবং চলে যাবার অনুমতি

দিতেন। তখন আর একদল পাইক হাজিরা দিতে আসত। একদিন ফতেহ্ শাহের প্রধান খোজা পাইকদের টাকা দিয়ে হাত করল এবং (তার ফলে) তারা সুলতানকে হত্যা করল। পরের দিন প্রত্যুষে ঐ খোজা নিজেই সিংহাসনে বসে পাইকদের অভিবাদন গ্রহণ করল।”

অন্যান্য বইগুলিতেও এই কথাই লেখা আছে। পূর্বোক্ত খওয়াজা সেরা বারবকই জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহকে হত্যা করে রাজা হয়ে বসে। ফিরিশ্তা লিখেছেন যে এই সময় ফতেহ্ শাহের উজীর খোজা খান জহান এবং আমীর-উল-উমারা (প্রধান অমাত্য) মালিক আন্দিল রাজধানীতে ছিলেন না, তাঁরা সীমান্ত অঞ্চলের রায়দের (হিন্দু জমিদারদের) শাস্তি দেবার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন; তারই ফলে খওয়াজা সেরা সুলতানকে হত্যা করতে পেরেছিল।

জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহের রাজ্যের আয়তন বেশ বিশাল ছিল। শাসনকর্তা হিসাবে তাঁর দক্ষতা এর থেকে খানিকটা বোঝা যায়। তাঁর যে সমস্ত মুদ্রা এপর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের অধিকাংশের মধ্যে “কোষাগার” ও “টাকশাল” ভিন্ন আর কোন নির্মাণস্থানের উল্লেখ নেই, কেবল কয়েকটি মুদ্রায় ফতেহাবাদ এবং একটি মুদ্রায় মুহম্মদাবাদের নাম পাওয়া যায়। আজ পর্যন্ত এইসব জায়গায় তাঁর শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে :—

খোন্দকারতলা (ঢাকা), ধামরাই (ঢাকা), দেবীকোট (দিনাজপুর), রামপাল (ঢাকা), মগরাপাড়া (ঢাকা), গৌড়, মেহদীপুর (মালদহ), সাতগাঁও (হুগলী)।

জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহের সমসাময়িক কবি বিজয় গুপ্ত তাঁর দেশের চতুঃসীমার এই বর্ণনা দিয়েছেন,

মুল্লুক ফতেয়াবাদ বাঙ্গরোড়া তকসিম ॥
পশ্চিমে ঘাঘর নদী পুবে ঘণ্টেশ্বর।
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিতনগর ॥

এই অঞ্চল জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহের রাজ্যভুক্ত ছিল। ফতেহাবাদের টাকশালে জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহের মুদ্রা উৎকীর্ণ হয়েছিল, এ কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সুতরাং উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল দেখা যাচ্ছে।

বিভিন্ন শিলালিপি থেকে জলালুদ্দীন ফতেহ্‌ শাহের এইসব কর্মচারীর নাম পাওয়া যায় :—

(১) **সৈয়দ দস্তুর**
(২) **দৌলত খান**
(৩) **মজলিস নূর**
(৪) **মালিক কাফুর**
(৫) **আখন্দ শের**

জলালুদ্দীন ফতেহ্‌ শাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে মাহ্‌মূদ শাহী বংশের রাজত্ব শেষ হল। অনেকের মতে পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহও এই বংশের লোক, কিন্তু তিনি শুধু নামেই রাজা ছিলেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে মাহ্‌মূদ শাহীর বংশের নাম উজ্জ্বল অক্ষরেই লেখা থাকবে। এই বংশের রাজারা ইলিয়াস শাহী বংশোদ্ভব কিনা জানি না, তবে পূর্ববর্তী ইলিয়াস শাহী স্থলতানদের সঙ্গে এঁদের সব বিষয়েই স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়। আগেকার ইলিয়াস শাহী স্থলতানরা বাংলাদেশকে মনে-প্রাণে স্বদেশ বলে গ্রহণ করেছিলেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু এই বংশের রাজারা বাঙালী বলেই গণ্য হবেন। কারণ যে সময় রাজা গণেশ ও তাঁর বংশধরেরা ইলিয়াস শাহী বংশকে ক্ষমতাচ্যুত করে বাংলাদেশ শাসন করছিলেন, সে সময় এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহ বাংলার জনসাধারণের মধ্যেই আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং একটি বিবরণীর মতে বাংলার নিভৃত পল্লীতে কৃষিকার্য করে জীবিকানির্বাহ করছিলেন। সিংহাসন অধিকার করে এই বংশের রাজারা শাসনকার্যে সহযোগিতা করার জন্য এই দেশেরই লোকদের আহ্বান করলেন—সম্প্রদায়-নির্বিশেষে। এই বংশেরই একজন রাজা বিদ্যা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণের আদর্শ স্থাপন করলেন—বিধর্মী পণ্ডিতেরাও তাঁর আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হল না। এই বংশের চারজন রাজাই (সিকন্দর শাহকে হিসাবের মধ্যে ধরছি না)—নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহ, রুকনুদ্দীন বারবক শাহ, শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহ ও জলালুদ্দীন ফতেহ্‌ শাহ—অত্যন্ত সুযোগ্য রাজা ছিলেন। শেষ দু'জন রাজা সময় সময় হিন্দুদের উপর অত্যাচার করেছিলেন, কিন্তু মোটের উপর এঁরা সুশাসক হিসাবেই সুনাম অর্জন করেছিলেন। আমার বিশ্বাস, যদি কোনদিন এই রাজবংশের বিস্তৃত ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহলে অনেক গৌরবময় ও মনোহর ঘটনা বিস্মৃতির অন্তরাল থেকে আত্মপ্রকাশ করবে।

চতুর্থ অধ্যায়

হাব্‌শী রাজত্ব

অবতরণিকা

বাংলার হাব্‌শী স্থলতানদের রাজত্ব সম্বন্ধে প্রায় সকলেরই মনে অত্যন্ত বিরূপ ধারণা আছে। এ সম্বন্ধে স্পষ্ট তথ্য হয় তো অনেকেরই জানা নেই, কিন্তু হাব্‌শী আমল যে অরাজকতা ও নৃশংসতায় পরিপূর্ণ এবং হাব্‌শী রাজারা যে নিতান্ত অযোগ্য, স্বেচ্ছাচারী ও নিষ্ঠুর ছিলেন, সে সম্বন্ধে কি পেশাদার ঐতিহাসিক, কি অন্যান্য শিক্ষিত লোক, কারও মধ্যে দ্বিমত দেখা যায় না। অনেক আধুনিক ঐতিহাসিক সমস্ত তথ্য এবং প্রমাণ খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ না করে নিতান্ত কতকগুলি গালগল্পের উপর নির্ভর করে হাব্‌শীদের রাজত্ব সংক্রান্ত অধ্যায়টি লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তার উপর নিজেদের উত্তপ্ত ধিক্কারবাণী বর্ষণ করে সাধারণ পাঠকদের বিভ্রান্ত করেছেন।

প্রথমে কুশাসনের প্রশ্নটি বিচার করা যাক। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা "হাব্‌শী রাজা" হিসাবে চারজন রাজার নাম উল্লেখ করেন। এঁরা সকলে মিলে মোট ছ' বছর রাজত্ব করেছিলেন। এর মধ্যে তিন বছর রাজত্ব করেন সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ—যিনি বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ স্থলতানদের অন্যতম, ঐতিহাসিকেরা যাঁর মহত্ত্ব, যোগ্যতা, বদান্যতা প্রভৃতি গুণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। এক বছর রাজত্ব করেন নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহ। ইনি হাব্‌শী ছিলেন কিনা তা বিতর্কের বিষয় এবং এঁর রাজত্বকালেও কোন কুশাসন হয়েছিল বলে কোথাও লেখা নেই। কুশাসনের যা কিছু অভিযোগ তা অপর দু'জন রাজার সম্বন্ধেই সীমাবদ্ধ—এঁরা হলেন চারজনের মধ্যে প্রথম রাজা "স্থলতান শাহজাদা" এবং শেষ রাজা শামসুদ্দীন মুজাফফর শাহ। কিন্তু এঁদের সম্বন্ধে পরবর্তীকালের বইগুলিতে যা লেখা আছে, তা যে সবটা সত্য নয়, তা পরে দেখাচ্ছি। আর একটা কথা মনে রাখতে হবে, এই দু'জন "কুশাসক" স্থলতানের মিলিত রাজত্বকাল দু'বছরও নয়। আর এঁদের মধ্যে প্রথমজন যে হাব্‌শী ছিলেন, তা বলার অনুকূলে কোন যুক্তি নেই। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

আধুনিক যুগের কোন কোন ঐতিহাসিক হাব্‌শী সুলতানদের সমালোচনা করতে গিয়ে এমন কতকগুলি কথা লিখেছেন, যা নিতান্তই বিদ্বেষ-প্রণোদিত উক্তি এবং যুক্তি-বিচারের ধোপে টেঁকে না। যেমন, রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় লিখেছেন, "আহমদ্‌ শাহকে হত্যা করিয়া ক্রীতদাস নাসির্‌ খাঁ যখন তাহার কলুষিত পাদস্পর্শে পবিত্র গৌড়-সিংহাসন কলঙ্কিত করিয়াছিল, তখন গৌড়রাষ্ট্রের আভিজাত্যাভিমানী ওম্‌রাহগণ ও আহমদ্‌ শাহের প্রভুভক্ত সেনানিগণ, সেই দিবসই তাহার রক্তে গৌড়-সিংহাসনের কলঙ্ককালিমা ধৌত করিয়াছিলেন। কিন্তু মাহ্‌মূদ শাহের হত্যার অর্ধশতাব্দী পরে ইলিয়াস শাহের বংশের শেষ সুলতান্‌ জলাল-উদ্দীন ফতে শাহ অপর একজন ক্রীতদাস কর্তৃক নিহত হইলে, গৌড়রাজ্যে কেহ তাহার বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলন করিতে ভরসা করেন নাই। ইহার একমাত্র কারণ এই হইতে পারে যে, হাব্‌শী ক্রীতদাসগণ পরাক্রমশালী হইয়া উঠিলে, হিন্দু ও মুসলমান ওম্‌রাহ্‌ এবং সেনাপতিগণ ক্ষমতাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং রাজানুগ্রহাভাবে তাঁহারা ক্রমশঃ রাজপ্রাসাদ অথবা রাজধানী হইতে দূরে সরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।" রাখালদাসের এই উক্তি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলবার আছে—(১) আহ্‌মদ শাহের হত্যাকারী নাসির খাঁ ওম্‌রাহের হাতে (রাখালদাসবাবুর "সেই দিবসই" কথাটি একেবারে ভুল) প্রাণ হারিয়েছিলেন না নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ নাম নিয়ে ২৪।২৫ বছর রাজত্ব করেছিলেন, তা সঠিকভাবে বলা যায় না। (২) জলালুদ্দীন ফতেহ্‌ শাহের হত্যাকারীর বিরুদ্ধে কেউ হাত তুলতে সাহস পায় নি, এ কথা মোটেই সত্য নয়; ফতেহ্‌ শাহের অমাত্য মালিক আন্দিল কয়েকমাসের মধ্যেই এই হত্যাকারীকে বধ করেছিলেন। (৩) রাখালদাসবাবু বারবার "ক্রীতদাস" শব্দটির উপরে এত জোর দিচ্ছেন কেন? অতীতে যে ক্রীতদাস ছিল, সেও যে একদিন সুলতান হয়ে যোগ্যতার সঙ্গে রাজ্য শাসন করতে পারে, তা কুৎবুদ্দীন আইবক, ইলতুৎমিশ এবং বলবনের দৃষ্টান্ত থেকেই তো দেখতে পাওয়া যায়। জৌনপুরের শর্কী বংশের প্রতিষ্ঠাতারাও সম্ভবত প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন। (৪) এই নতুন ক্ষমতাধিকারীরা হাব্‌শী বলেই যে অযোগ্য হবেন, তা মনে করার কী কারণ আছে? হাব্‌শীদের মধ্যেও তো মালিক আন্দিলের মত মহানুভব লোক এবং আরও অনেক প্রভুভক্ত লোক ছিলেন।

যা হোক্, এখন প্রশ্ন হচ্ছে হাব্‌শী সুলতান বলতে কাদের বুঝব? জলালুদ্দীন ফতেহ্‌ শাহের পরে এই চারজন রাজা সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন বলে ইতিহাসগ্রন্থগুলিতে লেখা আছে :—

(১) **বারবক বা খওয়াজা সেরা বা "সুলতান শাহজাদা"।**

(২) **ফিরোজ শাহ।**

(৩) **মাহ্‌মুদ শাহ।**

(৪) **মুজাফফর শাহ।**

আধুনিক ঐতিহাসিকেরা এই চারজন সুলতানকেই "বাংলার হাব্‌শী সুলতান" আখ্যায় অভিহিত করে থাকেন। এঁদের মধ্যে দ্বিতীয় ও চতুর্থ সুলতান নিঃসন্দেহে হাব্‌শী ছিলেন। প্রথম ও তৃতীয় জন যে হাব্‌শী ছিলেন, তা জোর করে বলা যায় না। এই চারজন সুলতানের মধ্যে শেষ তিনজনের মুদ্রা ও শিলালিপি পাওয়া যায়, প্রথম জনের কিছুই পাওয়া যায় না। যাহোক্, এখন এঁদের সম্বন্ধে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাক্।

বারবক বা সুলতান শাহজাদা

বারবক সম্বন্ধে 'তবকাৎ-ই-আকবরী', 'মাসির-ই-রহিমী', 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা' এবং 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীন'-এ অনেকখানি বিবরণ পাওয়া যায়। 'মাসির'-এর বিবরণ সংক্ষিপ্ত, নীচে আমরা তা উদ্ধৃত করলাম।

"খওয়াজা সেরা বারবক শাহ বিশ্বাসঘাতকতা করে প্রভুকে হত্যা করে রাজা হয়। যেখানেই সে নপুংসক দেখত, তাদের দলভুক্ত করত। তার শক্তি দিন দিন বাড়তে লাগল। অবশেষে সমস্ত আমীরেরা একত্র মিলিত হলেন এবং নায়েকদের ('মাসির'-এ 'পাইক' অর্থে 'নায়েক' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে) ঘুস দিয়ে তাকে (বারবককে) হত্যা করলেন।"

'তবকাৎ-ই-আকবরী'তেও এই কথা আছে, কেবল আমীররা নায়েক বা পাইকদের ঘুস দিয়ে বারবককে হত্যা করেছিলেন, এ কথা লেখা নেই ; সেখানে শুধু বলা হয়েছে আমীরেরা একত্র হয়ে বারবককে বধ করেছিলেন। সুতরাং জলালুদ্দীন ফতেহ্‌ শাহের আমীরেরা তাঁর হত্যাকারীর বিরুদ্ধে আঙুল তোলেননি, রাখালদাসবাবুর এই অভিযোগ অমূলক।

'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা'য় বারবক সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত কাহিনী পাওয়া যায়। তার সংক্ষিপ্তসার নীচে দেওয়া হল।

রাজাকে বধ করে খোজা (বারবক) সুলতান শাহজাদা উপাধি নিল এবং চারদিক থেকে খোজাদের, নীচ প্রকৃতির লোকদের এবং বেপরোয়া ভাগ্যান্বেষীদের এনে জড়ো করল। রাজ্যের প্রধান আমীর ও রাজপুরুষেরা কিন্তু এই অভদ্র নীচ লোকটাকে বিতাড়িত করতে মনস্থ করলেন। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন প্রধান আমীর হাব্‌শী মালিক আন্দিল, ইনি এই সময়ে সীমান্তে ছিলেন। ইনি সুলতান শাহজাদাকে শাস্তি দেবার এবং নিরাপদে রাজধানীতে পৌঁছোবার উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করছিলেন। এমন সময় খোজা তাঁকে ডেকে পাঠালো; তার উদ্দেশ্য, মালিক আন্দিলকে বন্দী করে বধ করা। মালিক আন্দিল কিন্তু একে সৌভাগ্য বলেই মনে করলেন, কারণ এতে নিজের উদ্দেশ্য গোপন রাখা যাবে। তিনি রাজধানীর দিকে অগ্রসর হলেন। রাজধানীতে পৌঁছে তিনি দেখলেন তাঁর নিজের পক্ষের লোকরাই দলে ভারী। তার ফলে খোজা মালিক আন্দিলের প্রাণবধের চেষ্টা করতে সাহস পেল না।

একদিন সে দরবার আহ্বান করল। তার ডাইনে ও বাঁয়ে ১২,০০০ সৈন্য তাকে ঘিরে ছিল। তার প্রশস্ত দরবার-কক্ষ সুসজ্জিত ছিল এবং সেখানে চূড়ান্ত জাঁকজমক ও পরিপূর্ণ শৃঙ্খলা বিরাজ করছিল। সে প্রথমে মালিক আন্দিলকে তার কাছে ডেকে বিরাট অনুগ্রহ প্রদর্শন করে বলল, "আমি ভূতপূর্ব রাজা ও তাঁর সঙ্গীদের নিহত করে তাঁর সিংহাসন অধিকার করেছি। এ সম্বন্ধে তোমার মত কী?" মালিক আন্দিল একটি শ্লোক বললেন, "রাজা যা করেন, তা'ই খুব মনোরম।" সুলতান শাহজাদা একথা শুনে খুব খুশী হয়ে তাঁকে সম্মান-পরিচ্ছদ দান করল এবং রত্নখচিত একটি তরবারি, অনেকগুলি ঘোড়া ও একটি হাতী উপহার দিল। তারপর মালিক আন্দিলের সামনে কোরান রেখে তাঁকে এই শপথ করতে বলল যে তিনি তাকে বধ করবেন না। মালিক আন্দিল শপথ করলেন যে সুলতান শাহজাদা যখন সিংহাসনে আরোহণ করেছেন, তখন যতক্ষণ তিনি এই আসনে অধিষ্ঠিত থাকবেন, তিনি তাঁর ক্ষতি করবেন না। সুলতান শাহজাদা যাদের বধ করেছিল, তাদের মধ্যে অনেকে ছিল তাঁর আত্মীয়। এই কারণে মালিক আন্দিল প্রতিশোধ গ্রহণের সঙ্কল্প করলেন এবং এই উদ্দেশ্যে খোজার ব্যক্তিগত ভৃত্যদের হস্তগত করে তাদের আস্থা অর্জন করলেন।

একদিন রাত্রিতে মালিক আন্দিল খোজার হারেমে প্রবেশ করলেন

এবং দেখলেন সে মদ্যপানের পর ঘুমোচ্ছে। সে তখন সিংহাসনের উপরেই শুয়েছিল, তাই মালিক আন্দিল নিজের শপথের কথা স্মরণ করে তাকে আঘাত করতে পারলেন না। কিন্তু সেই মুহূর্তেই খোজা পাশ ফিরতে গিয়ে সিংহাসন থেকে পড়ে গেল। মালিক আন্দিল এখন শপথ থেকে মুক্ত হয়ে তলোয়ার বার করলেন এবং সুলতান শাহজাদাকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলেন। সেই আঘাতে তার খুব সামান্য লাগল, কিন্তু সে জেগে উঠল। জেগে সে তার সামনে একটা খোলা তলোয়ার দেখে নিরস্ত্র অবস্থাতেই মালিক আন্দিলের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে বেশী বলবান ছিল, তাই মালিক আন্দিলকে মাটিতে ফেলে দিতে পারল। এদিকে ধস্তাধস্তির ফলে ঘরের আলো নিভে গিয়েছিল। খোজা মালিক আন্দিলের গলা টিপে ধরেছিল এবং তিনি নীচে থেকে তার চুল টেনে ধরেছিলেন। মালিক আন্দিল তাঁর দলের লোকদেব সাহায্যের জন্য ডাকতে লাগলেন। তুর্কী যুগ্রাশ খান বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি ভেতরে ঢুকে দেখলেন দুজনেই একসঙ্গে মাটিতে রয়েছে, এ অবস্থায় কী করা উচিত ভেবে তিনি ইতস্তত করতে লাগলেন। মালিক আন্দিল তাঁকে বললেন, "আমি ওর চুল ধরে রয়েছি। ওর শরীর এত চওড়া আর ভারী যে আমার উপরে ও ঢালের মত রয়েছে। ওর শরীরে তলোয়ার চালালে আমার লাগবে না।" যুগ্রাশ খান তখন খোজাকে তিন চারবার আঘাত করলেন, খোজা মৃতের ভান করে পড়ে রইল। তাকে মৃত মনে করে মালিক আন্দিল ও যুগ্রাশ খান ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তওয়াচী বাশী অর্থাৎ প্রাসাদের বাতিদারদের সর্দার তাঁদের জিজ্ঞাসা করল কী হয়েছে। তাঁরা উত্তর দিলেন নিমকহারাম নিহত হয়েছে। হাব্শী তওয়াচী বাশী বারবকের (সুলতান শাহজাদা) শোবার ঘরে গিয়ে আলো জ্বালল। বারবক মালিক আন্দিল ঢুকেছেন ভেবে আত্মগোপন করল। তওয়াচী বাশী এমন ভান করতে লাগল যেন সে নিজে আহত হয়েছে এবং চেঁচামেচি করে সে বলতে লাগল যে ষড়যন্ত্রকারীর দল তার প্রভুকে বধ করেছে। বারবক তাকে নিজের বন্ধু ও শুভার্থী মনে করে বলল, "শান্ত হও। আমি বেঁচে আছি। তারপর জিজ্ঞাসা করল, "আন্দিল কোথায়? এই বলে সে তওয়াচী বাশীকে বলল মালিক আন্দিলকে মেরে তাঁর মাথা পাঠিয়ে দিতে। তওয়াচী বাশী তখন অস্ত্র নিয়ে বলল, "আমি তাকে বধ করতে যাচ্ছি।" এই বলে সে মালিক আন্দিলের কাছে

গিয়ে সব কথা জানিয়ে দিল। মালিক আন্দিল তখন তওয়াচী বাশীর সঙ্গে আবার সেই ঘরে ফিরে এলেন এবং ছোরা দিয়ে বারবককে শেষ করলেন। তারপর তার মৃতদেহ সেইখানে ফেলে রেখে তিনি সেই ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে এলেন।

'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে'ও এই কাহিনীটিই লিপিবদ্ধ হয়েছে। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—'রিয়াজ'-এর স্থলতান শাহজাদা, হাব্‌শী স্থলতানগণ এবং আলাউদ্দীন হোসেন শাহ সংক্রান্ত অধ্যায়গুলির অধিকাংশ উপকরণই ফিরিশ্‌তা থেকে নেওয়া। যাহোক্, 'রিয়াজ'-এ স্থলতান শাহজাদার কাহিনী যেভাবে পাওয়া যায়, তার মধ্যে দু'-একটি অতিরিক্ত খুঁটিনাটি বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। 'রিয়াজে'র বিবরণের অনুবাদ নীচে দেওয়া হল।

নপুংসক বারবক 'স্থলতান শাহজাদা' উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসে সব জায়গা থেকে খোজাদের জড়ো করতে লাগল এবং নিকৃষ্ট লোকদের উপরে অনুগ্রহ বর্ষণ করে তাদের দলে টানতে লাগল। এইভাবে সে নিজের শক্তি ও মর্যাদা বাড়াবার চেষ্টা করছিল। কেবলমাত্র নিজের লোক দিয়ে শাসনকার্য চালাবার উদ্দেশ্যে সে উচ্চপদস্থ এবং প্রতিপত্তিশালী অমাত্যদের উচ্ছেদ করার মতলব করল। এঁদের মধ্যে প্রধান অমাত্য মালিক আন্দিল হাব্‌শী অন্যতম। মালিক আন্দিল এই সময় রাজ্যের সীমান্তে ছিলেন। এই নপুংসকের মৎলব বুঝতে পেরে তিনি তাকে বধ করার এবং নিজের স্থযোগ্য পুত্রকে* সিংহাসনে বসাবার পরিকল্পনা ফাঁদলেন। এই সময়ে হতভাগ্য নপুংসক মালিক আন্দিলকে ফাঁদে ফেলে কারারুদ্ধ করার জন্য তাঁকে ডেকে পাঠাল। এই আহ্বানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে মালিক আন্দিল অনেক লোক সঙ্গে নিয়ে নপুংসকের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তিনি দরবারে প্রবেশ ও নির্গমের সময় খুব সতর্কতা অবলম্বন করলেন, ফলে নপুংসকের তাঁকে খতম করার আশা সফল হল না। অবশেষে একদিন নপুংসক এক প্রমোদ-অনুষ্ঠানের আয়োজন করল। সেখানে সে মালিক আন্দিলের প্রতি খুব অন্তরঙ্গতা দেখিয়ে তাঁকে কোরান দিয়ে বলল, "কোরান ছুঁয়ে শপথ কর তুমি আমার ক্ষতি করবে না।" মালিক আন্দিল

---

* এই "স্থযোগ্য পুত্র" সম্বন্ধে 'রিয়াজ'-এ আর কিছু লেখা নেই, অন্য কোন সূত্রেও এঁর উল্লেখ পাওয়া যায়নি। বারবককে বধ করে মালিক আন্দিল তাঁর কোন পুত্রকে সিংহাসনে বসাননি, নিজেই সিংহাসনে বসেছিলেন।

কোরান ছুঁয়ে শপথ করলেন, "যতক্ষণ আপনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকবেন, আমি আপনার কোন ক্ষতি করব না।" সব লোকেই ঐ দুরাত্মা নপুংসককে বধ করার মতলব করছিল, মালিক আন্দিলও তা'ই করছিলেন। তিনি প্রভু-হত্যার প্রতিশোধ নিতে সঙ্কল্পবদ্ধ হলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ভৃত্যদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন ও সুযোগের প্রতীক্ষায় রইলেন। এক রাত্রিতে ঐ দুর্বৃত্ত অত্যধিক পরিমাণে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে সিংহাসনের উপরে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মালিক আন্দিল তখন তাকে বধ করার উদ্দেশ্য নিয়ে ভৃত্যদের সাহায্যে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। কিন্তু তিনি যখন দেখলেন সে সিংহাসনের উপরেই ঘুমিয়ে রয়েছে, তখন নিজের শপথের কথা মনে করে তিনি ইতস্তত করতে লাগলেন। এমন সময় অকস্মাৎ ভাগ্যচক্রে নপুংসক মদের ঝোঁকে সিংহাসন থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল। মালিক আন্দিল এই ব্যাপারে আনন্দিত হয়ে তাকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলেন। কিন্তু এই আঘাতে তার প্রাণবধ সম্ভব হল না। সুলতান শাহজাদা জেগে উঠে নিজেকে একটা খাপ-খোলা তলোয়ারের সম্মুখীন দেখে মালিক আন্দিলের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। গায়ে বেশী জোর থাকার জন্য সে ধস্তাধস্তিতে জয়ী হয়ে মালিক আন্দিলকে চিৎ করে ফেলে তাঁর বুকের উপরে চড়ে বসল। মালিক আন্দিল নপুংসকের চুল খুব শক্ত করে ধরেছিলেন, কিছুতেই ছাড়েননি। তিনি চীৎকার করে যুগ্রাশ খানকে ডাকতে লাগলেন—তাড়াতাড়ি আসবার জন্য। তুর্কী যুগ্রাশ খান ঘরের বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি একদল হাব্‌শীকে নিয়ে তক্ষণি ভিতরে ঢুকলেন এবং মালিক আন্দিল নপুংসকের দেহের নীচে চাপা পড়ে আছেন দেখে তলোয়ার নিয়ে আক্রমণ করতে ইতস্তত করতে লাগলেন। এদিকে এই দুজনের ধস্তাধস্তির ফলে ঘরের সব বাতিগুলি এদিক-সেদিকে ছিটকে পড়ে নিভে গিয়েছিল, ফলে সারা ঘরই অন্ধকার। মালিক আন্দিল যুগ্রাশ খানকে চেঁচিয়ে বললেন, "আমি খোজাটার চুল ধরে আছি। ওর বিরাট শরীর আমাকে ঢালের মত আড়াল করে আছে। তলোয়ার দিয়ে ওকে মারতে ইতস্তত কোরো না। ও তলোয়ার আমার শরীরে লাগবে না। আর যদি লাগেই, তা হলেও কোন ক্ষতি নেই। প্রভুর হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য আমার মত শত সহস্র লোক প্রাণ দিতে পারে।" যুগ্রাশ খান তখন আস্তে আস্তে সুলতান শাহজাদার পিঠে এবং কাঁধে তলোয়ার দিয়ে কয়েকটি আঘাত করলেন, সে তখন মরার ভান

করে পড়ে রইল। তখন মালিক আন্দিল উঠে যুগ্রাশ খান এবং হাব্‌শীদের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন এবং তওয়াচী বাশী অতঃপর সুলতান শাহজাদার ঘরে ঢুকে আলো জ্বালল। সুলতান শাহজাদা তাকে মালিক আন্দিল ভেবে আলো জ্বালার আগেই একটা কুঠরীর মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। তওয়াচী বাশীও সেই কুঠরীতে ঢোকাতে সুলতান শাহজাদা আবার মরার ভান করে পড়ে রইল। তখন তওয়াচী বাশী চেঁচিয়ে বলল, "হায় কী দুর্ভাগ্য। বিদ্রোহীরা আমার প্রভুকে মেরে ফেলে রাজ্য ধ্বংস করেছে।" সুলতান শাহজাদা তখন তাকে তার বিশ্বস্ত ভৃত্য মনে করে চেঁচিয়ে বলল, "দেখ। আমি বেঁচে আছি। শান্ত হও।" তারপর জিজ্ঞাসা করল মালিক আন্দিল কোথায়। তওয়াচী বলল, "সে রাজাকে বধ করেছে ভেবে শান্ত মনে বাড়ী ফিরে গেছে।" সুলতান শাহজাদা তাকে বলল, "যাও, অমাত্যদের ডাক। তাদের বল মালিক আন্দিলকে মেরে তার মাথা কেটে নিয়ে আসতে। ফটকে পাহারা বসাও, পাহারাদারদের সশস্ত্র হয়ে সাবধানে থাকতে বল।" হাব্‌শী তওয়াচী বলল, "আচ্ছা, আমি সব গোলমাল চুকিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি।" এই বলে সে বেরিয়ে এসে তক্ষণি সব কথা মালিক আন্দিলকে জানাল। মালিক আন্দিল তখন আবার ভিতরে ঢুকে ছোরা দিয়ে মেরে নপুংসকের জীবন শেষ করলেন এবং তার মৃতদেহ সেই কুঠরীতে ফেলে রেখে তালা দিয়ে বেরিয়ে এলেন।

এই কাহিনীর সঙ্গে 'তবকাৎ-ই-আকবরী' ও 'মাসির-ই-রহিমী'তে প্রদত্ত কাহিনীর মিল আছে। তবে সেখানে কাহিনী সংক্ষিপ্ত আর এখানে পল্লবিত। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ হবীবুল্লাহ এই কাহিনীকে সত্য বলেই গ্রহণ করেছেন। কাহিনীটি খুবই চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নেই, কিন্তু এর মধ্যে বেশ খানিকটা অস্বাভাবিকতার ছাপ আছে। "সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকা"—এই কথাটির মারপ্যাচের উপরেই কাহিনীটি প্রতিষ্ঠিত। মালিক আন্দিলের পক্ষে এই রকম দ্ব্যর্থমূলক শপথ গ্রহণ করা বিচিত্র নয়, কিন্তু সুলতান শাহজাদা যদি সত্যিই তাতে বিশ্বাস করে থাকে, তাহলে বলতে হবে তার মত নির্বোধ খুব কমই জন্মায়।

যাহোক্, সুলতান শাহজাদার প্রসঙ্গে দুটি বিষয় খুব সাবধানে লক্ষ করতে হবে। প্রথমত, আলোচ্য সময়ের অনেক পরে রচিত 'তবকাৎ-ই-আকবরী', 'মাসির-ই-রহিমী', 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা', 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীন', বুকাননের বিবরণী প্রভৃতি সূত্রের উক্তি ভিন্ন সুলতান শাহজাদার ঐতিহাসিকতার কোন

প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। এ পর্যন্ত তার রাজত্বকালের কোন মুদ্রা বা শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়নি।

দ্বিতীয়ত, আধুনিক ঐতিহাসিকরা সকলেই লিখেছেন যে সুলতান শাহজাদা জাতিতে হাব্‌শী ছিল। কিন্তু এই মতের কোনই ভিত্তি নেই। 'তবকাৎ--ই-আকবরী' থেকে সুরু করে 'রিয়াজ-উস্-সলাতীন' পর্যন্ত কোন বইয়েই একথা লেখা নেই যে সুলতান শাহজাদা হাব্‌শী ছিল। বুকাননের বিবরণী বা স্টুয়ার্টের History of Bengal-এও এরকম কোন কথা লেখা নেই। উপরন্তু ফিরিশ্‌তার মতে সুলতান শাহজাদা ছিল বাঙালী। 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা'য় তাকে "সুলতান শাহজাদা বঙ্গালী" বলেই উল্লেখ করা হয়েছে।

এই দ্বিতীয় বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সুলতান শাহজাদাকে হাব্‌শী বলে ধরে নিয়েই আধুনিক ঐতিহাসিকেরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে হাব্‌শীরা বিশ্বাসঘাতকতা করে নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ্‌ শাহের বংশকে উচ্ছেদ করে বাংলাদেশে রাজা হয়ে বসেছিল। কিন্তু প্রাচীন ইতিহাসগ্রন্থগুলির সাক্ষ্য এই সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে যায়। 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা' ও 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে' স্পষ্টই লেখা আছে যে হাব্‌শীরা ফতেহ্‌ শাহের হত্যাকারীর বিরুদ্ধেই দলবদ্ধ হয়েছিল এবং মালিক আন্দিল তাদের নেতৃত্ব করেছিলেন। তওয়াচী বাশীও হাব্‌শী ছিল, সেও এই দলের সঙ্গেই যোগদান করেছিল। সুতরাং ফতেহ্‌ শাহের হাব্‌শী কর্মচারী ও ভৃত্যেরা প্রভুদ্রোহী বা প্রভুহন্তা নয়, বরং তারাই আদর্শ প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়েছিল বলতে হয়। 'রিয়াজ'-এর মতে মালিক আন্দিল য়ুগ্রাশ খানকে বলেছিলেন, "প্রভুর হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য আমার মত শত শত সহস্র লোক প্রাণ দিতে পারে।"

"সুলতান শাহজাদা"র রাজত্বকাল সম্বন্ধে 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে' তিনটি মত উল্লিখিত হয়েছে—একটি মতে সে ছ' মাস রাজত্ব করেছিল, একটি মতে আট মাস, আর একটি মতে আড়াই মাস। 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা'তে দুটি মত উল্লিখিত হয়েছে—আট মাস এবং আড়াই মাস। 'তবকাৎ-ই-আকবরী' ও 'মাসির-ই-রহিমী'তে বলা হয়েছে যে সে আড়াই মাস রাজত্ব করেছিল। এই কথাই ঠিক বলে মনে হয়। "সুলতান শাহজাদা"র উপর গোড়া থেকেই সকলে অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছিলেন। সুতরাং ছ' মাস বা আট মাস রাজত্ব করা তার পক্ষে সম্ভব বলে মনে হয় না। ৮৯২ হিজরার ৪ঠা মুহরম

তারিখে উৎকীর্ণ জলালুদ্দীন ফতেহ্‌ শাহের একটি শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে। সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহেরও ৮৯২ হিজরার মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং ঐ বছরে (৮৯২ হিঃ) খুব সামান্য সময় "সুলতান শাহজাদা"র পক্ষে রাজত্ব করা সম্ভব এবং সে সময় ছ'মাস বা আট মাস ধরা মুস্কিল। এতদিন সে রাজত্ব করলে তার কিছু মুদ্রা না পাওয়ার কোন কারণ দেখা যায় না। অতএব "সুলতান শাহজাদা"র রাজত্বকাল আড়াই মাস স্থায়ী হয়েছিল মনে করাই যুক্তিসঙ্গত।

ফিরিশ্‌তা ও 'রিয়াজে' লেখা আছে, "সুলতান শাহজাদার প্রভুহত্যা করে রাজ্যলাভের পরে কয়েক বছর বাংলাদেশে এই প্রথা চালু হল যে, যে-ই রাজাকে হত্যা করবে, সে-ই সিংহাসনে আরোহণ করবে।" বাবরের আত্মকাহিনীতেও অনেকটা এই ধরনের কথা আছে। বাবর লিখেছেন, "বাংলা রাজ্যে একটি বিস্ময়কর প্রথা এই যে উত্তরাধিকার প্রথা অনুসারে সিংহাসন-লাভ সেখানে বিরল। রাজার পদ স্থায়ী।...যে কোন লোক যদি রাজাকে হত্যা করে নিজে সিংহাসনে বসে, তাহলে সে-ই রাজা হয়। আমীর, উজীর, সৈন্য এবং কৃষকেরা তক্ষণি তার কাছে নত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করে এবং তাকে পূর্ববর্তী রাজার স্থলাভিষিক্ত আইনসঙ্গত রাজা বলে স্বীকার করে। বাঙালীরা বলে, 'আমরা সিংহাসনের প্রতি অনুগত; যে কেউ সিংহাসন অধিকার করে, তাকেই আমরা মানি'।"

সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ

'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা' ও 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে'র মতে মালিক আন্দিল "সুলতান শাহজাদা"-কে বধ করে ফিরোজ শাহ নাম নিয়ে রাজা হন। অন্যান্য বইতে ফিরোজ শাহের পূর্ব-পরিচয় সম্বন্ধে কিছু লেখা নেই। ফিরিশ্‌তা ও 'রিয়াজ'-এ ফিরোজ শাহের সিংহাসন লাভ সম্বন্ধে একই কথা লেখা হয়েছে। এই দুই বইয়ের মতে মালিক আন্দিল "সুলতান শাহজাদা"কে বধ করে বাইরে এসে জলালুদ্দীন ফতেহ্‌ শাহের উজীর খান জহানকে ডেকে পাঠালেন। খান জহান এলে তাঁকে তিনি সমস্ত খুলে বললেন। অতঃপর রাজা নির্বাচনের জন্য অমাত্যদের পরিষৎ আহ্বান করা হল। ফতেহ্‌ শাহের পুত্রের বয়স মাত্র দু'বছর, সুতরাং তাঁকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা সম্বন্ধে অমাত্যদের দ্বিধা দেখা দিল। তার ফলে সমস্ত অমাত্যেরা একমত হয়ে পরদিন সকালে ফতেহ্‌ শাহের বিধবা রানীর কাছে গেলেন। গিয়ে তাঁর কাছে আগের রাত্রির ঘটনা

বর্ণনা করে বললেন, "রাজপুত্র শিশু। সুতরাং যতদিন না তাঁর বয়স হচ্ছে, ততদিন শাসনকার্য চালাবার জন্য কাউকে আপনি নিযুক্ত করুন।" রানী তাঁদের উদ্বেগ অনুভব করে কী বলতে হবে বুঝলেন। তিনি বললেন, "ঈশ্বরের কাছে আমি শপথ করেছিলাম যিনি ফতেহ্ শাহের হত্যাকারীকে বধ করবেন, তাঁকেই রাজত্ব ছেড়ে দেব।" মালিক আন্দিল প্রথমে রাজত্বের ভার গ্রহণ করতে রাজী হননি, কিন্তু যখন দরবারে সমবেত সমস্ত অমাত্যেরাই তাঁকে চাইল, তখন তিনি সিংহাসনে আরোহণ করলেন।

এই কাহিনী যদি সত্য হয়, তাহলে মালিক আন্দিল যে কত মহানুভব ও স্বার্থত্যাগী ছিলেন, তা বোঝা যাবে। কিন্তু দিনাজপুর জেলার বিরল গ্রামে সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহের এক শিলালিপি পাওয়া যায়। এই শিলালিপির তারিখ সম্বন্ধে কোন কোন পণ্ডিতের মত গ্রহণ করলে বলতে হয় ইনি সুলতান শামসুদ্দীন যুসুফ শাহ বা জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহের রাজত্বকালে রাজ্যের উত্তরাংশে নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করেছিলেন। সেক্ষেত্রে উপরের কাহিনী মিথ্যা বলতে হয়। কিন্তু বিরল গ্রামের শিলালিপির তারিখ সঠিক-ভাবে পড়া যায়নি। মৌলবী সরফুদ্দীনের মতে এর তারিখ ৮৮০ হিজরা; তখন শামসুদ্দীন যুসুফ শাহ বাংলার সুলতান। ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে এই শিলালিপির তারিখ ৮৮৯ হিজরা, যে সময় জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহ বাংলার সুলতান ছিলেন। কিন্তু এই সব পাঠ কাল্পনিক।* এদের উপর নির্ভর করে, ফিরোজ যুসুফ শাহ বা ফতেহ্ শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন বলা মোটেই ঠিক হবে না। এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, শিলালিপিটি ফিরোজ শাহের নিজস্ব রাজত্বকালেই (অর্থাৎ ৮৯২-৮৯৫ হিজরার মধ্যেই) উৎকীর্ণ হয়েছিল, খোদাইয়ের দোষে তারিখটি অস্পষ্ট থেকে গিয়েছে এবং তার ফলে গবেষকরা বিভ্রান্ত হচ্ছেন।

ফিরোজ শাহ সম্বন্ধে 'তবকাৎ-ই-আকবরী' এবং 'মাসির-ই-রহিমী'তে লেখা আছে, "তিনি দয়ালু এবং মহৎ প্রকৃতির রাজা ছিলেন।" 'তারিখ-ই-ফিরিশ তা'তেও তাঁর সম্বন্ধে প্রশংসা আছে। এ সম্বন্ধে 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে'

* ডঃ আবদুল করিম এই শিলালিপিটি সম্বন্ধে লিখেছেন, "Our own examination of this inscription shows that the reading is more conjectural than otherwise, the date is illegible yielding no satisfactory reading." (Corpus of the Muslim Coins of Bengal, pp. 146—147)

অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। ঐ বিবরণ আমরা অনুবাদ করে দিচ্ছি।

হাব্‌শী মালিক আন্দিল সৌভাগ্যক্রমে বাংলার সার্বভৌম নৃপতি হয়ে ফিরোজ শাহ উপাধি ধারণ করলেন এবং রাজধানী গৌড়ে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ ও উদার, এবং তাঁর কাজগুলি ছিল মহৎ। তিনি প্রজাদের শান্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করেছিলেন। যখন তিনি অমাত্য ছিলেন সেই সময় থেকেই তিনি মহৎ এবং বীরত্বপূর্ণ অনেক কাজ করেছিলেন। তাঁর সৈন্যেরা ও প্রজারা তাঁকে ভয় করত এবং তাঁর বিরুদ্ধে যেত না। উদারতা এবং মহত্বের দিক দিয়ে তাঁর তুলনা হয় না। তাঁর আগের রাজারা অনেক কষ্ট করে যেসব ধনদৌলত সঞ্চয় করেছিলেন, সেগুলি তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই গরীবদের দান করে দিলেন। কথিত আছে একবার তিনি এক দিনেই গরীবদের এক লাখ টাকা দান করেছিলেন। তাঁর সচিবেরা এই মুক্তহস্ত দান পছন্দ করে নি। নিজেদের মধ্যে তারা বলাবলি করতে লাগল, "এই হাব্‌শী বিনা কষ্টে ও পরিশ্রমে যে টাকার মালিক হয়েছেন তার মূল্য বুঝতে পারছেন না। যাতে পারেন, সেরকম কোন উপায় আমাদের বার করতে হবে। তাহলে ইনি আর এরকম যথেচ্ছভাবে মুক্ত হস্তে দান করতে পারবেন না।" এই ঠিক করে তারা এক লাখ টাকা একটা ঘরের মেঝেতে রেখে দিল, যাতে রাজা নিজের চোখে তা দেখে তার মূল্য বুঝে তার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে পারেন (অর্থাৎ রাজা বুঝতে পারবেন এক লাখ টাকার পরিমাণ কত বিরাট, ফলে কথায় কথায় তিনি লাখ টাকা দান করতে পারবেন না)। রাজা যখন এই টাকা দেখলেন, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "টাকাগুলো এখানে পড়ে আছে কেন?" সচিবেরা বলল, "এত টাকাই আপনি গরীবদের দিতে বলেছেন।" রাজা বললেন, "এত কম টাকায় কী করে কুলোবে? এর সঙ্গে আর এক লাখ টাকা যোগ কর।" সচিবেরা এতে অপ্রস্তুত হয়ে সব টাকা ভিখারীদের বণ্টন করে দিলেন।

এই গল্পটি কতদূর সত্য তা জানি না, তবে অত্যন্ত মধুর। গল্পটি সত্য হলে বলতে হবে দানের দিক দিয়ে সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ বাংলার সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। গল্পটি যদি অক্ষরে অক্ষরে সত্য না-ও হয়, তাহলেও ফিরোজ শাহ যে মহৎ ও দানবীর ছিলেন, তা এর থেকে বোঝা যায়। কারণ সম্পূর্ণ বিনা কারণে কারও নামে এরকম গল্প রটে না।

সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ সম্বন্ধে 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' লেখা আছে, "তিনি গৌড় শহরে একটি মসজিদ, একটি মিনার এবং একটি জলাধার তৈরী করিয়েছিলেন। এর মধ্যে মিনারটি এবং তার সংলগ্ন জলাধারটি এখনও বর্তমান। এই মিনারটি "ফিরোজ মিনার" নামে পরিচিত। মুন্শী শ্যামপ্রসাদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে এটি "ফিরোজ শাহের লাট" নামে অভিহিত হত। এই মিনারে নির্মাতার নাম লেখা নেই, কিন্তু মেজর ফ্রাঙ্কলিন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে গুয়ামালতীতে একটি শিলালিপির এক টুকরো পেয়েছিলেন, মুন্শী শ্যামপ্রসাদের বিবরণে এই খণ্ডিত শিলালিপিটি উদ্ধৃত হয়েছে (Dani, Muslim Architecture in Bengal, Appendix, p. 12 দ্রঃ), তাতে সৈফুদ্দীন নামক জনেক রাজার নাম উপাধিসমেত লেখা রয়েছে, * আর কিছু নেই।

মেজর ফ্রাঙ্কলিন ও মুন্শী শ্যামপ্রসাদের মতে এই শিলালিপিটি ফিরোজ মিনারের দরজায় সংলগ্ন ছিল। কানিংহাম এটি ফিরোজ মিনারের মূল শিলালিপি বলে স্বীকার করে নিয়েও মনে করেছিলেন শিলালিপিতে উল্লিখিত "সৈফুদ্দীন" আসলে সৈফুদ্দীন হম্‌জা শাহ (৮১৩-৮১৫ হিঃ) এবং ইনিই মিনারটি তৈরী করিয়েছিলেন। কিন্তু ফিরোজ মিনারের স্থাপত্যরীতি থেকে মনে হয়, এই মিনার পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে নির্মিত হয়েছিল, গোড়ার দিকে নয়। "সৈফুদ্দীন" এবং "ফিরোজ" এই দুই নাম একটিমাত্র সুলতানেরই ছিল, তিনি আমাদের আলোচ্য সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ। সুতরাং তিনিই এই মিনারটি তৈরী করিয়েছিলেন। জনৈক গবেষক এসম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করে লিখেছেন, "...the precarious nature of his position and the short tenure of his power are strong arguments against this view." কিন্তু 'রিয়াজ'-এ স্পষ্টই লেখা আছে যে গৌড়ের মিনার ফিরোজ শাহের তৈরী। ফিরোজ শাহ তিন বছরেরও বেশী রাজত্ব করেছিলেন, এই ধরনের মিনারের নির্মাণ এক বছরের মধ্যেই শেষ হওয়া সম্ভব। ফিরোজ শাহ যে সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার মধ্যে রাজত্ব করেছিলেন, একথা কোথাও লেখা নেই। বরং ইতিহাস-গ্রন্থগুলিতে একথাই লেখা আছে যে অমাত্যদের সর্বসম্মতিক্রমেই তিনি রাজা হয়েছিলেন।

* এতে লেখা আছে, "অল্-মুইয়ুদ্দ্ নিআ ওআদ্দীন অল্-মুজাহিদ ফি সিবিলাল্লাহ্ খলিফহ্ৎ অর্-রহমান অস্-সুলতান বে-অল্ হুজহ্ৎ ওঅ অল্-বুরহান সৈফুদ্দীন ওআদ্দ্ নিআ।"

ফিরোজ মিনার কীভাবে তৈরী হয়েছিল, সে সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী আছে। সেটি এই।

প্রথমে একজন রাজমিস্ত্রী এই মিনারটি তৈরী করে। তৈরী শেষ হয়েছে শুনে সুলতান এটি দেখতে গেলেন এবং চূড়ার উপরে উঠলেন। রাজমিস্ত্রী তখন তাঁর সামনে এসে গর্ব করে বলল, "এর চেয়েও অনেক উঁচু মিনার আমি তৈরী করতে পারতাম।

সুলতান—"তাহলে তা'ই করলে না কেন?"

রাজমিস্ত্রী—"আমার কাছে অত মালমশলা ছিল না।"

সুলতান—"ছিল না তো আমার কাছে চাইলে না কেন?"

রাজমিস্ত্রী এর কোন উত্তরই দিতে পারল না। সুলতান তখন ক্রোধে আগুন হয়ে আদেশ দিলেন রাজমিস্ত্রীকে মিনারের চূড়া থেকে ফেলে দিতে। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর আদেশ পালিত হল। এইভাবে রাজমিস্ত্রী তার প্রাণ হারাল। এদিকে সুলতান চূড়া থেকে নেমে এসে তাঁর প্রিয় ভৃত্য হিঙ্গাকে আদেশ দিলেন তক্ষণি মোরগাঁওয়ে যেতে। হিঙ্গা তক্ষণি মোরগাঁওয়ের দিকে রওনা হল, কিন্তু কেন যেতে হবে তা সে কিছুই বুঝতে পারল না। রাজা তখন এত রেগে রয়েছেন যে রাজাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতেও তার সাহস হল না। মোরগাঁওয়ে পৌঁছে হিঙ্গা গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগল কী কাজের জন্য তাকে এখানে পাঠানো হতে পারে। কিন্তু অনেক ভেবেও কোন কূল-কিনারা না পেয়ে সে বিরক্ত হয়ে এদিক-সেদিক ঘুরতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে তার সঙ্গে সনাতন নামে একজন ব্রাহ্মণ যুবকের দেখা হয়ে গেল। হিঙ্গা তখন ভাবল এর সঙ্গে একটু পরামর্শ করে দেখা যাক্ যদি কোন সুরাহা হয়। এই ভেবে সে সনাতনকে তার সমস্যার কথা খুলে বলল। সনাতন তখন হিঙ্গাকে জিজ্ঞাসা করল মিনার থেকে তার রওনা হবার অব্যবহিত আগে কী কী ঘটনা ঘটেছিল। হিঙ্গা সবই গোড়া থেকে বলল। সব শুনে সনাতন বলল, "তাহলে সুলতান তোমাকে নিশ্চয়ই পাঠিয়েছেন মোরগাঁও থেকে ভাল ভাল রাজমিস্ত্রী নিয়ে যেতে।" মোরগাঁওয়ে এই সময় অনেক সুদক্ষ রাজমিস্ত্রী বাস করত। হিঙ্গা সনাতনের কথা শুনে ভাবল এ'ই বোধ হয় ঠিক বলেছে। এই ভেবে সে মোরগাঁও থেকে কয়েকজন খুব ভাল রাজমিস্ত্রী সংগ্রহ করে তাদের সুলতানের কাছে নিয়ে গেল। এদিকে সুলতানের মেজাজ ততক্ষণে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তিনি তখন ভাবছিলেন, "তাই তো!

হিঙ্গাকে কী করতে হবে তা না বলেই মোরগাঁওয়ে পাঠালাম।" এমন সময়ে হিঙ্গা তাঁর সামনে মোরগাঁওয়ের রাজমিস্ত্রীদের নিয়ে এসে হাজির। সুলতান তো অবাক! হিঙ্গা তাঁর মনের কথা কী করে জানল? হিঙ্গাকে তিনি জিজ্ঞাসা করাতে হিঙ্গা তাঁকে সমস্ত খুলে বলল এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি সনাতনের পরামর্শেই যে তার পক্ষে একাজ করা সম্ভব হয়েছে, তা-ও জানাল। সুলতান একথা শুনে সনাতনের খুব প্রশংসা করলেন এবং সনাতনকে ডাকিয়ে এনে তাকে রাজদরবারে একটি খুব উঁচু পদে নিয়োগ করলেন। হিঙ্গা যেসব রাজমিস্ত্রীদের এনেছিল, তাদের সাহায্যে সুলতান ফিরোজ মিনারের উচ্চতা আরও অনেকখানি বাড়ালেন।

এই গল্পটি মালদহ জেলা এবং সন্নিহিত অঞ্চলের লোকদের মধ্যে বহুল-প্রচলিত। এখনও পর্যন্ত ভাল করে না বুঝিয়ে কেউ কোন হুকুম করলে ঐ অঞ্চলের লোকে বলে, "এর যে দেখছি হিঙ্গা তুই মোরগাঁয়ে যা।"

ঐ কিংবদন্তীটির প্রথমাংশ (রাজমিস্ত্রীকে মিনারের চূড়া থেকে ফেলে দেওয়া অবধি) আজ থেকে দেড়শো বছর আগে মুন্শী শ্যামপ্রসাদ লিপিবদ্ধ করেছিলেন (Dani, Muslim Architecture in Bengal, Appendix, p. 11 দ্রঃ)। তাঁর মতে ঐ রাজমিস্ত্রীর নাম 'পীরু'; প্রাণহানির পরে মিনারের পাশেই তাকে কবর দেওয়া হয়। সম্পূর্ণ কিংবদন্তীটি প্রথমে রজনীকান্ত চক্রবর্তী প্রকাশ করেন তাঁর 'গৌড়ের ইতিহাস' ২য় খণ্ডে (১৯০৯)। পরে এটি আবিদ আলী লিপিবদ্ধ করেছেন Momoirs of Gaur and Pandua বইয়ে।

এই কিংবদন্তীর সবটা না হোক্ কতকটা সত্য বলেই মনে হয়। আলাউদ্দীন হোসেন শাহের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন 'সাকর মল্লিক' সনাতন। ফিরোজ শাহের রাজত্বাবসানের মাত্র চার বছর বাদে হোসেন শাহের রাজত্ব সুরু হয়। এটা খুবই সম্ভব যে সনাতন হোসেন শাহের সিংহাসনে আরোহণেরও কয়েক বছর আগে থেকে গৌড়-দরবারে চাকরী করতেন। সুতরাং সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহের ভৃত্যের সঙ্গে সনাতনের মোরগাঁওয়ে সাক্ষাৎ এবং সৈফুদ্দীন কর্তৃক সনাতনকে উচ্চপদে নিয়োগ খুবই সম্ভাব্য ব্যাপার এবং বলা বাহুল্য মোরগাঁও গ্রামের সনাতন এবং রূপের অগ্রজ সনাতন অভিন্ন হবার শতকরা ৯৯ ভাগ সম্ভাবনা।

উপরে উল্লিখিত কিংবদন্তী থেকেও সুলতান ফিরোজ শাহের চরিত্রের

খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। নিজের রচিত শিল্প-কীর্তির উন্নতিবিধানে তাঁর আগ্রহ, ক্রোধে দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হওয়া এবং ক্রোধ শান্ত হলে স্বাভাবিক হওয়া—এগুলি তাঁর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও দুর্বলতার পরিচায়ক। অবশ্য রাজমিস্ত্রীকে মিনারের চূড়া থেকে ফেলে দিয়ে বধ করা নিষ্ঠুরতা ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু রাজমিস্ত্রী যে বাচালতা ও বেয়াদবীর পরিচয় দিয়েছিল, তা সে যুগের কোন সার্বভৌম নৃপতিই বরদাস্ত করতেন না। সেদিক দিয়ে ফিরোজ শাহের কাজ অন্যায় হলেও অস্বাভাবিক হয়নি, অবশ্য যদি এই রাজমিস্ত্রী-বধ ব্যাপারটা আদৌ ঐতিহাসিক হয়।

আজ অবধি এই সব জায়গায় সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহের শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে :—

বিরল (দিনাজপুর), গুয়ামালতী (মালদহ), কালনা (বর্ধমান), কাটরা (মালদহ), গড় জরীপা (ময়মনসিংহ), গৌড়। তাঁর মুদ্রাগুলির অধিকাংশের মধ্যেই "কোষাগার" ভিন্ন কোন স্থানের নাম নেই, কতকগুলি মুহম্মদাবাদ ও ফতেহাবাদের (ফরিদপুর) টাকশালে তৈরী হয়েছিল বলে লেখা আছে। সুতরাং ফিরোজ শাহ উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম বঙ্গের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রাজত্ব করতেন।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত গড় জরীপা নামক স্থানে সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহের যে শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে, তার তারিখ এবং শিলালিপিস্থাপনের উদ্দেশ্য অক্ষর অস্পষ্ট থাকায় পড়া যায়নি। কেদারনাথ মজুমদার তাঁর ময়মনসিংহের ইতিহাসে (পৃঃ ৩৬-৩৭) লিখেছেন যে ঐ শিলালিপি মজলিস খাঁ হুমায়ুন নামে জনৈক বীরের সমাধি-স্তম্ভের শিলালিপি এবং ঐ মজলিস খাঁ হুমায়ুন ফিরোজ শাহের সেনাপতি ছিলেন। তাঁর মতে 'গড় জরীপা'র পূর্ব নাম 'গড় দলীপা', ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে এখানে দলীপ সামন্ত নামে জনৈক স্বাধীন রাজা রাজত্ব করতেন; মজলিস খাঁ হুমায়ুন তাঁকে পরাজিত করে এই অঞ্চল অধিকার করেন। এই সমস্ত উক্তির স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেদারনাথ মজুমদার লিখেছেন, "ইহাই ময়মনসিংহে মুসলমান প্রবেশের প্রথম সূত্রপাত।" এই উক্তি সম্পূর্ণ ভুল। কয়েক বছর আগে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত গুয়াই গ্রামে রুকনুদ্দীন বারবক শাহের এক শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে। তার তারিখ ২১শে রমজান, ৮৭১ হিজরা। চতুর্দশ শতাব্দীর

প্রথম দিকে শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালেও ময়মনসিংহে মুসলমানদের অধিকার ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

বিভিন্ন শিলালিপি থেকে সুলতান সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহের এই সব কর্মচারীর নাম পাওয়া যায়,

(১) কীরা (কিরাৎ) খান
(২) মুখলিশ খান
(৩) জাফর খান
(৪) সাঈদ

ফিরোজ শাহের মৃত্যু সম্বন্ধে 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' দুটি বিভিন্ন মতের উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে লেখা আছে, "তিন বছর রাজত্ব করে মালিক আন্দিল অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মৃত্যুর ঝটিকায় তাঁর জীবনের দীপ নির্বাপিত হয়। কিন্তু অধিকতর সত্য বিবরণ এই যে ফিরোজ শাহও পাইকদের হাতে নিহত হন।" 'মাসির-ই-রহিমী'তে লেখা আছে, "কোন কোন লোকের মতে তিনি নায়েক (পাইক)-দের হাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন।" 'তবকাৎ-ই-আকবরী'তেও এই কথা আছে।

ইতিহাসগ্রন্থগুলিতে লেখা আছে ফিরোজ শাহ তিন বছর রাজত্ব করেন। সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহের ৮৯২ ও ৮৯৩ হিজরার মুদ্রা এবং ৮৯৪ ও ৮৯৫ হিজরার শিলালিপি (বিরল গ্রামের শিলালিপি বাদ দিলে) পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং তাঁর রাজত্বকাল ৮৯২-৮৯৫ হিজরা। তিন বছরেরও বেশী তাঁর রাজত্ব স্থায়ী হয়েছিল। "সুলতান শাহজাদা"কে রাজা হিসাবে ঠিক ধরা যায় না, তাছাড়া "সুলতান শাহজাদা"কে হাব্‌শী বলার কোন কারণ নেই, এমন কি তার ঐতিহাসিকতাও সন্দেহের অতীত নয়। সুতরাং সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহই বাংলার প্রথম হাব্‌শী সুলতান। দানের দিক দিয়ে তিনি অতুলনীয় ছিলেন। তাঁর শিল্পকীর্তি ফিরোজ মিনার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর রাজ্যের আয়তন ছিল সুবিশাল। সুতরাং তিনি যে বাংলার শ্রেষ্ঠ সুলতানদের অন্যতম, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাংলাদেশে হাব্‌শী রাজত্বের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই যে এদেশে সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় নি, তা এখন বোধ হয় সকলেই বুঝতে পারবেন। বাংলার প্রথম হাব্‌শী রাজা যোগ্যতার সঙ্গে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল শাসন করে গিয়েছেন। হাব্‌শীদের মোট রাজত্বকালের অর্ধেকেরও বেশী সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহের রাজত্বকাল। সুতরাং ফিরোজ শাহের পরবর্তী

রাজারা যা-ই করে থাকুন না কেন, বাংলার হাব্‌শী রাজত্বের অধিকাংশই বেশ ভালভাবে কেটেছিল বলে স্বীকার করতে হয়।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহের নাম উল্লেখের সময় তাঁকে প্রায়ই "ফতে শাহের ক্রীতদাস" বলেছেন। কিন্তু ফিরোজ যে জলালুদ্দীন ফতেহ্‌ শাহের ক্রীতদাস ছিলেন, তার কোন প্রমাণই নেই।

নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ (২য়)

সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহের পরবর্তী সুলতানের নাম নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ। সমস্ত ইতিহাস-গ্রন্থে এঁর নাম পাওয়া যায়। এই নামে ইতিপূর্বে আর একজন সুলতান ছিলেন বলে এঁকে দ্বিতীয় নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ বলা উচিত। 'তবকাৎ-ই-আকবরী', 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা' ও 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতী'নের মতে ইনি সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কিন্তু 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা' ও 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে' আবার এও লেখা হয়েছে যে হাজী মুহম্মদ কন্দাহারী নামে একজন ঐতিহাসিকের মতে এই মাহ্‌মুদ শাহ জলালুদ্দীন ফতেহ্‌ শাহের পুত্র, ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পরে এঁকে সিংহাসনে বসানো হয়।

সুতরাং এই নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে একটা রহস্য রয়েছে। রহস্য আরও ঘনীভূত হয় নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের শিলালিপি থেকে। বর্ধমান জেলার কালনার কাছে এক মসজিদে এঁর একটি শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে ; এর তারিখ ৮৯৫ হিজরা ; এতে সুলতানের নাম এইভাবে লেখা রয়েছে,

"অস্‌-সুলতান ইব্‌ন্‌ অস্‌-সুলতান্‌ নাসির উদ্‌-দুনিয়া ওয়াদ্‌-দীন আবু (ল মুজাহিদ) মাহ্‌মুদ শাহ বাদশাহ গাজী।"

এতে বলা হয়েছে সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ সুলতানের পুত্র, কিন্তু তাঁর পিতার নাম বলা হল না। জলালুদ্দীন ফতেহ্‌ শাহ ও সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ উভয়েরই পুত্র নিজেকে "সুলতানের পুত্র" বলে পরিচয় দিতে পারেন। সুতারাং আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেলাম।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেছিলেন মুহম্মদ কন্দাহারীর উক্তিই ঠিক এবং এই মাহ্‌মুদ শাহ জলালুদ্দীন ফতেহ্‌ শাহেরই পুত্র। অপর মতকে তিনি এই বলে নস্যাৎ করে দিয়েছেন,

"রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে নাসির-উদ্দীন্ মহ্মুদ শাহ, সৈফ্-উদ্দীন্ ফিরোজ্ শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র। যে সকল হাব্শী ক্রীতদাস ভারতবর্ষে আনীত হইত, তাহারা সকলেই নপুংসক। মুসলমান ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন্ কি জন্য নপুংসকের পুত্রপ্রাপ্তির কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।"

কিন্তু রাখালদাস লক্ষ্য করেননি যে শুধু গোলাম হোসেন মাহ্মুদ শাহকে ফিরোজ শাহের পুত্র বলেন, বখ্শী নিজামুদ্দীনও এই কথা বলেছেন তাঁর 'তবকাৎ-ই-আকবরী'তে। বখ্শী নিজামুদ্দীন ষোড়শ শতাব্দীর লোক। মুহম্মদ কন্দাহারীও তাই। সুতরাং কন্দাহারীর উক্তির তুলনায় নিজামুদ্দীনের উক্তির মূল্য কোন অংশে কম নয়, বরং একদিক দিয়ে বেশী; কারণ কন্দাহারীর বই এখন আর পাওয়া যায় না, কিন্তু নিজামুদ্দীনের বই পাওয়া যায়।

আশ্চর্যের বিষয়, রাখালদাস মনে করেছেন যে সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ নপুংসক ছিলেন। এদেশে যে সব হাব্শী আসত, তাদের সম্বন্ধে রাখালদাসের তুলনায় 'তবকাৎ-ই-আকবরী'-লেখকের ধারণা নিশ্চয়ই অনেক পরিষ্কার ছিল; কারণ তিনি আলোচ্য সময়ের মাত্র একশো বছর পরে (১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে) এই বই লিখেছেন এবং তাঁর সময়েও ভারতবর্ষে অনেক হাব্শী ছিল; এদেশে আগত সব হাব্শীই যদি নপুংসক হত, তাহলে তিনি ফিরোজ শাহের পুত্রপ্রাপ্তির মত অসম্ভব কথা লিপিবদ্ধ করতেন না। সুতরাং ফিরোজ শাহকে নপুংসক মনে করার অনুকূলে কোন যুক্তি নেই। রাখালদাস ফিরোজ শাহ্কে যে "ক্রীতদাস" বলছেন, এরও অনুকূলে যে কোন প্রমাণ নেই, তা আগেই বলা হয়েছে।

আর একটি বিষয় দেখতে হবে। 'তারিখ-ই-ফিরিশ্তা' ও 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' "সুলতান শাহজাদা"র সঙ্গে মালিক আন্দিল বা ফিরোজ শাহের দ্বন্দ্বযুদ্ধের যে বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে কেবলমাত্র "সুলতান শাহজাদা"কেই বারবার নপুংসক বলা হয়েছে, মালিক আন্দিলও যে নপুংসক, সে কথা ঘুণাক্ষরেও বলা হয়নি। বরং তিনি যে নপুংসককে বধ করে খুব বড় একটা কাজ করছেন, সেই কথাটাই জোর দিয়ে বলা হয়েছে। 'তারিখ-ই-ফিরিশ্তা'য় লেখা আছে যে জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহ নিহত হবার সময়ে তাঁর উজীর খোজা খান জহান এবং প্রধান অমাত্য মালিক আন্দিল হাব্শী রাজ্যের সীমান্তে ছিলেন। মালিক আন্দিল যে খোজা ছিলেন, তা ফিরিশ্তা বলেননি, কেবল খান জহানকেই তিনি খোজা বলেছেন। সুতরাং সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ কে

নপুংসক ছিলেন না, তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রকৃতপক্ষে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান, ফিরোজ মিনারের নির্মাতা, দানবীর ফিরোজ শাহকে নপুংসক মনে করা নিতান্তই অসঙ্গত কল্পনা।

কিন্তু আমাদের মূল প্রশ্নের আলোচনা এখনও বাকী রয়েছে; অর্থাৎ দ্বিতীয় নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহ্ কার ছেলে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থেকে মনে হয় যে এসম্বন্ধে 'তবকাৎ-ই-আকবরী'র উক্তিই ঠিক্ এবং নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহ সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহের পুত্র।

(১) মুহম্মদ কন্দাহারীর উক্তি অনুসারে নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহ জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহের পুত্র। জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহের পিতার নামও নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহ। তা'হলে পিতামহ ও পৌত্রের অবিকল একই নাম হয়। কিন্তু বাংলাদেশের সুলতানদের মধ্যে এমন একটি দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় না, যেখানে পিতামহ ও পৌত্রের নাম একেবারে অভিন্ন।*

(২) এই দ্বিতীয় নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের শিলালিপিতে তাঁকে "সুলতানের পুত্র সুলতান" (অস্-সুলতান ইব্‌ন্ অস্-সুলতান) বলা হয়েছে, কিন্তু তাঁর পিতামহও যে সুলতান, তা বলা হয়নি। তিনি জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহের পুত্র ও প্রথম নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের পৌত্র হলে তাঁর শিলালিপিতে "অস্-সুলতান্ ইব্‌ন্ অস্ সুলতান ইব্‌ন্ অস্-সুলতান" (অর্থাৎ সুলতানের পুত্র সুলতান, তস্য পুত্র সুলতান) লেখা থাকত। তা না থাকাতে মনে হয়. তাঁর পিতামহ সুলতান ছিলেন না, কেবল পিতাই সুলতান ছিলেন এবং তিনি সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহের পুত্র।

(৩) দ্বিতীয় নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহ জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহের পুত্র হলে ফতেহ্ শাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন না কেন? অপর পক্ষ ফিরিশ্‌তা ও 'রিয়াজে'র উক্তি উদ্ধৃত করে বলবেন যে সে সময় তিনি শিশু ছিলেন বলে সিংহাসন পাননি। ফিরিশ্‌তা ও গোলাম হোসেন লিখেছেন, ফতেহ্ শাহের মৃত্যুর সময় তাঁর পুত্রের বয়স মাত্র দু' বছর

---

* ব্লকম্যান লিখেছিলেন প্রথম নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের "কুনিয়াহ্" ছিল "আবুল মুজাফ্ফর" এবং দ্বিতীয় নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের "কুনিয়াহ্" ছিল "আবুল মুজাহিদ"; এঁদের নাম সম্পূর্ণ অভিন্ন নয়, সুতরাং এঁদের মধ্যে পিতামহ-পৌত্র সম্পর্ক থাকতে বাধা নেই (JASB, 1873, Pt. I, p. 288 দ্রঃ)। কিন্তু প্রথম নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের "আবুল মুজাফ্ফর" ও "আবুল মুজাহিদ" উভয় "কুনিয়াহ্"ই ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং ব্লকম্যানের মত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

ছিল বলে অমাত্যেরা তাকে রাজা না করে ফিরোজ শাহ্‌কে রাজা করেন। এই কথা ঠিক হলে বলতে হবে ফিরোজ শাহের মৃত্যুর সময়েও ফতেহ্‌ শাহের পুত্র শিশুই ছিলেন, কারণ ফিরোজ শাহ ৩।৪ বছর রাজত্ব করেন এবং তাঁর মৃত্যুকালে ফতেহ্‌ শাহের পুত্রের বয়স ৫।৬ বছরের বেশী হয় না। সুতরাং অমাত্যেরা যদি আগে শিশুকে সিংহাসনে বসাতে রাজী না হয়ে থাকেন, তবে এখনও তাঁদের রাজী হবার কোন কারণ দেখা যায় না।

দ্বিতীয় নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের কোন মুদ্রা পাওয়া যায় নি। যে সমস্ত মুদ্রা এঁর উপর আরোপিত হয়েছিল, সেগুলি প্রথম নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের মুদ্রা বলে প্রমাণিত হয়েছে। এর তিনটি শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে, একটি ৮৯৫ হিজরায় ও দুটি ৮৯৬ হিজরায় উৎকীর্ণ। সুতারাং এক বছর বা তার কিছু বেশী সময় ইনি রাজত্ব করেছিলেন বলে মনে হয়। এই সমস্ত জায়গায় এঁর শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে :—

কালনা (বর্ধমান), পাণ্ডুয়া (মালদহ) এবং চুনাখালি (মুর্শিদাবাদ)।

সুতরাং উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এঁর রাজত্ব ছিল দেখা যাচ্ছে। ইনি হাব্‌শী হোন্‌ বা না হোন্‌, এঁর পরামর্শদাতারা সকলেই হাব্‌শী ছিলেন। বাংলাদেশে হাব্‌শী-কর্তৃত্ব যে এঁর রাজত্বকালেও সুদৃঢ় ছিল, এঁর রাজ্যের এই বিস্তৃত আয়তনই তার প্রমাণ।

ফিরিশতা ও 'রিয়াজ'-এর মতে এঁর রাজত্বকালে হাব্‌শ্‌ খান নামে একজন হাব্‌শী ক্রীতদাস রাজকোষ এবং শাসনব্যবস্থার সর্বময় কর্তা হয়ে ওঠে। মুহম্মদ কন্দাহারীর মতে (ফিরিশ্‌তা ও গোলাম হোসেন কর্তৃক উল্লিখিত) সুলতান ফিরোজ শাহের জীবদ্দশায় তাঁর আদেশে হাব্‌শ্‌ খান মাহ্‌মুদ শাহকে শিক্ষা দেবার জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। যাহোক্‌, এই তিনজন লেখকই বলেন, ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পরে মাহ্‌মুদ শাহ রাজা হন বটে, কিন্তু হাব্‌শ্‌ খানই রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা করায়ত্ত করেন, ফলে মাহ্‌মুদ শাহ তাঁর হাতের পুতুলে পরিণত হন। এইভাবে কিছুদিন কাটবার পর (কন্দাহারীর মতে হাব্‌শ্‌ খান তখন নিজে রাজা হবার মতলব আঁটছিলেন) সিদি বদ্‌র্‌ নামে আর একজন হাব্‌শী বেপরোয়া হয়ে উঠে হাব্‌শ্‌ খানকে হত্যা করে এবং নিজেই শাসনব্যবস্থার কর্তা হয়ে বসে। কিছুদিন বাদে পাইকদের সর্দারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সে একদিন রাত্রে মাহ্‌মুদ শাহকে হত্যা করে এবং পরদিন সকালে অমাত্যদের সম্মতিক্রমে সে মুজাফফর শাহ নাম নিয়ে সিংহাসনে বসে।

এই বিবরণের প্রথমাংশ কোন সমসাময়িক বিবরণ দ্বারা সমর্থিত না হলেও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও বিশ্বাস্য। শেষাংশ সম্পূর্ণ সত্য, কারণ বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "নসরৎ শাহের পিতার (অর্থাৎ হোসেন শাহের) রাজ্যলাভের আগে একজন হাব্‌শী রাজাকে হত্যা করে কিছুদিন বাংলাদেশ শাসন করেছিল।"

বিভিন্ন শিলালিপি থেকে দ্বিতীয় নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের এই সমস্ত কর্মচারীর নাম পাওয়া গিয়েছে :—

(১) **দৌলৎ খান**

(২) **মজলিস খান**

শামসুদ্দীন মুজাফফর শাহ

শামসুদ্দীন মুজাফফর শাহ সম্বন্ধে 'তবকাৎ-ই-আকবরী', 'মাসির-ই-রহিমী', 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা' ও 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে'র বিবরণ প্রায় একই রকম। চারটি বইয়েই মোটামুটিভাবে এই সব কথা লেখা রয়েছে—

গায়ের জোরে মুজাফফর শাহ রাজা হবার পরে পৃথিবীতে অন্ধকার নেমে এল। মুজাফফর শাহ ছিলেন উদ্ধত, নৃশংস ও রক্তপিপাসু প্রকৃতির। রাজা হয়ে তিনি বহু শিক্ষিত, ধার্মিক ও সম্ভ্রান্ত লোককে হত্যা করেন এবং হিন্দু রাজাদের যমালয়ে প্রেরণ করেন। অবশেষে তাঁর অত্যাচার যখন চরমে পৌঁছোলো, তখন সকলেই তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াল। তাঁর মন্ত্রী সৈয়দ হোসেন বিরুদ্ধবাদীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন এবং মুজাফফর শাহকে বধ করে নিজে রাজা হলেন।

বাবরের আত্মকাহিনী থেকে মুজাফফর শাহ সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র জানা যায়,

(১) মুজাফফর শাহ জাতিতে হাব্‌শী ছিলেন।

(২) তিনি পূর্ববর্তী রাজাকে হত্যা করে রাজা হয়েছিলেন।

(৩) আলাউদ্দীন হোসেন শাহ মুজাফফর শাহকে হত্যা করে রাজ্যলাভ করেছিলেন।

মুজাফফর শাহের নৃশংসতা, অত্যাচার ও কুশাসন সম্বন্ধে বাবর কিছু লেখেননি। এসম্বন্ধে পূর্বোল্লিখিত চারখানি বইতে যা লেখা আছে, তা সম্পূর্ণ সত্য কিনা বলা যায় না। 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা' ও 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে'র মতে মুজাফফর শাহ তাঁর উজীর সৈয়দ হোসেনের পরামর্শে

সৈন্যদের বেতন হ্রাস করেন। এই ব্যাপার এবং মুজাফফর শাহের দুর্ব্যবহার ও রাজস্ব সংগ্রহের জন্য প্রজাদের উপর নৃশংস অত্যাচার অমাত্যদের অধিকাংশকেই বিরক্ত করে তোলে। তাঁরা তখন সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। এই সৈয়দ হোসেনই তখন তাঁদের নেতৃত্ব করেন। এসব কথা সত্য কিনা তা বলা শক্ত, তবে মুজাফফর শাহ যে জনপ্রিয় রাজা ছিলেন না, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার প্রমাণ, তিনি বাংলাদেশের একটা বড় অঞ্চলে নিজের অধিকার হারিয়েছিলেন। আজ অবধি এইসব জায়গায় তাঁর শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে :—

গঙ্গারামপুর (দিনাজপুর), নবাবগঞ্জ (মালদহ), হজরৎ (মালদহ), চম্পানগর (ভাগলপুর)।

তাঁর মুদ্রায় "কোষাগার" ও "টাকশাল" ছাড়া দু'টি মাত্র নির্মাণস্থানের উল্লেখ পাই—বারবকাবাদ ও ফতেহাবাদ। বারবকাবাদ উত্তরবঙ্গে অবস্থিত। মোগল সম্রাটদের আমলে বর্তমান মালদহ, রাজশাহী, দিনাজপুর ও বগুড়ার কিয়দংশ নিয়ে সরকার বারবকাবাদ গঠিত হয়েছিল। ফতেহাবাদ দক্ষিণবঙ্গে —ফরিদপুর অঞ্চলে অবস্থিত।

এর থেকে দেখা যায়, প্রায় সমগ্র উত্তরবঙ্গে মুজাফফর শাহের অধিকার ছিল, উপরন্তু উত্তরবঙ্গের সংলগ্ন বিহারের কিছু অঞ্চল তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। দক্ষিণবঙ্গেরও কিছু অংশ তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল। কিন্তু পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে যে তাঁর কোন অধিকার ছিল, এমন কোন প্রমাণ পাই না। সম্ভবত এই সব অঞ্চল তাঁর কর্তৃত্ব স্বীকার করেনি।

তবে যে অঞ্চলে মুজাফফর শাহের রাজত্ব ছিল বলে নিঃসন্দিগ্ধভাবে জানা যায়, তার আয়তনও খুব কম নয়। মুজাফফর শাহের ৮৯৬ হিজরার মুদ্রা এবং ৮৯৬ থেকে ৮৯৮ হিজরার শিলালিপি পাওয়া যায়। তিনি যতখানি অত্যাচারী ছিলেন বলে চিত্রিত হয়েছেন, সত্যিই যদি তিনি ততখানি অত্যাচারী হতেন, তাহলে এতবড় অঞ্চলে এতদিন ধরে নিজের অধিকার বজায় রাখতে পারতেন বলে মনে হয় না। এই কারণে মনে হয়, মুজাফফর শাহ সম্বন্ধে পূর্বোল্লিখিত ইতিহাসগ্রন্থগুলির বিবরণে খানিকটা অতিরঞ্জন আছে। মুজাফফর শাহকে উচ্ছেদ করে যিনি রাজা হয়েছিলেন, সেই হোসেন শাহের প্রচারের ফলেই সম্ভবত মুজাফফর শাহের চরিত্র অত্যধিক পরিমাণে কালিমালিপ্ত হয়েছে।

বিভিন্ন শিলালিপি থেকে শামসুদ্দীন মুজাফফর শাহের এই সব কর্মচারীর নাম পাওয়া যায় :—

(১) **মুস্তাবর খান কার ফর্মান**

(২) **মজলিস উলুগ খুর্শীদ**

পূর্বোল্লিখিত ইতিহাসগ্রন্থগুলির মতে মুজাফফর শাহ সৈয়দ হোসেনকে উজীরের পদে নিয়োগ করেছিলেন। এই নিয়োগের ফলে রাজ্যের ভাল হয়েছিল, কিন্তু মুজাফফর শাহের সর্বনাশ হয়েছিল। এ সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব।

কীভাবে মুজাফফর শাহ নিহত হয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে ষোড়শ শতাব্দীর দু'জন লেখকের মধ্যে মতদ্বৈধ দেখা যায়। হাজী মুহম্মদ কন্দাহারীর মতে ('তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা' ও 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' উল্লিখিত) মুজাফফর শাহের সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল। ১,২০,০০০ লোক এই যুদ্ধে নিহত হবার পরে মুজাফফর শাহ পরাস্ত ও নিহত হন এবং বিরুদ্ধবাদীদের নেতা সৈয়দ হোসেন রাজা হন। সম্ভবত কন্দাহারীর বর্ণনা অবলম্বনেই ফিরিশ্‌তা ও গোলাম হোসেন এই যুদ্ধের অনতিসংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এটি বিশ্লেষণ করব। ফিরিশ্‌তা ও 'রিয়াজে' লেখা আছে এই যুদ্ধে যে সমস্ত লোক বন্দী হত, তাদের মুজাফফর শাহের সামনে নিয়ে আসা হত এবং মুজাফফর নাকি স্বহস্তে তাদের বধ করতেন।

বখ্‌শী নিজামুদ্দীন কিন্তু 'তবকাৎ-ই-আকবরী'তে অন্য কথা লিখেছেন। তাঁর মতে জনসাধারণ যখন মুজাফফর শাহের উপর বিরক্ত হয়ে উঠল, তখন সৈয়দ হোসেন তাদের মনোভাব বুঝতে পারলেন এবং ঘুস দিয়ে পাইকদের সর্দারকে হাত করে ১৩ জন লোক সঙ্গে নিয়ে মুজাফফর শাহের অন্তঃপুরে ঢুকে তাঁকে হত্যা করলেন। 'মাসির-ই-রহিমী'তেও এই কথা লেখা আছে, তবে তাতে বলা হয়েছে হোসেন ১৫ জন লোক সঙ্গে নিয়ে মুজাফফরের অন্তঃপুরে ঢুকেছিলেন।

সম্ভবত এই বইগুলির কথাই সত্য, কারণ বাবর তাঁর আত্মকাহিনীতে লিখেছেন, "সুলতান আলাউদ্দীন সেই হাব্শীকে (মুজাফফর শাহকে) হত্যা করে রাজ্যলাভ করেছিলেন।" আলাউদ্দীন (সৈয়দ হোসেন) মুজাফফর শাহকে যুদ্ধে নিহত করলে বাবর তাকে "হত্যা করা" বলতেন কিনা সন্দেহ।

মুজাফফর শাহ্ সম্ভবত ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন। তাঁরই রাজত্বকালে ও সম্ভবত তাঁরই যত্নে পাণ্ডুয়ায় নূর কুৎব্ আলমের সমাধি-ভবনটি পুনর্নির্মিত হয়। গৌড়ের কাছে গঙ্গারামপুরে মৌলানা আতার দরগায় তিনি একটি মসজিদ তৈরী করান। নূর কুৎব্ আলমের সমাধি-ভবনের শিলালিপিতে তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আছে। অথচ সব ইতিহাসগ্রন্থেই লেখা আছে তিনি ধার্মিক লোকদের হত্যা করতেন!

৮৯২ হিজরায় বাংলা দেশে হাব্শী-রাজত্ব সুরু হয়। ৮৯৮ হিজরায় মুজাফফর শাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তা শেষ হল। পরবর্তী সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ সিংহাসনে আরোহণ করে হাব্শীদের বাংলা দেশ থেকে বিতাড়িত করেন। রুকনুদ্দীন বারবক শাহের রাজত্বকালে যারা এদেশের শাসনব্যবস্থায় প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পায়, ত্রিশ বছরের মধ্যেই তাদের ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ ও তার ঠিক পরেই সদলবলে বিদায়গ্রহণ—দুইই নাটকীয় ব্যাপার। এই হাব্শীদের মধ্যে সকলেই যে খারাপ লোক ছিল না, তা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করে দেখিয়েছি। এখানে তার পুনরুক্তি না করে আর একটি বিষয়ের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। অনেকেই লিখেছেন যে হাব্শীদের দৌরাত্ম্যের ফলে ১৪৮৭ থেকে ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশে পরপর অনেকগুলি রাজা নিতান্ত অল্প সময় রাজত্ব করার পরে নিহত হন। কিন্তু আসলে এই ব্যাপারের জন্যে হাব্শীদের চেয়ে পাইকরাই বেশী দায়ী। বিভিন্ন রাজার আততায়ীরা (তারা সকলেই হাব্শী নয়) এই পাইকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেই রাজাদের হত্যা করেছে। বলা বাহুল্য, পাইকেরা হাব্শী নয়, তারা এদেশেরই লোক। জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহকে হত্যা করে যে দুরাত্মা গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করে, সেই সুলতান শাহজাদা ফিরিশ্তার মতে পাইকদের সর্দার ও বাঙালী ছিল।

রজনীকান্ত চক্রবর্তী তাঁর 'গৌড়ের ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছেন যে বাংলার হাব্শীদের মধ্যে এই কজন প্রধান ছিলেন:—

কাফুর, কোয়ারানকুল, ফিরুজ, ফিরুজা, আল্মাস্, ইয়াকুৎ, হাব্স্ খাঁ, আন্দিল এবং সিদ্দিবদর।

এঁদের মধ্যে কাফুর, হাব্স খান, আন্দিল এবং সিদ্দিবদরের নাম অন্যান্য সূত্রে পাওয়া যায়। কাফুর ঐতিহাসিক ব্যক্তি, কারণ ঢাকা জেলায় রামপালের

এক মসজিদের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, সুলতান জলালুদ্দীন ফতেহ্‌ শাহের রাজত্বকালে ৮৮৮ হিজরার রজব মাসে মালিক কাফুর ঐ মসজিদ তৈরী করিয়েছিলেন। হাব্‌স্‌ খানের নাম 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা' ও 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীন'-এ পাওয়া যায়, এই দুই বইয়ের মতে ইনি দ্বিতীয় নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের রাজত্বকালের প্রথম দিকে রাজ্যের সর্বেসর্বা ছিলেন। মালিক আন্দিল ও সিদ্দিবদর যথাক্রমে সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ্‌ ও শামসুদ্দীন মুজাফফর শাহ নাম নিয়ে বাংলার সুলতান হন বলে বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থে লেখা আছে। রজনীকান্ত চক্রবর্তী অন্য যে সমস্ত হাব্‌শীর নাম করেছেন, তাঁদের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

পঞ্চম অধ্যায়

আলাউদ্দীন হোসেন শাহ

অবতরণিকা

মোগল-পূর্ববর্তী যুগে বাংলাদেশে যে সমস্ত স্বাধীন সুলতানের আবির্ভাব হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে আলাউদ্দীন হোসেন শাহই সবচেয়ে বিখ্যাত। এঁদের ভিতর একমাত্র তাঁর নামই জনতার স্মৃতিতে আজও অম্লান। অন্য সুলতানদের নাম বেঁচে আছে শুধু ইতিহাসের পাতায়, ইতিহাসরসিক ভিন্ন তাঁদের খবর বিশেষ কেউ রাখেন না। কিন্তু হোসেন শাহের নাম সাধারণ লোকের কাছেও পরিচিত। বাংলাদেশ ও তার আশপাশের বিভিন্ন অঞ্চলে হোসেন শাহ সম্বন্ধে যে কত কাহিনী প্রচলিত আছে, তার সীমা নেই। ব্লকম্যান লিখেছেন, "The name of Husain Shah, the good, is still remembered from the frontiers of Orissa to the Brahmaputra."

আলাউদ্দীন হোসেন শাহের এই খ্যাতির প্রধান কারণ তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ নরপতি। এ ছাড়া এর আরও কয়েকটি কারণ আছে। সেগুলি এই,

(ক) আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজ্যের আয়তন ছিল অত্যন্ত বিরাট, পূর্ববর্তী সুলতানদের রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশী। এই কারণে তাঁর খ্যাতির প্রসার-ক্ষেত্র স্বভাবতই বিস্তীর্ণ হয়েছে।

(খ) আলাউদ্দীন হোসেন শাহের যত ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন আছে, এত বাংলার আর কোন সুলতানের নেই। এ পর্যন্ত তাঁর অজস্র শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, এখনও হচ্ছে। সমসাময়িক বা ঈষৎ-পরবর্তী যুগে রচিত বহু গ্রন্থেই তাঁর নাম পাওয়া যায়। তাঁর সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণও তাদের মধ্যে মেলে।

(গ) আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ছিলেন চৈতন্যদেবের সমসাময়িক বঙ্গাধিপ। চৈতন্যদেবের নবদ্বীপলীলা তাঁর রাজত্বকালেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এইজন্য চৈতন্যদেবের প্রসঙ্গের সঙ্গে তাঁর নামটিও যুক্ত হয়ে বাঙালীর স্মৃতিতে স্থায়ী আসন লাভ করেছে।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, বাংলা দেশের কৃপণা ইতিহাস-লক্ষ্মী এত বিখ্যাত একজন নরপতিকেও তাঁর প্রসাদ থেকে বঞ্চিত রেখেছেন। অন্য সুলতানদের মত আলাউদ্দীন হোসেন শাহেরও প্রামাণিক আনুপূর্বিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। তার ফল হয়েছে এই যে, আগেকার লোকে যেমন হোসেন শাহের ইতিহাস বলতে জানত কয়েকটি গালগল্প, তেম্নি এখনকার যুগের লোকেদের, এমন কি গবেষকদের মনেও হোসেন শাহ সম্বন্ধে নিতান্ত অস্পষ্ট একটা ধারণা রয়েছে, যার মধ্যে সত্যের চাইতে কল্পনার পরিমাণই বেশী। বাংলার সংস্কৃতি, সাহিত্য, ইতিহাস সংক্রান্ত আলোচনায় আলাউদ্দীন হোসেন শাহের প্রসঙ্গ প্রায়ই এসে পড়ে। সেক্ষেত্রে এরা এই সব অস্পষ্ট ধারণারই বারবার পুনরাবৃত্তি করেন।

সেইজন্য আজ আলাউদ্দীন হোসেন শাহের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করা ও সর্বসাধারণের সামনে তাকে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী হয়ে পড়েছে। নানা ভেজালের মধ্য থেকে আসল তথ্যকে উদ্ধার করা অত্যন্ত কঠিন কাজ হলেও আমাদের সেই চেষ্টাই করতে হবে।

আরবী, ফার্সী, বাংলা, সংস্কৃত, উড়িয়া, অসমীয়া, অবধী, পর্তুগীজ প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় লেখা নানা সূত্রে আলাউদ্দীন হোসেন শাহ সম্বন্ধে বিচ্ছিন্ন সংবাদ পাওয়া যায়। হোসেন শাহের শিলালিপিগুলি সবই আরবী ভাষায় লেখা। ফার্সী গ্রন্থগুলির মধ্যে 'তবকাৎ-ই-আকবরী', 'আইন-ই আকবরী', 'মাসির-ই-রহিমী', 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা', এবং 'রিয়াজ-উস্-সলাতীন' উল্লেখযোগ্য। এদের ভিতরে একমাত্র 'রিয়াজ-উস্ সলাতীনে'ই হোসেন শাহ সম্বন্ধে কতকটা বিস্তৃত ও ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায়। অর্বাচীন হলেও এই বিবরণীর গুরুত্ব আছে, কারণ এর কতকাংশ নির্ভরযোগ্য প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত, সুতরাং অন্যান্য অংশকেও বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দু'একটি সমসাময়িক ফার্সী গ্রন্থে ও ফার্সী পুঁথির পুষ্পিকায় হোসেন শাহের নাম উল্লিখিত হয়েছে। বাংলা বইগুলির মধ্যে 'চৈতন্যভাগবত', 'চৈতন্যমঙ্গল', 'চৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি চৈতন্যজীবনীগ্রন্থে এবং কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী রচিত মহাভারতে হোসেন শাহ সম্বন্ধে অল্পস্বল্প তথ্য মেলে, অন্য কয়েকখানি গ্রন্থে হোসেন শাহের নাম মাত্র পাওয়া যায়। কয়েকটি সংস্কৃত গ্রন্থ ও লিপি থেকে অল্প সংবাদ পাওয়া যায়। উড়িষ্যার 'মাদলা পাঞ্জী', আসামের 'বুরঞ্জী' এবং ত্রিপুরার 'রাজমালা'য় হোসেন

শাহের সঙ্গে ঐসব দেশের যুদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যায়, এইসব সূত্র খুব মূল্যবান হলেও এদের মধ্যে দু'টি ত্রুটি রয়েছে; এগুলি সমসাময়িক নয় এবং এদের বর্ণনা একদেশদর্শিতা-দোষে দুষ্ট। অবধী ভাষায় লেখা কুৎবনের 'মৃগাবতী'তে হোসেন শাহের নাম মেলে, কিন্তু তিনি কোন্ হোসেন শাহ, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকালে পর্তুগীজরা প্রথম বাংলাদেশে পদার্পণ করেন। এই সময়ের কয়েকজন পর্তুগীজ ভাগ্যান্বেষী বা পর্যটকের লেখা ভ্রমণবৃত্তান্তে এবং কয়েকজন পর্তুগীজ ঐতিহাসিকের লেখা গ্রন্থে—যেমন জোআঁ-দে-বারোসের[১] Da Asia-য়, গ্যাসপার কোরীআর[২] Lendas da India-য় এবং ফরিয়া-ই-সুজার[৩] Asia Portuguesa-য় বাংলার রাজা সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ আছে। মোটামুটিভাবে এই সমস্ত সূত্রের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করেই আমরা এই বিশ্রুত নরপতির ইতিহাস পুনর্গঠন করার চেষ্টা করব।

এখন আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাক্।

পূর্ব-ইতিহাস

আলাউদ্দীন হোসেন শাহ সৈয়দ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। একথা তাঁর মুদ্রা ও শিলালিপিতে এবং সমস্ত প্রামাণিক সূত্রে পাওয়া যায়। তাঁর মুদ্রা ও শিলালিপি থেকে জানা যায়, তাঁর পিতার নাম সৈয়দ আশরফ অল-হোসেনী। কিন্তু তাঁর সিংহাসন লাভের আগেকার ইতিহাস সম্বন্ধে খুব বেশী সংবাদ পাওয়া যায় না। স্টুয়ার্টের মতে হোসেন আরবের মরুভূমি থেকে বাংলায় এসেছিলেন। রিয়াজ-রচয়িতা কোন এক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় পেয়েছিলেন—হোসেন শাহ তাঁর পিতা আশরফ অল-হোসেনী ও ভ্রাতা য়ুসুফের সঙ্গে সুদূর তুর্কীস্তানের তারমুজ শহর থেকে বাংলায় এসে রাঢ়ের চাঁদপুর মৌজায় বসতি স্থাপন করেন; সেখানকার কাজী তাঁদের দুই ভাইকে

---

১ ইনি লিসবনের India House-এর কার্যাধ্যক্ষ ও গোমস্তা ছিলেন। এঁর বইয়ের রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ।

২ ইনি প্রাচ্যে পর্তুগীজ অধিকৃত অঞ্চলগুলির শাসনকর্তা আলবুকার্কের সেক্রেটারী ছিলেন এবং ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আসেন। এঁর বইয়ের রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ।

৩ এঁর জীবৎকাল ১৫৮১-১৬৪৯ খ্রীঃ। এঁর বইয়ের প্রথম খণ্ড ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

শিক্ষা দেন এবং তাঁর উচ্চ বংশমর্যাদার কথা জেনে তাঁর সঙ্গে নিজের কন্যার বিবাহ দেন। রাঢ়ের চাঁদপুর (নামান্তর চাঁদপাড়া) এবং তার আশ-পাশের বিভিন্ন গ্রামে হোসেন শাহের রাজত্বকালের প্রথম দিকের বহু শিলালিপি পাওয়া যায়। চাঁদপুর অঞ্চলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ সম্বন্ধে ঐ অঞ্চলে ব্যাপক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। একটি বহুলপ্রচলিত কিংবদন্তী এই। বাল্যকালে সৈয়দ হোসেন চাঁদপুরের এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে রাখালের কাজ করতেন; বাংলার সুলতান হয়ে তিনি ঐ ব্রাহ্মণকে মাত্র এক আনা খাজনায় চাঁদপুর গ্রামখানি ভোগ করার অধিকার দেন। তার ফলে গ্রামটি আজও পর্যন্ত একানী চাঁদপুর বা একানী চাঁদপাড়া নামে পরিচিত। কিন্তু কিছুদিন পরে তাঁর বেগম ঐ ব্রাহ্মণের জাতি নষ্ট করার জন্য তাঁকে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। তার ফলে ব্রাহ্মণ গরুর মাংস খেতে ও মুসলমান হতে বাধ্য হন। 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' উল্লিখিত ক্ষুদ্র পুস্তিকার বিবরণ, বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হাসানের প্রথম জীবন সংক্রান্ত একটি সুপ্রচলিত কাহিনী এবং নীচে উল্লিখিত সুবুদ্ধি রায়ের কাহিনীকে জোড়াতালি দিয়ে মিলিয়ে এই কিংবদন্তীর সৃষ্টি করা হয়েছে। এই জাতীয় কিংবদন্তী কখনই সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু চাঁদপুর অঞ্চলের সঙ্গে হোসেন শাহের যে প্রথম জীবনে সম্পর্ক ছিল, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত' মধ্যলীলা ২৫শ পরিচ্ছেদে আলাউদ্দীন হোসেন শাহের পূর্বজীবন সম্বন্ধে একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। কাহিনীটি এই। রাজা হবার অনেক আগে সৈয়দ হোসেন "গৌড়-অধিকারী" (বাংলার রাজধানী গৌড়ের ভারপ্রাপ্ত শাসনকর্তা—District Magistrate জাতীয়) সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে চাকরী করতেন। সুবুদ্ধি রায় তাঁকে এক দীঘি কাটানোর কাজে নিয়োগ করেন এবং তাঁর কাজে ত্রুটি হওয়ায় তাঁকে চাবুক মারেন। পরে সৈয়দ হোসেন সুলতান হয়ে সুবুদ্ধি রায়ের পদমর্যাদা অনেক বাড়িয়ে দেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী একদিন তাঁর দেহে চাবুকের দাগ আবিষ্কার করে সুবুদ্ধি রায়ের চাবুক মারার কথা জানতে পারেন এবং সুবুদ্ধি রায়ের প্রাণবধ করার জন্য হোসেন শাহকে অনুরোধ করেন। সুলতান তাতে সম্মত না হওয়ায় তাঁর স্ত্রী সুবুদ্ধি রায়ের জাতি নষ্ট করতে বলেন। হোসেন শাহ তাতেও প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু স্ত্রীর নির্বন্ধাতিশয্যে অবশেষে তিনি সুবুদ্ধি রায়ের মুখে তাঁর করোয়ার

(বদনার) জল দেওয়ান এবং এইভাবে তিনি সুবুদ্ধি রায়ের জাতি নাশ করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তি অবিকল উদ্ধৃত করছি,

পূর্বে যবে সুবুদ্ধি রায় ছিলা গৌড় অধিকারী।
হুসন খাঁ সৈয়দ করে তাঁহার চাকরী॥
দীঘি খোদাইতে তারে মনসাব কৈল।
ছিদ্র পাঞা রায় তারে চাবুক মারিল॥
পাছে যবে হুসন খাঁ গৌড়ের রাজা হৈল।
সুবুদ্ধি রায়েরে তেঁহো বহু বাড়াইল॥
তাঁর স্ত্রী তাঁর অঙ্গে দেখে মারণের চিহ্নে।
সুবুদ্ধি রায়ে মারিবারে কহে রাজস্থানে॥
রাজা কহে আমার পোষ্টা রায় হয় পিতা।
তাহারে মারিব আমি ভাল নহে কথা॥
স্ত্রী কহে জাতি লহ যদি প্রাণে না মারিবে।
রাজা কহে জাতি নিলে ইহো নাহি জীবে॥
স্ত্রী মারিতে চাহে রাজা সঙ্কটে পড়িলা।
করোয়ার পানি তার মুখে দেয়াইলা॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রায় ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, প্রায় ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবনে যান এবং ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আলাউদ্দীন হোসেন শাহ সম্বন্ধে তাঁর প্রদত্ত এই বিবরণ মূল্যবান। কারণ কৃষ্ণদাস দীর্ঘকাল সনাতন ও রূপের সঙ্গ লাভ করেছিলেন। সনাতন ও রূপ দুজনেই হোসেন শাহের অমাত্য ছিলেন, সুলতানের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ; সুবুদ্ধি রায়ের সঙ্গেও তাঁদের অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল ('চৈতন্যচরিতামৃত', মধ্যলীলা, ২৫শ পরিচ্ছেদ, ১৫৯-১৬৫ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য)। কৃষ্ণদাস তাঁদেরই কাছে শুনে হোসেন শাহের প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করছেন বলে মনে হয়। তাই তাঁর প্রদত্ত বিবরণের গুরুত্ব অবিসংবাদিত। তাছাড়া যে সুবুদ্ধি রায় এই কাহিনীর নায়ক, তিনিও শেষ জীবনে বৃন্দাবনেই বাস করতেন। কৃষ্ণদাসের পক্ষে বৃন্দাবনে প্রথম এসে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করা ও তাঁরই কাছে এই কাহিনী শোনা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। আর স্বয়ং সুবুদ্ধি রায়ের সাক্ষাৎ যদি তিনি না-ও পেয়ে থাকেন, তাহলেও সুবুদ্ধি রায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত বহু লোকের সাক্ষাৎ তিনি বৃন্দাবনে

পেয়েছিলেন সন্দেহ নেই। এই সব দিক দিয়ে বিচার করলে, কৃষ্ণদাস কবিরাজের এই বিবরণ যথার্থ বলেই গ্রহণ করা যেতে পারে।

ফিরিশ্‌তার মতে আলাউদ্দীন অর্থাৎ হোসেন শাহের পূর্ব-নাম ছিল "সৈয়দ শরীফ মক্কী"। এর থেকে 'রিয়াজ'-রচয়িতা গোলাম হোসেন অনুমান করেছিলেন যে হোসেন শাহের পিতা মক্কার শরীফ ছিলেন। কিন্তু ফিরিশ্‌তার উক্তি বা গোলাম হোসেনের অনুমানের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্পষ্টই লিখেছেন যে হোসেন শাহের পূর্ব-নাম ছিল "হুসন (হোসেন) খাঁ সৈয়দ"।

এখন এই প্রসঙ্গে আর একটি বিবরণীর বিচার করা দরকার। পর্তুগীজ ঐতিহাসিক জোআঁ-দে-বারোস তাঁর 'দা এশিয়া' গ্রন্থে লিখেছেন যে পর্তুগীজদের চট্টগ্রামে আগমনের একশো বছর আগে কোন এক সম্ভ্রান্তবংশীয় আরব বণিক অদন (এডেন) থেকে ২০০ জন লোক সঙ্গে নিয়ে বাংলায় আসেন। রাজ্যের অবস্থা দেখে তিনি এই রাজ্য জয়ের পরিকল্পনা করতে থাকেন। নিজের উদ্দেশ্য গোপন করে তিনি ব্যবসায়ী বলে নিজের পরিচয় দেন এবং এই অছিলায় দেশ থেকে আরও ৩০০ জন আরবকে আনিয়ে নিজের দল ভারী করেন। তখন মন্দারিজরা (?) ঐ স্থানের শাসনকর্তা ছিল।* তাদের প্রভাবে তিনি বাংলার রাজার সঙ্গে পরিচিত হতে সমর্থ হন। ঐ সময়ে গৌড় ছিল বাংলার রাজধানী। ঐ আরব বণিক বাংলার রাজাকে তাঁর বংশগত শত্রু উড়িষ্যার রাজাকে দমন করতে সাহায্য করেন। এই সাহায্যের জন্য তিনি রাজার দেহরক্ষি-দলের অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হন। কিছুদিন পরেই বাংলার রাজাকে বধ করে তিনি নিজে সিংহাসনে আরোহণ করেন। (JASB, 1873, Pt. I, p. 217 দ্রষ্টব্য)

অনেকের মতে এই কাহিনীতে আলাউদ্দীন হোসেন শাহের কথাই বলা হয়েছে, অর্থাৎ ঐ আরব বণিক হোসেন শাহ। কিন্তু এই মত স্বীকার

* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী জনাব রুহুল আমিন আমাকে এক চিঠিতে লিখেছেন যে মন্দারী বা মদারী নামে পরিচিত সুফী মতাবলম্বী মুসলমানরা এক সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের মাহ্‌মুদাবাদ অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন। এই অঞ্চলের "মন্দারীটোলা" নামে একটি মৌজা এঁদেরই স্মৃতি বহন করছে। জনাব আমিনের মতে জোআঁ-দে-বারোস "মন্দারিজ" বলতে মন্দারীদের বুঝিয়েছেন। তিনি আরও মনে করেন যে জোআঁ-দে-বারোস বর্ণিত এই কাহিনীর একটা ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে, "তবে সেই আরব বণিক আলাউদ্দীন হোসেন শাহ নন।"

করা যায় না। কারণ প্রথমত, জোআঁ-দে-বারোস লিখেছেন যে এই ঘটনা পর্তুগীজেরা চট্টগ্রামে আসার একশো বছর আগে ঘটেছিল, আর হোসেন শাহ চট্টগ্রামে পর্তুগীজদের প্রথম আসার সময়েই (১৫১৭ খ্রীঃ) সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁর পুত্র গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের রাজত্বকালে পর্তুগীজরা চট্টগ্রামে কুঠি ও শুল্কগৃহ স্থাপন করে। দ্বিতীয়ত, হোসেন শাহের পূর্ববর্তী রাজা মুজাফফর শাহের রাজত্বকাল মাত্র দু'বছরের মত। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি উড়িষ্যার রাজাকে দমন করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। উড়িষ্যারাজ তাঁর বংশগত শত্রুও নন। তৃতীয়ত, জোআঁ-দে-বারোসের বিবরণী হোসেন শাহ সম্বন্ধে প্রযুক্ত ও অভ্রান্ত বলে স্বীকার করলে কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তির সঙ্গে তার বিরোধ ঘটে। হোসেন শাহের সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তি বেশী প্রামাণিক, কারণ কৃষ্ণদাস হোসেন শাহের কয়েকজন বিশিষ্ট অমাত্যের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন; তাছাড়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং যৌবনকাল অবধি তিনি এদেশেই ছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন যে হোসেন শাহ সিংহাসনে আরোহণের আগে সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন এবং গৌড়-শহরের ভারপ্রাপ্ত শাসনকর্তা সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে তিনি সামান্য চাকরী করতেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিবরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সিংহাসনে আরোহণের বহুদিন আগে থাকতেই হোসেন বাংলাদেশে ছিলেন। সম্ভ্রান্তবংশীয় আরব বণিক হোসেন শাহের লোকজন নিয়ে এদেশে আসা, ব্যবসায়ী বলে নিজের পরিচয় দিয়ে রাজ্যজয়ের চেষ্টা করা, মন্দারিজ(?)দের সাহায্যে বাংলাদেশের রাজার সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং কিছুদিনের মধ্যেই বাংলার সিংহাসন অধিকার করা—প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তির কোন সামঞ্জস্যই করা যায় না। অথচ কৃষ্ণদাস কবিরাজের সাক্ষ্যকে উড়িয়ে দেবার কোন উপায়ই নেই।

জোআঁ-দে-বারোস যে আরব বণিকের কথা বলেছেন, তাঁর ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধেও নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। জোআঁ-দে-বারোস হোসেন শাহের পূর্ববর্তী কোন গৌড়-সুলতানের সিংহাসন লাভ সম্বন্ধে একটি (সম্ভবত কাল্পনিক) জনশ্রুতি শুনে সেটিকে এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। জোআঁ-দে-বারোস কোনদিন বাংলাদেশে আসেন নি, সুতরাং তাঁর সংগ্রহ করা এই জনশ্রুতির

বিশেষ কোন মূল্য নেই এবং হোসেন শাহের সঙ্গে এই জনশ্রুতির কোনই সম্পর্ক নেই।

সুতরাং হোসেন শাহ যে আসলে কোথাকার লোক ছিলেন, সে বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কোন সিদ্ধান্ত করার উপায় দেখা যাচ্ছে না। তবে তিনি যে বাইরে থেকেই এসেছিলেন, একথা বলার স্বপক্ষে কোনই প্রমাণ নেই। এমনও হতে পারে, তিনি বাংলাদেশেরই লোক ছিলেন। ফ্রান্সিস বুকানন রংপুর জেলার যে বিবরণ দিয়েছেন, তাতে তিনি লিখেছেন যে হোসেন রংপুরের বোদা বিভাগের দেবনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন (Martin's Eastern India, Vol. III, p. 448 দ্রষ্টব্য)। রামপ্রাণ গুপ্ত লিখেছেন, "তাঁহার (হোসেনের) মাতা হিন্দু ছিলেন, এরূপ জনপ্রবাদও বিরল নহে।" (রিয়াজ-উস্-সলাতীন, বাংলা অনুবাদ, পৃঃ ১২৩, পাদটীকা)

হোসেন শাহ আরব বা তুর্কীস্তান থেকে বাংলায় এসেছিলেন বলে আমার মনে হয় না। তাঁর গাত্রবর্ণ সম্বন্ধে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য থেকে যে আভাস পাই, তাতে তাঁকে ঐসব অঞ্চলের লোক বলে মনে হয় না। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মধ্যলীলা ১৫শ পরিচ্ছেদে লেখা আছে যে একদিন "ম্লেচ্ছ রাজা" হোসেন শাহের চিকিৎসক মুকুন্দ যখন তাঁর চিকিৎসা করছিলেন, তখন রাজার মাথার উপরে একজন ভৃত্য ময়ূরপুচ্ছের পাখা ধরলে মুকুন্দ কৃষ্ণকে স্মরণ করে প্রেমাবেশে মূর্ছিত হয়ে পড়েন। এর থেকে ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেছেন, "হোসেন শাহার রঙ খুব কালো ছিল। তাই মাথার উপরে ময়ূরপুচ্ছের পাখা ধরিতেই মুকুন্দের কৃষ্ণস্মৃতিজনিত ভাববিহ্বলতা আসিয়াছিল।" কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁর মহাভারতে হোসেন শাহ সম্বন্ধে লিখেছেন,

> নৃপতি হোসেন শাহ হএ মহামতি।
> পঞ্চম গৌড়েত যার পরম সুখ্যাতি॥
> অস্ত্রশস্ত্রে সুপণ্ডিত মহিমা অপার।
> কলিকালে হৈব (হৈল?) যেন কৃষ্ণ অবতার॥

এই প্রশস্তিতে কবি হোসেন শাহকে কৃষ্ণ অবতারের সঙ্গে তুলনা করেছেন, এর থেকেও মনে হয়, হোসেন শাহের গায়ের রং কালো ছিল। কিন্তু আরব বা তুর্কীস্তানের লোকেরা কালো হয় না, ফরশা হয়।

এই সমস্ত বিষয় থেকে আমাদের মনে হয়, হোসেন শাহ্ আরব বা তুর্কীস্তান বা বাইরের অন্য কোন অঞ্চল থেকে এদেশে আসেন নি। তিনি আসলে ছিলেন বাংলাদেশেরই সন্তান এবং অন্য বহু বাঙালীর মত তাঁরও গাত্রচর্ম ছিল কৃষ্ণবর্ণ। অবশ্য এটা আমাদের অনুমান মাত্র। কিন্তু এর বিপক্ষেও কোন প্রমাণ নেই। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, বাবর তাঁর আত্মকাহিনীতে তাঁর সমসাময়িক বাংলার রাজা এবং হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহকে "নসরৎ শাহ্ বঙ্গালী" নামে অভিহিত করেছেন। এতদিন পর্যন্ত গবেষকরা হোসেন শাহ্ ও নসরৎ শাহ্ অবাঙালী ছিলেন এই বদ্ধমূল ধারণার বশবর্তী হয়ে বাবর "বঙ্গালী" অর্থে 'বাংলাদেশের রাজা' বুঝিয়েছেন বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু এখন পুর্বোল্লিখিত বিষয়গুলি থেকে মনে হয় বাবরের উক্তিকে আক্ষরিক অর্থেই গ্রহণ করা উচিত। হোসেন শাহ্ ও নসরৎ শাহ্ সত্যিসত্যিই "বঙ্গালী" ছিলেন না, একথা মনে করবার কোন কারণ নেই।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে হোসেন শাহ্ যদি বাঙালীই ছিলেন, তাহলে তিনি আরব বা তুর্কীস্তান বা বাইরের আর কোন অঞ্চল থেকে এসেছিলেন, এরকম প্রবাদ রটল কেন? তার কারণ সম্বন্ধে আমার যা মনে হয়, তা সংক্ষেপে বলছি। হোসেন শাহ্ সৈয়দবংশীয় ছিলেন। সৈয়দরা হজরৎ মুহম্মদের বংশধর বলে পরিচিত। সুতরাং যিনিই সৈয়দ হবেন, তিনিই আরব বা আশপাশের কোন অঞ্চল থেকে আসবেন, পরবর্তী কালের লোকের মনে এই ধারণা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সৈয়দ বংশের লোকরা অন্ততপক্ষে ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে বাংলায় আসা সুরু করেছিলেন। তাঁরা এদেশের মেয়ে বিবাহ করতেন এবং নিজেদের ছেলে-মেয়েদের এদেশের মেয়ে ও ছেলেদের সঙ্গে বিবাহ দিতেন। তাঁদের বংশধররা দুই শতাব্দীর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে এদেশের লোক হয়ে গিয়েছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদে রচিত বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল ও বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলের হাসন-হোসেন পালা পড়লে বোঝা যায়, ঐ সময়ে বাংলা দেশে বহু সৈয়দ বাস করতেন। হোসেন শাহ্ও বোধহয় এই রকমই একজন সৈয়দ। তাঁর পূর্বজীবন-সংক্রান্ত তথ্য এই ধারণারই অনুকূল। যে সমস্ত সৈয়দ দু' এক পুরুষের মধ্যে বাইরে থেকে বাংলায় এসেছিলেন, তাঁদের খাতির এদেশে স্বতন্ত্র ধরনের ছিল বলে মনে হয়। হোসেন এই শ্রেণীভুক্ত হলে তাঁকে "কাফের" সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে সামান্য চাকরী করা, দীঘি কাটা এবং সুবুদ্ধি রায়ের কাছে চাবুক খাওয়ার হীনতা স্বীকার করতে

হত বলে বোধ হয় না। সেই জন্যে আমার মনে হয়, হোসেন শাহ বাইরে থেকে বাংলায় আসেন নি, তিনি বাঙালীই ছিলেন। এদেশের লোক হওয়ার ফলেই বোধহয় তাঁর পক্ষে হাব্‌শী মুজাফফর শাহের বিরুদ্ধে দল গঠন করা এবং তাঁকে উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়েছিল।

যাহোক্, হোসেন শাহের পূর্ব-পরিচয় ও প্রথম জীবন সম্বন্ধে এই তিনটি তথ্য নিশ্চিতভাবে জানা যায়,

(১) তিনি সৈয়দ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর পিতার নাম সৈয়দ আশরফ অল-হোসেনী।

(২) রাঢ়ের চাঁদপুর অঞ্চলে তাঁর প্রথম জীবনের কিছু সময় কেটেছিল।

(৩) তিনি গৌড়ের শাসনকর্তা বা "অধিকারী" সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে কিছুদিন চাকরী করেছিলেন। সুবুদ্ধি রায় তাঁকে দীঘি কাটাবার ভার দিয়েছিলেন এবং তাঁর কাজে গাফিলতি হওয়ায় সুবুদ্ধি রায় তাঁকে চাবুক মেরেছিলেন।

হোসেন শাহের পিতা ভিন্ন আর কোন পূর্বপুরুষের নাম এ পর্যন্ত জানা যায় নি। ফ্রান্সিস বুকাননের মতে হোসেন শাহের পিতামহের নাম ছিল সুলতান ইব্রাহিম ; তিনি বাংলার সুলতান ছিলেন, গণেশের পুত্র জলালুদ্দীন তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে তাঁর রাজ্য কেড়ে নেন ; অতঃপর ইব্রাহিমের পরিবার কামতাপুর রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে ; এর ৭৬ বছর পরে তাঁর পৌত্র হোসেন আবার পূর্বপুরুষের রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। (Martin's Eastern India, Vol. III, p. 448 দ্রঃ)। কিন্তু এই সব কথা সম্পূর্ণ অমূলক। প্রথমত, যে সুলতান ইব্রাহিমের সঙ্গে জলালুদ্দীনের সংঘর্ষ বেধেছিল, তিনি বাংলার সুলতান নন, জৌনপুরের সুলতান এবং তিনি সৈয়দবংশীয় নন। দ্বিতীয়ত, এই সুলতান ইব্রাহিম জলালুদ্দীনের সঙ্গে পরাজিত ও নিহত হন নি, তিনি জলালুদ্দীনের সঙ্গে সংঘর্ষের, এমন কি জলালুদ্দীনের মৃত্যুর পরেও জীবিত ও সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৃতীয়ত, চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে বা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে (হোসেন শাহের পিতামহের সম্ভাব্য সময়) বাংলার সুলতানদের মধ্যে কারও নামই ইব্রাহিম ছিল বলে জানা যায় না। অতএব সুলতান ইব্রাহিম নামক কোন ব্যক্তি হোসেন শাহের পিতামহ ছিলেন না, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সিংহাসন লাভের আগে

সিংহাসন অধিকারের আগে যে সৈয়দ হোসেন শেষ হাব্‌শী সুলতান মুজাফফর শাহের উজীর ছিলেন, একথা বিভিন্ন ফার্সী বিবরণীতে পাওয়া যায়। এই উক্তিকে সত্য বলেই মেনে নেওয়া যেতে পারে, কারণ যার তার পক্ষে অল্প সময়ের মধ্যে বাংলার সিংহাসন অধিকার করা এবং সর্বসাধারণের কাছে, বিশেষত শক্তিশালী অমাত্যদের কাছে রাজা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করা সম্ভব নয়। 'ফিরিশ্‌তা' ও 'রিয়াজ'-এ লেখা আছে সৈয়দ হোসেনের পরামর্শেই মুজাফফর শাহ সৈন্যদের বেতন কমিয়ে দিয়ে রাজকোষে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করতে সমর্থ হন। এইভাবে হোসেন অর্থলোভী মুজাফফরের সন্তোষ ও আস্থা অর্জন করেন। এই দুই বইয়ে এও লেখা হয়েছে যে, রাজস্ব সংগ্রহের জন্য মুজাফফর শাহ প্রজাদের উপর ঘোরতর অত্যাচার করেন। এ কাজও তিনি সৈয়দ হোসেনের পরামর্শে করেছিলেন কিনা, তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না। মুজাফফর শাহকে সকলের বিরাগভাজন করে নিজের ক্ষমতা-লাভের পথ প্রশস্ত করবার জন্য এরকম পরামর্শ দেওয়া হোসেনের পক্ষে অসম্ভব নয়। হোসেন ছিলেন কুশাগ্রবুদ্ধি রাজনীতিক আর মুজাফফর শাহ সম্ভবত ছিলেন স্বল্পবুদ্ধি ও অনভিজ্ঞ প্রকৃতির লোক।

'তবকাৎ-ই-আকবরী', 'মাসির-ই-রহিমী', 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা' ও 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীন'-এ মুজাফফর শাহকে ঘোরতর অত্যাচারী রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর অত্যাচারের যে বিবরণ এই সমস্ত বইয়ে দেওয়া হয়েছে, তার সবটাই সত্য কিনা বলা শক্ত। এইসব বইতে মুজাফফর শাহকে যে এই রকম একজন ঘৃণিত অত্যাচারী বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এর মূলে হয় তো রয়েছে হোসেন শাহ ও তাঁর পক্ষের লোকদের প্রচার। সর্বদেশ ও সর্বকালের ইতিহাসে দেখা যায়, যিনি কোন রাজাকে উচ্ছেদ করে সিংহাসন জবরদখল করেন, তিনি পূর্ববর্তী রাজার বিরুদ্ধে কলঙ্ক রটান এবং কালক্রমে তা'ই ইতিহাসে স্থান পায়। ইংলণ্ডের ইতিহাসে তৃতীয় রিচার্ডের বেলায় এরকম হয়েছে। অবশ্য মুজাফফর শাহও তাঁর প্রভুকে বধ করে রাজা হয়েছিলেন। সুতরাং তিনি যে মহাপুরুষ প্রকৃতির লোক ছিলেন না, তা বলাই বাহুল্য। আমাদের বক্তব্য এই যে তাঁকে যতটা অত্যাচারী বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তার সবটাই বোধহয় সত্য নয়। 'তারিখ-ফিরিশ্‌তা' ও 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে'র মতে হোসেন যে সময় মুজাফফর শাহের উজীর ছিলেন, তখনই

সকলের মনে মুজাফফর শাহ্ সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব জাগিয়ে তোলার জন্ম প্রচার চালাতেন। এই দুই বইয়ের মতে উজীর থাকার সময় হোসেন জনসাধারণের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করতেন এবং তাঁদের কাছে নিজেকে খুব ভাল লোক বলে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করতেন। তিনি নাকি তাদের বলতেন (ফিরিশ্‌তার ভাষায়) "মুজাফফর শাহ্ অত্যন্ত নীচ ও কৃপণ প্রকৃতির লোক। যদিও আমি তাঁকে সৈন্যদের প্রতি উদার ব্যবহার করতে পরামর্শ দিই, তাতে ফল হয় না। সব সময়ে তিনি ধন সঞ্চয়ে ব্যস্ত।" অথবা (রিয়াজের ভাষায়) "মুজাফফর শাহ্ অত্যন্ত নিষ্ঠুর, তাঁর ব্যবহার কর্কশ। যদিও আমি তাঁকে সৈন্য ও অমাত্যদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করতে ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দিই, তাতে কোনই ফল হয় না। তাঁর ঝোঁক খালি অর্থসংগ্রহের দিকে।" এই জাতীয় কথা যদি তিনি সত্যই বলে থাকেন, তাহলে তাঁর সততা ও সরলতা সম্বন্ধে সকলেরই সন্দেহ জাগতে বাধ্য। একদিকে সৈন্যদের বেতন কমাবার জন্য মুজাফফর শাহকে পরামর্শ দেওয়া, অপরদিকে বিশেষভাবে সৈন্য ও অমাত্যদের কথা উল্লেখ করে সাধারণের কাছে এই সব উক্তি করা—এর থেকে সহজেই বোঝা যায় যে হোসেন কতবড় কূটনীতিজ্ঞ ছিলেন। এই সব বিবরণ সম্পূর্ণ সত্য হোক্ বা না হোক্, মন্ত্রী থাকার সময় হোসেন যে তাঁর প্রভুর বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, তাঁকে সকলের বিরাগভাজন করে তোলার জন্য সব সময় প্রচার করতেন এবং সৈন্য ও অমাত্যদের দলে টানবার চে করতেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ অল্প। বলা বাহুল্য, তাঁর এই আচরণ বিশেষ প্রশংসনীয় নয়। অবশ্য প্রভুহন্তা মুজাফফর শাহের বিরুদ্ধে হোসেনের এই ষড়যন্ত্র "শঠে শাঠ্যং সমাচরয়েৎ" নীতির অনুসরণ বলেই ক্ষমার্হ। ফিরিশ্‌তার মতে আমীরেরা তাঁকে সদয় ও বন্ধুভাবাপন্ন বলে মনে করে নিজেদের নেতৃত্বে বরণ করেন। ফিরিশ্‌তা ও গোলাম হোসেন প্রধানত মুহম্মদ কন্দাহারীর উক্তির উপর নির্ভর করে লিখেছেন যে মুজাফফর শাহের অত্যাচারের ফলে পরিণামে অধিকাংশ অমাত্যই তাঁকে পরিত্যাগ করেন এবং হোসেনের নেতৃত্বে তাঁরা মুজাফফর শাহের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁকে পরাজিত ও নিহত করেন। কিন্তু 'ফিরিশ্‌তা' ও 'রিয়াজ'-এই লেখা আছে যে হাজী মুহম্মদ কন্দাহারীর মতে দীর্ঘ চার মাস ধরে দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ চলেছিল এবং বহু লোক হতাহত হয়েছিল, শেষ যুদ্ধে এক লক্ষ কুড়ি হাজার লোক নিহত হয়েছিল।

সুতরাং মুজাফফর শাহের পক্ষেও যে বিরাট সংখ্যক লোক ছিল, তা বোঝা যায়।

'তবকাৎ-ই-আকবরী'তে হোসেনের প্রভুহত্যা ব্যাপারটিকে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তার মধ্যে গৌরবজনক কিছু নেই। এতে বলা হয়েছে হোসেন পাইকদের সর্দারকে ঘুস দিয়ে হাত করে কয়েকজন অনুচর সঙ্গে নিয়ে মুজাফফর শাহের অন্তঃপুরে ঢুকে তাঁকে হত্যা করেন। 'মাসির-ই-রহিমী'তেও এই কথা লেখা আছে।

'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা' ও 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে' লেখা আছে যে মুজাফফর শাহের মৃত্যুর পরে প্রধান অমাত্যেরা নতুন রাজা নির্বাচনের জন্য পরিষৎ আহ্বান করেন। সেখানে সকলে সমবেত হন। তাঁরা হোসেনকেই রাজা হিসাবে নির্বাচন করেন। একথায় অবিশ্বাস করার কিছু নেই। বাংলার ইতিহাসে হিন্দু-বৌদ্ধযুগে রাজবংশের সন্তান না হয়েও অমাত্যদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে সিংহাসন লাভ করেছিলেন পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালদেব। মুসলিম যুগে এই সম্মান লাভ করেছিলেন সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ এবং আলা-উদ্দীন হোসেন শাহ। কিন্তু ফিরিশ্‌তা ও 'রিয়াজে'র কথা বিশ্বাস করলে বলতে হয়, অমাত্যেরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে হোসেনকে রাজা হিসাবে নির্বাচন করেন নি, তিনি তাঁদের গৌড় নগরীর মাটির উপরের সমস্ত ধনৈশ্বর্য দেবার লোভ দেখালে তবেই তাঁরা তাঁকে রাজপদে অভিষিক্ত করতে রাজী হয়েছিলেন।

সিংহাসনে আরোহণের সময় যে হোসেন শাহ প্রবীণ বয়সে উপনীত হয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ এর মাত্র দু' বছর পরে ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন সিকন্দর শাহ লোদী হোসেন শাহের রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন, তখন হোসেন শাহের যে সৈন্যবাহিনী তাঁকে বাধা দেবার জন্য প্রেরিত হয়েছিল, তার নেতৃত্ব করেছিলেন হোসেন শাহের অন্যতম পুত্র দানিয়েল। দানিয়েল ঐ সময়ে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করার মত বয়সে উপনীত হয়েছিলেন, এর থেকে তাঁর পিতা হোসেন শাহের বয়সও সহজেই অনুমান করা যায়।

সিংহাসনে আরোহণের তারিখ

আলাউদ্দীন হোসেন শাহ যে ৮৯৯ হিজরায় সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই, কারণ ৮৯৯ হিঃ থেকে তাঁর মুদ্রা ও শিলালিপি পাওয়া যায়। ৮৯৯ হিজরা ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর থেকে

সুরু হয়েছিল। কিন্তু আলাউদ্দীন হোসেন শাহের পূর্ববর্তী সুলতান মুজাফফর শাহের পাণ্ডুয়া শিলালিপির তারিখ ১৭ই রমজান, ৮৯৮ হিজরা বা ২রা জুলাই, ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দ। মুজাফফর শাহের ৮৯৯ হিজরার মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং মুজাফফর শাহ যে ১৪৯৩ খ্রীঃর ১২ই অক্টোবরের পরেও কিছু সময় রাজত্ব করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। হোসেন শাহের প্রথম শিলালিপির তারিখ ১০ই জিল্কদ, ৮৯৯ হিজরা বা ১৩ই আগস্ট, ১৪৯৪ খ্রীঃ। ঐ তারিখের অন্তত একমাস আগে হোসেন শাহ সিংহাসনে বসেছিলেন সন্দেহ নেই। সুতরাং ১৪৯৩ খ্রীঃর নভেম্বর থেকে সুরু করে ১৪৯৪ খ্রীঃর জুলাই—এই নয় মাসের মধ্যে কোন এক সময়ে হোসেন শামসুদ্দীন মুজাফফর শাহকে বধ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন বলে সিদ্ধান্ত করা যায়।

এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের আগে রচিত সমস্ত ইতিহাসগ্রন্থে এই নৃপতি শুধুমাত্র 'আলাউদ্দীন' নামে উল্লিখিত হয়েছেন, পক্ষান্তরে বাংলা সাহিত্য ও বাংলা দেশের বিভিন্ন কিংবদন্তীতে ইনি কেবলমাত্র 'হোসেন শাহ' নামে উল্লিখিত হয়েছেন। ১৬৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত শিহাবুদ্দীন তালিশের 'ফতিয়াহ্-ই-ইব্রিয়াহ্' বই এবং তার কিছু পরে রচিত মীর্জা মুহম্মদ কাজিমের 'আলমগীরনামা' বইয়ে 'হোসেন শাহ' নাম পাওয়া যায়। 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে'র লেখক শিলালিপির সাক্ষ্য উদ্ধৃত করে প্রমাণ করেন যে এই রাজার 'হোসেন শাহ' নাম ছিল। মুদ্রা ও শিলালিপিতে দেখা যায়, এই রাজার পুর্ণ রাজকীয় নাম 'আলা-উদ্-দুনিয়া ওয়াদ্-দীন আবুল্-মুজাফফর হোসেন শাহ'।

সিংহাসন লাভের পরে

সিংহাসন লাভের পরে হোসেন শাহের প্রথম লক্ষ্য হল নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা, প্রজাদের আস্থা অর্জন করা, দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপন করা এবং ভালভাবে দেশ শাসন করা। এ কাজ কঠিন হলেও তাঁর মত প্রবীণ, অভিজ্ঞ এবং রাজনীতিকুশল নরপতির পক্ষে অসাধ্য নয়। মুজাফফর শাহের উজীর থাকবার সময়ই তিনি শাসনদক্ষতার জন্য যশ ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। রাজ্যের যা কিছু ভালো, তার জন্য কৃতিত্ব তাঁরই এবং যা কিছু খারাপ, তার জন্য দায়ী মুজাফফর শাহ—সকলের মনে তিনি এরকম ধারণা জন্মিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন—'ফিরিশ্তা' ও 'রিয়াজ'-এর বর্ণনা পড়ে এই কথাই মনে হয়।

সুতরাং তাঁর উপর প্রথম থেকেই প্রজাদের আস্থা ছিল। সুলতান হিসাবে তিনি অধিকতর শাসনদক্ষতা দেখাবেন এই বিশ্বাসে দেশের জনসাধারণ তাঁকে সাগ্রহে স্বাগত জানিয়েছিল বলে মনে হয়।

'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা' ও 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে' হোসেন শাহের সিংহাসনে আরোহণ ও তার অব্যবহিত পরবর্তী কার্যকলাপের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তার সারমর্ম নীচে দেওয়া হল।

যেদিন মুজাফফর শাহ নিহত হলেন, সেদিন অমাত্যেরা রাজা নির্বাচনের জন্য একটি পরিষৎ আহ্বান করলেন এবং সৈয়দ হোসেনের নির্বাচন সম্বন্ধে অনুকূল মনোভাব প্রদর্শন করে বললেন, "আমরা যদি আপনাকে রাজা হিসাবে নির্বাচন করি, তাহলে আপনি আমাদের সঙ্গে কী ব্যবহার করবেন?" হোসেন বললেন, "আপনাদের সব ইচ্ছা আমি পূরণ করব। গৌড় শহরে মাটির উপরে যা কিছু পাওয়া যাবে, সঙ্গে সঙ্গে তা আমি আপনাদের দেব; কিন্তু মাটির নীচে যা আছে, সব আমি নিজে নেব।" তখন সমস্ত সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ লোক এই প্রলোভনজনক প্রস্তাবে রাজী হয়ে ধনের লোভে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করলেন এবং ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির দিক দিয়ে যা এই সময় কায়রোকেও অতিক্রম করেছিল, সেই গৌড় নগরী লুঠ করতে লাগলেন। গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করার কয়েক দিন পরে হোসেন শাহ তাঁদের লুঠ বন্ধ করতে বললেন। কিন্তু তাঁরা বন্ধ না করাতে তিনি বারো হাজার লুণ্ঠনকারীকে বধ করলেন। তখন অন্যেরা লুঠ বন্ধ করল। কিন্তু গৌড়ের মাটির নীচের সম্পত্তি নিজে লুঠ করে নিতে তিনি ছাড়লেন না। তিনি অনুসন্ধান করে তের শো সোনার থালা সমেত বহু গুপ্তধন পেলেন। তখনকার দিনে বাংলার ধনী লোকেরা সোনার থালায় খেতেন এবং উৎসবের দিনে যিনি যত বেশী সোনার থালা বার করতেন, তিনিই বেশী মর্যাদা লাভ করতেন। গৌড়ের এই জাতীয় বহু ধনী ব্যক্তির এতগুলি সোনার থালা এখন হোসেন শাহ হস্তগত করলেন।

এই সব বিবরণ পড়লে মনে হয় হোসেন শাহ নানা রকম ক্রূর কূটনীতি, হীন চাতুরী এবং বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতিশ্রুতিভঙ্গের মধ্য দিয়ে রাজা হয়েছিলেন ও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

'তবকাৎ-ই-আকবরী', 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা' এবং 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে' লেখা আছে যে হোসেন রাজা হয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই রাজ্যে পরিপূর্ণ শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। পাইকরা বহু রাজাকে হত্যা করেছিল। পাইকদের

উপরে প্রাসাদ-রক্ষার ভার না রেখে তিনি অন্য রক্ষি-দল নিযুক্ত করলেন এবং পাইকদের দল একেবারে ভেঙে দিলেন। এর আগে হাব্‌শীদের মধ্যে অনেকেই নানারকম দুর্বৃত্ততার পরিচয় দিয়েছিল এবং রাজদ্রোহ ও রাজহত্যা করার জন্য কুখ্যাতি অর্জন করেছিল। ফিরিশ্‌তা ও 'রিয়াজে'র মতে হোসেন শাহ্ সমস্ত হাব্‌শীকে চাকরী থেকে বরখাস্ত এবং তাঁর রাজ্য থেকে নির্বাসিত করলেন। তারা জৌনপুর রাজ্যে বা উত্তর ভারতের কোথাও স্থান না পেয়ে গুজরাট ও দক্ষিণ ভারতে চলে গেল। তাদের বদলে হোসেন শাহ্ সৈয়দ, মোগল ও আফগানদের উচ্চপদে নিয়োগ করলেন।

এই সব বিবরণের খুঁটিনাটিগুলি সত্য হওয়াই সম্ভব। মূল বিষয়টি অর্থাৎ হোসেন শাহের সিংহাসনে আরোহণের অল্প কালের মধ্যেই রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কথাটি যে বহুলাংশে সত্য, সে সম্বন্ধে প্রমাণ আছে। তার কথা একটু পরেই বলছি। তার আগে একটি মতের বিচার করা দরকার। জনৈক গবেষক* লিখেছেন, "Even the earliest part of Husain Shah's reign seems to have made an impression upon the minds of his subjects and captured their imagination to a great extent. Bijoy Gupta, a contemporary of Alauddin Husain Shah, who composed in 1494-95 the epic of snake-cult popularly known as Manasā-Maṅgal, has spoken very much highly of the achievements of the Sultan. (IHQ, Vol. XXXII, pp. 58-59)। এই প্রসঙ্গে তিনি বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল থেকে এই ক'টি ছত্র উদ্ধৃত করেছেন,

স্থলতান হোসেন সাহা নৃপতি-তিলক ॥
সংগ্রামে অর্জ্জুন রাজা প্রভাতের রবি।
নিজ বাহুবলে রাজা শাসিল পৃথিবী ॥
রাজার পালনে প্রজা সুখ ভুঞ্জে নিত।
মুল্লুক ফতেয়াবাদ বাঙরোড়া তকসিম ॥
পশ্চিমে ঘাঘর নদী পূবে খণ্ডেশ্বর (ঘণ্টেশ্বর)।
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর ॥

* অধ্যাপক মোমতাজুর রহমান তরফদার।

চারি বেদধারী তথা ব্রাহ্মণ সকল।
বৈদ্যজাতি বসে নিজ শাস্ত্রেতে কুশল ॥
কায়স্থ জাতি বসে তথা লিখনের সুর।
অন্যজাতি বসে নিজ শাস্ত্রে সুচতুর ॥
স্থানগুণে যেই জন্মে সেই গুণময়।
হেন ফুল্লশ্রী গ্রামে বসতি বিজয় ॥

এই বর্ণনায় হোসেন শাহের সংক্ষিপ্ত প্রশস্তি এবং বিজয়গুপ্তের মাতৃভূমির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা মাত্র পাওয়া যায়; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, পূর্বোক্ত গবেষক লিখেছেন, "This brief description of the Hindu society tells us much about the peace and prosperity enjoyed by the Hindus under Husain Shah whose reign was marked by a spirit of tolerance and liberalism." তাছাড়া আমরা আগেই দেখাবার চেষ্টা করেছি যে এই হোসেন শাহ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ নন, জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহ। সুতরাং বিজয় গুপ্তের এই উক্তি আলোচ্য প্রসঙ্গে আমাদের কোন কাজেই লাগবে না।

যা হোক্, হোসেন শাহের সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পরে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যে প্রমাণ আছে, তার উল্লেখ করছি। ১৪১৬ শকাব্দের বৈশাখ বা ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে চৈতন্যদেবের অন্যতম বাল্য-গুরু বিষ্ণু পণ্ডিতের পুত্র মহাদেব আচার্যসিংহ ভবভূতির 'মালতীমাধব' নাটকের এক টীকা রচনা করেন। এই টীকার শেষে দু'টি শ্লোক আছে। শ্লোক দু'টি নীচে উদ্ধৃত হল।

অস্তি শ্রীমজ্জিলীশবার্ব্বক ইতি খ্যাতো গুণানাং নিধি-
র্জাতো রাম ইব ক্ষিতৌ কলিযুগে সত্যাবতারেচ্ছয়া।
তস্মিন্ গৌড়মহীমহেন্দ্রসচিবশ্রেণীশিরোভূষণে
যোগক্ষেম (ম) মুক্ষণং কৃতধিয়াং নির্ব্যাজমাতন্বতি ॥
শাকে ষোড়শসাগরেন্দুগণিতে গীর্ব্বাণকল্লোলিনী-
তীরে ধীরগণাস্পদে পুরি নবদ্বীপাভিধায়াং বাধাৎ।
বৈশাখে ভবভূতিধীরভণিতৌ গূঢ়ার্থসন্দীপনীম্
আচার্য্যো মতিমানিমামিহ মহাদেবঃ কৃতী টিপ্পনীম্ ॥

(বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, পৃঃ ১০০)

[শ্রীমজ্জিলীশ বারবক নামে খ্যাত গুণের নিধি আছেন, কলিযুগে সত্যাবতারের ইচ্ছায় রামের মত তিনি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন; সেই গৌড়রাজের সচিবদের শিরোভূষণ অকপটে অনুক্ষণ কৃতধী ব্যক্তিদের যোগক্ষেম নির্বাহ করছেন। ১৪১৬ শাকে গীর্বাণকল্লোলিনীতীরে (অর্থাৎ গঙ্গাতীরে) ধীরগণের আবাসস্থল নবদ্বীপ নামক পুরে বৈশাখ মাসে ধীর ভবভূতির কথা অনুসারে এই আচার্য মতিমান্ মহাদেব কৃত 'শুদ্ধার্থসন্দীপনী' টিপ্পনী এখানে সমাপ্ত হল।]

১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে অর্থাৎ হোসেন শাহের সিংহাসনারোহণের মাস কয়েক পরে নবদ্বীপের পণ্ডিত মহাদেব আচার্যসিংহ 'গৌড়মহীমহেন্দ্র' অর্থাৎ হোসেন শাহের 'সচিবশ্রেণীশিরোভূষণ' মজিলীশ বারবকের এই প্রশস্তি রচনা করেছেন। এই মজিলীশ বারবক সম্ভবত নবদ্বীপ অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন। মহাদেব মজিলীশ বারবককে রাম ও কলিযুগাবতার বলে প্রশস্তি করেছেন এবং বলেছেন তিনি অকপটে কৃতধী ব্যক্তিদের যোগক্ষেম সর্বদা নির্বাহ করছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় ঐ সময় নবদ্বীপ অঞ্চলে পরিপূর্ণ শান্তি বিরাজ করছিল। তা না হলে নবদ্বীপের একজন পণ্ডিতের লেখায় এরকম পরিপূর্ণ সন্তোষ প্রকাশ পেত না।

সিকন্দর লোদীর সঙ্গে হোসেন শাহের সংঘর্ষ

সুদীর্ঘ ছাব্বিশ বছর রাজত্বের মধ্যে হোসেন শাহ বহু বহিঃশক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন—কতকগুলির উদ্দেশ্য রাজ্যজয়, কতকগুলি আত্মরক্ষামূলক। কয়েকটি ক্ষেত্রে আবার যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ হয় নি।

হোসেন শাহের রাজ্যাভিষেকের দু'বছর বাদে দিল্লীশ্বর সিকন্দর লোদীর সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ বাধে। সুলতান ফিরোজ শাহ তোগলকের সঙ্গে ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকন্দর শাহের যুদ্ধের প্রায় ১৩৭ বছর পরে এই প্রথম আবার দিল্লীর সুলতানের সঙ্গে বাংলার সুলতানের সংঘর্ষ হল। 'মন্তখব্-উৎ-তওয়ারিখ্', 'তবকাৎ-ই-আকবরী', 'মখজান-ই-আফগানী' প্রভৃতি ইতিহাসগ্রন্থে এই সংঘর্ষের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা সংক্ষেপে এই :—

জৌনপুরের সুলতান হোসেন শাহ শর্কী ৮৮৪ হিজরা বা ১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বহ্‌লোল লোদীর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও হৃতরাজ্য হয়ে বিহারে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বহ্‌লোলের মৃত্যুর পর সিকন্দর লোদী যখন দিল্লীর সুলতান হন,

তখন পাটনার শাসনকর্তা দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ৯০০ হিজরা বা ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহ দমন করতে সিকন্দর লোদী পাটনায় আসেন, এই অভিযানে তাঁর বহু ঘোড়া মারা পড়ে। এই খবর পেয়ে হোসেন শাহ শর্কী সিকন্দরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং কাশী পর্যন্ত তাঁর পিছু পিছু ধাওয়া করেন। কাশীতে দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হয়; তাতে পরাজিত হয়ে হোসেন শাহ শর্কী পালিয়ে আসেন, সিকন্দরও তাঁর পিছু পিছু ধাওয়া করে আসেন। বাংলার সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ তখন হোসেন শাহ শর্কীকে আশ্রয় দেন এবং ভাগলপুরের কাছে কহলগাঁওতে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা করে দেন। হোসেন শাহ শর্কী আলাউদ্দীন হোসেন শাহের আত্মীয় ছিলেন, আলাউদ্দীনের পৌত্রী ও নসরৎ শাহের কন্যার সঙ্গে হোসেন শাহ শর্কীর পুত্র জলালুদ্দীন শর্কীর বিবাহ হয়েছিল। হোসেন শাহ শর্কীকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য সিকন্দর লোদী বাংলার সুলতানের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। ৯০১ হিজরা বা ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সিকন্দরের সৈন্যদল কুৎলুগপুর থেকে মাহ্‌মুদ খান লোদী ও মুবারক খান নুহানির নেতৃত্বে যাত্রা করল। হোসেন শাহও তাঁকে বাধা দেবার জন্য তাঁর পুত্র দানিয়েলের নেতৃত্বে এক সৈন্যবাহিনী পাঠালেন। বিহারের বাঢ় নামক জায়গায় দুই পক্ষ পরস্পরের সম্মুখীন হয়। কিন্তু যুদ্ধ হয় না। কিছুদিন পরে সিকন্দর লোদী হোসেন শাহের সঙ্গে সন্ধি-স্থাপন করে স্বস্থানে ফিরে যান। নিয়ামতুল্লাহ্‌র 'মখজান-ই-আফগানী' এবং অন্য কোন কোন ইতিহাসগ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, সন্ধির সময় হোসেন শাহ প্রতিশ্রুতি দেন সিকন্দর শাহের শত্রুদের তিনি ভবিষ্যতে আর তাঁর রাজ্যে আশ্রয় দেবেন না। বদাওনী 'মন্ত্‌খব-উৎ-তওয়ারিখে' লিখেছেন, "দুই পক্ষ নিজের নিজের রাজ্য নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলেন।" এছাড়া এই সন্ধি সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। এই সন্ধির পরেও যে বিহার ও ত্রিহুতে হোসেন শাহের অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল, তার প্রমাণ আছে। এইভাবে দিল্লীর পরাক্রান্ত সম্রাট সিকন্দর লোদী হোসেন শাহকে দমন করতে এসে সন্ধিস্থাপন করে ফিরে গেলেন, হোসেন শাহের প্রাধান্যও বিন্দুমাত্র খর্ব হল না। এই ব্যাপার যে হোসেন শাহের পক্ষে বিশেষ গৌরবের, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে এই সন্ধির পরেও যে সিকন্দর শাহের সঙ্গে তাঁর পরিপূর্ণ মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি, তার প্রমাণ আছে। এসম্বন্ধে পরে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

হোসেন শাহের কামতাপুর-কামরূপ অভিযান

আলাউদ্দীন হোসেন শাহ সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পরেই রাজ্য-বিস্তারে মন দেন এবং এজন্য তাঁকে বহু যুদ্ধ করতে হয়। এখন এইসব যুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে। সিংহাসনে আরোহণের এক বছরের মধ্যেই আলাউদ্দীন হোসেন শাহ উত্তর বঙ্গের কামতাপুর রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। এই অভিযানের কথা নানা সূত্রে লেখা আছে। হোসেন শাহ যে এই অভিযানে সাফল্য লাভ করেন, এসম্বন্ধে সব সূত্রই একমত। কামতাপুর রাজ্য আধুনিক কুচবিহার অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত 'বহারিস্তান-ই-গায়বী'তে লেখা আছে যে এই রাজ্যের পূর্ব-সীমা ছিল বনস (মনসা) নদী এবং অপর সীমা করতোয়া নদী। হোসেন শাহের সময়ে এই রাজ্যের রাজা খুব প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। উত্তরবঙ্গের এক বিরাট অঞ্চল এবং আসামের কামরূপ অঞ্চলের তিনি একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন। হোসেন শাহ তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করে তাঁর রাজ্য নিজের অধিকারে আনেন।

হোসেন শাহ যে তাঁর রাজত্বের প্রথম বছরেই কামতাপুর-কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই, কারণ ঐ বছর অর্থাৎ ৮৯৯ হিজরায় (১৪৯৩-৯৪ খ্রী:) উৎকীর্ণ তাঁর অনেকগুলি মুদ্রাতে তাঁর নামের সঙ্গে "কামরু-কামতা-জাজনগর-উড়িশা-বিজয়ী" উপাধি যুক্ত দেখা যায় (Catalogue of Coins, Indian Museum, Calcutta, Vol II. p. 173, Coin no. 175 : Supplement to the Provincil Coin Cabinet, Shillong, p. 150, Coin no $\frac{6}{7}$, p.152, Coin no $\frac{5}{7}$; Catalogue of Indian coins, British Museum, p. 148, Coin no. 123 প্রভৃতি এবং JNSI, Vol. XIX, Pt. I, 1957, p. 56 দ্রষ্টব্য)। পরবর্তী বছরগুলিতে উৎকীর্ণ তাঁর বহু মুদ্রাতেও এই উপাধি উল্লিখিত হয়েছে। তাঁর বহু শিলালিপিতেও এই উপাধির উল্লেখ দেখা যায়, তার মধ্যে সর্বপ্রাচীন শিলালিপিটির তারিখ ১লা রমজান, ৯০৭ হিজরা (১০ই মার্চ, ১৫০২ খ্রী:)

যদিও হোসেন শাহের ৮৯৯ হি: বা ১৪৯৩-৯৪ খ্রী:র মুদ্রাতেই তাঁকে "কামরু (কামরূপ)-কামতা বিজয়ী" বলা হয়েছে, তাহলেও ঐ বছরেই তাঁর কামরূপ-কামতা বিজয় সম্পূর্ণ হয়েছিল বলে মনে করার কোন কারণ নেই। আগেকার দিনে রাজারা কোন দেশের সঙ্গে যুদ্ধ করলেই সঙ্গে সঙ্গে সেই দেশ জয় করার

দাবী জানাতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ৮৯৯ হিজরাতেই হোসেন শাহ উড়িষ্যা বিজয়ের দাবী জানিয়েছেন, কিন্তু অন্ততঃ ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে উড়িষ্যার সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ চলেছিল, তার প্রমাণ আছে; এই যুদ্ধে তিনি উড়িষ্যা জয় করা দূরে থাক্, কোন উল্লেখযোগ্য সাফল্যই অর্জন করতে পারেন নি। সুতরাং হোসেন শাহের কামরূপ-কামতা বিজয় কবে সম্পূর্ণ হয়েছিল, তা বর্তমানে বলার কোন উপায় নেই। স্থানীয় কিংবদন্তীর মতে ১৪২০ শকাব্দ বা ১৪৯৮-৯৯ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন শাহ কামরূপ-কামতা রাজ্য জয় করেছিলেন এবং ঐ রাজ্যের রাজধানী কামতাপুর শহর বারো বছর ধরে হোসেন শাহের সৈন্যবাহিনীকে প্রতিরোধ করার পর আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু এই সব কিংবদন্তী একেবারেই বিশ্বাস করা যায় না। ১৪৯৮-৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মাত্র পাঁচ বছর আগে হোসেন শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। সুতরাং বারো বছর ধরে কামতাপুর অবরোধ করে ঐ শহর অধিকার করার পরে ১৪৯৮-৯৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণভাবে কামরূপ-কামতা রাজ্য জয় করতে তিনি পারেন না।

বিভিন্ন সূত্রে হোসেন শাহের কামরূপ-কামতা জয়ের বিভিন্ন চিত্র পাওয়া যায়। 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' লেখা আছে, "তিনি কামরূপ, কামতা ও অন্যান্য অঞ্চল পর্যন্ত সমগ্র দেশ জয় করলেন। ঐ সব অঞ্চল আগে রূপনারায়ণ, মল কুঁওয়ার, গস লখন, লছমী নারায়ণ এবং অন্যান্য শক্তিশালী রাজার অধীনে ছিল। বিজিত দেশগুলি থেকে তিনি অনেক ধন সংগ্রহ করলেন।" কিন্তু কোচবিহার অঞ্চলে প্রচলিত প্রবাদগুলি বিশ্বাস করলে বলতে হয় যে, হোসেন শাহ বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে কামতা রাজ্য জয় করেছিলেন। এগুলিতে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা সংক্ষেপে এই। ঐ সময় কামতাপুরের রাজা ছিলেন খেন বংশীয় নীলাম্বর। তাঁর এক মন্ত্রীর পুত্র রানীর প্রতি অবৈধ আসক্তি প্রকাশ করায় রাজা তাঁকে বধ করেন এবং ঐ মন্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করে তাঁর পুত্রের মাংস খাওয়ান। মন্ত্রী তখন পাপমুক্ত হবার জন্য গঙ্গাস্নানের অছিলা করে গৌড়ে এসে হোসেন শাহের আশ্রয় নেন এবং তাঁকে কামতাপুর রাজ্য সংক্রান্ত সব খবর জানিয়ে দেন। হোসেন শাহ তখন কামতাপুর আক্রমণ করেন, কিন্তু নীলাম্বর তাঁর সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করেন। অবশেষে হোসেন শাহ মিথ্যা করে নীলাম্বরকে বলে পাঠান যে তিনি চলে যেতে চান, কিন্তু যাবার আগে তাঁর বেগম নীলাম্বরের রানীর সঙ্গে দেখা করতে চান। নীলাম্বর তাতে রাজী হলে হোসেন শাহের শিবির থেকে তাঁর রাজধানীর

ভিতরে পাল্‌কি যায়, তাতে নারীর ছদ্মবেশে সৈন্য ছিল ; তারা কামতাপুর নগর অধিকার করে। বুকাননের বিবরণীতে লেখা আছে, "He (Husain Shah) is said to have conquered Kamrup, that is the country to the east of the upper part of the Korotoya, and to have killed its king, Harup Narayan, son of Malkongyar, son of Sada Lokymon."

উপরে উল্লিখিত তিনটি বিবরণীর কোনটিই সম্পূর্ণ সত্য বলে মনে হয় না। তিনটি বিবরণে কামরূপের রাজার নাম সম্বন্ধেই ঐক্য নেই। 'রিয়াজে' যে সব রাজার নাম উল্লিখিত হয়েছে, কামরূপ-কামতায় এইসব নামের কোন রাজা ছিলেন বলে জানা যায় না। অবশ্য 'রিয়াজে' হোসেন শাহের কামরূপ-কামতা ভিন্ন অন্যান্য অঞ্চল জয় করারও উল্লেখ আছে। ত্রিহুতে হোসেন শাহের সময়ে 'রূপনারায়ণ' বিরুদ ধারী রামভদ্রসিংহ ও 'কংসনারায়ণ' বিরুদ ধারী লক্ষ্মীনাথ নামক নৃপতিরা ছিলেন বলে জানা যায়। হোসেন শাহ্‌ ত্রিহুতের অন্তত কিছু অংশ অধিকার করেছিলেন বলেই মনে হয়, কারণ ত্রিহুতের সন্নিহিত ভাগলপুর, মুঙ্গের, পাটনা ও সারণ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে। ত্রিহুতের সন্নিহিত (পাটনার ওপারে অবস্থিত) হাজীপুর যে তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তা 'চৈতন্যচরিতামৃত' মধ্যলীলা ২০শ পরিচ্ছেদ থেকে জানা যায়। সুতরাং 'রিয়াজে'র উক্তিতে কিছু সত্য আছে বলেই মনে হয়। কিন্তু হোসেন শাহের কামরূপ-কামতা বিজয় সম্বন্ধে 'রিয়াজে' কোন আলোক পাওয়া যায় না এবং মল কুঁওয়ার ও গস লখন প্রভৃতি রাজাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ মেলে না। কোচবিহার অঞ্চলের প্রবাদে বর্ণিত হোসেন শাহের নীলাম্বরকে প্রতারিত করার কাহিনী সত্য হলে নীলাম্বরের নির্বুদ্ধিতা সম্ভবের সীমা অতিক্রম করে যায়। বুকাননের বিবরণীতে কামরূপের রাজা ও তাঁর পুর্বপুরুষদের যে সব নাম দেওয়া হয়েছে, সেরকম অর্থহীন নাম কারও থাকতে পারে বলে ভাবা যায় না।* যা হোক্‌, হোসেন শাহ্‌ যে কামতা-কামরূপ জয় করেছিলেন, সে সম্বন্ধে সব সূত্রই একমত। সুতরাং সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কীভাবে তিনি জয় করেছিলেন, তা

* বোধ হয় 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে' উল্লিখিত রাজাদের নামগুলিই বুকাননের বিবরণীতে বিকৃত আকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং 'মল কুঁওয়ার' Malkongyar-এ ও 'রূপনারায়ণ' Harup Narayan-এ পরিণত হয়েছে।

আরও ভাল সূত্র আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে জানবার কোন উপায় নেই। মুন্সী শ্যামপ্রসাদ লিখেছেন যে হোসেন শাহ কামতা ("কামচে") রাজ্য থেকে "কুচমর্দন" নামে একটি কামান এনেছিলেন। 'আসাম বুরঞ্জী'র কথা বিশ্বাস করলে বলতে হয় যে কোচ রাজা বিশ্বসিংহ হোসেন শাহের কাছ থেকে কামতা রাজ্য জয় করে নেন। 'বুরঞ্জী'র মতে আটগাঁওয়ের মুসলমান শাসনকর্তা "তুরকা কোতয়াল" বিশ্বসিংহের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। আমানতউল্লা আহমদের মতে ১৫১৩ খ্রীঃর পরে কামতা রাজ্য থেকে মুসলমানরা বিতাড়িত হয় (কোচবিহারের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৮ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এই সব মত কতদূর সত্য তা বলা যায় না, কারণ হোসেন শাহের ৯২৪ হিজরা যা ১৫১৮-১৯ খ্রীষ্টাব্দের মুদ্রাতেও তাঁর "কামরূপ ও কামতা বিজয়ী" উপাধি উল্লিখিত হয়েছে। তা ছাড়া হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহের রাজত্ব-কালেও কামরূপের হাজো বাংলার সুলতানের অধিকারে ছিল এবং সেখান থেকে মুসলমানরা আসামে অভিযান করেছিল বলে অসমীয়া বুরঞ্জীগুলিতে উল্লিখিত হয়েছে।

হোসেন শাহের আসাম-অভিযান

ঐ সময়ে কামরূপের পূর্ব ও দক্ষিণে প্রাচীন আসাম বা অহোম রাজ্য অবস্থিত ছিল। এই রাজ্য নিতান্ত দুর্ভেদ্য ছিল। এখানকার লোকেরা বাইরের কোন লোককে তাদের দেশে প্রবেশ করতে দিত না। নিজেরা আসামে উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে বাইরের জিনিস সংগ্রহ করে আনবার জন্য এক আধবার মাত্র বাইরে যেত। রাজ্যটি দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য এবং এখানে বর্ষার প্রকোপ খুব বেশী হওয়ার জন্য এখানকার রাজাদের দেশরক্ষার জন্য বিশেষ বেগ পেতে হত না। হোসেন শাহ এই অজেয় অহোম রাজ্য জয় করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁকে ব্যর্থতা বরণ করতে হয়। এসম্বন্ধে সব সূত্রই একমত। গোলাম হোসেন 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' লিখেছেন, "আসামের রাজা তাঁকে বাধা দিতে না পেরে দেশ (সমতল অঞ্চল) ছেড়ে পাহাড়ে পালিয়ে যান। রাজা (হোসেন শাহ) তখন এক বিরাট সৈন্যবাহিনী সমেত তাঁর পুত্রকে বিজিত দেশ সম্বন্ধে করণীয় ব্যবস্থাদি সম্পূর্ণ করবার জন্য রেখে বিজয়গৌরবে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। রাজার প্রত্যাবর্তনের পরে তাঁরা বিজিত দেশে শান্তি সংস্থাপন ও আত্মরক্ষার

ব্যবস্থা করতে ব্রতী হন। কিন্তু বর্ষাকাল সমাগত হলে জলপ্লাবনে রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে গেল। (আসামের) রাজা তখন অনুচরবর্গ সমেত পাহাড় থেকে নেমে বিপক্ষ সৈন্যকে বেষ্টন করে যুদ্ধ করতে লাগলেন এবং তাদের রসদ সংগ্রহের পথ বন্ধ করে দিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে সকলকেই তিনি বধ করলেন।"

অসমীয়া বুরঞ্জীগুলিতে এ সম্বন্ধে যা লেখা আছে, তার সারমর্ম এই। স্থহুঙ্গ মুঙের রাজত্বকালে সর্বপ্রথম মুসলমানরা আসামে অভিযান করে। এই সময়ে বাংলার রাজা "খুনফং" বা "থুফং" (হুসন) আসাম আক্রমণ করেন। ২০,০০০ পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য এবং অসংখ্য রণতরী এই অভিযানে যোগদান করে। বাংলার সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব করেন জনৈক "বড় উজীর" এবং জনৈক "বিং মালিক" বা "মিং মানিক"। প্রথম প্রথম মুসলমানরা সহজেই বিজয়ী হয়। তারা প্রায় বিনা বাধায় ব্রহ্মপুত্র নদ ধরে বর্তমান দরং জেলার পূর্ব সীমা পর্যন্ত উপস্থিত হয় এবং অনতিবিলম্বে বুড়াই নদীর তীর অবধি পৌঁছোয়। তখন আসামের রাজা মুসলমানদের প্রচণ্ড বাধা দেন। তেমেনি (ত্রিমোহণী?)-তে দুই পক্ষের মধ্যে নৌযুদ্ধ হয়। তাতে মুসলমানরা প্রথম প্রথম জয়লাভ করলেও শেষ পর্যন্ত তাদের শোচনীয় পরাজয় হয়। "বড় উজীর" কোনক্রমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচান।

এরপর কিছুদিন যুদ্ধ বন্ধ থাকে। আসাম-রাজ দেশরক্ষার ব্যবস্থা পাকা করেন এবং সিংরী, সালা ও ভৈরালী নদীর মোহানায় প্রধান প্রধান অসমীয়া সেনাধ্যক্ষের নেতৃত্বে সৈন্যদের ঘাটি বসানো হয়।

এরপর আবার "বিং মালিক বা "মিং মানিক" এবং "বড় উজীরের" নেতৃত্বে বাংলার সৈন্যবাহিনী আসাম আক্রমণ করে। স্থলপথে এবং জলপথে অগ্রসর হয়ে তারা সিংরী পর্যন্ত পৌছোয় এবং সেখানকার ঘাঁটি আক্রমণ করে। এই ঘাঁটি বরপাত্র গোহাইনের রক্ষণাধীন ছিল। অনেকক্ষণ ধরে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরে অসমীয়া বাহিনীর সেনাপতি শত্রুবাহিনীকে পরাস্ত করেন। "বিং মালক" বা "মিং মালিক" ও বাংলার বহু সৈন্য যুদ্ধে নিহত হয় এবং অনেকে বন্দী হয়। "বড় উজীর" অল্প সংখ্যক অনুচর সমেত পালিয়ে প্রাণ বাঁচান। অসমীয়া বাহিনী পলাতকদের বর্তমান নওগাঁ জেলার অন্তর্গত খগরিজন পর্যন্ত তাড়া করে নিয়ে যান এবং সেখান থেকে অনেক লুঠের মাল নিয়ে জয়গৌরবে ফিরে আসেন। (Ahom Buranji from Khunlung and Khunlai: Purani Assam Buranji, p. 57 দ্রষ্টব্য)।

গেটের মতে বাংলার সৈন্যবাহিনীর এই আসাম অভিযান ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে ঘটেছিল (History of Assam, pp. 90-91, f. n. দ্রষ্টব্য) কিন্তু তা হতে পারে না, কারণ হোসেন শাহ ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন না। গেটের এই অনুমানের যে কোন ভিত্তি নেই, তা সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন (Mughal North-Fast Frontier Policy. pp. 85-86, f. n. দ্রষ্টব্য)।

অসমীয়া বুরঞ্জীগুলির উক্তি বিশ্লেষণ করে আমাদের ধারণা হয়েছে যে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকের ঘটনা সম্বন্ধে এদের খুঁটিনাটি বিবরণ সর্বাংশে নির্ভরযোগ্য নয়। বহু অমূলক কথা এদের মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে। যেমন একটি অসমীয়া বুরঞ্জীতে (Assam Buranji, edited by S. K. Bhuyan, 1945) লেখা আছে যে কামতার রাজার সঙ্গে গৌড়েশ্বরের (শ্রীহট্টের একটি অঞ্চলকে আগে 'গৌড়' বলা হত, ইনি সেখানকার রাজা হলে এই কাহিনী অংশত সত্য হতে পারে) কন্যা সুশুদ্ধি গরম কুমারীর বিবাহ হয়েছিল, পুরোহিতপুত্রের সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ের জন্য কামতারাজ রানীকে প্রাসাদ থেকে বহিষ্কৃত করেন। রানী তখন তাঁর পিতা গৌড়েশ্বরকে জানান এবং গৌড়েশ্বর কাম্‌তারাজ্য আক্রমণ করেন। কাম্‌তারাজ অহোমরাজ স্বর্গদেও সুহুমফা ডিহিঙ্গিয়া রাজা (১৪৯৭-১৫৩৯ খ্রী:)-র শরণাপন্ন হন। দীর্ঘকাল কাম্‌তারাজ ও অহোমরাজের সঙ্গে গৌড়েশ্বরের সেনাপতি তুরবকের যুদ্ধ হয় এবং শেষ পর্যন্ত তুরবক পরাজিত হয়ে অহোমরাজের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিবাহ দেন।

১৬৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ইব্‌ন্ মুহম্মদ ওয়ালী বা শিহাবুদ্দীন তালিশ নামে মোগল সরকারের একজন কর্মচারী ফতিয়াহ-ই-ইব্রিয়াহ্ বা তারিখ-ফতে-ই-আশাম নামে একখানি বই লেখেন। বইটিতে মীরজুমলার আসাম অভিযানের বিস্তৃত ও ধারাবাহিক বর্ণনা পাওয়া যায়। এই বইএর এক জায়গায় প্রসঙ্গক্রমে হোসেন শাহের আসাম অভিযান সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। তার সারমর্ম এই। বাংলার রাজা হোসেন শাহ ২৪,০০০ পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য এবং অসংখ্য জাহাজ নিয়ে আসাম আক্রমণ করেন। আসামের রাজা তখন পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নিলেন। হোসেন তখন দেশ (সমতল অঞ্চল) অধিকার করে তাঁর পুত্রকে এক শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সেখানে রেখে ফিরে গেলেন। কিন্তু যখন বর্ষা নামল, আসামের রাজা তখন পার্বত্য অঞ্চল থেকে সমতলভূমিতে নেমে এলেন এবং নিজের প্রজাদের সহায়তায় হোসেন শাহের পুত্রকে বধ করলেন ও তাঁর সৈন্যবাহিনীকে

অনাহারে রেখে দিলেন। তারপর ক্রমে ক্রমে তাদের সবাইকে বধ বা বন্দী করলেন (JASB, 1872, Pt. I, p. 79 দ্রষ্টব্য)। 'আলমগীরনামা'তেও হুবহু এই বিবরণ আছে। এই বিবরণ 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে'র বিবরণকেই সমর্থন করছে।

সুতরাং হোসেন শাহের আসাম-অভিযানের শোচনীয় ব্যর্থতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহই আর নেই। আসাম অভিযানে হোসেন শাহের যে পুত্র নিহত হয়েছিলেন, ঐ অঞ্চলে প্রচলিত কিংবদন্তীগুলিতে তিনি "দুলাল গাজী" নামে উল্লিখিত হন। "দুলাল" সম্ভবতঃ "দানিয়েল" নামের বিকৃতি। হোসেন শাহের যে দানিয়েল নামে এক পুত্র ছিল, তা আমরা আগেই দেখে এসেছি। হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকনের মতে দুলাল গাজী হোসেন শাহের জামাতা।

এখন প্রশ্ন এই, হোসেন শাহ কোন্ সময়ে আসামে অভিযান করেছিলেন ? ত্রিপুরার 'রাজমালা'র মতে হোসেন শাহ ১৪৩৬ শকাব্দ বা ১৫১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দে বলেছিলেন, "উড়িয়া আসাম কোচ জিনিয়া লইল।" এর থেকে মনে হয়, হোসেন শাহ ১৫১৪-১৫ খ্রীঃর অল্প আগেই আসামে অভিযান করে প্রাথমিক সাফল্য লাভ করেছিলেন এবং এর কিছুদিন বাদে আসামে তাঁর বাহিনীর বিপর্যয় ঘটে।

আসামের "হোসেন শাহী পরগণা" নামে পরিচিত একটি অঞ্চল এখনও হোসেন শাহের স্মৃতি বহন করছে।

উড়িষ্যার সঙ্গে হোসেন শাহের যুদ্ধ

হোসেন শাহ যে সমস্ত দেশের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তার মধ্যে উড়িষ্যাও অন্যতম। 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' লেখা আছে, "আশপাশের সমস্ত রাজাকে বশীভূত করে এবং উড়িষ্যা পর্যন্ত জয় করে তিনি কর আদায় করেছিলেন।" এখন হোসেন শাহের সঙ্গে উড়িষ্যার রাজার যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা করা যাক্।

'রিয়াজ'-এর মতে হোসেন শাহ উড়িষ্যা জয় করেছিলেন। হোসেন শাহের মুদ্রা এবং শিলালিপিতেও দাবী করা হয়েছে যে তিনি উড়িষ্যা জয় করেছিলেন। আমরা আগেই বলেছি যে হোসেন শাহের অনেকগুলি মুদ্রায় তাঁর নামের সঙ্গে "অল-ফতেহ' অল্-কামরু ওঅ কামতে ওঅ জাজনগর ওঅ ওরিসে" ("কামরূ-কামতা-জাজনগর-উড়িষ্যা বিজয়ী") উপাধি যুক্ত হয়েছে এবং এই জাতীয়

মুদ্রাগুলির মধ্যে যেগুলি সবচেয়ে প্রাচীন, সেগুলি ৮৯৯ হিজরা বা ১৪৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হয়েছিল।

এই মুদ্রাগুলি ছাড়া হোসেন শাহের রাজত্বকালের একটি শিলালিপিতেও এই কথা দেখতে পাওয়া যায়। ৯১৮ হিজরা বা ১৫১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ শ্রীহট্টের শাহ্ জলাল দরগার এই শিলালিপিতে লেখা আছে,

"আটটি 'কাম্‌হার' বিজয়ী রুকন্ খান, যিনি নগরসমূহের উজীর এবং সেনাধ্যক্ষ থাকাকালীন কামরু, কামতা, জাজনগর ও উড়িষ্যা বিজয়ের সময়ে বাদশাহের অধীনস্থ সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ করেছেন।" (JASB, 1922, p. 413 দ্রষ্টব্য)

শিলালিপিটিতে হোসেন শাহের নাম নেই, কিন্তু এর তারিখ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এতে যে বাদশাহের উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ভিন্ন আর কেউই নন।

এই সমস্ত মুদ্রা ও শিলালিপির সাক্ষ্য থেকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, হোসেন শাহ উড়িষ্যা জয় করেছিলেন ; ১৪৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ রাজত্বের প্রথম বছরে তিনি উড়িষ্যা আক্রমণ করেন এবং ঐ বছরেই এই বিজয় সম্পূর্ণ হয়েছিল। কিন্তু অন্যান্য সূত্রের সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করলে এই ধারণা দূরীভূত হয়। ১৪৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার সঙ্গে হোসেন শাহের যুদ্ধ সুরু হয় বটে, কিন্তু ঐ বছরেই তা শেষ হয়নি, তারও পরে দীর্ঘকাল ধরে এই যুদ্ধ চলেছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত চৈতন্য-চরিত গ্রন্থগুলিতে উড়িষ্যার সঙ্গে হোসেন শাহের যুদ্ধ সম্বন্ধে কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। প্রথমে এদের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করব।

চৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে বৃন্দাবনদাস হোসেন শাহের উড়িষ্যা-অভিযানের কথা এইভাবে উল্লেখ করেছেন,

যে হুসেন সাহা সর্ব্ব উড়িয়ার দেশে।
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে॥
... ...
স্বভাবেই রাজা মহা কালযবন।
মহাতমোগুণবুদ্ধি জন্মে ঘনেঘন॥
ওড্র দেশে কোটি কোটি প্রতিমা প্রাসাদ।
ভাঙ্গিলেক কত কত করিল প্রমাদ॥

চৈতন্যদেব যখন সন্ন্যাসগ্রহণের পর বাংলা থেকে নীলাচলে যান, (জানুয়ারী, ১৫১০খ্রীঃ), তখন বাংলা ও উড়িষ্যার মধ্যে যুদ্ধ চলছিল এবং ছত্রভোগে দুই রাজ্যের সীমানা পার হবার সময় বাংলার সীমান্তরক্ষী রামচন্দ্র খান চৈতন্য-দেবকে সাহায্য করেছিলেন বলে বৃন্দাবনদাস জানিয়েছেন। 'চৈতন্যভাগবত' অন্ত্যখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে মহাপ্রভুর প্রতি রামচন্দ্র খানের উক্তি এইভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে,

সভে প্রভু হইয়াছে বিষম সময়।
সে দেশে এ দেশে কেহো পথ নাহি বয়॥
রাজারা ত্রিশূল পুঁতিয়াছে স্থানে স্থানে।
পথিক পাইলে জাশু বলি লয় প্রাণে॥
কোন দিক দিয়া বা পাঠাঙ লুকাইয়া।
তাহাতে ডরাঙ প্রভু শুন মন দিয়া॥
মুঞি সে লস্কর এথা মোর সব ভার।
নাগালি পাইলে আগে সংশয় আমার॥
তথাপিও যেতে কেনে প্রভু মোর নয়।
যে তোমার আজ্ঞা তাহা করিমু নিশ্চয়॥

এর দু'বছর বাদে (১৫১২ খ্রীঃ) যখন মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ ক'রে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন বাংলার সঙ্গে উড়িষ্যার যুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। কবিকর্ণপূরের 'শ্রীচৈতন্যোচন্দ্রোদয়' নাটকের অষ্টম অঙ্কে দেখি, দক্ষিণ ভারত থেকে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করে চৈতন্যদেব মুকুন্দকে প্রশ্ন করলেন নিত্যানন্দ কোথায়। মুকুন্দ বললেন যে তিনি বাংলায় গেছেন এবং বলে গেছেন মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারত থেকে ফিরে এলে অদ্বৈতপ্রমুখ সমস্ত ভক্তকে নিয়ে আবার নীলাচলে আসবেন। তাই শুনে গোপীনাথ আচার্য বললেন, "সম্প্রতি বৈরাজ্যাদিকমপি নাস্তি। পন্থাশ্চ সুগমঃ। গুণ্ডিচাযাত্রা চ নেদীয়সী। তদাগমন-সামগ্রী সর্বৈবাস্তি।" (সম্প্রতি দুই রাজার রাজ্য নিয়ে বিবাদ নেই। পথও সুগম। গুণ্ডিচাযাত্রাও নিকট। তাঁদের আগমনের সমস্ত কারণই বর্তমান।)

১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মহাপ্রভু নীলাচল থেকে বাংলায় যান। কবিকর্ণপূর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর উৎকল-গৌড় সীমান্ত অতিক্রমের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার থেকে দেখা যায় যে ঐ সময়ে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ

কার্যত হচ্ছিল না এবং সন্ধিও আসন্ন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু উড়িষ্যা থেকে বাংলায় প্রবেশের কোন কোন পথ তখনও বন্ধ ছিল। কোন কোন পথ খোলা ছিল বটে; কিন্তু সেসব পথ দিয়ে যারা বাংলায় যেত, তাদের অনেক সময় বাংলার সীমান্তরক্ষীদের হাতে অত্যাচার সহ্য করতে হত। এজন্য মহাপ্রভুকে উড়িষ্যার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে কিছু সময় অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কবিকর্ণপূরের 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকের নবম অঙ্কে দেখি, একজন লোক উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রের কাছে মহাপ্রভুর উৎকল-গৌড় সীমান্ত অতিক্রমের এই বর্ণনা দিচ্ছে,

"ইতো দেবাধিকারং যাবৎ তাবত্তব প্রভাবেনৈব নির্ব্বাহিতবর্ত্ম সৌকর্য্যা অচংক্রমণেনৈব সর্ব্বে গতবন্তঃ। গৌড়সীম্নি প্রবেষ্টুং ত্রয়ঃ পন্থানঃ। দ্বয়ং রুদ্ধং একস্তু জলদুর্গঃ তমেবোদ্দিশ্য চলিতে সতি তৎসীমাধিকারী তুরুষ্কোঽরুষ্কোষকারঃ ইব সর্ব্বেষাং মর্ম্মহা মহমন্তপো দুর্বৃত্তচক্রচূড়ামণিঃ। ইতো দেশাদ্ যে গচ্ছন্তি তেষাং দুর্গতিঃ ক্রিয়তে ইতি শ্রুত্বা সর্ব্বেষামেব ভয়মুৎপন্নং মহাপ্রভবে কোঽপি ন শ্রাবয়তি। অস্মৎ সীমাধিকারিণোক্তম্। অত্র কিয়ান্ বিলম্বঃ ক্রিয়তাং যাবন্ময়াঽনেন সহ সন্ধিঃ সন্ধীয়তে।"

[এখান থেকে দেবাধিকার (মহারাজের অধিকার) যে পর্যন্ত, আপনার পথের সমস্ত বিঘ্ন নিবৃত্ত হওয়াতে সকলে অনায়াসেই বিনা ভ্রমণে গিয়েছিল। গৌড়দেশের সীমায় প্রবেশ করবার তিনটি পথ ছিল, তাদের মধ্যে দু'টি রুদ্ধ। একটি জলপথ, কিন্তু সেই জলপথেই (চৈতন্যদেব) প্রস্থান করছিলেন। সেই সীমার অধিকারী মহামন্তপ এবং হৃদয়জাত ব্রণের মত সকলের মর্মপীড়ক দুর্বৃত্তদের চূড়ামণি এক তুরুষ্ক (মুসলমান) ব্যক্তি আছে, সে এই দেশ থেকে যারা যায় সকলের দুর্গতি করে থাকে। একথা শুনে সকলেই ভয় পেলেন, কিন্তু মহাপ্রভুকে কিছুই শোনালেন না। আমাদের সীমাধিকারী বললেন, "যে পর্যন্ত এর সঙ্গে সন্ধি না হয় সে পর্যন্ত (মহাপ্রভু) এখানেই থাকুন।"]

কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মধ্যলীলা ষোড়শ অধ্যায়ে কবিকর্ণপূরেরই অনুরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। মহাপ্রভু উৎকল-গৌড় সীমান্তে উপনীত হবার পরে তাঁর প্রতি উড়িষ্যার সীমাধিকারীর উক্তি কৃষ্ণদাস কবিরাজ এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন,

মন্তপ যবন রাজার আগে অধিকার।
তার ভয়ে পথে কেহ নারে চলিবার ॥

পিছলদা পর্যন্ত সব তার অধিকার।
তার ভয়ে নদী কেহ হৈতে নারে পার॥
দিন কথো রহ সন্ধি করি তার সনে।
তবে সুখে নৌকাতে করাইব গমনে॥

এই নদী যে মন্ত্রেশ্বর নদ, তা কবিকর্ণপূর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ দুজনেই বলেছেন। বাংলার "যবন" সীমাধিকারী হঠাৎ চৈতন্যদেবের প্রতি ভক্তিভাব প্রদর্শন করল এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষায় চৈতন্যদেবকে

মন্ত্রেশ্বর দুষ্টনদ পার করাইল।
পিছলদা পর্যন্ত সেই যবন আইল॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বাংলার মুসলমান সীমাধিকারীকেই "মদ্যপ যবন রাজা" বলেছেন, হোসেন শাহকে নয়। মন্ত্রেশ্বর নদ থেকে সুরু করে পিছলদা পর্যন্ত এই মুসলমান সীমাধিকারীর কর্তৃত্বাধীন ছিল।

কবিকর্ণপূর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের এইসব উক্তি থেকে বোঝা যায়, অন্তত ১৫১২ খ্রীঃ থেকে ১৫১৪ খ্রীঃ পর্যন্ত বাংলা ও উড়িষ্যার মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ ছিল এবং ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে উভয় রাজ্যের মধ্যে সন্ধি আসন্ন হয়ে উঠেছিল। ঐ সময় সত্যিই যে দুই রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছিল না, তা সমসাময়িক পর্তুগীজ পর্যটক দুয়ার্তে বারবোসার ভ্রমণ-বিবরণী থেকে জানা যায়। বারবোসা ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ও উড়িষ্যায় ভ্রমণ করেন। তিনি উড়িষ্যার বর্ণনা দেবার সময় লিখেছেন, উড়িষ্যার রাজার এলাকার পরেই, "...commences the kingdom of Bengal, with which he (the king of Orissa) is sometimes at war." বারবোসার ভাষা থেকে বোঝা যায়, ঠিক ঐ সময়ে বাংলা ও উড়িষ্যার মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছিল না।

কিন্তু ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে আবার নতুন করে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। আগেই বলা হয়েছে, ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মহাপ্রভু বাংলায় আসেন। ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস পর্যন্ত তিনি বাংলায় ছিলেন। এই সময়ের মধ্যেই এক সময় তিনি গৌড়ের কাছে রামকেলি গ্রামে যান। রামকেলি গ্রামে হোসেন শাহের মন্ত্রী সনাতন তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন এবং সেই থেকেই তিনি তাঁর একান্ত ভক্ত হয়ে পড়লেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত' মধ্যলীলা ১৯শ অধ্যায়ের নিম্নোদ্ধৃত উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, চৈতন্যদেব বাংলা থেকে চলে যাবার

কিছুদিন পরে হোসেন শাহ নিজেই সৈন্যবাহিনী নিয়ে উড়িষ্যায় যুদ্ধ করতে যান,

হেন কালে গেল রাজা উড়িয়া মারিতে।
সনাতনে কহে তুমি চল মোর সাথে॥
তেহোঁ কহে যাবে তুমি দেবতায় দুঃখ দিতে।
মোর শক্তি নাহি তোমার সঙ্গে যাইতে॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ সনাতনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। সুতরাং সনাতন যে ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত, সে সম্বন্ধে তাঁর উক্তির প্রামাণিকতা অবিসংবাদিত। তাঁর উক্তি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের কিছু পরে বাংলার সঙ্গে উড়িষ্যার যুদ্ধ আবার নতুন করে বাধল, যে যুদ্ধ ইতিপূর্বে শেষ হয়ে এসেছিল।

আর একটি চৈতন্যচরিতগ্রন্থ—জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' এবিষয়ে কিছু নতুন সংবাদ পাওয়া যায়। এই বইয়ের মতে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র বাংলাদেশ আক্রমণের সঙ্কল্প করেছিলেন, কিন্তু চৈতন্যদেব বাংলার সুলতানের প্রচণ্ড শক্তির কথা বলে তাঁকে নিরস্ত করেন। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে'র 'বিজয়খণ্ডে' হরিদাস ঠাকুরের নীলাচল গমন বর্ণনার ঠিক পরেই এই প্রসঙ্গটি উল্লিখিত হয়েছে। আমরা এই বইয়ের একটি প্রাচীন পুঁথি থেকে এই অংশটি উদ্ধৃত করছি।

(চৈতন্যদেব) এইমতে আছেন বৎসর দুই চারি।
গৌড়ে উৎকলে পড়িল মহা সারি॥
প্রতাপরুদ্র গৌড় জিনিতে করে আশা।
শুনিঞা গৌড়েন্দ্র তারে করেন উপহাসা॥
চৈতন্যদেবেরে রাজা আজ্ঞা মাগিল।
প্রভু বলে প্রতাপরুদ্র কুবুদ্ধি লাগিল॥
কালযবন রাজা পঞ্চগৌড়েশ্বর।
সিংহশার্দ্দুলে দেখ কতেক আন্তর॥
উড্রদেশ উচ্ছন্ন ক(ি)রবেক যবনে।
জগন্নাথ নীলাচল ছাড়িবেন এতদিনে॥
লজ্জা পাবে প্রতাপরুদ্র আমার বাক্য ধর।
গৌড়মুখে শয়ন ভোজন পাছে কর॥
কাঞ(ী)দেশ বিজয়া জিনিলেক নানা রাজ্য॥

গৌড় জিনিবে হেন না দেখী সে কার্য্য ॥
গৌড়েশ্বর অবশ্য আসিবে নীলাচলে।
তুমি ছাড়িবে প্রলয় হইব উৎকলে ॥
প্রভু নিবারেন শুনিঞা প্রতাপরুদ্র।
বিজয়ানগর গেল করিবারে যুদ্ধ ॥

(এশিয়াটিক সোসাইটির G-5398-6-c.4নং পুঁথি, ১৩৬ক পত্র)

জয়ানন্দের এই বিবরণে অবিশ্বাস্য কিছুই নেই। কারণ যদিও চৈতন্যদেব নীলাচলে বাস করবার সময় সংসারধর্ম ত্যাগ করেছিলেন, তাঁর বাস্তব বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা কোন সময়েই তিনি বিসর্জন দেননি। 'চৈতন্যভাগবত' ও 'চৈতন্যচরিতামৃতে' তাঁর নীলাচল-বাসের যে বর্ণনা পাই, তাতে দেখি ভক্তদের সঙ্গে কথা বলা থেকে সুরু করে নানা বিষয়েই তিনি সব সময় পরিণত বাস্তববোধের পরিচয় দিয়েছেন। হোসেন শাহের ব্যক্তিত্ব ও শক্তি সম্বন্ধে চৈতন্যদেবের খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল। 'চৈতন্যচরিতামৃত' মধ্যলীলা ১৫শ পরিচ্ছেদে দেখি চৈতন্যদেব হোসেন শাহকে "মহাবিদগ্ধ রাজা" বলছেন। সুতরাং প্রতাপরুদ্র হোসেন শাহের রাজ্য আক্রমণ করতে চাইলে চৈতন্যদেব তাঁর পরম ভক্ত প্রতাপরুদ্রকে হোসেন শাহের পরাক্রমের কথা বলে সতর্ক করে দেবেন, এ ব্যাপার খুবই স্বাভাবিক। প্রতাপরুদ্রের মঙ্গল-চিন্তার চেয়ে জগন্নাথ-মন্দিরের নিরাপত্তার ভাবনা চৈতন্যদেবের মনে আরও বেশী করে জাগা স্বাভাবিক এবং তা যে জেগেছিল, উপরে উদ্ধৃত অংশে তারই পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং জয়ানন্দের এই বিবরণ যথার্থ বলেই মনে হয়। উদ্ধৃত অংশের শেষ ছত্রে বলা হয়েছে বাংলাদেশ আক্রমণে বিরত হয়ে প্রতাপরুদ্র "বিজয়ানগর গেল করিবারে যুদ্ধ"। চৈতন্যদেবের নীলাচলে আগমনের পরে অন্তত ১৫১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে প্রতাপরুদ্র বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, তার প্রমাণ আছে (The Gajapati Kings of Orissa by Prabhat Mukherjee, pp. 81-82 দ্রষ্টব্য)। এই সমস্ত বিষয় থেকে মনে হয়, জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে'র পূর্বোদ্ধৃত বিবরণ মূলত সত্য।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য যে প্রতাপরুদ্রের বিজয়নগরে যুদ্ধ করতে যাবার পিছনে চৈতন্যদেবের কোন হাত ছিল না, তিনি যে প্রতাপরুদ্রকে বিজয়নগর আক্রমণ করতে বলেছিলেন, এমন কোন কথা উদ্ধৃত অংশে নেই। অথচ নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর সম্পাদিত জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে'র ভূমিকায়

(পৃঃ।৶০) এই অংশটি যেভাবে উদ্ধৃত করেছেন*, তার থেকে মনে হয় চৈতন্যদেবই প্রতাপরুদ্রকে বিজয়নগরে অভিযান করতে বলেছিলেন; কারণ নগেন্দ্রনাথের উদ্ধৃত অংশে চৈতন্যদেবের উক্তির অন্তর্গত একটি চরণের এই পাঠ দেখা যায়,

কাঞ্চীদেশ জিনি কর নানা রাজ্য।

এই চরণটিকে অবলম্বন করে এপর্যন্ত বহু আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছে। চৈতন্যদেব প্রতাপরুদ্রকে বাংলাদেশ আক্রমণ করতে না বলে হিন্দুরাজ্য কাঞ্চী আক্রমণ করতে বলেছিলেন, একথা যাঁরা বিশ্বাস করেছেন তাঁরা চৈতন্যদেবের উপর দোষারোপ করেছেন; যাঁরা বিশ্বাস করেননি, তাঁরা এ কথা লেখার জন্য জয়ানন্দের উপর দোষারোপ করেছেন। কিন্তু আমাদের ব্যবহৃত প্রাচীন পুঁথিতে চরণটির এই পাঠ পাওয়া যায় না। তাতে আছে,

কাঞ্চ(ী) দেশ বিজয়া জিনিলেক নানা রাজ্য।

সুতরাং নগেন্দ্রনাথের দেওয়া পাঠ একেবারেই ভ্রান্ত। অথচ এরই উপর নির্ভর করে চৈতন্যদেব বা জয়ানন্দের উপর এতদিন দোষারোপ করা হয়েছে। চৈতন্যদেবের পক্ষে প্রতাপরুদ্রকে "কাঞ্চীদেশ বিজয়া জিনিলেক নানা রাজ্য" বলা মোটেই অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক নয়।

চৈতন্যচরিতগ্রন্থগুলির সাক্ষ্য আমরা বিশ্লেষণ করলাম। এখন এসম্বন্ধে উড়িষ্যায় যে সমস্ত সূত্র পাওয়া গিয়েছে, তাদের সাক্ষ্য বিচার করব।

এদের মধ্যে সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য জগন্নাথমন্দিরের 'মাদলা পাঞ্জী'। মনোমোহন চক্রবর্তী প্রথম আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে 'মাদলা পাঞ্জী'র সাক্ষ্যের উল্লেখ করেন (JASB, 1900, Pt. I, p. 186 দ্রষ্টব্য)। তিনি কিন্তু একটি ভুল করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে 'মাদলা পাঞ্জী'তে উল্লিখিত উড়িষ্যা-অভিযানে বাংলার সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব করেছিলেন ইসমাইল

* নগেন্দ্রনাথ বসু জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে'র ভূমিকায় যদিও 'বিজয়খণ্ড' থেকে আলোচ্য অংশটি উদ্ধৃত করেছেন, বইয়ের মধ্যে কিন্তু এই অংশটি ছাপা হয়নি। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার (শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, ২য় সং, পৃঃ ২৫৮-এ) লিখেছেন, "মুদ্রিত গ্রন্থের ১৩৯ পৃষ্ঠা হইতে ১৪৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত বিজয়খণ্ডের মধ্যে এই পংক্তিগুলি পাওয়া গেল না। কুলজীশাস্ত্রের অনেক জালপুঁথি দেখিয়া বসু মহাশয় যেমন ভ্রান্ত হইয়াছিলেন, আলোচ্য গ্রন্থের বেলাতেও কি তাহার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছিল?" কিন্তু এই পংক্তিগুলি নগেন্দ্রবাবুর স্বকপোলকল্পিত নয়, কারণ এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিতে এগুলি 'বিজয়খণ্ডে' যথাযথভাবেই পাওয়া যায়। সম্ভবত নগেন্দ্রনাথের অসাবধানতার দরুণ জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' ছাপবার সময় এই অংশটি বাদ পড়ে গিয়েছিল।

গাজী। কিন্তু 'রিসালৎ-ই-শুহাদা' নামক ফার্সী গ্রন্থে পরিষ্কার লেখা আছে যে ইসমাইল গাজী বারবক শাহের সমসাময়িক ছিলেন এবং তাঁরই আদেশে (৮) ৭৮ হিজরায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকালে যে ইসমাইল গাজী জীবিত ছিলেন না, তার আর একটি প্রমাণ হচ্ছে এই যে, হুগলী জেলার মান্দারণ ও রংপুর জেলার কাঁটাদুয়ারে ইসমাইল গাজীর যে দুটি সমাধি আছে, দুটিতেই আলাউদ্দীন হোসেন শাহের শিলালিপি পাওয়া যায়; মান্দারণের শিলালিপির তারিখ ৯০০ হিজরা বা ১৪৯৪-৯৫ খ্রীঃ—হোসেন শাহের রাজত্বের দ্বিতীয় বছর। এই সব প্রমাণ থেকে বোঝা যায় যে 'মাদলা পাঞ্জী'তে বর্ণিত হোসেন শাহের ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দের উড়িষ্যা-আক্রমণে ইসমাইল গাজীর নেতৃত্ব করার কথা মনোমোহন চক্রবর্তীর কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নয়। 'মাদলা পাঞ্জী'তে ইসমাইল গাজীর নামগন্ধও নেই। তাতে স্বয়ং হোসেন শাহের উড়িষ্যা-অভিযানে সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব করার কথা আছে। 'মাদলা পাঞ্জী'র প্রতাপরুদ্র সংক্রান্ত বিবরণে ('মাদলা পাঞ্জী', প্রাচী সংস্করণ, পৃঃ ৫২-৫৩ দ্রষ্টব্য) গৌড়ের সুলতানের উড়িষ্যা-আক্রমণ সম্বন্ধে এই লেখা আছে,

"এ রাজাঙ্ক ১৭ অঙ্কে গউড়নগরু মুগল বাহিলে। কটক নিকটে সে টারা পকাইলে। কটক রখিআ হোইথিলে ভোই বিদ্যাধর। সে যাইং ধইলে সারঙ্গগড় (পাঠান্তর—এ সম্ভালি ন পারি শারঙ্গগড় রহিলে)। পরমেশ্বরঙ্কু চকা ছড়াই চাপরে বসাই চড়াইগুহা পর্বতে বিজে করাইলে। শ্রীপুরুষোত্তমে আসি গৌড় পাতিশা অমুরা সুরথান প্রবেশ হোইলে। বড় দেউলে যেতে পিতুলামান থিলে সবুকুহিং খুণ কলে। দখিণ কটকাইরে যে রজা যাইথিলে সেঠারে রজা বারতা পাইলে। বড় ক্রোধ করি মাসক বাট দশ দিনে অইলে। বারতা পাই অলাপতি সুরথান শ্রীপুরুষোত্তমরু ভাঙ্গিলা। রজা তাহাঙ্ক পছে লাগি কটকে ন রহি গঙ্গা পরিযন্তে অলাপতি সুরথানকু গোড়াই চউমুহিঁঠারে রহি বহুত যুঝ কলে। এঠারু ভাঙ্গি সুরথান মন্দারুণী রহিলে। মন্দারুণী ছড়াই রজাএ আবোরি রহিলে। গোবিন্দ বিদ্যাধর যাই সুরথানকু যাই পেষিলে। রজাঙ্কু সে দোরেহা হোইলে। সুরথানকু ঘেনি বাহাড় অইলে। মন্দারুণী গড়-ঠাইং বহুত যুঝ রহি কলে। রাজা বারু লাগি হোইং হাথী দণ্ড ঘেনি বহুত গোল যুঝ কলে। গোবিন্দ ভোই বিদ্যাধর যুঝরে রজাঙ্কু ভজাইলে।

হাথীদণ্ড ঘেনি রাজা ভাজি অইলে। সেঠারে তাঙ্কু লোক পঠিআইলে। আন্ত উত্তারু কাহাকু করিচ পচার বোইলে, এহা শুণি গোবিন্দ ভোই বিদ্যাধর রাজাঙ্কু আসি দরশন কলে। বহুত সুকৃত তাহাঙ্কু রাজা কলে। কনক স্নাহান করাইলে, বিদ্যাধর পদরে রাজা তাহাকু শাঢ়ি দেলে, পাত্র কলে। তাহাঙ্কু মূলে রাজা রাজ্যভার দেলে। সেহিঠারে সুরথান তাঙ্ক রাজ্যরে রহিলে (পাঠান্তর—সেঠারু সুরথান তাঙ্ক রাজ্যকু গলে)।"

[এই রাজার (প্রতাপরুদ্রের) সতের অঙ্কে গৌড়নগর থেকে মোগল আক্রমণ করে। কটকের কাছে তারা তাঁবু গাড়ল। কটক রক্ষা করছিলেন ভোই বিদ্যাধর। তিনি সারঙ্গগড়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন (পাঠান্তর অনুসারে—তিনি আটকাতে না পেরে শারঙ্গগড়ে আশ্রয় নিলেন)। তিনি পরমেশ্বরকে (জগন্নাথকে) আস্তানা থেকে (পুরীর মন্দির থেকে) নিয়ে দোলায় বসিয়ে চড়াইগুহা পর্বতে রাখলেন। গৌড়ের পাৎশা আমীর সুলতান শ্রীপুরুষোত্তমে এসে প্রবেশ করলেন। বড় মন্দিরে যত মূর্তি ছিল, সবগুলিই তিনি নষ্ট করলেন। রাজা দক্ষিণে অভিযানে গিয়েছিলেন। সেখানে রাজা খবর পেলেন। বড় ক্রোধ করে তিনি এক মাসের পথ দশ দিনে এলেন। খবর পেয়ে অলাপতি (আলাউদ্দীন) সুলতান শ্রীপুরুষোত্তম থেকে পালালেন। রাজা তখন পিছু পিছু ধাওয়া করে কটকে না থেকে গঙ্গা পর্যন্ত অলাপতি সুলতানকে তাড়া করে চউমুহি'র কাছে অনেক যুদ্ধ করলেন। এখান থেকে পালিয়ে সুলতান মান্দারণে রইলেন। রাজা (তাঁকে) মান্দারণ থেকে তাড়িয়ে (মান্দারণ দুর্গ) অবরোধ করে রইলেন। গোবিন্দ বিদ্যাধর গিয়ে সুলতানের সঙ্গে যোগ দিলেন। রাজার প্রতি তিনি বিশ্বাসঘাতক হলেন, সুলতানকে নিয়ে ফিরে এলেন। মান্দারণ দুর্গে (তাঁরা) খুব যুদ্ধ করলেন। রাজা জয়লাভের জন্য হাতী এবং সৈন্যবাহিনী নিয়ে খুব দারুণ যুদ্ধ করলেন। গোবিন্দ বিদ্যাধর যুদ্ধে রাজাকে তাড়ালেন। হাতী এবং সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাজা পালিয়ে এলেন। সেখানে তাঁকে (গোবিন্দ বিদ্যাধরকে) লোক পাঠালেন। "আমাকে সরিয়ে কাকে (রাজা) করছ" প্রশ্ন করলেন। তা শুনে গোবিন্দ ভোই বিদ্যাধর রাজাকে এসে দর্শন দিলেন। রাজা তাঁকে অনেক সমাদর করলেন, কনকস্নান করালেন। রাজা তাঁকে বিদ্যাধর-পদে অধিষ্ঠিত করলেন, পাত্র করলেন। তাঁরই উপর রাজা রাজ্যভার

রে

দিলেন। সেইখানে সুলতান তাঁর রাজ্যে রইলেন (পাঠান্তর অনুসারে—সেখান থেকে সুলতান তাঁর রাজ্যে গেলেন)।]

প্রতাপরুদ্রের রাজত্বের ১৭শ অঙ্ক* ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সুরু হয় এবং ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শেষ হয়। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে চৈতন্যদেব নীলাচলে যান। ঐ সময়ে বর্তমান ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত এবং কলকাতার ২৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ছত্রভোগ ছিল বাংলা-উড়িষ্যার সীমানায় বাংলার শেষ ঘাঁটি। ১৫০৯ খ্রীঃর সেপ্টেম্বর থেকে ১৫১০ খ্রীঃর জানুয়ারী—মাত্র এই কয় মাসের মধ্যে বাংলার সুলতানের পুরী অবধি অধিকার, সেখান থেকে উড়িষ্যার রাজার কাছে তাড়া খেয়ে মান্দারণ অবধি পশ্চাদপসরণ এবং আবার মান্দারণ থেকে ছত্রভোগ অবধি অধিকার নিশ্চয়ই ঘটেনি। ১৫১০ খ্রীঃর জানুয়ারী থেকে এপ্রিল পর্যন্ত সময়ের মধ্যেও ঘটেনি, কারণ চৈতন্যদেব ঐ সময়ে নীলাচলে ছিলেন, এর মধ্যে নীলাচল মুসলমানদের হাতে যাওয়ার মত এত বিরাট একটা ঘটনা ঘটে গেলে চৈতন্য-চরিতগ্রন্থগুলিতে নিশ্চয়ই তার উল্লেখ থাকত। ১৫১০ খ্রীঃর এপ্রিল মাসে চৈতন্যদেব দক্ষিণ ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন এবং তার দু'বছর বাদে নীলাচলে ফেরেন। সুতরাং 'মাদলা পাঞ্জী'র বিবরণে বাংলার সুলতানের যে উড়িষ্যা-অভিযানের কথা আছে, তা যদি সত্যই ঘটে থাকে, তাহলে ১৫১০ খ্রীঃর এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ঘটেছিল সন্দেহ নেই।

কিন্তু 'মাদলা পাঞ্জী'র উল্লিখিত বিবরণকে হুবহু সত্য বলে গ্রহণ করতে অসুবিধা আছে। আলোচ্য যুগের ঘটনা সম্পর্কে 'মাদলা পাঞ্জী'র উক্তির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "...the dates of the events of this period are wrongly given in the Mādalā Pāñji in most cases...There are indications that the Mādalā Pāñji was compiled shortly after the Mughal conquest of Orissa...The temple priests depended on traditional accounts, true stories and stray records of temple

*১৭শ অঙ্ক মানে ১৭শ বর্ষ নয়। বর্ষ-গণনার সঙ্গে অঙ্ক-গণনার পার্থক্য এই যে অঙ্ক-গণনার সময় কতকগুলি সংখ্যাকে "অশুভ" বলে বাদ দেওয়া হয়। এই সংখ্যাগুলি হচ্ছে—১, যে সব সংখ্যার শেষে ৬ আছে এবং ১০ ছাড়া অন্য যে সব সংখ্যা শূন্য দিয়ে শেষ হয়। "অঙ্কে"র বছর ভাদ্রমাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথি থেকে শুরু হয়।

administration when they compiled the Mādalā Pānji. (The Gajapati Kings of Orissa, pp. 7-৪) সুতরাং আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে 'মাদলা পাঞ্জী'র বিবরণকে সর্বাংশে সত্য বলে গ্রহণ করা দুরূহ।

যাহোক্ 'মাদলা পাঞ্জী'তে খুব স্পষ্টভাবে লেখা হয়েছে যে "গৌড় পাতিসা অমুরা সুরথান" অর্থাৎ "গৌড় পাৎশা আমীর সুলতান" স্বয়ং গৌড় বাহিনীর নেতৃত্ব করেছিলেন। সুলতানের নাম বলা হয়েছে "অলাপতি" অর্থাৎ আলাউদ্দীন।* এখানেও 'মাদলা পাঞ্জী' নির্ভুল। কিন্তু এই সুলতানকে "মোগল" বলা 'মাদলা পাঞ্জী'র একটি প্রকাণ্ড ভুল এবং তার আধুনিকতা ও নাতি-প্রামাণিকতার অন্যতম প্রমাণ। কিন্তু এই যুদ্ধ সম্বন্ধে 'মাদলা পাঞ্জী'র সাক্ষ্যকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্রতাপরুদ্রের বেলিচেরলা তাম্রশাসন এবং 'কটকরাজবংশাবলী' থেকে 'মাদলা পাঞ্জী'র বিবরণের সমর্থন পাওয়া যায়।

'মাদলা পাঞ্জী'র বিবরণের আর একটি নতুন বিষয় হল গোবিন্দ বিদ্যাধরের প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে হোসেন শাহের দলে যোগদানের প্রসঙ্গ। গোবিন্দ বিদ্যাধর ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ষোড়শ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে তিনি উড়িষ্যার রাজা হয়েছিলেন। এরকম একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির বিশ্বাস-ঘাতকতার ফলেই প্রতাপরুদ্রের প্রথমে পরাজয় ঘটেছিল এবং তাঁকে ফিরে পেয়ে তিনি পরে জয়যুক্ত হলেন, একথা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য।

মোটের উপর, আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে 'মাদলা পাঞ্জী'র উক্তি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য না হলেও তার মধ্যে যে কিছু কিছু সত্যের উপাদান রয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

যা হোক্, নাতিপ্রামাণিক 'মাদলা পাঞ্জী' ছাড়া উড়িষ্যায় আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে অন্য কিছু কিছু সূত্রও পাওয়া যায়। প্রতাপরুদ্রের কয়েকটি শিলালিপি ও শাসনে এসম্বন্ধে উল্লেখ আছে। বর্তমান অন্ধ্র রাজ্যের অন্তর্গত গুন্টুর জেলার ইত্নুপুলপদু গ্রামের চেন্না কেশব মন্দিরে প্রতাপরুদ্রের এক শিলালিপি পাওয়া যায়। (South Indian Inscriptions, Vol. X, No. 732 দ্রষ্টব্য।) এটি ১৪২২ শকাব্দের কার্তিক মাসে চন্দ্রগ্রহণের দিন অর্থাৎ ৫ই নভেম্বর, ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হয়েছিল। এতে লেখা আছে,

* কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতের কোন কোন পুঁথিতে আলাউদ্দীন হোসেন শাহকে "অল্লাপদীন" বলা হয়েছে।

সমুত্থদ্ গৌড়েন্দ্র ক্রন্দন কথিতা-
শেষবিজয় প্রতাপশ্রীরুদ্রো জয়তি
সমরে শত্রুনিকরান্ ॥

এর অর্থ :—সমুত্থত গৌড়রাজের ক্রন্দনের দ্বারা যাঁর শেষ বিজয় কথিত হয়েছিল সেই প্রতাপশ্রীরুদ্র সমরে শত্রুবর্গকে জয় করেন। এখানে প্রতাপরুদ্রের কাছে গৌড়ের রাজা পরাজিত হয়েছিলেন বলে দাবী করা হয়েছে।

[ঐ একই তারিখে অর্থাৎ ১৫০০ খ্রীঃর ৫ই নভেম্বরে উৎকীর্ণ প্রতাপরুদ্রের অনন্তবরম্ শাসনে (Andhra Patrika Annual, 1929, pp. 175-176 দ্রষ্টব্য) লেখা আছে যে প্রতাপরুদ্র অঙ্গরাজকে বিতাড়িত করে পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছিলেন। অঙ্গরাজ্য বলতে আগেকার দিনে ভাগলপুর সমেত পুব বিহারের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে বোঝাত। ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে এই অঞ্চলের অনেকাংশ হোসেন শাহের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু যেহেতু অনন্তবরম্ শাসনে অঙ্গরাজের পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণের উল্লেখ আছে, সেইজন্য মনে হয়, এখানে 'অঙ্গরাজ' অর্থে হোসেন শাহকে বোঝানো হয়নি, অন্য কোন রাজাকে বোঝানো হয়েছে; সম্ভবত ইনি ঝাড়খণ্ডের পার্বত্য অঞ্চলের রাজা।]

নেল্লোর জেলার বেলিচেরলা গ্রামে প্রতাপরুদ্রের তিনটি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে; এগুলি আসলে একই শাসনের তিনটি অংশ; প্রতাপরুদ্র এক ব্রাহ্মণকে বেরিচরলা গ্রাম দান করেছিলেন, এদের মধ্যে সেই কথাই বলা হয়েছে (Epigraphica Indica, January, 1950, pp. 206-208 দ্রষ্টব্য)। এদের তারিখ শুদি কার্তিক ৩ শুক্রবার "কর-রাম-অব্ধি-শীতাংশু" (১৪৩২) শকাব্দ, "প্রমোদাস্থ" বর্ষ। এই তারিখ ইংরেজী কোন্ তারিখের সমান, তা নিয়ে কিছু মতভেদ আছে (Epigraphica Indica, 1950, p. 206 দ্রঃ), তবে ১৫১০ খ্রীঃর সেপ্টেম্বর থেকে ১৫১১ খ্রীঃর অক্টোবরের মধ্যে কোন এক সময়ে এই তারিখ পড়বে। এই তাম্রশাসনগুলির মধ্যে দ্বিতীয়টিতে প্রতাপরুদ্র সম্বন্ধে লেখা আছে,

রৌদ্রঃ স গৌড়-রাজস্য বলানি জিত্বা
প্রত্যগ্রহীদ্ রাজ্যম্-অধিজ্য ধন্বা মস্তেভ
কুম্ভৌ সমরেষু যস্য

দৃষ্ট্বা পলায্য স্বপুরং প্রবেশ্য ভয়াকুলো গৌড়-
পতিঃ কদাপি বিব্বী কুচৌ নেক্ষিতুম্ ঈহতে স্ম
স ভূপতির্ম্মহারাজো রাজেন্দ্র-পর-
মেশ্বরঃ শ্রীমদ্রাজাধিরাজেন্দ্র-পঞ্চগৌড়াধিনায়কঃ।

এই শিলালিপিতে বলা হয়েছে যে প্রতাপরুদ্র গৌড়ের রাজাকে বলপূর্বক পরাজিত করে নিজের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেছিলেন এবং তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন, তার ফলে ভয়াকুল গৌড়পতি নিজের পুরে (দুর্গে) প্রবেশ করে আত্মরক্ষা করেন। এই শিলালিপির উক্তি 'মাদলা পাঞ্জী'র উক্তিকে সমর্থন করছে। এই শিলালিপির আর একটি বৈশিষ্ট্য, প্রতাপরুদ্র এতে নিজেকে "পঞ্চগৌড়াধিনায়ক" বলেছেন।

এইসব শিলালিপি ও শাসনের সাক্ষ্য থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে ১৫০০ খ্রীঃর নভেম্বর মাসের আগেই হোসেন শাহের সঙ্গে প্রতাপরুদ্রের সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল এবং ১৫০০ থেকে ১৫১০-১১ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রতাপরুদ্র গৌড়ের রাজার সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভের দাবী করেছেন।

সমসাময়িক উড়িয়া লেখকদের রচিত কয়েকটি গ্রন্থ থেকেও এসম্বন্ধে কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। স্বয়ং প্রতাপরুদ্র 'সরস্বতীবিলাসম্' নামে একটি স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তার অন্যতম পুষ্পিকায় তিনি "শরণাগত-জয়মুনাপুরাধীশ্বর-হুসনশাহসুরত্রাণশরণরক্ষণ" বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন।* সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রতাপরুদ্র এখানে শুধুমাত্র হোসেন শাহকে পরাজিত করার গৌরব দাবী করেন নি, নিজেকে হোসেন শাহের রক্ষাকর্তা বলে ঘোষণা করেছেন।

কিন্তু প্রতাপরুদ্রের এই অদ্ভুত ঘোষণা করার অর্থ কী? এক অর্থ এই হতে পারে যে হোসেন শাহ কোন এক সময়ে প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধে সুবিধা করতে না পেরে সন্ধি করতে বাধ্য হন, তাই প্রতাপরুদ্র নিজেকে হোসেন শাহের রক্ষাকর্তা বলে আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছেন। কিন্তু এই জাতীয় সন্ধি যদি হয়েও থাকে, তা প্রতাপরুদ্র ও হোসেন শাহের যুদ্ধের শেষ ফলাফল নয়। 'সরস্বতীবিলাসমে'র রচনাকালের দিকে লক্ষ্য রাখলেই একথা বোঝা যাবে। কোণ্ডবীড়ুর ব্রাহ্মণ লোল্ল লক্ষ্মীধর প্রতাপরুদ্রের সভাকার ছিলেন।

* Catalogue of the Sans. & Prakrit Mss., Ind. off. Lib., Vol. II, Pt. I, p. 424 দ্রষ্টব্য।

বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায় প্রতাপরুদ্রের কাছ থেকে কোণ্ডবীড়ু জয় করার পরে লোল্ল লক্ষ্মীধর প্রতাপরুদ্রকে ত্যাগ করে কৃষ্ণদেব রায়ের সভাকবি হন। কৃষ্ণদেব রায়ের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে লোল্ল লক্ষ্মীধর শঙ্করের 'সৌন্দর্যলহরী'র যে টীকা রচনা করেন, তার শেষে তিনি লিখেছেন যে তিনিই প্রতাপরুদ্রদেবের ("বীররুদ্রগজপতি") আজ্ঞায় 'সরস্বতীবিলাসম্' রচনা করেন। এই দাবী সত্য হোক্ বা না হোক্, 'সরস্বতীবিলাসম্' যে কৃষ্ণদেব রায় কর্তৃক কোণ্ডবীড়ু জয় করার আগে রচিত, তা এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। কৃষ্ণদেব রায়ের মঙ্গলগিরি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন তারিখে তিনি কোণ্ডবীড়ু জয় করেন (The Gajapati Kings of Orissa, by Prabhat Mukherjee, p. 79)। তাহলে 'সরস্বতীবিলাসম্' নিশ্চয়ই তার আগে রচিত। কিন্তু ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের পরেও যে হোসেন শাহ উড়িষ্যার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, তা আমরা 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র উক্তি উদ্ধৃত করে আগেই দেখিয়েছি।

প্রতাপরুদ্রের দীক্ষা-গুরু জীবদেবাচার্য কাবডিণ্ডিম রচিত 'ভক্তিভাগবত-মহাকাব্যম্' থেকেও প্রতাপরুদ্র ও হোসেন শাহের যুদ্ধ সম্বন্ধে কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। ৩২ সর্গে বিভক্ত এই মহাকাব্যটির শেষে এক সুদীর্ঘ প্রশস্তি রয়েছে, তার মধ্যে কবি নিজের ও উড়িষ্যার রাজাদের বংশপরিচয় দিয়েছেন। আমরা নীচে এই প্রশস্তির ২৬শ থেকে ৩২শ সংখ্যক শ্লোক উদ্ধৃত করছি,

স্বর্লোকভোগরসিকে পুরুষোত্তমেন্দ্রে
তস্যাত্মজঃ প্রবরতরুর্ভূব বীররুদ্রঃ।
ভর্তাভবৎসমুচিতো ধরণের্নবীনঃ
সৌন্দর্যসপ্তদশবৎসরমৎস্যকেতুঃ ॥ ২৬

সন্তোঽভিষেকসলিলৈঃ কৃতমৌলিরেব
সংখ্যে বিজিত্য রণজিত্বগৌড়রাজম্।
নদ্যাং নিবাপসলিলেন স বিষ্ণুপদ্যাং
প্রাতর্পয়ৎপৃথুযশাঃ পিতরং ত্রিপক্ষে ॥ ২৭

যো বৈরিপক্ষপরিতক্ষণদক্ষদীর্ঘ-
দোর্দণ্ডপালিতমহীবলয়ো নরেন্দ্রঃ।
অদ্বৈতবাদপরিশুদ্ধতরান্তরাত্মা
দ্বৈতং তনোতি বসুদেবসুতাবতারে ॥ ২৮

গোপালমূর্তিরুচিরা নবহেমমুদ্রা
যন্নামবর্ণলিখনাঙ্কনভাসমানাঃ।
সর্বাসু দিক্ষু বিহরন্তি যদীয়ভূক্তি-
মুক্তাশ্চ কণ্ঠকুহরে সুধিয়াং লুঠন্তি ॥ ২৯
তস্যাভবদ্ গুরুরসৌ কবিরাজরাজঃ
শ্রীমত্রিলোচননৃপালগুরোস্তনূজঃ।
শ্রীজীবদেবকবিডিণ্ডিমপণ্ডিতেন্দ্রো
রত্নাবতীশিশুরনারতকৃষ্ণভক্তঃ ॥ ৩০
শ্রীরুদ্রদেবনৃপতাবথ বেঙ্কটাদ্রৌ
কর্ণাটদেশবিজয়েন বসত্যুদারে।
তেনাশু শীঘ্রকবিনা জগদীশ্বরস্য
কাব্যং নিবদ্ধমিদমুজ্জ্বলভক্তিসিদ্ধম্ ॥ ৩১
অব্দেঽস্য সপ্তদশকে নৃপতেঃ সপঞ্চ-
ত্রিংশাব্দচুম্বিতবয়াঃ কবিডিণ্ডিমোঽয়ম্।
গোদাবরীপরিসরে নিবসন্নকার্ষীন্
মাসেন তত্র মকরেণ মহাপ্রবন্ধম্ ॥

(JAS, Vol. IV, 1962, pp. 26-27 থেকে উদ্ধৃত)

এর ভাবানুবাদ নীচে দেওয়া হল :—

পুরুষোত্তম স্বর্গলোকে গেলে তাঁর পুত্র বীররুদ্র কল্পতরু হলেন ; তাঁর বয়স ছিল (ঐ সময়ে) সপ্তদশ বৎসর*, (তাঁর) সৌন্দর্য মীনকেতুর (মদনের) মত, তিনি পৃথিবীর উপযুক্ত প্রভু হলেন ॥ ২৬ ॥ তাঁর কেশ যখন সদ্য অভিষেকের সলিলে সিক্ত, তখনই তিনি রণজয়ী গৌড়রাজকে পরাজিত করলেন এবং পিতার মৃত্যুর তিন পক্ষের মধ্যেই বিষ্ণুপদীর (গঙ্গা) নদীর জলে পিতার তর্পণ করলেন ॥ ২৭ ॥ (সেই) রাজা তাঁর দীর্ঘ বাহু দিয়ে তাঁর শত্রুদের দমন করেছিলেন এবং পৃথিবীকে পালন করেছিলেন, অদ্বৈতবাদে তাঁর অন্তরাত্মা পরিশুদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু বসুদেবসুতের অবতার হওয়ায় (অর্থাৎ চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হওয়ায়) তিনি দ্বৈতবাদ প্রচার করেছিলেন ॥ ২৮ ॥ যাঁর নাম লেখা গোপালের মূর্তি আঁকা স্বর্ণমুদ্রা সর্বত্র সুপ্রচারিত এবং যাঁর বাণীসমূহ মুক্তার

* এর থেকে বোঝা যায় যে, প্রতাপরুদ্র ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কারণ তিনি ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মত সুধীদের কণ্ঠে লুণ্ঠিত হয়॥ ২৯॥ তাঁর গুরু, গুরুদেরও রাজার তুল্য ত্রিলোচনের পুত্র, রত্নাবলীর গর্ভজাত, কৃষ্ণভক্ত কবিরাজরাজ পণ্ডিতেন্দ্র শ্রীজীবদেব কবিডিণ্ডিম॥ ৩০॥ রাজা রুদ্রদেব যখন কর্ণাট-বিজয় উপলক্ষে বেঙ্কটাদ্রিতে বাস করছিলেন, সেই সময়ে শীঘ্রকবি (জীবদেব কবিডিণ্ডিম) জগদীশ্বরের এই ভক্তিসমুজ্জল কাব্য রচনা করেন॥ ৩১॥ রাজার সপ্তদশ অঙ্কে, পঁয়ত্রিশ বর্ষ বয়সে প্রবেশকালে এই কবিডিণ্ডিম গোদাবরীতীরে অবস্থান করে মকর (মাঘ) মাসে এই মহাপ্রবন্ধ রচনা করলেন॥ ৩২॥

প্রতাপরুদ্রের দীক্ষাগুরু জীবদেবাচার্য কবিডিণ্ডিম প্রতাপরুদ্রের রাজত্বের সপ্তদশ অঙ্কে অর্থাৎ ১৫০৯-১০ খ্রীষ্টাব্দে এই কথাগুলি লিখেছিলেন। সুতরাং এদের ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। জীবদেবাচার্যের উক্তি থেকে আমরা জানতে পারি যে প্রতাপরুদ্র তাঁর অভিষেকের অব্যবহিত পরেই বাংলার সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। জীবদেবাচার্য এই যুদ্ধে প্রতাপরুদ্রের জয়লাভের এবং পিতার মৃত্যুর তিন পক্ষের (ছয় সপ্তাহের) মধ্যেই গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত অধিকারের দাবী করেছেন। এই দাবী কতদূর সত্য তা বলা যায় না, কিন্তু প্রতাপরুদ্র ও হোসেন শাহের প্রথম সংঘর্ষের সময় সম্বন্ধে এই প্রত্যক্ষদর্শী লেখকের সাক্ষ্য যে সম্পূর্ণ প্রামাণিক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রতাপরুদ্র ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে সিংহাসনে আরোহণ করেন (The Gajapati Kings of Orissa, Prabhat Mukherjee, pp. 58-59 দ্রষ্টব্য)। সুতরাং হোসেন শাহ ও প্রতাপরুদ্রের প্রথম সংঘর্ষ যে ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ঘটেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু হোসেন শাহের ৮৯৯ হিজরা বা ১৪৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দের "কামরু-কামতা-জাজনগর-উড়িষ্যা-বিজয়ী" উপাধিযুক্ত মুদ্রা থেকে বোঝা যায় যে, তারও আগে অর্থাৎ প্রতাপরুদ্রের পিতা পুরুষোত্তমের রাজত্বকালে বাংলার সঙ্গে উড়িষ্যার সংঘর্ষ সুরু হয়েছিল। তবে ১৪৯৩-৯৪ খ্রীঃ থেকে ১৪৯৭ খ্রীঃ, এই কয় বছরের যুদ্ধের বিবরণ বা ফলাফল সম্বন্ধে কোন সংবাদ কোথাও পাওয়া যায় না।

এরপর আমরা উড়িষ্যার আর একটিমাত্র সূত্রের উল্লেখ করব। এটি হচ্ছে অর্বাচীন 'কটকরাজবংশাবলী' (Further Sources of Vijaynagar History, no. 94)। এতে লেখা আছে যে প্রতাপরুদ্রের রাজত্বের "সপ্তমবর্ষে মুগল নামক ম্লেচ্ছা আগত্য কটকনিকটে স্থিতাঃ। কটকরক্ষকেনানন্তসামন্তরায়া-

ভিধেন কটকদুর্গ ত্যক্ত্বা সারঙ্গগড়নামকদুর্গে স্থিতম্। শ্রীজগন্নাথপ্রতিমাচতুষ্টয়ম্ নৌকায়াং স্থাপয়িত্বা চিলকাভিধজলমধ্যে চড়ায়ি (চড়ায়ি) গুহানামকপর্বতে স্থাপিতবান্। মুগলাভিধযবনমুখ্যেন অম্বরা (অমুরা) স্থুরস্থাহুনামকেন শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র আগত্য মন্দিরমধ্যে প্রতিমাদিকং ভগ্নং কৃতম্। অনন্তরং দক্ষিণদিগ্বিজয়ার্থম্ গতেন রাজ্ঞা শ্রুত্বা যবনাদিকং গত্বোন্মুখীকৃত্বা গঙ্গাতীরপর্যন্তম্ নীতঃ।" 'মাদলা পাঞ্জী'র বিবরণের সঙ্গে এই বিবরণের মিল আছে। সম্ভবত 'মাদলা পাঞ্জী' থেকে এই বিবরণ নেওয়া। তবে 'মাদলা পাঞ্জী'তে লেখা আছে যে প্রতাপরুদ্রের সপ্তদশ অঙ্কে গৌড়ের সুলতান উড়িষ্যা আক্রমণ করেছিলেন আর এতে বলা হয়েছে প্রতাপরুদ্রের রাজত্বের সপ্তম বর্ষে এই ঘটনা ঘটেছিল। এই 'কটকরাজবংশাবলী'তেও বাংলার সুলতানকে ভুল করে মোগল বলা হয়েছে।

আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সঙ্গে উড়িষ্যার রাজার যুদ্ধ সম্বন্ধে বিভিন্ন সূত্রে যে সমস্ত সংবাদ পাওয়া যায়, সেগুলি উল্লেখ ও বিশ্লেষণ করলাম। এই যুদ্ধ যে ১৪৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে অন্তত ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মাঝে অন্তত ১৫১২ খ্রীঃ থেকে ১৫১৪ খ্রীঃ পর্যন্ত এই যুদ্ধ বন্ধ ছিল। ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল এবং সন্ধি আসন্ন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তার অব্যবহিত পরেই আবার হোসেন শাহ নতুন করে উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। তিনি স্বয়ং এই অভিযান পরিচালনা করেন। এরপর আর হোসেন শাহের সঙ্গে উড়িষ্যার কোন যুদ্ধ হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না।

এই দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে হোসেন শাহ এবং উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্র—দু'জনেই জয়ের দাবী করেছেন। কিন্তু কেউই চূড়ান্ত জয় লাভ করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। এঁদের মধ্যে কেউ অপরের রাজ্যের কোন অঞ্চল স্থায়িভাবে অধিকার করতে পেরেছিলেন বলেও জানা যায় না। আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রতাপরুদ্রের বা উড়িষ্যায় হোসেন শাহের কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি। তবে ১৫১০ থেকে ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে হোসেন শাহ যে উড়িষ্যার দিকে তাঁর রাজ্যের সীমা খানিকদূর প্রসারিত করতে পেরেছিলেন, তার প্রমাণ আছে। 'চৈতন্যভাগবতে'র সাক্ষ্য থেকে দেখি, ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন শাহের রাজ্যের শেষ সীমা ছত্রভোগ, তারপর উড়িষ্যার এলাকা সুরু হচ্ছে। কিন্তু কবিকর্ণপূরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের

'চৈতন্যচরিতামৃত' থেকে দেখি, ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে ছত্রভোগের কিঞ্চিদধিক ৪০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত মন্ত্রেশ্বর নদ বাংলা ও উড়িষ্যার সীমারেখা। তবে এই সীমানা-প্রসারণ নতুন রাজ্য জয় না হৃত রাজ্যের পুনরুদ্ধার, তা বলা যেমন কঠিন, তেমনি শেষ পর্যন্ত উভয় রাজ্যের মধ্যে কী সীমারেখা দাঁড়িয়েছিল, তাও বলা শক্ত। যতদূর মনে হয়, উভয় রাজার এই যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিতই থেকে গিয়েছিল। কিন্তু ত্রিপুরার 'রাজমালা'য় হোসেন শাহের মুখে এই উক্তি দেওয়া হয়েছে,

উড়িয়া আসাম কোচ জিনিয়া লইল।
ত্রিপুর না জিনি মোর মন দুঃখ হইল॥

এর থেকে বোঝা যায়, ত্রিপুরার লোকেরা মনে করতেন যে উড়িষ্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধে হোসেন শাহ জয়লাভ করেছিলেন। হোসেন শাহের লোকদের প্রচারের ফলেই হয়তো ত্রিপুরাবাসীর মনে এই ধারণা জন্মেছিল।

হোসেন শাহের সঙ্গে উড়িষ্যারাজের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের ফলে বাংলা থেকে উড়িষ্যায় যাওয়া যে কত বিপদসঙ্কুল হয়েছিল, তা বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' থেকে জানা যায়। 'চৈতন্যভাগবত' অন্ত্যখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখি ভক্তেরা মহাপ্রভুকে উড়িষ্যা অভিমুখে অবিলম্বে রওনা হতে নিষেধ করে বলছে,

তথাপিহ হইয়াছে দুর্ঘট সময়।
সে রাজ্যে এখন কেহো পথ নাহি বয়
দুই রাজায় হইয়াছে অনন্ত বিবাদ।
মহাযুদ্ধ স্থানে স্থানে পরম প্রমাদ॥

এবং রামচন্দ্র খান মহাপ্রভুকে বলছে,

রাজারা ত্রিশূল পুতিয়াছে স্থানে স্থানে।
পথিক পাইলে 'জাশু' বলি লয় প্রাণে॥

এই যুদ্ধের সময় বাংলা-উড়িষ্যার সীমান্ত অঞ্চল যে কতখানি অরাজক হয়ে উঠেছিল, চৈতন্যভাগবত থেকে তারও পরিচয় পাই। এর অন্ত্যখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখা আছে যে চৈতন্যদেব ও তাঁর দলবল যখন নৌকায় করে সীমান্তবর্তী নদী পার হচ্ছিলেন, তখন নাবিক তাঁদের বলেছিল,

নিরন্তর এ পানীতে ডাকাইত ফিরে।
পাইলেই ধন প্রাণ দুই নাশ করে॥

এতেক যাবত উড়িয়ার দেশ পাই।
তাবত নীরব হও সকল গোসাঞি॥

কবিকর্ণপূরের 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে ঠিক এই সময়ের সম্বন্ধেই বলা হয়েছে "ইদানীং গৌড়াধিপতে র্যবনভূপালস্য গজপতিনা সহ বিরোধে গমনাগমনমেব ন বর্ত্ততে।"

কিন্তু মহাপ্রভু নীলাচলে বাস করার পরে বাংলার ভক্তেরা প্রতি বছর রথযাত্রার সময় তাঁকে দর্শন করবার জন্য নীলাচলে যেতেন। ১৫১৩ থেকে ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ অবধি অধিকাংশ বছরই ভক্তেরা গিয়েছেন। তাঁদের পথে কোন বিপদ হয়েছিল বলে কোন সূত্র থেকে জানা যায় না। ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করে দেখিয়েছি যে ১৫১২ থেকে ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা-উড়িষ্যার যুদ্ধ বন্ধ ছিল। এই কারণেই প্রথম দু' বছর অর্থাৎ ১৫১৩-১৪ খ্রীষ্টাব্দে ভক্তদের উড়িষ্যায় যাওয়ার অসুবিধা হয় নি। কবিকর্ণপূরও তাঁর নাটকের অষ্টম অঙ্কে সেকথা বলেছেন। কিন্তু ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন শাহ নতুন করে উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। ঐ বছরে যে মহাপ্রভুর বাঙালী ভক্তদের নীলাচলে যাওয়া বন্ধ ছিল, তা 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মধ্যলীলা ১৬শ অধ্যায় থেকে জানা যায়। ঐ অধ্যায়ে দেখি, মহাপ্রভু বাংলাদেশ থেকে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের সময় বাংলার ভক্তদের বলছেন,

সভা সহিত ইহাঁ মোর হইল মিলন।
এ বৎসর নীলাদ্রি কেহ না করিহ গমন॥

আমাদের মনে হয় ঐ বছরে নতুন করে বাংলার সঙ্গে উড়িষ্যার যুদ্ধ বাধার দরুণই মহাপ্রভু ভক্তদের নীলাচলে যেতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু পরের বছর থেকে বাংলার ভক্তেরা আবার রথযাত্রার সময় নীলাচলে যেতে সুরু করেন এবং ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মহাপ্রভুর তিরোধান হওয়া পর্যন্ত তাঁরা মাত্র এক বছর ছাড়া আর সব কয় বছরই গিয়েছেন। (এক বছর বন্ধ ছিল—চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ১৬শ পরিচ্ছেদ, ৩৯-৪১শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।) এর থেকে মনে হয়, ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধই উড়িষ্যার সঙ্গে হোসেন শাহের শেষ যুদ্ধ; এর পর দুই দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয় এবং অন্তত ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই শান্তি অক্ষুণ্ণ ছিল।

('মাদলা পাঞ্জী'তে এক "মলিকা পাতিসা"র সঙ্গে প্রতাপরুদ্রের যুদ্ধ ও সন্ধির কথা লেখা আছে। 'কটকরাজবংশাবলী'তেও এই কথা আছে, তাতে ঐ

রাজাকে "মল্লিকান্বিতাধিপ" বলা হয়েছে। ইনি কিন্তু হোসেন শাহ নন, ইনি গোলকুণ্ডার সুলতান কুৎব্-উল্-মুল্‌ক্, তেলেগু শিলালিপিতে ইনি 'কুতমন মলিক' নামে উল্লিখিত হয়েছেন। ইনি ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে প্রতাপরুদ্রের রাজ্যের দক্ষিণদিকের অনেকখানি অংশ জয় করেন এবং মল্‌ক-পুরমে অন্যতম ঘাঁটি স্থাপন করেন। 'মাদলা পাঞ্জী'তেও লেখা আছে রাজমহেন্দ্রীতে এই রাজার সঙ্গে প্রতাপরুদ্রের যুদ্ধ হয়েছিল।)

ত্রিপুরার সঙ্গে হোসেন শাহের যুদ্ধ

হোসেন শাহের সঙ্গে ত্রিপুরারাজ ধন্যমাণিক্যেরও সংঘর্ষ হয়েছিল। ত্রিপুরার রাজাদের ইতিবৃত্ত 'রাজমালা'র মতে ধন্যমাণিক্যই প্রথম গৌড়-রাজ্য আক্রমণ করেন এবং সাফল্যলাভ করেন; তাঁর বারবার সাফল্যের কথা শুনেই ১৪৩৬ শকাব্দ বা ১৫১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন শাহ বলেন,

উড়িয়া আসাম কোচ জিনিয়া লইল।
ত্রিপুর না জিনি মোর মন দুঃখ হইল॥

সম্ভবত আসাম অভিযানে হোসেন শাহের প্রাথমিক জয়টুকুই এর আগে ঘটেছিল, পরবর্তী পরাজয় তখনও ঘটেনি। 'রাজমালা'তে হোসেন শাহ ও ধন্যমাণিক্যের সংঘর্ষ সম্বন্ধে অনেক কথা লেখা আছে। তবে এখানে একটি কথা বলা দরকার। মুদ্রিত 'রাজমালা'র সবটাই প্রাচীন বা অকৃত্রিম নয়। মহারাজা কাশীচন্দ্রমাণিক্যের (১৮২৬-৩০ খ্রীঃ) রাজত্বকালে দুর্গামণি উজীর প্রাচীন রাজমালাকে নিজের ইচ্ছামত "সংশোধন" করে যে রূপ দিয়েছিলেন, সেইটিই মুদ্রিত গ্রন্থের আদর্শ। প্রাচীন রাজমালার প্রথম খণ্ড পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ত্রিপুরারাজ ধর্মমাণিক্যের রাজত্বকালে, দ্বিতীয় খণ্ড ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অমরমাণিক্যের রাজত্বকালে, তৃতীয় খণ্ড সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে গোবিন্দমাণিক্যের রাজত্বকালে এবং চতুর্থ খণ্ড অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কৃষ্ণমাণিক্যের রাজত্বকালে রচিত হয়েছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে 'রাজমালা'র একটি পুরোনো পুঁথি (নং ২২৫৯) আছে।* দুর্গামণি

* এই পুঁথির লিপিকরের নাম পুঁথির ৪৯-খ ও ৫৫-খ পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে—'রামনারায়ণ দেব'। এই রামনারায়ণ দেবই "সন ১২০৬ তারিখ ১৮ই বৈশাখ"-এ অর্থাৎ ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ('সন' অব্দকে বঙ্গাব্দ না ধরে ত্রিপুরাব্দ ধরলে ১৮০২ খ্রীঃ হয়) 'চম্পকবিজয়' নামে একটি ঐতিহাসিক কাব্যের পুঁথির নকল সম্পূর্ণ করেছিলেন (ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা, সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১৯)। 'রাজমালা'র আলোচ্য পুঁথি এর কয়েক বছর আগে বা পরে লিপিকৃত হয়েছিল সন্দেহ নেই।

উজীরের 'রাজমালা' সংশোধনের আগেই এটি লিপিকৃত হয়েছিল। সুতরাং এই পুঁথির পাঠ অধিকতর নির্ভরযোগ্য। এই পুঁথিতে যে পাঠ পাওয়া যায়, তার সঙ্গে মুদ্রিত রাজমালার পাঠের অনেক জায়গাতেই অনৈক্য দেখা যায়। 'রাজমালা'র দ্বিতীয় খণ্ডে ধন্যমাণিক্যের বঙ্গাভিযান ও বাংলার সৈন্যবাহিনীর ত্রিপুরা-অভিযান সম্বন্ধে যা লেখা আছে, তা এই পুঁথির ১৮-২২শ পত্র থেকে উদ্ধৃত করছি,

কালক্রমে মহারাজা বলবন্ত হৈল।
বঙ্গ অধিপতি হৈব মনে ইহা কৈল ॥
গঙ্গামণ্ডল পাটীকারা মেহেরকুল নাম।
কৈলাসহর বেজোরা আদি ভানুগাছ গ্রাম ॥
বিষ্ণুজুড়ি লাঙ্গলা জিনিল অনুক্রমে।
জিনিল ইসব দেশ আপনা বিক্রমে ॥
বরদাখাত আছিল গৌড়ের অধিকারে।
নিজ বাহুবলে রাজা জিনিল তাহারে ॥
প্রতাপরায় নামে তার জমিদার ছিল।
গৌড়েতে নামিলে সেই আইসে নিজদল ॥
এহিরূপে নানা দেশ জিনিল সকল।
নিজ ছত্র তলে তাতে নামিলে খণ্ডল ॥
তবে রাজা সৈন্য দিয়া বৈসাইল থানা।
লস্কর করিল রাজা নিজ একজনা ॥
আমল করিয়া যদি সর্ব্বসৈন্য আইল।
খণ্ডলের লোকে তবে লস্কর ধরিল ॥
গৌড়রাজ্যে লৈয়া চলে বান্ধিয়া তাহারে।
কতদিনে দিল নিয়া গৌড় অধিকারে ॥
হস্তিতে মারিতে আজ্ঞা করে গৌড়েশ্বরে।
তাহাকে মারিতে নিছে বান্দিয়া জিঞ্জিরে ॥
লস্করে জানিল তবে মরণ নিশ্চয়।
একজনের হাত হতে খড়্গ কাড়ি লয় ॥
মারেন বিংশতি জন বিক্রম করিয়া।
মাহুতে টুয়াইল হস্তী অঙ্কুশ মারিয়া ॥

হাস্ত হস্ত খড়্গে কাটে মারে তরবার।
ভঙ্গ দিল সেই গজে করিয়া চিৎকার॥
তবে মহা মত্ত গজ দিল টুয়াইয়া।
দন্তেতে মারিল চোট বিক্রম করিয়া॥
ধন্য ধন্য বলি তাকে কহে সর্ব্বলোকে।
এমত বিক্রম লোক পর্ব্বতেত থাকে॥
আর চোট মারিতে খড়্গ ভাঙ্গি গেল।
পড়িয়া হস্তীর হাতে পরাণ তেজিল॥
ই কথা শুনিয়া পরে বলে গৌড়েশ্বর।
আপনার কর্ম্ম দোষে সেথানে মরিল॥
শ্রীধন্যমাণিক্য রাজা ই কথা শুনিল।
অগ্নিসম হইয়া ক্রোধে জ্বলিতে লাগিল॥
রাইকছাগ সেনাপতি পাঠাইয়া দিল।
খণ্ডলের লোকে তবে আসিয়া মিলিল॥
খণ্ডল দেশেতে ছিল দ্বাদশ বসিক।
রাজার সাক্ষাতে নিল করিয়া রসিক॥
একদিন বলে রাজা বসিকের স্থানে।
কালি তোমি সব আইস আমা বিদ্যমানে॥
সংকেত শিখাইল রাজা সব ত্রিপুরাকে।
মারিতে কহিল রাজা সবে একে একে॥
মিত্রতা করিতে আমি বলিব জখনে।
তোমরা তারার শির কাটীবা তখনে॥
আমিহ কাটীব তবে প্রধান বসিক।
আগে বসাইব মান্য করিয়া অধিক॥
ইসব মন্ত্রণা শুনি রাজসৈন্যগণে।
সুসজ্জ হইয়া আইল আপনার মনে॥
বসিক সকল আইল রাজা ভেটীবারে।
সঙ্গে দুই হাজার সেনা লৈয়া ধনুঃশরে॥
বসিয়াছে মহারাজা সিংহাসনপরে।
বসিক সকল নিয়া বৈসাইল উপরে॥

এক এক ত্রিপুরেত এক বঙ্গজন।
পংক্তিক্রমে দাঁড়াইল বন্ধুতা কারণ ॥
রাজআজ্ঞা অনুসারে দাঁড়াইল গিয়া।
ইসারাতে কৈল সেলামবাজি দিয়া ॥
প্রণাম করিতে বসিক মস্তক নামায়।
সেইকালে মারণের সময় যে পাএ ॥
প্রধানকে নরপতি আগে দিল কাটা।
পরেতে ত্রিপুরে কাটে যার যেই বাঁটা ॥
এহি মতে নাশ কৈল খণ্ডলের প্রজা।
সসৈন্য খণ্ডল দেশে গেল মহারাজা ॥
লুটীয়া কাড়িয়া সব নির্দ্ধন করিল।
তবে সে খণ্ডল দেশ আপনা হইল ॥
দেশে আইসে ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মে করে নিষ্ঠা
মঠ দিয়া ধন্যসাগর করিল প্রতিষ্ঠা ॥

* * * *

শ্রীধন্যমাণিক্য রাজা চাটীগ্রাম চলে।
চৌদ্দস পাচত্তিস শকে নিজ বাহুবলে ॥
চাটীগ্রাম বিজই বলি মোহর মারিল।
গৌড়েশ্বরের সৈন্য সব ভঙ্গ দিয়া গেল ॥
হোসন শাহা গৌড়পতি ই কথা শুনিয়া।
গৌরাই মল্লিক ভেজে বহু সৈন্য দিয়া ॥
দ্বাদশ বাঙ্গলা দিল মল্লিকের সাতে।
বহুল কটক দিল নিজে ছিল জতে ॥
বহু তর তরি বর গোমতি কারণ।
গজ বাজী বহু সাজ করিবারে রণ ॥
সাহেক মেহেরকুল আসিলেক বল।
গজ কাছে বড় নাচে পাইয়া রঙ্গস্থল ॥
কোটফাটে চোট মারে হইল আনন্দ।
রাজার প্রজার মাঝে হৈল নিরানন্দ ॥

শরে মারে ধারে কারে পড়ে রাজসেনা।
চলে বলে দলে করে চণ্ডীগড় থানা।
পাছে পাছে কাছে কাছে গেল গৌড় সেনা।
গোড়াই ভোড়াই হৈল না মারিয়া থানা॥
ছিলে খোজা দিলে বোজা বান্দিতে গোমতী।
কাটে মাটী পরিপাটী যত্ন পাইতে অতি॥
মনে করে চাকু ধরে যুক্তি কৈলে সারা।
ছিলে যদি দিলে বিধি মরিবে ত্রিপুরা॥
তিনদিন মতিহীন রাখিল গোমতী।
চারিদিনে ভাঙ্গিয়া চলয়ে বেগবতী॥
পাঠান স্থঠান নহে চাবুক লইয়া।
বারে বারে মারে ধরে কর্কশ বলিয়া॥
গুরু রোষে ভর সোষে পাঠান বর্ব্বর।
রঙ্গে নদী ভাঙ্গে বিধি কাঁপে থরথর॥
এত শুনি নৃপমণি হইয়া বিস্ময়।
মারে ধরে মনে করে শরীরে না সয়॥
রাখে প্রজা ডাকে রাজা গুরু পুরোহিত।
অরি তরে অবিচারে (অভিচারে) কার্য্য কর হিত॥
পরে তরে অবিচারে করিতে লাগিল।
গুরু সুতে বিধিমতে কর্ম্ম আরম্ভিল॥
সপ্তদিবা গুপ্ত কিবা মণ্ডপে রহিল।
যজ্ঞশেষে কুণ্ডদেশে চণ্ডাল কাটীল॥
রায় ধরে করে করে চণ্ডালের মাথা।
মলিক হলিক যথা গাড়ে নিয়া তথা॥
শর্ব্বরীতে বর্ব্বরে যে পাছে মহাভয়।
নাশিল আসিল রাজসৈন্য এহি কয়॥
রব উঠে সব লুটে গোরাই ভাজিল।
ছাড়ি কাজ বড় লাজ দূরে তলাসিল॥

কাপুরুষ না পৌরুষ তারে কেহ করে।
শুনিয়া শুনিয়া গৌড়পতি নিলে তারে ॥
কহিল সরির জেন (?) কেন তিরস্কার।
হইল কহিল তার চন্দ্রের খাঁখার ॥

* * * *

পুনরপি ধন্যমাণিক্য মহারাজা।
চাটীগ্রাম লইবারে পাঠাইলে প্রজা ॥
মারণে কাটনে ভঙ্গ দিল গৌড় সেনা।
রসাংমর্দন নারায়ণকে বৈসাইল থানা ॥
রাম্বু আদি ছত্রসীক মারিয়া লইল।
রসাঙ্গ নিকটে জাইয়া পুষ্করণি দিল ॥
রসাঙ্গ মারিতে গীয়াছিল সেনাপতি।
সেই হতে রসাঙ্গমর্দন নাম খ্যাতি ॥
রাইকছাগ রাইকছম দুই সেনাপতি।
তাহাকে ভেজিলে তথা ত্রিপুরের পতি ॥
চৌদ্দস ছত্তিস শকে চাটীগ্রামে গেল।
শুনিয়া হোসন শাহা বড় ক্রোধ হৈল ॥
উড়িয়া আসাম কোচ জিনিয়া লইল।
ত্রিপুর না জিনি মোর মন দুঃখ হইল ॥
ই বলিয়া হৈতন খাঁরে তৈনাথ (?) করিল।
করবে খাঁন পাঠানেরে তার সঙ্গে দিল ॥
রাঙ্গামাটী জিনিবারে হৈতন খাঁ চলিল।
গৌড়পতি বহু সৈন্য তার সঙ্গে দিল ॥
একশত হস্তী পঞ্চসহস্র ঘোটক।
লৈক্ষ পদাতি চলে অসংখ্য কটক ॥
দ্বাদশ বাজলা চলে হৈতন খাঁর সাতে।
বিদায় করিল দিব্য সিরপারা (শিরস্ত্রাণ ?) মাথে ॥
চলিলেক হৈতন খাঁ মহী কম্পমান।
কতদিনে উত্তরিল দেশ সন্নিধান ॥

সরালি দেশেতে সে বাঙ্গলা পথ পাইল।
কৈলাগড়ে উত্তরিয়া বিশালগড়ে আইল ॥
জামির খাঁনি গড়েতে ত্রিপুরা রহে যবে।
প্রভাতে পাঠান গেলা সেই গড়ে তবে ॥
খড়্গরায় আদি করি আছিল ত্রিপুর।
করিয়া অনেক যুদ্ধ মারিল প্রচুর ॥
মারিলেক সেই গড় হৈতন খাঁ পাঠান।
ছয়কড়িয়া গড়ে গেল রাজা বিদ্যমান ॥
গগন খাঁ নামে ছিল রাজসেনাপতি।
মহা ঘোরতর যুদ্ধ কৈল মহামতি ॥
আপ্তপরভেদ কিছু না করে বিচার।
এহিমতে ঘোর যুদ্ধ হৈল অপার ॥
তিনপ্রহর পরে যুদ্ধে গগন খাঁ ভাগীল।
হৈতন খাঁর সৈন্য মধ্যে জয়শব্দ হৈল ॥
যশপুর ছাড়ি রাজা রাঙ্গামাটী আইল।
হৈতন খাঁ সেই পথে তথাতে আসিল ॥
গঙ্গানগরেত গিয়া ডোমঘাটীর পথে।
গড় ধরি হৈতন খাঁন রহিল তথাতে ॥
এক মহা দিঘি দিল আপনার কাছে।
না খাইল গোমতীর জল বিষ মাখি দিছে ॥
সেই হেতু তুড়ুক দিঘি দেশেতে প্রচার।
শ্রীদেবমাণিক্যে তাহা করিলে প্রচার ॥
তবে মহারাজা রহে ছনগঙ্গার পারে।
আর জত সেনাপতি রহে থরে থরে ॥
ছনগঙ্গাত্রিবেগেতে দেবঘার নাম।
তার কত বাঁক নামাএ মাছিছা উপাম ॥
রাজা আইল গড়পরে চাইতে শত্রুবল।
দেখিলেক মহরস (মহারাজ ?) উচ্চ এক স্থল ॥
নিচের বাঁকেতে গৌড়কটক রাহছে।
উচ্চেতে ত্রিপুরার গড় নির্ম্মাণ করিছে ॥

বসিলেক নরপতি বৃক্ষ ছায়াতলে।
ক্রোধ হইয়া বলে রাজা ভাইন সকলে ॥
আমার দেশের লোক খাইতে ভাল পায়।
হৈতন খাঁরে এবে কেনে তোমরা না মার ॥
নৃপতির বাক্য শুনি বলাংস (বলাংশ ?) তে খণে
প্রণাম করিয়া কহে রাজা বিগুমানে ॥
মঙ্গলবারেতে আমি শুষিব গোমতী।
সপ্তদিন এহিমতে রাখিব সম্প্রতি ॥
বলাংস কথাতে নৃপতি তুষ্ট হৈল।
দুইকুলা বাহুযুগে বান্দিয়া উড়িল ॥
দুইশত উচ্চ হৈল পথের কিনারা।
উড়িয়া পড়িল মধ্যে নদী হৈল চরা ॥
উজানে চলিল ভাটী ভাটী হইল চর।
দেখিয়া গৌড়ের সৈন্য তুষ্ট হৈল বড় ॥
হোসন সাহার ভাগ্যে নদী হইল চর।
চরে জাইয়াময়া (মোরা) সবে করি বাস ঘর ॥
নদীতীরে পাথরের প্রতিমা করিয়া।
হিন্দু সবে পূজা করে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ॥
মাছিছা বসি সেই স্থান কহে সর্ব্বলোকে।
রাগে রঙ্গে গৌড় সেনা নিদ্রা যায়ে সুখে ॥
সাড় বান্দি আজ্ঞীতে সাড় বান্দিল বিস্তর।
তিন তিন পুতলা দিল সাড়ের উপর ॥
দুই দুই লুকা (উল্কা) দিল পুতলার হাতে।
হাজারে হাজারে লুকা পুতলার হাতে ॥
জল হতে বলাংস উঠিল তখনে।
মহাশব্দ করি স্রোত উঠিল গগনে ॥
হাজারে হাজারে সাড় আসিতে লাগিল।
সহস্রে সহস্রে লোক তখনে দেখীল ॥
গৌড়পতির সৈন্য সব সুখে নিদ্রা যায়ে।
সেইকালে নদী বেগে সকল ডুবায়ে ॥

হস্তি ঘোড়া উট আদি ভাসিল বেগেতে।
নির্ব্বল মনুষ্যে পারে তাতে কি করিতে ॥
জ্বলিছে আলোকা সব পুতুলা হস্তেতে।
তা দেখি বলিল ত্রিপুর আসিল মারিতে ॥
গৌড়সেনা নিকটে আছিল এক বন।
সেই কালে তাতে অগ্নি দিল একজন ॥
নানামতে শব্দ তথা বনেরে করিল।
ত্রিপুর আসিল বলি ভয় ভঙ্গ দিল ॥
সর্ব্বসৈন্য প্রলয় করিল নদীস্রোতে।
পিতাএ পুত্র না জিজ্ঞাসে ভাঙ্গে এহি মতে ॥
হৈতন খাঁ করবে খাঁ সহিতে না পারে ;
তবেহ বাজিল শেষে ঘোটক উপরে ॥
কাটীতে কাটীতে চলে ত্রিপুরার সেনা।
এক রাত্রি মধ্যে তবে লৈল চারি থানা ॥
বহু অশ্ব গজ পরে পাইল সেইখানে।
হৈতন খাঁ কটক সঙ্গে ছিল সেই স্থানে ॥
ছয়কড়িয়ার ঘাটে যাইয়া সত্য করি কয়।
এত সৈন্য আসি আমি হৈল পরাজয়।
এহার অধিক সৈন্য যে জনে পাইবা।
সে জন নির্ভয়রূপ এদেশে আসিবা ॥
এহা হতে অল্প সৈন্য যাহার নিকটে।
সত্য সত্য বলি আসি না পড় সঙ্কটে ॥
যে সব পাঠান জাতি যে মোর বান্ধব।
সৈন্য হীনে যেই আইসে সে প্রাণী গর্দ্দভ ॥
ই বলিয়া হৈতন খাঁ গৌড়ে চলি গেল।
গৌড়েশ্বরে নিষ্ঠুর বহু তাহারে বলিল ॥

এই দীর্ঘ বিবরণ থেকে ত্রিপুরার রাজা ও বাংলার রাজার সংঘর্ষের যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তাকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা চলে।

প্রথম পর্যায়ের সূচনা হয় ত্রিপুরারাজ ধন্যমাণিক্যের বাংলা-অভিযানের মধ্য দিয়ে। ধন্যমাণিক্য বাংলার সুলতানের অধীন গঙ্গামণ্ডল, পাটীকারা, মেহেরকুল,

কৈলাসহর, বেজোরা, ভানুগাছ, বিষুজুড়ি, লাঙ্গলা প্রভৃতি অঞ্চল জয় করেন এবং বরদাখাতের জমিদার প্রতাপ রায় বাংলার স্থলতানের পক্ষ ছেড়ে ত্রিপুরারাজের পক্ষে যোগদান করেন। ধন্যমাণিক্য খণ্ডল পর্যন্ত জয় করেন এবং অধিকৃত অঞ্চলে একজন লস্কর বা শাসনকর্তা নিযুক্ত করে সসৈন্যে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু খণ্ডলের লোকে সেই লস্করকে বন্দী করে গৌড়ে পাঠায়। গৌড়েশ্বর তাকে হাতীর পায়ের তলায় ফেলে বধ করতে আদেশ দেন। লস্কর একা অশেষ বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে অবশেষে হাতীর পায়ের তলায় প্রাণ দেয়। ধন্যমাণিক্য তখন তাঁর সেনাপতি রাইকছাগকে খণ্ডলে পাঠান। খণ্ডলে বারোজন বসিক ছিল, তাদের সঙ্গে কপট বন্ধুত্ব দেখিয়ে তাদের ত্রিপুরারাজের সামনে নিমন্ত্রণ করে আনা হয়। তাদের কবলের মধ্যে পেয়ে ত্রিপুরারাজ বিশ্বাসঘাতকতা করেন এবং তাঁর লোকদের সাহায্যে তাদের সবাইকে বধ করেন। বসিকরা নিহত হলে ত্রিপুরারাজ নিষ্কণ্টক হয়ে খণ্ডল দেশ অধিকার করেন এবং যথেচ্ছভাবে ঐ দেশ লুণ্ঠন করেন।

দ্বিতীয় পর্যায় সুরু হয় ১৪৩৫ শকে (১৫১৩-১৪ খ্রীঃ) ত্রিপুরারাজের চট্টগ্রাম আক্রমণ ও অধিকারের মধ্য দিয়ে। ধন্যমাণিক্য চট্টগ্রাম অধিকার করে বিজয়ের স্মারক-স্বরূপ স্বর্ণমুদ্রা বার করেন। বাংলার স্থলতান হোসেন শাহ একথা শুনে গৌরাই মল্লিক নামক একজন সেনাপতিকে বাংলার বারোটি অঞ্চল থেকে সংগৃহীত বিপুল সৈন্যবাহিনী সঙ্গে দিয়ে পাঠান। গৌরাই মল্লিক (স্পষ্টত বাংলার হৃত অঞ্চলগুলি পুনধিকার করে এবং দক্ষিণ থেকে অগ্রসর হয়ে) ত্রিপুরার মেহেরকুল অঞ্চল পর্যন্ত অধিকার করেন (মেহেরকুল গোমতী নদীর খানিকটা দক্ষিণে অবস্থিত)। ত্রিপুরারাজের সৈন্যেরা তখন চণ্ডীগড় দুর্গে আশ্রয় নেয় (চণ্ডীগড় গোমতী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত)। গৌরাই মল্লিক এই দুর্গ জয় করতে অসমর্থ হলেন। তখন তিনি চণ্ডীগড় দুর্গের পাশ কাটিয়ে সামান্য অগ্রসর হয়ে ("পাছে পাছে কাছে কাছে গেল গৌড় সেনা") গোমতী নদীর উপরের দিক দখল করলেন। অবশেষে ছিলে নামক একজন খোজার বুদ্ধিতে গৌরাই মল্লিক বাঁধ দিয়ে গোমতী নদীর জল অবরুদ্ধ করলেন এবং তিনদিন বাদে সেই জল ছেড়ে দিলেন। তার ফলে জল নদীর পাড় ভেঙে দেশ ভাসিয়ে ফেলে ত্রিপুরার বিপর্যয় ঘটাল। ত্রিপুরারাজ এই বিপদ থেকে মুক্তি পাবার জন্য পুরোহিতকে দিয়ে অভিচার অনুষ্ঠান করালেন। এই অভিচার অনুষ্ঠানে এক চণ্ডালকে বলি দিয়ে তার

মাথা গৌরাই মল্লিকের ঘাঁটিতে পুঁতে আসা হল। তার ফলে সেই রাত্রে গৌরাই মল্লিকের বাহিনী অযথা—ত্রিপুরার সৈন্তেরা আসছে মনে করে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল এবং সেনাপতিসমেত সমস্ত বাহিনী সেই অঞ্চল ছেড়ে পালিয়ে গেল। হোসেন শাহ গৌরাই মল্লিককে ডাকিয়ে এনে তিরস্কার করলেন।

তৃতীয় পর্যায় শুরু হয় ধন্তমাণিক্যের চট্টগ্রাম পুনরধিকার-প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে। তাঁর সেনাপতি "রসাঙ্গমর্দন" নারায়ণ বাংলার রামু প্রভৃতি অঞ্চল জয় করলেন এবং ঘাঁটি আগলাতে লাগলেন। ১৪৩৬ শকে (১৫১৪-১৫ খ্রীঃ) ধন্তমাণিক্যের রাইকছাগ এবং রাইকছম নামে দু'জন সেনাপতি চট্টগ্রাম জয় করলেন। এ খবর শুনে হোসেন শাহ ক্রুদ্ধ হয়ে হৈতন খাঁ নামক একজন সেনাপতিকে বিপুল সৈন্যবাহিনী দিয়ে ও করবে খাঁ নামে একজন পাঠানকে তাঁর সঙ্গে সহকারীরূপে দিয়ে পাঠালেন। হৈতন খাঁ সাফল্যের সঙ্গে অগ্রসর হতে লাগলেন। ত্রিপুরার সরালি, কৈলাগড়, বিশালগড় প্রভৃতি হৈতন খাঁ জয় করলেন। ত্রিপুরার সৈন্তেরা জামির খাঁনি গড়ে ছিল, তার অধ্যক্ষ খড়্গ রায় অনেক যুদ্ধ করলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হৈতন খাঁ গড় জয় করলেন। তারপরে তিনি ছয়কড়িয়া গড় আক্রমণ করলেন। এই গড়ে ত্রিপুরার রাজা ছিলেন। এই গড়ের সেনাপতি গগন খাঁ বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করে তিন প্রহর পরে রণে ভঙ্গ দিলেন। এই গড়ও হৈতন খাঁ জয় করাতে রাজা যশপুর ছেড়ে রাঙ্গামাটি চলে গেলেন। হৈতন খাঁ তাঁর পিছু পিছু ধাওয়া করে গঙ্গানগরে গেলেন এবং ডোমঘাটীর পথে এক দুর্গ জয় করে সেখানে অবস্থান করতে লাগলেন। গোমতীর জলে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে হৈতন খাঁ নিজেদের ব্যবহারের জন্য একটি নতুন দিঘি কাটালেন, সেটি "তুড়ুক দিঘি" নামে পরিচিত হল। ধন্তমাণিক্য তাঁর সেনাপতিদের নিয়ে ছনগঙ্গা নদীর ওপারে অবস্থান করছিলেন। ঐ নদীর অনেকগুলি বাঁক। উপরের দিকের দেবদ্বার বাঁকে ত্রিপুরার দুর্গ এবং তার কিছু দূরে নীচের মাছিছা বাঁকে বাংলার সৈন্তেরা ছিল। ধন্তমাণিক্য শত্রুবল পর্যবেক্ষণ করে ডাইনীদের ডেকে বললেন কেন তারা শত্রুদের ধ্বংস করছে না। ডাইনীরা বলল তারা জলবায় গোমতী শোষণ করবে এবং সাতদিন এইভাবে রাখবে। অতঃপর ডাইনীরা নদীর জল শোষণ করে তাতে চড়া বার করে দিল। এখানে 'রাজমালা'র বর্ণনায় নানা অলৌকিক উপাদান প্রবেশ করেছে। যতদূর

মনে হয়, ত্রিপুরারাজের লোকেরা স্বাভাবিকভাবে গোমতীর জল বাঁধ দিয়ে আটকে রেখেছিল। অতঃপর ত্রিপুরার লোকেরা গোমতীতে বহু ভেলা ভাসাল, প্রতি ভেলায় তিনটি করে পুতুল এবং প্রতি পুতুলের হাতে দুটি করে উল্কা বা জ্বলন্ত মশাল ছিল। গোমতীর জলও ছেড়ে দেওয়া হল। তখন সমস্ত ভেলা বাংলার সৈন্যেরা যেখানে ছিল, সেইদিকে আসতে লাগল, ভেলার উপরে পুতুলগুলির হাতে আগুন জ্বলছিল, তাই দেখে বাংলার সৈন্যেরা ভাবল ত্রিপুরার সৈন্যেরা আসছে। এদিকে নদীর অর্গলমুক্ত জলধারা তাদের হাতী, ঘোড়া, উট সমস্ত ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তাছাড়া বাংলার সৈন্যবাহিনীর ঘাঁটির কাছে একটি বন ছিল, ত্রিপুরা-রাজ্যের একজন লোক তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। এই সমস্ত অপ্রত্যাশিত বিপদের ফলে বাংলার সৈন্যবাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে গেল। হৈতন খাঁ ও করবে খাঁ এই বিপর্যয় রোধ করতে না পেরে ঘোড়ায় চড়ে পালালেন। ত্রিপুরার সৈন্যবাহিনী তাঁদের পিছনে ধাওয়া করে তাঁদের বহু সৈন্যকে বধ করল এবং এক রাত্রেই তাঁদের চারটি ঘাঁটি জয় করে বহু হাতী-ঘোড়া অধিকার করল। অবশেষে ছয়কড়িয়ার ঘাঁটিতে পৌছে হৈতন খাঁ কম সৈন্য নিয়ে আসার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। হৈতন খাঁ গৌড়ে ফিরে গেলে গৌড়েশ্বর তাঁকে অনেক নিষ্ঠুর বাক্য বললেন।

এখন প্রশ্ন এই যে, 'রাজমালা'র এই বিবরণ কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য? এর মধ্যে এই খবর পাওয়া যায় যে প্রথম পর্যায়ে ধন্যমাণিক্যই জয়যুক্ত হন এবং তিনি খণ্ডল পর্যন্ত বাংলাদেশের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল অধিকার করে নেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে ধন্যমাণিক্য চট্টগ্রাম পর্যন্ত জয় করেন, কিন্তু প্রতিপক্ষের আক্রমণে তাঁকে পূর্বাধিকৃত সমস্ত অঞ্চল হারাতে হয় এবং গৌড়েশ্বরের সেনাপতি গৌরাই মল্লিক গোমতী নদীর তীরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত উপনীত হন। অবশেষে অভিচার অনুষ্ঠানের দ্বারা ত্রিপুরারাজ বাংলার সৈন্যদের বিতাড়িত করেন। তৃতীয় পর্যায়ে ধন্যমাণিক্য আবার পূর্বাধিকৃত অঞ্চলগু'ল অধিকার করেন। কিন্তু এইবারও গৌড়েশ্বরের সেনাপতি হৈতন খাঁ তাঁকে বিতাড়িত করে পিছু পিছু তাড়া করে যান এবং গোমতী নদীর তীরবর্তী মাছিছা পর্যন্ত অঞ্চল অধিকার করেন। এইবার ডাইনীদের সাহায্য নিয়ে এবং বাংলার সৈন্যদের বোকা বানিয়ে ধন্যমাণিক্য তাদের বিতাড়িত করেন। কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে যে ত্রিপুরারাজ এই সময় মাত্র ছয়কড়িয়া পর্যন্ত অঞ্চল পুনরধিকার করতে পেরেছিলেন।

ধন্যমাণিক্য অভিচারের দ্বারা গৌরাই মল্লিককে এবং ডাইনীদের সাহায্যে

হৈতন খাঁকে বিতাড়িত করেছিলেন বলে আমি বিশ্বাস করি না। এ সমস্ত অলৌকিক কাণ্ড ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে গ্রাহ্য হতে পারে না। এগুলিকে অবিশ্বাস করে উল্লিখিত বিবরণের বাকী অংশকে সত্য বলে গ্রহণ করলে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে গৌরাই মল্লিক ধন্যমাণিক্যের কাছে পরাজয়বরণ করেন নি ; তিনি গোমতী নদীর তীর পর্যন্ত অঞ্চল অধিকার করেন এবং গোমতী নদীর জল প্রথমে রুদ্ধ ও পরে মুক্ত করে ত্রিপুরারাজের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটান। হৈতন খাঁও সম্পূর্ণ পরাজয় বরণ করেননি, কিন্তু এইবার ত্রিপুরা-রাজ প্রথমে গোমতীর জল রুদ্ধ ও পরে মুক্ত করে তাঁকে খানিকটা বিপদে ফেলেছিলেন।

গোমতী নদীকে দুই পক্ষ এইভাবে শত্রুদের অসুবিধায় ফেলার জন্য ব্যবহার করেছে—এতে অস্বাভাবিক বা অবিশ্বাস্য কিছু নেই। প্রথমবার গোমতী গৌড়েশ্বরের সেনাপতির আয়ত্তে ছিল, দ্বিতীয়বার ত্রিপুরারাজের। এরও কারণ খুব সুস্পষ্ট। প্রথমবার গৌরাই মল্লিক মেহেরকুলের পথে অগ্রসর হয়ে চণ্ডীগড় দুর্গের পাশ কাটিয়ে গিয়ে ('রাজমালা'য় লেখা আছে 'চণ্ডীগড়' দুর্গের "পাছে পাছে কাছে কাছে গেল গৌড় সেনা") গোমতী নদীর উপর দিক দখল করেছিলেন, ত্রিপুরারাজের সৈন্যেরা নীচের দিকে থাকায় নদীতে বাঁধ দিয়ে পরে বাঁধ খুলে তাদের ডোবাতে অসুবিধা হয় নি। দ্বিতীয়বার কিন্তু হৈতন খাঁ কৈলাগড়, বিশালগড়, জামিরখাঁনি গড়, ছয়কড়িয়া গড় ও গঙ্গানগরের পথ দিয়ে গিয়ে গোমতী নদীর নীচের দিক দখল করেছিলেন, উপরের অংশ ছিল ধন্যমাণিক্যের দখলে। তাই এবার ধন্যমাণিক্যের পক্ষে হৈতন খাঁর বিপর্যয় সাধনের জন্য গোমতী নদীকে ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছিল।

আর একটা কথা। 'রাজমালা'র মুদ্রিত সংস্করণে ধন্যমাণিক্য-হোসেন শাহের সংঘর্ষের বিবরণ যেভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তার থেকে ধারণা হয় যে গৌরাই মল্লিক ও হৈতন খাঁ দুজনেরই আক্রমণের সময় ত্রিপুরারাজ গোমতী নদীতে বাঁধ দিয়ে ও বাঁধ খুলে শত্রুপক্ষের বিপর্যয় ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু তা যে ঠিক্ নয়, উপরের উদ্ধৃতি ও আলোচনা থেকে তা স্পষ্টই বোঝা যাবে। ঐ ভ্রান্ত ধারণার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন গবেষক যে সমস্ত জল্পনা-কল্পনা করেছেন, সেগুলি সম্বন্ধেও আলোচনার স্বতই কোন প্রয়োজন নেই।

অলৌকিক অংশ বাদ দিলে রাজমালা-বর্ণিত হোসেন শাহ-ধন্যমাণিক্য সংঘর্ষের বিবরণ মূলত সত্য বলেই মনে হয়। সুতরাং ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই

যে, ধন্যমাণিক্য একবার বাংলার চট্টগ্রাম পর্যন্ত দখল করলেন, কিন্তু তারপরেই বাংলার সেনাপতি তাঁকে বিতাড়িত করে তাঁরই রাজ্যের গোমতী-তীরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত জয় করে নিলেন। এর কিছুদিন পরে আবার ধন্যমাণিক্য চট্টগ্রাম অবধি জয় করলেন, কিন্তু এবারও বাংলার সেনাপতি তাঁকে ঠেলে নিয়ে গিয়ে গোমতী নদী পর্যন্ত অঞ্চল অধিকার করলেন এবং তার পরে খানিকটা পিছু হটে ছয়কড়িয়ায় এসে ঘাঁটি গাড়লেন। সুতরাং ত্রিপুরার ছয়কড়িয়া পর্যন্ত অঞ্চল যে শেষ অবধি হোসেন শাহেরই অধিকারে ছিল, সে সম্বন্ধে 'রাজমালা'র মধ্যে স্বীকারোক্তি পাওয়া যাচ্ছে। ধন্যমাণিক্য ১৪৩৫ শকাব্দে চট্টগ্রাম জয় করেছিলেন, 'রাজমালা'র এই উক্তি সত্য; কারণ ধন্যমাণিক্যের ১৪৩৫ শকাব্দে উৎকীর্ণ এবং "চাটিগ্রামজয়ি" উপাধি সংবলিত কতকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে (সা. প. প, ১৩৫৪, পৃঃ ২৬ দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু 'রাজমালা'য় হোসেন শাহ-ধন্যমাণিক্যের সংঘর্ষের সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হয়নি। অন্যান্য সূত্রের সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করলে তা বোঝা যাবে।

প্রথমত, 'রাজমালা'র বিবরণ অনুযায়ী ১৪৩৫ শকাব্দ বা ১৫১৩-১৪ খ্রীষ্টাব্দের আগে ধন্যমাণিক্য বাংলাদেশে অভিযান করে খণ্ডল পর্যন্ত অধিকার করে নেন। এর আগে বাংলার সুলতানের সঙ্গে ত্রিপুরারাজের কোন বিরোধ ছিল বলে 'রাজমালা'য় লেখা নেই। এরপর 'রাজমালা'য় লেখা হয়েছে ১৪৩৫ শক বা ১৫১৩-১৪ খ্রীষ্টাব্দে ধন্যমাণিক্য চট্টগ্রাম জয় করার পরে হোসেন শাহ প্রথম ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। কিন্তু হোসেন শাহ যে ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই ত্রিপুরার অন্তত একাংশ অধিকার করেছিলেন, তার প্রমাণ আছে। সোনারগাঁও অঞ্চলের একটি মসজিদে ৯১৯ হিজিরার ২রা রবী-উস্-সানি বা ৭ই জুন, ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ একটি শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে। এতে তৎকালীন রাজা হিসাবে হোসেন শাহের নাম আছে এবং এর নির্মাতা খওয়াস খান ত্রিপুরা রাজ্যের "সর-এ-লস্কর" ও মুয়াজ্জমাবাদের "উজীর" বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। এর থেকে বোঝা যায়, ঐ তারিখের বেশ কিছুদিন আগেই হোসেন শাহের সৈন্যবাহিনী ত্রিপুরায় অভিযান করে তার খানিকটা অংশ অধিকার করে। সম্ভবত ধন্যমাণিক্যের ১৪৩৫ শকাব্দের আগে খণ্ডল অবধি জয় এবং ১৪৩৫ শকে চট্টগ্রাম অধিকার—এর মাঝখানে হোসেন শাহের এই ত্রিপুরা আক্রমণ ও তার অংশবিশেষ অধিকার ঘটেছিল। হোসেন শাহের অধীনস্থ চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খান এবং তাঁর পুত্র ছুটি খান

(প্রকৃত নাম নসরৎ খান) যে দু'টি মহাভারত লিখিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে উল্লিখিত হয়েছে যে হোসেন শাহের কাছে ত্রিপুরারাজ পরাস্ত হয়েছিলেন। পরাগল খানের আজ্ঞায় লিখিত কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতে লেখা রয়েছে,

সুলতান হোসেন সাহা পঞ্চগৌড়নাথ।
ত্রিপুরার দ্বার সমর্পিল যার হাথ॥

আর ছুটি খানের আজ্ঞায় লেখানো শ্রীকর নন্দীর মহাভারতে রয়েছে,

তান এক সেনাপতি লস্কর ছুটি খান।
ত্রিপুরা গড়েত গিয়া করিল সন্নিধান॥
... ...
ত্রিপুর নৃপতি যার ডরে এড়ে দেশ।
পর্বত গহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ॥
গজবাজী কর দিয়া করিল সম্মান।
মহাবনমধ্যে তার পুরীর নির্ম্মাণ॥
অদ্যাপি অভয় না দিল মহামতি।*
তথাপি (অদ্যাপি?) আতঙ্কে বৈসে ত্রিপুর নৃপতি॥*

এই দুই কবির বিবরণ, বিশেষ ভাবে শ্রীকর নন্দীর বিবরণে বিশ্বাস করলে বলতে হয় যে ছুটি খানের নেতৃত্বে হোসেন শাহের সৈন্যবাহিনী ত্রিপুরারাজকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে রাজ্যের এক বৃহদংশ অধিকার করেছিল। কিন্তু 'রাজমালা'য় ত্রিপুরারাজের এত শোচনীয় কোন পরাজয়ের উল্লেখ নেই এবং তাতে ছুটি খানের নামও নেই। 'রাজমালা'র মতে হোসেন শাহের সঙ্গে ধন্যমাণিক্যের শেষ সংঘর্ষ ১৪৩৬ শকাব্দ বা ১৫১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দে ঘটেছিল। কবীন্দ্রের মহাভারত ১৫০০ খ্রীঃর কিছু পরে এবং শ্রীকর নন্দীর মহাভারত তারও কয়েক বছর পরে রচিত হয় (প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম, পৃঃ ১২৬ দ্রঃ)। ছুটি খানের ত্রিপুরা-অভিযান সম্বন্ধে শ্রীকর নন্দীর বিবরণ সত্য হলে বলতে হবে যে 'রাজমালা'য় বর্ণিত যুদ্ধগুলি বাদেও ছুটি খানের

* এই দুই ছত্রের পাঠান্তর,

যদ্যপি অভয় দিল খান মহামতি।
তথাপি আতঙ্কে বৈসে ত্রিপুর নৃপতি॥

এই পাঠ ঠিক হলে বলতে হবে, শ্রীকর নন্দীর মহাভারত রচনার সময়ে বাংলার সুলতান ও ত্রিপুরার রাজার মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়েছিল।

সেনাপতিত্বে বাংলার সৈন্যবাহিনী ত্রিপুরায় আর একবার অভিযান করেছিল, এবং ধন্যমাণিক্যকে পরাজিত করে ঐ রাজ্যের বৃহদংশ অধিকার করেছিল।

অবশ্য এখানে একটা কথা আছে। শ্রীকর নন্দীর মহাভারত হোসেন শাহের আমলে রচিত হয়েছিল, না তাঁর পুত্র নসরৎ শাহের রাজত্বকালে রচিত হয়েছিল, তা সঠিকভাবে বলা যায় না। শ্রীকর নন্দীর মহাভারতের কোন কোন পুঁথিতে তৎকালীন রাজার নাম এইভাবে উল্লিখিত হয়েছে,

নসরৎ শাহ তাত অতি মহারাজা।
রামবৎ নিত্য পালে সব প্রজা॥
নৃপতি হুসেন শাহ হএ ক্ষিতিপতি।
সামদানদণ্ডভেদে পালে বসুমতী॥

আবার কোন কোন পুঁথিতে আছে,

নসরৎ শাহ নাম অতি মহারাজা।
পুত্রসম রক্ষা করে সকল পরজা॥
নৃপতি হুসন শাহ তনয় সুমতি।
সামদানদণ্ডভেদে পালে বসুমতী॥

আমার মনে হয়, শ্রীকর নন্দীর মহাভারত রচনার সময় হোসেন শাহই বাংলার সুলতান ছিলেন, তখন শ্রীকর নন্দী প্রথম প্রশস্তিটি লিখেছিলেন। পরে হোসেন শাহ যখন পরলোকগমন করেন এবং নসরৎ শাহ রাজা হন, তখন তিনি সেটি পরিবর্তিত করে দ্বিতীয় প্রশস্তিতে দাঁড় করান।* এই অনুমান যদি সত্য হয়, তাহলে শ্রীকর নন্দীর "ত্রিপুরা-জয়" নিশ্চয়ই হোসেন শাহের রাজত্বকালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু যদি শ্রীকর নন্দীর মহাভারত নসরৎ শাহের রাজত্বকালেই রচিত হয়ে থাকে, তাহলে প্রশ্ন উঠবে—ছুটি খান কার রাজত্বকালে "ত্রিপুরা-জয়" করেছিলেন, হোসেন শাহ না নসরৎ শাহ? হোসেন শাহের রাজত্বকালেই করার সম্ভাবনা অবশ্য বেশী, কারণ হোসেন শাহের

* সে যুগে কবিদের মধ্যে এই রীতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর বিখ্যাত গ্রন্থকার জগন্নাথ পণ্ডিত শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশুকোর প্রশস্তি করে 'জগদাভরণম্' নামে একটি কাব্য লেখেন। দারার মৃত্যুর পরে জগন্নাথ ঐ কাব্যটিকে 'প্রাণাভরণম্' নাম দিয়ে কোচবিহারের মহারাজা প্রাণনারায়ণের প্রশস্তিতে দাঁড় করান এবং দারার জায়গায় প্রাণনারায়ণের নাম বসান।

আমলেই বাংলার সঙ্গে ত্রিপুরার সংঘর্ষের সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু নসরৎ শাহের রাজত্বকালেও যে বাংলার সঙ্গে ত্রিপুরার যুদ্ধ চলেছিল, তার প্রমাণ আছে। সে সম্বন্ধে আমরা পরে যথাস্থানে আলোচনা করব।

যা হোক্, ছুটি খানের "ত্রিপুরা-জয়" সম্বন্ধে শ্রীকর নন্দী যা লিখেছেন, তা আক্ষরিকভাবে সত্য বলে আমাদের মনে হয় না। আমাদের মনে হয়, হোসেন শাহ ত্রিপুরায় যে সব অভিযান প্রেরণ করেছিলেন, তাদের কোন একটিতে অন্যান্য সেনাপতিদের সঙ্গে ছুটি খানও ছিলেন এবং ঐ অভিযানে তিনি কতকটা বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন ; এইটুকুই সত্য ঘটনা, শ্রীকর নন্দী একেই অতিরঞ্জিত করে পূর্বোদ্ধৃত বিবরণ রচনা করেছেন।

আরাকানের সঙ্গে হোসেন শাহের সংঘর্ষ

'রাজমালা'য় লেখা আছে, ত্রিপুরারাজ ধন্যমাণিক্য ছ'বার চট্টগ্রাম জয় করেছিলেন—একবার ১৫১৩-১৪ খ্রীষ্টাব্দে, আর একবার ১৫১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দে ; কিন্তু ছ'বারই চট্টগ্রামে ত্রিপুরারাজের অধিকার খুব স্বল্পকাল স্থায়ী হয়েছিল। পর্তুগীজ বণিক জোআঁ-দে-সিলভেরা ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রাম বন্দরে এসে দেখেছিলেন ঐ শহর বাংলার রাজার অধিকারভুক্ত ; একথা জোআঁ-দে-বারোস-এর Da Asia এবং অন্যান্য পর্তুগীজ গ্রন্থ থেকে জানা যায়। স্থানীয় প্রবাদ, আরাকান দেশের ইতিহাস এবং 'রাজমালা'র সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, চট্টগ্রামের অধিকার নিয়ে গৌড়, ত্রিপুরা ও আরাকানের রাজাদের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ হত। চট্টগ্রাম অঞ্চলে এই মর্মে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে মগেরা হোসেন শাহের রাজত্বকালে চট্টগ্রাম অধিকার করেছিল। ঐ সময় হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহের নেতৃত্বে বাংলার সৈন্যবাহিনী মগদের বিতাড়িত করে চট্টগ্রাম অধিকার করে—মৌলভী হামিদুল্লাহ্ খান তাঁর 'তারিখ-ই-হামিদী'(১৮৭১) বইয়ে এই কথা লিখেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, চট্টগ্রামবাসী সমসাময়িক কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতে এবিষয়ে কোন কিছু লেখা নেই। এতে পরাগল খান সম্বন্ধে এই কথাগুলি লেখা আছে,

নৃপতি হুসেন শাহ গৌড়ের ঈশ্বর।
তান এক সেনাপতি হওন্ত লস্কর॥
লস্কর পরাগল খান মহামতি।
সুবর্ণ বসন পাইল অশ্ব বায়ুগতি॥

লস্করী বিষয় পাই আইবন্ত চলিয়া।
চাটিগ্রামে চলি আইল হরষিত হৈয়া॥
পুত্রপৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি।
পুরাণ শুনন্ত নিতি হরষিত মতি॥

এতে শুধুমাত্র বলা হয়েছে, বাংলার সুলতান হোসেন শাহ্ পরাগল খানকে চট্টগ্রাম অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন; হোসেন শাহ্ যে শত্রুর কাছ থেকে চট্টগ্রাম জয় করেছিলেন, এরকম কথার কোন ইঙ্গিত কবীন্দ্র পরমেশ্বর বা শ্রীকর নন্দী কোথাও দেন নি। তাছাড়া ১৩৯৭ থেকে ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে চট্টগ্রাম যে অধিকাংশ সময় বাংলার রাজারই অধিকারে ছিল, এ কথা সমসাময়িক শিলালিপি, সাহিত্য ও বিদেশীদের ভ্রমণ-বিবরণী থেকে জানা যায়। ৮০০ হিজরা বা ১৩৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বিহারের দরবেশ মুজাফফর শামস্ বল্খি যখন চট্টগ্রাম বন্দর থেকে জাহাজে চড়ে মক্কা অভিমুখে রওনা হন, তখন চট্টগ্রাম বাংলার সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, একথা গিয়াসুদ্দীনকে লেখা মুজাফফর শামস্ বল্খির চিঠি থেকে জানা যায়। (Proceedings of the 19th Session of Indian History Congress, 1959, pp. 217-220 দ্রষ্টব্য।) ১৪০৯, ১৪১২ ও ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে চীন থেকে তিন দল রাজপ্রতিনিধি বাংলার তৎকালীন রাজধানী পাণ্ডুয়ায় এসেছিলেন। প্রথম দুই দলের সফরের বর্ণনা দিয়েছেন এই দুই দলের সদস্য মা-হোয়ান তাঁর 'য়িং-য়া-শুং-লান'এ এবং তৃতীয় দলের সফরের বর্ণনা দিয়েছেন ফেই-শিন তাঁর 'শিং-ছা-শুং-লান'এ। দুজনেরই লেখা থেকে জানা যায় যে চট্টগ্রাম ঐ সময় বাংলার রাজার অধিকারে ছিল এবং চীনা রাজপ্রতিনিধিরা এই বন্দরেই প্রথম অবতরণ করেছিলেন। ১৪১৭ ও ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দেও চট্টগ্রাম গৌড়ের রাজার অধিকারে ছিল, কারণ ১৩৩৯ ও ১৩৪০ শকাব্দে দনুজমর্দনদেব ও মহেন্দ্রদেবের মুদ্রা 'চাটিগ্রামে'র টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ হয়েছিল। সুলতান জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের (১৪১৫-১৬, ১৪১৮-৩৩ খ্রীঃ) অনেক মুদ্রাও চট্টগ্রামের টাকশালে তৈরী। অবশ্য আরাকানী কিংবদন্তী অনুসারে আরাকানরাজ মেং-খরি (১৪৩৪-৫৯ খ্রীঃ) চট্টগ্রামের 'রামু' নামক অঞ্চল জয় করেছিলেন এবং তাঁর পুত্র ও পরবর্তী রাজা বসোআহ্‌প্যু (১৪৫৯-৮২ খ্রীঃ) চট্টগ্রাম শহর জয় করেছিলেন। একথা যদি সত্য হয়, তাহলে বলতে হবে চট্টগ্রামে আরাকান-রাজের অধিকার দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। কারণ রাস্তি খান কর্তৃক নির্মিত চট্টগ্রামের

একটি মসজিদের ৮৭৮ হিজরার ২৫শে রমজান তারিখের শিলালিপি থেকে জানা যায়, চট্টগ্রাম ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রুকনুদ্দীন বারবক শাহের শাসনাধীন ছিল। ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামে বাংলার রাজার অধিকার সম্বন্ধে তো জোআঁ-দে-সিল্‌ভেরার সাক্ষ্য আছে।

ডঃ হবিবুল্লাহ্‌ লিখেছেন, "According to Rajmala,…the Arakanese king took advantage of Husain's pre-occupation with Tipperah and occupied Chittagong." (History of Bengal, D. U., Vol. II, pp. 149-50) কিন্তু 'রাজমালা'র ধন্যমাণিক্যখণ্ডে ঠিক এই কথা পাওয়া যায় না, তাতে লেখা আছে,

পুনরপি ধন্যমাণিক্য মহারাজা।
চাটীগ্রাম লইবারে পাঠাইলে প্রজা॥
মারণে কাটনে ভঙ্গ দিল গৌড় সেনা।
রসাংমর্দন নারায়ণকে বৈসাইল থানা॥
রাম্বু আদি ছত্রসীক মারিয়া লইল।
রসাঙ্গ নিকটে জাইয়া পুষ্করণি দিল॥
রসাঙ্গ মারিতে গীয়াছিল সেনাপতি।
সেই হতে রসাঙ্গমর্দন নাম খ্যাতি॥

উপরে উদ্ধৃত পাঠ সাহিত্য-পরিষদের পুঁথির। মুদ্রিত গ্রন্থে অংশটির পাঠ এই,

গৌড়াই মল্লিক ভঙ্গ দিল যুদ্ধ হৈতে।
শ্রীধন্যমাণিক্য চলে চাটিগ্রাম লৈতে॥
চাটিগ্রাম হতে ভঙ্গ দিল গৌড় সেনা।
রসাঙ্গমর্দন নারায়ণকে বসাইল থানা॥
রাম্বু ছত্রসিক রাজা আমল করিল।
রসাঙ্গ জিনিয়া কিল্লা পুষ্কর্ণী খনিল॥
নিজ রসাঙ্গ লৈতে নারে সেনাপতি।
রসাঙ্গমর্দন নারায়ণ তার হৈল খ্যাতি॥

কোন পাঠেই আরাকান বা রসাঙ্গের রাজার চট্টগ্রাম অধিকারের কথা পাওয়া যায় না। আলোচ্য অংশে শুধু বলা হয়েছে, ত্রিপুরারাজের জনৈক সেনাপতি রসাঙ্গ আক্রমণ করে রসাঙ্গমর্দন উপাধি পেয়েছিলেন। যাহোক্‌, উদ্ধৃত অংশে ত্রিপুরারাজের সেনাপতি কর্তৃক রামু (রাম্বু) অধিকারের কথা আছে। ইতি-

পূর্বে আমরা দেখে এসেছি যে আরাকানী কিংবদন্তীর মতে আরাকানরাজ মেং-খরি (১৪৩৪-৫৯ খ্রীঃ) বাংলার রাজার অধিকারভুক্ত রামু অঞ্চল জয় করেছিলেন। এখন 'রাজমালা'র মতে ত্রিপুরার রাজা এই অঞ্চল জয় করলেন। আসলে এই অঞ্চলটি ছিল তিন রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত, তাই এটি এক এক সময় এক এক রাজ্যের অধিকারভুক্ত হত। হোসেন শাহের আক্রমণে ধন্য-মাণিক্যের পশ্চাদপসরণের সময় আরাকান-রাজ চট্টগ্রাম অধিকার করুন বা না করুন, এই জাতীয় সীমান্তবর্তী কিছু অঞ্চল অধিকার করেছিলেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ অল্প।

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত (পৃঃ ১৬-৩২) এক প্রবন্ধে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে "রামের অভিষেক" রচয়িতা কবি ভবানীনাথের পৃষ্ঠপোষক রাজা জয়চন্দ (১) চক্রশালা নামক স্থানের রাজা ছিলেন ও (২) তিনি জাতিতে মগ ছিলেন এবং ১৪৮২ থেকে ১৫১৩ খ্রীঃ পর্যন্ত চট্টগ্রাম তাঁর অধিকারে ছিল। দীনেশবাবুর প্রথম সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ না থাকলেও দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের বিশেষ কোন ভিত্তি নেই। জয়চন্দ যে জাতিতে মগ ছিলেন, স্বাধীন রাজা ছিলেন, এবং ঠিক ঐ সময়েই বর্তমান ছিলেন, তা জোর করে বলবার মত কোন কারণ নেই।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকলেও, আরাকানের মগদের সাময়িকভাবে চট্টগ্রাম অধিকারের প্রবাদ সত্য বলে মনে হয়। কারণ জোআঁ-দে-বারোস-এর Da Asia গ্রন্থে লেখা আছে যে, ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন পর্তুগীজ বণিক জোআঁ-দে-সিলভেরা চট্টগ্রাম বন্দরে অবতরণ করতে না পেরে আরাকান অভিমুখে রওনা হন, তখন আরাকানের রাজা বাংলার রাজার প্রজা ছিলেন। এই মূল্যবান তথ্যটি পূর্বোক্ত প্রবাদের সমর্থন জোগাচ্ছে। ইতিপূর্বে আরাকানরাজ মেং-সোআ-মৃউন্ ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সুলতান জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের অধীনতা স্বীকার করে তাঁর সামন্ত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর পরবর্তী রাজারা বাংলার অধীনতা অস্বীকার করেন, উপরন্তু বাংলাদেশে অভিযান চালিয়ে তার অংশবিশেষ অধিকার পর্যন্ত করেন। এ অবস্থায় ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন আরাকানরাজ আবার বাংলার সুলতানের সামন্তে পরিণত হয়েছিলেন বলে জানা যাচ্ছে, তখন মাঝে কোন এক সময় যে বাংলার রাজার সঙ্গে যুদ্ধে আরাকানরাজের পরাজয় ঘটেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এর থেকে মনে হয়, এইভাবে ঘটনাগুলি যথাক্রমে সংঘটিত হয়েছিল—আরাকানরাজের চট্টগ্রাম অধিকার, তাঁকে উচ্ছেদের

জন্ম হোসেন শাহের সৈন্যবাহিনী প্রেরণ, তাদের হাতে আরাকানরাজের উচ্ছেদ এবং যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে তাঁর বাংলার রাজার সামন্তে পরিণত হওয়া। ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দের আগেই এই ব্যাপারগুলি ঘটেছিল।

ত্রিহুত ও বিহারে হোসেন শাহের অভিযান

ইতিপূর্বে আমরা হোসেন শাহের কামতাপুর-কামরূপ অভিযান সম্বন্ধে আলোচনা করার সময়ে দেখাবার চেষ্টা করেছি যে হোসেন শাহ ত্রিহুতের অন্তত কতকাংশ জয় করেছিলেন। কিন্তু কীভাবে এবং কবে জয় করেছিলেন, বর্তমানে তা বলবার কোন উপায় নেই।

বিহারে হোসেন শাহের রাজ্য অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। অবশ্য বিহারের মুঙ্গের ও ভাগলপুর জেলায় তাঁর পূর্ববর্তী সুলতানদের মধ্যে কারও কারও শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু হোসেন শাহের শিলালিপি পাটনা জেলায়, এমন কি বিহারের পশ্চিম প্রান্তের সারণ জেলাতেও পাওয়া গিয়েছে। বর্তমান বিহার প্রদেশের অধিকাংশই হোসেন শাহের রাজ্যভুক্ত হয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কেমন করে হোসেন শাহ বিহারের এই সমস্ত অঞ্চল জয় করলেন, তার কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না।

৯০১ হিজরা বা ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সুলতান সিকন্দর শাহের সঙ্গে হোসেন শাহের সন্ধি স্থাপিত হয়। সিকন্দর শাহের দলের লোকদের মতে ঐ বছরের মধ্যেই সিকন্দর শাহের বিহার (অর্থাৎ বর্তমান বিহার শরীফ ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল) জয় সম্পূর্ণ হয়েছিল, কারণ বিহার শরীফের দায়রা মহল্লায় ফজলুল্লাহ্‌র কবরের উত্তর দিকের দেওয়ালের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, সিকন্দরের বিহার জয়ের পর তাঁর অধীনস্থ শাসনকর্তা দরিয়া খান নুহানির শাসনকালে হাজী খান ৯০১ হিজরায় পূর্বদিকের ফটক নির্মাণ করান (JBRS, 1955, p. 363)। এখানে বিহার বলতে 'বিহার শরীফ'কে বোঝানো হয়েছে, সমগ্র বিহার অঞ্চলকে বোঝানো হয় নি। আধুনিক বিহার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত অনেকগুলি অংশ হোসেন শাহের অধিকারে ছিল। হোসেন শাহের মুঙ্গেরে শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে, তার তারিখ ৯০৩ হিঃ। পাটনা জেলার বোনহরা, নওয়াদা ও মচ্ছিহাটায় হোসেন শাহের শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে; তাদের তারিখ যথাক্রমে ৯০৮, ৯১৬ ও ৯১৬ হিজরা। সারণ

জেলার ইসমাইলপুর, চেরান্দ ও নরহন গ্রামেও হোসেন শাহের শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে, ইসমাইলপুর ও চেরান্দের শিলালিপির তারিখ যথাক্রমে ৯০৬ ও ৯০৯ হিজরা। 'চৈতন্যচরিতামৃত' মধ্যলীলা ২০শ পরিচ্ছেদ থেকে জানা যায় যে মুজাফফরপুর জেলার হাজীপুর হোসেন শাহের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সিকন্দর শাহের সঙ্গে হোসেন শাহের সন্ধি স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও দু'জনের মধ্যে যে পরিপূর্ণ প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নি, তার প্রমাণ আছে। সন্ধির সময় হোসেন শাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, সিকন্দর শাহের শত্রুদের তিনি ভবিষ্যতে আশ্রয় দেবেন না। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি শেষ পর্যন্ত পালিত হয়নি। সিকন্দর শাহ তাঁর অন্যতম অমাত্য "সারণের নায়েব (প্রতিনিধি)" হোসেন খান ফর্মুলির প্রাধান্য বৃদ্ধি পেতে দেখে এবং তাঁকে বাংলার সুলতানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে ৯১৫ হিজরায় অর্থাৎ ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে হাজী সারং-এর নেতৃত্বে একদল সৈন্য পাঠান। হোসেন খান ফর্মুলি বিপদ বুঝে বাংলার সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। (JBRS, 1955, pp. 365-366)। ৯১৫ হিঃ অবধি হোসেন খান ফর্মুলি সারণে সিকন্দর শাহের প্রতিনিধি ছিলেন। কিন্তু ৯০৯ হিজরাতে সারণের চেরান্দে হোসেন শাহের শিলালিপি পাওয়া যাচ্ছে। এর থেকে মনে হয়, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশকে সারণের এক অংশে হোসেন শাহের এবং অপর অংশে সিকন্দর শাহের অধিকার ছিল।

বিহার শরীফের পূর্বোক্ত শিলালিপিতে যে দরিয়া খান নুহানির নাম পাওয়া যায়, তিনি ১৫২২ খ্রীঃ পর্যন্ত "বিহারের" শাসনকর্তা ছিলেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক শেখ রিজকুল্লাহ্ (১৪৯১-১৫৪১ খ্রীঃ) তাঁর 'ওয়াকিআৎ-ই-মুস্তাকী' গ্রন্থে লিখেছেন যে সিকন্দর শাহের মৃত্যুর (১৫১৭খ্রীঃ) পর বাংলার সুলতান ও উড়িষ্যার রাজা যখন শত্রুতা করতে সুরু করলেন, তখন দরিয়া খান নুহানি তেজের সঙ্গে বলেছিলেন, "সুলতান মারা গিয়েছেন তো কী হয়েছে? আমি এখনও বেঁচে আছি। সুলতান যখন অনেক দূরে তাঁর রাজধানীতে থাকতেন, তখন আমিই সবসময় এখানে থাকতাম। যাও, একদিকে বাংলার আর একদিকে উড়িষ্যার দ্বার বন্ধ কর। কারও যদি সাহস থাকে, সে এদিকে আসুক।" (JBRS, 1955, p. 367)। সিকন্দর শাহের মৃত্যুর পরে আলাউদ্দীন হোসেন শাহ যে প্রকাশ্যভাবেই দিল্লীর রাজশক্তির বিরুদ্ধে শত্রুতা

সুরু করেছিলেন, এই মূল্যবান সংবাদ এখানে পাচ্ছি। দরিয়া খান নুহানির আস্ফালন সত্ত্বেও বিহারে হোসেন শাহের রাজ্যবিস্তার বিশেষ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল বলে মনে হয় না।

হোসেন শাহের সামরিক কীর্তির সার-সংকলন

আলাউদ্দীন হোসেন শাহ অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে যে সমস্ত সংঘর্ষ ও যুদ্ধবিগ্রহে জড়িত হয়েছিলেন, তাদের সম্বন্ধে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম।

এই আলোচনার ফলে যে তথ্যগুলি পাওয়া গেল, নীচে সংক্ষেপে সেগুলি উল্লেখ করছি।

১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সুলতান সিকন্দর লোদীর সঙ্গে হোসেন শাহের সংঘর্ষ হয়। বিহারের বাঢ় নামক জায়গায় দুই সুলতানের সৈন্য পরস্পরের সম্মুখীন হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুই পক্ষ যুদ্ধ না করে সন্ধি স্থাপন করে।

১৪৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন শাহ কামতাপুর-কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই সেখানকার রাজাকে যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে ঐ রাজ্য অধিকার করেন।

এর কিছু পরে এবং ১৫১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দের আগে হোসেন শাহ আসাম বা অহোম্ রাজ্য আক্রমণ করে তার সমতল অঞ্চল অধিকার করেন। ঐ রাজ্যের রাজা তখন পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নেন এবং বর্ষাকাল আগত হলে প্রতি-আক্রমণ করে হোসেন শাহের লোকদের বিধ্বস্ত করে নিজের হৃত অঞ্চলগুলি পুনরধিকার করেন।

১৪৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সুরু করে অন্তত ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উড়িষ্যার রাজার সঙ্গে হোসেন শাহের যুদ্ধ চলে। মাঝে কোন কোন সময় এই যুদ্ধ বন্ধ ছিল এবং ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে সন্ধি আসন্ন হয়ে উঠেছিল, কিন্তু ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে আবার নতুন করে যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ে কোন কোন সময় উভয় রাজা অন্য রাজ্যের অঞ্চলবিশেষ অধিকার করেন, কিন্তু কারও অধিকারই স্থায়ী হয়নি। উভয় রাজাই এই যুদ্ধে জয়ের দাবী করেন, কিন্তু মোটের উপর এই যুদ্ধ অমীমাংসিত থেকে গিয়েছিল বলে মনে হয়। ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দেই এই যুদ্ধের অবসান হয়েছিল বলে বোধ হয়।

১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দেরও আগে কোন এক সময়ে ত্রিপুরার রাজা ধন্যমাণিক্যের

সঙ্গে হোসেন শাহের যুদ্ধ সুরু হয় এবং ১৫১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দ বা তারও পর পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধেও দুই রাজাই কোন কোন সময় অন্য রাজ্যের অংশ-বিশেষ অধিকার করেন বটে, কিন্তু এইসব অধিকার বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। শেষ পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের কিছু অংশ হোসেন শাহের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু ত্রিপুরার সঙ্গে যুদ্ধ চলতে থাকে, হোসেন শাহের রাজত্ব শেষ হবার পরেও এই যুদ্ধ চলেছিল।

সম্ভবত ১৫১৪ থেকে ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময় আরাকানের রাজা চট্টগ্রাম অধিকার করেন ; হোসেন শাহের সৈন্যবাহিনী ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দের আগেই চট্টগ্রাম পুনরধিকার করে এবং আবাকানরাজ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে হোসেন শাহের সামন্তে পরিণত হন।

এছাড়া হোসেন শাহ সম্ভবত ত্রিহুতেরও কতকাংশ জয় করেছিলেন। হোসেন শাহ বিহারের অধিকাংশই নিজের রাজ্যভুক্ত করেন। এইসব অঞ্চলের কিছু কিছু অংশ আগে সিকন্দর লোদীর রাজ্যভুক্ত ছিল। সিকন্দর লোদীর সঙ্গে সন্ধি স্থাপিত হওয়ার পরেও তাঁর সঙ্গে হোসেন শাহের পরিপূর্ণ প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নি। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে সিকন্দর লোদীর মৃত্যুর পরে তিনি প্রকাশ্যেই দিল্লীর রাজশক্তির বিরুদ্ধে শত্রুতা সুরু করেন।

বাংলায় পর্তুগীজদের আগমন

পর্তুগীজ ঐতিহাসিক জোআঁ-দে-বারোস এর "Da Asia" গ্রন্থে (রচনাকাল ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ) এবং অন্যান্য পর্তুগীজ গ্রন্থে বাংলাদেশে পর্তুগীজদের প্রথম আগমন সম্বন্ধে বিস্তৃত ও প্রামাণিক বিবরণ পাওয়া যায়। এই বিবরণ থেকে জানা যায় যে, হোসেন শাহের রাজত্বকালেই বাংলাদেশে পর্তুগীজরা প্রথম পদার্পণ করে। বাংলাতেই বা বলি কেন, ভারতের প্রথম পর্তুগীজ আগন্তুক ভাস্কো-দা-গামা যে বছর (১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে) কালিকট বন্দরে অবতরণ করেন, তখনও হোসেন শাহই বাংলার সুলতান ছিলেন। যাহোক্, জোআঁ দে-বারোস-এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, দীর্ঘকাল ধরে পর্তুগীজরা বাংলাদেশে তাদের বাণিজ্য সুরু করতে পারেনি। মাঝে মাঝে দু'একজন পর্তুগীজ বণিক বাংলার সমুদ্রোপকূলে এসে অল্পস্বল্প জিনিষ কেনাবেচা বা এদেশের কুটিরশিল্পীদের সঙ্গে পণ্যদ্রব্য বিনিময় করে চলে যেত। প্রাচ্যে পর্তুগীজ অধিকারভুক্ত অঞ্চলগুলির শাসনকর্তা আলবুকার্ক ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগালের

রাজা মনোএল্‌কে এক চিঠি লিখে জানান যে বাংলাদেশের লোকেরা পর্তুগীজদের কাছে জিনিস কিনতে চায়। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে আলবুকার্ক ফার্নাঁ-পেরেস-দা-আঁন্দ্রেদ্‌ নামে একজন পর্তুগীজকে চারটি জাহাজ দিয়ে বাংলায় বাণিজ্য সুরু করতে এবং আরব বণিকদের একচেটিয়া ব্যবসায়ের মূলোচ্ছেদ করতে বলেন। কিন্তু মাঝসমুদ্রে অগ্নিকাণ্ডে প্রধান জাহাজটি নষ্ট হওয়ার জন্য ফার্নাঁ শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে এসে পৌছোতে পারেননি। অবশ্য জোআঁ-কোএল্‌হো নামে তাঁর একজন বার্তাবহ চট্টগ্রামে এসেছিলেন। ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে আলবুকার্কের স্থলাভিষিক্ত পর্তুগীজ শাসনকর্তা লোপো-সোরস-দে-আলবার্গারিয়া—জোআঁ-দে-সিলভেরা নামে আর একজন পর্তুগীজকে বাংলাদেশে পাঠান সেই একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। সিলভেরা প্রথমে আরাকান নদীর মোহানায় পৌছে তারপর চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌছোন। জোআঁ-কোএল্‌হো আগে থেকেই সেখানে এসেছিলেন। সিলভেরা পর্তুগালের রাজার পক্ষ থেকে বাংলার রাজাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি চিঠি পাঠান এবং বাণিজ্য করার অনুমতি চান। সেই সঙ্গে তিনি একটি কুঠি নির্মাণেরও অনুমতি চান, যেখানে পর্তুগীজ বণিকরা সমুদ্রযাত্রার সময় বিশ্রাম নিতে পারবে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের সঙ্গে পণ্যদ্রব্য আদানপ্রদান করতে পারবে। কিন্তু বাংলার রাজা তাঁর এই আবেদনের কোন উত্তর পাঠাবার আগেই সিলভেরার সঙ্গে চট্টগ্রামের শাসনকর্তার সংঘর্ষ বেধে গেল। এর আগে একবার সিলভেরা গ্রোমাল নামে একজন মুসলমানের দুটি জাহাজ দখল করেছিলেন। এই গ্রোমাল ছিল চট্টগ্রামের শাসনকর্তার আত্মীয়। চট্টগ্রামের শাসনকর্তা এই ব্যাপার জানতে পেরে পর্তুগীজদের তাড়াবার জন্য যুদ্ধের আয়োজন করতে লাগলেন। তাঁর ধারণা হল সিলভেরা জলদস্যু। এদিকে পর্তুগীজদের খাবার ফুরিয়ে যাওয়ায় সিলভেরা চালে বোঝাই একটা নৌকো দখল করে নিলেন। চট্টগ্রামের শাসনকর্তা তখন ডাঙা থেকে কামান দাগলেন। পর্তুগীজরাও চট্টগ্রাম বন্দর অবরোধ করে বাংলাদের সমস্ত সামুদ্রিক বাণিজ্য বিপর্যস্ত করে দিল। কিন্তু চট্টগ্রামের শাসনকর্তা তখন কয়েকটি জাহাজের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন, তিনি বেগতিক দেখে পর্তুগীজদের সঙ্গে সন্ধি করতে চাইলেন; কোএল্‌হোর সঙ্গে তাঁর ভাল সম্পর্ক ছিল, তাঁর মধ্যস্থতায় সাময়িকভাবে একটা সন্ধি হল; প্রত্যাশিত জাহাজগুলি বন্দরে এসে পৌছোবামাত্র তিনি সিলভেরার উপর আবার আক্রমণ সুরু করলেন। বাংলাদেশের মাটিতে নামতে না পেরে

সিলভেরা শেষ পর্যন্ত নিরাশ হয়ে আরাকানের দিকে গেলেন। কোএল্‌হো চীনে চলে গেলেন। আরাকানের রাজা এই সময় বাংলার সুলতানের প্রজা ছিলেন। তাঁর রাজধানী আরাকান চট্টগ্রাম থেকে ৩৫ লীগ দূরে অবস্থিত ছিল। আরাকানের রাজার সঙ্গে সিলভেরার কথাবার্তা চলল। আরাকান-রাজ জানালেন তিনি পর্তুগীজদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে ইচ্ছুক। সিলভেরা কিন্তু জানতে পারলেন যে তিনি আরাকানে অবতরণ করলেই তাঁকে বিশ্বাসঘাতকতা করে বন্দী করা হবে। নিরাশ হয়ে তিনি সিংহলে ফিরে গেলেন।

১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে তুয়ার্তে-বারবোসা নামে একজন পর্তুগীজ বাংলাদেশে ভ্রমণ করেন। ইনি বিখ্যাত পর্তুগীজ নাবিক ম্যাগেলানের জ্ঞাতি। তিনি এদেশের একটি বিবরণ লিখে গিয়েছেন। সেটি আমরা পরে যথাস্থানে উদ্ধৃত করব।

হোসেন শাহের রাজধানী

হোসেন শাহের রাজধানী কোথায় ছিল, সে সম্বন্ধে 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে' লেখা আছে, "সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ তাঁর রাজধানী গৌড় নগরীর সংলগ্ন একডালায় স্থানান্তরিত করেন। হোসেন শাহ ছাড়া বাংলার আর কোন রাজা পাণ্ডুয়া ও গৌড় ভিন্ন অন্য কোন স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন নি।" হোসেন শাহের রাজধানী যে একডালায় ছিল, সেকথা হোসেন শাহের মৃত্যুর ৭১ বছর পরে রচিত 'তবকাৎ-ই-আকবরী'তেও লেখা আছে। সম্প্রতি এ সম্বন্ধে সমসাময়িক প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়েছে। ৯১১ হিজরার ২রা জমাদী-অল-আউয়ল অর্থাৎ ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর তারিখে মুহম্মদ বিন্ য়জ্‌দান বখ্‌শ্‌ নামে এক ব্যক্তি বিশিষ্ট ঐস্লামিক গ্রন্থ 'শহীহ্‌-অল-বুখারী'র তিন খণ্ডের পুঁথি নকল সম্পূর্ণ করেছিলেন। এই তিন খণ্ডের পুঁথি বর্তমানে বাঁকীপুর ওরিয়েণ্টাল পাবলিক লাইব্রেরীতে আছে, সর্বশেষ খণ্ডের পুঁথিটির পুষ্পিকা থেকে জানা যায় যে, পুঁথিগুলি আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজকীয় কোষাগারের জন্য নকল করা হয়েছিল বাংলার রাজধানী একডালায় ("The...colophon says that all these three copies were written for the Royal Treasury of Alauddin Hussain Shah bin Sayyid Ashraf al-Husaini, the king of Bengal··· Dated Yakdalah, the capital of Bengal, A. H. 911."—Catalogue of the Arabic and Persian Manuscripts in the Oriental Public Library at Bankipore, Vol. V, pp. 18-20)

সুতরাং হোসেন শাহের রাজধানী যে একডালায় ছিল, তা জানা গেল। এর আগে চতুর্দশ শতাব্দীতে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ও তাঁর পুত্র সিকন্দর শাহ একডালার দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় নিয়ে দিল্লীশ্বর ফিরোজ শাহ তোগলকের আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন বলে জিয়াউদ্দীন বারনি, শাম্‌স্‌-ই-সিরাজ-ই-আফিফ প্রভৃতি সমসাময়িক লেখকরা এবং অন্য ঐতিহাসিকরা লিখেছেন। কিন্তু এই একডালা কোথায় ছিল, তা এখনও পর্যন্ত স্থিরভাবে নিরূপণ করা যায় নি। রেনেল এবং বেভারিজের মতে বর্তমান ঢাকা জেলার অন্তর্ভুক্ত একডালা গ্রামই এই একডালা। ওয়েস্টমেকটের মতে একডালা বর্তমানে মালদহ জেলার অন্তর্ভুক্ত। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের মতে মালদহ জেলার দমদমা নামক স্থানই প্রাচীনকালে একডালা নামে পরিচিত ছিল। রজনীকান্ত চক্রবর্তীর মতে এই একডালা পাণ্ডুয়ার খুব নিকটে অবস্থিত ছিল। আবিদ আলীর মতে এই একডালা পাণ্ডুয়ার আট মাইল পশ্চিমে অবস্থিত মুর্চা গ্রাম। স্টেপলটন ও নীরদভূষণ রায়ের মতে এই একডালা ঘোড়াঘাটের ১৫ মাইল পশ্চিমে এবং পাণ্ডুয়ার ২৩ মাইল উত্তরে অবস্থিত বর্তমান দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত একডালা গ্রাম। রামপ্রাণ গুপ্ত লিখেছেন, "কেহ বা মালদহের কেহ বা দিনাজপুরের 'জগদলকেই' এই একডালা অনুমান করেন।"

আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজধানী যে একডালায় ছিল, একথা নিশ্চিতরূপে জানবার পর একডালার অবস্থান নির্ণয় করা এখন খুব সহজ হয়ে পড়েছে। এ সম্বন্ধে 'চৈতন্যভাগবত' ও 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র সাক্ষ্য খুব মূল্যবান। 'চৈতন্যভাগবতে'র অন্ত্যখণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে স্পষ্ট লেখা আছে যে গৌড়ের নিকটবর্তী রামকেলি গ্রামের খুব কাছেই হোসেন শাহের রাজধানী ছিল। এই অধ্যায়ে বৃন্দাবনদাস লিখেছেন,

> গৌড়ের নিকটে গঙ্গাতীরে এক গ্রাম।
> ব্রাহ্মণসমাজ তার 'রামকেলি' নাম॥
> দিন চারি পাঁচ প্রভু সেই পুণ্যস্থানে।
> আসিয়া রহিলা যেন কেহো নাহি জানে॥

রামকেলি গ্রামের কাছেই যে হোসেন শাহের রাজধানী, সেকথা বৃন্দাবনদাস এর পর বলেছেন,

> নিকটে যবন রাজা পরম দুর্ব্বার।
> তথাপিহ চিত্তে ভয় না জন্মে কাহার॥

'চৈতন্যচরিতামৃত' মধ্যলীলা প্রথম পরিচ্ছেদে লেখা আছে যে হোসেন শাহ কেশব ছত্রী ও দবীর খাসকে চৈতন্যদেব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে রূপ-সনাতন দুই ভাই লুকিয়ে গভীর রাত্রে রামকেলি গ্রামে গিয়ে চৈতন্যদেবের সঙ্গে দেখা করেছিলেন,

ঘরে আসি দুই ভাই যুকতি করিয়া।
প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাইয়া॥
অর্দ্ধরাত্র্যে দুই ভাই আসিলা প্রভুস্থানে।

এ বিষয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজের সাক্ষ্য খুব মূল্যবান, কারণ তিনি দীর্ঘকাল রূপ-সনাতনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। তাঁর উক্তি থেকে আমরা জানতে পারছি যে রূপ-সনাতন তাঁদের নিবাসস্থল অর্থাৎ হোসেন শাহের রাজধানী থেকে এক রাত্রের মধ্যেই গোপনে রামকেলি গ্রামে গিয়ে চৈতন্যদেবের সঙ্গে দেখা করে ফিরে এসেছিলেন। এর থেকেও বোঝা যায় হোসেন শাহের রাজধানী একডালা রামকেলির একেবারে কাছাকাছি তথা গৌড়েরও খুব কাছে অবস্থিত ছিল। রামকেলি গ্রাম গৌড় শহরের পশ্চিম উপকণ্ঠে অবস্থিত ছিল।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা দরকার। 'ভক্তিরত্নাকরে'র প্রথম তরঙ্গে লেখা আছে যে রূপ-সনাতন রামকেলি গ্রামে বাস করতেন,

গৌড়ে রামকেলি গ্রামে করিলেন বাস।
ঐশ্বর্যের সীমা অতি অদ্ভুত বিলাস

রামকেলি গ্রামে সে সকল বিপ্র লৈয়া।
ব্যবহার কার্য সব সাধে হর্ষ হৈয়া॥

কিন্তু 'চৈতন্যচরিতামৃত' মধ্যলীলার ১৯শ অধ্যায়ে লেখা আছে,

শ্রীরূপ-সনাতন রামকেলি গ্রামে।
প্রভুকে মিলিয়া গেল আপন ভবনে॥

এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে রূপ-সনাতন রামকেলি গ্রামে চৈতন্যদেবের সঙ্গে দেখা করে নিজের ভবনে ফিরে গেলেন। এর থেকে মনে হয়, তাঁদের ভবন রামকেলি গ্রামে ছিল না, অন্য কোন জায়গায় ছিল। রূপ-সনাতন শুধু হোসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন না, প্রাইভেট সেক্রেটারীর পর্যায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁদের বেশীর ভাগ সময়েই রাজার কাছে কাছে থাকতে হত। সুতরাং তাঁদের

বাসভবন রাজধানীর বাইরে হতে পারে না। আর যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় যে রূপ-সনাতন রামকেলি গ্রামেই বাস করতেন, তাহলেও বলতে হবে হোসেন শাহের রাজধানী রামকেলির খুব কাছে অবস্থিত ছিল, তা না হলে রূপ-সনাতনের পক্ষে সদাসর্বদা রামকেলি থেকে সুলতানের কাছে যাওয়া সম্ভব হত না।

জিয়াউদ্দীন বারনির মতে একডালা পাণ্ডুয়ার নিকটবর্তী একটি মৌজা। ফিরিশ্‌তার মতে একডালা গঙ্গা থেকে সাত ক্রোশ দূরে অবস্থিত। কিন্তু এই দু'জন লেখকের মধ্যে কেউই কখনও বাংলাদেশে আসেন নি। 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে'র লেখকের মতে একডালা গৌড়ের পাশেই অবস্থিত ছিল এবং 'চৈতন্যভাগবত' ও 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র সাক্ষ্য থেকে এই উক্তিই সঠিক বলে প্রমাণিত হচ্ছে। 'রিয়াজ'-রচয়িতা মালদহেরই লোক, সুতরাং তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে গ্রন্থ রচনা করলেও এ বিষয়ে তাঁর সাক্ষ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, একডালার অবস্থিতি সম্বন্ধে আজকের দিনের তুলনায় তখন অনেক বেশী তথ্য-প্রমাণ ছিল সন্দেহ নেই। গৌড় পাণ্ডুয়া থেকে মাত্র ২০ মাইল দূর, সুতরাং একডালা সম্বন্ধে জিয়াউদ্দীন বারনির উক্তিও একেবারে ভুল নয়। জিয়াউদ্দীন বারনিরই সমসাময়িক কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি কর্তৃক রচিত 'সিরাৎ-ই-ফিরোজ-শাহী' গ্রন্থে লেখা আছে যে একডালা গঙ্গার তীরে অবস্থিত এবং গঙ্গার শাখা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। এই বর্ণনা গৌড় সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

এখন কথা হচ্ছে, হোসেন শাহ তাঁর রাজধানী গৌড় থেকে একডালায় স্থানান্তরিত করলেন কেন? রজনীকান্ত চক্রবর্তীর মতে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য তিনি এরকম করেছিলেন। এই কথাই ঠিক্ বলে মনে হয়। এর আগে উপর্যুপরি কয়েকজন সুলতান যেভাবে আততায়ীদের হাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন, সেই কথা মনে করেই সম্ভবত হোসেন শাহ একডালায় তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন। খুব সম্ভব তিনি একডালার দুর্ভেদ্য দুর্গেই বাস করতেন। তা'ছাড়া হোসেন শাহের সিংহাসনে আরোহণের সময় কয়েকদিন অবিশ্রান্ত লুঠের ফলে রাজধানী গৌড় নিশ্চয়ই শ্রীহীন হয়ে পড়েছিল। তার ফলেও হয়তো হোসেন শাহ অন্য জায়গায় তাঁর রাজধানী স্থাপন করার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন।

'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' লেখা আছে যে গৌড়ের একনাথা নামে জায়গায় হোসেন শাহের সমাধি ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ক্রেটন ও

উইলিয়ম ফ্রাঙ্কলিন এবং মাঝের দিকে মুন্শী ইলাহী বখ্শ্ এই সমাধি দেখেছিলেন। এই সমাধি যে জায়গায় ছিল, সে জায়গাটি এখন বাঙ্গলা-কোট নামে পরিচিত, এটি বাইশ-গজী দেওয়াল বা পুরোনো রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষের প্রায় এক ফার্লং উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। হোসেন শাহের সমাধি-ভূমির এই অবস্থান থেকেও মনে হয় যে হোসেন শাহের রাজধানী গৌড়ের কাছে ছিল, কারণ মৃত রাজাকে তাঁর রাজধানী থেকে অনেক দূরে নিয়ে এসে কবর দেওয়ার প্রথা সে যুগে প্রায় ছিলই না বলা চলে।

হোসেন শাহ ও শ্রীচৈতন্য

মধ্যযুগের বাংলার সবচেয়ে বিখ্যাত নরপতি হোসেন শাহ্ এবং বাংলার শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্য পরস্পরের সমসাময়িক। এই যোগাযোগ সত্যিই আশ্চর্য। ইতিহাসে সাধারণত দেখা যায়, কোন মহাপুরুষের নামের জোরে তাঁর সমসাময়িক রাজাও বিখ্যাত হয়ে পড়েন। বুদ্ধদেবের সমসাময়িক না হলে রাজা বিম্বিসারকে আজ কে চিনত? কিন্তু হোসেন শাহের বেলায় এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। তিনি শুধুমাত্র তাঁর সমসাময়িক মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যের জন্য বিখ্যাত নন, নিজগুণেই তিনি বড়, তাই ব্রহ্মপুত্র থেকে উড়িষ্যা পর্যন্ত সর্বত্র তাঁর স্মৃতি জনসাধারণের মনের মধ্যে আজও বেঁচে আছে।

হোসেন শাহ্ তাঁর সমসাময়িক এই মহামানবকে কী দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, তা জানতে আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। তিনি যে শ্রীচৈতন্যদেবের নাম জানতে পেরেছিলেন, সে কথা বৃন্দাবনদাস, কবিকর্ণপুর, জয়ানন্দ, চূড়ামণিদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি বহু চরিতকার উল্লেখ করেছেন, কাজেই তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এক চূড়ামণিদাস ভিন্ন অন্য সব চরিতকারই লিখেছেন যে নীলাচল থেকে গৌড়ে আগমনের সময় যখন চৈতন্যদেব বৃন্দাবনে যাওয়ার সঙ্কল্প নিয়ে গৌড়ের অনতিদূরে অবস্থিত রামকেলি গ্রাম পর্যন্ত এসেছিলেন, তখন হোসেন শাহ শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শোনেন। অবশ্য এ-সম্বন্ধে বিভিন্ন বইএর বর্ণনার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। চূড়ামণিদাসের মতে চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের আগেই তাঁর প্রতি হোসেন শাহের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। যাহোক্, এখন আমরা আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থের উক্তি বিচার করে সত্য নির্ধারণের চেষ্টা করব।

বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবতে' (রচনাকাল ১৫৩৮ খ্রীঃ থেকে ১৫৫০ খ্রীঃর

মধ্যে) সর্বপ্রথম আমরা আলোচ্য প্রসঙ্গের উল্লেখ পাচ্ছি। বৃন্দাবনদাস বেশ বিস্তৃতভাবেই বিষয়টির বর্ণনা দিয়েছেন।

'চৈতন্যভাগবতে'র অন্ত্যখণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে বৃন্দাবনদাস লিখেছেন যে চৈতন্যদেব যখন রামকেলি গ্রামে গিয়ে ভক্তদের সঙ্গে হরিগুণগানে বিভোর ছিলেন, তখন,

নিকটে যবন রাজা পরম দুর্ব্বার।
তথাপিহ চিত্তে ভয় না জন্মে কাহার॥
নির্ভয় হইয়া সর্ব্বলোক বোলে হরি।
দুঃখ শোক গৃহ বিত্ত সকল পাসরি
কোটোয়াল গিয়া কহিলেক রাজস্থানে।
এক ন্যাসী আসিয়াছে রামকেলি গ্রামে॥
নিরবধি করয়ে ভূতের সংকীর্ত্তন।
না জানি তাঁহার স্থানে মিলে কতজন॥
রাজা বোলে কহ কহ সন্ন্যাসী কেমন।
কি খায়, কি নাম, কৈছে দেহের গঠন॥

"কোটোয়াল" উচ্ছ্বসিত ভাষায় সন্ন্যাসীর রূপ-গুণ ও আচরণ বর্ণনা করলেন। তাঁর কথা শুনে রাজা কেশব খানকে ডাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,

কহত কেশব খান কেমত তোমার।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি নাম বোল যার॥
কেমত তাঁহার কথা কেমত মনুষ্য।
কেমত গোসাঞি তিহোঁ কহিবা অবশ্য॥
চতুর্দ্দিকে আইছে লোক তাঁহারে দেখিতে।
কি নিমিত্তে আইসে কহিবা ভালমতে॥
শুনিয়া কেশব খান পরম সজ্জন।
ভয় পাই লুকাইয়া কহেন কথন॥
কে বলে গোসাঞি, এক ভিক্ষুক সন্ন্যাসী।
দেশান্তরী গরিব বৃক্ষের তলবাসী॥

তখন

রাজা বোলে, গরিব না বোলো কভু তানে
মহাদোষ হয় ইহা শুনিলেও কানে॥

হিন্দু যারে বোলে 'কৃষ্ণ' খোদায় যবনে।
সেই তিহোঁ নিশ্চয় জানিহ সর্ব্বজনে॥
আপনার রাজ্যে সে আমার আজ্ঞা রহে।
তাঁর আজ্ঞা সর্ব্বদেশে শিরে করি বহে॥
এই নিজ রাজ্যেই আমারে কত জনে।
মন্দ করিবারে লাগিয়াছে মনে মনে॥
তাঁহারে সকল দেশে কায়-বাক্য-মনে।
ঈশ্বর নহিলে বিনা অর্থে ভজে কেনে॥
আজি আমি জীবিকা না দিলে।
যুক্তি করিবেক সেবক সকলে॥
আপনার সেবি লোক তাহানে খাইতে।
চাহে তাহা কেহো নাহি পায় ভালমতে॥
অতএব তিঁহো সত্য জানিহ ঈশ্বর।
গরিব করিয়া তাঁরে না বোল উত্তর॥
রাজা বোলে, এই মুঞি বলিলু সভারে।
কেহো পাছে উপদ্রব করয়ে তাঁহারে॥
যেখানে তাহান ইচ্ছা থাকুন সেখানে।
আপনার শাস্ত্রমত করুন বিধানে॥
সর্ব্বলোক লই সুখে করুন কীর্তন।
কি বিরলে থাকুন যে লয় তাঁর মন॥
কাজী বা কোটাল বা তাঁহাকে কোনো জনে
কিছু বলিলেই তার লইমু জীবনে॥"

হোসেন শাহ এই কথা বলে ভিতরে চলে গেলেন। তাঁর কথা শুনে "তুষ্ট হইলেন যত সজ্জনের গণ"। কিন্তু তাঁরা নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। এক সঙ্গে বসে মন্ত্রণা করতে লাগলেন,

স্বভাবেই রাজা মহা কালযবন।
মহাতমোগুণবুদ্ধি জন্মে ঘনেঘন॥
ওড্রদেশে কোটি কোটি প্রতিমা প্রাসাদ॥
ভাঙ্গিলেক কত কত করিলে প্রমাদ

দৈবে আসি সত্বগুণ উপজিল মনে।
তেঞি ভাল কহিলেন আমা সভা স্থানে॥
আর কোন পাত্র আসি কুমন্ত্রণা দিলে।
আরবার কুবুদ্ধি আসিয়া পাছে মিলে॥
জানি কদাচিৎ কহে, কেমন গোসাঞি।
আন গিয়া সভে চাহি দেখি এই ঠাঞি॥
অতএব গোসাঞিরে পাঠাই কহিয়া।
রাজার নিকট-গ্রামে কি কার্য রহিয়া॥

এই যুক্তি করে তাঁরা একজন ব্রাহ্মণকে চৈতন্যদেবের কাছে পাঠালেন। সেই ব্রাহ্মণ সঙ্কীর্তনরত ভাববিভোর চৈতন্যদেবকে দেখে তাঁকে আর কিছু বলতে পারল না, তাঁর ভক্তদের কাছে সব কথা বলে চৈতন্যদেবকে অবসরমত জানাতে অনুরোধ করে গেল। ভক্তেরাও সঙ্কোচবশত চৈতন্যদেবের কাছে কিছু বলতে পারলেন না। কিন্তু "অন্তর্যামী শচীনন্দন" সমস্ত বুঝে নিলেন। তারপর

প্রভু বোলে তুমি সব ভয় পাও মনে।
রাজা আমা দেখিবারে নিবেক কারণে॥
আমা চাহে হেন জন আমিও তা চাঙ্।
সবে আমা চাহে হেন কোথাও না পাঙ্॥
তোমরা ইহাতে কেন ভয় পাও মনে।
রাজা আমা চাহে মুঞি যাইমু আপনে
রাজা বা আমারে কেনে বলিব চাহিতে।
কি শক্তি রাজার এ বা বোল উচ্চারিতে॥
আমি যদি বোলাই সে রাজার মুখেতে।
তবে সে বলিব রাজা আমারে চাহিতে॥
আমা দেখিবারে শক্তি কোন্ বা তাহার।
বেদে অন্বেষিয়া দেখা না পায় আমার॥

অতঃপর কিছুদিন বাদে মহাপ্রভু নিজের ইচ্ছায় আর অগ্রসর না হয়ে ফিরে গেলেন।

কবিকর্ণপূর বৃন্দাবনদাসের সমসাময়িক গ্রন্থকার। চৈতন্যদেবের জীবন-কাহিনী বর্ণনা করে তিনি সংস্কৃত ভাষায় দু'খানি বই লেখেন—'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য' (রচনাকাল ১৫৪২ খ্রীঃ) ও 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক' (রচনাকাল

১৫৭২-৭৩ খ্রীঃ)। এর মধ্যে প্রথমটিতে আলোচ্য প্রসঙ্গ সম্বন্ধে কোন কথা নেই। 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে' চৈতন্যদেবের গৌড় ভ্রমণের সহযাত্রী রায় রামানন্দ কর্তৃক প্রেরিত একজন লোক উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রের কাছে বলছে,

"শ্রুতঞ্চ গৌড়েশ্বরস্য রাজধান্যাঃ পারে গঙ্গং চলতো ভগবতঃ পশ্চাদুভয়োঃ পার্শ্বদ্বয়োশ্চলন্তীং লোকঘটামালোক্য গৌড়েশ্বরো গঙ্গাতটঘটমানোপকারি-কামারূঢ়ো বিস্মিতঃ কিমধিকমিতি যদা পৃষ্টবান্ তদা কেশববসুনাম্না তদমাত্যেন কথিতং সুরত্রাণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোনাম কোঽপি মহাপুরুষঃ পুরুষোত্তমান্মথুরাং প্রয়াতি তদ্দিদৃক্ষয়া অমী লোকাঃ সঞ্চরন্তি ইতি তত স্তেনাপ্যুক্তম্ অয়মীশ্বরো ভবতি যস্যৈবংবিধ লোকাকর্ষণমিতি।"

[আমি শুনেছি যে ভগবান যখন গৌড়েশ্বরের রাজধানী থেকে গঙ্গাপারে যান, সেই সময় তাঁর পিছনের ও দু'পাশের চলন্ত লোকদের দেখে গঙ্গাতীরের চন্দ্রশালিকায় অধিরূঢ় গৌড়েশ্বর বিস্মিত হয়ে কেশব বসু নামে তাঁর অমাত্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওহে এ কী। এত লোক কেন?" তখন অমাত্য বললেন, "সুলতান! শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে একজন মহাপুরুষ পুরুষোত্তম থেকে মথুরায় যাচ্ছেন, কাজেই তাঁকে দেখতে এত লোক আসছে। তাই শুনে তিনি (গৌড়েশ্বর) বললেন, "ইনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর! নয়তো এত লোক আকৃষ্ট হবে কেন?"]

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে (১৫৪৮ থেকে ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত) আলোচ্য প্রসঙ্গ সম্বন্ধে এই লেখা আছে (এশিয়াটিক সোসাইটির G-5398 নং পুঁথির পাঠ),

গৌড় নিকটে কৃষ্ণকেলি নামে গ্রাম।
তাহে ব্রাহ্মণ গোষ্ঠী ভুবনে অনুপাম॥
সঙ্কীর্ত্তনে নাচে প্রভু কৃষ্ণকেলি গ্রামে।
সর্ব্বলোক উন্মত্ত হইল হরি নামে॥
চৈতন্য চান্দের রূপ দেখীয়া বিশাল।
রাজারে জানাএ গিয়া রাজার কোটাল
এক সন্ন্যাসী কৃষ্ণচৈতন্য তার নাম।
উন্মত্ত করাইলেক নাটে কৃষ্ণকেলি গ্রাম॥
তাহার নাট দেখীআ বনের পশু কান্দে।
রূপ দেখী কুলবধূ বুক নাঞি বান্ধে॥

গাছে মাথা নওাএ গোসাঞার নাটে।
আছুক মানুষের কাজ পাথর দেখীআ ফাটে॥
রাজা বলে কেশবর্থা ধরিয়া আন এথা।
কেমন কৃষ্ণচৈতন্য তারে পাথর নওাএ মাথা॥
তাহা শুনি নিবর্ত্ত হইল চৈতন্য ঠাকুর।
সর্ব্ব পারিষদ সঙ্গে গেলা শান্তিপুর॥

চূড়ামণিদাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়ে' (রচনাকাল সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ) হোসেন শাহ যে শ্রীচৈতন্যদেবকে স্বচক্ষে দেখেছেন, এরকম আভাস দেওয়া হয়েছে। চূড়ামণিদাসের মতে মহাপ্রভু যখন পিতার পিণ্ড দিতে গয়া যাচ্ছিলেন, তখন গৌড় হয়ে যান এবং সে সময়ে হোসেন শাহ তাঁর অলৌকিক কীর্তি দর্শন করে মুগ্ধ হন। চূড়ামণি দাস লিখেছেন, গৌড়ের বিস্তীর্ণ গঙ্গা দেখে

আবেশে অবশ প্রভু গঙ্গাস্নান করে।
পূজিল গোবিন্দ গঙ্গা বহু উপচারে॥
এক অযুত পদ্ম প্রভু কিনি আনে।
গঙ্গানিবেদন করে এ মন্ত্রবিধানে॥
গঙ্গার দুকুল মাঝে পদ্ম ভাসি যায়।
দেখিয়া গৌড়ের লোক চমৎকার পায়॥
দেখিয়া দুকূল লোক আকুল আনন্দে।
কোন ভাগ্যবান কৈল এসব প্রবন্ধে॥
গঙ্গার দুকূল মাঝে ভাসে পদ্মরাশি।
শিবশিরে রহে গিয়া পলাইয়া শশী॥
কিবা লক্ষ্মী গৌড়ে রহি করএ বিহার।
গঙ্গা বা দিলেন তাঁরে পদ্ম উপহার॥
সুলুতান হুসেন সাহা শুনিয়া এ রঙ্গ।
আপনি দেখিতে আল্যা পাত্রমিত্র সঙ্গ॥
সুলুতান কহে শুন অহে পাত্রমিত্র।
এসব মানুষি নহে গোসাঞী চরিত্র॥
এক এক পদ্ম হৈল লাখ লাখ দলে।
দেখি পদ্মময় গঙ্গা না দেখিএ জলে॥

গয়া যাবার সময় যে চৈতন্যদেব গৌড় হয়ে গিয়েছিলেন, এ কথা জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে'ও পাওয়া যায়। কিন্তু এক অযুত পদ্ম কিনে গঙ্গায় ভাসিয়ে গঙ্গাকে ঢেকে ফেলা এবং তাই দেখতে স্বয়ং হোসেন শাহের গঙ্গাতীরে আসার কাহিনী গল্পকথার মতই শোনায়। তা'ছাড়া এক এক পদ্মের "লাখ লাখ দলে" পরিণত হওয়া সম্পূর্ণ অলৌকিক ব্যাপার। এটা বাদ দিলে চূড়ামণিদাসের বিবরণের যা থাকে, অন্য কোন সূত্রে তার কোন সমর্থন পাওয়া যায় না বলে বর্তমান অবস্থায় তার যাথার্থ্য নির্ধারণ করার কোন উপায় নেই।

অতঃপর কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃতে' এ সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তা' উদ্ধৃত করব। এই বই সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে রচিত হলেও আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে এর বিবরণ খুব মূল্যবান, কারণ চৈতন্যদেব ও হোসেন শাহ—এই দুজনেরই যাঁরা ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন, এমন কয়েকজন ব্যক্তির সঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজের অন্তরঙ্গতা ছিল; কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিবরণের প্রথম অংশের সঙ্গে পূর্ববর্তী লেখকদের বর্ণনার বিশেষ পার্থক্য নেই, কিন্তু তার শেষ অংশে দু'টি নতুন কথা পাই। সে দু'টি কথা এই যে, কেশব ছত্রীকে চৈতন্যদেব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার পরে হোসেন শাহ "দবীর খাসে"র সঙ্গে চৈতন্যদেব সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন এবং রূপ-সনাতন নিজের মুখে চৈতন্যদেবকে রামকেলি গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে অনুরোধ করেছিলেন। বলা বাহুল্য এই নতুন সংবাদ দুটি সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য, কারণ কৃষ্ণদাস কবিরাজ দীর্ঘকাল বৃন্দাবনে রূপ ও সনাতন গোস্বামীর নিবিড় সঙ্গ লাভ করেছিলেন। যাহোক্, 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মধ্যলীলা প্রথম পরিচ্ছেদে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এ সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তা নীচে উদ্ধৃত হল।

ঐছে চলি আইলা প্রভু রামকেলিগ্রাম।
গৌড়ের নিকটে গ্রাম অতি অনুপাম ॥
তাঁহা নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন।
কোটি কোটি লোক আইল দেখিতে চরণ ॥
গৌড়েশ্বর যবন রাজা প্রভাব শুনিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু বিস্মিত হইয়া॥
বিনা দানে এত লোক যার পাছে হয়।
সেই ত গোসাঞি ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥

কাজী যবন ! ইঁহার না করিহ হিংসন।
আপন ইচ্ছায় বুলুন—যাহা উঁহার মন ॥
কেশব ছত্রীরে রাজা বার্তা পুছিল।
প্রভুর মহিমা ছত্রী উড়াইয়া দিল ॥
ভিখারী সন্ন্যাসী করে তীর্থ পর্যটন।
তাঁহা দেখিবারে আইসে তুইচারিজন ॥
যবনে তোমার ঠাঁই করয়ে লাগানি।
তাঁর হিংসায় লাভ নাহি হয় আরো হানি ॥
রাজারে প্রবোধি কেশব ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া।
চলিবার তরে প্রভুরে পাঠাইল কহিয়া ॥
দবীর খাসেরে রাজা পুছিল নিভৃতে।
গোসাঞির মহিমা তেহোঁ লাগিলা কহিতে ॥
যে তোমারে রাজ্য দিল তোমার গোঁসাঞা।
তোমার দেশে তোমার ভাগ্যে জন্মিলা আসিয়া ॥
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে বাক্যসিদ্ধ হয় ॥
ইঁহার আশীর্বাদে তোমার সর্বত্রেতে জয় ॥
মোরে কেনে পুছ, তুমি পুছ আপন মন।
তুমি নরাধিপ হও বিষ্ণু অংশসম ॥
তোমার চিত্তে চৈতন্যের কৈছে হয় জ্ঞান ?
তোমার চিত্তে যেই লয়, সেইত প্রমাণ ॥
রাজা কহে শুন মোর মনে যেই লয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইহোঁ নাহিক সংশয় ॥

এরপর রূপ-সনাতন চৈতন্যদেবের সঙ্গে দেখা করে তাঁর চরণে পতিত হলেন। চৈতন্যদেব তাঁদের কৃপা করলেন। তাঁর কৃপা লাভ করে রূপ-সনাতন তখনকার মত বিদায় নিলেন। যাবার সময় রূপ-সনাতন মহাপ্রভুকে এই অনুরোধ করেন,

ইহাঁ হৈতে চল প্রভু ইহাঁ নাহি কাজ।
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ ॥
তথাপি যবন জাতি না করি প্রতীতি।

মহাপ্রভু এই অনুরোধ রেখেছিলেন।

আলোচ্য প্রসঙ্গ সম্বন্ধে বিভিন্ন চৈতন্যচরিতগ্রন্থে যে সমস্ত বিবরণ পাওয়া যায়, সেগুলি আমরা উদ্ধৃত করলাম। এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, এই বিবরণগুলি একই সূত্র থেকে সংগৃহীত নয়, কারণ তাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। এদের মধ্যে বর্ণিত ঘটনা যে মূলত সত্য, তাতে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। বাস্তব ভিত্তি না থাকলে এতগুলি বইয়ে এই প্রসঙ্গ স্থান পেত না। কিন্তু বিভিন্ন বইয়ে যেসমস্ত পরস্পরবিরোধী খুঁটিনাটি বিবরণ পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে কোন্‌গুলি সত্য আর কোন্‌গুলি অমূলক, তা বলা শক্ত। তিনটি বিষয়ে অধিকাংশ বিবরণের মধ্যে ঐক্য দেখা যায়। সেগুলি এই,

(১) চৈতন্যদেব যখন ভক্তদের সঙ্গে রামকেলি গ্রামে গিয়েছিলেন, তখন হোসেন শাহ্ প্রথম চৈতন্যদেবের কথা জানতে পারেন।

(২) হোসেন শাহ্ কেশব ছত্রীর কাছে চৈতন্যদেবের পরিচয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন।

(৩) হোসেন শাহ্ চৈতন্যদেবের কোন ক্ষতি করেন নি।

এই তিনটি বিষয় সত্য বলেই গ্রহণ করা যায়। এদের মধ্যে তৃতীয় বিষয়টি সন্দেহের অতীত, কারণ এ সম্বন্ধে সমস্ত বিবরণের মধ্যে ঐক্য আছে। কিন্তু অন্যান্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া শক্ত। হোসেন শাহ্ যে চৈতন্যদেবকে চোখে দেখেছিলেন, এরকম আভাস চূড়ামণিদাস ভিন্ন আর কেউ দেন নি। কবিকর্ণপূর লিকখছেন যে হোসেন শাহ্ চৈতন্যদেবের পিছনের ও দুপাশের জনতা দর্শন করেছিলেন। বৃন্দাবনদাস লিখেছেন যে হোসেন শাহের সজ্জন হিন্দু কর্মচারীরা একসঙ্গে মিলে বলাবলি করেছিলেন যে দুষ্ট লোকের কুমন্ত্রণায় পড়ে হয় তো হোসেন শাহ্ চৈতন্যদেবকে তাঁর সামনে নিয়ে আসতে বলবেন। জয়ানন্দ বলেন যে হোসেন শাহ্ চৈতন্যদেবকে ধরে আনতেই বলেছিলেন ; কিন্তু একথার সমর্থন অন্য কোন সূত্র থেকে পাওয়া যায় না বলে এর উপর নির্ভর করা যায় না। 'চৈতন্যভাগবত' ও 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মতে কেশব ছত্রী চৈতন্যদেবের নিরাপত্তার কথা ভেবে হোসেন শাহের কাছে চৈতন্যদেবের মহিমা লাঘব করে বলেছিলেন ; একথা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। বৃন্দাবনদাসের মতে হোসেন শাহের সজ্জন অমাত্যেরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে চৈতন্যদেবের কাছে ব্রাহ্মণ পাঠিয়ে তাঁকে রামকেলি গ্রাম থেকে দূরে চলে যেতে বলেছিলেন, কিন্তু চৈতন্যদেব রাজার ভয়ে ভীত হন নি, তিনি সেখানে কিছুদিন থেকে তারপর স্বেচ্ছায় সেখান থেকে গিয়েছিলেন। কৃষ্ণদাস

কবিরাজের মতে প্রথমে কেশব ছত্রী ব্রাহ্মণ পাঠিয়ে এবং পরে রূপ-সনাতন নিজেরা চৈতন্যদেবের কাছে গিয়ে তাঁকে স্থান ত্যাগ করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, চৈতন্যদেব রাজভয়ে ভীত না হলেও তাঁদের অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। জয়ানন্দের মতে চৈতন্যদেব হোসেন শাহের কথা শুনেই আর অগ্রসর না হয়ে ফিরে আসেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের সঙ্গে রূপ-সনাতনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলে তাঁর কথাই এক্ষেত্রে সত্য বলে মনে হয়। হোসেন শাহ কবিকর্ণপূর ও বৃন্দাবনদাসের মতে কেশব ছত্রীর কাছে এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে দবীর খাসের কাছে স্বীকার করেছিলেন যে চৈতন্যদেব স্বয়ং ভগবান ভিন্ন আর কেউ নন। নিষ্ঠাবান্ মুসলমান হোসেন শাহ চৈতন্যদেবের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করেছিলেন বলে মনে হয় না, তবে চৈতন্যদেব যে সাধারণ লোক নন, এ কথা বুঝতে পারাই তাঁর মত বিচক্ষণ রাজার পক্ষে স্বাভাবিক। তিনি যে চৈতন্যদেবের অসাধারণত্বের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, তাকেই ভক্ত চৈতন্যচরিতকাররা চৈতন্যদেবের ভগবত্তার স্বীকৃতিরূপে উপস্থাপিত করেছেন।

হোসেন শাহ চৈতন্যদেবের কোন ক্ষতি করেন নি বা তাঁর চলার পথে বাধা সৃষ্টি করেন নি। বৃন্দাবনদাসের মতে তিনি বলেছিলেন, চৈতন্যদেবকে কেউ কিছু বললে তিনি তাকে বধ করবেন। এর মধ্যে একটু অতিরঞ্জন থাকলেও মোটামুটিভাবে একথা বিশ্বাসযোগ্য। কারণ হোসেন শাহ ধর্মোন্মাদ ছিলেন না। চৈতন্যদেব থেকে যখন তাঁর কোন অনিষ্ট হচ্ছে না, তখন তাঁর ক্ষতি করে অযথা হিন্দু প্রজাদের অসন্তোষ সৃষ্টি করা তাঁর মত দূরদর্শী রাজার দ্বারা সম্ভব নয়। বরং সহজে হিন্দু প্রজাদের মন পাবার উপায় হিসাবে চৈতন্যদেবের নিরাপত্তাবিধান করাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। যাহোক্, চৈতন্যদেবকে হোসেন শাহ ভগবান বলে স্বীকার করুন বা না করুন, চৈতন্যদেব যে হোসেন শাহের মনে খুব গভীরভাবে রেখাপাত করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সমস্ত চরিতগ্রন্থগুলির মধ্যে মাত্র দুই তিন জায়গায় চৈতন্যদেবকে হোসেন শাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে দেখা যায়। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মধ্যলীলা ১৫শ পরিচ্ছেদে দেখি চৈতন্যদেব অন্য ভক্তদের কাছে মুকুন্দের পরিচয় দেবার সময় বলেছেন, তিনি "ম্লেচ্ছ রাজা"র চিকিৎসা করেন; শেষে অবশ্য "ম্লেচ্ছ রাজা"কে তিনি "মহাবিদগ্ধ রাজা" বলেছেন। জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলে দেখি, প্রতাপরুদ্রকে গৌড় আক্রমণ থেকে বিরত করবার সময় চৈতন্যদেব বলছেন, "কালযবন রাজা পঞ্চগৌড়েশ্বর"; তিনি তাঁর প্রচণ্ড শক্তির

কথাও সেই প্রসঙ্গে বলেছেন। চৈতন্যদেব যদি সত্যই এইসব উক্তি করে থাকেন, তাহলে বুঝতে হবে তিনি হোসেন শাহকে খুব শ্রদ্ধা না করলেও তাঁর শক্তি এবং বিদ্যাবুদ্ধির উৎকর্ষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন।

হোসেন শাহের বিশিষ্ট অমাত্য রূপ-সনাতন পরবর্তী জীবনে চৈতন্যদেবের পার্ষদ হয়েছিলেন। সুতরাং তাঁদের দুজনকে এক মহাপুরুষ ও এক মহানৃপতির মধ্যের যোগসূত্র বলা যায়।

হোসেন শাহ কি সত্যপীর-পূজার প্রবর্তক?

অনেকের মনে ধারণা আছে যে আলাউদ্দীন হোসেন শাহ প্রথম সত্যপীরের সিন্নি প্রবর্তন করেন। নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর 'বিশ্বকোষে' সর্বপ্রথম এই মত প্রচার করেন। দীনেশচন্দ্র সেনও এই কথা লিখেছেন তাঁর History of Bengali Language and Literature বইয়ে। এঁদের উক্তিকে অনেকে যাচাই না করে সত্য বলে গ্রহণ করেছেন। বাংলা দেশে অনেকের মনেই এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে যে হোসেন শাহ সত্যপীর-পূজার প্রবর্তক। সেইজন্য তার বিচার করা দরকার।

প্রথমে বলে রাখা দরকার, হোসেন শাহ যে সত্যপীর-পূজার প্রবর্তন করেছিলেন, এ কথা কোন প্রামাণিক সূত্রে পাওয়া যায় না। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের আগে সত্যপীরেব কোন উল্লেখ নিঃসন্দিগ্ধভাবে কোথাও পাওয়া যায় না।* সুতরাং ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরে এদেশে সত্যপীর-পূজার প্রবর্তন হয়েছিল বলে মনে হয়।

প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে হোসেন শাহ কর্তৃক সত্যপীর-পূজার প্রবর্তন করার ধারণা লোকের মনে এল কেন? এল, তার কারণ অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে সত্যপীর সম্বন্ধে নানা রকম অলৌকিক-রসাশ্রিত কাহিনী প্রচলিত হয়েছিল। তার মধ্যে একটি কাহিনীতে আছে সত্যপীর "আলা বাদশাহ" নামে জনৈক নৃপতির কুমারী কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং "আলা বাদশাহ" সত্যপীরের পূজা করেন। আর একটি কাহিনীতে আছে "হোছেন শাহ" নামে জনৈক রাজা সত্যপীরের কৃপা লাভ করেন। নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর 'বিশ্বকোষে' (অষ্টাদশ ভাগ, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৬০) সর্বপ্রথম এই কাহিনীগুলি

* কোন কোন গবেষক মনে করেন, কবি কঙ্ক ও শেখ ফয়জুল্লাহ্ ষোড়শ শতাব্দীতে যথাক্রমে সত্যনারায়ণ ও সত্যপীরের পাঁচালী রচনা করেছিলেন। কিন্তু আমরা এই মত সমর্থন করি না।

নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি লেখেন, "……সত্যনারায়ণের কথায় যে 'আলা' বাদশাহের উল্লেখ আছে, তাঁহাকে আমরা আলাউদ্দীন হোসেন শাহ বলিয়া মনে করি। হোসেন শাহ হিন্দু মুসলমানকে সমভাবে দেখিতেন; তাঁহার উদারতা ও ন্যায়পরতা ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ। সম্ভবতঃ হিন্দুমুসলমানের মধ্যে একতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে তাঁহারই যত্নে সত্যনারায়ণের পূজা প্রবর্ত্তিত হয়।" দীনেশচন্দ্র সেন রামানন্দ এবং নায়েক ময়াজ গাজীর লেখা দুটি সত্যপীরের পাঁচালীর তুলনা করে সিদ্ধান্ত করেন যে হোসেন শাহ-ই সত্যপীর-পূজার প্রবর্তক (History of Bengali Language and Literature, 1911, p. 797)।

এ সম্বন্ধে আমি কয়েক বছর আগে লিখেছিলাম, "শঙ্কর-আচার্য এবং কবি কর্ণ রচিত 'সত্যপীরের পাঁচালী'তে জনৈক 'আলা বাদশাহ' কর্তৃক সত্যপীরের পূজার একটি অলৌকিক-রসাশ্রিত কাহিনী পাওয়া যায় এবং আরিফ রচিত 'লালমোনের কেচ্ছা'য় এই কটি চরণ মেলে,

> সত্যপীর ছিল ছলে লালমোন সুন্দরী।
> হোছেন শাহা বাদশা নিয়া হয় দেশান্তরী॥
>
> পূরিল মনের সাধ পোহাইল রজনী।
> সও লক্ষ টাকা দিল সত্যপীরের সিনি॥

একথা মনে করা যেতে পারে, শঙ্কর-আচার্য ও কবি কর্ণের পাঁচালীতে উল্লিখিত 'আলা বাদশাহ' এবং লালমোনের কেচ্ছায় উল্লিখিত 'হোছেন শাহা বাদশা' অভিন্ন লোক, এবং ইনি আসলে বাংলার সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খৃঃ)। হয়ত হোসেন শাহ কোন সময় সত্যপীরের সিন্নি দিয়েছিলেন, সেই কাহিনীই পরবর্তী সাহিত্যে পল্লবিত ও নানা অলৌকিক কাহিনীর সঙ্গে জড়িত আকারে স্থান পেয়েছে।" (বাংলার নাথসাহিত্য, বিশ্বভারতী প্রকাশিত সাহিত্য-প্রকাশিকা, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৩০)

কিন্তু এখন আর এই মত সমর্থন করতে পারছি না। কারণ প্রথমত, "আলা বাদশাহ" ও "হোছেন শাহা" সংক্রান্ত কাহিনীগুলি একেবারে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। এগুলি থেকে দুজনকে এক লোক বলে মনে হয় না। দ্বিতীয়ত, এই সব কাহিনীতে "আলা বাদশাহ" ও "হোছেন শাহা" কাউকেই বাংলার

রাজা বলা হয় নি। বাংলার বিখ্যাত রাজা আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সঙ্গে তাঁদের অভিন্ন ভাবার অনুকূলে এক নামসাদৃশ্য ছাড়া আর কোন যুক্তিই নেই। তৃতীয়ত, "আলা বাদশাহ" ও হোছেন শাহা"র কাহিনীগুলি এতই অলৌকিক-রসাশ্রিত যে তাদের কোন সামান্যতম বাস্তব ভিত্তি আছে বলেও মনে হয় না।

সুতরাং, আলাউদ্দীন হোসেন শাহ সত্যপীর-পূজার প্রবর্তন করেছিলেন, এরকম ধারণার কোন হেতু নেই।

রজনীকান্ত চক্রবর্তী তাঁর 'গৌড়ের ইতিহাস'-এ লিখেছেন যে রাজা গণেশ বাংলা দেশে সত্যপীরের সিনি দেবার প্রথা প্রবর্তন করেন। বলা বাহুল্য, এই উক্তির পিছনেও কোন প্রমাণ নেই।

হোসেন শাহের মন্ত্রী, কর্মচারী ও অমাত্যবর্গ

বিভিন্ন সূত্র থেকে হোসেন শাহের বহু মন্ত্রী, কর্মচারী ও অমাত্যের নাম পাওয়া যায়। নীচে আমরা তার একটি যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়নের চেষ্টা করলাম।

হোসেন শাহের বিভিন্ন শিলালিপি থেকে তাঁর এই সব মুসলমান কর্মচারীর নাম পাওয়া যায়।

(১) **খলিশ খান**

ইনি ৯১১ হিঃ বা ১৫০৫-০৬ খ্রীষ্টাব্দে মুয়াজ্জমাবাদ বা সোনারগাঁও অঞ্চলের উজীর ও সর-এ-লস্কর ছিলেন। একটি শিলালিপিতে এঁর নাম পাওয়া যায়।

(২) **হিন্দু খান**

ইনি ৯১১-১২ হিঃ বা ১৫০৫-০৭ খ্রীষ্টাব্দে হোসেনাবাদ, অর্‌সা সজ্‌লা মঙ্খ্‌বাদ এবং লাওবলা এলাকার সর-এ-লস্কর এবং প্রথম দুই স্থানের উজীর ছিলেন। দু'টি শিলালিপিতে এঁর নাম পাওয়া যায়।

(৩) **রুকনুদ্দীন রুকন্‌ খান**

ইনিও হোসেনাবাদ, অর্‌সা সজ্‌লা মঙ্খ্‌বাদ ও লাওবলা এলাকার সর-এ-লস্কর এবং প্রথম দুই স্থানের উজীর ছিলেন। সম্ভবত ইনি হিন্দু খানের পরে ঐ পদে নিযুক্ত হন। একটি শিলালিপিতে এঁর নাম এইভাবে উল্লিখিত হয়েছে—"রুকনুদ্দীন রুকন্‌ খান ইব্‌ন্‌ আলাউদ্দীন সরহাটী।"

(৪) আলাউদ্দীন রুকন্ খান

ইনি পূর্বোক্ত রুকনুদ্দীন রুকন্ খানের পিতা। ইনি ৯১৮ হিঃ বা ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে মুজাফফরাবাদ শহরের উজীর, ফিরোজাবাদ শহরের সর-এ-লস্কর, কোতবাল-বাক (প্রধান কোটাল) এবং মুনসিফ-দিওয়ান-কোতবালী (ফৌজদারী আদালতের বিচারক) ছিলেন। একটি শিলালিপিতে এঁর নাম এইভাবে উল্লিখিত হয়েছে—"খান মুয়াজ্জম রুকন্ খান আলাউদ্দীন সরহাটী।" ব্লকম্যানের মতে "আলাউদ্দীনে"র আগে "ইব্ন্" শব্দটি বাদ পড়ে গিয়েছে এবং এই শিলালিপিতে প্রকৃতপক্ষে পুত্র রুকনুদ্দীনের নামই উল্লিখিত হয়েছে। আর একটি শিলালিপিতে শুধুমাত্র "রুকন্ খান" নাম আছে—তাতে "আলাউদ্দীন" বা "রুকনুদ্দীন"-এর উল্লেখ নেই। এই রুকন্ খান আটটি কামহার (?) জয় করেছিলেন, বিভিন্ন শহরের উজীর ও লস্কর ছিলেন এবং কামরূপ, কামতা, জাজনগর ও উড়িষ্যা বিজয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছিলেন বলে শিলা-লিপিটি থেকে জানা যায়। ৺সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে এই রুকন্ খান অসমীয়া বুরঞ্জীতে বর্ণিত "বড় উজীর"-এর সঙ্গে অভিন্ন (Mughal North-East Frontier Policy, pp. 86-87, f. n. দ্রষ্টব্য)।

(৫) খওয়াস খান

ইনি ৯১৯ হিজরা বা ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে মুয়াজ্জমাবাদের উজীর এবং ত্রিপুরার সর-এ-লস্কর ছিলেন। একটি শিলালিপিতে এঁর নাম পাওয়া যায়।

(৬) মজলিস মাহ্মুদ

ইনি কোন এক জায়গার (সম্ভবত ভাগলপুর অঞ্চলের) সর-এ-লস্কর ছিলেন। ভাগলপুরের এক শিলালিপিতে এঁর নাম পাওয়া যায়। এঁর পিতার নাম যুসুফ।

(৭) রামনন্দল (?)

ইনি ৯০৪ হিজরার ১৩ই জমাদী-অল-আউয়ল তারিখে একটি মসজিদ তৈরী করিয়েছিলেন। এঁর পিতার নাম কিনাপতি (?)।

এঁরা ছাড়াও আলাউদ্দীন হোসেন শাহের বিভিন্ন শিলালিপিতে তাঁর আরও অনেক কর্মচারীর নাম পাওয়া যায়। এঁরা মসজিদ, দরগা প্রভৃতি নির্মাণ করিয়েছিলেন। কিন্তু এঁদের বিস্তৃত পরিচয় জানা যায় না। নীচে এঁদের নাম উল্লেখ করা হল।

(৮) **মজলিস রাহৎ**

(৯) **শের খান**

(১০) **আতা মালিক**

(১১) **রিফায়ৎ খান**

(১২) **মজলিস অল-মজালিস (উপাধি)**

(১৩) **মুকাবর খান**

(১৪) **মজলিস আখিয়ার**

(১৫) **ওয়ালী মুহম্মদ**

(১৬) **জাফর খান**

(১৭) **নাজির খান**

এঁরা ছাড়া সমসাময়িক সাহিত্য থেকে হোসেন শাহের এই ক'জন মুসলমান কর্মচারীর নাম পাওয়া যায়।

(১) **পরাগল খান**

ইনি কবীন্দ্র পরমেশ্বরের পৃষ্ঠপোষক হিসাবেই বিশেষভাবে পরিচিত। কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁর মহাভারতে লিখেছেন, পরাগল খান হোসেন শাহ কর্তৃক চট্টগ্রাম অঞ্চলের লস্কর অর্থাৎ সামরিক শাসনকর্তা* নিযুক্ত হয়েছিলেন। চট্টগ্রাম জেলার 'পরাগলপুর' নামে একটি গ্রাম এখনও এঁর স্মৃতি বহন করছে।

(২) **নসরৎ খান বা ছুটি খান**

পরাগল খানের পুত্র নসরৎ খান ছুটি খান নামেই সাধারণের কাছে পরিচিত ছিলেন। এঁর প্রকৃত নাম যে নসরৎ খান, তা শ্রীকর নন্দীর উক্তি থেকে জানা যায়—"ছুটি খান নাম নসরৎ মহামতি"। এঁরই আজ্ঞায় শ্রীকর নন্দী জৈমিনি-ভারতের অশ্বমেধ পর্ব অবলম্বনে বাংলা মহাভারত লিখেছিলেন। শ্রীকর নন্দী লিখেছেন যে ছুটি খান ত্রিপুরার রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে

* "লস্কর" ফার্সী শব্দ, এর অর্থ 'সৈন্য'; কিন্তু বাংলা ভাষায় যে শব্দটি 'সামরিক শাসনকর্তা' অর্থে ব্যবহৃত হত তার প্রমাণ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের বহু জায়গা থেকে পাওয়া যায়। 'চৈতন্য-ভাগবত' থেকে জানা যায় যে, "লস্কর" রামচন্দ্র খান বাংলার "দক্ষিণ রাজ্যে"র অধিকারী ছিলেন এবং সেখানকার "সব ভার" তাঁর উপরে ন্যস্ত ছিল; 'রাজমালা' থেকে জানা যায় যে, ত্রিপুরারাজ ধন্যমাণিক্য খণ্ডল জয় করবার পরে "তবে রাজা সৈন্য দিয়া বৈসাইল থানা। লস্কর করিল রাজা নিজ একজনা॥"

অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য করেন এবং ত্রিপুরার লস্কর পদে নিযুক্ত হন। সম্ভবত ইনি এই পদে পূর্বোক্ত খওয়াস খানের স্থলাভিষিক্ত হন।

(৩) হামিদ খান

দৌলত-উজীর বাহরাম খানের লেখা 'লায়লী-মজনু'তে এঁর নাম পাওয়া যায়। লায়লী-মজনু ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রীঃ) রচিত হয়। এতে দৌলত-উজীর লিখেছেন যে, তাঁর পূর্বপুরুষ হামিদ খান হোসেন শাহের প্রধান উজীর ছিলেন। তিনি বহুগুণে বিভূষিত এবং অদ্বিতীয় দাতা ছিলেন,

পূর্বকালে নরপতি ভুবন বিখ্যাত অতি
আছিল হোসেন শাহাবর।
তান রত্ন সিংহাসন অতি মহা বিলক্ষণ
গৌড়েত শোভিত মনোহর ॥
প্রধান উজির তান সুনাম হামিদ খান
তাহার গুণের অন্ত নাই।
অন্নশালা স্থানে স্থান মসজিদ সুনির্ম্মাণ
পুষ্করণী দিলেক ঠাঁই ঠাঁই ॥
অনুদিন মহামতি পিপীলিকা মক্ষী প্রতি
সর্করাদি দিলেন্ত খাইবার।
কাক পিক পক্ষী আদি শিবা সেজা চতুষ্পদী
যোগাইলা সভান আহার ॥
বাতুল আতুর জথ পালিলেন্ত অবিরত
দান ধর্ম্ম করিলা বিশেষ ॥
নটক গাইন জান সত্য জথ কৃতি তান
প্রকাশ হইল সর্ব্বদেশ ॥
শুনিয়া দানের ধ্বনি ক্রোধ হইল নৃপমণি
জথ ধন লুটাএ সদাএ।
কেমত ধার্ম্মিক সার একে একে সপ্তবার
তাহাকে বুঝিল পরীক্ষাএ ॥

হোসেন শাহ নাকি সাতবার সাতরকম উপায়ে হামিদ খানকে পরীক্ষা করে তাঁর অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেয়েছিলেন। অন্তত হামিদ খানের বংশধর

বাহ্‌রাম খান সেই কথা লিখেছেন। তিনি আরও লিখেছেন যে হামিদ খানের শক্তির পরীক্ষা সমাপ্ত হবার পর হোসেন শাহ্ তাঁকে

করিলেন্ত প্রশংসা অধিক।

দেখিয়া ধর্ম্মের সাজ ভালবাসে মহারাজ
প্রসাদ করিলা দুই সিক॥

নগর ফতেয়াবাদ দেখিয়া পুরএ সাধ
চাটিগ্রাম সুনাম প্রকাশ।

মনোভব মনোরম অমরাবতীর সম
সাধু সৎ অনেক নিবাস॥

লবণাম্বু সন্নিকট কর্ণফুলি নদীতট
শুভপুরী অতি দিব্যমান।

চৌদিকে পর্বত গড় অধিক উঞ্চলতর
তাত শাহা বদর আলাম॥

আদেশিলা গৌড়েশ্বরে উজির হামিদ খাঁরে
অধিকারী হৈতে চাটিগ্রাম।

আত্মরূপে দানধর্ম্ম করিলা পুণ্যের কর্ম্ম
আনন্দে রহিলা সেই ঠাম॥

বাহ্‌রাম খানের এই বর্ণনা কতদূর সত্য আর কতখানি অতিরঞ্জিত, তা নির্ণয় করার বর্তমানে কোন উপায় নেই।

(অধ্যাপক আহ্‌মদ শরীফ সম্পাদিত ও ঢাকার বাঙ্‌লা-একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত দৌলত-উজীর বাহ্‌রাম খানের 'লায়লী-মজনু' থেকে উপরের উদ্ধৃতগুলি গৃহীত হয়েছে। ইতিপূর্বে বঙ্গীয় প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যার ১৪-১৭ পৃষ্ঠায় আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ এই বইয়ের একটি পুথির বিবরণ দিয়েছিলেন এবং উপরে প্রদত্ত অংশ উদ্ধৃত করেছিলেন। তার মধ্যে এক জায়গায় 'সুনাম হামিদ খান'-এর জায়গায় 'মহম্মদ খান নাম' এই ভ্রান্ত পাঠ পাওয়া যায়, কিন্তু অন্যান্য জায়গায় কবির পূর্বপুরুষের নাম 'হামিদ খান' রূপেই উল্লিখিত হয়েছে।)

(৫) হৈতন খাঁ

'রাজমালা'তে এঁর নাম পাওয়া যায়। হোসেন শাহের ইনি অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। 'রাজমালা'র মতে হোসেন শাহের আর একজন সেনাপতি

গৌরাই মল্লিক ত্রিপুরা জয় করতে গিয়ে ব্যর্থতা বরণ করার পরে হৈতন খাঁর উপর ত্রিপুরা অভিযানের নেতৃত্ব অর্পণ করা হয়; কিন্তু তিনিও সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। এ সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। 'হৈতন খাঁ' নামটি বড়ই অদ্ভুত। এর অর্থও করা যায় না। তবে হোসেন শাহের কর্মচারীদের মধ্যে এই জাতীয় অর্থহীন (?) নামের আরও নিদর্শন পাওয়া যায়। 'পরাগল খান' নামই এর দৃষ্টান্ত।

(৪) মজিলীশ বারবক

১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত মহাদেব আচার্যসিংহের 'মালতীমাধব-টীকা'য় এঁর নাম পাওয়া যায়। আচার্যসিংহ এঁকে "গৌড়মহীমহেন্দ্রসচিবশ্রেণীশিরোভূষণ" বলেছেন। ইনি সম্ভবত ঐ সময়ে নবদ্বীপ অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন।

(৫) অজ্ঞাতনামা সীমাধিকারী

কবিকর্ণপুর তাঁর 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকে এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃতে' এই ব্যক্তির উল্লেখ করেছেন। এঁরা লিখেছেন যে চৈতন্যদেব নীলাচল থেকে গৌড়ে আগমনের সময় জলপথে আসছিলেন। কিন্তু উৎকল ও গৌড় রাজ্যের সীমানায় এসে তাঁরা সঙ্কটে পড়লেন, কারণ সে সময়ে দুই রাজ্যের মধ্যে শত্রুতা বর্তমান ছিল, তাই যারা উড়িষ্যা থেকে সীমান্ত পার হয়ে বাংলায় যেত, তাদের দুরবস্থার একশেষ হত; বাংলার সীমাধিকারী (officer-in-charge of the frontier) ছিল জনৈক মুসলমান, সে ঘোরতর মাতাল ও দুর্বৃত্ত প্রকৃতির ছিল এবং যারা সীমানা পার হয়ে আসত, তাদের চরম দুর্গতি করত। কবিকর্ণপূর লিখেছেন,

"তৎসীমাধিকারী তুরুষ্কোঽরুষ্কোষকার ইব সর্ব্বেষাং মর্ম্মহা মহামদ্যপো দুর্বৃত্তচক্রচূড়ামণিঃ ইতো দেশাদ্ যে গচ্ছন্তি তেষাং দুর্গতিঃ ক্রিয়তে।"

[সেই সীমানার অধিকারী মহামদ্যপ, দুর্বৃত্তমণ্ডলীর চূড়ামণি এবং হৃদয়জাত ব্রণের মত সকলের মর্মপীড়ক এক "তুরুষ্ক" আছে, সে এই দেশ (অর্থাৎ উড়িষ্যা থেকে) যারা গমন করে, তাদের দুর্গতি করে থাকে।]

কবিকর্ণপূর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে এই মুসলমান সীমাধিকারী আকস্মিকভাবে চৈতন্যদেবের ভক্ত হয়ে পড়ে এবং তাঁকে নিরাপদে সীমান্ত পার করিয়ে দিয়ে অনেকদূর অবধি তাঁর সঙ্গে যায়।

(৫) **ছিলে খোজা**

'রাজমালা'য় এর নাম পাওয়া যায়। গৌরাই মল্লিকের নেতৃত্বে হোসেন শাহের যে সৈন্যবাহিনী ত্রিপুরা আক্রমণ করে, এই ব্যক্তি সেই বাহিনীর অন্যতম সৈন্য ছিল।

(৬) **নবদ্বীপের কাজী**

ইনি চৈতন্যদেবের নবদ্বীপলীলার সময়ে কীর্তনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন। চৈতন্যদেব সদলবলে কীর্তনে বেরিয়ে সে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেছিলেন। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে লেখা আছে যে চৈতন্যদেবের ভক্তের দল কাজীর ঘর ভেঙে ফেলে ফুলের বাগানের গাছ উপড়ে তছনছ করে দিয়েছিলেন; চৈতন্যদেব স্বয়ং কাজীকে ধরে আনতে বলেন ও তাঁর ঘরে আগুন দিতে বলেন, ভক্তেরাই তাঁকে বুঝিয়ে সুজিয়ে ঠাণ্ডা করে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর চৈতন্যচরিতামৃতে লিখেছেন যে এরপর চৈতন্যদেব "ভব্যলোক পাঠাইয়া কাজীরে বোলাইলা।" কাজী এসে চৈতন্যদেবকে বলল,

গ্রাম-সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় মোর চাচা।
দেহ-সম্বন্ধ হইতে হয় গ্রাম-সম্বন্ধ সাঁচা॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা।
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥

অতঃপর চৈতন্যদেবের সঙ্গে কাজীর গোবধ নিয়ে বিচার হয় এবং বিচারে পরাস্ত হয়ে কাজী চৈতন্যদেবের পা ছুঁয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করেন, "এই কৃপা কর যে তোমাতে রহে ভক্তি।" এই কাজীর বাড়ী ছিল সিমুলিয়া গ্রামে।

কোন প্রামাণিক চরিতগ্রন্থে এই কাজীর নাম উল্লিখিত হয়নি। একটি অর্বাচীন কিংবদন্তীর মতে এঁর নাম ছিল 'চাঁদ কাজী' এবং ইনি হোসেন শাহের দৌহিত্র ছিলেন। আর একটি অর্বাচীন কিংবদন্তীর মতে এঁর নাম ছিল মৌলানা সিরাজুদ্দীন এবং ইনি হোসেন শাহের শিক্ষক ছিলেন।

(৭) **গদাধর দাসের গ্রামের কাজী**

'চৈতন্যভাগবত' অন্ত্যখণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে এঁর উল্লেখ আছে। বৃন্দাবনদাস লিখেছেন,

সেই গ্রামে কাজী আছে পরম দুর্ব্বার।
কীর্ত্তনের প্রতি দ্বেষ করয়ে অপার॥

পরানন্দে মত্ত গদাধর মহাশয়।
নিশাভাগে গেলা সেই কাজীর আলয়॥

যে কাজীর ভয়ে লোক পালাত, নির্ভয়ে তার বাড়ীতে গিয়ে

গদাধর বোলে, আরে কাজী বেটা কোথা।
ঝাট কৃষ্ণ বোল নহে ছিণ্ডোঁ এই মাথা॥
অগ্নি হেন ক্রোধে কাজী হইল বাহির।
গদাধরদাস দেখি মাত্র হৈল স্থির॥
কাজী বোলে গদাধর তুমি কেনে এথা।

গদাধর তখন বললেন, "শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ প্রভু অবতীর্ণ হয়ে সকলকে 'হরি' বলিয়েছেন, কেবল তুমি 'হরি' নাম করনি। তাই

তাহা বোলাইতে আইলাঙ্ তোমা স্থান॥
পরম-মঙ্গল হরি-নাম বোল তুমি।
তোমার সকল পাপ উদ্ধারিব আমি॥
যদ্যপিহ কাজী মহা হিংসক চরিত।
তথাপিহ না বোলে কিছু হইল স্তম্ভিত॥
হাসি বোলে কাজী শুন দাস গদাধর।
কালিকা বলিবাঙ্ হরি আজি যাহ ঘর॥
হরি-নাম মাত্র শুনিলেন তার মুখে।
গদাধরদাস পূর্ণ হৈল প্রেম সুখে॥
গদাধরদাস বোলে, আর কালি কেনে।
এই ত বলিলা 'হরি' আপন বদনে॥
আর তোর অমঙ্গল নাহি কোন ক্ষণে।
যখনে করিলা 'হরি' নামের গ্রহণে॥

কাজীদের সঙ্গে চৈতন্যভক্তদের বিরোধ প্রায়ই লেগে থাকত। কোন কোন সময় তাঁরা কাজীদের উপর নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতেও সমর্থ হতেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে চৈতন্যদেবের কয়েকজন ভক্ত ও পার্ষদের কাজীদের সঙ্গে বিরোধ এবং কাজীদের নিয়ে হরিনাম করানোর উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা

(১) কাজি মুখে হরি বোলাই নিত্যানন্দ। (উত্তরখণ্ড, সাহিত্য পরিষৎ সং, পৃঃ ১৪৮)

(২) কাজি সনে বাদ করে প্রেম উনমাদে।
সাতদিন গৌরীদাস ছিলা গঙ্গাহ্রদে ॥ (উত্তরাখণ্ড, সাহিত্য পরিষদ সং, পৃঃ ১৫১)

(৩) কাজি সনে বাদ করিল গদাধর দাস।
অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিল দেখি লোকে ত্রাস ॥ (ঐ, পৃঃ ১৫১)

চৈতন্যচরিতগ্রন্থগুলিতে যেভাবে কাজীদের পরাজয়ের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে, তার মধ্যে অনেকখানি অতিরঞ্জন আছে সন্দেহ নেই।

(৮) করবে খাঁ

'রাজমালা'য় এঁর নাম পাওয়া যায়। ত্রিপুরার বিরুদ্ধে হৈতন খাঁর নেতৃত্বে যে সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হয়েছিল, তার সঙ্গে ইনি সহকারী সেনানায়ক হিসাবে গিয়েছিলেন। ইনি জাতিতে পাঠান ছিলেন।

(৯) অজ্ঞাতনামা কারাধ্যক্ষ (শেখ হাব্বু ?)

'চৈতন্যচরিতামৃত' মধ্যলীলা ২০শ পরিচ্ছেদে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। সনাতন হোসেন শাহের সঙ্গে উড়িষ্যা-অভিযানে যেতে রাজী না হওয়ায় হোসেন শাহ সনাতনকে কারারুদ্ধ করে উড়িষ্যায় চলে যান। সনাতন তখন এই "যবন-রক্ষক"কে অনেক কাকুতিমিনতি করেন এবং অবশেষে সাত হাজার মুদ্রা দিয়ে তাঁকে বশীভূত করেন।

সাত-হাজার মুদ্রা তার আগে রাশি কৈল ॥
লোভ হৈল যবনের মুদ্রা দেখিয়া।
রাত্র্যে গঙ্গাপার কৈল দাঁড়ুকা কাটিয়া ॥

কিংবদন্তী অনুসারে এই মুসলমান কারাধ্যক্ষের নাম শেখ হাব্বু এবং এঁর বাড়ী ছিল ফতেপুর গ্রামে; সেখানে একটি ধ্বংসস্তূপকে এখনও লোকে এঁর ভিটা বলে দেখিয়ে দেয় (Memoirs of Gaur and Pandua, p. 35 দ্রষ্টব্য)।

(১০) সপ্তগ্রাম-মুলুকের চৌধুরী

'চৈতন্যচরিতামৃত' অন্ত্যলীলা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে এঁর উল্লেখ আছে। ইনি সপ্তগ্রাম মুলুকের "অধিকারী" অর্থাৎ শাসনকর্তা ছিলেন। হিরণ্য মজুমদার যখন গৌড়ের সুলতানের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে এই মুলুকের রাজস্ব আদায়ের ভার নেন এবং বিশ লক্ষ টাকা রাজস্বের মধ্যে বার লক্ষ টাকা রাজকোষে জমা

দিয়ে বাকী আট লক্ষ টাকা নিজে নিতে থাকেন, তখন এই "চৌধুরী" হিংসায় জ্বলতে থাকেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন,

হেনকালে মুলুকের এক ম্লেচ্ছ অধিকারী।
সপ্তগ্রাম মুলুকের সে হয় চৌধুরী॥
হিরণ্যদাস মুলুক নিল মোকতা করিয়া।
তার অধিকার গেল মরে সে দেখিয়া॥
বার লক্ষ দেন রাজায় সাধেন বিশ লক্ষ।
সেই তুড়ুক কিছু না পাঞা হৈল প্রতিপক্ষ॥
রাজঘরে কৈফিতি দিয়া উজীর আনিল।
হিরণ্য মজুমদার পলাইল রঘুনাথেরে বান্ধিল॥
প্রতিদিন রঘুনাথে করয়ে ভর্ৎসনা।
বাপ-জ্যেঠা আনহ নহে পাইবি যাতনা॥

রঘুনাথ মিষ্ট কথায় এই মুসলমানের মন জয় করেন এবং তাঁর জ্যাঠা হিরণ্য মজুমদারের সঙ্গে এঁর একটা মিটমাট করে দেন।

এখন হোসেন শাহের হিন্দু অমাত্য ও কর্মচারীদের পরিচয় দেব। এদের মধ্যে অনেকের নাম সুপরিচিত, কিন্তু প্রামাণিক সূত্র অবলম্বনে হোসেন শাহের হিন্দু অমাত্য-কর্মচারীদের নাম ও পরিচয়ের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়নের চেষ্টা এপর্যন্ত কেউ করেন নি। এখন আমরা সেই চেষ্টাই করব।

(১) **সনাতন**

ইনি ছিলেন হোসেন শাহের বিশিষ্ট অমাত্যদের অন্যতম। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক চরিতকার মুরারি গুপ্ত তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্' গ্রন্থের ৩য় প্রক্রম ১৮শ সর্গ ১০ম শ্লোকে সনাতন ও তাঁর ভ্রাতা রূপকে "রাজপাত্র" বলেছেন। সনাতন যে হোসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন এবং তাঁর সভায় বসতেন, তা কবিকর্ণপুর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তি থেকে জানা যায়। কবিকর্ণপুর সনাতনকে "গৌড়েন্দ্রস্য সভাবিভূষণমণিঃ" বলেছেন; কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন, "রাজমন্ত্রী সনাতন বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি।" চৈতন্যদেব যখন রামকেলিতে যান, তখন সনাতন ও রূপ তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং কিছুদিন পরে চাকরী ও সংসার ছেড়ে তাঁরা চৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলিত হন। এঁদের অবশিষ্ট জীবন বৃন্দাবনে কাটে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভাষ্যকার ও বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নেতা হিসাবেই এই দুই ভাই অমর হয়েছেন। সনাতন যে হোসেন শাহের কত

প্রিয় ছিলেন ও তাঁর সরকারে কত দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেকথা 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মধ্যলীলা ১৯শ পরিচ্ছেদের নিম্নোদ্ধৃত অংশ পড়লে বোঝা যায়।

এথা সনাতন গোসাঞি ভাবে মনেমন।
রাজা মোরে প্রীতি করে, সে মোর বন্ধন॥
... ...
অস্বাস্থ্যের ছদ্ম করি রহে নিজ ঘরে।
রাজকার্য্য ছাড়িল, না যায় রাজদ্বারে॥
লেভ কায়স্থগণে রাজকার্য্য করে।
আপনি স্বগৃহে করে শাস্ত্রের বিচারে॥
ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশ ত্রিশ লঞা।
ভাগবত বিচার করে সভাতে বসিয়া॥
আরদিন গৌড়েশ্বর সঙ্গে একজন।
আচম্বিতে গোসাঞি-সভাতে কৈল আগমন॥
পাৎশা দেখিয়া সভে সম্ভ্রমে উঠিলা।
সম্ভ্রমে আসন দিয়া রাজা বসাইলা॥
রাজা কহে তোমার স্থানে বৈদ্য পাঠাইল।
বৈদ্য কহে ব্যাধি নাহি সুস্থ সে দেখিল॥
আমার যে কিছু কার্য্য সব তোমা লঞা।
কার্য্য ছাড়ি রহিলা তুমি ঘরেতে বসিয়া॥

(২) রূপ

ইনি সনাতনের ছোট ভাই। ইনিও সনাতনের মত হোসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মধ্যলীলা ১৬শ পরিচ্ছেদে দেখি চৈতন্যদেব রূপ-সনাতন সম্বন্ধে বলছেন, "দুই ভাই ভক্তরাজ কৃষ্ণকৃপাপাত্র। ব্যবহারে রাজমন্ত্রী হয় রাজপাত্র॥" রূপ ছিলেন অপূর্ব কবিত্বশক্তির অধিকারী। চৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সন্ন্যাসী হবার আগে ইনি সংস্কৃত ভাষায় কয়েকটি লৌকিক কাব্য রচনা করেছিলেন, তার পরে অনেক কাব্য ও নাটক রচনা করেন, সমস্তই কৃষ্ণলীলাবিষয়ক ও ভক্তিরসাত্মক। রূপ গোস্বামী 'ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি' নামে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অলঙ্কারশাস্ত্র রচনা করেন এবং 'পদ্যাবলী' নামে বিখ্যাত পদসঙ্কলনগ্রন্থ সঙ্কলন করেন।

এখানে একটি বিষয়ের আলোচনা করা দরকার। 'চৈতন্যভাগবত', 'চৈতন্য-চরিতামৃত', 'চৈতন্যমঙ্গল' প্রভৃতি চরিতগ্রন্থে অনেক ক্ষেত্রে সনাতন ও রূপের কথা যখন বলা হয়েছে, তখন দু'টি উপাধিরও উল্লেখ করা হয়েছে। এই দু'টি উপাধি হচ্ছে—সাকর মল্লিক ও দবীর খাস। কিন্তু এ দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টি কার উপাধি, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে কিছু মতভেদ দেখা যায়। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে সনাতনের উপাধি ছিল 'সাকর মল্লিক' এবং রূপের 'দবীর খাস'। কিন্তু 'সপ্তগোস্বামী' নামক গ্রন্থের মতে রূপেরই উপাধি ছিল 'সাকর মল্লিক' এবং সনাতনের 'দবীর খাস'। এই মত কোন কোন বিশিষ্ট গবেষক গ্রহণ করেছেন। গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী তাঁর 'শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণ' বইয়ে (পৃঃ ১৪৭-১৪৯) এসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে "সাকর মল্লিক ও দবির খাস—শ্রীসনাতনকেই এই দুই নামে অভিহিত করা হইয়াছে।" এইসব পরস্পরবিরোধী অভিমতের জন্য বিষয়টি সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে; এই আলোচনায় আমরা কেবলমাত্র প্রামাণিক চৈতন্যচরিতগ্রন্থগুলির উক্তির উপরেই নির্ভর করব।

সনাতনের উপাধি যে সাকর মল্লিক ছিল, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। প্রমাণস্বরূপ আমি চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত থেকে কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করছি,

> সাকর মল্লিক আর রূপ দুই ভাই। (চৈ. ভা., অন্ত্য, ১০ম অঃ)
> সাকর মল্লিক নাম ঘুচাইয়া তান।
> সনাতন অবধূত থুইলেন নাম॥ (চৈ. ভা., অন্ত্য, ১০ম অঃ)
> অর্দ্ধরাত্রে দুই ভাই আসিলা প্রভুস্থানে।
> প্রথমে মিলিলা নিত্যানন্দ হরিদাস সনে॥
> তাঁহা দুইজন জানাইল প্রভুর গোচরে।
> রূপ সাকর মল্লিক আইলা তোমা দেখিবারে॥
> (চৈ. চ., মধ্য, ১ম পঃ)

সর্বশেষ উদ্ধৃত অংশটির "রূপ সাকর মল্লিক" কথার অর্থ—রূপ এবং সাকর মল্লিক। ঐ কথাটি থেকে কেউ যেন না ভাবেন যে রূপ আর সাকর মল্লিক একই লোক। কারণ দু'জন লোক যখন মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন,

তখন নিত্যানন্দ এবং হরিদাস মহাপ্রভুকে তাঁদের কথা বলতে গিয়ে মাত্র একজনের নাম করবেন বলে কল্পনা করা যায় না।

'সাকর মল্লিক' সম্ভবত ফার্সী শব্দ 'সগীর মলিক'-এর অপভ্রংশ। 'সগীর মলিক' অর্থ 'ছোট রাজা'। এই উপাধিটি থেকে বোঝা যায়, সনাতন হোসেন শাহের সরকারে কত সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

'সাকর মল্লিক' বলতে যে সনাতনকেই বোঝানো হয়েছে, তা জানা গেল। এখন 'দবীর খাস' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে হবে। 'সাকর মল্লিক' ও 'দবীর খাস' সমজাতীয় শব্দ নয়। 'সাকর মল্লিক' একটি উপাধিমাত্র, কিন্তু 'দবীর খাস' একটি রাজপদের নাম। 'দবীর' মানে লেখক (সেক্রেটারী); 'দবীর' ও 'মুন্‌শী' সমার্থবাচক শব্দ। 'খাস' শব্দের অর্থ প্রধান। সুতরাং 'দবীর খাস' বলতে রাজার প্রধান সেক্রেটারীকে বোঝাত। 'দবীর খাস' (দবীর-ই-খাস)-এর কাজ ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এসম্বন্ধে আই এইচ কুরেশী লিখেছেন, "The third office was the diwan-i-insha which dealt with royal correspondence. It has rightly been called the 'treasury of secrets,' for the dabir-i-khās, who presided over this department, was also the confidential clerk of the state......The dabir-i-khās was assisted by a number of dabirs, men who had already established their reputatian as masters of style......The dabir-i-khās was always at hand so that he could be summoned to draft an urgent letter or even take down notes of any conversation worth-recording. (The Administration of the Sultanalte of Delhi, 4th Edition, pp. 86-87)

প্রামাণিক চৈতন্যচরিতগ্রন্থগুলির সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তাদের মধ্যে কেবলমাত্র রূপকে বা কেবলমাত্র সনাতনকে 'দবীর খাস' বলা হয় নি, দুজনকেই 'দবীর খাস' বলা হয়েছে, অর্থাৎ রূপ ও সনাতন দুজনেই হোসেন শাহের 'দবীর খাস' ছিলেন। চৈতন্যচরিতগ্রন্থগুলির যে সব অংশে 'দবীর খাস'-এর উল্লেখ পাওয়া যায়, সেগুলি উদ্ধৃত করলেই বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে।

বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবতে' কয়েক জায়গায় 'দবীর খাস'-এর উল্লেখ পাওয়া যায় ; যেমন,

(১) শেষখণ্ডে শ্রীগৌরসুন্দর মহাশয়।
দবীর খাসেরে প্রভু দিলা পরিচয় ॥
প্রভু চিনি দুই ভাইর বন্ধ বিমোচন।
শেষে নাম থুইলেন রূপ-সনাতন ॥ (আদিখণ্ড, প্রথম অধ্যায়)

(২) হেনমতে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের রঙ্গ ॥
তাহান কৃপার এই স্বাভাবিক ধর্ম্ম।
রাজ্য-পদ ছাড়ি করে ভিক্ষুকের কর্ম্ম ॥
কলিযুগে তার সাক্ষী শ্রীদবীর খাস।
রাজ্যপাট ছাড়ি যার অরণ্যে বিলাস ॥ (আদিখণ্ড, নবম অধ্যায়)

(৩) দবীর খাসেরে প্রভু বলিতে লাগিলা।
এখানে তোমার কৃষ্ণপ্রেমভক্তি হইলা ॥
অদ্বৈতের প্রসাদে হয় প্রেমভক্তি।
জানিহ অদ্বৈত শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণশক্তি ॥
কথোদিন জগন্নাথ শ্রীমুখ দেখিয়া।
তবে দুই ভাই মথুরায় থাক গিয়া ॥
তোমা সভা হৈতে যত রাজস তামস।
পশ্চিমা সভারে দিয়া দেহ ভক্তিরস ॥ (অন্ত্যখণ্ড, দশম অধ্যায়)

কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃতে'ও কয়েক জায়গায় 'দবীর খাস'এর উল্লেখ দেখতে পাই ; যেমন,

(৪) দবীর খাসেরে রাজা পুছিল নিভৃতে।
গোসাঞির মহিমা তেহোঁ লাগিলা কহিতে ॥
(মধ্যলীলা, প্রথম পরিচ্ছেদ)

(৫) তবে দবীর খাস আইলা আপনার ঘরে ॥
ঘরে আসি দুই ভাই যুকতি করিয়া।
প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাইয়া ॥ (ঐ)

(৬) শুনি মহাপ্রভু কহে শুন দবীর খাস।
তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস ॥ (ঐ)

যাঁরা 'দবীর খাস'কে রূপের উপাধি বলে মনে করেছিলেন, তাঁদের একমাত্র অবলম্বন উপরে উদ্ধৃত (৬) নং উদাহরণের প্রথম চরণের পাঠান্তর, "শুনি প্রভু কহে শুন রূপ দবীর খাস।" কিন্তু এখানে "রূপ দবীর খাস" শব্দের অর্থ 'দবীর খাস উপাধিধারী রূপ' যেমন করা যায়, তেম্‌নি 'রূপ এবং দবীর খাস'ও করা যায়; তাহলে 'দবীর খাস' সনাতনের উপাধি হয়। কিন্তু "শুনি প্রভু কহে শুন রূপ দবীর খাস" প্রকৃত পাঠ নয়, "শুনি মহাপ্রভু কহে শুন দবীর খাস"-ই প্রকৃত পাঠ, চৈতন্যচরিতামৃতের বহু নির্ভরযোগ্য পুঁথিতে এবং প্রাচীন মুদ্রিত সংস্করণ গণেশচন্দ্র ঘোষ প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' (মধ্যখণ্ড, পৃঃ ৬) এই পাঠ দেখা যায়। আর চৈতন্যচরিতামৃত ও অন্যান্য চরিতগ্রন্থগুলির সর্বত্রই যখন রূপ-সনাতনকে যুক্তভাবে 'দবীর খাস' বলা হয়েছে (নীচে আলোচনা দ্রষ্টব্য), তখন 'রূপ দবীর খাস'—এই খাপছাড়া পাঠকে প্রকৃত পাঠ বলে মেনে নেওয়া যায় না।

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে'র উক্তি থেকে 'দবীর খাস'-সমস্যার সমাধানের সুস্পষ্ট সূত্র পাওয়া যায়। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' রূপ ও সনাতন দুজনকেই খুব স্পষ্টভাবে 'দবীর খাস' (দবির খাশ) বলা হয়েছে। নীচে আমরা জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে'র প্রাসঙ্গিক অংশগুলি উদ্ধৃত করছি (এশিয়াটিক সোসাইটির G-5398 নং পুঁথির পাঠ, প্রয়োজনবোধে ছাপা বইয়ের পাঠ গৃহীত হয়েছে),

(৭) হেনকালে দবির খাশ (স) ভার সহিতে।
চৈতন্যচন্দ্রের ঠাঞি গেলা আচম্বিতে॥
মহাবৈরাগ্য মৃত্তিকাভাণ্ড সঙ্গে।
নিরবধি প্রেমধারা পুলক সর্বাঙ্গে॥
গৌড়েন্দ্র-সম্পদ তারা তৃণজ্ঞান করি।
বৃন্দাবনে ভ্রমেন অকিঞ্চন বেশ ধরি॥
ঈশ্বর দবির খাশ তাই সনাতন।*
গৌড়েন্দ্র সম্পদ ছাড়ি হইলা অকিঞ্চন॥†

---

* এই ছত্রটির পাঠ এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথির। এর অর্থ পরের পাদটীকায় দ্রষ্টব্য। ছাপা বইয়ের পাঠ "ঈশ্বর দবিরখাস ভাই সনাতন" নিতান্তই ভুল।

† এই পয়ারটির অর্থ—সনাতন ঈশ্বরের 'দবীর খাস', তাই তিনি গৌড়েশ্বরের সম্পদ ত্যাগ করে অকিঞ্চন হলেন। জয়ানন্দ যে 'দবীর খাস'-এর অর্থ জানতেন, তা এর থেকে বোঝা যায়।

সহস্র ঘোড়া যার আগু-পাছু দৌড়ে।
বাইশ লক্ষ সুবর্ণ রহিল পোঁতা গৌড়ে॥
পূর্বে তারা ব্রহ্মার মানসপুত্র ছিলা।
শাপভ্রষ্ট দুই ভাই পৃথিবী জন্মিলা॥
চৈতন্যদর্শনে তার পাপ বিমোচন।
গোসাঞি নাম থুইল দুই ভাই রূপ-সনাতন।
প্রভু বলেন শাপান্তর হইল দবির খাশ।
রূপ-সনাতন হইলা ক্ষিতি-পরকাশ॥

(৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রহিলেন কুতূহলে।
দবির খাশ দুই ভাই গেলা নীলাচলে॥
দবির খাশ দুই ভাএে খণ্ডাল্য সংসার বন্ধন।
দুই ভাএের নাম থুইল রূপ-সনাতন॥

উপরে উদ্ধৃত উদাহরণগুলি যত্নসহকারে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, 'দবীর খাস' পদের দ্বারা রূপ বা সনাতন, কাউকেই এককভাবে বোঝানো হয়নি। রূপ ও সনাতন উভয়কেই "দবীর খাস" বলা হয়েছে। প্রমাণ স্বরূপ, (৩) নং উদাহরণে বলা হয়েছে মহাপ্রভু দবীর খাসকে বললেন, "তোমরা দুই ভাই মথুরায় গিয়ে থাক।" (৫) নং উদাহরণে বলা হয়েছে, দবীর খাস ঘরে ফিরলনে এবং দুই ভাই প্রভুকে দেখবার জন্য ছদ্মবেশ ধরে গেলেন, (৬) নং উদাহরণে বলা হয়েছে মহাপ্রভু 'দবীর খাস' কে বলছেন, "তোমরা দুই ভাই আমার পুরাতন দাস", (১) ও (৭) নং উদাহরণে বলা হয়েছে, চৈতন্যদেব 'দবীর খাসে'র নাম রাখলেন রূপ-সনাতন; এই তিনটি উদাহরণে খুব স্পষ্টভাবে রূপ ও সনাতন উভয়কেই 'দবীর খাস' বলা হয়েছে। (২) নং উদাহরণে' 'যার', (৩) নং উদাহরণে 'তোমার', (৪) নং উদাহরণে 'যেহোঁ' এবং (৬) নং উদাহরণে 'তুমি' 'দবীর খাস'-এর সর্বনামরূপে ব্যবহৃত, কিন্তু তার দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে 'দবীর খাস' একজন লোকেরই নাম কারণ এই সর্বনামগুলি ষোড়শ শতাব্দীতে একবচন ও বহুবচন উভয় বচনেই ব্যবহৃত হত।

সুতরাং এখন পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে, রূপ ও সনাতন দু'জনেই হোসেন শাহের 'দবীর খাস' ছিলেন। একজন সুলতানের দুজন 'দবীর খাস থাকতে যেমন বাধা নেই, তেমনি 'দবীর খাস' পদের অধিকারীর পক্ষে 'সাকর মাল্লক'

উপাধি লাভ করতেও কোন বাধা নেই। অতএব দুই ভাইয়ের যে একই পদ ছিল, তাতে সন্দেহের কোন কারণ নেই। তবে সনাতনের 'সাকর মল্লিক' উপাধি এবং তাঁর প্রতি হোসেন শাহের "আমার যে কিছু কার্য্য সব তোমা লঞা" উক্তি থেকে মনে হয়, দু'জনের মধ্যে সনাতনেরই পদমর্যাদা বেশী ছিল, তাঁরই হাতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির ভার ন্যস্ত ছিল এবং তিনিই হোসেন শাহের বেশী প্রিয় ছিলেন।

এই দুই ভ্রাতার 'রূপ' ও 'সনাতন' নাম চৈতন্যদেবের দেওয়া। এই নামেই এঁরা পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। অর্বাচীন কিংবদন্তী অনুসারে রূপ ও সনাতনের পিতৃদত্ত নাম ছিল যথাক্রমে সন্তোষ ও অমর; কিন্তু এই কিংবদন্তীর সপক্ষে কোন প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

(৩) বল্লভ

ইনি সনাতন-রূপের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনিও শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন ও কৃপা লাভ করেছিলেন। কিন্তু লাভ করার অল্পদিন পরেই এঁর মৃত্যু হয়। বিখ্যাত জীব গোস্বামী এঁর পুত্র। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' এঁর সম্বন্ধে লেখা আছে, "অনুপম মল্লিক তাঁর নাম শ্রীবল্লভ"। সুতরাং এঁর প্রকৃত নাম বল্লভ এবং 'অনুপম মল্লিক' উপাধি—'সাকর মল্লিক'-এর মত। অতএব রূপ-সনাতনের মত বল্লভও যে হোসেন শাহের সরকারে কাজ করতেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বল্লভ রূপ-সনাতনের সঙ্গে গৌড়েই বাস করতেন, কারণ 'চৈতন্যচরিতামৃতে' দেখি সনাতন বলছেন,

আমি আর রূপ তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর।
আমা দোঁহা সঙ্গে তেহোঁ রহে নিরন্তর ॥

বল্লভ রামভক্ত ছিলেন। রূপ গোস্বামীর সঙ্গে তিনি প্রয়াগে গিয়ে মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করেন। প্রয়াগ থেকে বৃন্দাবন হয়ে বাংলায় আসার পর তিনি পরলোকগমন করেন। কোন কোন আধুনিক গ্রন্থে বল্লভ বা অনুপম মল্লিক 'অনুপ' নামে উল্লিখিত হয়েছেন। কিংবদন্তী অনুসারে তিনি গৌড়ের টাকশালের অধ্যক্ষ ছিলেন।

(৪) শ্রীকান্ত

ইনি সনাতন-রূপের ভগ্নীপতি। ইনি হাজীপুরে থাকতেন। সুলতান

হোসেন শাহের ঘোড়া সংগ্রহ করে পাঠানো ছিল এঁর কাজ। 'চৈতন্য-চরিতামৃত' মধ্যলীলা ২০শ পরিচ্ছেদে এঁর সম্বন্ধে লেখা আছে,

সেই হাজিপুরে রহে শ্রীকান্ত তার নাম।
গোসাঞির ভগিনীপতি করে রাজকাম॥
তিন লক্ষ মুদ্রা রাজা দিয়াছে তার স্থানে।
ঘোড়া মূল্য লঞা পাঠায় পাৎশার স্থানে।

(৫) **সনাতনের "বড় ভাই"** (রঘুনন্দন ?)

রূপ-সনাতনের যে আরও ভাই ছিল, তা জীব গোস্বামী তাঁর 'লঘু বৈষ্ণব-তোষণী'র উপক্রমে বলেছেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত' মধ্যলীলার ১৯শ পরিচ্ছেদে সনাতনের এক বড় ভাইয়ের উল্লেখ পাই। সনাতন যখন রাজকার্য ছেড়ে ঘরে বসেছিলেন, তখন হোসেন শাহ তাঁকে বলেছিলেন,

তোমার বড় ভাই করে দস্যু-ব্যবহার॥
জীব বহু মারিয়া বাকলা কৈল খাস।
এথা তুমি কৈলে মোর সর্বকার্য্য নাশ॥

'খাস' অর্থ রাজার নিজস্ব এলাকা। সনাতনের বড় ভাই যখন বাকলাকে "খাস" করেছিলেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই স্থলতান হোসেন শাহের কর্মচারী ছিলেন এবং এই কাজের ভার পেয়েছিলেন। এ কাজ করতে গিয়ে তিনি বহু জীব হত্যা করেছিলেন; অর্থাৎ পশুপাখী মেরেছিলেন এবং সম্ভবত যে সব মানুষ দখল ছাড়তে রাজী হয়নি, তাদেরও অনেককে বধ করেছিলেন। এই জন্য হোসেন শাহ তাঁর উপর বিরক্ত হয়ে তাঁর কাজকে "দস্যু-ব্যবহার" বলেছেন।

অবশ্য উদ্ধৃত শ্লোকের কেউ কেউ এই অর্থও করতে পারেন যে সনাতনের বড় ভাই বাকলায় হোসেন শাহের বহু প্রজাকে হত্যা করে সেখানে স্বাধীন রাজা হয়ে বসেছিলেন। কিন্তু এই অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ তা'হলে হোসেন শাহ তাঁর ভাই ও আত্মীয়দের রাজপদে বহাল রাখতেন না এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান না করে বসে থাকতেন না।

অর্বাচীন কিংবদন্তীর মতে সনাতনের এই বড় ভাইয়ের নাম রঘুনন্দন (ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭, পৃঃ ৯২০ দ্রঃ)।

'বাকলা'র সঙ্গে সনাতন-রূপের পরিবারের সম্পর্ক খুবই পুরোনো। জীব গোস্বামী তাঁর 'লঘুবৈষ্ণবতোষণী'তে বলেছেন সনাতন-রূপের পিতা কুমারদেব "দ্রোহ"বশত নৈহাটি ছেড়ে পূর্ববঙ্গ চলে যান ("কিঞ্চিৎ দ্রোহমবাপ্য

সংকুলজনির্বঙ্গালয়ং সঙ্গতঃ")। ভক্তিরত্নাকরে স্পষ্টভাবে লেখা হয়েছে যে কুমারদেব বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপে গিয়েছিলেন,

নিজগণ সহ বঙ্গদেশেতে শীঘ্র গেলা।
বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপ গ্রামেতে বাস কৈলা॥

সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সনাতন, রূপ ও বল্লভ বাক্‌লা ছেড়ে গৌড়ে এসে রাজকায করছিলেন আর তাঁদের বড় ভাই বাক্‌লাতে থেকেই রাজকার্য করতেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই চার ভাই ও তাঁদের ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত—এক পরিবারের এই পাঁচজনই হোসেন শাহের কর্মচারী ছিলেন।

'বর্ধমান সাহিত্য-সভা'র একটি সংস্কৃত পুঁথিতে (এই বইয়ের ১৪২ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত) ভুল সংস্কৃতে লেখা আছে সনাতন-রূপ-বল্লভের একজন নয়—দু'জন বড় ভাই ছিলেন এবং তাঁরা "দেশাধিকারী" ছিলেন ("জ্যেষ্ঠ অগ্রজৌ দ্বৌ দেশাধিকারিণৌ ভবৎ")। চৈতন্যচরিতামৃতের পূর্বোদ্ধৃত উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে "দেশাধিকারী" মানে এখানে আঞ্চলিক শাসনকর্তা ধরতে হবে। তাহলে বলতে হবে পাঁচ ভাইই হোসেন শাহের অধীনে কাজ করতেন। অবশ্য সংস্কৃত পুঁথিটির উক্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে তথা রূপ-সনাতনের আর একজন ভাইয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নেই।

(৬) কেশব ছত্রী

ইনি কেশব ছত্রী, কেশব বসু ও কেশব খান তিন নামেই বিভিন্ন জায়গায় উল্লিখিত হয়েছেন। এঁর নাম কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' এবং রূপ গোস্বামী সংকলিত 'পদ্যাবলী'তে লেখা হয়েছে 'কেশব ছত্রী,' কবিকর্ণপূরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক' ও কুলজীগ্রন্থে 'কেশব বসু' এবং বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' ও জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' 'কেশব খান'। সম্ভবত এঁর পদবী 'বসু', উপাধি 'খান' এবং রাজপদের নাম 'ছত্রী' *। 'চৈতন্যভাগবত' ও 'চৈতন্যচরিতামৃতে' লেখা আছে যে হোসেন শাহ যখন কেশবের কাছে চৈতন্যদেব সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানতে চান, তখন কেশব চৈতন্যদেবের যাতে

* 'ছত্রী নামক রাজপদের অস্তিত্ব ভারতবর্ষে প্রাচীন কাল থেকেই আছে। 'ছত্রী'রা রাজার সভায় যাওয়ার সময় এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে রাজার ছত্র ধারণ করতেন বলে মনে হয়। 'ছত্রী' মানে যে আড়াল করে রাখে—অর্থাৎ দেহরক্ষীও হতে পারে। আবার 'ছত্রী' 'ক্ষত্রী'র অপভ্রংশও হতে পারে। 'রাজতরঙ্গিণী'র মতে 'ক্ষত্রী' ও 'প্রতিহার' সমার্থক।

অনিষ্ট না হয়, সেজন্য তাঁর মহিমা লাঘব করে বলেন। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' এও লেখা আছে যে ইনি চৈতন্যদেবের কাছে ব্রাহ্মণ পাঠিয়ে তাঁকে চলে যেতে বলেছিলেন। এই ব্যাপার থেকে বোঝা যায়, কেশব ছত্রীও চৈতন্যদেবের ভক্ত ছিলেন। তিনি সুকবিও ছিলেন। তাঁর লেখা একটি কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদ 'পদ্যাবলী'তে উদ্ধৃত হয়েছে। এই পদে ভক্ত হৃদয়ের ছাপ আছে। জনশ্রুতি অনুসারে কেশব ছত্রী হোসেন শাহের প্রধান দেহরক্ষী ছিলেন। তাঁর 'ছত্রী' উপাধি এই জনশ্রুতির সমর্থন জোগায়।

কুলগ্রন্থের মতে কেশব ছত্রী মালাধর বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র। মালাধর বসুর উপাধি ছিল গুণরাজ খান, কিন্তু জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে তিনি 'গুণরাজ ছত্রী' বলে উল্লিখিত হয়েছেন। সম্ভবত মালাধর বসুও গৌড়েশ্বরের (রুকনুদ্দীন বারবক শাহের) কর্মচারী ছিলেন এবং কেশব ছত্রীর মত তাঁরও রাজপদের নাম ছিল 'ছত্রী'।

(৭) সুবুদ্ধি রায়

সুবুদ্ধি রায় ছিলেন "গৌড়-অধিকারী" অর্থাৎ গৌড় শহরের চৌধুরী বা ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক। হোসেন শাহের সিংহাসনে আরোহণের অনেক আগে থেকেই তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হোসেন তখন তাঁর অধীনে কাজ করতেন। কাজের ত্রুটির জন্য তিনি হোসেনকে চাবুক মেরেছিলেন। পরে হোসেন সুলতান হলে, "সুবুদ্ধি রায়েরে তেঁহো বহু বাঢ়াইল।" কিন্তু তাঁর বেগম চাবুক মারার কথা জেনে সুবুদ্ধি রায়ের উপর ক্রুদ্ধ হন এবং বেগমের উপরোধে হোসেন শাহ সুবুদ্ধি রায়ের জাতি নাশ করেন। সুবুদ্ধি রায় তখন কাশী চলে যান এবং পণ্ডিতদের কাছে প্রায়শ্চিত্তের বিধান চান। পণ্ডিতদের পরস্পরবিরোধী বিধান "শুনিঞা রহিলা রায় করিয়া সংশয়।" পরে কাশীতে চৈতন্যদেব এলে সুবুদ্ধি রায় তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। চৈতন্যদেব বলেন, "বৃন্দাবনে গিয়ে কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তন কর, তাহলেই সব পাপ খণ্ডন হবে।" সুবুদ্ধি রায় তা'ই করলেন। শুকনো কাঠ বেচে তিনি নিজের জীবনধারণ ও বৈষ্ণবদের সেবা করতেন। রূপ ও সনাতন বৃন্দাবনে এলে তাঁদের সুবুদ্ধি রায় অনেক যত্ন করেছিলেন।

চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ২৫শ পরিচ্ছেদে সুবুদ্ধি রায়ের কাহিনী বর্ণিত আছে। ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে চৈতন্যদেব কাশীতে এসেছিলেন। সুতরাং হোসেন শাহের হাতে সুবুদ্ধি রায়ের লাঞ্ছনা তার কিছু আগে

ঘটেছিল। সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে হোসেন শাহের চাকরী করা তারও ৩০।৪০ বছর আগেকার ঘটনা, কারণ হোসেন তখন যুবক। ১৪৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণের সময় যে হোসেন প্রবীণ বয়সে উপনীত হয়েছিলেন, তা আমরা আগেই দেখে এসেছি।

(৮) **মুকুন্দ**

ইনি ছিলেন হোসেন শাহের চিকিৎসক। এঁর পিতা নারায়ণদাস রুকনুদ্দীন বারবক শাহের চিকিৎসক ছিলেন। মুকুন্দ চৈতন্যদেবের একজন বড় ভক্ত ছিলেন। এঁর অনুজ নরহরি ও পুত্র রঘুনন্দন চৈতন্যদেবের বিশিষ্ট পার্ষদদের অন্যতম ছিলেন এবং তাঁরা পরবর্তীকালে বাংলার বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নেতা ও গুরুরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। মুকুন্দদের বাড়ী ছিল শ্রীখণ্ডে। 'চৈতন্য-চরিতামৃতে'র মধ্যলীলা ১৫শ অধ্যায়ে লেখা আছে যে চৈতন্যদেব স্বয়ং নীলাচলে বসে মুকুন্দের সামনে তাঁর প্রেমভক্তির পরিচয় অন্য ভক্তদের কাছে দিয়েছিলেন। এর মধ্যে "ম্লেচ্ছ রাজা" অর্থাৎ হোসেন শাহেরও উল্লেখ আছে। এই স্থানটি আমরা উদ্ধৃত করছি।

ভক্তের মহিমা প্রভু কহিতে পায় সুখ।
ভক্তের মহিমা কহিলে হয় পঞ্চমুখ ॥
ভক্তগণে কহে শুন মুকুন্দের প্রেম।
নিগূঢ় নির্ম্মল প্রেম যেন দগ্ধ হেম ॥
বাহ্যে রাজবৈদ্য ইঁহো করে রাজসেবা।
অন্তরে কৃষ্ণপ্রেম ইঁহার জানিবেক কেবা ॥
একদিন ম্লেচ্ছ রাজার উচ্চ টুঙ্গীতে।
চিকিৎসার বাত কহে তাহার অগ্রেতে ॥
হেনকালে এক ময়ূরপুচ্ছের আড়ানী।
রাজার শিরোপরি ধরে এক সেবক আনি ॥
ময়ূরপুচ্ছ দেখি মুকুন্দ প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
অতি উচ্চ টুঙ্গী হৈতে ভূমিতে পড়িলা ॥
রাজার জ্ঞান রাজবৈদ্যের হৈল মরণ।
আপনে নামিয়া রাজা করাইল চেতন ॥
রাজা বলে ব্যথা তুমি পাইলে কোন্ ঠাঞি।
মুকুন্দ কহে অতিবড় ব্যথা নাহি পাই ॥

রাজা কহে মুকুন্দ তুমি পড়িলা কি লাগি।
মুকুন্দ কহে মোর এক ব্যাধি আছে মৃগী॥
মহা বিদগ্ধ রাজা সেই সব বাত জানে।
মুকুন্দেরে হৈল তাঁর মহাসিদ্ধ জ্ঞানে॥

(৯) রামচন্দ্র খান

ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলাদেশে রামচন্দ্র খান নামে তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্তমান ছিলেন। এঁদের মধ্যে অন্তত দু'জন হোসেন শাহের সমসাময়িক। প্রথম রামচন্দ্র খানের কাহিনী 'চৈতন্যচরিতামৃতে' পাওয়া যায়। ইনি ছিলেন বেনাপোলের জমিদার। কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে ইনি যবন হরিদাসের উপর অত্যাচার করেছিলেন এবং বারাঙ্গনা দিয়ে তাঁকে প্রলুব্ধ করে তাঁর সাধনা নষ্ট করবার চেষ্টা করেছিলেন; পরে নিত্যানন্দ এঁর গ্রামে এলে তাঁকেও ইনি অপমান করেছিলেন; ইনি পরে দস্যুবৃত্তি করে বেড়াতেন এবং রাজকর দিতেন না; তারপরে "ম্লেচ্ছ উজীর" এসে স্ত্রীপুত্র সমেত তাঁকে বন্দী করেন, তাঁর গৃহে অভ্যক্ষ মাংস রন্ধন করান এবং ঘর ও গ্রাম তিন দিন ধরে লুঠ করে শ্মশানে পরিণত করেন। দ্বিতীয় রামচন্দ্র খান একখানি বাংলা মহাভারত রচনা করেন। এটি জৈমিনী রচিত অশ্বমেধ-পর্বের মর্মানুবাদ। এর শেষে যে রচনাকালবাচক শ্লোক আছে, তার পাঠ বিকৃত বলে অর্থ সম্বন্ধে সকলে একমত নন। কারও মতে এর থেকে ১৪৫৪ শক, কারও মতে ১৪৭৪ শক পাওয়া যায়। যাহোক্‌, ১৪৫৪ থেকে ১৪৭৪ শকাব্দের (১৫৩২-১৫৫২ খ্রীঃ) মধ্যে যে এই মহাভারত লেখা হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এর থেকে বোঝা যায় যে, এই রামচন্দ্র খানও সম্ভবত হোসেন শাহের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন, অন্তত ঐ সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এর নিবাস ছিল উত্তর রাঢ়ে, কোন পুঁথির মতে দণ্ডসিমলিয়া-ডাঙা গ্রামে, কোন পুঁথির মতে জঙ্গীপুরে। তৃতীয় রামচন্দ্র খানই আমাদের আলোচ্য ব্যক্তি। এঁর কথা 'চৈতন্যভাগবতে'র অন্ত্যখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাওয়া যায়। ইনি হোসেন শাহের অধীনে গৌড়-উৎকল সীমান্ত অঞ্চলের লস্কর বা সামরিক শাসনকর্তা ছিলেন। সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব এর উপরেই ন্যস্ত ছিল। 'চৈতন্যভাগবতে' দেখি রামচন্দ্র খান সম্বন্ধে চৈতন্যদেবকে ছত্রভোগের "সর্ব-লোক" বলছে, "এই অধিকারী প্রভু দক্ষিণ রাজ্যেতে" এবং রামচন্দ্র খান চৈতন্যদেবকে নিজের সম্বন্ধে বলছেন, "মুঞি সে লস্কর এথা সব

মোর ভার।" ইনিই ছত্রভোগে চৈতন্যদেবকে নিরাপদে গৌড়-উৎকল সীমান্ত পার হতে সাহায্য করেছিলেন। কেউ কেউ মনে করেন এই রামচন্দ্র খানই মহাভারতের রচয়িতা। কিন্তু এই মতের পক্ষে বিন্দুমাত্রও প্রমাণ নেই, বরং বিপক্ষে প্রমাণ আছে। মহাভারত-রচয়িতা রামচন্দ্র খানের বাড়ী ছিল উত্তর রাঢ়ে, আর এই রামচন্দ্র খানকে দেখতে পাওয়া যায় বাংলা ও উড়িষ্যার সীমান্তে। এই রামচন্দ্র খান ব্রাহ্মণ ছিলেন না (বা. সা. ই. ১।২, পৃঃ ২৩১ দ্রঃ), কিন্তু মহাভারতকার রামচন্দ্র খান কোন কোন পুঁথির মতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। সুতরাং এই দুই রামচন্দ্র খানের অভিন্নতা কোন ক্রমেই প্রমাণ করা যায় না।

(১০) **চিরঞ্জীব সেন**

ইনি শ্রীখণ্ডনিবাসী বিখ্যাত পদকর্তা গোবিন্দদাস কবিরাজের পিতা। গোবিন্দদাস তাঁর 'সঙ্গীতমাধব' নাটকে নিজের সম্বন্ধে বলেছেন,

স্বর্ধুন্যাস্তীরভূমৌ শরজনিনগরে গৌড়ভূপাধিপাত্রাদ্
ব্রহ্মণ্যাদ্ বিষ্ণুভক্তাদপি সুপরিচিতাৎ শ্রীচিরঞ্জীবসেনাৎ।
যঃ শ্রীরামেন্দুনামা সমজনি পরমঃ শ্রীসুনন্দাভিধায়াং
সোঽয়ং শ্রীমান্নরাখ্যো স হি কবিনৃপতিঃ সম্যগাসীদভিন্নঃ॥

এর থেকে জানা যায়, গোবিন্দদাসের পিতা চিরঞ্জীব সেন 'গৌড়ভূপাধিপাত্র' ছিলেন। এই 'গৌড়ভূপ' নিশ্চয়ই আলাউদ্দীন হোসেন শাহ। কারণ চিরঞ্জীব সেন চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ভক্ত। কবিকর্ণপূরের 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় (রচনাকাল ১৪৯৮ শক বা ১৫৭৬-৭৭ খ্রীঃ) এবং 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র আদিলীলা ১০ম পরিচ্ছেদে চৈতন্যদেবের পার্ষদদের যে তালিকা দেওয়া আছে, তাতে শ্রীখণ্ডবাসী চিরঞ্জীবের নাম আছে। সুতরাং চিরঞ্জীব হোসেন শাহেরই সমসাময়িক।

(১১) **যশোরাজ খান**

সপ্তদশ শতাব্দীতে সঙ্কলিত পীতাম্বর দাসের 'রসমঞ্জরী'তে যশোরাজ খানের একটি পদ উদ্ধৃত হয়েছে ; তার ভণিতা এই,

শ্রীযুত হুসন জগতভূষণ সোই ইহ রস জান।
পঞ্চগৌড়েশ্বর ভোগপুরন্দর ভণে যশোরাজ খান॥

এই ভণিতায় "পঞ্চগৌড়েশ্বর" "শ্রীযুত হুসন"-এর উল্লেখ থেকে বোঝা যায়, যশোরাজ খান হোসেন শাহের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি হোসেন শাহের

দরবারে কাজ করতেন বলেও এর থেকে অনুমান হয়। এই অনুমান যে ঠিক্, তার প্রমাণ পাওয়া যায় গোপালদাস-রসিকদাসের শাখানির্ণয়ে। তাতে লেখা আছে যশোরাজ "রাজসেবী" ছিলেন।

যশোরাজ খান দামোদর মহাকবি।
কবিরঞ্জন আদি সবে রাজসেবী ॥

সুতরাং যশোরাজ খান যে আলাউদ্দীন হোসেন শাহের কর্মচারী ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

(১২) **দামোদর**

উপরে উদ্ধৃত পয়ারটিতে "রাজসেবী"দের তালিকায় যশোরাজ খান-এর পরেই দামোদর-এর নাম আছে। দামোদর গোবিন্দদাস কবিরাজের মাতামহ। অতএব যশোরাজ খানের মত তিনিও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে বর্তমান ছিলেন। সুতরাং তিনি হোসেন শাহেরই সরকারে কাজ করতেন বলে মনে হয়। নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' থেকে জানা যায়, এই দামোদর 'সঙ্গীত-দামোদর' নামে একখানি গ্রন্থ লিখেছিলেন। বইটি এখন আর পাওয়া যায় না।

(১৩)

পূর্বোদ্ধৃত পয়ারে তৃতীয় নাম 'কবিরঞ্জন'-এর। কবিরঞ্জন শুধুমাত্র রাজসেবী ছিলেন না, একজন বিখ্যাত কবিও ছিলেন। এঁর প্রকৃত নাম দৈবকীনন্দন সিংহ। এঁর তিনটি উপাধি—কবিরঞ্জন, কবিশেখর ও বিদ্যাপতি। এই তিন ভণিতাতেই তিনি পদরচনা করতেন। এঁর লেখা বহু পদ পাওয়া গিয়েছে। ইনি 'গোপালচরিত মহাকাব্য', 'গোপীনাথবিজয় নাটক', 'গোপালবিজয় কাব্য' এবং 'দণ্ডাত্মিকা পদাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে মাত্র শেষ দুখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়েছে (এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম', পৃঃ ১৭০-১৭৫ দ্রষ্টব্য)। বিভিন্ন পদের নিম্নোদ্ধৃত ভণিতাগুলির প্রথম তিনটি থেকে বোঝা যায়, এই "রাজসেবী" কবিরঞ্জন বা কবিশেখর বা বাঙালী বিদ্যাপতি হোসেন শাহ এবং তাঁর পুত্র নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের সরকারে কাজ করতেন। চতুর্থ ভণিতাটি যদি এই কবিরই হয়, তাহলে বলতে হবে, এই কবি হোসেন শাহের অপর পুত্র গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের

অধীনেও কাজ করতেন (এ সম্বন্ধে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য)। ভণিতাগুলি এই,

(১) শাহ হুসেন অনুমানে যারে হানল মদনবাণে।
চিরজীব হউ পঞ্চগৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভাণে॥

(২) বিদ্যাপতি ভাণি অশেষ অনুমানি
সুলতান শাহ নসীর মধুপ ভুলে কমলা বাণী॥

(৩) কবিশেখর ভণ অপরূপ রূপ দেখি।
রাএ নসরৎ শাহ ভুললি কমলমুখী॥

(৪) বেকতেও চোরি গুপুত কর কতিখন বিদ্যাপতি কবি ভাণ।
মহলম জুগপতি চিরেজীব জীবথু গ্যাসদীন সুরতান॥

যশোরাজ খান ও দামোদরের সঙ্গে একত্র উল্লেখ থেকে মনে হয়, কবিরঞ্জন এঁদের সমসাময়িক ছিলেন। এর থেকেও তিনি ঐসব সুলতানদের সরকারে কাজ করতেন বলে প্রতীত হয়।

(১৪-১৫) হিরণ্যদাস ও গোবর্ধনদাস

এরা দুই ভাই। ষট্ গোস্বামীর অন্যতম রঘুনাথ দাসের এঁরা যথাক্রমে জ্যেষ্ঠতাত ও পিতা। এঁদের নিবাস ছিল সপ্তগ্রামে। এদের সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র অন্ত্যলীলা ৩য় পরিচ্ছেদে লিখেছেন,

হিরণ্য গোবর্ধন দুই মুলুকের মজুমদার।

এবং অন্ত্যলীলা ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে লিখেছেন,

হিরণ্যদাস মুলুক নিল মোকতা করিয়া।

বার লক্ষ দেয় রাজার সাধে বিশ লক্ষ॥

এর থেকে বোঝা যায় যে হিরণ্য মজুমদারের উপর হোসেন শাহ সপ্তগ্রাম মুলুকের রাজস্ব আদায়ের ভার অর্পণ করেছিলেন এই সর্তে যে বিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব সংগ্রহ করে হিরণ্য বার লক্ষ টাকা রাজকোষে জমা দেবেন।

(১৬) গোপাল চক্রবর্তী

ইনি হোসেন শাহের আরিন্দা অর্থাৎ কর-আদায়কারী ছিলেন। ইনি গৌড়ে থাকতেন এবং রাজকোষে বার লক্ষ টাকা জমা দিতেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত' অন্ত্যলীলা ৩য় পরিচ্ছেদে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এঁর সম্বন্ধে লিখেছেন,

গোপাল চক্রবর্ত্তী নাম একজন।
মজুমদারের ঘরে সেই আরিন্দা ব্রাহ্মণ॥
গৌড়ে রহে পাতসাহা আগে আরিন্দাগিরি করে।
বার লক্ষ মুদ্রা সেই পাতসাহারে ভরে॥
পরম সুন্দর পণ্ডিত নূতন যৌবন।

ইনি হিরণ্য মজুমদারের ঘরে সমবেত ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতদের সামনে হরিদাসকে বলেছিলেন যে নামাভাসে মুক্তিলাভ করা যায় না এবং এই নিয়ে হরিদাসের সঙ্গে ক্রুদ্ধভাবে তর্কবিতর্ক করেছিলেন। তার ফলে একে ধিক্কৃত হতে হয়। সম্ভবত এই সময় ইনি গৌড়েশ্বরের প্রাপ্য বার লক্ষ টাকা নেবার জন্য সপ্তগ্রামে এসেছিলেন।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ করবার আছে। এই গোপাল চক্রবর্তী গৌড়ের সুলতানের কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত হিসাবে তাঁর প্রতিষ্ঠা কিছু মাত্র খর্ব হয়নি। অতএব যাঁরা রূপ-সনাতনের দৃষ্টান্ত থেকে বলেন যে রাজ-সরকারে কাজ করলেই সে যুগে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা সমাজে পতিত হত, তাঁরা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

কারও কারও মতে এই গোপাল চক্রবর্তী গৌড়েশ্বরের কর্মচারী নন, হিরণ্য মজুমদারেরই কর্মচারী। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্পষ্ট লিখেছেন যে গোপাল চক্রবর্তী গৌড়ে থাকতেন। হিরণ্য মজুমদারের কর্মচারী হলে বার মাস গৌড়ে থাকার দরকার হত না। তা ছাড়া যখন গোপাল চক্রবর্তীর সঙ্গে হরিদাসের তর্ক হয়, তখন রঘুনাথদাস বালক। 'চৈতন্যচরিতামৃত' অন্ত্যলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে এই কথা লেখা আছে এবং ঐ পরিচ্ছেদেই এই তর্কের বর্ণনা আছে। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে হিরণ্য মজুমদারের গৌড়েশ্বরের রাজস্ব আদায়ের ভার লাভের কথা আছে এবং ঐ সময়ে যে রঘুনাথ যুবক, সে কথাও সেখানে বলা হয়েছে। অতএব গোপাল চক্রবর্তী যখন হরিদাসের সঙ্গে তর্ক করেছিলেন, তখন হিরণ্য মজুমদারের বার লক্ষ টাকা রাজকোষে জমা দেবার কথা উঠতে পারে না। গোপাল চক্রবর্তী পূর্ববর্তী ইজারাদারের কাছ থেকে গৌড়েশ্বরের প্রাপ্য বার লক্ষ টাকা নেবার জন্য এই সময়ে সপ্তগ্রামে এসেছিলেন।

(১৭) গৌরাই মল্লিক

'রাজমালা'তে এঁর নাম পাওয়া যায়। ১৪৩৫ ও ১৪৩৭ শকাব্দের মধ্যে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে অন্যতম অভিযানের সময় ইনি হোসেন শাহের সৈন্যবাহিনীর

নেতৃত্ব করেন। এই অভিযান ও তার ফলাফল সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। সম্ভবত এর প্রকৃত নাম ছিল গৌর মল্লিক। জনাব এ. টি. এম রুহুল আমিনের মতে গৌরাই মল্লিক হিন্দু নন, মুসলমান ; তিনি "শাহজাদ খানী বংশীয়" পাঠান দৌলাহ্-ই-আলম (মাসিক মোহাম্মদী, শ্রাবণ, ১৩৭১, পৃ: ৭১৭ দ্রঃ)। অবশ্য কোন মুসলমানের নাম (ডাক নাম) "গোরাই মল্লিক" হতে পারে ; কিংবদন্তী অনুসারে হোসেন শাহের একজন কাজীর নাম ছিল "গোরাই কাজী"। 'রাজমালা'তে গৌরাই মল্লিকের অভিযান বর্ণনার সময় দু'জায়গায় "পাঠান" শব্দটাও ব্যবহৃত হয়েছে ("পাঠান সুঠান নহে চাবুক লইয়া" এবং "গরু রোষে ভর সোষে পাঠান বর্ব্বর॥") ; তবে এখানে কাকে "পাঠান" বলা হয়েছে, তা বোঝা যায় না।" "গৌরাই মল্লিক"কে হিন্দু বলে মনে করার কারণ "গৌরাই" নামটিই পুঁথিতে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে এবং "গৌর" থেকে "গৌরাই" হওয়াই বেশী স্বাভাবিক।

(১৫) বিদ্যাবাচস্পতি

ইনি ছিলেন বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ভাই। গঙ্গার পশ্চিম তীরে কুলিয়ার কাছে ইনি বাস করতেন। সনাতনের ইনি অন্যতম শিক্ষাগুরু ছিলেন। চৈতন্যদেব যখন নীলাচল থেকে বাংলায় এসেছিলেন, তখন এঁর বাড়ীতে উঠেছিলেন। 'ভক্তিরত্নাকরে'র মতে ইনি মাঝে মাঝে রামকেলি গ্রামে থাকতেন,

শ্রীসনাতনের গুরু বিদ্যাবাচস্পতি।
মধ্যে মধ্যে রামকেলি গ্রামে তাঁর স্থিতি॥

বিদ্যাবাচস্পতির পৌত্র রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি তাঁর 'ভ্রমরদূত' কাব্যের শেষে এঁর সম্বন্ধে লিখেছেন,

যোঽভূদ্ গৌড়ক্ষিতিপতিশিখারত্নঘৃষ্টাঙ্ঘ্রিরেণু-
র্বিদ্যাবাচস্পতিরিতি জগদ্গীতকীর্ত্তিপ্রপঞ্চঃ।

এই শ্লোকে বলা হয়েছে বিদ্যাবাচস্পতির পদরেণু গৌড়ক্ষিতিপতির মুকুটমণিকে ঘর্ষণ করত। এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, সমসাময়িক গৌড়েশ্বর হোসেন শাহ বিদ্যাবাচস্পতিকে খুব সম্মান করতেন। অবশ্য হোসেন শাহ বিদ্যা-বাচস্পতির চরণে সমুকুট মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতেন বলে মনে হয় না। এখানে রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি একটু বেশী রকমের অত্যুক্তি করেছেন। বিদ্যাবাচস্পতি কি হোসেন শাহের সভাপণ্ডিত ছিলেন ?

(১৬-১৭) জগাই-মাধাই

এরা নবদ্বীপের অধিবাসী ও ব্রাহ্মণ-সন্তান। এরা ছিল মদ্যপ, উচ্ছৃঙ্খল, ও পাপাচারী। চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দের কৃপা পেয়ে এদের চরিত্র সংশোধিত হয় এবং তারা পরে চৈতন্যদেবের পরম ভক্ত হয়ে ওঠে। জগাই ও মাধাইও সম্ভবত কোন রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিল। কারণ লোচনদাস তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গলে' লিখেছেন যে তারা ছিল নবদ্বীপের "ঠাকুর",

মহাপাপী ব্রাহ্মণ সে আছে দুই ভাই।
নবদ্বীপের ঠাকুর সে জগাই মাধাই॥

এই বইয়ে দেখি, চৈতন্যদেবের কৃপা পাবার পর জগাই-মাধাই বলছে,

ধিক্ জাউ আমার নদীয়ার ঠাকুরাল।
গুরুহত্যা ব্রহ্মহত্যায় এ দেহ আমার॥

'ঠাকুর' অর্থে রাজা, ব্রাহ্মণ, পূজ্য, নায়ক, অধিকারী—সব কিছুকেই বোঝাতে পারে। জগাই-মাধাই সম্বন্ধে যে সব তথ্য পাওয়া যায়, তাদের পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্ত অর্থের কোনটিই খুব সুষ্ঠু বলে মনে হয় না। * এই কারণে মনে হয়, এক্ষেত্রে 'ঠাকুর' শব্দটি দ্বারা কোটালজাতীয় কোন রাজপদকে বোঝাচ্ছে।

বৃন্দাবনদাস তাঁর 'চৈতন্যভাগবত' মধ্যখণ্ডের ১৩শ অধ্যায়ে জগাই-মাধাই সম্বন্ধে লিখেছেন,

ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ।
ডাকা চুরি পরগৃহ দাহে সর্ব্বক্ষণ॥
দেয়ানে না দেয় দেখা বোলায় কোটাল।
মদ্য মাংস বিনা আর নাহি যায় কাল॥

উপরে উদ্ধৃত অংশের তৃতীয় ছত্রের 'বোলায়' ক্রিয়াপদটির দুটি অর্থ করা যায়—(১) 'পরিচয় দেয়'—এই অর্থে 'বোলায়' ক্রিয়ার ব্যবহারের অন্য নিদর্শন জগাই-মাধাই সম্বন্ধে চৈতন্যভাগবতের আর একটি উক্তি "পরম মদ্যপ পুন বোলায় ব্রাহ্মণ"; (২) 'ডাকায়'—এই অর্থে ক্রিয়াপদটির ব্যবহারের

*জগাই-মাধাই নবদ্বীপের "রাজা" বা "নায়ক" বা "অধিকারী" ছিল না; তাদের "পূজ্য" বলেও কেউ মনে করত না। "ব্রাহ্মণ" তারা ছিল, কিন্তু নবদ্বীপে আরও সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ ছিলেন, সুতরাং এই দুইজনকে বিশেষভাবে 'নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ' বলার কোন কারণ নেই। অতএব নিঃসন্দেহে লোচনদাস এই সব অর্থে 'ঠাকুর' শব্দ প্রয়োগ করেন নি।

নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের উক্তি "একেঁ একেঁ সখিজন সম্ভাক বোলাইলোঁ"। প্রথম অর্থ গ্রহণ করলে উদ্ধৃত অংশের তৃতীয় চরণের অর্থ হবে—'তারা (জগাই-মাধাই) কোটাল বলে (নিজেদের) পরিচয় দিত, কিন্তু দেয়ানে (অর্থাৎ রাজদ্বারে) উপস্থিত থাকত না (কোটালদের যা অবশ্য কর্তব্য)'। দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করলে চরণটির অর্থ হবে—'কোটাল ডাকলেও তারা দেয়ানে (অর্থাৎ রাজদ্বারে) দেখা দিত না'। কিন্তু শেষোক্ত অর্থ খুব সঙ্গত নয়; কারণ সেযুগে কোটালদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা কারও পক্ষে সহজসাধ্য ছিল বলে মনে হয় না। প্রথম অর্থটিই সুষ্ঠু, কারণ এই অর্থ গ্রহণ করলে লোচনদাসের পূর্বোদ্ধৃত উক্তির সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়। অতএব জগাই-মাধাই যে নবদ্বীপের কোটাল ছিল, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। লোচনদাস 'ঠাকুর' অর্থে কোটালই বুঝিয়েছেন। জগাই-মাধাই নিজেরা নবদ্বীপের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিল বলেই তারা নির্ভয়ে দুর্নীতি ও যথেচ্ছাচারের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে পেরেছিল। হোসেন শাহের আমলে বাংলাদেশের সর্বত্র যে আদর্শ শাসনব্যবস্থা চালু ছিল না, তা'ও এর থেকে বোঝা যায়।

উপরে যাঁদের নাম উল্লিখিত হল, তাঁরা ছাড়াও হোসেন শাহের যে অনেক হিন্দু অমাত্য ও কর্মচারী ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। হোসেন শাহের যে হিন্দু কাজীও ছিল, তা 'চৈতন্যভাগবত' (মধ্যখণ্ড, ২৩শ অধ্যায়, ১০৮ সংখ্যক শ্লোক) থেকে জানা যায়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন যে নীলাচল থেকে গৌড়ে আসবার সময়ে চৈতন্যদেব যখন উড়িষ্যা-বাংলা সীমান্ত পার হবার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন, তখন বাংলার "যবন সীমাধিকারী"র কাছ থেকে একজন হিন্দু চর ছদ্মবেশে তাঁর দলে প্রবেশ করে ও খোঁজখবর নিয়ে যায়,

> সেইকালে সে যবনের এক অনুচর।
> উড়িয়া কটক আইল করি বেশান্তর॥
> প্রভুর সে অদ্ভুত চরিত্র দেখিয়া।
> হিন্দু চর কহে সেই যবন পাশ গিয়া॥ (চৈ. চ.)

'রাজমালা' থেকে জানা যায়, হৈতন খাঁর নেতৃত্বে হোসেন শাহের যে সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হয়েছিল, তাতে অনেক হিন্দু সৈন্য ছিল এবং তারা গোমতী নদীর তীরে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পাথরের প্রতিমা পূজা করেছিল।

রজনীকান্ত চক্রবর্তী তাঁর 'গৌড়ের ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছেন যে, হোসেন শাহের অন্তঃপুরে মালতী নামে একজন ধাত্রী ছিলেন। সম্ভবত এই কথা সত্য, কারণ ঐ সময়ে গৌড়ে যে ঐ নামের একজন মহিলা সত্যই ছিলেন, তার প্রমাণ আছে। আলাউদ্দীন হোসেন শাহের পুত্র গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের রাজত্বকালে নির্মিত গৌড়ের একটি মসজিদের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে বিবি মালতী নামে জনৈকা মহিলা ৯৪১ হিজরা বা ১৫৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ঐ মসজিদটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। সম্ভবত এই মহিলা প্রথম জীবনে হিন্দু ছিলেন, পরে মুসলিম ধর্মে দীক্ষিতা হন। ইসলামধর্মে তাঁর আন্তরিক নিষ্ঠার পরিচয় মেলে মসজিদ নির্মাণ করানোর মধ্যে; কিন্তু হিন্দু নামকে তিনি ত্যাগ করেননি। রজনীকান্ত চক্রবর্তীর মতে ধাত্রী মালতীর নাম থেকেই 'গুয়ামালতী নামক স্থানের নামকরণ হয়েছে। আবিদ আলীর মতে 'গুয়ামালতী' 'বুয়া মালতী'র অপভ্রংশ। 'বুয়া' শব্দের মানে 'দিদি', প্রাচীন মালদহ শহরের 'চলীসপাড়া' অঞ্চলে একটি শিলালিপি পাওয়া যায়, তার থেকে জানা যায় যে, হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহের রাজত্বকালে ৯৩৮ হিজরা বা ১৫৩১-৩২ খ্রীষ্টাব্দে 'বুয়া মালতী' একটি সিকায়াহ্ বা জলসত্র তৈরী করেছিলেন। 'বিবি মালতী' ও 'বুয়া মালতী' যে অভিন্ন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এছাড়া রজনীকান্ত চক্রবর্তী তাঁর 'গৌড়ের ইতিহাসে' লিখেছেন যে, পুরন্দর খান নামে এক ব্যক্তি হোসেন শাহের উজীর ছিলেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাঙ্গালার ইতিহাস' ২য় খণ্ডে এবং ডঃ হবীবুল্লাহ্ History of Bengal, Vol. IIতে এই উক্তির পুনরাবৃত্তি করেছেন, তার ফলে "পুরন্দর খান" এখন ঐতিহাসিক ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু কিংবদন্তী ও কুলজীগ্রন্থের বাইরে কোথাও পুরন্দর খানের নাম পাওয়া যায় না! কুলজীগ্রন্থের মতেও পুরন্দর খান হোসেন শাহের নয়, তাঁর পূর্ববর্তী কোন সুলতানের অমাত্য ছিলেন। নগেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন, "পুরন্দর খাঁর অভ্যুদয় সম্বন্ধে সাধারণের বিশ্বাস যে সুলতান হোসেন শাহের সময় তিনি গৌড়েশ্বরের রাজস্বমন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু প্রাচীন কুলগ্রন্থ আলোচনা করিলে জানা যায়, সুলতান হোসেন শাহের পূর্ব্বে তিনি কায়স্থ সমাজপতি ছিলেন এবং গৌড়ের দরবারে লেখাপড়ার কর্ত্তা বা সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন।...গোপীনাথ বসু সুলতানগণের প্রিয়কার্য্যসাধন করিয়া রাজস্ব বিভাগের শ্রেষ্ঠ মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। তিনি পুরন্দর খাঁ উপাধি এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর গোবিন্দ বসু ধনাধ্যক্ষ হইয়া গন্ধর্ব্ব খাঁ উপাধিতে

ভূষিত হন।" সুতরাং পুরন্দর খান বলে হোসেন শাহের কোন মন্ত্রী ছিলেন না।

প্রসঙ্গক্রমে 'গন্ধর্ব খাঁ' সম্বন্ধে একটি কথা বলা যেতে পারে। আমরা আগেই বলেছি, কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী থেকে জানা যায়, রুকনুদ্দীন বারবক শাহের সভায় 'গন্ধর্ব রায়' নামে একজন সভাসদ ছিলেন এবং ইনি কুলজীগ্রন্থে উল্লিখিত গন্ধর্ব খাঁ-র সঙ্গে অভিন্ন হতে পারেন। ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "হোসেন-শাহার দরবারে গন্ধর্ব্ব রায় প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন" (বা. সা. ই. ১।২, পৃঃ ৫৬৩))। তাঁর মতে এর প্রমাণ—কুতবনের 'মৃগাবতী'তে সুলতান হোসেন শাহের প্রশস্তির একটি চরণ—"রায় জহাঁ লউ গংদ্রয় রহহী" (পাঠান্তর—"রায় জহাঁ লহু গন্ধর্প অহঈঁ")। কিন্তু এর থেকে হোসেন শাহের সভায় গন্ধর্ব রায়ের অবস্থান প্রমাণিত হয় না। কারণ প্রথমত চরণটির অর্থ "গন্ধর্বেরা যেখানে আছে, ততদূর পর্যন্ত রাজার গতি"—"যেখানে গন্ধর্ব রায় থাকেন" নয়। দ্বিতীয়ত এই হোসেন শাহ বাংলার হোসেন শাহ নন, জৌনপুরের সুলতান হোসেন শাহ শর্কী। এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব।

হোসেন শাহের রাজ্যসীমা

বহুরাজ্যবিজেতা হোসেন শাহ তাঁর রাজ্যের সীমানাকে পূর্ববর্তী সুলতানদের তুলনায় কতখানি প্রসারিত করেছিলেন, তা আলোচনা করলে বিস্মিত হতে হয়।

হোসেন শাহের মুদ্রাগুলি উৎকীর্ণ হয়েছিল হোসেনাবাদ, মুহম্মদাবাদ, মুয়াজ্জমাবাদ, খলিফতাবাদ, চন্দ্রাবাদ ও ফতেহাবাদের টাকশালে। এই স্থানগুলির মধ্যে মুয়াজ্জমাবাদ সোনারগাঁওয়ের অদূরে অবস্থিত। খলিফতাবাদ বাগেরহাটের নামান্তর। হোসেনাবাদ নামে ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলায় তিনটি স্থান আছে, মালদহ জেলার হোসেনাবাদেই হোসেন শাহের মুদ্রা উৎকীর্ণ হয়েছিল বলে মনে হয়। মুহম্মদাবাদেরও অবস্থান নির্ণয় করা যায় নি। 'চন্দ্রাবাদ' সম্ভবত চাঁদপাড়া বা চাঁদপুরের (মুর্শিদাবাদ জেলা) সঙ্গে অভিন্ন।

আজ পর্যন্ত এই সমস্ত জায়গায় তাঁর শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে :—

মালদহ, মান্দারণ (হুগলী), খেরোল (মুর্শিদাবাদ), আজিমনগর (ঢাকা), মুঙ্গের, মোরগ্রাম (মুর্শিদাবাদ), বাবারগ্রাম (মুর্শিদাবাদ), ইসমাইলপুর (সারণ),

মচাইন (ঢাকা), ইংরেজবাজার (মালদহ), বনহরা (পাটনা), গৌড়, সুতী (মুর্শিদাবাদ), গিলহরী (মুর্শিদাবাদ), হায়দরপুর (মালদহ), সোনারগাঁও (ঢাকা), সিলেট, ত্রিবেণী (হুগলী), চক অমবিয়া (মালদহ), অতিয়া (ময়মনসিংহ), হজরৎ পাণ্ডুয়া (মালদহ), মঙ্গলকোট (বর্ধমান), দেওকোট (দিনাজপুর), মৌলানাতলী (মালদহ), সাগরদীঘি (মুর্শিদাবাদ), বাদশাহী শড়ক (বীরভূম), ধমরাই (ঢাকা), কাঁটাদুয়ার (রংপুর), জাহানাবাদ (রাজসাহী), কুশুম্বা (রাজসাহী), ভাগলপুর, বাঢ় (পাটনা), মচ্ছিহাটা (পাটনা), ব্যাণ্ডেল (হুগলী), জোয়ার (ময়মনসিংহ), চেরান্দ (সারণ), নরুহন (সারণ)।*

এর থেকে বোঝা যায়, বাংলা দেশের প্রায় সবটা এবং বিহারের এক বৃহদংশ তাঁর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এছাড়া কামরূপ ও কামতা রাজ্য এবং উড়িষ্যা ও ত্রিপুরা রাজ্যের কিয়ংদশ অন্তত সাময়িকভাবে তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

হোসেন শাহের রাজ্যের উত্তর-পূর্ব সীমা কামরূপ-কামতা রাজ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল বলে ধরতে পারি। মোটামুটিভাবে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত তাঁর রাজ্য ছিল মনে করলে অন্যায় হবে না।

গঙ্গার উত্তরে হাজীপুর অঞ্চল হোসেন শাহের অধিকারভুক্ত ছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মধ্যলীলা ২০শ পরিচ্ছেদে লিখেছেন যে হাজীপুরে সনাতনের ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত থাকতেন এবং তিনি বাংলার স্থলতানের জন্য ঘোড়া কিনে পাঠাতেন। হোসেন শাহের রাজ্যের উত্তর সীমারেখার সঙ্গে বর্তমান বিহার ও উত্তরপ্রদেশের সীমারেখার খুব তফাৎ ছিল বলে মনে হয় না। কারণ বর্তমান পাটনা ও সারণ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে। অবশ্য অপেক্ষাকৃত দক্ষিণে এই সীমারেখা বর্তমান বিহার-উত্তর-প্রদেশের সীমারেখার অনেকখানি পূর্বেই অবস্থিত ছিল। কারণ হোসেন শাহ ও সিকন্দর শাহ লোদীর সৈন্যদল পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল গঙ্গার দক্ষিণ তীরে বিহার-শরীফের ২২ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত বাঢ় নামক জায়গায়। বাঢ়ে হোসেন শাহ কর্তৃক নির্মিত একটি জামী মসজিদের শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে।

আরও দক্ষিণে হোসেন শাহের রাজ্যসীমা ছিল সম্ভবত খড়্গপুর পর্বতমালা।

* ইংরেজবাজার প্রভৃতি আধুনিক শহরগুলিতে হোসেন শাহ ও অন্যান্য স্থলতানদের যে সমস্ত শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি অন্য জায়গা থেকে উঠিয়ে-আনা।

পর্তুগীজ ঐতিহাসিক জোআঁ-দে-বারোস লিখেছেন যে কোন একটি পর্বতমালা বাংলাকে "Patane" দেশ এবং উড়িষ্যা থেকে পৃথক করে রেখেছিল। তাঁর ভাষায়, "···these mountains separate the Bengalas from the Patane peoples, and lower down towards the south, from the kingdom of Orissa." এই "these mountains" খড়্গপুর পর্বতমালা ভিন্ন আর কিছু হতে পারে না। জোআঁ-দে-বারোস তাঁর বইয়ে বাংলার যে মানচিত্র দিয়েছেন, তাতে তিনি বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি ভূখণ্ডকে "Patane" (= পাঠান ?) নামে চিহ্নিত করেছেন।

বাংলার দক্ষিণে উড়িষ্যা প্রদেশ। কবিকর্ণপূর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যদেবের নীলাচল থেকে গৌড়ে আগমনের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার থেকে দেখা যায় যে ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে রেমুনার খানিকটা উত্তরে এবং পিছলদার খানিকটা দক্ষিণে অবস্থিত মন্ত্রেশ্বর নদ ছিল দুই রাজ্যের সীমারেখা। কবিকর্ণপূর লিখেছেন যে বাংলার যবন সীমান্তরক্ষী স্বয়ং চৈতন্যদেবকে মন্ত্রেশ্বর নদ পার করিয়ে পিছলদা গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল ("অথ স এব জলচরদস্যুভয়নিবারণায় স্বয়মগ্রেসরোভূত্বা মন্ত্রেশ্বরমুত্তীর্য্য পিচ্ছলদাগ্রাম-পর্য্যন্তমাগতবান"—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক—নবম অঙ্ক)। কৃষ্ণদাস কবিরাজও এই কথা লিখেছেন।

পর্তুগীজ পর্যটক বারবোসার ভ্রমণ-বিবরণী থেকে জানা যায় যে, ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে "গঙ্গা" নামে একটি নদী ছিল বাংলা ও উড়িষ্যার সীমারেখা। জোআঁ-দে-বারোসও এই নদীটির কথা বলেছেন। তিনি বাংলাদেশের যে মানচিত্র দিয়েছেন, তার থেকে দেখা যায় যে এই গঙ্গা নদী (R. Ganga) উড়িষ্যা (Reino De Orixa) থেকে এসে পিছলদার (Pisolta) খানিকটা দক্ষিণে ভাগীরথীর (R. Ganges) সঙ্গে মিলিত হয়েছে। জোআঁ-দে-বারোস লিখেছেন যে হিন্দুরা এই দ্বিতীয় "গঙ্গা" নদীকে মূল গঙ্গা নদীর মতই পবিত্র মনে করতেন এবং এটি "Gate" (ঘাট) পর্বতমালা থেকে বেরিয়ে সাতগাঁওয়ের কাছে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হত। এই দ্বিতীয় গঙ্গা নদীকে কেউ বর্তমান কাঁসাই নদীর সঙ্গে, কেউ সুবর্ণরেখার সঙ্গে, কেউ ব্রাহ্মণী ও বৈতরণীর মিলিত প্রবাহ ধামরা নদীর সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেন। এই সব নদীর গতিপথ যে তখনকার দিনে এখনকার তুলনায় পৃথক ছিল, তা বলাই বাহুল্য। যা হোক্‌, বারবোসার বিবরণ এবং জোআঁ-দে-বারোসের মানচিত্র ও বিবরণের সঙ্গে

কবিকর্ণপুর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তি মিলিয়ে দেখে আমাদের মনে হয়, এই তথাকথিত দ্বিতীয় "গঙ্গা" নদী মন্ত্রেশ্বর নদের সঙ্গে অভিন্ন।

বর্তমান ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত ছত্রভোগ* ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন শাহের রাজ্য এবং উড়িষ্যার সীমান্তে অবস্থিত ছিল। চৈতন্যদেব প্রথমবার নীলাচলে যাবার সময় এইখানে সীমান্ত পার হয়েছিলেন, একথা বৃন্দাবনদাস বলেছেন।

বাংলা ও উড়িষ্যার মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের ফলে এই দুই রাজ্যের সীমারেখা প্রায়ই পরিবর্তিত হত।

হোসেন শাহের বিভিন্ন শিলালিপিতে তাঁর অধিকারভুক্ত অঞ্চল হিসাবে অর্সলা সাজলা মংখাবাদ, থানা লাওবলা, সিমলাবাদ, হোসেনাবাদ ও হাদীগড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্লকম্যান দেখিয়েছেন যে, অর্সলা সাজলা মংখাবাদ একটি প্রশাসনিক অঞ্চল, সাতগাঁও এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং থানা লাওবলা বর্তমান ২৪ পরগণার জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণীর ১০ মাইল পূর্বে অবস্থিত লাওপাল। সিমলাবাদ—বর্তমান বর্ধমান জেলার অন্তর্গত দামোদর তীরবর্তী সেলিমাবাদ। হোসেনাবাদও ২৪ পরগণা জেলার মধ্যেই অবস্থিত। হাদীগড় বর্তমান ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত ডায়মণ্ডহারবারের দক্ষিণে অবস্থিত হাতিয়াগড়ের সঙ্গে অভিন্ন।

হোসেন শাহের রাজ্যের দক্ষিণ সীমা সম্বন্ধে এ থেকে একটা ধারণা করা যায়।

দক্ষিণবঙ্গেও হোসেন শাহের অধিকার ছিল। খলিফতাবাদ (আধুনিক বাগেরহাট) ও ফতেহাবাদে (আধুনিক ফরিদপুর) হোসেন শাহের টাকশাল ছিল। বর্তমান ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালি জেলার অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত 'বাকলা' অঞ্চল যে হোসেন শাহের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তার প্রমাণ 'চৈতন্য-চরিতামৃতে'র মধ্যলীলা ২০শ অধ্যায়ে সনাতনের প্রতি হোসেন শাহের উক্তি,

তোমার বড় ভাই করে দস্যু-ব্যবহার॥
জীব বহু মারিয়া বাকলা কৈল খাস।

---

* ছত্রভোগ কলকাতার প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এর পাশ দিয়ে শীর্ণকায়া আদিগঙ্গা প্রবাহিত। 'চৈতন্যভাগবত' থেকে জানা যায়, ষোড়শ শতাব্দীতে গঙ্গার প্রধান স্রোত এখান দিয়েই প্রবাহিত হত। "আদিগঙ্গা" যে সত্যিই আদি গঙ্গা, তার প্রমাণ এর থেকে পাওয়া যায়।

সুতরাং দক্ষিণবঙ্গের এক বৃহদংশ হোসেন শাহের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল সন্দেহ নেই। মোটের উপর বঙ্গোপসাগর থেকে হোসেন শাহের রাজ্যের দক্ষিণ সীমা খুব দূরে ছিল না এবং স্থানে স্থানে বঙ্গোপসাগরকে স্পর্শ করেছিল বলেই আমার বিশ্বাস।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীর মহাভারত এবং অন্যান্য সূত্র থেকে জানা যায় যে দক্ষিণ-পূর্বে হোসেন শাহের রাজ্য চট্টগ্রাম অঞ্চল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। শ্রীকর নন্দী লিখেছেন যে চট্টগ্রাম "ফণী (ফেণী) নদীএ বেষ্টিত" এবং তার "পূর্ব-দিকে মহাগিরি"। জোআঁ-দে-বারোসের মতে "Chatigram river" ছিল বাংলা এবং "lands of Codavascam" এর সীমারেখা। তিনি লিখেছেন, "The Chatigram river rises in the mountains of the kingdoms of Ava and Vagaru, and flowing from the North-East to the South-West divides the kingdom of Bengala from the lands of Codavascam, and along the course of this river lie the kingdoms of Tipora and of Brema Limma which surround Bengala in the East." এই "Chatigram river" সম্ভবত কর্ণফুলী নদী। "Codavascam" 'খোদা বখ্‌শ্‌ খান' নামের বিকৃতি। বারোস যাকে "lands of Codavascam" বলেছেন, তা একটি পার্বত্য অঞ্চল, আরাকান পর্বত এবং মাতামহুরি নদী পর্যন্ত প্রসারিত। এই অঞ্চলের অধিকার নিয়ে বাংলার সঙ্গে ত্রিপুরা ও অন্যান্য প্রতিবেশী রাজ্যের বিবাদ লেগে থাকত অন্ততপক্ষে নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ থেকে সুরু করে গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহ পর্যন্ত সুলতানদের রাজত্বকালে এই অঞ্চল তাঁদের রাজ্যভুক্ত এবং খোদা বখ্‌শ্‌ খান নামে একজন শাসনকর্তার শাসনাধীন ছিল, একথা পর্তুগীজদের লেখা থেকে জানা যায়। বারোসের মতে এই "Chatigram river" ছিল বাংলা ও ত্রিপুরা রাজ্যেরও সীমারেখা। হোসেন শাহের সৈন্যেরা যে অন্তত দু'বার ত্রিপুরার গোমতী নদীর তীরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত অধিকার করেছিল এবং অন্তত ছয়কড়িয়া অবধি অঞ্চল যে শেষ পর্যন্ত তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তা ত্রিপুরার 'রাজমালা'র সাক্ষ্য থেকেই জানা যায়।

হোসেন শাহের চরিত্র

আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায়, তা একত্র সংগ্রহের চেষ্টা করলাম। তথ্যের পরিমাণ আশানুরূপ না হলেও এর থেকেই বোঝা যাবে নৃপতি হিসাবে তিনি কত অসামান্য ছিলেন। সমগ্র বাংলাদেশ, বর্তমান বিহারের প্রায় অর্ধেক, কোচবিহার ও উত্তর আসাম এবং উড়িষ্যা ও ত্রিপুরার কিয়দংশ যাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, বিভিন্ন দেশের রাজারা যাঁর বাহুবলের কাছে নতি স্বীকার করেছিলেন এবং সুদীর্ঘ ছাব্বিশ বছর যিনি ঐ বিশাল ভূখণ্ডে নিরুদ্বেগে অপ্রতিহতভাবে রাজত্ব করেছিলেন, তিনি যে শ্রেষ্ঠ রাজা হিসাবে ইতিহাসে ও জনসাধারণের স্মৃতিতে পূজিত হবেন, তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।

যে অবস্থার মধ্যে হোসেন শাহ বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন, তার কথা মনে রাখলেও তাঁর অসামান্য কৃতিত্বের কথা উপলব্ধ হবে। গোলাম হোসেন লিখেছেন, জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহের হত্যার পরে বাংলাদেশে যে কেউ রাজাকে হত্যা করত, সে-ই দেশের সর্বত্র সিংহাসনের অধিকারিরূপে সম্মানিত হত। ফিরিশ্তা ব্যঙ্গ করে লিখেছেন, প্রভুহত্যা না করলে কেউ গৌড়ের সিংহাসন লাভ করতে পারত না। পর্তুগীজ ঐতিহাসিক ফরিয়া-ই-সুজা লিখেছেন, গৌড় দেশে পুত্র পিতৃসিংহাসন অধিকার করে না, সময়ে সময়ে ক্রীতদাসেরা প্রভুহত্যা করে রাজ্যলাভ করে। মোগল সম্রাট বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "এই সময়ে সৈয়দ সুলতান আলাউদ্দীনের পুত্র নসরৎ শাহ বাংলা দেশের রাজা, তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলার সিংহাসন লাভ করেছেন। বাংলা রাজ্যে উত্তরাধিকার প্রথায় সিংহাসন লাভ অত্যন্ত বিরল। যে কেউ সিংহাসন অধিকার করতে পারে, সে-ই দেশের সর্বত্র রাজা বলে সম্মানিত হয়। নসরৎ শাহের পিতার রাজ্যলাভের আগে একজন হাবশী রাজাকে হত্যা করে কিছুকাল বাংলা রাজ্য শাসন করেছিল এবং সুলতান আলাউদ্দীন সেই হাবশীকে বধ করে রাজ্যলাভ করেছিলেন।" দেশের যখন এইরকম বিশৃঙ্খল অবস্থা, এবং কোন রাজারই রাজত্ব যখন স্থায়ী হচ্ছিল না, সেই সময়ে হোসেন শাহ আবির্ভূত হয়ে এই বিরাট দেশকে নিজের আয়ত্তে এনে তাতে এমন স্থায়ী শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা তাঁর সুদীর্ঘকালব্যাপী রাজত্বের মধ্যে কোন দিনই বিচলিত হয়নি।

হোসেন শাহ যে সুশাসক ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহের কারণ নেই। তা

না হলে তাঁর রাজত্ব অতদিন স্থায়ী হত না এবং সমসাময়িক হিন্দু কবিদের রচনায় তাঁর সপ্রশংস উল্লেখ থাকত না। 'তবকাৎ-ই-আকবরী', 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা' ও 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে' হোসেন শাহের সম্বন্ধে অনেক প্রশংসার কথা লেখা আছে। এইসব বইয়ের মতে হোসেন শাহ্‌ জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকদের, প্রধান প্রধান অমাত্যদের এবং নিজের অনুগত ব্যক্তিদের উচ্চপদ দান করেন। তিনি রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় শাসনকার্য নির্বাহের জন্য উপযুক্ত রাজকর্মচারী পাঠাতেন। তার ফলে পূর্ববর্তী রাজাদের আমলে যে রাজ্য ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় পৌঁছেছিল, তাতে আবার শান্তি, শৃঙ্খলা ও শ্রী ফিরে এসেছিল এবং অসন্তোষ ও বিদ্রোহের মূল উৎপাটিত হয়েছিল। ফিরিশ্‌তার মতে হোসেন শাহ্‌ তাঁর রাজ্যে কোথাও আঞ্চলিক শাসনকর্তা মাথা তুলছে বা বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করছে জানতে পারলেই তক্ষণি সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে তাকে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করতেন।

'তবকাৎ-ই-আকবরী'তে লেখা আছে, "দেশকে সমৃদ্ধ করে তোলবার জন্য, দেশের উন্নতি বিধানের জন্য তিনি অনেক চেষ্টা ও পরিশ্রম করেন। ...তাঁর প্রশংসনীয় চরিত্র ও মনোরঞ্জক গুণগুলির জন্য তিনি বহু বছর ধরে রাজার কর্তব্য পালন করতে পেরেছিলেন।" ফিরিশ্‌তার মতে হোসেন শাহ্‌ বাংলাদেশের শহরগুলিকে সমৃদ্ধ করে তোলেন এবং অনেক জায়গায় বিনা পয়সার অন্নসত্র বা লঙ্গরখানা স্থাপন করেন।

'রিয়াজ'-এর মতে পূর্ববর্তী রাজাদের রাজত্বকালে যে সমস্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হত, হোসেন শাহের সুব্যবস্থায় সে সমস্ত দূর হয় এবং সকলেই শান্তিতে কালযাপন করে। কারও বিরুদ্ধাচরণের সমস্ত সম্ভাবনাই তিনি দূর করেন। বাহাতি বা গণ্ডক নদীর কূলে একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করে তিনি রাজ্যের সীমানা সুরক্ষিত করেন। তিনি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ ও সরাইখানা নির্মাণ করেছিলেন এবং আলিম ও দরবেশদের বহু অর্থ দান করেছিলেন। স্টুয়ার্ট তাঁর History of Bengal-এ 'রিয়াজে'র এই সমস্ত কথার প্রতিধ্বনি করেছেন। এই সমস্ত কথা যে অনেকাংশে সত্য, হোসেন শাহের শিলালিপি ও সমসাময়িক সাহিত্য থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

হোসেন শাহের রাজত্বকালে ভারথেমা ও বারবোসা নামে দু'জন ইউরোপীয় পর্যটক বাংলাদেশে ভ্রমণ করেন। এঁদের লেখা ভ্রমণ-বিবরণী থেকে হোসেন শাহ সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

ভারথেমা লিখেছেন যে বাংলার সুলতানের সৈন্যবাহিনীতে ২০,০০০ নিয়মিত সৈন্য ছিল। বারবোসা লিখেছেন যে ইনি একজন খুব বড় এবং অত্যন্ত ধনী রাজা ছিলেন, বিভিন্ন শহরে এঁর অধীনস্থ শাসনকর্তারা এবং রাজস্ব ও শুল্ক-আদায়কারী কর্মচারীরা থাকত।

হোসেন শাহের রাজত্বকালে তাঁর বা তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের দ্বারা অনেক সুন্দর সুন্দর মসজিদ, প্রাসাদ, ফটক প্রভৃতি নির্মিত হয়েছিল। তাদের কয়েকটি এখনও বর্তমান আছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গৌড়ের দক্ষিণ উপকণ্ঠস্থিত ফিরোজপুরের ছোটা সোনা মসজিদ এবং গৌড়ের গুমটি ফটক। এদের শিল্পসৌন্দর্য অসাধারণ।

হোসেন শাহ অনেকগুলি রাস্তাও তৈরী করিয়েছিলেন। ফ্রান্সিস বুকানন লিখেছেন, "Hoseyn Shah formed a fine road through the country botween the Tanggon and Punabhoba, and it is said to have extended to Ghoraghat." বীরভূমের পূর্বপ্রান্তে "বাদশাহী সড়ক" নামে পরিচিত রাস্তাটিও হোসেন শাহ তৈরী করিয়েছিলেন বলে প্রসিদ্ধি আছে। এই রাস্তার একটি মসজিদে হোসেন শাহের শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে। রাস্তাটিতে আগে ক্রোশ-অন্তর দীঘি এবং আজান-অন্তর মসজিদ ছিল, এখন মসজিদ ও দীঘিগুলির অধিকাংশই বিলুপ্ত।

হোসেন শাহের রাজত্বকালে দেশের যে কেবল ভালই হয়েছে তা নয়। ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে যে হোসেন শাহের রাজ্যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, তার প্রমাণ আছে। ঐ বছরে চৈতন্যদেব নবদ্বীপে সংকীর্তন করছিলেন। 'চৈতন্যভাগবতে'র মধ্যখণ্ড অষ্টম অধ্যায়ে লেখা আছে যে পাষণ্ডীরা তখন এই কথা বলেছিল,

যে না ছিল রাজ্য দেশে আনিঞা কীর্তন।
দুর্ভিক্ষ হইল সব গেল চিরন্তন॥
দেবে হরিলেক বৃষ্টি জানিহ নিশ্চয়।
ধান্য মরি গেল কড়ি উৎপন্ন না হয়॥

প্রাকৃতিক কারণেই এই দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। এই জাতীয় দুর্ভিক্ষের জন্য হোসেন শাহকে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী না করা গেলেও পরোক্ষ দায়িত্ব তিনি এড়াতে পারেন না। তিনি সিংহাসনে আরোহণের পর থেকে ক্রমাগত একের পর এক যুদ্ধই করে গিয়েছেন। এইসব যুদ্ধের ব্যয়ভার নিশ্চয়ই বাংলাদেশের

জনসাধারণকে যোগাতে হত। ফলে তাঁর রাজত্বকালে বাঙালী জনসাধারণের আর্থিক স্বচ্ছলতা আগের তুলনায় হ্রাস পেয়েছিল এবং তাদের দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের শক্তি কমে গিয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য হোসেন শাহের রাজত্বকালে বাংলাদেশে জিনিষপত্রের দাম খুব সস্তাই ছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃত' মধ্যলীলা ২০শ পরিচ্ছেদে লিখেছেন যে সনাতন গোস্বামী তাঁর ভগ্নীপতি শ্রীকান্তের দেওয়া যে "বহুমূল্য" ভোটকম্বল গায়ে দিয়ে কাশীতে চৈতন্যদেবের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তার দাম ছিল তিন টাকা ("তিন মুদ্রার ভোট গায়"—"মুদ্রা" মানে এখানে রৌপ্যমুদ্রা, স্বর্ণমুদ্রা নয়; স্বর্ণমুদ্রাকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ সবসময় "মোহর" বলেছেন।) চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইবন্ বতুতা বাংলাদেশে জিনিসপত্রের যে সুলভ মূল্য দেখেছিলেন, এ মূল্য তার চেয়েও সুলভ বলে মনে হয়। সম্ভবত হোসেন শাহের রাজত্বকালে জনসাধারণের ক্রয়শক্তি হ্রাস পাওয়াতেই জিনিষপত্রের মূল্য কমে গিয়েছিল।

আরও একটি বিষয় লক্ষ করতে হবে। হোসেন শাহ বহু যুদ্ধ করেছেন, কিন্তু পরিপূর্ণ জয়লাভ করেছেন মাত্র কয়েকটি যুদ্ধে। যতদিন ধরে তিনি যুদ্ধ করেছেন এবং যত শক্তি ক্ষয় করেছেন, তার তুলনায় তিনি ভিন্ন রাজ্যগুলির যতটা অঞ্চল স্থায়িভাবে অধিকার করতে পেরেছিলেন, তা খুবই কম বলে মনে হয়। সুতরাং সামরিক ক্ষেত্রে হোসেন শাহ যথেষ্ট দক্ষতা দেখালেও পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছিলেন বলা যায় না।

এই সব দিক দিয়ে বিচার করলে রাজা হিসাবে হোসেন শাহকে ষোল আনা কৃতিত্ব দেওয়া যায় না। তবে মোটের উপর তিনি যে একজন অত্যন্ত সুদক্ষ শাসক ছিলেন, তা পূর্বোল্লিখিত বিভিন্ন সূত্রের সাক্ষ্য থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। বহু বছর ধরে বাংলাদেশে যে বিশৃঙ্খল ও অনিশ্চিত অবস্থা বিরাজ করছিল, তাকে অল্প সময়ের মধ্যে দূর করা এবং সুদীর্ঘ ছাব্বিশ বছর ধরে আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখাই তাঁর প্রধান কৃতিত্ব। যদিও তিনি তাঁর রাজত্বের বেশীর ভাগ সময়েই ভিন্ন দেশের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন, তাতে দেশের শান্তি ব্যাহত হয়নি, কারণ এই সব যুদ্ধ রাজ্যজয়ের যুদ্ধ এবং এগুলি অনুষ্ঠিত হত দেশের বাইরে। আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে হোসেন শাহ বহুবার নিজেই সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব করে বিদেশে যুদ্ধ করতে গিয়েছেন, কিন্তু কখনও কেউ রাজ্যে তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে বিদ্রোহ করতে চেষ্টা

করেছিল বলে জানা যায় না। এ ব্যাপার থেকেও হোসেন শাহের কৃতিত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

আলাউদ্দীন হোসেন শাহের চরিত্রে মহত্বের অভাব ছিল না। এর দৃষ্টান্ত আমরা দেখি জৌনপুরের রাজ্যচ্যুত সুলতান হোসেন শাহ শর্কীকে আশ্রয়-দানের মধ্যে।

কিন্তু আধুনিক যুগের এক শ্রেণীর সমালোচক ব্যক্তিত্ব, শাসনদক্ষতা, সামরিক দক্ষতা ও মহত্ত্ব ছাড়াও হোসেন শাহের চরিত্রে অন্য সমস্ত গুণ দেখেছেন, যার জন্য তাঁরা হোসেন শাহকে আকবরের সঙ্গে তুলনা করেন। তাঁদের মতে হোসেন শাহ বিদ্যা ও সাহিত্যের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষণের ফলে বাংলা সাহিত্য বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে; এই ধারণার বশবর্তী হয়ে এঁরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি পর্বকে "হোসেন শাহী আমল" নামে চিহ্নিত করেছেন। তারপর, এইসব সমালোচকেরা বলেন হোসেন শাহের ধর্মমত ছিল উদার, তিনি হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শী ছিলেন, হিন্দুদের প্রতি তাঁর উদার ও অপক্ষপাত আচরণের ফলেই বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্যদেব এমন অবাধে ধর্মপ্রচার করতে পেরেছিলেন। এইসব মত কতদূর সত্য, তা আমরা এখন বিচার করব।

হোসেন শাহ কি বিদ্যা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন?

হোসেন শাহের কয়েকজন অমাত্য—যথা রূপ, সনাতন ও কেশব ছত্রী সুকবি ছিলেন। এছাড়া যশোরাজ খান, দামোদর ও কবিরঞ্জন প্রভৃতি কবিরা যে হোসেন শাহের কর্মচারী ছিলেন, তা আমরা আগেই দেখাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু যদিও এই সমস্ত কবিরা হোসেন শাহের কর্মচারী বা অমাত্যের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এঁদের সাহিত্যসৃষ্টির মূলে যে হোসেন শাহের পৃষ্ঠপোষণ বা অনুপ্রেরণা ছিল, এমন কোন প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। বিপ্রদাস পিপিলাই, শঙ্করকিঙ্কর মিশ্র*, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী প্রভৃতি সমসাময়িক

*শঙ্করকিঙ্কর মিশ্র ১৪১৯ ("নব শশী সুর ইন্দ্র") শকাব্দ বা ১৪৯৭-৯৮ খ্রীষ্টাব্দে 'গৌরীমঙ্গল' নামে একখানি কাব্য রচনা করেছিলেন। কাব্যটি এখনও প্রকাশিত হয়নি, তবে বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'পুঁথি-পরিচয়' তৃতীয় খণ্ডে এর কয়েকটি পুঁথির বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। 'গৌরীমঙ্গলে' সমসাময়িক রাজা হিসাবে হোসেন শাহের নাম এইভাবে পাওয়া যায়,

পৃথিবীর সার রাজ্যে পঞ্চগৌড় নাম।
নৃপতি হুসেন সাহা কলিযুগে রাম॥
খাণ্ডাএ প্রচণ্ড রাজা প্রতাপে তপন।
যার ভয়ে কম্পিত সকল নৃপগণ॥

কবিরা তাঁদের কাব্যে হোসেন শাহের নাম করেছেন, কিন্তু হোসেন শাহের কাছে তাঁরা কোন পৃষ্ঠপোষণ পেয়েছিলেন বলে জানা যায় না। হোসেন শাহের বিদ্যোৎসাহিতা সম্বন্ধেও বিশেষ প্রমাণ পাই না। বিদ্যাবাচস্পতির সম্বন্ধে তাঁর পৌত্রের উক্তি "যোহভূদ্ গৌড়ক্ষিতিপতিশিখারত্নঘৃষ্টাঙ্ঘ্রিরেণুর্বিদ্যা-বাচস্পতিরিতি" ভিন্ন কোন সংস্কৃত-পণ্ডিতের সঙ্গে হোসেন শাহের যোগাযোগের আর কোন আভাস কোথাও পাই না। বিদ্যাবাচস্পতির সঙ্গেও তাঁর ঠিক্ কী ধরণের সম্পর্ক ছিল, তা পরিষ্কারভাবে জানা যায় না।

কোন কোন সমসাময়িক মুসলমান পণ্ডিতের সঙ্গে হোসেন শাহের যোগা-যোগের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত আমরা বিভিন্ন সূত্র থেকে পাই। এদের মধ্যে একজনের নাম মুহম্মদ বুদই উর্ফ সৈয়দ মীর অলাওয়ী। ইনি ফার্সী ভাষায় একটি ধনুর্বিদ্যা-বিষয়ক বই লিখেছিলেন; বইটির নাম হিদায়ৎ-অল-রামী। বইটি সাতাশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। লেখক এই বই সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহকে উৎসর্গ করেছেন। এই বইয়ের পুথি বর্তমানে ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে (Charles Rieu : Catalogue of Persian Manus-cripts in the British Museum, Vol. II, p. 489, No. Add. 26, 306 দ্রষ্টব্য)। দ্বিতীয় জনের নাম মুহম্মদ বিন য়জ্দান বখ্শ্। ইনি খওয়াজ্গী শিরওয়ানী নামেই বিশেষভাবে পরিচিত। সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজধানী একডালায় বসে ইনি রাজকীয় কোষাগারের জন্য ৯১১ হিজরার ২রা জমাদী অল-আউয়ল, বুধবারে (=১লা অক্টোবর, ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দ) শহীহ্-অল্-বুখারী নামে ঐস্লামিক গ্রন্থের তিনটি খণ্ড নকল সম্পূর্ণ করেন। এর পুঁথি বর্তমানে বাঁকীপুরের ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরীতে আছে (Catalogue of Arabic and Persian Manuscripts in the Oriental Public Library at Bankipore, Vol. V, Pt. I., Nos. 130-132)। তৃতীয় খণ্ডের পুঁথির পুষ্পিকায় হোসেন শাহের এক দীর্ঘ প্রশস্তি আছে। এই বই আলাউদ্দীন হোসেন শাহই উৎসাহী হয়ে নকল করিয়েছিলেন বলে মনে হয়। কিন্তু এই নকল করানোর মধ্যে তাঁর বিদ্যোৎ-সাহিতার বদলে ধর্মপরায়ণতারই নিদর্শন বেশী মেলে।

সমসাময়িক মুসলমান কবিদের মধ্যে মাত্র একজন তাঁর কাব্যে রাজা হোসেন শাহের নাম করেছেন, কিন্তু তিনি কোন্ হোসেন শাহ সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতদ্বৈধ দেখা যায়। এই কবির নাম শেখ কুৎবন।

এঁর কাব্যের নাম 'মৃগাবতী'। এটি প্রাচীন অবধী ভাষায় লেখা। কবি নিশ্চয়ই উত্তর ভারতের লোক। অধ্যাপক সৈয়দ হাসান আস্‌কারি লিখেছেন, "The 'Pīr' or the 'Guru' to whom the poet was so greatly devoted was Makhdum Shaikh Badhan, the greatest of the spiritual disciple and successor of the celebrated saint Md. Isā Taj, Jaunpuri, whose brother Ahmad Isā Taj, lies buried in Bhainsāsur Muhalla of Bihar Sharif town. He was an inhabitant of the 'Qasba' of Ajauli in U. P. where he lies buried." এই সমস্ত বিষয় থেকে ও 'মৃগাবতী' কাব্যের ভাষা থেকে—কুৎবন যে বর্তমান উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত কোন স্থানের অধিবাসী ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ থাকে না। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে সুরু করে পঞ্চদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ পর্যন্ত উত্তর ভারতের এক বৃহদংশ জুড়ে যে জৌনপুর সাম্রাজ্য বর্তমান ছিল, কুৎবনের নিবাসভূমি তারই অন্তর্গত ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। জৌনপুরের শর্কী রাজবংশের শেষ রাজা হোসেন শাহ্ শর্কী ১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বহ্‌লোল লোদীর সঙ্গে যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হন। এরপর তিনি বিহারে আশ্রয় নেন এবং ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে আবার একবার সিকন্দর লোদীর সঙ্গে যুদ্ধ করে রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয় এবং সিকন্দর লোদীর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তিনি বাংলার সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজ্যে এসে আশ্রয় লাভ করেন এবং ভাগলপুরের কাছে কহলগাঁও নামক স্থানে তাঁর শেষ জীবন কাটে।

কুৎবনের 'মৃগাবতী' ৯০৯ হিজরার মহরম মাসে অর্থাৎ ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন-জুলাই মাসে সম্পূর্ণ হয়েছিল (ডঃ সুকুমার সেন নানা জায়গায় ভুল করে ৯০৯ হিজরা = ১৫১২ খ্রীঃ লিখেছেন)। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এর একটিমাত্র খণ্ডিত পুঁথির অস্তিত্ব জানা ছিল, সেটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামসুন্দর দাস সঙ্কলিত Report of the Search for Hindi Manuscripts-এর ১৭-১৯ পৃষ্ঠায়। কয়েক বছর আগে অধ্যাপক সৈয়দ হাসান আস্‌কারি 'মৃগাবতী'র আর একটি খণ্ডিত পুঁথি পান এবং তার কিছুদিন পরে তিনি এর একটি সম্পূর্ণ এবং প্রাচীন পুঁথিও আবিষ্কার করেন; এই সম্পূর্ণ পুঁথিটির বিস্তৃত বিবরণ তিনি প্রকাশ করেন Journal of the Bihar Research Societyর ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর মাসের সংখ্যায় (pp.

454 ff.)। আস্‌কারি সাহেবের এই বিবরণ থেকে জানা যায় যে 'মৃগাবতী'র এই সম্পূর্ণ পুথিটি ফার্সী অক্ষরে লেখা এবং এটি দিল্লীর এক পুরোনো 'খান্‌কা'র সম্পত্তি।

'মৃগাবতী'র গোড়ার দিককার কয়েকটি শ্লোকে জনৈক রাজা হোসেন শাহের প্রশস্তি আছে। Report of the Search for Hindi Manuscripts-এ প্রশস্তিটির যে পাঠ পাওয়া যায়, তার ভাষা আধুনিক ধরনের এবং সব জায়গার অর্থও বোঝা যায় না। আস্‌কারি সাহেবের আবিষ্কৃত পুঁথিটিতে এর যে পাঠ পাওয়া যায়, তার ভাষা প্রাচীন। আস্‌কারি সাহেব তাঁর প্রবন্ধে এই পুথির থেকে প্রশস্তি-অংশটি সম্পূর্ণভাবে উদ্ধৃত করেছেন (JBRS, Dec. 1955, p. 458 দ্রষ্টব্য)। অবশ্য এই পাঠেও কিছু কিছু লিপিকরপ্রমাদ থাকায় কোন কোন অংশের অর্থ স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না। বিশ্বভারতী হিন্দীভবনের অধ্যাপক ডঃ শিবনাথ এই দুই পাঠ মিলিয়ে রাজ-প্রশস্তিটির একটি আদর্শ পাঠ প্রস্তুত করেছেন।* নীচে সেই পাঠটি আমরা বাংলা অনুবাদ সমেত দিলাম,

শাহ হুসেন আহ বড় রাজা।
ছাৎ সিংহাসন ইন্‌হ্‌ য়ে ছাজা॥
পণ্ডিৎ অউ বুধবন্ত সিয়ানা।
পোথা বাঁচ অর্থ সব জানাঁ॥
ধরম দুদিষ্টিল ইন্‌হ্‌ কিন্‌হ্‌ ছাজা॥
হম পর ছাহ জিব (jiw) জগ রাজা॥
দান দৈ য়ী বহু গিনৎ ন আওয়া।
বল অউ করন না সরবর পাওয়া॥
রায় জই। লহু গন্ধর্প অহঈঁ।
সেবা করহি বার সব চহঈী॥
চতুর সুজন ভাখা সব জানা।
ঐস ন দেখ নূ কোয়ী।
সভা সুনো সব কান দৈ
য়ীঁ ফিন্ দেখা নূঁ সোয়ী॥

* সম্প্রতি কুৎবনের 'মৃগাবতী' মুদ্রিত হয়েছে। মুদ্রিত গ্রন্থে রাজপ্রশস্তির যে পাঠ পাওয়া যায়, সেটি আমরা এই বইয়ের পরিশিষ্টে উদ্ধৃত করেছি।

[শাহ হুসেন বড় রাজা আছেন, যাঁর ছত্র ও সিংহাসন সুশোভিত, (যিনি) পণ্ডিত, বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ, বই পড়ে তার সমস্ত অর্থ (যিনি) বোঝেন। এঁকেই ধর্মে যুধিষ্ঠির বলা শোভা পায়। সংসারে (এই) রাজা আমার উপরে ছায়ার মত। ইনি বহু দান দেন, (যার) গণনা হয় না, বলি আর কর্ণও (দানে যাঁর) সমকক্ষতা পায় না। গন্ধর্বেরা যেখানে আছে, ততদূর পর্যন্ত রাজার গতি। সবাই (তাঁর) সেবা করে ও দ্বারে (শরণ) চায়। (ইনি) চতুর ও জ্ঞানী, সব ভাষা জানেন, এরকম কাউকে দেখা যায় না। সভাতে সবাই কান দিয়ে শোন, এঁর মত আর (কাউকে) দেখা গেল না।]

এই "বড় রাজা" "শাহ হুসেন" যে বাংলার সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ, সে সম্বন্ধে এতদিন কারও মনে কোন সংশয় ছিল না। কারণ ৯০৯ হিজরা বা ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দের অন্য কোন রাজা হোসেন শাহের নাম কিছুদিন আগে পর্যন্ত জানা যায় নি। কিন্তু একটা প্রশ্ন ছিল এই যে উত্তর-ভারতের এবং সম্ভবত জৌনপুর অঞ্চলের কবি কুৎবন তাঁর অবধী ভাষায় লেখা কাব্যে বাংলার সুলতান হোসেন শাহের প্রশস্তি কেন করেছেন। তার একটা আনুমানিক ব্যাখ্যা কোন কোন পণ্ডিত দিয়েছেন। ডঃ সুকুমার সেনের ভাষাতে ব্যাখ্যাটা এই, "জৌনপুরের শেষ সর্কীবংশীয় সুলতান হোসেন শাহা দিল্লীর বাদশাহা বহলুল লোদী ও সিকন্দর লোদীর কাছে হার মানিয়া প্রথমে বিহারে (১৪৭৮*) পরে বাঙ্গালায় পলাইয়া আসেন। গৌড়-সুলতান হোসেন শাহা তাঁহাকে সাদরে আশ্রয় দেন। সপরিবার ও সপরিজন হোসেন শাহা সর্কী গঙ্গাতীরে কহলগাঁয়ের কাছে বাসস্থান করিয়া শেষ জীবনে এইখানেই কাটাইয়া দেন। সর্কী-সুলতানের সঙ্গে কবি গুণীও কেহ কেহ আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন সুফী সাধক কবি কুতবন।" [বা. সা. ই. ১/৩ (পূ), পৃঃ ৯৬]

এতদিন পর্যন্ত ব্যাপারটাকে এইভাবেই দেখা হয়েছে, কুৎবন-উল্লিখিত "শাহ হুসেন" যে বাংলার সুলতান হোসেন শাহই, সেসম্বন্ধেও কেউ ভিন্ন মত প্রকাশ করেননি। কিন্তু সম্প্রতি সৈয়দ হাসান আসকারি এই মত প্রকাশ করেছেন যে এই "শাহ হুসেন" জৌনপুরের রাজ্যচ্যুত সুলতান হোসেন শাহ

* এখানে ভুলবশত "১৪৭৯"র জায়গায় ডঃ সেন "১৪৭৮" লিখেছেন।

শর্কী (JBRS, 1955 p. 457)।* পরবর্তীকালের কোন কোন ইতিহাস-গ্রন্থে লেখা আছে যে হোসেন শাহ্ শর্কী ৯০৬ হিজরা বা ১৫০০-০১ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেছিলেন, Cambridge History of India, Vol. III তে তাঁর মৃত্যুর এই তারিখই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হোসেন শাহ শর্কীর কতকগুলি মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে, যেগুলি ৯১০ হিজরা বা ১৫০৪-০৫ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হয়েছিল। আস্‌কারি সাহেব লিখেছেন "He (Husain Shah Sharqi) lived at least till 910 at Kahalgaon as refugee, for the last of the coins bearing his name, but not that of the mint town, is of that date." অবশ্য এর অনেক আগে নেলসন রাইট-ও হোসেন শাহ্ শর্কীর ৯১০ হিজরার মুদ্রার কথা বলেছিলেন (Catalogue of the Coins in the Indian Museum, Vol. II, p. 207), তা তখন কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি।

জৌনপুরের রাজ্যচ্যুত সুলতান হোসেন শাহ্ শর্কী যখন ৯০৪ হিজরায়ও বেঁচে ছিলেন বলে জানা যাচ্ছে, তখন ৯০৩ হিজরায় লেখা 'মৃগাবতী'তে কুৎবন কোন্ হোসেন শাহের নাম করেছেন—জৌনপুরের না বাংলার? এ ক্ষেত্রে জৌনপুরের হোসেন শাহেরই দাবী যে বেশী, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ কুৎবনের দেশ জৌনপুর অঞ্চলে এবং তিনি জৌনপুরের সুলতান হোসেন শাহের সহচর হয়ে বাংলা দেশে এসেছিলেন বলে আগেই অনুমান করা হয়েছিল। আস্‌কারি সাহেব মনে করেন যে কুৎবন নিজের দেশে বসেই কাব্য রচনা করেছিলেন এবং ঐ অঞ্চলে তখন হোসেন শাহ্ শর্কীর আধিপত্য না থাকলেও তিনি হোসেন শাহ শর্কীকেই আসল রাজা ধরে নিয়ে তাঁর প্রশস্তি করেছেন। কিন্তু এই অনুমান সমর্থন করা যায় না। ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দে জৌনপুর অঞ্চল দিল্লীর লোদী সম্রাটদের অধীন ছিল। কুৎবন নিজের দেশে বসে কাব্য লেখবার সময় তাঁদের নাম না করে প্রায় ২৪ বছর আগে যিনি রাজ্যচ্যুত হয়েছেন, তাঁকেই আসল রাজা বলে ধরে নিয়ে তাঁর প্রশস্তি করেছেন, এরকম কল্পনা করা যায় না। কিন্তু এ'রকম হওয়া মোটেই অসম্ভব নয় যে হোসেন শাহ্ শর্কী যে কজন বিশ্বস্ত অনুচরকে সঙ্গে নিয়ে জৌনপুর থেকে

* কেউ কেউ মনে করেন, এই "শাহ হুসেন" শের খানের পিতা হাসান খান সুর। কিন্তু এই মত সত্য হতে পারে না ; কারণ প্রথমত, 'হাসান' এবং 'হুসেন' বা 'হোসেন' ভিন্ন নাম; দ্বিতীয়ত, হাসান খান সুর কোনদিনই স্বাধীন নৃপতি ছিলেন না।

বাংলায় এসেছিলেন এবং যাঁদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে তিনি প্রজাহীন অবস্থার "রাজত্ব" করছিলেন ও মুদ্রা প্রকাশ করেছিলেন (টাকশালের নাম দিতে পারেন নি, কারণ জায়গাটা বাংলার সুলতানের অধীন ; এরকম রাজ্যহীন রাজার ভিন্ন দেশে বসে "রাজত্ব" করার দৃষ্টান্ত আধুনিক যুগেও দেখা যায়), শেখ কুৎবন তাঁদের অন্যতম। তাই কুৎবন 'মৃগাবতী'তে তাঁর প্রশস্তি করেছেন।

কুৎবন যে "শাহ হুসেন"-এর প্রশস্তি করছেন, তিনি যে জৌনপুরের হোসেন শাহ শর্কী, তার প্রমাণ প্রশস্তিটির মধ্যেই রয়েছে। প্রশস্তিটির একটি চরণ—"রায় জহাঁ লহু গন্ধর্প অহঈঁ" (গন্ধর্বেরা যেখানে আছে, ততদূর পর্যন্ত রাজার গতি)। গন্ধর্বেরা শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবেই পুরাণে প্রসিদ্ধ। অতএব গন্ধর্বদের অধিষ্ঠানক্ষেত্র পর্যন্ত "শাহ হুসেন"-এর গতি, এই কথার অর্থ—"শাহ হুসেন" একজন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। জৌনপুরের হোসেন শাহ শর্কী ভারতের অমর সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে অন্যতম ; তিনি খেয়াল সঙ্গীতের শ্রীবৃদ্ধি করে তাকে জনপ্রিয় করেন এবং বহু নতুন রাগ-রাগিণী প্রবর্তন করেন ; শুধু তাই নয়, হোসেন শাহ শর্কীর উপাধিই ছিল "গন্ধর্ব"। যাঁরা অতীত ও সমকালীন সঙ্গীতের ব্যাবহারিক দিকে বিশেষরূপে পারদর্শী হতেন, তাঁরাই "গন্ধর্ব" উপাধি লাভ করতেন (ডঃ আবদুল হালীম রচিত 'ইন্দো-পাক সঙ্গীতের ইতিহাস' থেকে এই সমস্ত তথ্য জানা যায়)। অতএব কুৎবন-উল্লিখিত "শাহ হুসেন" যে জৌনপুরের হোসেন শাহই, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আলাউদ্দীন হোসেন শাহ যে বিদ্যা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, সে সম্বন্ধে আমরা কোন সূত্র থেকেই সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পেলাম না। কয়েকজন সমসাময়িক কবি ও গ্রন্থকার তাঁর নাম করেছেন, একজন তাঁর নামে বই উৎসর্গও করেছেন। তাঁর সভাসদ ও কর্মচারীদের মধ্যে কেউ কেউ পণ্ডিত বা কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। * তাঁর অমাত্য ও সেনানায়কদের মধ্যে পরাগল খান ও ছুটি খান বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং সনাতন পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষণ করতেন। এই সমস্ত বিষয় থেকে এবং ভুলবশত হোসেন শাহকে

* ইংরেজ শাসনকালে বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, নবগোপাল দাশ, দেবেশচন্দ্র দাশ প্রভৃতি বাঙালী সাহিত্যিকেরা সরকারী কর্মচারী ছিলেন—এর থেকে প্রমাণ হয় না যে ইংরেজ সরকার বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তেমনি হোসেন শাহের কয়েকজন সভাসদ পণ্ডিত বা কবি ছিলেন বলেই প্রমাণ হয় না যে হোসেন শাহ বিদ্যা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

মালাধর বসুর পৃষ্ঠপোষক হিসাবে ধরে নিয়ে সকলে ভেবেছিলেন যে, হোসেন শাহ্ পণ্ডিত ও সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষণ করতেন। আর একটি বিষয় দেখতে হবে। বারবক শাহের কাছ থেকে যেমন বহু ব্যক্তি পাণ্ডিত্য বা অন্য কোন কারণের জন্য সম্মানসূচক উপাধি পেয়েছিলেন, হোসেন শাহের কাছে সেরকম উপাধি কেউ পেয়েছিলেন বলে জানা যায় না। এর থেকেও হোসেন শাহ্ বিদ্যা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন—এরকম ধারণা সমর্থিত হয় না। অবশ্য আমরা জোর করে একথা বলতে পারি না যে হোসেন শাহ্ বিদ্যা ও সাহিত্যের কোন পৃষ্ঠপোষকতাই করেন নি। করে থাকতে পারেন, কিন্তু সে সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় না। বরং বিরুদ্ধে প্রমাণ পাওয়া যায়। 'চৈতন্যভাগবত' (সিদ্ধান্তসরস্বতী সম্পাদিত) মধ্যখণ্ডের সপ্তদশ অধ্যায়ে হোসেন শাহ্ সম্বন্ধে লেখা আছে, "না করে পাণ্ডিত্য-চর্চ্চা রাজা সে যবন।"

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি পর্বকে 'হোসেন শাহী আমল' নামে চিহ্নিত করারও কোন সার্থকতা নেই। কারণ হোসেন শাহের রাজত্বকালে মাত্র দু'খানি উল্লেখযোগ্য বাংলা গ্রন্থ রচিত হয়েছিল—বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল ও কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারত। অনেকের মতে বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল এবং শ্রীকর নন্দীর মহাভারতও হোসেন শাহের রাজত্বকালে রচিত হয়েছিল, কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নয়। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল তাঁর রাজত্বকালের আগে রচিত হয়েছিল। শ্রীকর নন্দীর মহাভারত হোসেন শাহের রাজত্বকালের পরে রচিত হওয়া অসম্ভব নয়। যা হোক্, এই সমস্ত গ্রন্থ রচনার মূলে যেমন হোসেন শাহের প্রত্যক্ষ প্রভাব কার্যকরী ছিল না, তেমনি এই সব গ্রন্থ রচনার মধ্য দিয়ে যে বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ সৃষ্টি হয়েছিল, এমন কথাও বলা চলে না। হোসেন শাহের আমলেই বাংলার পদাবলী-সাহিত্যের চরম উন্নতি ঘটে বলে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন। কিন্তু পদাবলী-সাহিত্যের চরম উন্নতি ঘটে হোসেন শাহের রাজত্ব অবসানের কয়েক দশক পরে, যখন জ্ঞানদাস, গোবিন্দ-দাস প্রভৃতি কবিরা পদ রচনা সুরু করেন। পদাবলী-সাহিত্য তথা বৈষ্ণব সাহিত্যের চরম সমৃদ্ধির মূলে যাঁর প্রভাব সবচেয়ে বেশী সক্রিয়, তিনি চৈতন্যদেব, হোসেন শাহ্ নন। এই কারণে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের সঙ্গে বিশেষভাবে হোসেন শাহের নাম যুক্ত করে রাখার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে বলে মনে হয় না।

হোসেন শাহের ধর্ম-সম্বন্ধীয় নীতি

আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন, হোসেন শাহের ধর্ম সম্বন্ধে কোন গোঁড়ামি ছিল না এবং তিনি হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শী ছিলেন। প্রধানত দুটি বিষয়ের উপর এঁদের এই ধারণা নির্ভর করছে। প্রথম—হোসেন শাহের রাজত্বকালেই চৈতন্যদেবের পূর্ণ অভ্যুদয় ঘটেছিল; হোসেন শাহ একবার চৈতন্যদেবের মহিমা স্বীকার করেছিলেন এবং তাঁর নিরাপত্তা রক্ষার আশ্বাস দিয়েছিলেন; এর থেকে মনে হয় ধর্মবিষয়ে তিনি উদার ছিলেন। দ্বিতীয়—হোসেন শাহ রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পদে হিন্দুদের নিয়োগ করেছিলেন, এঁদের মধ্যে সনাতন ছিলেন হোসেন শাহের ডান হাত; এ ব্যাপার কি হোসেন শাহের হিন্দুদের প্রতি উদার মনোভাবের পরিচায়ক নয়?

প্রথম বিষয়টি সম্বন্ধে বলা যায়, হোসেন শাহের রাজত্বকালে চৈতন্যদেবের অভ্যুদয় ঘটেছিল বটে, কিন্তু এজন্য চৈতন্যদেবকে নানারকম বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করছি। এ ব্যাপারও বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, সন্ন্যাসগ্রহণ করার পরে চৈতন্যদেব আর হোসেন শাহের রাজ্যে থাকেন নি, হিন্দু রাজার দেশ উড়িষ্যায় চলে গিয়েছিলেন। মুসলিম-শাসিত বাংলা দেশে থাকলে তাঁর ধর্মচর্চার বিঘ্ন হতে পারে, এরকম আশঙ্কার বশবর্তী হয়েই তিনি বোধ হয় উড়িষ্যায় গিয়েছিলেন। হোসেন শাহ কর্তৃক চৈতন্যদেবের মাহাত্ম্য স্বীকার ও নিরাপত্তার আশ্বাসদান যে একটি বিচ্ছিন্ন আকস্মিক ঘটনা, সেকথা চৈতন্যদেবের চরিতকাররাই বলেছেন। বৃন্দাবনদাস বলেছেন সে সময়ে হোসেন শাহের "দৈবে আসি সত্ত্বগুণ উপজিল মনে।" হোসেন শাহের হিন্দু কর্মচারীরাও এর উপর ভরসা রাখতে পারেন নি।

দ্বিতীয় বিষয়টি সম্বন্ধে বলা চলে, সব সময়ে সমস্ত কাজের জন্য যোগ্য মুসলমান কর্মচারী পাওয়া যেত না বলে হিন্দুদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের প্রথা বাংলাদেশে অনেকদিন আগে থেকেই চলে আসছিল—রুকনুদ্দীন বারবক শাহের আমলেও বহু হিন্দু উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং হোসেন শাহ এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী সুলতানদের প্রথা অনুসরণ করেছিলেন। সনাতনও সম্ভবত তাঁর পূর্ববর্তী সুলতান সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালেই প্রথম নিযুক্ত হয়েছিলেন। আসল কথা, সনাতন, রূপ এবং অন্যান্য হিন্দু অমাত্য ও কর্মচারীদের অতুলনীয় কর্মদক্ষতার জন্যই হোসেন শাহ তাঁদের উচ্চপদে বহাল রেখেছিলেন। এতে রাজা হিসাবে তাঁর বিচক্ষণতা ও

দূরদর্শিতারই প্রমাণ পাওয়া যায়, হিন্দুদের প্রতি উদার মনোভাবের প্রমাণ মেলে না।

যাহোক্, বিশ্বাসযোগ্য সূত্রগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা যাক্, ধর্ম সম্বন্ধে হোসেন শাহ কোন্ দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করতেন। তাঁর দেহত্যাগের ৭১ বছর পরে রচিত 'তবকাৎ-ই-আকবরী'তে তাঁর সম্বন্ধে লেখা আছে, "তিনি শেখ নূর কুৎব্ আলমের সমাধিসংলগ্ন দানসত্রগুলির খরচ চালাবার জন্য অনেকগুলি গ্রাম দান করেছিলেন। প্রতি বছর তিনি তাঁর রাজধানী একডালা থেকে পাণ্ডুয়ায় আসতেন, শেখ নূরের সমাধি প্রদক্ষিণ করার জন্য।" 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা', 'মাসির-ই-রহিমী' এবং 'রিয়াজ-উস্-সলাতীন'-এও এই কথাগুলি লেখা আছে। 'মাসির'-এর মতে তিনি একডালা থেকে পাণ্ডুয়ায় আসার পথে সরাইখানা স্থাপন করেছিলেন, সেগুলি ব্যবহার করতে পয়সা লাগত না। 'রিয়াজ'-এর মতে তিনি প্রতি বছর পায়ে হেঁটে একডালা থেকে পাণ্ডুয়ায় নূর কুৎব্ আলমের সমাধিভূমিতে আসতেন। সুতরাং হোসেন শাহ সত্যিকারের নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন বলেই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে।

তাঁর শিলালিপিগুলির সাক্ষ্য থেকে এই সিদ্ধান্ত দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ পর্যন্ত তাঁর রাজত্বকালে উৎকীর্ণ ৫৮টি শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে মাত্র কয়েকটি ব্যতীত আর সবগুলিতেই তাঁর নাম আছে। বাংলার আর কোন সুলতানের এর অর্ধেক সংখ্যক শিলালিপিও মেলে না। এর অর্থ এই যে অন্য সুলতানদের রাজত্বের তুলনায় হোসেন শাহের রাজত্বকালে অনেক বেশী নতুন মসজিদ তৈরী হয়েছিল; কারণ মুসলিম আমলের বেশীর ভাগ শিলালিপিই মসজিদের গাত্রে উৎকীর্ণ। হোসেন শাহের রাজত্বকালে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অসংখ্য নতুন মসজিদ নির্মিত হয়েছিল, তার মধ্যে ৩১টিতে শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে। স্বয়ং সুলতান হোসেন শাহের নির্দেশে সুতী (মুর্শিদাবাদ), হজরৎ পাণ্ডুয়ার ছোটী দরগা, মৌলানাতলী (মালদহ) প্রভৃতি জায়গায় মসজিদ এবং মচাইন (ঢাকা), বনহরা (পাটনা), শাহ গদার দরগা (মালদহ), ধরমাই (ঢাকা), বাঢ় (পাটনা) ও আরও দু'তিন জায়গায় জামী মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। তিনি গৌড়ে মখদুম শেখ আখী সিরাজুদ্দীনের সমাধিগৃহে দুটি দরজা এবং একটি সিকায়াহ্ বা জলসত্র তৈরী করিয়ে দিয়েছিলেন। ৯০৭ হিজরায় "ধর্মবিজ্ঞান শিক্ষা এবং কেবলমাত্র যেসব আদেশ সত্য, সেগুলি সম্বন্ধে নির্দেশ" দেবার জন্য তিনি একটি মাদ্রাসা নির্মাণ

করিয়েছিলেন। গৌড়ের 'কদম্ রসুল' ভবনের (যেটি তাঁর পুত্র নসরৎ শাহ নির্মাণ করিয়েছিলেন বলে ভুলবশত মনে করা হয়) একটি তোরণ তিনি তৈরী করিয়েছিলেন, এবং বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটে মৌলানা হামিদ দানিশমন্দের সমাধির পাশে তিনি একটি জলাশয় খনন করিয়ে দিয়েছিলেন। 'কদম্ রসুল' ভবনের শিলালিপিতে স্থলতান হোসেন শাহকে "ইসলাম ও মুসলমানদের রক্ষক" বলা হয়েছে, কাঁটাদুয়ারের শিলালিপিতে তাঁকে বলা হয়েছে "মুসলিম পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের প্রতি দয়াশীল" এবং জাহানাবাদের শিলালিপিতে তাঁর সম্বন্ধে লেখা হয়েছে, "যাঁর উদ্যোগে ইসলাম বর্ধিত হচ্ছে।" স্থতরাং হোসেন শাহ যে সত্যকার ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সৈয়দ বংশের সন্তানের পক্ষে তা'ই হওয়া স্বাভাবিক।

এখন দেখা যাক্, হিন্দুদের প্রতি হোসেন শাহ উদার নীতি অবলম্বন করেছিলেন, এই ধারণা কতদূর সত্য? চৈতন্যচরিতগ্রন্থগুলি থেকে কিন্তু এসম্বন্ধে প্রতিকুল প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৫১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন চৈতন্যদেব সদলবলে রামকেলি গ্রামে গিয়েছিলেন, সেই সময় সকলে মিলে যে হরিধ্বনি করেছিলেন, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বৃন্দাবনদাস লিখেছেন,

নিকটে যবন রাজা পরম দুর্ব্বার।
তথাপিহ চিত্তে ভয় না জন্মে কাহার॥

এর কয়েক বছর আগে চৈতন্যদেব যখন সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে নবদ্বীপে শ্রীবাসের ঘরে হরিসংকীর্তন করছিলেন, সেই সময় নবদ্বীপে গুজব রটেছিল যে রাজার আদেশে কীর্তনীয়াদের ধরে নিয়ে যাবার জন্য দু'টি নৌকা আসছে। 'চৈতন্য-ভাগবত' মধ্যখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বৃন্দাবনদাস লিখেছেন,

কেহো বোলে আরে ভাই! পড়িল প্রমাদ।
শ্রীবাসের বাদে হৈল দেশের উৎপাদ॥
আজি মুঞি দেয়ানে শুনিলুঁ সব কথা।
রাজার আজ্ঞায় দুই নাও আইসে এথা॥
শুনিলে নদীয়ার কীর্তন বিশেষ।
ধরিয়া নিবারে হৈল রাজার আদেশ॥

এই মত কথা হৈল নগরে নগরে।
রাজ-নৌকা আইসে বৈষ্ণব ধরিবারে

শ্রীবাস পণ্ডিত বড় পরম উদার।
যেই কথা শুনে তাই প্রতীত তাঁহার॥
যবনের রাজ দেখি মনে হৈল ভয়।

'চৈতন্যভাগবত' মধ্যখণ্ডের সপ্তদশ অধ্যায়ে লেখা আছে স্বয়ং চৈতন্যদেবকে নবদ্বীপের "পাষণ্ডী"রা রাজার রোষের কথা বলে ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছিল,

পাষণ্ডি-সকল বোলে নিমাঞি পণ্ডিত।
তোমারে রাজার আজ্ঞা আইসে ত্বরিত॥
... ...
প্রভু বলে অস্তু অস্তু এ সব বচন।
মোর ইচ্ছা আছে করোঁ রাজ-দরশন॥
... ...
পাষণ্ডী বলয়ে রাজা চাহিব কীর্ত্তন!
না করে পাণ্ডিত্য-চর্চ্চা রাজা সে যবন॥

এই সমস্ত প্রবাদ রটা এবং পাষণ্ডীদের এই জাতীয় উক্তি করা থেকে মনে হয় হোসেন শাহ হিন্দু ধর্মের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না। হয়তো এসম্বন্ধে নবদ্বীপবাসীদের অপ্রীতিকর পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছিল, তাই তাঁদের মধ্যে এই জাতীয় কথা রটত। নবদ্বীপের হিন্দুরা যে হোসেন শাহকে সবিশেষ ভয়ের চোখে দেখতেন, তা'ও এই সব বিবরণ থেকে বেশ বোঝা যায়।

এসম্বন্ধে সমসাময়িক পর্তুগীজ পর্যটক বারবোসার সাক্ষ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি লিখেছেন যে বাংলার রাজার অধীনে "পৌত্তলিক (হিন্দু) অধ্যুষিত এক বিরাট অঞ্চল ছিল, তাদের (হিন্দুদের) মধ্যে প্রত্যেক দিন বহু লোক রাজা এবং শাসনকর্তাদের আনুকূল্য অর্জনের জন্য মুর (মুসলমান) হয়ে যেত।" সুতরাং হোসেন শাহ যে গোঁড়া মুসলমান ছিলেন না এবং তিনি হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শী ছিলেন—একথা বলবার আর কোন উপায় নেই।

হোসেন শাহ যে উড়িষ্যায় অভিযানে গিয়ে বহু দেবমন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংস করেছিলেন, একথা সমস্ত চৈতন্যচরিতগ্রন্থেই নানা জায়গায় পাওয়া যায়। 'চৈতন্যভাগবতে' আছে,



যে হুসেন সাহা সর্ব্ব উড়িয়ার দেশে।
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে॥
... ...
ওড্রদেশে কোটি কোটি প্রতিমা প্রাসাদ।
ভাঙ্গিলেক কত কত করিলে প্রমাদ॥

'চৈতন্যচরিতামৃতে' লেখা আছে, উড়িষ্যা-অভিযানে যাবার সময় হোসেন শাহ যখন সনাতনকে তাঁর সঙ্গে যাবার জন্য অনুরোধ করেন, তখন সনাতন বলেন,

যাবে তুমি দেবতায় দুঃখ দিতে।
মোর শক্তি নাহি তোমার সঙ্গে যাইতে॥

সনাতনের এই স্পর্ধিত উক্তি শুনে হোসেন শাহ "তবে তারে বান্ধি রাখি করিল গমন।"

তবে এখানে একটা কথা উঠতে পারে,—হোসেন শাহ উড়িষ্যার মন্দির ভেঙেছেন যুদ্ধের সময়। শান্তির সময়েও যে তিনি হিন্দুধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখিয়েছেন ও হিন্দুদের প্রতি অনুদার ব্যবহার করেছেন, তার প্রমাণ কই? এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ, তিনি সুবুদ্ধি রায়ের জাতি নষ্ট করেছিলেন। এ সম্বন্ধে পরোক্ষ প্রমাণ যথেষ্টই আছে। হোসেন শাহ যখন কেশব ছত্রীকে চৈতন্যদেবের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন কেশব ছত্রী তাঁর কাছে চৈতন্যদেবের মহিমা লাঘব করে বলেছিলেন। এর থেকে মনে হয়, হিন্দুদের প্রতি, বিশেষত হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতি হোসেন শাহের পূর্ব-ব্যবহার খুব সন্তোষজনক ছিল না।

হোসেন শাহের অধীনস্থ আঞ্চলিক শাসনকর্তা ও রাজকর্মচারীদের আচরণ সম্বন্ধে যে সব তথ্য পাই, তা'ও হোসেন শাহের হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শিতা প্রমাণ করে না। যখন চৈতন্যদেব নবদ্বীপে হরি-সঙ্কীর্তন করছিলেন এবং "নগরে নগরে সঙ্কীর্ত্তন" করাচ্ছিলেন, তখন নবদ্বীপের কাজী কীর্তনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন। 'চৈতন্যভাগবতে'র মধ্যখণ্ড, ২৩শ অধ্যায়ে লেখা আছে,

কাজী বোলে হিন্দুয়ানী হইল নদীয়া।
করিমু ইহার শাস্তি নাগালি পাইয়া॥
ক্ষমা করি যাঙ আজি দৈবে হৈল রাতি।
আর দিন লাগি পাইলেই লৈব জাতি॥

এইমত প্রতিদিন দুষ্টগণ লৈয়া।
নগরে ভ্রময়ে কাজি কীর্ত্তন চাহিয়া
দুঃখে সব নগরিয়া থাকে লুকাইয়া।

প্রভু-স্থানে গিয়া সভে করিলা গোচর॥
কাজীর ভয়েতে আর না করি কীর্ত্তন।
প্রতিদিন বুলে লই সহস্রেক জন॥
নবদ্বীপ ছাড়িয়া যাইব অন্য স্থানে।
গোচরিল এই দুই তোমার চরণে॥

'চৈতন্যভাগবত' অন্ত্যখণ্ডের ৫ম অধ্যায়ে গদাধর দাসের গ্রামের কাজীর অনুরূপ আচরণের বর্ণনা আছে,

সেই গ্রামে কাজী আছে পরম দুর্ব্বার।
কীর্ত্তনের প্রতি দ্বেষ করয়ে অপার॥

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে'র কয়েক জায়গাতেও কাজীদের সঙ্গে চৈতন্য-ভক্তদের বিরোধের উল্লেখ আছে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র আদিলীলা ১৭শ পরিচ্ছেদে লিখেছেন যে চৈতন্যদেবের নবদ্বীপলীলার সময়ে নবদ্বীপের কাজী জনৈক কীর্তনীয়ার ঘরে গিয়ে তাঁর খোল ভেঙে দিয়ে কীর্তন করতে নিষেধ করেছিলেন,

মৃদঙ্গ করতাল সঙ্কীর্ত্তন উচ্চধ্বনি।
হরিহরিধ্বনি বিনে আন নাহি শুনি॥
শুনিয়া যে ক্রুদ্ধ হৈল সকল যবন।
কাজী পাশে আসি সভে কৈল নিবেদন॥
ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী এক ঘরে আইল।
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল॥
এতকাল কেহো নাহি কৈল হিন্দুয়ানী॥
এবে যে উদ্যম চালাও কোন্ বল জানি॥
কেহো কীর্ত্তন না করিহ সকল নগরে।
আজি আমি ক্ষমা করি যাইতেছি ঘরে॥
আর যদি কীর্ত্তন করিতে লাগ পাইমু।
সর্ব্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু॥

হোসেন শাহের অথবা তাঁর পুত্র নসরৎ শাহের রাজত্বকালের একটি ঘটনা থেকে জানতে পারি বাংলার স্থলতানের মুসলমান উজীররা কীভাবে কথায় কথায় হিন্দুর ধর্ম নষ্ট করতেন। এই সময় বেনাপোলের (বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের যশোহর জেলার অন্তর্গত) জমিদার ছিলেন রামচন্দ্র খান। ইনি একজন গোঁড়া শাক্ত ছিলেন, বৈষ্ণবদের সহ্য করতে পারতেন না। হরিদাস ঠাকুর ও নিত্যানন্দ এঁর কাছে বিরূপ ব্যবহার পেয়েছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃতে' এঁর চরিত্র এমনভাবে বর্ণনা করেছেন, যার থেকে মনে হয় ইনি ঘোরতর দুষ্কৃতকারী ছিলেন। কিন্তু নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব কৃষ্ণদাস এই বৈষ্ণব-বিরোধীর চরিত্র অঙ্কনে অতিরঞ্জনের আশ্রয় নিয়েছেন বলে মনে হয়। ১৫১৫ খ্রীঃর কয়েক বছর পরে এই রামচন্দ্র খানের রাজকর বাকী পড়ায় * বাংলার স্থলতানের উজীরের হাতে তাঁর কী অবস্থা হয়েছিল, তা কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখা থেকে উদ্ধৃত করছি,

দস্যুবৃত্তি করে রামচন্দ্র না দেয় রাজকর।
ক্রুদ্ধ হঞা ম্লেচ্ছ উজীর আইল তার ঘর॥
আসি সেই দুর্গামণ্ডপে বাসা কৈল।
অবধ্যবধ করি মাংস সে ঘরে রান্ধাইল॥
স্ত্রী-পুত্র সহিতে রামচন্দ্রেরে বান্ধিয়া।
তার ঘর গ্রাম লুটে তিনদিন রহিয়া॥
সেই ঘরে তিনদিন করে অমেধ্য-রন্ধন।
আর দিন সভা লঞা করিল গমন॥
জাতি-ধন-জন খানের সব নষ্ট হৈল।
বহুদিন পর্য্যন্ত গ্রাম উজাড় রহিল॥

রাজকর না দেওয়ার জন্য রামচন্দ্র খানকে বন্দী করে এবং তার ঘর গ্রাম লুঠ করেও উজীরের তৃপ্তি হল না, তিনি হতভাগ্য রামচন্দ্রের দুর্গামণ্ডপে "অবধ্য" অর্থাৎ গরু বধ করে তার মাংস তিনদিন ধরে রন্ধন করে তবে ক্ষান্ত হলেন! (সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই ঘটনা অত্যন্ত

* ১৫১৫ খ্রীঃ বা তারও কিছু পরে নিত্যানন্দ নীলাচল থেকে বাংলায় ফিরে আসেন। তার কিছুদিন পরে তিনি প্রেমধর্ম প্রচার উপলক্ষে রামচন্দ্র খানের গ্রামে গিয়ে রামচন্দ্রের কাছে খারাপ ব্যবহার পান। তারও কিছুদিন পরে রামচন্দ্র খানের রাজকর বাকী পড়ে।

পরিতোষ সহকারে বর্ণনা করেছেন, হরিদাস ঠাকুর ও নিত্যানন্দের প্রতি অসদাচরণকারী রামচন্দ্রের উচিত শাস্তি হল ভেবে। রামচন্দ্রের এই লাঞ্ছনা যে সমগ্র হিন্দু-সমাজের অপমান, সে কথা তাঁর মনে জাগে নি।)

'চৈতন্যচরিতামৃতে'র অন্ত্যলীলা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ থেকে জানা যায় যে সপ্তগ্রামের মুসলমান শাসনকর্তা নিছক গায়ের জোরে ঐ অঞ্চলের ইজারাদার হিরণ্য মজুমদার ও গোবর্ধন মজুমদারের সুলতানের কাছে প্রাপ্য আট লক্ষ টাকার ভাগ চেয়েছিল, তার মিথ্যা নালিশ শুনে হোসেন শাহের উজীর হিরণ্য ও গোবর্ধনের মত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বন্দী করতে এসেছিলেন এবং তাঁদের না পেয়ে গোবর্ধনের পুত্র নিরীহ রঘুনাথ দাসকে বন্দী করেছিলেন। সবচেয়ে আশ্চর্য কথা, রাজার কারাগারে বন্দী হবার পরেও সপ্তগ্রামের শাসন-কর্তা রঘুনাথকে তর্জনগর্জন ও ভীতিপ্রদর্শন করতে থাকে। শুধু উজীর ও রাজকর্মচারীরা নয়, অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মুসলমানরাও আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকালে হিন্দুদের উপর অনেক সময় জুলুম করতেন। বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের 'মনসামঙ্গল' হোসেন শাহের রাজত্বকালে—১৪৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। তার চতুর্থ পালায় বিপ্রদাস হাসন-হুসেনের রাজ্যের মুসলমানদের সম্বন্ধে লিখেছেন,

> কেহ বা জুলুম করে কেহ গুনা শিরে ধরে
> রুজু করি করয়ে নছাব।
> জতেক ছৈয়দ মোল্লা জপয়ে ত বিসমল্লা
> সদা মুখে কলিমা কেতাব॥
> হিন্দুত কলিমা দিল মুছলমানি শিখাইল
> তথা বৈসে জত মুছলমান।

এই বর্ণনা নিশ্চয়ই তৎকালীন মুসলমানদের দেখে কবি লিপিবদ্ধ করেছেন। সুতরাং ঐ সময়ে যে "সৈয়দ মোল্লা"রা হিন্দুদের জোর করে মুসলমান করত, তার আভাস এখানে পাচ্ছি।

অত্যাচারের কথা বাদ দিলেও হোসেন শাহের মুসলমান কর্মচারীদের পর-ধর্ম-বিদ্বেষের নিদর্শন বহু সূত্র থেকেই পাওয়া যায়। বৈষ্ণবদের কীর্তনকে তাঁরা বলতেন "ভূতের কীর্তন", একথা 'চৈতন্যভাগবতে'র মধ্যখণ্ড, ২৩শ অধ্যায় থেকে জানা যায়। 'চৈতন্যভাগবত' অন্ত্যখণ্ডের ৪র্থ অধ্যায়ে লেখা আছে

যে হোসেন শাহের "কোটোয়াল" তাঁর কাছে চৈতন্যদেবের বর্ণনা দেবার সময় বলেছিল,

এক ন্যাসী আসিয়াছে রামকেলি গ্রামে॥
নিরবধি করয়ে ভূতের সংকীর্ত্তন।
না জানি তাঁহার স্থানে মিলে কত জন॥

কেউ কেউ বলতে পারেন, উজীর ও কর্মচারীদের বা অন্যান্য মুসলমানদের এই সমস্ত কাজ থেকে রাজার হিন্দুবিদ্বেষ প্রমাণিত হয় না। কিন্তু রাজা যদি হিন্দুদের উপর সহানুভূতিসম্পন্ন হতেন, তাহলে উজীর ও কর্মচারীরা বা অন্য মুসলমানরা হিন্দুদের উপর অকথ্য নির্যাতন করতে ও তাদের ধর্ম নষ্ট করতে পারতেন বলে মনে হয় না। আকবরের সময়েও হিন্দুদ্বেষী মুসলমান কর্মচারীর ও সাধারণ মুসলমানের অভাব ছিল না। কিন্তু সম্রাটের নীতির বিরুদ্ধাচরণ করে হিন্দুদের উপর অত্যাচার করতে তাঁরা সাহস করেন নি। সুতরাং হোসেন শাহ যে আকবরেরই মত ধর্মবিষয়ে উদার ও হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শী ছিলেন, একথা বলা ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ মাত্র। যাহোক্, স্বয়ং হোসেন শাহেরও ধর্মবিষয়ে অনুদারতার প্রমাণ যথেষ্টই পাই। 'চৈতন্যচরিতামৃত' আদিলীলা সপ্তদশ পরিচ্ছেদ থেকে বোঝা যায়, হোসেন শাহ হরি-সঙ্কীর্তন একেবারেই পছন্দ করতেন না এবং কোথাও হিন্দুরা হরি-সঙ্কীর্তন করলে তিনি স্থানীয় কাজীকে শাস্তি দিতেন। জনৈক মুসলমান নবদ্বীপের কাজীকে বলেছিল,

হরি-হরি করি হিন্দু করে কোলাহল।
পাৎশা শুনিলে তোমায় করিবেক ফল॥

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে দেখি হোসেন শাহের হিন্দু কর্মচারীরা তাঁর সম্বন্ধে বলছেন,

স্বভাবেই রাজা মহা কালযবন।
মহাতমোগুণবুদ্ধি জন্মে ঘনেঘন॥

এর থেকে বোঝা যায়, হোসেন শাহ বহুবারই হিন্দুবিদ্বেষ ও হিন্দুবিরোধী কার্য-কলাপের পরিচয় দিয়েছেন।

সুতরাং হোসেন শাহ যে অসাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন ও হিন্দুদের প্রতি অপক্ষপাত আচরণ করতেন, এ ধারণা একেবারেই ভুল। হোসেন শাহ একজন শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন, তাঁর শাসনদক্ষতা অতুলনীয় ছিল এবং তিনি উচ্চস্তরের সামরিক প্রতিভারও অধিকারী ছিলেন। কিন্তু পরধর্ম সম্বন্ধে

উদারতা তাঁর খুব বেশী ছিল না। অপরদিকে নিজের ধর্মের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ছিল খুবই বেশী। নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবরা হোসেন শাহকে ধর্ম-বিষয়ে উদার মনে করেন নি কোনদিনই। তাঁরা চৈতন্যদেবের সমসাময়িক বিভিন্ন বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব ব্যক্তির তত্ত্বনিরূপণ করেছেন, অর্থাৎ দ্বাপরযুগে কৃষ্ণলীলার সময় কে কী ছিলেন, তা কল্পনা করেছেন। তাঁদের মতে হোসেন শাহ কৃষ্ণলীলার সময় জরাসন্ধ ছিলেন (চিত্রে নবদ্বীপ, শরদিন্দুনারায়ণ রায়, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৭৮)। হোসেন শাহের হিন্দু সম্বন্ধীয় নীতির অনুদারতা সম্বন্ধে এর থেকে খানিকটা আভাস পাওয়া যায়।

রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান' বইয়ের একাধিক প্রবন্ধে "হোসেন শাহ স্বীয় প্রকৃতি ও কৃতকার্য্যের জন্য হিন্দুদিগের কিরূপ ভয় ও অবিশ্বাসের কারণ হইয়াছিলেন," তা দেখাবার চেষ্টা করেছেন। রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত মোটামুটিভাবে সমর্থনযোগ্য। কিন্তু তাঁর আলোচনার একটি প্রধান ত্রুটি হচ্ছে এই যে তিনি কয়েকটি অপ্রামাণিক সূত্রের উক্তি প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করেছেন, যেমন, ঈশান নাগরের 'অদ্বৈতপ্রকাশ', 'প্রেমবিলাস' ও 'বৃহৎ সারাবলী'। তিনি যাকে সমসাময়িক ও প্রামাণিক সূত্র বলে মনে করেছেন, সেই ঈশান নাগরের 'অদ্বৈতপ্রকাশ' আসলে জাল বই—অনেক পরবর্তী কালের রচনা; 'প্রেমবিলাসে'র এক বৃহদংশই প্রক্ষিপ্ত এবং 'বৃহৎ সারাবলী' নিতান্তই অর্বাচীন গ্রন্থ—১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। তাছাড়া রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যে সমস্ত ঘটনা হোসেন শাহের রাজত্বকালে ঘটেছিল বলে মনে করেছেন, তাদের মধ্যে অনেকগুলি হোসেন শাহের রাজত্ব সুরু হবার অনেক আগে ঘটেছিল, যেমন গৌড়েশ্বর কর্তৃক "নদীয়া উচ্ছন্ন" করা এবং হরিদাস ঠাকুরের নির্যাতন (এই বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহ' সম্বন্ধীয় আলোচনা দ্রষ্টব্য)। তিনি বিজয়গুপ্তের সাক্ষ্যও উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' হোসেন শাহের সিংহাসনে আরোহণের প্রায় ন' বছর আগে লেখা (পৃঃ ২২০-২২১ দ্রষ্টব্য)। অবশ্য রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দুদের প্রতি হোসেন শাহের আচরণ সম্বন্ধে বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকেও অনেক উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। সেগুলি আমরা আগেই বিচার করে এসেছি। একটি কথা বলা দরকার। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত থেকে পরধর্ম সম্বন্ধে হোসেন শাহের অনুদারতার প্রমাণ মেলে, কিন্তু তাঁর ধর্মোন্মত্ততার প্রমাণ মেলে না।

হোসেন শাহ হিন্দুধর্ম তথা পরধর্মের উপর বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না, তাই সময়ে সময়ে তিনি হিন্দুদের প্রতি দুর্ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তিনি যে ফিরোজ শাহ তোগলক, সিকন্দর লোদী বা ঔরংজেবের মত ধর্মোন্মাদ ছিলেন না, তাতে কোন সন্দেহ নেই। হোসেন শাহ যদি ধর্মোন্মাদ হতেন, তাহলে নবদ্বীপের কীর্তন বন্ধ করায় সেখানকার কাজী ব্যর্থতা বরণ করার পর নিজেই অকুস্থলে উপস্থিত হতেন এবং জোর করে কীর্তন বন্ধ করে দিতেন। তাঁর রাজত্বকালে কয়েকজন মুসলমান হিন্দু-ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিলেন। কবিকর্ণপুরের 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়' নাটক ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' থেকে জানা যায় যে, শ্রীবাসের মুসলমান দর্জি চৈতন্যদেবের রূপ দেখে প্রেমে পাগল হয়ে মুসলমানদের তিরস্কার এবং তাড়নাকে অগ্রাহ্য করে হরিনাম ও কীর্তন করেছিল, আর উৎকল-সীমান্তের মুসলমান সীমাধিকারী ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্যদেবের ভক্ত হয়ে পড়েছিল। ইতিপূর্বে-নির্যাতিত যবন হরিদাস হোসেন শাহের রাজত্বকালে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতেন এবং নবদ্বীপে নগর-সঙ্কীর্তনের সময় সামনের সারিতে থাকতেন। চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খান ও তাঁর পুত্র ছুটি খান হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ মহাভারত শুনতেন। এসব ব্যাপার—অন্তত শেষ ব্যাপারটা হোসেন শাহের কাছে অজানা থাকবার কথা নয়। হোসেন শাহ যখন এঁদের কোন শাস্তি দেন নি, তখন বুঝতে হবে তিনি ধর্মোন্মাদ ছিলেন না। এ কথাও মনে রাখতে হবে যে তাঁর রাজধানীর খুব কাছেই রামকেলি, কানাই-নাটশালা প্রভৃতি গ্রামে বহু নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব বাস করতেন। 'রাজমালা'য় লেখা আছে যে হোসেন শাহের হিন্দু সৈন্যেরা ত্রিপুরায় যুদ্ধ করতে গিয়ে গোমতী নদীর তীরে পাথরের প্রতিমা পূজা করেছিল। হোসেন শাহ ধর্মোন্মাদ হলে এ সব ব্যাপার সম্ভব হত না।

আসল কথা হোসেন শাহ ছিলেন বিচক্ষণ ও রাজনীতিচতুর নরপতি। হিন্দুধর্মের প্রতি অত্যধিক বিদ্বেষের পরিচয় দিলে অথবা হিন্দুদের মনে বেশী আঘাত দিলে তার ফল যে বিষময় হবে, তা তিনি বুঝতেন। তাই তাঁর হিন্দু-বিরোধী কার্যকলাপ সংখ্যায় অল্প না হলেও তা কোনদিনই একেবারে মাত্রা ছাড়িয়ে যায় নি।

হোসেন শাহের মৃত্যু

আলাউদ্দীন হোসেন শাহের যে সমস্ত শিলালিপি পাওয়া যায়, তার মধ্যে সোনারগাঁওয়ের গোয়ালদী মসজিদের শিলালিপিটিই শেষতম; এর তারিখ

৯২৫ হিজরার ১৫ই শাবান অর্থাৎ ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগস্ট। অতএব হোসেন শাহ অন্তত ঐ তারিখ অবধি নিশ্চয়ই জীবিত ছিলেন। এর অল্প কিছুদিন পরেই বোধহয় তাঁর মৃত্যু হয়েছিল; কারণ ৯২৫ হিজরা থেকেই তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে, পরের বছর থেকে নসরৎ শাহের শিলালিপিও পাওয়া যাচ্ছে। হোসেন শাহের নিশ্চয়ই স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল, কারণ বাবর তাঁর আত্মকাহিনীতে লিখেছেন যে নসরৎ শাহ শান্তিপূর্ণভাবে উত্তরাধিকারসূত্রে সিংহাসন লাভ করেছিলেন। 'তবকাৎ-ই-আকবরী'তে স্পষ্টভাবেই লেখা আছে যে আলাউদ্দীনের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল। অন্যান্য গ্রন্থেও একথা লেখা আছে।

হোসেন শাহের সমাধি-ভবন ছিল এক অপূর্ব শিল্পকর্মের নিদর্শন। এটি এখন আর বর্তমান নেই, কিন্তু যখন ছিল, সে সময়ে ক্রেটন একে দেখে এর একটি ছবি এঁকে গিয়েছেন। সেটি দেখলে এর অতুলনীয় সৌন্দর্যের আভাস পাওয়া যায়। মেজর উইলিয়ম ফ্রাঙ্কলিনও এই ভবনটি দেখেছিলেন। তিনি এর এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

"You enter by a handsome arched gateway built of stone, the sides and front of this doorway are incrusted with a peculiar kind of composition, blue and white China tiling, which has a singular appearance ; at the four corners are large roses cut in the stone...The minarets which flank the building are ornamented with curious carved work of trees, flowers, etc. Within the doorway is a large enclosure containing the bodies of Shah Sultān Hosein and other branches of the royal family. The sides of the enclosure are incrusted with the same kind of blue and white composition." (Memoirs of Gaur and Pandua, p. 59 দ্রষ্টব্য।)

সে যুগের অনেক মুসলমান নৃপতি নিজেদের সমাধি-ভবন নির্মাণ করে যেতেন। হোসেন শাহও সম্ভবত তা'ই করেছিলেন। তা' যদি করে থাকেন, তাহলে এর থেকে হোসেন শাহের শিল্পবোধ ও সৌন্দর্যরসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

উপসংহার

যে রাজার নাম বাঙালীর কাছে একান্ত পরিচিত,—ইতিহাসে, সাহিত্যে ও কিংবদন্তীতে যিনি অমরতা লাভ করেছেন, তাঁর সম্বন্ধে আমরা যথাসাধ্য আলোচনা করলাম। অবশ্য দীর্ঘ আলোচনা সত্ত্বেও যেটুকু তথ্য উদ্ধার করা গেল, তা পর্যাপ্ত নয়। দীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসর ব্যাপী এক গৌরবোজ্জ্বল রাজত্বের কতটুকু সংবাদই বা আমরা জানতে পারলাম ? এ সম্বন্ধে অধিকাংশ তথ্যই বিস্মৃতির গহন অরণ্যের অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছে, জানি না কোনদিন তাদের উদ্ধার সাধন সম্ভব হবে কিনা।

"হোসেন শাহের আমল"—কথাটি শুনলেই বাঙালীর মনে একটি অত্যুজ্জ্বল গরিমাময় আলেখ্য ফুটে ওঠে। "হোসেন শাহের আমল" বলতে বাঙালী বোঝেন এমন এক আমল, যে সময় এদেশ ও তার মানুষেরা রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক—সব দিক দিয়েই উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল। এই ধারণা অমূলক নয়। তবে আমাদের এ কথাও মনে রাখতে হবে যে হোসেন শাহের আমল সম্বন্ধে বারো আনা সংবাদই আমরা পাই চৈতন্য-চরিত গ্রন্থগুলি থেকে। হোসেন শাহের রাজত্বকালেই চৈতন্যদেব নবদ্বীপে লীলা করেছিলেন এবং সন্ন্যাসগ্রহণ করেছিলেন। চরিতকাররা চৈতন্যদেবের জীবনের এই অংশের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার থেকেই আমরা প্রাসঙ্গিকভাবে হোসেন শাহের আমল সংক্রান্ত তথ্যগুলি পাই। অন্য গৌড়েশ্বরদের রাজত্ব-কালে অনুরূপ বিশিষ্ট ঘটনা ঘটে নি, তাই তাঁদের আমল সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানতে পারি নি। তার ফলে—তাঁদের আমলের তুলনায় হোসেন শাহের আমল যে সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, সাধারণের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। হোসেন শাহের ছাব্বিশ বৎসর ব্যাপী নির্বিঘ্ন রাজত্ব, রাজ্যের বিশাল আয়তন ও রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রাখার কথা ভাবলে এবং তাঁর রাজত্ব-কালে বাংলাদেশে যে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছিল, তাঁদের কথা স্মরণ করলে এই ধারণার অনুকূলে যুক্তিও পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে, বাংলার অন্যান্য শ্রেষ্ঠ সুলতানদের আমল সম্বন্ধে আমরা পর্যাপ্ত তথ্য পাই নি। তাই এ সম্বন্ধে চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

হোসেন শাহের আমলে দেশের লোকে মোটামুটি সুখেই ছিল। সুলতানের

পরধর্ম সম্বন্ধে উদারতার যেটুকু অভাব ছিল, তাঁর শাসনদক্ষতা দিয়ে তিনি সেটুকু পুষিয়ে নিয়েছিলেন, তাই গোলযোগ বিশেষ হয় নি।

যাহোক, কল্পনা ও সংস্কারের ধূম্রজাল ভেদ করে এই লোকবিশ্রুত নরপতির সত্য পরিচয় উদ্ধারের চেষ্টা করা গেল। এখন তাঁর কাছ থেকে আমরা বিদায় নিতে পারি।

নবম অধ্যায়

হোসেন শাহী বংশের শেষ পর্ব

নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ

আলাউদ্দীন হোসেন শাহের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। আগেই বলেছি যে মুদ্রা ও শিলালিপির সাক্ষ্য থেকে দেখা যায়, ৯২৫ হিজরাতে হোসেন শাহের মৃত্যু ও নসরৎ শাহের সিংহাসনে আরোহণ ঘটেছিল।

কিন্তু নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের ৯১৮ এবং ৯২২-৯২৪ হিজরায় উৎকীর্ণ মুদ্রাও পাওয়া গিয়েছে। এর থেকে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত করেছিলেন, "নস্‌রৎ শাহ্‌ পিতার জীবদ্দশায় বিদ্রোহী হইয়া দক্ষিণবঙ্গে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন।" কিন্তু এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না। বাংলার সুলতানদের পুত্রেরা যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবার সময়েই যে নিজের নামে মুদ্রা প্রকাশের অধিকারী হতেন, তার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। রুকনুদ্দীন বারবক শাহ ও শামসুদ্দীন যুসুফ শাহ এইরকম যুবরাজ হওয়ার পরে পিতার জীবদ্দশায় মুদ্রা ও শিলালিপি প্রকাশ করেছিলেন। সুতরাং নসরৎ শাহের ঐ মুদ্রাগুলিকে তাঁর যুবরাজ অবস্থার মুদ্রা বলে গ্রহণ করাই সঙ্গত। হোসেন শাহের জীবদ্দশায় যে নসরৎ তাঁর প্রতি চিরদিনই অনুগত ছিলেন, তা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। বাবর তাঁর আত্মকাহিনীতে লিখেছেন যে নসরৎ শাহ তাঁর পিতার মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকারসূত্রে পিতৃসিংহাসন লাভ করেছিলেন। বাবরই লিখেছেন যে বাংলাদেশে উত্তরাধিকারসূত্রে সিংহাসন লাভ অত্যন্ত বিরল এবং যে রাজাকে বধ করে, সে-ই রাজা হয়। সুতরাং নসরৎ শাহ যে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন, একথা বলার কোন কারণই নেই।

'তবকাৎ-ই-আকবরী', 'মাসির-ই-রহিমী' ও 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে' লেখা আছে যে সুলতান হোসেন শাহের ১৮ জন পুত্র ছিলেন এবং নসরৎ শাহ্‌ তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন। 'রিয়াজ'-এ লেখা আছে, অন্যান্য রাজাদের মত নসরৎ শাহ তাঁর ভাইদের বন্দী করেননি, তার বদলে তাঁদের পিতৃদত্ত বৃত্তি দ্বিগুণ করে দেন। একথা সত্য হলে বলতে হবে নসরৎ শাহ অত্যন্ত মহৎ প্রকৃতির

লোক ছিলেন। কিন্তু এই উদারতার পরিণাম খুব শুভ হয় নি। নসরৎ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ যখন রাজা হলেন, তখন নসরৎ শাহের একজন ভাইই তাঁকে সিংহাসনচ্যুত ও নিহত করে নিজে রাজা হয়েছিলেন।

নসরৎ শাহের পরবর্তী কাজ সম্বন্ধে 'রিয়াজ'-এ লেখা আছে, "তিনি ত্রিহুতের রাজাকে বন্দী করে বধ করলেন। ত্রিহুত ও হাজীপুরের শেষ সীমান্ত পর্যন্ত জয় করার জন্য তিনি হোসেন শাহের জামাতা ও তাঁর অমাত্য আলাউদ্দীন ও মখদুম আলম বা শাহ আলমকে নিযুক্ত করেন।" 'রিয়াজ'-এর এই উক্তি সত্য বলেই মনে হয়। কারণ, এই সময় ত্রিহুত বা মিথিলায় ওইনিবার-বংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন। তাঁদের মধ্যে শেষ যে রাজার নাম জানা যায়—তিনি ভৈরবসিংহের পৌত্র ও রামভদ্রসিংহের পুত্র লক্ষ্মীনাথ বা কংসনারায়ণ * (J. A. S. B., 1915, pp. 430-431 এবং Select Inscriptions of Bihar by R. K. Choudhari, pp. 126-127 দ্রষ্টব্য)। এঁর পরে এই বংশের আর কোন রাজার নাম পাই না। সুতরাং নসরৎ শাহই কংসনারায়ণকে বধ করে এই বংশ লোপ করেছিলেন বলে মনে হয়।†

---

* কংসনারায়ণ সম্ভবত নসরৎ শাহের সামন্ত ছিলেন, কারণ লোচনের 'রাগতরঙ্গিণী'তে (মুদ্রিত গ্রন্থ, পৃঃ ৯৭) সঙ্কলিত কংসনারায়ণের ভণিতাযুক্ত একটি পদে 'নসিরা শাহ" অর্থাৎ নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের এই প্রশস্তি পাই (এতে উল্লিখিত 'সে'রম দেই' সম্ভবত নসরৎ শাহের হিন্দু বেগম)—

স্মুখি সমাদ সমাদরে সমদল নসিরাসাহ সুরতানে।
নসিরা ভূপতি সোরম দেই পতি কংসনরাএণ ভাণে॥

সম্ভবত কংসনারায়ণ স্বাধীন হবার চেষ্টা করাতে অথবা বাবরের সঙ্গে যোগ দেওয়াতে নসরৎ শাহ তাঁকে আক্রমণ করে বন্দী করেন ও বধ করেন।

† মিথিলায় প্রচলিত একটি শ্লোকের সাক্ষ্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এতে বলা হয়েছে যে, কংসনারায়ণ ১৪৪৯ শকাব্দের ভাদ্র মাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে মঙ্গলবারে নিহত হয়েছিলেন,

অঙ্কাব্ধিবেদরাসি সম্মিতশাকবর্ষে।
ভাদ্রেসিতে প্রতিপদি ক্ষিতিসূনুবারে॥
হা হা নিহত্য কংসনারায়ণোঽসৌ।
তত্যাজ দেবসরসী নিকটে শরীরম্॥

(**Proceedings of the Indian History Congress, 16th Session, 1953, p. 206** দ্রষ্টব্য।)

এই শ্লোকটি প্রামাণিক বলে মনে হয়, কারণ ১৪৪৯ শকাব্দের ভাদ্র মাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথি মঙ্গলবারেই পড়েছিল; ঐ দিন তারিখ ছিল ২৭শে আগষ্ট, ১৫২৭ খ্রীঃ (**Indian Ephemeries, Swami Kanupillay, Vol V, p. 257** দ্রষ্টব্য)। ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে নসরৎ শাহ বাংলার সুলতান ছিলেন। সুতরাং নসরৎ শাহ ত্রিহুতের রাজাকে নিহত করেছিলেন—'রিয়াজ'-এর এই উক্তির সঙ্গে শ্লোকটির উক্তির সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে।

'রিয়াজ'-এ উল্লিখিত মখদুম আলম-এর নাম বাবরের আত্মকাহিনীতে পাওয়া যায়। ত্রিহুত যে নসরৎ শাহের রাজ্যের অধিকারভুক্ত হয়েছিল, তাতে সন্দেহের অবকাশ অল্প; কারণ ত্রিহুতের পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম—তিন দিকে অবস্থিত অঞ্চলই যে নসরৎ শাহের রাজ্যভুক্ত ছিল, তার প্রমাণ আছে। নসরৎ শাহের ত্রিহুত অধিকারের একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে। ত্রিহুতের বেগুসরাইয়ে নসরৎ শাহ একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন, তার শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে; মসজিদটিকে নদী গ্রাস করেছে (JBRS, 1955, pp. 367-368)। তাছাড়া ত্রিহুতে নসরৎ শাহ, তাঁর পিতা হোসেন শাহ ও হাব্‌শী সুলতান মুজাফফর শাহের মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে।

নসরৎ শাহের রাজত্বকালের অন্যতম প্রধান ঘটনা ভারতে চাগতাই (মোগল) সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ।

হোসেন শাহের রাজ্য বাংলার সীমা অতিক্রম করে বিহারের অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল বটে, কিন্তু তার পাশেই ছিল পরাক্রান্ত সুলতান সিকন্দর লোদীর রাজ্য। এইজন্য বাংলার সুলতানকে কতকটা সশঙ্কভাবেই থাকতে হত। কিন্তু নসরৎ শাহের সিংহাসনে আরোহণের দু' বছরের মধ্যেই লোদী সুলতানদের রাজ্যে ভাঙন ধরল। জৌনপুর থেকে পাটনা পর্যন্ত অঞ্চল প্রায় স্বাধীন হল এবং এই অঞ্চলে লোহানী ও ফর্মুলী বংশীয় লোকরা মাথা তুলে দাঁড়ালেন। নসরৎ এঁদের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করলেন। এর ফলে নতুন কিছু অঞ্চল তাঁর রাজ্যভুক্ত হয়েছিল মনে করা যেতে পারে।

এর পরবর্তী ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ বাবরের আত্মকাহিনীতে পাওয়া যায়। এই বিবরণের সংক্ষিপ্তসার নীচে দেওয়া হল।

১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে বাবর পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত ও নিহত করে দিল্লী দখল করেন এবং তখন থেকেই রাজ্য-বিস্তারে মন দেন। আফগান নায়কেরা তাঁর হাতে পরাজিত হয়ে পূর্ব ভারতে পালিয়ে গেলেন। ১৫২৬ খ্রীঃর আগস্ট মাসে হুমায়ুন কনৌজ ও জৌনপুর থেকে মারুফ এবং নাসির লোহানীকে বিতাড়িত করলেন। টঁস নদীর দক্ষিণ থেকে সুরু করে ঘর্ঘরা পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল এইভাবে বাবরের রাজ্যভুক্ত হল এবং তাঁর রাজ্যের সীমা নসরৎ শাহের রাজ্যের সীমাকে স্পর্শ করল। নসরৎ বাবর কর্তৃক বিতাড়িত আফগানদের অনেককে তাঁর রাজ্যে আশ্রয় দিলেন। কিন্তু তিনি খোলাখুলিভাবে বাবরের বিরুদ্ধাচরণ করলেন না। বাবর তাঁর সভায়

দূত পাঠিয়ে তাঁকে তাঁর মনোভাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। সেই দূত নসরৎ শাহের সভায় এক বছরেরও বেশী সময় রইল, কিন্তু নসরৎ এক বছরের মধ্যেও তাকে খোলাখুলিভাবে কিছু জানালেন না। অবশেষে যখন বাবরের সন্দেহ জাগ্রত হল, তখন নসরৎ বাবরের দূতকে ফেরৎ পাঠালেন নিজের দূত সঙ্গে দিয়ে। বাবরের কাছে অনেক উপহার পাঠিয়ে তিনি তাঁর বন্ধুত্ব জ্ঞাপন করলেন। ফলে ১৫২৯ খ্রীঃর জানুয়ারী মাসে বাবর স্থির করলেন বাংলা আক্রমণ করা তাঁর পক্ষে উচিত হবে না।

এর পরবর্তী কিছু সময়ের ঘটনা সম্বন্ধে আমরা কিছু জানতে পারি না, কারণ বাবরের আত্মকাহিনীর এই অংশ হারিয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে বিহারের লোহানী-প্রধান বহার খানের আকস্মিক মৃত্যু ঘটল। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন তাঁর বালক পুত্র জলাল খান। শের খান সূর দক্ষিণ বিহারের জায়গীর গ্রহণ করলেন এবং জৌনপুরের শাসনকর্তার (মোগলের অধীন) সঙ্গে মিলে নিজের স্বার্থসিদ্ধির উপায় খুঁজতে লাগলেন।

এদিকে ইব্রাহিম লোদীর ভাই মাহ্‌মুদ নিজেকে ইব্রাহিম লোদীর উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করলেন। তিনি জৌনপুর অধিকার করলেন এবং বালক জলাল খান লোহানীকে আক্রমণ করে তার রাজ্য কেড়ে নিলেন। জলাল দলবল সমেত হাজীপুরে পালিয়ে গিয়ে তার পিতৃবন্ধু নসরৎ শাহের কাছে আশ্রয় চাইল। নসরৎ কিন্তু জলালকে হাজীপুরে আটক করে রাখলেন। এদিকে বিহারের আফগান নায়কেরা মাহ্‌মুদ লোদীর সঙ্গে যোগ দিলেন। এঁদের মধ্যে শের খানও ছিলেন।

অতঃপর শের খান এবং মাহ্‌মুদ লোদী বাবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। মাহ্‌মুদ এবং শের গঙ্গার দুই তীর ধরে যথাক্রমে চুনার ও কাশীর দিকে রওনা হলেন। বিবন এবং বায়াজিদ নামে অপর দুজন আফগান নায়ক ঘর্ঘরা নদী ধরে উত্তরে গোরক্ষপুরের দিকে রওনা হলেন। বাবরের আত্মকাহিনীতে এই বিবরণ পাওয়া যায়। শের খান দক্ষতার পরিচয় দিয়ে কাশী অধিকার করলেন। কিন্তু বিবন ও বায়াজিদের সারণ পর্যন্ত পৌছোতেই অনেক দেরী হয়ে গেল। এদিকে বাবর-বিরোধী-গোষ্ঠীর নেতা মাহ্‌মুদের অপদার্থতায় সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। বাবর ঐ সময় ঢোলপুরে ছিলেন। তিনি আফগানদের অগ্রগতির খবর পেয়ে আগ্রায় ফিরে এলেন এবং বিহারের দিকে সসৈন্যে রওনা হলেন। বাবরের অগ্রগতির খবর শুনে মাহ্‌মুদ কোন যুদ্ধ

না করেই মাহোবাতে পালিয়ে গেলেন। বাবরের অন্যান্য প্রতিপক্ষের মধ্যে শের খান বেগতিক দেখে এক মাসের মধ্যেই আত্মসমর্পণ করলেন। বিবন ও বায়াজিদ পালিয়ে এলেন। হাজীপুরে নসরৎ শাহের ভগ্নীপতি মখদুম-ই-আলম তাঁদের আটকে রাখলেন, মোগলের কাছে আত্মসমর্পণ করতে দিলেন না। বাবর ইতিমধ্যে তাঁর সৈন্যবাহিনী সমেত গঙ্গা ও ঘর্ঘরা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত বক্সারে এসে পৌঁছেছিলেন। জলাল লোহানী তাঁর দলবল সমেত নসরতের কবল থেকে জোর করে মুক্তিলাভ করে তাঁর মা দুদু বিবিকে সঙ্গে নিয়ে বক্সারে বাবরের কাছে আত্মসমর্পণ করার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

উপরে বর্ণিত বাবর-বিরোধী অভিযানগুলিতে নসরৎ শাহ প্রত্যক্ষভাবে কোন অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে বাবর তাঁর আত্মকাহিনীতে লেখেন নি। কিন্তু 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' লেখা আছে, নসরৎ মোগল বাহিনীকে পরাজিত করবার জন্য ভরাইচ অঞ্চলের দিকে কুৎব্ খাঁর অধীনে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিলেন। নসরৎ যদি কোন সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে থাকেন, তা মোগল বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে নি নিশ্চয়ই। ফলে তাঁর নিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে বাবর কোন প্রকাশ্য প্রমাণ পাননি। অবশ্য গঙ্গা ও ঘর্ঘরার সঙ্গমস্থলের কাছে, ঘর্ঘরার পরপারে নসরতের খরিদস্থ বাহিনী ১০০।১৫০টি নৌকা নিয়ে জমায়েৎ হয়েছিল। তা সত্ত্বেও বাবর তিনটি সর্তে নসরৎ শাহের সঙ্গে সন্ধি করতে চাইলেন এবং নসরৎ শাহের দূত ইসমাইল মিতার কাছে সন্ধির প্রস্তাব দিলেন (১৯শে এপ্রিল, ১৫২৯ খ্রীঃ)। নসরৎকে তাড়াতাড়ি এই সন্ধি অনুমোদন করতে অনুরোধ জানিয়ে বাবর তাঁর কাছে একজন দূত পাঠালেন। নসরৎ কিন্তু তাড়াতাড়ি এর কোন উত্তর দিলেন না। এদিকে বাবর দু'জন চরের মুখে খবর পেলেন যে গণ্ডক নদীর তীরে ২৪টি জায়গায় মখদুম-ই আলমের নেতৃত্বে বাংলার সৈন্যবাহিনী সমবেত হয়ে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা সুদৃঢ় করে তুলছে। শুধু তাই নয়, তারা আত্মসমর্পণেচ্ছু আফগানদের সপরিবারে নদী পার হয়ে বাবরের কাছে আসতে দিচ্ছে না এবং তাদের নিজেদের দলভুক্ত করছে। এপ্রিল মাসের শেষে বাংলার দূত ইসমাইল মিতা ও বাবরের দূত মুল্লা মজহব বাংলার দিকে রওনা হলেন। তার ক'দিন আগে বাবর ইসমাইল মিতাকে নিজের কাছে ডাকিয়ে বলে দিলেন যে (১) নসরতের অধিকারের ক্ষতি না করে তিনি তাঁর শত্রুদের পিছনে যথেচ্ছভাবে ধাওয়া করবেন, (২) তিনটি সর্তের অন্যতম অনুসারে নসরতের

সৈন্যেরা বাবরের পথ ছেড়ে দিয়ে খরিদে ফিরে যাবে, বাবরের কিছু তুর্কী সৈন্য তাদের সঙ্গে গিয়ে খরিদে রেখে আসবে, (৩) নসরতের লোকদের কটূক্তি করা বন্ধ করতে হবে। অন্যথা তাঁদের যে অমঙ্গল ঘটবে, তার জন্য তাঁরাই দায়ী হবেন। কিন্তু বাংলার দূত চলে যাওয়ার পরে কয়েকদিন অপেক্ষা করেও বাবর তাঁর সন্ধির প্রস্তাবের কোন উত্তর পেলেন না, নসরৎ শাহও ঘর্ঘরা নদীর ওপার থেকে তাঁর সৈন্য সরালেন না। তখন বাবর জোর করে ঘর্ঘরা নদী পার হবেন স্থির করলেন।

বাবর বাংলার সৈন্যদের শক্তি এবং কামান চালনায় দক্ষতার কথা জানতেন, তাই তিনি নিজের বাহিনীকে অসাধারণ শক্তিশালী করে গঠন করেছিলেন। এরপর যখন জৌনপুর থেকে আরও ২০,০০০ সৈন্য এসে তাঁর বাহিনীকে পুষ্টতর করে তুলল, তখন বাবর আক্রমণ সুরু করতে বিলম্ব করলেন না। উস্তাদ আলী কুলী খান ঘর্ঘরা নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত বাংলার বাহিনীর দিকে মুখ করে গঙ্গা ও ঘর্ঘরা নদীর মাঝে উচু জায়গায় কামান বসালেন। ঘর্ঘরা ও গঙ্গা নদীর সঙ্গমস্থল থেকে কিছু দূরে মুস্তাফা প্রস্তুত রইলেন ওধারের এক দ্বীপের নিকটে অবস্থিত বাংলার হস্তী ও নৌবাহিনীর উপর গোলা বর্ষণের জন্য। একদল মিস্ত্রী ও কারিগরকেও এইসব জায়গায় পাঠান হল। বাবরের বাহিনী ছ'টি দলে বিভক্ত ছিল, তার মধ্যে চারটি ছিল তাঁর পুত্র আস্‌কারির পরিচালনাধীন। এরা ইতিমধ্যেই গঙ্গার উত্তর দিকে পৌঁছেছিল। কথা ছিল এরা 'হলদী' নামক স্থানে হেঁটে বা নৌকায় চড়ে ঘর্ঘরা নদী পার হবে, যাতে শত্রুদের দৃষ্টি কামান-বাহিনীর উপর না পড়ে এদের উপর পড়ে এবং এইভাবে কামান-বাহিনী নির্বিঘ্নে নদী পার হয়ে যাবে। পঞ্চম বাহিনীটি ছিল স্বয়ং বাবরের অধীন। কথা ছিল যে, যখন শত্রুদের উপর কামান দাগা হবে, তখন এই বাহিনী নদী পার হবে। মুহম্মদ-ই-জমান মীর্জা প্রভৃতির পরিচালনাধীন ষষ্ঠ বাহিনী গঙ্গার ডান ধারে মুস্তাফার গোলন্দাজ সৈন্যদের সাহায্য করতে নিযুক্ত ছিল।

২রা মে তারিখে বাবরের পরিচালনাধীন সৈন্যবাহিনী গঙ্গা পার হল। ৪ঠা মে তারিখে বাবর তাঁর ঘাঁটি থেকে রওনা হয়ে দুই নদীর সঙ্গমস্থল থেকে ২ মাইল দূরের একটি জায়গায় পৌঁছোলেন এবং আলী কুলীকে কামান চালাতে বললেন।

আলী কুলী বাংলার দুটি নৌকাকে ঐদিন ডুবিয়ে দিলেন। মুস্তাফাও

তা'ই করলেন। ঐদিন রাত্রেই একজন বাঙালী বাবরের বজরায় উঠে তাঁকে বধ করার চেষ্টা করে, কিন্তু নৈশ প্রহরীর সতর্কতায় বাবর অব্যাহতি পান।

৫ই মে তারিখে বাঙালীরা প্রতি-আক্রমণ করে। তাদের নৌবল উৎকৃষ্টতর হওয়ার দরুণ তারা সহজেই নদীর উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করল এবং ঘর্ঘরার অপর পারে আস্‌কারির নতুন ঘাটির কাছে তাদের একদল পদাতিক সৈন্য অবতরণ করতে সমর্থ হল। গঙ্গার অপর পারে নীচের মুহম্মদ-ই-জমান মীর্জার তাঁবুর কাছেও তাদের একদল পদাতিক সৈন্য অবতরণ করল।

ঐদিন মধ্যাহ্নে বাবরের অনুচর উস্তার সঙ্গে বাঙালীদের কামান-যুদ্ধ হ'ল। বাবর বাঙালীদের কামান চালানোর পদ্ধতির প্রশংসা করে লিখেছেন, "বাঙালীরা কামান চালানোর নৈপুণ্যের জন্য বিখ্যাত। আমরা এখন তার পরিচয় পেলাম। তারা একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করে কামান চালায় না, যথেচ্ছভাবে চালায়।" *

যা হোক্, বাঙালীদের এই সাফল্য বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় নি। ঘর্ঘরার ওপারে যারা অবতরণ করেছিল, মোগল অশ্বারোহী সৈন্যরা তাদের হটিয়ে দেয় এবং গঙ্গার ওপারে যারা অবতরণ করেছিল, মুহম্মদ-ই-জমান মীর্জা তাদের পরাজিত ও বিতাড়িত করেন।

ঐদিনই আস্‌কারির অধীন সৈন্যবাহিনীর এক বৃহদংশ ঘর্ঘরা নদী পার হয়। আস্‌কারি বাবরকে জানান যে তিনি বাংলার সৈন্যবাহিনীকে পরদিন পরিপূর্ণভাবে আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেছেন।

এই খবর শুনে বাবর ৫ই মের বিকালে আদেশ দেন যে তাঁর দলের কয়েকজন যোদ্ধার পরিচালনায় কয়েকটি রণতরী ঘর্ঘরা নদীতে অগ্রসর হয়ে বাংলার সৈন্যদের ঘাঁটির ঠিক সামনে এক জায়গায় সমবেত হবে এবং ঐসন তিমুর সুলতান ও তুখতেহ্‌ বুঘা সুলতান সেখানে গিয়ে তাদের উপর নজর রাখবেন। তাঁর কথা অনুযায়ী কাজ হ'ল। কিন্তু ৫ই মে মধ্যরাত্রের মত সময়ে বাংলার নৌবাহিনী ঘর্ঘরা নদীর একটি বাঁকে এই সমস্ত নৌকার অগ্রগতি সম্পূর্ণভাবে রোধ করল। বাবরের ভাষায় "নদীর আরও উপরের দিকে যে সমস্ত জাহাজ সমবেত ছিল, তাদের কাছ থেকে মধ্যরাত্রে খবর এল

* অর্থাৎ কামান-চালানোতে বাঙালীদের হাত এত পাকা যে তাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করার দরকার হয় না, যথেচ্ছভাবে কামান চালিয়ে তারা শত্রুদের ঘায়েল করতে পারে।

যে যুদ্ধের জন্য আদেশ-প্রাপ্ত নৌবহর নির্দেশ অনুযায়ী এগিয়ে গিয়েছে। যে সমস্ত জাহাজ সমবেত হয়েছে, তারা আদেশ অনুসারে চলছে, বাঙালীরা নদীর একটি সঙ্কীর্ণ বাঁক দখল করে তাদের আটকে রেখেছে। একজন নাবিকের পা গুলি লেগে ভেঙে গিয়েছে। তারা এগিয়ে যেতে পারছে না।"

কিন্তু বাবর এতে দমে গেলেন না। তিনি মুহম্মদ-ই-সুলতান মীর্জাকে আদেশ পাঠালেন অবিলম্বে নদী পার হয়ে আস্‌কারির সঙ্গে যোগ দিতে। সেই সঙ্গে ঐসন তিমুর সুলতান এবং তুখতেহ্‌ বুঘা খানকে অবিলম্বে নদী পার হতে তিনি আদেশ দিলেন।

বাবরের আদেশ অনুযায়ী তাঁর রণতরীগুলি যখন নদী পার হতে লাগল, তখন বাংলার অশ্বারোহী সৈন্যেরা পূর্ণোদ্যমে তাদের আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হল। কিন্তু তাতেও মোগল নৌ-বাহিনী নিরস্ত না হয়ে নদী পার হতে লাগল। ঐসন তিমুর সুলতান ত্রিশ চল্লিশ জন অনুচর নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে নদী পার হলেন। প্রথম দলটি নদী পার হবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার পদাতিক সৈন্যেরা তাদের আক্রমণ করল। সাত আটজন মোগল সৈন্য ঘোড়ায় চড়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল। ইতিমধ্যে অন্যান্য মোগলরাও তৈরী হয়ে গেল এবং আর একখানা নৌকা নদী পার হল। ঐসন তিমুর সুলতানের অদম্য বিক্রম সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে উৎসাহিত করে তুলল। ইতিমধ্যে বাবরের অন্য অনেক সৈন্য ও রণতরী বিনা বাধায় নদী পার হয়ে এপারে চলে এল।

বাংলার নৌবাহিনী দুই নদীর সঙ্গমস্থলের কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু বাবরের বাহিনী যখন নদী পার হয়ে বাংলার স্থলবাহিনীকে পরাজিত করল, তখন তারা নিরাশ হয়ে পড়ল। এদিকে দরবেশ মুহম্মদ খান সরবন, দোস্ত ঈশাক আগা, নূর বেগ এবং অন্যেরা গঙ্গার অন্যদিক্ দিয়ে এসে বাংলার কামানবাহিনীকে এড়িয়ে চলে গেল। গিয়ে বাংলার স্থলবাহিনীকে আক্রমণ করল। এইভাবে বাংলার স্থলবাহিনী দু'দিক দিয়ে বাবরের বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হল। বাংলার নৌ-বাহিনী তাদের সাহায্য করতে না পেরে পালাতে লাগল। ঐসন তিমুর সুলতান এবং তাঁর বাহিনী একদিকে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অপরদিকে আস্‌কারির একদল সৈন্য কূকী নামে একজন অধ্যক্ষের অধীনে যুদ্ধ করে বাংলার বাহিনীকে রণক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত করল। এরা বসন্ত রাও নামে জনৈক বিখ্যাত হিন্দু (বাবরের ভাষায় "একজন খ্যাতিমান্ পৌত্তলিক")

বীরকে নিহত করে তাঁর মাথা কেটে ফেলল। বসন্ত রাওয়ের দশ পনেরো জন অনুচর কুকীর সৈন্যদের আক্রমণ করতে গিয়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে কাটা পড়ল।

তখন বাবর নিজেও নৌকায় নদী পার হয়ে রণক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করলেন। তাঁর যে সৈন্যেরা তখনও নদী পার হয়নি, তাদের তিনি পায়ে হেঁটে নদী পার হতে আদেশ দিলেন। ওই যে দুপুরের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল।

মোগল সৈন্যেরা যুদ্ধে জয়লাভ করে ঘর্ঘরা নদী পার হয়ে সারণে উপনীত হল। সারণের নিরহুন পরগণার কুন্‌ডীহ্‌ গ্রামে যখন বাবর পৌছোলেন, তখন জলাল লোহানী এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। বাবর জলালকে বিহারে তাঁর সামন্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠা করলেন।

কিন্তু নসরতের দূরদর্শিতার জন্য বাবরের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ বেশী দূর গড়াল না। ইতিপূর্বে বাবর প্রথমে গোলাম আলী নামক একজন দূত এবং পরে মুল্লা মজহব নামে আর একজন দূত মারফৎ নসরৎ শাহের সঙ্গে সন্ধি করার প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। উপরে বর্ণিত যুদ্ধের কয়েকদিন পর গোলাম আলী বাবরের কাছে প্রত্যাবর্তন করে জানালেন যে অপর পক্ষ বাবরের তিনটি সর্ত মেনে নিয়ে সন্ধি করতে রাজী হয়েছেন। গোলাম আলীর সঙ্গে আবুল ফতেহ্‌ নামে মুঙ্গেরের শাহজাদার একজন লোক এসেছিলেন। লস্কর-উজীর * হোসেন খান ও মুঙ্গেরের শাহজাদা এদের মারফৎ বাবরকে একটি চিঠি পাঠান। তাতে এরা নসরৎ শাহের পক্ষ থেকে জানান যে তাঁরা বাবরের সর্তে সম্মত এবং সন্ধি পালনের দায়িত্ব তাঁরা গ্রহণ করলেন। বাবরের প্রতিপক্ষ আফগান নায়কদের কতক পর্যুদস্ত, কতক নিহত হয়েছিল, কয়েকজন বাবরের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছিল এবং কয়েকজন বাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। তার উপরে এই সময়ে বর্ষাও আসন্ন হয়ে উঠেছিল। তাই বাবরও সন্ধি করতে রাজী হয়ে অপর পক্ষকে চিঠি দিলেন। এইভাবে বাবর ও নসরৎ শাহের সংঘর্ষের শান্তিপূর্ণ সমাপ্তি ঘটল। এই সংঘর্ষের পরে বর্তমান বিহার ও উত্তর প্রদেশের

---

* 'লস্কর উজীর' উপাধি যে রাজার সেনাপতিরা পেতেন, তার প্রমাণ দৌলত কাজীর 'সতী ময়নামতী' কাব্য থেকে মেলে। এই কাব্যে দৌলৎ কাজী তাঁর পৃষ্ঠপোষক আশরফ খান সম্বন্ধে লিখেছেন,

সেনাপতি হৈলা নানা সৈন্য অধিপতি।
আশরফ খান নামে শোভা হৈল অতি॥
শ্রী আশরফ খান লস্কর উজীর।

অন্তর্গত কিছু অঞ্চল নসরতের হস্তচ্যুত এবং বাবরের রাজ্যভুক্ত হয়েছিল বলে দেখা যাচ্ছে। বাবর তাঁর আফগান সমর্থকদের সারণ ও গোরক্ষপুরের শাসনভার দিয়েছিলেন এবং খরিদ ও আজমগড়ে পদার্পণ করেছিলেন বলে তাঁর আত্মজীবনী থেকে জানা যায়। অথচ এই সমস্ত জায়গা যে বাংলার সুলতানের রাজ্যভুক্ত ছিল, তা তাঁর শিলালিপি থেকেই জানা যায়। খরিদে নসরৎ শাহের ৯৩৩ হিজরা বা ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে। অথচ বাবর নিজেই লিখেছেন যে তিনি নসরৎ শাহের সঙ্গে বিজেতার মত আচরণ করেননি, পূর্বঘোষিত সম্মানজনক সর্তে সন্ধি করেছিলেন। সম্ভবত বাবর ও নসরৎ শাহের মধ্যে যে সন্ধি হয়েছিল, তারই সর্ত অনুযায়ী এই সমস্ত অঞ্চল বাবরের অধিকারভুক্ত হয়েছিল।

১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাবরের মৃত্যুর পরে মাহ্‌মুদ লোদী—বিবন, বায়াজিদ এবং শের খানের সহায়তায় মোগলদের বিরুদ্ধে আর একবার অভিযান করেন এবং বিহারের সীমা অতিক্রম করে ক্রমশ জৌনপুর অবধি অধিকার করেন ও লক্ষ্ণৌ ঘেরাও করেন। অবশেষে নিজের অযোগ্যতা ও শের খানের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে দাদরার যুদ্ধক্ষেত্রে মোগলের হাতে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন। এই অভিযানে নসরৎ শাহের পরোক্ষ সমর্থন ছিল কিনা, সে সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে' লেখা আছে যে, হুমায়ূনের সিংহাসনে আরোহণের কিছুদিন পরে নসরৎ শাহের কাছে খবর আসে হুমায়ুন বাংলার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগ করছেন। এই খবর পেয়ে নসরৎ গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহের কাছে অনেক উপঢৌকন সমেত মালিক মর্জান নামে একজন খোজাকে দূতস্বরূপে পাঠান। মালিক মর্জান মাণ্ডুতে বাহাদুর শাহের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর কাছে খিলাৎ পান। এই কথা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়। বাহাদুর শাহ হুমায়ূনের প্রবল শত্রু; তাঁর সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হলে হুমায়ূন যখন নসরতের রাজ্য আক্রমণ করবেন, তখন বাহাদুর অপর দিক থেকে হুমায়ূনের রাজ্য আক্রমণ করবেন। সম্ভবত নসরতের এই বিজ্ঞোচিত কূটনৈতিক কার্যের ফলেই হুমায়ূন বাংলা-আক্রমণ থেকে বিরত হন।

ত্রিপুরার সঙ্গে যে নসরৎ শাহের পিতা হোসেন শাহের দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ চলেছিল, তা আমরা আগেই দেখে এসেছি। কিন্তু নসরৎ শাহের সঙ্গেও যে ত্রিপুরার যুদ্ধ হয়েছিল, সে খবর অনেকেই রাখেন না। প্রাচীন 'রাজমালা'য়

(সা. প. ২২৫৯ নং পুঁথি, ২৩ খ পত্র) ধন্যমাণিক্যের পুত্র ও পরবর্তী রাজা দেবমাণিক্য * সম্বন্ধে লেখা আছে,

চাটীগ্রাম থানা রাখি আসিলেক দেশ।
যত রাজ্য পিতৃস্বত্ব আছিলেক পুনি।
সকল শাসিল সুখে সেই নৃপমণি ॥

দেবমাণিক্যের রাজত্বকাল ১৫২২-১৫২৭ খ্রীঃ (রাজমালা, কালীপ্রসন্ন সেন সম্পাদিত সংস্করণ, ২য় লহর, পৃঃ ১৮৪ দ্রষ্টব্য)। 'রাজমালা'তে যখন দেবমাণিক্য চট্টগ্রাম জয় করেছিলেন বলে দাবী জানানো হয়েছে, তখন চট্টগ্রামের অধিকারী বাংলার সুলতান নসরৎ শাহের সঙ্গে যে তাঁর সংঘর্ষ হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এ সম্বন্ধে আর একটি প্রমাণ আছে। ১০৫৬ হিজরা বা ১৬৪৫-৪৬ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রাম-নিবাসী কবি মোহাম্মদ খান তাঁর 'মক্তুল হোসেন' কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যের উপক্রমে কবি তাঁর বিস্তৃত বংশপরিচয় দিয়েছেন। সংক্ষেপে তাঁর বংশলতিকা এই,

মাহি আসোয়ার
|
হাতিম
|
সিদ্দিক
|
রাস্তি খান
|
মিনা খান
|
গাভুর খান
|
হামজা খান
|
নসরৎ খান
|
জালাল খান

বিরাহিম খান — মুবারিজ খান
|
মোহাম্মদ খান

* কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ('রাজমালা'র মতে নয়) ধন্যমাণিক্য ও দেবমাণিক্যের মাঝখানে "ধন্যমাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র ধ্বজমাণিক্য" অল্প সময়ের জন্য রাজা হয়েছিলেন।

নীচে আমরা 'মক্তুল হোসেন' থেকে রাস্তি খান হতে সুরু করে নসরৎ খান পর্যন্ত কবির পূর্বপুরুষদের বিবরণ উদ্ধৃত করলাম (সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬, পৃঃ ১০১-১০৩ দ্রষ্টব্য)।

সর্ব্বসিদ্ধি কল্পতরু পর উপকার চারু সত্যবাদী সিদ্দিক সমান।
তান পুত্র জ্ঞানে গুরু দানে কর্ণ মানে কুরু রাস্তি খান রূপে পঞ্চবাণ ॥
চাটিগ্রাম দেশপতি স্বর্গে যেন শচীপতি তাহানে প্রণামি বারে বার।
তাহান নন্দন বলি রসে 'দধি বলে শূলী দানে হরিচন্দ্র সমসর ॥
তেজে অগ্নি কোপে যম মানেত কৌরবসম রণে যেন ভৃগুপতি রাম।
কামিনীমোহন বর অভিনব পঞ্চশর মিনা খান রূপে অনুপাম ॥
তান পুত্র গুণবান ভীমসম বলবান কার্তবীর্য সম ধনুধারী।
জ্ঞানে শুক্র জ্ঞানে গুরু দানে বলি কল্পতরু যার কীর্তি গৌড়দেশ ভরি ॥
ভিক্ষুক জনের গতি ঐশ্বর্যে যে যযাতি ধৈর্যে বীর্যে গম্ভীর সাগর।
গাভুর খান গুণনিধি থিরে ক্ষিতি রসে 'দধি তাহানে প্রণামি বহুতর ॥
করিয়া বিষম রণ জিনিয়া ত্রিপুরাগণ লীলাএ পাঠানগণ জিনি।
শত্রু সব করি ক্ষয় বাহু বলে লভি জয় বাপ হোস্তে কৈলা রাজধ্বনি ॥
লইয়া পণ্ডিতগণ শাস্ত্র শুনে অনুক্ষণ রঙ্গ ঢঙ্গ কৌতুক অপার।
হামজা খান মছলন্দ হাস্যবাণী মকরন্দ তাহাকে প্রণামি বারে বার ॥
তাহান নন্দনবর রসে যেন রত্নাকর ধর্মে কর্মে যেন বৃহস্পতি।
সুমেরু সদৃশ থির পার্থসম মহাবীর ঐশ্বর্য্যাদি নৃপ যযাতি ॥
বংশের প্রসিদ্ধি হেতু নিজ কুল জয়কেতু জন্ম হৈল প্রচণ্ড প্রতাপ।
গান্ধারী-নন্দন মানে কর্ণ-বলি জিনি দানে ভিক্ষুক জনের যেন বাপ ॥
বিজয়ে বিজয় সম বিপক্ষ কুলের যম চন্দ্রমুখ সুধা মধু হাস।
রূপে কাম সমসর ধীর সুললিত বর পুরাস্ত সকল নারী আশ ॥
প্রজার পালক রাম বাপ হোস্তে অনুপাম বাহুবলে শাসিলেন্ত ক্ষিতি।
বান্ধব জনের প্রাণ নসরৎ খান জান তান পদে করম মিনতি ॥

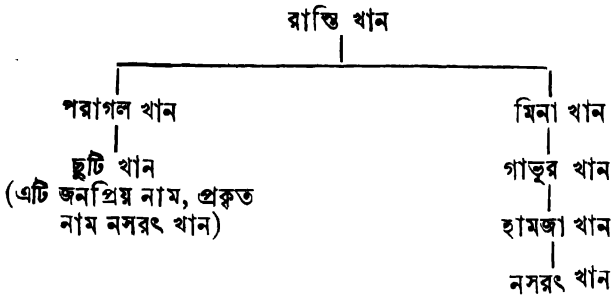
মোহাম্মদ খানের এই বংশপরিচয়ে যে রাস্তি খানের নাম পাওয়া যাচ্ছে, তিনি মোহাম্মদ খানের উর্ধ্বতন অষ্টম পুরুষ। মোহাম্মদ খান যখন সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন, তখন সময়ের হিসাবে রাস্তি খান পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বর্তমান ছিলেন বলা যেতে পারে। মোহাম্মদ খান রাস্তি

খানকে "চাটিগ্রাম দেশপতি" বলেছেন। সুতরাং এবিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে এই রাস্তি খান রুকনুদ্দীন বারবক শাহের সমসাময়িক "মজলিস আলা" রাস্তি খানের সঙ্গে অভিন্ন, যিনি ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার জোবরা গ্রামে একটি মসজিদ তৈরী করিয়েছিলেন।

কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারত থেকে জানা যায় যে এই রাস্তি খানেরই পুত্র পরাগল খান ও পৌত্র ছুটি খান।* এদিকে মোহাম্মদ খানের বংশপরিচয়ে রাস্তি খানের পুত্র মিনা খান, পৌত্র গাভুর খান, প্রপৌত্র হাম্জা খান, বৃদ্ধ-প্রপৌত্র নসরৎ খান প্রভৃতির নাম পাওয়া যাচ্ছে। পরাগল খান ও ছুটি খানকে কেউ কেউ যথাক্রমে মিনা খান ও গাভুর খানের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেন, কিন্তু এ মতের স্বপক্ষে কোন যুক্তি বা প্রমাণ নেই।† প্রকৃতপক্ষে পরাগল খান ও মিনা খান রাস্তি খানের দুজন পুত্রের নাম। কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও মোহাম্মদ খানের সাক্ষ্য মিলিয়ে রাস্তি খানের নিম্নতম পঞ্চম পুরুষ অবধি এই বংশলতা দাঁড়ায়,

* কবীন্দ্র পরমেশ্বর রাস্তি খানের পুত্র পরাগল খানকে "রুদ্রবংশরত্নাকর" নামে অভিহিত করেছেন। এর থেকে কেউ কেউ মনে করেন রাস্তি খান অথবা তাঁর পিতা হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছিলেন এবং আগে তাঁদের "রুদ্র" পদবী ছিল। কিন্তু মোহাম্মদ খান লিখেছেন যে রাস্তি খানের প্রপিতামহ মুসলমান ছিলেন, তাঁর নাম ছিল "মাহি আসোয়ার" এবং তিনি ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এসেছিলেন। এর থেকে কেউ কেউ অনুমান করেন যে, কবীন্দ্র পরমেশ্বর উল্লিখিত রাস্তি খান ও মোহাম্মদ খানের পূর্বপুরুষ রাস্তি খান পৃথক লোক। কিন্তু এই অনুমান যুক্তিযুক্ত নয়। একই সময়ে একই জায়গায় দুই রাস্তি খানের অস্তিত্ব কল্পনা করা সঙ্গত নয়। এ সমস্যার সমাধান অন্যভাবেও করা যায় এবং তা-ই এর প্রকৃত সমাধান বলে মনে হয়। মোহম্মদ খান লিখেছেন যে মাহি আসোয়ার বাংলাদেশে এসে এক ব্রাহ্মণের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। সম্ভবত এই ব্রাহ্মণকন্যাই রুদ্রবংশীয়া ছিলেন, তাই তাঁর বৃদ্ধপ্রপৌত্র পরাগল "রুদ্রবংশরত্নাকর" বিশেষণে অভিহিত হয়েছেন।

† যাঁরা মিনা খান-গাভুর খানকে পরাগল খান-ছুটি খানের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন, তাঁদের একমাত্র তথাকথিত যুক্তি এই যে, ছুটি খান ও গাভুর খান উভয়েই রাস্তি খানের পৌত্র এবং উভয়ের কীর্তি একই, কারণ শ্রীকর নন্দী বলেছেন যে ছুটি খান ত্রিপুরার রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন আর এঁদের মতে মোহাম্মদ খান গাভুর খান সম্বন্ধে "জিনিয়া ত্রিপুরাগণ" ইত্যাদি উক্তি করেছেন। কিন্তু পর পৃষ্ঠায় আমরা আলোচনা করে দেখিয়েছি যে মোহাম্মদ খান এই উক্তি গাভুর খান সম্বন্ধে করেন নি, তাঁর পুত্র হাম্জা খান সম্বন্ধে করেছেন। অতএব এর থেকে ছুটি খান ও গাভুর খানের অভিন্নতা প্রমাণিত হয় না। পরাগল খান ও ছুটি খান হোসেন শাহের লস্কর ও সেনাপতি ছিলেন। মিনা খান ও গাভুর খান তা ছিলেন বলে



মোহাম্মদ খান তাঁর বংশপরিচয়ে তাঁর একজন পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে বলেছেন, "করিয়া বিষম রণ জিনিয়া ত্রিপুরাগণ ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, এই উক্তি কার সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়েছে? অনেকে বলেন যে এই উক্তি গাভুর খান সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়েছে। কিন্তু এই মত যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ মোহাম্মদ খান তাঁর বংশপরিচয়ে প্রত্যেক পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে প্রণাম বা চরণবন্দনা জানাবার পরই তাঁর প্রসঙ্গ শেষ করে তাঁর পুত্রের প্রসঙ্গ সুরু করেছেন। বংশপরিচয়ের যে অংশ আমরা উদ্ধৃত করেছি এবং যে অংশ উদ্ধৃত করি নি, দুইয়ের মধ্যেই এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে (সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৬, পৃঃ ১০১-১০৩ দ্রঃ)। সুতরাং মোহাম্মদ খান গাভুর খানকে "তাহানে প্রণামি বহুতর" বলে পরে "করিয়া বিষম রণ জিনিয়া ত্রিপুরাগণ" বলে যে বর্ণনা সুরু করেছেন, তা গাভুর খান সম্বন্ধে নয়, তাঁর পুত্র হাম্জা খান সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হয়েছে সন্দেহ নেই। আর "করিয়া বিষম রণ" ইত্যাদি উক্তি গাভুর খান সম্বন্ধে প্রযুক্ত ধরলে বলতে হয়, হামজা খান সম্বন্ধে মোহাম্মদ খান মাত্র "লইয়া পণ্ডিতগণ···তাহাকে প্রণামি বারে বার" এইটুকুমাত্র বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন এবং হামজা খান কার পুত্র, তা বলেন নি; এই দুই বিষয়ই বংশপরিচয়ের অন্যান্য অংশের সঙ্গে খাপ খায় না। সুতরাং মোহাম্মদ খান হাম্জা খানকেই ত্রিপুরা-বিজেতা বলেছেন, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। পরাগল খান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সমসাময়িক, ছুটি খানও হোসেন শাহের বয়ঃকনিষ্ঠ সমসাময়িক; সুতরাং ছুটি

মোহাম্মদ খান লেখেন নি। অথচ পূর্বপুরুষদের সমস্ত গৌরবের কথা তিনি বিস্তারিত ভাবে বলেছেন। এর থেকেও বোঝা যায়, পরাগল খান-ছুটি খান মিনা খান-গাভুর খানের সঙ্গে অভিন্ন নন। মোহাম্মদ খান মিনা খানের কেবলমাত্র রূপগুণের প্রশংসা করেছেন এবং গাভুর খান সম্বন্ধে সাধারণভাবে বলেছেন, "যার কীর্তি গৌড়-দেশ ভরি।" সম্ভবত গাভুর খানের পুত্র হাম্জা খান থেকেই রাস্তি খানের বংশের এই শাখাটি প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করে।

খানের এক পুরুষ পরবর্তী হাম্‌জা খানকে নসরৎ শাহের সমসাময়িক ধরা যায়। এই হাম্‌জা খান ত্রিপুরা জয় করেছিলেন বলে দাবী জানানো হয়েছে। অতএব নসরৎ শাহের যে ত্রিপুরার সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছিল, তা এর থেকেও বোঝা যায়।

অহোম্ বুরঞ্জী থেকে জানা যায় নসরৎ শাহ তাঁর রাজত্বের শেষ বছরে আসাম আক্রমণ করেছিলেন। এই আক্রমণ ও তার পরিণতি সম্বন্ধে অহোম্ বুরঞ্জীতে যে বিবরণ পাওয়া যায় (Mughal North-East Frontier Policy, Sudhindranath Bhattacharya, pp. 89-99 দ্রষ্টব্য), তার সংক্ষিপ্তসার নীচে দেওয়া হল। এই বিবরণ আক্ষরিকভাবে সত্য না-ও হতে পারে, কিন্তু মোটামুটিভাবে যে সত্য তাতে কোন সন্দেহ নেই।

১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তুরবক নামে বাংলার একজন মুসলমান সেনাপতি ৩০টি হাতী, ১০০০টি ঘোড়া এবং বহু কামান নিয়ে অহোম্ রাজ্য আক্রমণ করেন। তেমেনি দুর্গ বিনা বাধায় জয় করার পরে মুসলমানরা অহোম্ রাজ্যের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি সিঙ্গরির সামনে এসে তাঁবু ফেলে অপেক্ষা করতে থাকে। সিঙ্গরির ঘাঁটি রক্ষা করছিলেন বর পাত্র গোহাইন। অহোম-রাজ তাঁর পুত্র স্থক্লেনকে একদল শক্তিশালী সৈন্য দিয়ে সিঙ্গরি রক্ষা করবার জন্য পাঠালেন। অল্পকালের মধ্যেই দুই পক্ষের খণ্ডযুদ্ধ সুরু হয়ে গেল এবং কিছু দিন ধরে তা চলতে থাকল। স্থক্লেন ব্রহ্মপুত্র নদ পার হয়ে মুসলমানদের আক্রমণ করলেন। তুমুল যুদ্ধের ফলে মুসলমানরা প্রথমে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল, কিন্তু অবশেষে তারা অসমীয়াদের পরাজিত করতে সমর্থ হল। আটজন অসমীয়া সেনাধ্যক্ষ নিহত হলেন, বহু লোক জলে ডুবে মরল, রাজপুত্র স্থক্লেন আহত হলেন এবং অল্পের জন্য মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেলেন। অবশিষ্ট অসমীয়া সৈন্যবাহিনী সালা নামক জায়গায় পালিয়ে গেল। অহোম্-রাজ সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠন করে বর পাত্র গোহাইনের অধীনে রাখলেন।

প্রায় এই সময়েই নসরৎ শাহ পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পরেও এই যুদ্ধ চলেছিল। যথাস্থানে এই যুদ্ধের পরবর্তী অংশ বর্ণিত হবে।

তেরো বছর রাজত্বের পরে ৯৩৮ হিজরা বা ১৫৩১-৩২ খ্রীষ্টাব্দে নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের মৃত্যু হয়। 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে'র মতে নসরৎ শাহ শেষ জীবনে ঘোরতর অত্যাচারী হয়ে ওঠেন এবং জনসাধারণের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করতে সুরু করেন। এই সমস্ত কথা কতদূর সত্য তা বলা যায় না।

'রিয়াজ'-এ লেখা আছে যে একদিন নসরৎ শাহ্ গৌড়ের একনাকা নামক স্থানে তাঁর পিতার সমাধিক্ষেত্রে গিয়েছিলেন। এর আগে তিনি একজন খোজাকে কোন দোষের জন্য শাস্তি দিয়েছিলেন। এই খোজা অন্য খোজাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এবং নসরৎ শাহ্ যখন একনাকা থেকে প্রাসাদে ফিরছিলেন, তখন নসরৎকে হত্যা করে। কিন্তু বুকাননের বিবরণীতে লেখা আছে, নসরৎ শাহ্ "was killed while asleep, by his servant Khwajeh Soray." "Khwajeh Soray" বলতে বুকানন 'খওয়াজা সেরা' অর্থাৎ প্রাসাদের খোজাকে বুঝিয়েছেন। কারণ জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহের হত্যাকারীকেও তিনি 'Khwajeh Soray" বলেছেন। নসরৎ শাহ্ যে আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছিলেন, তাতে সংশয়ের অবকাশ অল্প। তবে কীভাবে তিনি প্রাণ হারিয়েছিলেন, তা সঠিকভাবে বলা শক্ত।

নসরৎ শাহ্ যে একজন অত্যন্ত যোগ্য শাসক ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাবর এবং আফগান নায়কবৃন্দ উভয় পক্ষের সঙ্গেই তিনি যেভাবে মৈত্রীর সম্পর্ক রক্ষা করেছিলেন, তা থেকে তাঁর কুশাগ্র কূটনীতিজ্ঞানের পরিচয় মেলে। সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "Alau-d-din Husain Shah's son and successor, Nasrat Shah (1519-32 A. D.) appears to have been an indolent and tactless sovereign." কিন্তু এরকম অনুমানের কোন ভিত্তিই নেই, ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণ থেকে এর বিপরীত সিদ্ধান্তে আসতে হয়।

নসরৎ শাহ্ শুধুমাত্র কূটনীতির ক্ষেত্রে নয়, যুদ্ধের ক্ষেত্রেও সাফল্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। অবশ্য বাবর তাঁর আত্মকাহিনীতে লিখেছেন যে ঘর্ঘরা ও গঙ্গা নদীর সঙ্গমস্থলে নসরৎ শাহের সৈন্যবাহিনী তাঁর বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়েছিল। কিন্তু নসরৎ শাহের প্রতিপক্ষের উক্তির উপর নির্ভর করে নসরতের শক্তি ও যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন ধারণা করে বসলে ভুল করা হবে। ঘর্ঘরার যুদ্ধ সম্বন্ধে আমরা কেবলমাত্র বাবরের বিবরণী ছাড়া আর কোন সূত্র যতক্ষণ না পাচ্ছি, ততক্ষণ পর্যন্ত এসম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া চলে না। নসরতের নিজের পক্ষের বিবরণী অথবা নিরপেক্ষ বিবরণী পাওয়া গেলে প্রকৃত সত্য হয়তো খানিকটা ভিন্ন মূর্তি নিয়ে দেখা দেবে। হয়তো দেখা যাবে ঘর্ঘরার যুদ্ধে নসরতের সৈন্যবাহিনী বাবরের সৈন্যবাহিনীর তুলনায় কম কৃতিত্বের পরিচয় দেয় নি। এরকম ধারণার কারণ,

ঘর্ঘরার যুদ্ধের পর বাবর নসরৎ শাহের সঙ্গে তাঁর পূর্বের সর্ত অনুযায়ী সন্ধি করেছেন। অথচ এই যুদ্ধে জয়লাভ করার পরে বাবরের পক্ষে বাংলাদেশ জয় করার জন্য এগিয়ে যাওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কারণ নতুন নতুন রাজ্য জয় ছিল বাবরের চিরদিনের নেশা এবং ভারতবর্ষে আসার পর থেকে বাবরের প্রধান লক্ষ্যই হয়ে দাঁড়িয়েছিল রাজ্যবিস্তার। এই সময়ে তাঁর প্রতিপক্ষ আফগানরাও পর্যুদস্ত হয়েছিল। সুতরাং বাবরের বাংলা জয়ের জন্য অগ্রসর হওয়ার পথে এদিক দিয়ে কোন বাধা ছিল না। যদি ধরে নেওয়া যায়, বাবরের কথা সম্পূর্ণ সত্য, তাহলেও নসরৎ শাহের গৌরব খর্ব হয় না। কারণ বাবর নিজে লিখেছেন যে বাংলার সৈন্যদের শক্তি এবং কামান চালানোর দক্ষতার কথা শুনে তিনি নিজের সৈন্যবাহিনীকে অসাধারণ রকম শক্তিশালী করে গঠন করেছিলেন। বাংলার সৈন্যবল যে কতখানি ছিল, সে সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। সম্ভবত সীমান্তের ঘাঁটি রক্ষার জন্য সাধারণত যত সৈন্য থাকে, তা-ই ছিল। অতএব অধিকতর সৈন্য নিয়ে গঠিত অপরিমিত শক্তি-সম্পন্ন বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে তারা যদি পরাজিত হয়ে থাকে, তাহলেও তাদের দোষ দেওয়া যায় না। ঘর্ঘরার যুদ্ধের পরেই বাবর যে নসরৎ শাহের সঙ্গে সন্ধি করলেন, এর থেকেও মনে হয় যে বাবর বাংলার এই সৈন্যবাহিনীর যোগ্যতার যে পরিচয় পেয়েছিলেন, তার থেকে বুঝতে পেরেছিলেন তাদের নিজেদের দেশে বৃহত্তর সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করলে তাঁর সুবিধা না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। বাবর সন্ধি করার সপক্ষে বর্ষা আসন্ন হওয়ার অছিলা দেখানোতে এই সন্দেহ দৃঢ় হয়। অতএব বাবরের সঙ্গে সংঘর্ষ ও তার পরিণতিকে কোন মতেই নসরৎ শাহের পক্ষে অগৌরবের বিষয় বলা যায় না।

আসাম-অভিযান নসরৎ শাহের আর একটি গৌরবময় কীর্তি। অসমীয়া বুরঞ্জীগুলির সাক্ষ্য থেকেই জানা যায় যে, নসরৎ শাহ যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন বাংলার সৈন্যবাহিনী আসামের সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত ও কোণঠাসা করে রেখেছিল। নসরতের পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয় এই যে, আসাম রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর বিশ্রুতকীর্তি পিতা শোচনীয় ব্যর্থতা বরণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি এই ব্যাপারে সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

হোসেন শাহের মত নসরৎ শাহের রাজত্বকালেও পর্তুগীজরা বাংলাদেশে বাণিজ্যের ঘাঁটি স্থাপন করার চেষ্টা করে, কিন্তু এবারও তাদের চেষ্টা সার্থক

হয় নি। বিভিন্ন সমসাময়িক বা প্রামাণিক পর্তুগীজ গ্রন্থে এ সম্বন্ধে যে বিবরণ পাওয়া যায়, নীচে আমরা তা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করলাম।

যদিও সিলভেরার বাংলাদেশে আগমন ফলপ্রসূ হয়নি, তবু তার পর থেকেই পর্তুগীজদের মধ্যে প্রতি বছর বাংলাদেশে একখানি করে সওদাগরী জাহাজ পাঠাবার প্রথা চালু হয়। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ গভর্নর লোপো-ভাজ-দে-সম্পয়ো রুই-ভাজ-পেরেরা নামে এক ব্যক্তির পরিচালনাধীন এক বাণিজ্য-জাহাজ বাংলায় পাঠান। পেরেরা চট্টগ্রামে পৌছে দেখেন সেখানে খাজা শিহাবুদ্দীন নামে একজন ইরানী বণিকের একটি জাহাজ রয়েছে; এটি পর্তুগীজ রীতিতে তৈরী। এর উদ্দেশ্য, অন্যান্য বাণিজ্য-জাহাজ এর দ্বারা লুঠ করে তার দোষ পর্তুগীজদের ঘাড়ে চাপানো। পেরেরা এই জাহাজটি অধিকার করে নিজের সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন।

এর পর ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে মার্তিম-আফন্সো-দে-মেলো নামে একজন পর্তুগীজ কাপ্তেন তাঁর জাহাজ নিয়ে অন্য জায়গায় যেতে যেতে ঝড়ের দরুণ বাংলার উপকূলের কাছে এক জায়গায় এসে পড়েন। এখানকার কয়েক জন জেলে তাঁকে চট্টগ্রামে পৌছে দেবার নাম করে চকরিয়ায় নিয়ে যায়। এখানকার শাসনকর্তা খোদা বখ্‌শ্‌ খান (পর্তুগীজ বিবরণে Codavascam নামে উল্লিখিত)* এই সময় একজন প্রতিবেশী ভূস্বামীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। পর্তুগীজদের পেয়ে তিনি তাদের বন্দী করে বলেন যে তাঁর হয়ে যুদ্ধ করলে তিনি তাদের মুক্তি দেবেন ও নিরাপদে তাদের গন্তব্যস্থলে চলে যেতে দেবেন। পর্তুগীজরা তাঁর হয়ে যুদ্ধ করে তাঁকে যুদ্ধে জেতাল। কিন্তু খোদা বখ্‌শ্‌ খান পর্তুগীজদের মুক্তি না দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে চট্টগ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত সোরে শহরে বন্দী করে রাখলেন।

এদিকে দুয়ার্তে-মেনদেস-ভাসকনসেলস ও জোআঁ-কোএলহো নামে আফন্সো-দে-মেলোর দলের দুজন লোক তাঁদের জাহাজ নিয়ে চকরিয়ায় এসে উপস্থিত হন এবং তাদের জাহাজের সমস্ত জিনিস খোদা বখ্‌শ্‌ খানকে দিয়ে

---

*জনাব এ. টি. এম রুহুল আমীনের মতে Codavascam হচ্ছেন আসলে "শাহজাদ-খানী-বংশীয়" সুলতান কুতুব-ই-আলম (মাসিক মোহাম্মদী, শ্রাবণ, ১৩৭১, পৃঃ ৭১২-৭১৩ দ্রঃ)। কিন্তু কিংবদন্তীর বাইরে যেমন এই কুতুব-ই-আলমের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নেই, তেমনি Codavascam-এর অধিকারভুক্ত অঞ্চলের যে বিবরণ পর্তুগীজ সূত্রগুলিতে পাই, তা "শাহজাদ-খানী সুলতান"দের অধীন ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। ধ্বনিতত্ত্বের দিক থেকেও বলা যায় যে, "কুতুব-ই-আলম" (বা "কুতুব আলম") Codavascam-এ পরিণত হওয়া সম্ভব নয়।

দে-মেলোকে মুক্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু খোদা বখ্‌শ্‌ তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে আরও চান। কিন্তু তাঁদের কাছে আর কিছুই ছিল না। দে-মেলো তাঁর দলের সঙ্গে পালিয়ে এসে ভাসকনসেলস ও কোএলহোর সঙ্গে যোগ দেবার চেষ্টা করেন, কিন্তু এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। উপরন্তু তাঁর রূপবান্‌ ও তরুণবয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্র গঞ্জলো-ভাস-দে-মেলোকে ব্রাহ্মণেরা ধরে দেবতার কাছে বলি দেয়।

এই সময়ে নুনো-দা-কুন্‌হা ছিলেন গোয়ার পর্তুগীজ গভর্নর। তিনি বাংলায় বাণিজ্য সুরু করার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। পূর্বোক্ত ইরানী বণিক খাজা শিহাবুদ্দীন তাঁর কাছে নিজের লুঠ হওয়া জাহাজটি জিনিসপত্র সমেত ফিরে চান এবং বলেন যে ফিরে পেলে ৩০০০ ক্রুজেডোর (পর্তুগীজ মুদ্রা) বিনিময়ে তিনি আফন্সো-দে-মেলোকে মুক্ত করিয়ে দেবেন। পর্তুগীজ গভর্নর তাঁর জাহাজ জিনিসপত্র সমেত ফিরিয়ে দিলেন। খাজা শিহাবুদ্দীন ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে আফন্সো-দে-মেলোকে মুক্ত করিয়ে তাঁর ভাই খাজা শকুর্‌-উল্লার সঙ্গে গোয়ায় পৌঁছে দিলেন। এরপর তিনি পর্তুগীজদের বিশেষ বন্ধু হয়ে পড়লেন। বাংলার সুলতান নসরৎ শাহের সঙ্গে একটা গোলযোগপূর্ণ বিষয়ের নিষ্পত্তি করার জন্য এবং নিরাপদে ওরমুজ যাবার জন্য তিনি পর্তুগীজ জাহাজের সাহায্য চাইলেন এবং বললেন তাঁকে সাহায্য করলে তিনি পর্তুগীজরা যাতে বাংলায় বাণিজ্য করার সুযোগ-সুবিধা লাভ করে, এমনকি যাতে চট্টগ্রামে দুর্গ নির্মাণ করার অনুমতি লাভ করে, তার জন্য বাংলার সুলতানের উপর তাঁর প্রভাব প্রয়োগ করবেন। পর্তুগীজ গভর্নর এই প্রস্তাবে রাজী হন। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর কিছু ঘটবার আগেই নসরৎ শাহের মৃত্যু হয়। (Campos, Portugese in Bengal, pp. 30-33 দ্রষ্টব্য)

নসরৎ শাহ্‌ ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন। গৌড়ে তিনি অনেকগুলি মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। গৌড়ে 'কদম্‌ রসুল' নামে যে বিখ্যাত ভবনটি আছে, সেটি তিনিই নির্মাণ করিয়েছিলেন বলে গোলাম হোসেন থেকে সুরু করে আবিদ আলী পর্যন্ত সমস্ত ঐতিহাসিক লিখেছেন। এই ভবনেরই প্রকোষ্ঠে একটি কালো কারুকার্যখচিত মর্মর-বেদীর উপরে হজরৎ মুহম্মদের "পদচিহ্ন"-উৎকীর্ণ একটি পাথর ছিল। এই প্রকোষ্ঠের দরজার মাথায় একটি শিলালিপিতে লেখা আছে যে সুলতান নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ ৯৩৭ হিজরায় "এই পবিত্র মঞ্চ এবং এর পাথর, যার উপরে রসুলের পদচিহ্ন আছে, তা উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন।" সম্ভবত এর থেকেই ঐতিহাসিকেরা মনে করেছেন যে

নসরৎ শাহই ভবনটির নির্মাতা। কিন্তু এই ভবনের ফটকের উপরে একটি শিলালিপি ছিল, তাতে লেখা ছিল যে সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকালে ৯০৯ হিজরার ২২শে মহরম তারিখে "এই ফটক নির্মিত হয়েছিল"। এখনও এই ভবনের প্রবেশপথের বাঁ পাশের ভিতরের দিকে একটি শিলালিপি রয়েছে, তাতে লেখা আছে সুলতান শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহের রাজত্বকালে ১৮ই রমজান তারিখে মির্শাদ খান "এই মসজিদ তৈরী করিয়েছিলেন।" অনেকে মনে করেন, শেষোক্ত দু'টি শিলালিপি মূলে এই ভবনে ছিল না, কিন্তু এই মতের অনুকূলে কোন প্রমাণ নেই। আমাদের মনে হয়, ভবনটি শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহের রাজত্বকালে মির্শাদ খানই প্রথম নির্মাণ করান, তখন এটি একটি সাধারণ মসজিদ ছিল। পরে আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকালে এর ফটকটি নির্মিত হয়। নসরৎ শাহ কেবলমাত্র হজরৎ মুহম্মদের পদচিহ্ন-সংবলিত পাথরটি ও যে মঞ্চের উপরে সেটি রক্ষিত ছিল, সেইটি স্থাপন করেছিলেন এবং তাঁর সময় থেকেই এই মসজিদটি 'কদম্ রসুল' নামে পরিচিত হয়; এর আদি নির্মাতা তিনি নন।

যা হোক্, নসরৎ শাহ গৌড়ের অন্য অনেক প্রসিদ্ধ প্রাসাদ ও মসজিদ নির্মাণ করান। তার মধ্যে বিখ্যাত বারদুয়ারী মসজিদ বা বড় সোনা মসজিদ অন্যতম। এটি ৯৩২ হিজরা বা ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়।

সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের অনেক জায়গায় নসরৎ শাহের নাম পাওয়া যায়। শ্রীকর নন্দীর মহাভারতে এইভাবে নসরৎ শাহের নাম পাই,

নসরৎ সাহ নাম অতি মহারাজা।
পুত্র সম রক্ষা করে সকল পরজা॥
নৃপতি হুসন সাহ তনয় সুমতি।
সামদানদণ্ডভেদে পালে বসুমতী॥

এর পাঠান্তর :—

নসরৎ সাহ তাত অতি মহারাজা।
রামবৎ নিত্য পালে সব প্রজা॥
নৃপতি হুসেন সাহ হএ ক্ষিতিপতি।
সামদানদণ্ডভেদে পালে বসুমতী॥

অনেকের ধারণা, নসরৎ শাহ নিজেও একখানি মহাভারত লিখিয়েছিলেন

কোন কবিকে দিয়ে। এরকম ধারণার কারণ, কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতের কোন কোন পুঁথিতে এই পয়ারটি পাওয়া যায়,

শ্রীযুত নায়ক সে যে নসরৎ খান।
রচাইল পঞ্চালী যে গুণের নিদান॥

কিন্তু এই নসরৎ খান নসরৎ শাহ নন, ইনি চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খানের পুত্র, যিনি ছুটি খান নামে বিশেষভাবে পরিচিত। এই নসরৎ খান বা ছুটি খান শ্রীকর নন্দীকে দিয়ে যে মহাভারত লিখিয়েছিলেন, তারই কথা এই পয়ারটিতে বলা হয়েছে এবং কালক্রমে এই পয়ারটি কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতের অর্বাচীন পুঁথিতে প্রবেশ করেছে।

নসরৎ শাহের সময়ে একজন বড় পদকর্তা ছিলেন। ইনি কবিশেখর, কবিরঞ্জন এবং বিদ্যাপতি এই তিন নামেই পদ লিখতেন। এঁর কয়েকটি পদের ভণিতায় নসরৎ শাহের নাম পাওয়া যায়। সেগুলি নীচে উদ্ধৃত করছি,

(১) কবিশেখর ভণ অপরূপ রূপ দেখি।
রাএ নসরৎ শাহ ভুললি কমলমুখী॥

(২) বিদ্যাপতি ভাণি
অশেষ অনুমানি
সুলতান শাহ নসীর মধুপ ভুলে কমলা-বাণী॥

(৩) নসীরা শাহ সে জানে
যারে হানল মদনবাণে
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চগৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভাণে॥

সম্ভবত এই কবি নসরৎ শাহের দরবারে চাকরী করতেন। আগেই এঁর সম্বন্ধে আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, নসরৎ শাহের প্রশস্তি-সংবলিত একটি পদের ভণিতায় কবির নাম "শেখ কবীর" লেখা রয়েছে। এর থেকে ডঃ এনামুল হক মনে করেন যে শেখ কবীর নামে নসরৎ শাহের একজন সমসাময়িক কবি ছিলেন এবং তিনি নসরৎ শাহের পৃষ্ঠপোষণ লাভ করেছিলেন। কিন্তু ডঃ শহীদুল্লাহ মনে করেন এখানে "শেখ কবীর" "কবিশেখর"-এর বিকৃতি। এই অনুমানই যথার্থ বলে মনে হয় (এ সম্বন্ধে পরিশিষ্টে আলোচনা দ্রষ্টব্য।)

নসরৎ শাহের রাজ্যের আয়তন তাঁর পিতার রাজ্যের তুলনায় কম ছিল না, বরং কোন কোন নতুন জায়গা তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। হোসেন

শাহের রাজ্যের পশ্চিম সীমারেখা বর্তমান বিহার রাজ্যের পশ্চিম সীমারেখাকে কোথাও অতিক্রম করে নি বলে মনে হয়। কিন্তু নসরৎ শাহের রাজ্যের মধ্যে বর্তমান উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত কোন কোন স্থানও অন্তর্ভুক্ত ছিল। উত্তর প্রদেশের খরিদ বা সিকন্দরপুরে নসরৎ শাহের শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে এবং 'রিয়াজ'-এর মতে নসরৎ শাহ উত্তর প্রদেশের ভরাইচ বা বহ্‌রাইচে কুৎব্‌ খানের অধীনে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিলেন।

সমসাময়িক পর্তুগীজ বিবরণ থেকে জানা যায় যে, চকরিয়া অঞ্চল এবং চট্টগ্রাম বন্দর নসরৎ শাহের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

নসরৎ শাহের যে সব মুদ্রা এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি এই সমস্ত জায়গার টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ হয়েছিল,

(১) নসরতাবাদ, (২) ফতেহাবাদ (ফরিদপুর), (৩) হোসেনাবাদ, (৪) খলিফতাবাদ, (৫) মুহম্মদাবাদ, (৬) মাহ্‌মুদাবাদ, (৭) বারবকাবাদ।

এদের মধ্যে বারবকাবাদ ও নসরতাবাদ উত্তরবঙ্গে অবস্থিত বলে 'আইন-ই-আকবরী' থেকে জানা যায়। খলিফতাবাদ বাগেরহাটের নামান্তর।

এই সমস্ত জায়গায় নসরৎ শাহের শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে:—

(১) গৌড়, (২) সোনারগাঁও (ঢাকা), (৩) মঙ্গলকোট (বর্ধমান), (৪) মৌলানাতলী (মালদহ), (৫) বাঘা (রাজশাহী), (৬) আশরফপুর (ঢাকা), (৭) নবগ্রাম (পাটনা), (৮) সিকন্দরপুর (খরিদ, উত্তর প্রদেশ),* (৯) দেওতলা (মালদহ), (১০) মালদহ, (১১) মুর্শিদাবাদ, (১২) সাতগাঁও (হুগলী), (১৩) সন্তোষপুর (হুগলী), (১৪) বেগুসরাই (ত্রিহুত)।

এর থেকে নসরৎ শাহের রাজ্যের আয়তন সম্বন্ধে বেশ সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়।

এই সব শিলালিপিতে নসরৎ শাহের এই সব কর্মচারীর নাম পাওয়া যায়:—

(১) **তকীউদ্দীন**

(২) **মিঞা মুআজ্জম**

(৩) **মুবারক খান**

(৪) **ফতে খান**

(৫) **মজলিস সাঈদ**

* সিকন্দরপুরে প্রাপ্ত শিলালিপির ভাষার ধরন দেখে ডঃ দানী এই অঞ্চলে নসরৎ শাহের সার্বভৌম অধিকার ছিল কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন (Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal, p. 70)। এই সন্দেহের ভিত্তি খুবই দুর্বল।

(৬) **খলিফ খান**

(৭) **মজলিস সিরাজ**

(৮) **শের-এ-মালিক**

(৯) **সৈয়দ জমালুদ্দীন**

(১০) **মুখতিয়ার খান**

(১১) **মজলিস খানওয়ার**

(১২) **হাসান খান**

(১৩) **আনওয়ার খান**

এছাড়া বাবরের আত্মকাহিনী থেকে নসরৎ শাহের এই সমস্ত দূত, কর্মচারী, আঞ্চলিক শাসনকর্তা ও সৈন্যাধ্যক্ষের নাম পাওয়া যায়—

(১) **ইসমাইল মিতা**

(২) **আবুল ফতেহ্**

(৩) **হোসেন খান লস্কর উজীর**

(৪) **মখদুম-ই-আলম**

(৫) **মুঙ্গেরের শাহজাদা** (ইনি সম্ভবত নসরৎ শাহের পুত্র, কিন্তু এর নাম জানা যায় না)।

(৬) **বসন্ত রাও**

পর্তুগীজ বিবরণগুলি থেকে জানা যায় যে চট্টগ্রামের নিকটবর্তী চকরিয়ায় খোদা বখ্‌শ্‌ খান নামে নসরৎ শাহের অধীনস্থ একজন শাসনকর্তা থাকতেন এবং তিনি এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল শাসন করতেন। 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে'র মতে কুৎব্‌ খান নামে নসরৎ শাহের একজন সেনাপতি ছিলেন। আব্বাস খানের 'তারিখ-ই-শেরশাহী'তে গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের কুৎব্‌ খান নামে একজন সেনাপতির উল্লেখ পাওয়া যায়; তিনি ও ইনি সম্ভবত অভিন্ন। অসমীয়া বুরঞ্জীতে "তুরবক" নামে নসরৎ শাহের আর একজন সেনাপতির নাম উল্লিখিত হয়েছে। এঁর নাম অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।

নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায়, সেগুলির পরিচয় দেওয়া হল। এই সমস্ত তথ্য থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে নসরৎ শাহ তাঁর পিতারই মত নানা যোগ্যতার অধিকারী একজন শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। বাবরও তাঁর আত্মকাহিনীতে লিখেছেন যে তাঁর সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ ভারতীয়

রাজাদের মধ্যে নসরৎ শাহ অন্যতম। অকালে আকস্মিকভাবে নসরৎ শাহের মৃত্যু না ঘটলে হয়তো তিনি তাঁর পিতার সমান যশই অর্জন করতেন।

আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ (২য়)

নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। এঁর আগে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমে শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহের পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ সুলতান হয়েছিলেন। সুতরাং একে দ্বিতীয় আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ বলা উচিত। কিন্তু এঁর রাজত্ব প্রথম আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহেরই মত স্বল্পস্থায়ী হয়েছিল।

দ্বিতীয় আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের কতকগুলি মুদ্রা ইতিপূর্বে পাওয়া গিয়েছিল, এদের মধ্যে সবগুলিরই তারিখ ৯৩৯ হিজরা। বর্ধমান জেলার কালনায় এর একটি শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে, এটি ৯৩৯ হিজরার ১লা রমজান বা ২৭শে মার্চ, ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হয়েছিল। এটি আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের উজীর ও সেনাপতি মালিক উলুগ মসনদ খান স্থাপন করেছিলেন। ফিরোজ শাহের পিতা নসরৎ শাহের ৯৩৮ হিঃ পর্যন্ত মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে এবং ৯৩৯ হিঃ থেকেই আবার ফিরোজের পরবর্তী সুলতান গিয়াসুদ্দীন মাহ্মুদ শাহের মুদ্রা সুরু হয়েছে। এই সমস্ত বিষয় থেকে সকলেই মনে করেছিলেন যে ফিরোজ শাহ মাত্র ৯৩৯ হিজরার কিছু সময় রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের ৯৩৮ হিজরায় উৎকীর্ণ কতকগুলি মুদ্রাও পাওয়া গিয়েছে (JASP, Vol. IV, 1959, pp. 173-180 এবং Varendra Research Society's Monographs, No. 6, pp. 16-18 দ্রষ্টব্য)। অতএব ৯৩৮ হিজরাতেই (১৫৩০-৩১ খ্রীঃ) নসরৎ শাহের মৃত্যু ও ফিরোজ শাহের সিংহাসনে আরোহণ ঘটেছিল এবং অন্তত কালনা শিলালিপির তারিখ অর্থাৎ ৯৩৯ হিঃর নবম মাস পর্যন্ত ফিরোজ শাহ রাজত্ব করেছিলেন। 'রিয়াজ'-এর মতে ফিরোজ শাহ মাত্র তিন মাস রাজত্ব করেছিলেন। বলা বাহুল্য এ কথা সত্য হতে পারে না। বুকানন-বিবরণীতে লেখা আছে "Firuz Shah governed nine months." এই কথা সত্য হলেও হতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে বলতে হবে ফিরোজ শাহের ৯৩৮ হিজরার মুদ্রাগুলি তাঁর রাজত্বের প্রথম মাসে উৎকীর্ণ হয়েছিল এবং কালনার শিলালিপিটি সম্পূর্ণ হবার অব্যবহিত পরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই ফিরোজ শাহের নাম সুপরিচিত। কারণ সর্বপ্রথম বাংলা কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্য এই ফিরোজ শাহেরই আজ্ঞায় লেখা হয়েছিল। এর লেখক দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ। তিনি ফিরোজ শাহকে (তাঁর কাব্যের মধ্যে "রাজা শ্রীপেরোজ সাহা" এবং "ছিরি পেরোজ সাহা বিদিত যুবরাজ" বলেছেন এবং ফিরোজ শাহের পিতা হিসাবে নসীর (নসরৎ) শাহের নাম করেছেন। কেউ কেউ মনে করেন ফিরোজ যখন যুবরাজ ছিলেন, তখন শ্রীধর কাব্য রচনা সুরু করেন, তিনি রাজা হবার পরে কাব্য রচনা শেষ হয়। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। কারণ শ্রীধর তাঁর 'কালিকামঙ্গল কাব্যে' অনেক ক্ষেত্রে ফিরোজকে একবার "রাজা" বলে তার অব্যবহিত পরেই "যুবরাজ" বলেছেন। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যখন নসরৎ শাহ বাংলার সুলতান (১৫১৯-১৫৩২ খ্রীঃ) এবং ফিরোজ শাহ যুবরাজ, সেই সময়ে ফিরোজের নির্দেশে শ্রীধর কালিকামঙ্গল রচনা করেন; তিনি ফিরোজকে স্তুতিচ্ছলে "রাজা" বলেছেন। শ্রীধর সম্ভবত চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোক, কারণ তাঁর কালিকামঙ্গলের সব পুঁথিই চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছে। এর থেকে মনে হয়, পিতার রাজত্বকালে ফিরোজ চট্টগ্রাম অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন এবং সেই সময়েই তিনি শ্রীধরকে দিয়ে এই কাব্যখানি লেখান।

অসমীয়া বুরঞ্জীর সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করলে জানা যায় যে নসরৎ শাহের রাজত্বকালে বাংলার সৈন্যবাহিনী আসামে যে অভিযান সুরু করেছিল, তা ফিরোজ শাহের রাজত্বকালেও অপ্রতিহত গতিতে চলেছিল।

ইতিপূর্বে বাংলার সৈন্যবাহিনীর যে জয়লাভের কথা উল্লেখ করেছি, তার পরে তারা আসামের ভিতর দিকে অগ্রসর হয়। মুসলমানরা দখিনকোলে ব্রহ্মপুত্র পার হল এবং কালিয়াবারে পৌছোলো। এই সময় বর্ষা এসে যাওয়াতে তারা অগ্রগতি বন্ধ করতে বাধ্য হল। ১৫৩২ খ্রীঃর অক্টোবর মাসে তারা উত্তর-কোলে ফিরে এল এবং কিছুদিনের মধ্যেই ঘীলাধরিতে (দরং জেলার বিশ্‌নাথের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত) গিয়ে হাজির হল। শত্রুর অগ্রগতি দেখে অহোমরাজ বিচলিত হয়ে বুরাই নদীর মোহানা পাহারা দেবার জন্য এক শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী পাঠালেন এবং পরিখা কাটালেন, কিন্তু মুসলমানরা তাদের মতলব পালটে ফেলল। তারা ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরে সরে গিয়ে সালা দুর্গ অবরোধ করল। দুর্গের চারপাশের ঘরবাড়ীগুলি তারা পুড়িয়ে ফেলল এবং ঝড়ের মত তীব্রবেগে আক্রমণ চালিয়ে দুর্গ দখল করে নিতে চেষ্টা করল, কিন্তু দুর্গের অধ্যক্ষ

তাদের উপর গরম জল ঢেলে দিয়ে তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিলেন। দু'মাস ইতস্তত খণ্ডযুদ্ধ চলার পর একটি বৃহৎ স্থলযুদ্ধ হয়। অহোম্‌রা ৪০০ হাতী নিয়ে মুসলমান অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করল। কিন্তু মুসলমানরা এই যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে জয়ী হল। অহোম্‌রা পরাজিত হয়ে দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নিল। (Mughal North-East Frontier Policy, Sudhindra Nath Bhattacharya, pp. 90-91 দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয় আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালের আর কোন ঘটনার কথা এ পর্যন্ত জানা যায় নি।

মুদ্রা ও শিলালিপির সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে, পরবর্তী সুলতান গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ আলাউদ্দীন হোসেন শাহের পুত্র এবং আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের পিতৃব্য। রিয়াজ-উস্‌-সলাতীন এবং বুকাননের বিবরণীতে লেখা আছে যে, পিতৃব্য মাহ্‌মুদ ভ্রাতুষ্পুত্র ফিরোজকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। এই কথা সম্পূর্ণ সত্য, কারণ সমসাময়িক ও প্রামাণিক পর্তুগীজ বিবরণগুলিতে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে।

ফিরোজ শাহের উজীর ও সেনাপতি এবং কালনা শিলালিপির নির্মাতা মসনদ খান ভিন্ন তাঁর অন্য কোন কর্মচারীর নাম এ পর্যন্ত জানা যায় নি।

ফিরোজ শাহের মুদ্রাগুলি ফতেহাবাদ (ফরিদপুর), নসরতাবাদ (উত্তরবঙ্গে অবস্থিত), হোসেনাবাদ ও মুহম্মদাবাদের টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ হয়েছিল।

গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ

'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে'র মতে গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ আলাউদ্দীন হোসেন শাহের আঠারো জন পুত্রের মধ্যে একজন এবং নসরৎ শাহ তাঁকে আমীর পদবী দান করেছিলেন। সাদুল্লাপুরের (গৌড়) শিলালিপি থেকে জানা যায় যে ইনি আব্‌দ্‌ শাহ ও আবদুল বদ্‌র্‌ নামেও অভিহিত হতেন।

গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ ৯৩৯ হিজরার আগে বাংলার সুলতান হন নি। কিন্তু তাঁর ৯৩৩-৯৩৫ ও ৯৩৮ হিজরায় মুদ্রিত মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে, এর থেকে কেউ কেউ মনে করেন নসরৎ শাহ তাঁকেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন, আবার কারও কারও মতে তিনি নসরৎ শাহের রাজত্বকালে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। নসরৎ শাহ তাঁর পুত্রকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত না করে ভাইকে করবেন, এটা খুব সম্ভবপর বলে মনে হয়

না। বিশেষত, নসরৎ শাহের রাজত্বকালে রচিত শ্রীধরের কালিকামঙ্গলে ফিরোজ শাহকে "যুবরাজ" বলা হয়েছে, একথাও মনে রাখতে হবে। সুতরাং নসরতের রাজত্বকালে গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন, এইটিই বেশী সম্ভাব্য বলে মনে হয়। অবশ্য এইসব মুদ্রার তারিখ ঠিকমত পড়া হয়েছে কিনা, তাতেও সন্দেহের অবকাশ আছে।

'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে' গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহ সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য এগুলি সর্বাংশে নির্ভরযোগ্য নয়। গিয়াসুদ্দীন শের শাহ ও হুমায়ুনের সমসাময়িক এবং তাঁদের সঙ্গে তাঁর ভাগ্য পরিণামে এক সূত্রে জড়িত হয়ে পড়ে। এই কারণে শের শাহ ও হুমায়ুন সংক্রান্ত প্রামাণিক ইতিহাসগ্রন্থগুলিতে তাঁর সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। এই বইগুলির মধ্যে আব্বাস খান সরওয়ানী রচিত 'তারিখ-ই-শেরশাহী' প্রধান। পর্তুগীজ বণিকদের সঙ্গে মাহ্‌মূদ শাহের যোগাযোগ ছিল বলে পর্তুগীজ বিবরণগুলির মধ্যেও তাঁর সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ পাওয়া যায়।

'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে'র মতে গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহ্‌ সিংহাসনে আরোহণ করলে তাঁর ভগ্নীপতি মখদুম-ই-আলম ত্রিহুতে বিদ্রোহ করেছিলেন এবং ফিরোজ শাহের হত্যার প্রতিশোধ নেবার সঙ্কল্প ঘোষণা করেছিলেন। আব্বাস খান সরওয়ানী 'তারিখ-ই-শের শাহী'তে (Eng. Translation, 2nd Ed., p. 44) লিখেছেন শের খান দিল্লী থেকে পালিয়ে যখন বিহারে এসেছিলেন, তখন বাংলার সুলতানের অধীনস্থ হাজীপুরের সরলস্কর মখদূম আলমের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল ; বাংলার সুলতান এই সময় মখদূম আলমের উপর কোন কারণে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এদিকে বাংলার সুলতান আফগানদের হাত থেকে বিহার প্রদেশ জয় করার মৎলব আঁটছিলেন। মাহ্‌মূদ শাহ মুঙ্গেরের সরলস্কর কুৎব্‌ খানকে পাঠিয়েছিলেন বিহার জয় করবার জন্য। শের খান মাহ্‌মূদ শাহের এই আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, কিন্তু কুৎব্‌ খান তাতে কর্ণপাত করেন নি।

'তারিখ ই-শের শাহী'তে লেখা আছে (Ibid, pp. 44-45) যে শের শাহ যখন সন্ধিস্থাপনে অক্ষম হলেন, তখন তিনি আফগানদের সঙ্গে মিলে কুৎব্‌ খানের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁকে বধ করলেন। মখদূম আলম কুৎব্‌ খানকে সাহায্য করেন নি বলে মাহ্‌মূদ শাহ তাঁর বিরুদ্ধে এক সৈন্যবাহিনী পাঠালেন। এই সময় শের খান বিহারের অধিপতি জলাল খান লোহানীর অমাত্য ও

অভিভাবক ছিলেন। 'তারিখ-ই-শের শাহী'র মতে শের খান লোহানীদের প্রতিকূলতার জন্য নিজে গিয়ে মখদুম আলমকে সাহায্য করতে পারেন নি। তার বদলে তিনি তাঁর ভগ্নীপতি হস্‌মু খানকে পাঠিয়েছিলেন। মখদুম আলম মাহ্‌মুদের সৈন্যদের হাতে নিহত হলেন, কিন্তু হস্‌মু খান অক্ষত শরীরে ফিরে এলেন।* এদিকে মখদুম আলম যুদ্ধে যাবার আগে তাঁর ধনসম্পত্তি শের খানের জিম্মায় রেখে গিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর ফলে শের খান ঐ বিপুল সম্পত্তির মালিক হলেন। 'তারিখ-ই-শের শাহী' ও অন্যান্য প্রামাণিক গ্রন্থ থেকে এর পরবর্তী ঘটনা সম্বন্ধে যা জানা যায়, তা নীচে বর্ণিত হল।

জলাল খান লোহানী শের খানের অভিভাবকত্ব বেশীদিন সহ্য করতে পারলেন না। তিনি মাহ্‌মুদের কাছে চলে গিয়ে তাঁর অধীনতা স্বীকার করলেন এবং তাঁকে অনুরোধ জানালেন শের খানকে দমন করার জন্য। মাহ্‌মুদ জলাল খান ও কুৎব্‌ খানের পুত্র ইব্রাহিম খানকে শের খানের বিরুদ্ধে পাঠালেন বহু সৈন্য, হাতী ও কামান সঙ্গে দিয়ে। শের খান এই বিরাট সৈন্যবাহিনীকে আসতে দেখে সসৈন্যে বাংলার দিকে অগ্রসর হলেন। (ডঃ কালিকারঞ্জন কানুনগোর মতে মুঙ্গের ও পাটনার মাঝখানে, মুঙ্গেরের ১৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত সুরজগড়ে দুই পক্ষের সৈন্য পরস্পরের সম্মুখীন হয়।) শের খান চারদিকে মাটির প্রাকার তৈরী করে ছাউনি ফেললেন। ইব্রাহিম খান শের খানের ছাউনি ঘিরে ফেলে তোপ বসালেন এবং নতুন সৈন্য পাঠাবার জন্য মাহ্‌মুদকে অনুরোধ করে পাঠালেন। প্রাকারের মধ্যে থেকে খানিকক্ষণ যুদ্ধ করে শের খান ইব্রাহিম খানের কাছে দূত পাঠিয়ে জানালেন, তিনি পরদিন সকালে প্রাকার থেকে বেরিয়ে তাঁকে আক্রমণ করবেন। এদিকে শের খান রাত্রি শেষ হবার আগেই প্রাকারের মধ্যে বাছা বাছা অল্প সৈন্য রেখে অন্য সৈন্যদের নিয়ে উঁচু জমির আড়ালে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ইব্রাহিম খানের সৈন্যেরা যখন এল, তখন শের খানের ঘোড়সওয়ার সৈন্যরা একবার তীর ছুঁড়েই পিছু হটল। তখন আফগানরা পালিয়ে যাচ্ছে ভেবে বাংলার ঘোড়সওয়ার সৈন্যেরা তাদের পিছু পিছু ধাওয়া করল।

* এই যুদ্ধে মখদুম আলম নিহত হলেন আর শের খানের আত্মীয় হস্‌মু খান অক্ষত শরীরে ফিরে এলেন, এর থেকে সন্দেহ হয়, শের খান মখদুম আলমের ধনসম্পত্তির মালিক হবার জন্য মখদুম আলমকে বিশ্বাসঘাতকতা করে বধ করিয়েছিলেন। শের খানের জীবনে অনুরূপ বিশ্বাসঘাতকতার দৃষ্টান্ত মোটেই বিরল নয়।

শের খান তাঁর লুকোনো সৈন্যদের নিয়ে বাংলার সৈন্যদের আক্রমণ করলেন। বাংলার সৈন্যরা পালিয়ে না গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে লাগল। এই যুদ্ধে বাংলার বাহিনী পরাজিত হল এবং তাদের সেনাপতি ইব্রাহিম খান নিহত হলেন। তাঁদের সমস্ত হাতী, তোপ এবং অর্থভাণ্ডার শের খানের দখলে এল। এরপর শের খান বাংলাদেশ আক্রমণ করে গড়ি (তেলিয়াগড়ি) পর্যন্ত সব অঞ্চল অধিকার করে নিলেন (Tarikh-i-Sher Shahi, Eng. Translation, 2nd Ed, pp. 45-55, 68-69 দ্রঃ)।

অতঃপর শের শাহ তেলিয়াগড়ি ও সকৃরীগলির গিরিপথ দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টা করলেন। কিন্তু মাহ্‌মূদের সেনাপতিরা, বিশেষত পর্তুগীজ সেনাপতি জোআঁ-কোরীআ অতুলনীয় বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে শের শাহের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিলেন। তখন শের শাহ অপেক্ষাকৃত অরক্ষিত এক পথ দিয়ে তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে চলে গেলেন (এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য ডঃ কালিকারঞ্জন কানুনগো রচিত Sher Shah, pp. 120-125 দ্রষ্টব্য—ডঃ কানুনগোর মতে এই পথ ঝাড়খণ্ডের পথ) এবং ৪০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য, ১৬,০০০ হাতী, ২০,০০০ সৈন্য ও ৩০০ নৌকা নিয়ে গৌড়ে গিয়ে হাজির হলেন। নির্বোধ মাহ্‌মূদ শাহ ১৩ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে শের শাহের সঙ্গে সন্ধি করলেন। শের শাহ তখনকার মত ফিরে গেলেন এবং মাহ্‌মূদের অর্থে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করে মাহ্‌মূদেরই বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ করলেন। এক বছর বাদে তিনি মাহ্‌মূদকে জানালেন যে সার্বভৌম নৃপতি হিসাবে তাঁর মাহ্‌মূদের কাছে বার্ষিক নজরানা প্রাপ্য এবং এই উপলক্ষে তিনি এক বিরাট পরিমাণ অর্থ দাবী করলেন। মাহ্‌মূদ তা দিতে রাজী না হওয়ায় তিনি আবার গৌড় আক্রমণ করলেন (Campos, Portugese in Bengal, pp. 38-39, 40-41.)। পর্তুগীজ বিবরণীর মতে শের শাহ গৌড় আক্রমণ করে শহরটি জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন এবং লুঠ চালিয়ে ষাট মণ সোনা হস্তগত করেছিলেন। কিন্তু 'তারিখ-ই-শের শাহী' থেকে জানা যায় যে, গৌড় নগরী অধিকারের সময় শের শাহ নিজে উপস্থিত ছিলেন না, তাঁর পুত্র জলাল খান ও সেনাপতি খওয়াস খান এই সময় তাঁর সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব করেছিলেন। সুতরাং তাঁরাই গৌড় জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন ও লুঠ করেছিলেন।

গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহ তখন আর উপায়ান্তর না দেখে হুমায়ুনের কাছে

সাহায্য প্রার্থনা করলেন। হুমায়ুন খান-ই-খানান য়ুসুফখেলের অনুরোধে শের খানকে দমন করার জন্য জৌনপুর থেকে বিহারের দিকে রওনা হয়েছিলেন। আমীরদের পরামর্শে হুমায়ুন প্রথমে চুণার দুর্গ অবরোধ করলেন। শের খান গাজী খান সূর এবং বুলাকী খানকে চুণার দুর্গ রক্ষার জন্য রেখে নিজে বহ্‌রকুণ্ডা দুর্গে পালিয়ে গেলেন এবং কৌশলে ও বিশ্বাস-ঘাতকতার দ্বারা রোটাস দুর্গ অধিকার করলেন। এদিকে হুমায়ুন প্রায় ছ'মাস অবরোধের পর চুণার দুর্গ জয় করতে সক্ষম হলেন। এ খবর পেয়ে শের শাহ বিচলিত হলেন। ওদিকে তাঁর পুত্র জলাল খান ও সেনাপতি খওয়াস খান গৌড় নগর অবরোধ করেছিলেন। গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ গৌড়নগরকে প্রাকার ও পরিখা দিয়ে ঘিরে আত্মরক্ষা করছিলেন। একদিন খওয়াস খান পরিখায় পড়ে জলমগ্ন হয়ে মারা যান। শের খান এর ছোট ভাই মোসাহেব খানকে খওয়াস খান উপাধি দিয়ে গৌড়ে পাঠালেন। এই দ্বিতীয় খওয়াস খান ৬ই জিল্বদ, ৯৪৪ হিঃ তারিখে (৬ই এপ্রিল, ১৫৩৮ খ্রীঃ) গৌড় নগরী জয় করেন। 'রিয়াজ'-এর মতে গৌড়ে খাদ্যাভাব দেখা দেওয়ার ফলে আফগানরা গৌড়ের দুর্গ জয় করতে পেরেছিলেন; গৌড় দখলের পর শের খানের পুত্র জলাল খান গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের পুত্রদের বন্দী করলেন; মাহ্‌মুদ শাহ নিজে পালিয়ে গেলেন; শের খান তাঁর পিছু পিছু ধাওয়া করলেন; মাহ্‌মুদ তখন উপায়ান্তর না দেখে শের খানের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন এবং সেই যুদ্ধে পরাজিত ও আহত হলেন। এদিকে হুমায়ুন ততদিনে চুণার দুর্গ অধিকার করে গৌড়ের দিকে রওনা হবার উদ্যোগ করছিলেন। শের খান তাঁর কাছে সন্ধির প্রস্তাব করে দূত পাঠালেন। মাহ্‌মুদ হুমায়ুনের কাছে দূত পাঠিয়ে শের খানের কথা না শুনতে অনুরোধ জানালেন এবং বলে পাঠালেন শের খান গৌড় শহর দখল করলেও বাংলার অধিকাংশ তাঁরই দখলে আছে, হুমায়ুন গৌড় আক্রমণ করলে তিনি সাহায্য করবেন। হুমায়ুন তাঁর কথায় রাজী হয়ে গৌড়ের দিকে রওনা হলেন এবং খান-ই-খানান য়ুসুফখেল বহ্‌রকুণ্ডার দিকে যাত্রা করলেন। শের খান এই খবর পেয়ে তাঁর সৈন্যবাহিনীকে রোটাস দুর্গে পাঠিয়ে দিলেন এবং নিজে পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নিলেন। শোণ ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে মনের গ্রামে হুমায়ুনের সঙ্গে আহত মাহ্‌মুদ শাহের দেখা হল। (Tarikh-i-Sher Shahi, Eng. Translation, 2nd. Ed. pp. 69-79 দ্রঃ)। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে হুমায়ুন মাহ্‌মুদ শাহকে সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা করেছিলেন, আবার

কেউ কেউ বলেন তিনি মাহ্‌মুদকে আদৌ খাতির করেন নি। কিন্তু হুমায়ুনের সহচর জৌহর তাঁর 'তজকিরৎ-উল-ওয়াকৎ'এ লিখেছেন যে হুমায়ুন মাহ্‌মুদকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে সম্ভাব্য সমস্ত রকম উপায়ে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

যাহোক্, হুমায়ুন গৌড়ের দিকে রওনা হলেন। পথে তেলিয়াগড়ির গিরিপথে হুমায়ুন বাধা পেলেন। জলাল খান এখানে তাঁর বাহিনীকে প্রায় এক মাস আটকে রেখে অবশেষে পথ ছেড়ে দিলেন। শের খান এই এক মাসের মধ্যে ঝাড়খণ্ড হয়ে রোটাস দুর্গে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তেলিয়াগড়ি দখলের পর হুমায়ুন গৌড়ের দিকে যাত্রা করলেন। (Tarikh-i-Sher Shahi, Eng. Translation, pp. 82-83)। ইতিমধ্যে গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের মৃত্যু হয়। 'রিয়াজ-উস-সলাতীন'-এর মতে কহলগাঁও-তে গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ খবর পান যে তাঁর দুই ছেলে শের খানের ছেলে জলাল খানের আদেশে নিহত হয়েছেন ; মাহ্‌মুদ শাহ এই খবর শুনে মর্মাহত হন এবং কিছু দিনের মধ্যেই পরলোকগমন করেন। বুকাননের বিবরণীতেও লেখা আছে যে মাহ্‌মুদ তাঁর দুর্গের পতনের এবং দু'টি ছেলের নিহত হওয়ার খবর পেয়ে রোগে আক্রান্ত হন ও তাইতেই মারা যান। এইভাবে বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতানের জীবনাবসান ঘটল এবং আলাউদ্দীন হোসেন শাহের মৃত্যুর মাত্র ১৯ বছর বাদে বাংলা দেশে তাঁর বংশের রাজত্ব শেষ হল। অতঃপর হুমায়ুন বিনা বাধায় গৌড় অধিকার করেন (জুলাই, ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দ)।

নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের রাজত্বকালে বাংলার সৈন্যবাহিনী আসামে যে অভিযান শুরু করেছিল, তা গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের রাজত্বকালে চূড়ান্ত ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয় (Mughal North-East Frontier Policy, Sudhindra Nath Bhattacharya, pp. 91-92 দ্রষ্টব্য)। আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে বাংলার বাহিনী অসমীয়া বাহিনীকে সালার যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত করে এবং সালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য করে। অসমীয়া বুরঞ্জী থেকে জানা যায় যে, ১৫৩৩ খ্রীঃর মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে মুসলমানরা জল এবং স্থলে যুগপৎ আক্রমণ চালিয়ে সালা দুর্গ জয় করবার চেষ্টা করে। কিন্তু তিন দিন তিন রাত্রি তুমুল যুদ্ধের পরেও দুর্গের পতন হল না।

এর পর অসমীয়া বাহিনীর ভাগ্য ফিরে গেল। বুরাই নদীর মোহানায় অনুষ্ঠিত এক যুদ্ধে তারা মুসলমান নৌবাহিনীকে পরাজিত করল। মুসলমানরা

আর একবার সালা দুর্গ জয় করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। এরপর মুসলমানরা দুইমুনিশিলার নৌ-যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল। এই যুদ্ধে তাদের একজন সেনাপতি ও ২৫০০ সৈন্য হত হল এবং তাদের ২০টি জাহাজ অসমীয়ারা জয় করে নিল।

এর পর হোসেন খানের অধীনে একদল নতুন শক্তিশালী সৈন্য এসে যোগ দেওয়ায় মুসলমানরা আবার উৎসাহিত হয়ে যুদ্ধ করতে সুরু করে। ১৫৩৩ খ্রীঃর মে মাসের মধ্যভাগে মুসলমানদের নৌবাহিনী তেজপুরও অতিক্রম করে চলে যায় এবং ডিকরাই নদীর মোহানায় ঘাঁটি গাড়ে। কিন্তু তাদের ঠিক মুখোমুখি অহোম্‌রা এক শক্তিশালী নৌ-বহর নিয়ে ঘাঁটি গেড়েছিল। আড়াই মাস দু'পক্ষ প্রায় বিনা যুদ্ধে এইভাবে থাকবার পর অহোম্‌রা আক্রমণ সুরু করে। তার ফলে ডিকরাই নদীর তীরে প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। মুসলমানরা এই যুদ্ধে পরাজিত হল। মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই মারা পড়ল, অনেকে অদূরবর্তী জলাভূমিতে আশ্রয় নিতে গিয়ে শত্রুদের হাতে ধরা পড়ে গেল।

অতঃপর ১৫৩৩ খ্রীঃর সেপ্টেম্বর মাসে হোসেন খান ভরালি নদীর কাছে তাঁর অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী নিয়ে অহোম্‌ বাহিনীকে বেপরোয়াভাবে আক্রমণ করতে গিয়ে নিহত হলেন, তাঁর বাহিনীও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। অসমীয়ারা ২৮টি হাতী, ৮৫০টি ঘোড়া, এক বাক্স সোনা, ৮০ থলে রূপা এবং অসংখ্য বন্দুক সমেত বহু জিনিস লুঠ করল।

এইখানেই বাংলার মুসলমানদের আসাম অভিযানের সমাপ্তি ঘটল। সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মনে করেন কামরূপে অবস্থিত বাংলার মুসলমান বীররা নিজেদের উদ্যমে এই অভিযান চালিয়েছিলেন, বিপদের মুখেও তাঁরা বাংলার সুলতানের কাছ থেকে কোন সাহায্য পান নি। এই মত যদি সত্য হয়, তাহলে গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের অপদার্থতার আর একটি নিদর্শন পাওয়া যায়। আসাম অভিযানে ব্যর্থতার কিছুদিন পরে মুসলমানরা পূর্বদিক থেকে অহোম্‌দের এবং পশ্চিম দিক থেকে কোচদের চাপ সহ্য করতে না পেরে কামরূপও ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। দুর্বল গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ এবারেও এদের কোন সাহায্য করতে পারেন নি।

গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের রাজত্বকালের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এদেশে পর্তুগীজদের বাণিজ্যের ঘাঁটি স্থাপন। ইতিপূর্বে হোসেন শাহ ও নসরৎ শাহের রাজত্বকালে পর্তুগীজরা এই বিষয়ে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল।

মাহ্মূদ শাহের রাজত্বকালে তারা যেভাবে সফল হল, বিভিন্ন প্রামাণিক পর্তুগীজ গ্রন্থে তার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এই বিবরণগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, এদের মধ্যে পর্তুগীজদের বাণিজ্যের ঘাঁটি স্থাপনের কথা ছাড়া গিয়াসুদ্দীন মাহ্মূদ শাহ ও শের শাহের সংঘর্ষ সম্বন্ধে নতুন ও মূল্যবান সংবাদ পাওয়া যায়। নীচে এই সব বিবরণের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হল।

১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে গোয়ার পর্তুগীজ গভর্নর নুনো-দা-কুন্হা খাজা শিহাবুদ্দীনকে সাহায্য করবার এবং বাংলায় বাণিজ্য আরম্ভের ব্যবস্থা করবার জন্য মার্তিম-আফন্সো-দে-মেলোকে পাঁচটি জাহাজ এবং দু'শো লোক সঙ্গে দিয়ে পাঠান। চট্টগ্রামে পৌঁছে দে-মেলো তাঁর দূত দুয়ার্তে-দে-আজেভেদোকে ১২ জন লোক সঙ্গে দিয়ে বাংলার রাজার জন্য অনেক ঘোড়া ও অলঙ্কার নিয়ে প্রায় ১২০০ পাউণ্ড মূল্যের উপহার সমেত গৌড়ে পাঠালেন। তখন মাহ্মূদ শাহ সদ্য ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করে রাজা হয়েছেন, তাঁর মন খুব খারাপ। তারপর পর্তুগীজদের পাঠানো উপঢৌকনের মধ্যে কয়েক বাক্স গোলাপ-জল ছিল, এগুলি দমিআঁও-বার্নালদেস নামে একজন পর্তুগীজ জলদস্যু একটি মুসলমান জাহাজ থেকে লুট করেছিল, মাহ্মূদ এগুলিকে সেই লুটের মাল বলে চিনতে পারলেন। রেগে গিয়ে তিনি মনস্থ করলেন শুধু পর্তুগীজ দূতদের নয়, বাংলায় আগত সমস্ত পর্তুগীজকেই তিনি বধ করবেন। কিন্তু আলফা খান নামে একজন মুসলমান এবং জনৈক শতাধিক বর্ষ বয়স্ক মুসলিম সন্ন্যাসী তাঁকে বুঝিয়ে সুজিয়ে এ কাজ করা থেকে বিরত করলেন। সুলতান তখন পর্তুগীজ দূতদের বন্দী করলেন এবং অন্যান্য পর্তুগীজদেরও বন্দী করবার জন্য চট্টগ্রামে একজন লোককে পাঠালেন। আফন্সো-দে মেলোর সঙ্গে শুল্কবিভাগের কর্মচারীর একদিন বচসা চলছিল, এমন সময় মাহ্মূদ শাহের পাঠানো লোকটি মাঝখান থেকে কথা বলল এবং দে-মেলোকে নৈশ ভোজের জন্য আমন্ত্রণ জানাল। দে-মেলো এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। কিন্তু ভোজের মাঝখানে লোকটি অসুস্থতার অছিলা করে উঠে গেল। তখন একদল মুসলমান বন্দুক ও তীরধনুক নিয়ে পর্তুগীজদের আক্রমণ করল। দে-মেলো ও ৪০ জন পর্তুগীজ নিমন্ত্রণে এসেছিলেন; তাঁরা প্রাণপণ যুদ্ধ করলেন, শেষে অনেকে নিহত হলেন, অন্যেরা আত্মসমর্পণ করলেন। তাঁদের সঙ্গীরা সমুদ্র-তীরে শূকর শিকার করছিলেন, মুসলমানরা তাঁদের অতর্কিতে আক্রমণ করে অনেককে মেরে ফেলল, অন্যান্য লোকরা বন্দী হলেন। পর্তুগীজদের ১,০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের

সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হল। মাত্র ত্রিশজন পর্তুগীজ হত্যাকাণ্ড থেকে অব্যাহতি পেয়ে বন্দী হয়েছিলেন। তাঁদের প্রথমে অন্ধকূপের মত একটা ঘরে বিনা চিকিৎসায় রাখা হল, তারপর একটা গোটা রাত্রি ধরে হাঁটিয়ে ছয় লীগ দূরে মাওয়া নামে একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হল, সেখান থেকে তাঁদের গৌড়ে চালান দেওয়া হল এবং গৌড়ে মাহ্‌মুদ শাহের লোকেরা পর্তুগীজ বন্দীদের সঙ্গে পশুর মত ব্যবহার করে নরকের মত একটা জায়গায় আটকে রাখল।

এই খবর শুনে নুনো-দা-কুন্‌হা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে আন্তোনিও-দে-সিলভা-মেনেজেসকে ন'টি জাহাজ ও ৩৫০ জন পর্তুগীজ সঙ্গে দিয়ে চট্টগ্রামে পাঠালেন মাহ্‌মুদের কাছে কৈফিয়ৎ তলব এবং দে-মেলো ও তাঁর সঙ্গীদের মুক্ত করবার জন্য। মেনেজেস চট্টগ্রামে এসে তাঁর দূত জর্জ-অলকোকোরাদোকে মাহ্‌মুদ শাহের কাছে পাঠিয়ে বন্দীদের মুক্তি দাবী করলেন। সেই সঙ্গে তিনি জানালেন দূতের কোন ক্ষতি করা হলে অথবা এক মাসের মধ্যে তাকে ফিরতে না দিলে তিনি যুদ্ধ করবেন। দূত যখন মাহ্‌মুদের কাছে উপস্থিত হল, তখন মাহ্‌মুদ বন্দীদের মুক্তি না দিয়ে মেনেজেসকে একটি চিঠি পাঠালেন গোয়ার গবর্নরের কাছে ছুতার, মণিকার এবং অন্যান্য মিস্ত্রী পাঠাবার জন্য অনুরোধ করে। এদিকে দূতের প্রত্যাবর্তন করতে এক মাসের বেশী দেরী হয়ে গেল। তখন মেনেজেস চট্টগ্রামের এক বৃহৎ অঞ্চলে আগুন লাগিয়ে দিলেন এবং বহু লোককে বধ ও বন্দী করলেন। মাহ্‌মুদ এ খবর শুনে খুব উত্তেজিত হলেন। মেনেজেসের দূতকে বন্দী করার জন্য তিনি আদেশ দিলেন, কিন্তু দূত ইতিমধ্যে মেনেজেসের কাছে পৌছে গিয়েছিল।

আফন্সো-দে-মেলো ও তাঁর দলবলকে হয়তো মাহ্‌মুদ বধ করতেন, কিন্তু এই সময়ে শের খান বাংলা আক্রমণ করাতে তাঁর মতিগতি পালটে গেল। তিনি দে-মেলোকে বধ করার বদলে বরং তাঁর কাছে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে পরামর্শ চাইলেন এবং গোয়ার পর্তুগীজ গভর্নরের কাছে সাহায্য চেয়ে দূত পাঠাবেন স্থির করলেন।

এই সময়ে নুনো-দা-কুন্‌হার কাছ থেকে দিয়োগো-রেবেলো নামে আর একজন পর্তুগীজ কাপ্তেন তিনখানি জাহাজ নিয়ে সপ্তগ্রামে এসে পৌছোলেন। রেবেলো সপ্তগ্রামে এসেই প্রথমে কাম্বে থেকে আগত দু'খানি ভিন্ন দেশের বড় বাণিজ্য-জাহাজকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলেন এবং নিজের ভাগ্যে

দিওগো দে-স্পিন্‌দোলা ও দুআর্তে-দিআস নামে আর একজন লোককে মাহ্‌মুদ শাহের কাছে পাঠিয়ে বললেন যে আফন্সো-দে-মেলো ও তাঁর লোকদের মুক্তি না দিলে তিনি মেনেজেসের অনুরূপ কার্যের অনুষ্ঠান করবেন। এতদিন চট্টগ্রাম থেকে মেঘনা নদী দিয়ে পর্তুগীজ দূতরা গৌড়ে গিয়েছিল, এই প্রথম ভাগীরথী নদী দিয়ে গেল। এদিকে মাহ্‌মুদ তখন অন্য মানুষ। তিনি পর্তুগীজ দূতকে খাতির করলেন এবং সপ্তগ্রামের শাসনকর্তার কাছে চিঠি লিখে রেবেলোর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে বললেন। পর্তুগীজ গভর্নরের কাছে বন্ধুত্বের প্রমাণস্বরূপ দূত পাঠাচ্ছেন বলেও তিনি জানালেন। পর্তুগীজদের কাছে তিনি সাহায্য চাইলেন এবং তার বিনিময়ে কুঠি তৈরীর জমি এবং দুর্গ তৈরীর অনুমতি দেবেন বলে জানালেন। তিনি ২১ জন পর্তুগীজ বন্দীকে রেবেলোর কাছে ফেরৎ পাঠালেন এবং জানালেন যে আফন্সো-দে-মেলোর পরামর্শ দরকার বলে তাঁকে তিনি রেখে দিচ্ছেন। আফন্সো-দে-মেলোও পর্তুগীজ গবর্নরকে চিঠি লিখে আশ্বস্ত করলেন।

এদিকে শের খান তখন অগ্রসর হয়ে তেলিয়াগড়ি ও সকরীগলি গিরিপথ পর্যন্ত পৌঁছেছেন। এই দুই গিরিপথ রক্ষা করার জন্য জোআঁ-দে-ভিল্লালো-বোস ও জোআঁ-কোরীআর অধীনে দুই জাহাজ পর্তুগীজ সৈন্য প্রেরিত হল। তারা অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করে শের খানকে গরিজ (গড়ি) দুর্গ ও গৌড় থেকে ২০ লীগ দূরে অবস্থিত "ফারানদুজ" (?) শহর অধিকার করতে দিল না এবং মাহ্‌মুদ শাহের কাঙ্ক্ষিত একটি বিখ্যাত হাতীকে অধিকার করল। কিন্তু শের খান অন্য অরক্ষিত পথ দিয়ে ৪০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য, ১,৫০০ হাতী, ২,০০,০০০ সৈন্য এবং ৩০০ নৌকা নিয়ে গৌড়ে প্রবেশ করলেন। নির্বোধ মাহ্‌মুদ তাঁকে বাধা দিতে না পেরে আফন্সো-দে-মেলোর নিষেধ সত্ত্বেও তেরো লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে শের শাহের সঙ্গে সন্ধি করলেন।

যদিও মাহ্‌মুদ শের শাহের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারেননি, তাহলেও তিনি পর্তুগীজদের বীরত্ব দেখে খুশী হয়েছিলেন। আফন্সো-দে-মেলোকে তিনি বিস্তর পুরস্কার দিলেন এবং কুঠি ও শুল্কগৃহ নির্মাণের অনুমতি দিলেন। চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রামে যথাক্রমে নুনো-ফার্নান্দেজ-ফ্রীয়ার ও জোআঁ-কোরীআর অধীনে একটি বড় ও একটি ছোট শুল্কগৃহ স্থাপিত হল। পর্তুগীজরা অনেক জমি ও বাড়ী পেলেন। তাঁদের হিন্দু-মুসলমান অধিবাসীদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের অধিকার এবং আরও নানারকম সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হল। সুলতান

পর্তুগীজদের এতখানি ক্ষমতা এবং পাকাপোক্ত অধিকার দান করেছেন দেখে লোকেরা অবাক হয়ে গেল। এটি নির্বোধ মাহ্‌মূদের নির্বুদ্ধিতার আর একটি দৃষ্টান্ত। বলা বাহুল্য এর পরিণাম বাংলার পক্ষে শুভ হয় নি। কারণ এর পর থেকে বাংলার নদীপথে পর্তুগীজদের অত্যাচার চরমে ওঠে। মাহ্‌মূদ শাহ তাদের এমন শক্ত ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেওয়ায় ও অত্যধিক ক্ষমতা দান করায় পর্তুগীজরা "ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোতে" পেরেছিল।

যাহোক্, অনুকূল সুযোগ দেখে অন্যান্য পর্তুগীজরাও বাংলায় আসতে লাগল। ইতিমধ্যে কাম্বের লোকদের সঙ্গে পর্তুগীজদের যুদ্ধ বেধেছিল। পর্তুগীজ গভর্নর মাহ্‌মূদের কাছে দূত পাঠিয়ে আফন্সো-দে-মেলোকে ফেরৎ চাইলেন, কারণ কাম্বের যুদ্ধের জন্য তাঁকে দরকার। মাহ্‌মূদকে তিনি জানালেন এই যুদ্ধের জন্য তিনি তাঁকে তক্ষণি কোন সাহায্য পাঠাতে পারছেন না, তবে পরের বছর পাঠাবেন। মাহ্‌মূদ পাঁচজন পর্তুগীজ বন্দীকে সাহায্য-দানের প্রতিশ্রুতির জামিনস্বরূপ রেখে আফন্সো-দে-মেলো ও অন্যান্য পর্তুগীজদের ছেড়ে দিলেন।

কিন্তু এর অব্যবহিত পরেই শের শাহ আবার গৌড় আক্রমণ ও অধিকার করেন। নুনো-দা-কুন্‌হা আগেকার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মাহ্‌মূদকে সাহায্য করার জন্য ভাস্কো-পেরেস-দে-সম্পয়োর অধীনে নয় জাহাজ সৈন্য পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু এই সাহায্য এসে পৌঁছোবার আগে মাহ্‌মূদ শের শাহের সঙ্গে যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়ে পরলোকগমন করেছিলেন। পর্তুগীজ জাহাজগুলি যখন চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছোলো, তখন বাংলাদেশ শের শাহের অধিকারে। (Campos, Portugese in Bengal, pp. 33-42 অবলম্বনে উপরের আটটি অনুচ্ছেদ লেখা হয়েছে।)

যাহোক্, গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের রাজত্বকালে এবং তাঁরই অনুমোদন অনুসারে বাংলাদেশে একটি ইউরোপীয় জাতি বাণিজ্যের ঘাঁটি স্থাপন করল। এক কথায় বলতে গেলে ইউরোপের সঙ্গে বাংলার ব্যাপক ও প্রত্যক্ষ সংযোগ এই প্রথম সুরু হল। এর আগে নিকলো কন্তি, ভারথেমা, বারবোসা প্রভৃতি কয়েকজন ইউরোপীয় পর্যটক বাংলাদেশে ভ্রমণ করেছিলেন, কয়েকটি পর্তুগীজ জাহাজ বাংলাদেশের বন্দরে এসে পৌঁছেছিল, এর বেশী ইউরোপের সঙ্গে বাংলার আর কোন যোগসূত্র স্থাপিত হয়নি। এখন মাহ্‌মূদ শাহের কল্যাণে বাংলাদেশের সামনে পশ্চিমের দ্বার খুলে গেল। এর ফল অনেক দিক দিয়ে

ভাল হলেও সব দিক দিয়ে যে ভাল হয়নি, সে কথা ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই জানেন।

গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহ যে একজন নির্বোধ ও অদূরদর্শী রাজা ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর পূর্ব-বর্ণিত ইতিহাসের প্রায় প্রত্যেকটি ঘটনাই তাঁর নির্বুদ্ধিতার পরিচয় বহন করছে। কিন্তু নির্বুদ্ধিতা ছাড়া অন্যান্য দোষও তাঁর কিছু কম ছিল না। নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রকে বধ করে সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি যে অপরিসীম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তারই ফলে মখদুম-ই-আলম তাঁর বিরুদ্ধে যান এবং এরই পরিণামে মাহ্‌মূদ শাহ সর্বস্বান্ত হন। এর উপর তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় ইন্দ্রিয়পরায়ণ। সমসাময়িক পর্তুগীজ বণিকদের মতে তাঁর উপপত্নীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১০,০০০। এই সমস্ত দোষের ফলে তিনি শেষ পর্যন্ত রাজ্য হারিয়েছিলেন, তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী শের শাহ অবশ্য রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিভায় অতুলনীয় ছিলেন। কিন্তু মাহ্‌মূদ শাহের মত এরকম অপদার্থ নৃপতি বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত না থাকলে তিনি সহজে এ দেশ জয় করতে পারতেন বলে মনে হয় না।

আজ পর্যন্ত এই সমস্ত জায়গায় গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে :—

ধোরাইল (দিনাজপুর), সাদুল্লাপুর (মালদহ), গৌড়, জোয়ার (ময়মনসিংহ)।

মাহ্‌মূদ শাহের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ ধোরাইল গ্রামের শিলালিপির ভাষা সংস্কৃত। বাংলার আর কোন সুলতানের সংস্কৃতে লেখা শিলালিপি পাওয়া যায় নি। মাহ্‌মূদ শাহের গৌড়ের একটি মসজিদের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, এই মসজিদটি বিবি মালতী নামে জনৈক স্ত্রীলোক তৈরী করিয়েছিলেন।

গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের অনেকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। এদের মধ্যে কতকগুলি হোসেনাবাদ ও খলিফতাবাদের (দক্ষিণ যশোহর) টাকশাল থেকে বেরিয়েছিল।

এছাড়া ফতেহাবাদ, নসরতাবাদ এবং মুহম্মদাবাদের টাকশালেও গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের মুদ্রা উৎকীর্ণ হয়েছিল। গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের সোনা, রূপা ও তামা তিন ধাতুতেই তৈরী মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। তাঁর বহু মুদ্রায় তাঁর রাজকীয় নামের সঙ্গে 'বদর্ শাহ' নামটিও উল্লিখিত

হয়েছে। খলিফতাবাদ বা বাগেরহাটের টাকশালে উৎকীর্ণ তাঁর অনেকগুলি মুদ্রা থেকে দেখা যায়, তিনি খলিফতাবাদের নামের সঙ্গে 'বদরপুর' নামটি যোগ করে দিয়েছিলেন।

গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের রাজ্যের আয়তন বেশ বৃহৎ ছিল। তাঁর শিলালিপিগুলি উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। তাঁর টাকশালগুলি উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে অবস্থিত ছিল। পশ্চিমবঙ্গে তাঁর কোন শিলালিপি বা টাকশালের সন্ধান এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। তবে পশ্চিমবঙ্গের সাতগাঁও অঞ্চল যে গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তা পর্তুগীজ বিবরণী থেকে জানা যায়। গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের রাজ্যের পশ্চিম সীমা মুঙ্গের ও পাটনার মাঝখানে এবং মুঙ্গের থেকে প্রায় ১৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত সূরজগড় অবধি বিস্তৃত ছিল, এ কথা আবুল ফজলের 'আকবর-নামা' থেকে জানা যায়। আরও উত্তরে মাহ্‌মূদ শাহের রাজ্যের পশ্চিম সীমা হাজীপুর অবধি বিস্তৃত ছিল, অবশ্য হাজীপুরের সর-ই-লস্কর মখদুম-ই-আলম মাহ্‌মূদ শাহের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তার পরিণামস্বরূপ তিনি নিহত হন। দক্ষিণ-পূর্বে মাহ্‌মূদ শাহের রাজ্য যে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং খোদাবখ্‌শ্‌ খানের শাসনাধীন আরাকানের পর্বতমালা ও মাতামহুরি নদী পর্যন্ত প্রসারিত অঞ্চলটি যে মাহ্‌মূদ শাহের রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল তা পর্তুগীজ বিবরণী থেকে জানা যায়।

শিলালিপি, 'তারিখ-ই-শেরশাহী' প্রভৃতি ইতিহাসগ্রন্থ এবং পর্তুগীজ বিবরণীগুলি থেকে গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের এই সব কর্মচারীর নাম পাওয়া যায়:—

(১) **ফরাস খান**

(২) **নূর খান**

(৩) **মখদুম-ই-আলম**

(৪) **কুৎব্‌ খান**

(৫) **ইব্রাহিম খান** (কুৎব্‌ খানের পুত্র)

(৬) **খোদাবখ্‌শ্‌ খান** (Codavascām) *

* শেখ এ. টি. এম্‌ রুহুল আমিনের মতে Codavascām = কুতব আলম। কিন্তু ধ্বনিতত্ত্বের বিচারে, Codavascām (কোদাবস্‌কাম)= খোদা বখ্‌শ্‌ খান ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য পৃঃ ৪৩২, পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(৭) **হামজা খান** (Amarzacão)*

এঁদের মধ্যে শেষ চারজন মাহ্‌মূদ শাহের সেনাপতি ছিলেন। শেষ দু'জনের নাম পর্তুগীজ বিবরণে পাওয়া যায়। এঁরা দু'জনেই চট্টগ্রাম অঞ্চলে থাকতেন। খোদা বখ্‌শ্‌ খান একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন। মাহ্‌মূদ শাহের মৃত্যুর পর এঁদের মধ্যে চট্টগ্রামের অধিকার নিয়ে বিরোধ বেধেছিল।

পর্তুগীজ বিবরণীগুলিতে লেখা আছে যে মাহ্‌মূদ শাহ যখন আফন্সো-দে-মেলো কর্তৃক প্রেরিত পর্তুগীজ দূতদের বধ করার পরিকল্পনা করছিলেন, তখন আলফা খান নামে জনৈক ব্যক্তি মাহ্‌মূদকে বুঝিয়ে তাঁদের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। এই আলফা খানও সম্ভবত মাহ্‌মূদ শাহের কর্মচারী ছিলেন।

ইতিপূর্বে আমরা একাধিকবার লিখেছি যে বিদ্যাপতির নামাঙ্কিত একটি পদের (বিদ্যাপতি, খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত, ২নং পদ) ভণিতা এই,

বেকতেও চোরি গুপুত কর কতিখন বিদ্যাপতি কবি ভাণ।
মহলম জুগপতি (যুগপতি) চিরেজীব জীবথু গ্যাসদীন সুরতান॥

এই "গ্যাসদীন সুরতান"-কে কেউ গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের সঙ্গে, আবার কেউ গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেন। একে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের সঙ্গে অভিন্ন বলার সপক্ষে যে সমস্ত যুক্তি আছে, সেগুলি এই বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। এখন, একে গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের সঙ্গে অভিন্ন বলার পক্ষে যে সব যুক্তি আছে, সেগুলি উল্লেখ করছি।

(১) আলোচ্য পদটি কেবলমাত্র লোচনের 'রাগতরঙ্গিণী'তে পাওয়া যায়; লোচন যেহেতু নিজে মৈথিল, অতএব তিনি কেবলমাত্র মৈথিল কবিদেরই

* মুহম্মদ খানের 'মক্তুল হোসেন' কাব্য থেকে জানা যায় যে, তাঁর পূর্বপুরুষ হামজা খান ১৫৩০ খ্রীঃর মত সময়ে বর্তমান ছিলেন; তিনি সম্ভবত চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন; এঁকেই পর্তুগীজ বিবরণে উল্লিখিত Amarzacão এর সঙ্গে অভিন্ন বলে ধরেছি; ধরার অনুকূলে নামসাদৃশ্য ছাড়াও একটি যুক্তি আছে; 'মক্তুল হোসেনে' লেখা আছে যে হামজা খান পাঠানদের যুদ্ধে পরাস্ত করেছিলেন, আর পর্তুগীজ বিবরণে লেখা আছে যে Amarzacão পাঠান সুলতান শের শাহের প্রেরিত সেনাপতিকে পরাস্ত ও বন্দী করেছিলেন (সাহিত্য পত্রিকা ৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, পৃঃ ১৬৮ দ্রঃ)।

পদ সঙ্কলন করেছেন এবং যেহেতু তিনি বিখ্যাত মৈথিল কবি বিদ্যাপতি ছাড়া অন্য কোন কবি বিদ্যাপতির নাম করেন নি, অতএব তিনি দ্বিতীয় কোন বিদ্যাপতির পদ সঙ্কলন করতে পারেন না বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু লোচনের 'রাগতরঙ্গিণী'তে সঙ্কলিত বিদ্যাপতির "আনন লোচুঅ বচনে বোলএ হঁসি" পদটিতে কবিশেখরের ভণিতা ("কবিশেখর ভণ অপরূপ রূপ দেখি") পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলাদেশে যে একজন দ্বিতীয় বিদ্যাপতি ছিলেন, তার প্রমাণ আছে; মৈথিল বিদ্যাপতির 'কবিশেখর' উপাধি ছিল বলে জানা যায় না, কিন্তু ঐ দ্বিতীয় বিদ্যাপতির এই উপাধি ছিল (এ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। অতএব "আনন লোচুঅ বচনে বোলএ হঁসি" পদটি যে এই বাঙালী কবি দ্বিতীয় বিদ্যাপতির রচনা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এর থেকে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে লোচন কর্তৃক 'রাগতরঙ্গিণী'তে সঙ্কলিত বিদ্যাপতির সব পদই মৈথিল বিদ্যাপতির রচনা নয়। অতএব "গ্যাসদীন সুরতান"-এর নাম-সংবলিত পদটিও এই বাঙালী বিদ্যাপতির রচনা হতে পারে। এই বাঙালী কবি কবিরঞ্জন, কবিশেখর ও বিদ্যাপতি এই তিন ভণিতাতেই পদ রচনা করতেন; গোপালদাস-রসিকদাস কৃত 'শাখানির্ণয়' থেকে জানা যায়, এই কবি "রাজসেবী" ছিলেন। এই "রাজসেবী" কবির লেখা কয়েকটি পদের ভণিতায় হোসেন শাহ, নসীরা শাহ, নসরৎ শাহ প্রভৃতি রাজার নাম পাওয়া যায় (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য), "আনন লোচুঅ বচনে বোলএ হঁসি" পদটির ভণিতাতে নসরৎ শাহের নাম পাওয়া যায়। এইসব ভণিতায় উল্লিখিত নসীরা শাহ ও নসরৎ শাহ যে বাংলার সুলতান নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ (১৫১৯-১৫৩২ খ্রীঃ) এবং হোসেন শাহ যে তাঁর পিতা আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ), সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। অতএব "গ্যাসদীন সুরতান"-কেও এই বংশের আর একজন সুলতান গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের সঙ্গে অভিন্ন বলে ধরা যায়।

(২) মৈথিল বিদ্যাপতির লেখা 'পুরুষপরীক্ষা' ও শৈবসর্বস্বসারে'র সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করলে মনে হয়, তাঁর পৃষ্ঠপোষক শিবসিংহের সঙ্গে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের শত্রুতা ছিল (বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ৮২ দ্রষ্টব্য)। অতএব মৈথিল বিদ্যাপতির লেখা পদের ভণিতায় গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের নাম এত উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সঙ্গে উল্লিখিত হওয়া সম্ভব কিনা, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে

পারে। পদটি যদি দ্বিতীয় বিদ্যাপতি অর্থাৎ কবিশেখর-বিদ্যাপতির লেখা হয়, তাহলে তার ভণিতায় গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের উল্লেখ সম্বন্ধে অনুরূপ কোন প্রশ্ন ওঠে না। অবশ্য আলোচ্য পদটিতে কবি "গ্যাসদীন সুরতান"-কে "যুগপতি" বলেছেন, যা গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের মত অপদার্থ সুলতানকে বলা সম্ভব কিনা প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু কবিদের পক্ষে এই জাতীয় অত্যুক্তি করা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

সুতরাং আলোচ্য পদটির ভণিতায় উল্লিখিত "গ্যাসদীন সুরতান" যে গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহ নন, তা জোর করে বলা যায় না। ইনি যদি গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহই হন, তাহলে বলতে হবে, পদটির রচয়িতা "রাজসেবী" কবিরঞ্জন-বিদ্যাপতি আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ও নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের মত গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের সরকারেও চাকরী করতেন।

হোসেন শাহের বংশধরদের আমলে দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা খুব বেশী ব্যাহত হয়নি। ধর্মের ক্ষেত্রেও এই সব সুলতানরা মোটামুটিভাবে সহিষ্ণুতাই দেখিয়েছেন। এর কিছু প্রমাণ আমরা দিচ্ছি। নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের রাজত্বকালে সাতগাঁওতে একটি জামী মসজিদ নির্মিত হয়েছিল—৯৩৬ হিঃর রমজান অর্থাৎ ১৫৩০ খ্রীঃর মে মাসে; এর নির্মাতা সৈয়দ ফখরুদ্দীনের পুত্র সৈয়দ জমালুদ্দীন (Dani, Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal, pp. 71-72 দ্রঃ)। এই জামী মসজিদটির ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান আছে। এদিকে, এই জামী মসজিদটির মাত্র এক ফার্লং দূরেই অবস্থিত ছিল (এখনও অবস্থিত আছে) চৈতন্যদেবের ভক্ত ও নিত্যানন্দের অন্তরঙ্গ পার্ষদ উদ্ধারণ দত্তের শ্রীপাট। উদ্ধারণ দত্ত এবং সাতগাঁওয়ের আরও অনেক বণিক নিত্যানন্দের কাছে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করার পরে দিবারাত্র সংকীর্তনে অতিবাহিত করতেন। বৃন্দাবনদাসের ভাষায়

সপ্তগ্রামে যত হৈল কীর্ত্তন বিহার।
শত বৎসরেও তাহা নারি বর্ণিবার।

(চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ৫ম অধ্যায়)

এ ঘটনা নসরৎ শাহের রাজত্বকালের। বৃন্দাবনদাস লিখেছেন যে, নিত্যানন্দের কাছে অনেক মুসলমানও শরণ গ্রহণ করেছিল,

অন্যের কি দায়, বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন।
তাহারাও পাদপদ্মে লইল শরণ॥
যবনের নয়নে দেখিয়া প্রেমধার।
ব্রাহ্মণেও আপনাকে করেন ধিক্কার॥

(চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ৫ম অধ্যায়)

এই সব মুসলমানদের ও সপ্তগ্রামের কীর্তনকারীদের (জামী মসজিদের অনতিদূরে কীর্তন করা সত্ত্বেও) কোন শাস্তি দেওয়া হয়নি; এর থেকে, নসরৎ শাহের রাজত্বকালে ধর্মের ক্ষেত্রে উদারতার নীতি রক্ষিত হয়েছিল মনে করা চলে।

আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ (২য়) ও গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের রাজত্বকালেও এই নীতি রক্ষিত হয়েছিল বলে মনে হয়। আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজকে দিয়ে কালীদেবীর মাহাত্ম্যবর্ণনামূলক কাব্য 'কালিকামঙ্গল' লিখিয়েছিলেন। গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের রাজত্বকালে ফরাস খান নামে একজন রাজপুরুষ একটি সেতু তৈরী করিয়ে তার উপর সংস্কৃত ভাষায় শিলালিপি উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন (Dani, Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal, p. 76 দ্রঃ)। এই সব দৃষ্টান্তগুলি আমাদের ধারণার পোষকতা করছে।

১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে মান্‌রিক দেখেছিলেন যে ধ্বংসপ্রাপ্ত গৌড় শহরে অনেকগুলি হিন্দু মন্দির রয়েছে; তাদের মধ্যে দেবতার বিগ্রহ আছে, তাদের চারপাশে রয়েছে নানারকম খোদাই-করা অদ্ভুত মূর্তি ও গাছের পাতা (carved grotesques and leaves)। এর থেকে মনে হয়, গৌড়ের সুলতানরা তাঁদের রাজধানীতে হিন্দুদের ধর্মচর্চার অবাধ অধিকার দিয়েছিলেন। গৌড়ের পাশে অবস্থিত রামকেলি গ্রাম তো হিন্দুদের ধর্মচর্চার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল।

সুতরাং ধর্ম সম্বন্ধে হোসেন শাহী বংশের সুলতানরা তথা বাংলার অধিকাংশ সুলতানই গোঁড়ামি দেখান নি বলে মনে হয়। অবশ্য হিন্দু রাজার রাজ্যে যুদ্ধাভিযান করার সময় এঁদের মধ্যে অনেকে মন্দির ও বিগ্রহ প্রভৃতি ধ্বংস করতেন। কিন্তু হিন্দু ধর্মের প্রতি বিদ্বেষই তার একমাত্র কারণ নয়; মন্দির ও মূর্তিগুলির ভিতরে অনেক ধনরত্ন থাকত, সেগুলি হস্তগত করার জন্যও এঁরা ঐগুলি ভাঙতেন। অবশ্য এই ভাঙা সম্বন্ধেও অনেকখানি অতিরঞ্জিত সংবাদ পরিবেশিত হয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, হোসেন শাহ থেকে

আরম্ভ করে বহু স্থলতানই উড়িষ্যার অসংখ্য মন্দির ধ্বংস করেছিলেন বলে লিপিবদ্ধ হয়েছে, কিন্তু আসলে এঁরা উড়িষ্যার মন্দিরগুলিতে সামান্য আঁচড় কাটার বেশি আর কিছু করতে পারেন নি; করা এঁদের পক্ষে সম্ভবও ছিল না, কারণ এত বড় বড় মন্দির ভাঙতে হলে যত মজুর দরকার, হিন্দু রাজ্যে এই কাজের জন্য এত মজুর পাবার উপায় ছিল না।

বাংলার স্থলতানরা (দু'একজন বাদে) নিজেদের রাজ্যে মন্দির ও মূর্তি ধ্বংস করার ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। হিন্দু প্রজা ও হিন্দু অমাত্য-কর্মচারীদের মনে অযথা আঘাত দিলে তার ফল ভাল হবে না মনে করেই সম্ভবত এঁরা এই ব্যাপারে মোটামুটিভাবে সাহষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছিলেন। বাংলার যে সমস্ত স্থানের নাম পৌত্তলিকতাগন্ধী, সেগুলির অধিকাংশই এই স্থলতানদের আমলে অপরিবর্তিত ছিল, তাদের মুসলমানী নাম দেওয়া হয়নি; এ ব্যাপারও এঁদের সহিষ্ণু মনোভাবেরই পরিচয় দেয়।

স্বাধীন স্থলতানদের আমলে, বিশেষভাবে হোসেন শাহী স্থলতানদের আমলে বাংলার মুসলিম জনসাধারণও যে ক্রমশ হিন্দুদের প্রতি বৈরভাব বিস্মৃত হচ্ছিলেন ও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার সূচনা দেখা দিচ্ছিল, তার প্রমাণ আছে। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র আদিখণ্ড সপ্তদশ পরিচ্ছেদে লেখা আছে যে তখন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে গ্রাম-সম্পর্ক স্থাপিত হত; নবদ্বীপের কাজী চৈতন্যদেবকে বলেছিল,

> গ্রাম-সম্বন্ধে (নীলাম্বর) চক্রবর্ত্তী হয় মোর চাচা।
> দেহ-সম্বন্ধ হৈতে হয় গ্রাম-সম্বন্ধ সাঁচা॥
> নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা।
> সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলার মুসলমানরা যে হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ রামায়ণ ও মহাভারতের রস ব্যাপকভাবে আস্বাদন করত, তার প্রমাণ আছে। বৃন্দাবনদাস 'চৈতন্যভাগবতে' লিখেছেন,

> যেন সীতা হারাইয়া শ্রীরঘুনন্দনে।
> নির্ভরে শুনিলে তাহা কান্দয়ে যবনে॥

(চৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড, ৩য় অধ্যায়)

এবং

যবনেহ যার কীর্ত্তি শ্রদ্ধা করি শুনে
ভজ হেন রাঘবেন্দ্র প্রভুব চরণে ॥

(চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়)

কবীন্দ্র পরমেশ্বর কর্তৃক হোসেন শাহের রাজত্বকালে রচিত বাংলা মহাভারত যে বাংলার মুসলমানদের ঘরে ঘরে পড়া হত, তা ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে সৈয়দ সুলতান লিখে গিয়েছেন। তিনি লিখেছেন,

লস্কর পরাগল খান আজ্ঞা শিরে ধরি।
কবীন্দ্র ভারত-কথা কহিল বিচারি ॥
হিন্দু মুসলমান তাএ ঘরে ঘরে পড়ে।

(মাসিক মোহাম্মদী, শ্রাবণ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৭০৯)

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সুনিবিড় বন্ধন স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু এর সূচনা স্বাধীন সুলতানদের আমলেই হয়েছিল বললে ভুল হবে না।

দশম অধ্যায়

স্বাধীন সুলতানদের আমলে বাংলার শাসন-ব্যবস্থা ও সামরিক ব্যবস্থা

১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে বখতিয়ার খিলজী বাংলায় প্রথম মুসলিম রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। এই মুসলিম রাজ্যের নাম হয় 'লখনৌতি'। রাজ্যটি অনেকগুলি 'ইক্তা' অর্থাৎ প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত ছিল।[১] বলবনের বংশধররা যখন এদেশের অধিপতি হন, তখন তাঁরা 'লখনৌতি' রাজ্যের নাম দেন 'ইক্‌লীম্' লখনৌতি' এবং একে অনেকগুলি 'ইক্তা'য় বিভক্ত করেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গের যে অংশ তাঁদের রাজ্যভুক্ত ছিল, তাঁর নাম তাঁরা দিয়েছিলেন 'অর্‌সহ্‌ বঙ্গালহ্‌'।[২] এরপর যখন মুহম্মদ তোগলক বাংলাদেশ জয় করলেন, তখন তিনি তাকে লখনৌতি, সোনারগাঁও ও সাতগাঁও—এই তিনটি 'ইক্তা'য় বিভক্ত করলেন।'[৩]

স্বাধীন সুলতানদের আমলে (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রীঃ) এই ব্যবস্থার খানিকটা পরিবর্তন সংঘটিত হল। তাঁদের আমলে সমগ্র বাংলাদেশ 'লখনৌতি' নামে পরিচিত না হয়ে 'বঙ্গালহ্‌' নামে পরিচিত হতে লাগল, রাজ্যের প্রশাসনিক বিভাগগুলি 'ইক্তা'র বদলে 'ইক্‌লীম্' নামে অভিহিত হতে লাগল, 'ইক্‌লীম্'-এর উপবিভাগগুলি 'অর্‌সহ্‌' নামে অভিহিত হল।[৪] সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে রাজ্যের উপবিভাগগুলিকে 'মুলুক' বলা হয়েছে।[৫] বোধহয় 'অরসহ্‌'র ও উপবিভাগ ছিল এবং তার নাম ছিল 'মুলুক' (মুল্‌ক্)। কোন কোন প্রাচীন বাংলা গ্রন্থে আবার মুলুকেরও একটি উপবিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়, তার নাম 'তক্‌সিম্'।[৬]

এই আমলে দুর্গহীন শহরকে বলা হত 'কশ্‌বাহ্‌' এবং দুর্গযুক্ত শহরকে বলা হত 'খিট্টাহ্‌'; সীমান্ত রক্ষার ঘাঁটিকে বলা হত 'থানা'; 'বঙ্গালহ্‌' রাজ্য অনেকগুলি রাজস্ব-অঞ্চলে বিভক্ত ছিল, এই অঞ্চলগুলি 'মহল' নামে পরিচিত ছিল, কয়েকটি 'মহল' নিয়ে এক একটি 'শিক' গঠিত হত; 'শিকদার' নামক কর্মচারীরা এদের ভারপ্রাপ্ত হতেন।[৭] রাজস্ব দু'ধরনের হত, 'গনীমাহ্‌' অর্থাৎ লুণ্ঠনলব্ধ অর্থ এবং খরজ অর্থাৎ খাজনা; সাধারণত যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে

১ J. A. S. P. Vol. III, 1958, pp. 67-68 ২ Ibid, pp. 72-73 f.n. ৩ Ibid, p. 75 ৪ Ibid, pp. 86-89 ৫ বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ২২৮ ৬ বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ২৪০ ৭ J. A. S. P., Vol., III 1958, pp. 89-90

লুঠ করে যে অর্থ সংগ্রহ করা হত, তার পাঁচভাগের চারভাগ সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বন্টিত হত এবং বাকী এক ভাগ 'গনীমাহ্'-রূপে রাজকোষে জমা হত।[৮] 'খরজ' এক বিচিত্র পদ্ধতিতে সংগৃহীত হত। সুলতান বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে 'মোকতা' করতেন অর্থাৎ ঐ অঞ্চলের (ইক্তার) 'খরজ' সংগ্রহের ভার দিতেন—যেমন হোসেন শাহ হিরণ্য ও গোবর্ধন মজুমদারকে সপ্তগ্রাম মুলুকের 'খরজ' সংগ্রহের ভার দিয়েছিলেন। সপ্তগ্রাম মুলুক থেকে বিশ লক্ষ টাকা খাজনা সংগৃহীত হত। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদার তার থেকে হোসেন শাহকে বারো লক্ষ টাকা দিতেন এবং বাকী আট লক্ষ টাকা নিজেদের আইনসঙ্গত প্রাপ্য হিসাবে গ্রহণ করতেন।[৯] সুলতানের প্রাপ্য টাকা নিয়ে যাবার জন্য রাজধানী থেকে যে সব কর্মচারী আসত, তাদের 'আরিন্দা' বলা হত।[১০] সুলতানের রাজস্ব-বিভাগের প্রধান কর্মচারীর উপাধি ছিল 'সর্-ই-গুমাশ্তাহ্'।[১১] জলপথে যে সব জিনিস আসত, সুলতানের কর্মচারীরা তাদের উপর শুল্ক আদায় করতেন;[১২] যে সব ঘাটে এই শুল্ক আদায় করা হত, তাদের বলা হত 'কুতঘাট'।[১৩] বিভিন্ন শহরে ও নদীর ঘাটে সুলতানের বহু কর্মচারী রাজস্ব আদায়ের জন্য নিযুক্ত ছিল; সে যুগে 'হাটকর', 'ঘাটকর', 'পথকর' প্রভৃতি করও ছিল বলে মনে হয়; তখন কোন কোন জিনিষ অবাধে উড়িষ্যা থেকে বাংলায় নিয়ে আসা যেত না, যেমন চন্দন; এ সব জিনিস আনলে দু'দিকেই মোটা শুল্ক দিতে হত।[১৪] আলোচ্য যুগে বাংলার অমুসলমানদের কাছ থেকে জিজিয়া কর আদায় করা হত বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

রাজ্যের শাসনব্যবস্থায়, বলা বাহুল্য, সুলতানের স্থান ছিল সবচেয়ে উঁচুতে। সুলতান ছিলেন স্বাধীন ও সর্বশক্তিমান। তিনি যে প্রাসাদে বাস করতেন, তার আয়তন ছিল বিরাট; সেখানে প্রশস্ত দরবার-ঘরে তাঁর সভা বসত।[১৫] শীতকালে কখনও কখনও উন্মুক্ত অঙ্গনে সুলতানের সভা বসত।[১৬] সভায় সুলতানের পাত্রমিত্রসভাসদেরা উপস্থিত থাকতেন।

৮ J. A. S. P., Vol. III, 1958, pp. 90-91 ৯ বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ৩৭৮ ১০ বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ৩৭৮-৭৯ ১১ J. A. S. P., Vol. III, 1958, p. 92 ১২ J. A. S. P., Vol. III, 1958, p. 92 ১৩ বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থে শব্দটি পাওয়া যায়। ১৪ J. A. S. P., Vol. III, 1958, p. 92 এবং 'চৈতন্যচরিতামৃত', মধ্যলীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। ১৫ চীনা গ্রন্থ 'শিং-ছা-শ্যং-লান' থেকে এই তথ্য জানা যায়; বর্তমান গ্রন্থ, ১১শ অধ্যায় দ্রঃ। ১৬ কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী থেকে এই তথ্য জানা যায়, বর্তমান গ্রন্থ ১১শ অধ্যায় দ্রঃ।

সুলতানের প্রাসাদে 'হাজিব', 'সিলাহ্‌দার', 'শরাবদার', 'জমাদার' ও 'দরবান' প্রভৃতি কর্মচারীরা থাকতেন। 'হাজিব'রা সভার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন; 'সিলাহ্‌দার'রা সুলতানের বর্ম বহন করতেন; 'শরাবদার'রা সুলতানের সুরাপানের ব্যবস্থা করতেন; 'জমাদার'রা ছিলেন তাঁর পোষাকের তত্ত্বাবধায়ক এবং 'দরবান'রা প্রাসাদের ফটকে পাহারা দিত।[১৭] এ ছাড়া সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে 'ছত্রী' নামক এক শ্রেণীর রাজকর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়, এঁরা হয় উৎসব-অনুষ্ঠানের সময়ে সুলতানের ছত্র ধারণ করতেন, না হয় সুলতানের দেহরক্ষী ছিলেন।[১৮] সুলতানের চিকিৎসকরা সাধারণত বৈদ্যজাতীয় হিন্দু হতেন, তাঁদের উপাধি হত 'অন্তরঙ্গ'।[১৯] কয়েকজন সুলতানের হিন্দু সভাপণ্ডিতও ছিল।[২০] সুলতানের প্রাসাদে অনেক ক্রীতদাস থাকত। এরা সাধারণত খোজা অর্থাৎ নপুংসক হত।

সুলতানের অমাত্য ও সভাসদবর্গ ও অন্যান্য অভিজাত রাজপুরুষগণ 'আমীর', 'মালিক' প্রভৃতি অভিধায় ভূষিত হতেন। এঁদের ক্ষমতা নিতান্ত অল্প ছিল না, বহুবার এঁদের ইচ্ছায় বিভিন্ন সুলতানের সিংহাসনলাভ ও সিংহাসনচ্যুতি ঘটেছে। কোন সুলতানের মৃত্যুর পর তাঁর ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারীর সিংহাসনে আরোহণের সময়ে সম্ভবত আমীর, মালিক ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দরকার হত।[২১] রাজ্যের বিশিষ্ট পদাধিকারীরা 'ওয়াজীর' (উজীর) আখ্যা লাভ করতেন। 'ওয়াজীর' (উজীর) বলতে সাধারণত মন্ত্রী বোঝায়, কিন্তু আলোচ্য সময়ে বাংলার অনেক সেনানায়ক এবং আঞ্চলিক শাসনকর্তাও 'ওয়াজীর' আখ্যা লাভ করেছেন দেখতে পাই।[২২] যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে বাংলার সীমান্ত অঞ্চলে সামরিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হত। সামরিক শাসনকর্তাদের 'লস্কর-ওয়াজীর' বলা হত, কখনও কখনও শুধু 'লস্কর'-ও বলা হত।[২৩] সুলতানদের প্রধান মন্ত্রীরা (অন্তত কেউ কেউ) 'খান-ই-জহান' উপাধি লাভ করতেন; প্রধান আমীরকে বলা হত 'আমীর-উল-উমারা'।[২৪] সুলতানের মন্ত্রী, অমাত্য,

১৭ J. A. S. P., Vol. III, 1958, pp. 79-80 ১৮ বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ৩৭২-৩৭৩ ১৯ বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ২০১ ২০ রায়মুকুট বৃহস্পতি মিশ্রের 'রাজপণ্ডিত' উপাধি ছিল, কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীতে গৌড়েশ্বরের মুকুন্দ নামে একজন পণ্ডিতের উল্লেখ পাই। ২১ বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ, ৯৮ ২২ J. A. S. P. Vol, III, 1958, p. 83 ২৩ বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ৩৫৬ ২৪ 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা ও 'রিয়াজ উস-সলাতীন' এবং বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ২৪০ দ্রঃ।

ও পদস্থ কর্মচারীরা 'খান মজলিস', 'মজলিস অল-আলা', 'মজলিস-অল-আজম', 'মজলিস অল-মুআজ্জম', 'মজলিস অল-মজালিস', 'মজলিস-বারবক' প্রভৃতি উপাধি লাভ করতেন ; সুলতানের সেক্রেটারীদের বলা হত 'দবীর' ; প্রধান সেক্রেটারীকে 'দবীর খাস' (দবীর-ই-খাস) বলা হত।[২৫]

আলোচ্য যুগের সামরিক ব্যবস্থা সম্বন্ধেও কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন সুলতান স্বয়ং। বিভিন্ন অভিযানের সময়ে যে সব বাহিনী প্রেরিত হত, তাদের অধিনায়কদের 'সর-ই-লস্কর' বলা হত। সৈন্যবাহিনী চার ভাগে বিভক্ত ছিল—হাতীসওয়ার, ঘোড়সওয়ার, পদাতিক এবং নৌবহর। বাংলার পদাতিকদের বিশিষ্ট নাম ছিল 'পাইক', এরা এ দেশেরই লোক ; এরা খুব ভাল যুদ্ধ করত।[২৬]

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিক পর্যন্ত বাংলার সৈন্যেরা প্রধানত তীর-ধনুক দিয়ে যুদ্ধ করত। এ ছাড়া তারা বর্শা, বল্লম ও শূল প্রভৃতি অস্ত্রও ব্যবহার করত। শর ও শূল ক্ষেপণের যন্ত্রের নাম ছিল যথাক্রমে "আরাদা" ও "মঞ্জালিক"। সম্ভবত পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে বাংলার সৈন্যেরা কামান ব্যবহার করতে শেখে এবং ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই তারা কামান চালানোর দক্ষতার জন্য দেশ-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করে।[২৭]

বাংলার সৈন্যবাহিনীতে দশ জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে এক একটি দল গঠিত হত ; তাদের নায়কের উপাধি ছিল 'সর-ই-খেল' ; বাংলার নৌবহরের অধিনায়ককে বলা হত 'মীর বহ্‌র্'।[২৮] বাংলার স্থলবাহিনীর প্রধান শক্তি ছিল হাতী ; সে সময়ে বাংলার মত এত ভাল হাতী ভারতবর্ষের আর কোথাও পাওয়া যেত না।[২৯] সৈন্যেরা তখন নিয়মিত বেতন ও খাদ্য পেত। সৈন্যবাহিনীর বেতনদাতার উপাধি ছিল 'আরিজ-ই-লস্কর'।[৩০]

আলোচ্য সময়ের বিচারব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কাজীরা বিভিন্ন স্থানে বিচারের জন্য নিযুক্ত থাকতেন এবং তাঁরা ঐস্লামিক বিধান অনুসারে বিচার করতেন, এইটুকু মাত্র জানা যায়। কোন কোন সুলতান নিজেই কিছু কিছু মামলার বিচার করতেন।[৩১]

---

[২৫] J. A. S. P., Vol. III, 1958, pp. 83-84 এবং বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ২৮৪-৮৫, পৃঃ ৩৬৫-৭০ দ্রঃ। [২৬] J. A. S. P., Vol. III, 1958, pp. 95-96 [২৭] বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ৪৯ ও ৪২১ দ্রঃ [২৮] J. A. S. P. Vol. III, 1958, p. 97 [২৯] Ibid, pp. 97-98 [৩০] বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ৩ [৩১] বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ২১৪ দ্রঃ।

অপরাধীদের জন্য যে সব শাস্তির ব্যবস্থা ছিল, তাদের মধ্যে প্রধান ছিল বাঁশের লাঠি দিয়ে প্রহার ও নির্বাসন।[৩২] কোন মুসলমান হিন্দুর দেবতার নাম করলে তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হত এবং কখনও কখনও বিভিন্ন বাজারে নিয়ে গিয়ে তাকে বেত্রাঘাত করা হত।[৩৩] সুলতানদের "বন্দিঘর" অর্থাৎ কারাগারও ছিল। কখনও কখনও হিন্দু জমিদারদের সেখানে আটক করে রাখা হত বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।[৩৪] সুলতানের কোন কর্মচারী তাঁর বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করলে সুলতান তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতেন।[৩৫] নরহত্যার জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত কিনা, তা জানা যায় না ; যতদূর মনে হয় নরহত্যার ক্ষেত্রে সাধারণ ঐস্লামিক আইনই প্রযুক্ত হত।

স্বাধীন সুলতানদের আমলে বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থায় শুধু মুসলমানরা নয়, হিন্দুরাও গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করতেন। তাঁরা অনেক সময়ে মুসলমান কর্মচারীদের উপরে 'ওয়ালি' অর্থাৎ প্রধান তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত হতেন ; বাংলার সুলতানদের মন্ত্রী, সেক্রেটারী, এমনকি সেনাপতির পদেও অনেক হিন্দু নিযুক্ত হয়েছেন।[৩৬]

---

৩২ J. A. S. P., Vol. III, 1958, p 101 ৩৩ বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ২২৪-২৮ ৩৪ বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ২২৭-৩৮ ৩৫ J. A. S. P., Vol. III, 1968, p. 100 ৩৬ বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ৮৩, ১৬০, ২০১-০৫, ৩৬৩-৮৩ দ্রঃ।

একাদশ অধ্যায়

সমসাময়িক দৃষ্টিতে এ' যুগের বাংলাদেশ

আগের পরিচ্ছেদগুলিতে ১৩৩৮ থেকে সুরু করে ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। বর্তমান পরিচ্ছেদে আমরা এই সময়কার বাংলাদেশের যে চিত্র সমসাময়িক সূত্রগুলিতে পাওয়া যায়, তা সংকলন করব।

এই সব সমসাময়িক সূত্রকে নিম্নোক্ত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে।

(ক) বিদেশীর লেখা বিবরণ

(খ) শাস্ত্রগ্রন্থ

(গ) সাহিত্যগ্রন্থ

এই সূত্রগুলি নানা ভাষায় লেখা। বর্তমান পরিচ্ছেদে আমরা কালানুক্রমিক রীতি অনুসরণ করে এই সব সূত্র থেকে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করব।

(১) ইব্‌ন্ বত্তুতার বিবরণ

আলোচ্য যুগের বাংলাদেশ সম্বন্ধে বিদেশীর লেখা যে সমস্ত সমসাময়িক বিবরণ পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন মুর পর্যটক ইব্‌ন্ বত্তুতার 'রেহ্‌লা' (ভ্রমণ-বিবরণী)। ইব্‌ন্ বত্তুতা বাংলাদেশের যে অংশে ভ্রমণ করেন, তার সুলতান সে সময়ে ছিলেন ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ। ইব্‌ন্ বত্তুতা ঠিক কোন্ সময়ে বাংলাদেশে এসেছিলেন, তা তিনি স্পষ্ট করে লেখেন নি। তবে তা অনুমান করা কঠিন নয়। ইব্‌ন্ বত্তুতা লিখেছেন যে তিনি ৭৪৫ হিঃর ১৫ই রবী উল-আখির (২৬শে আগস্ট, ১৩৪৪ খ্রীঃ) তারিখে মুলুক ত্যাগ করে সিংহলের দিকে যাত্রা করেন এবং ৭৪৮ হিঃর মহরম মাসে (এপ্রিল, ১৩৪৭ খ্রীঃ) ধোফর (জফার) পৌঁছোন। এই দুই তারিখের মাঝখানে তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করেন, বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম এবং ইব্‌ন্ বত্তুতার বাংলাদেশে পরিভ্রমণ ধোফর বা জফারে পৌঁছোনোর কয়েক মাস আগেকার ঘটনা। সুতরাং ইব্‌ন্ বত্তুতা ১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে ভ্রমণ করেছিলেন বলে

অনুমান করা যায়। ইব্‌ন্ বত্তুতার অস্পষ্ট সময়-নির্দেশ থেকে মনে হয়, ১৩৪৬ খ্রীঃর শেষ দিকে শীতকালে তিনি বাংলায় এসেছিলেন। কর্ণেল য়ুল মনে করেন, তারও এক বছর আগে অর্থাৎ ১৩৪৫-৪৬ খ্রীঃর গোড়ার দিকে ইব্‌ন্ বত্তুতা বাংলায় আসেন। মাহ্‌দী হোসেনের মতে ইব্‌ন্ বত্তুতা ১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের মত সময়ে বাংলাদেশে এসেছিলেন। শেষোক্ত মত গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। যাহোক্, ইব্‌ন্ বত্তুতা যে ১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় এসেছিলেন, তাতে সংশয়ের কোন কারণ নেই।

ইব্‌ন্ বত্তুতা শুধু বাংলাদেশেই আসেন নি, আসামের কামরূপ অঞ্চলেও গিয়েছিলেন। বাংলা ও আসাম ভ্রমণের বিবরণ তিনি একসঙ্গেই দিয়েছেন। নীচে আমরা ঐ বিবরণ উদ্ধৃত করলাম।

"বাংলা একটি বিরাট দেশ। এখানে প্রচুর পরিমাণে চাল উৎপন্ন হয়। সারা পৃথিবীতে আমি এমন একটিও দেশ দেখিনি, যেখানে বাংলাদেশের চেয়ে জিনিসপত্রের দাম সস্তা। যাহোক্, বাংলাদেশ স্যাঁতসেঁতে, খুরাসানিরা (অর্থাৎ বিদেশীরা) একে বলে 'সম্পদে ভরা নরক'। আমি বাংলাদেশের রাস্তায় দেখেছি, এক রূপোর দিনার[১], যা আট দিরহামের সমান, তার বিনিময়ে দিল্লীর ২৫ রৎল্[২] ওজনের চাল বিক্রী হচ্ছে, ভারতবর্ষের এক দিরহামের মূল্য (মিশর ও সিরিয়ার) একটি রূপোর দিরহামের সমান, দিল্লীর রৎলের ওজন মরক্কোর কুড়ি রৎলের সমান। আমি শুনেছি যে বাংলার লোকেরা মনে করে তাদের দেশে ঐটাই চড়া দর। মরক্কোর লোক ধার্মিক প্রকৃতির মুহম্মদ-উল-মশমূদী ছিলেন এই দেশের একজন পুরোনো বাসিন্দা, দিল্লীতে আমার কাছে থাকার সময়ে তাঁর মৃত্যু হয় : তিনি আমায় বলেছিলেন যে তিনি, তাঁর স্ত্রী এবং একজন চাকর—এই তিনজনের এক বছরের উপযোগী জিনিস তিনি আট দিরহামেই কিনতেন এবং খোসা সমেত চাল (ধান) তিনি কিনতেন আট দিরহামে দিল্লীর আশী রৎল্ দরে। (ঐ ধান) ভেঙে পাক্কা পঞ্চাশ রৎল্ চাল পাওয়া যেত, পঞ্চাশ রৎল্ মানে দশ কিন্‌টার। আমি সেখানে (বাংলাদেশে) তিনটি রূপোর দিনারে একটি দুগ্ধবতী গাভী বিক্রী হতে দেখেছি ; এই সব অঞ্চলে গরুর কাজ মহিষ দিয়েও চালানো হয়। আমি সেখানে এক দিরহামে আটটি দরে হৃষ্টপুষ্ট মুরগী বিক্রী হতে এবং এক দিরহামে

---

১ "রূপোর দিনার" এবং "টঙ্কা" (টাকা) সমার্থক। ২ দিল্লীর এক রৎল্=বর্তমান যুগের ১৪ সের।

পনেরোটি দরে বাচ্ছা পায়রা বিক্রী হতে দেখেছি। একটি পরিপুষ্ট মেষশাবক দুই দিরহাম দামে বিক্রী হতে দেখেছি ; (বাংলায়) চার দিরহামে এক রৎল্ চিনি পাওয়া যেত—রৎলের ওজন দিল্লীর মান অনুযায়ী। এছাড়া, এক রৎল্ গোলাপ-জল পাওয়া যেত আট দিরহামে, এক রৎল্ ঘী চার দিরহামে এবং এক রৎল্ তিল (seasame) তেল দুই দিরহামে। সবচেয়ে মিহি পাৎলা এক থান কাপড় আমি দুই দিনারে ত্রিশ হাত দরে বিক্রী হতে দেখেছি। একটি সুন্দরী ক্রীতদাসী বালিকা—যে উপপত্নী হতে সমর্থ—তার দাম এক সোনার দিনার, যা মরক্কোর আড়াই সোনার দিনারের সমান। এই দরে আমি অশূরা নামে অত্যন্ত সুন্দরী একটি ক্রীতদাসী বালিকাকে ক্রয় করলাম। আমার একজন সঙ্গী লূল্ নামে একটি অল্পবয়স্ক সুদর্শন বালককে দুই সোনার দিনার দামে কিনলেন।

"বাংলাদেশের প্রথম যে শহরে আমরা প্রবেশ করলাম, তা হল সোদকাওয়াঙ্।[১] এটি মহাসমুদ্রের তীরে অবস্থিত একটি বিরাট শহর, এরই কাছে গঙ্গা নদী—যেখানে হিন্দুরা তীর্থ করেন—ও যমুনা নদী একসঙ্গে মিলেছে এবং সেখান থেকে প্রবাহিত হয়ে তারা সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। গঙ্গা নদীর তীরে[২] অসংখ্য জাহাজ ছিল, সেইগুলি দিয়ে এরা (সোদকাওয়াঙের লোকেরা) লখ্নৌতির লোকেদের সঙ্গে যুদ্ধ করে।

বাংলার সুলতান

"ইনি সুলতান ফখরুদ্দীন, ডাকনাম ফখ্রা। গুণী রাজা ইনি। বিদেশীদের, বিশেষত ফকীর ও সুফীদের ইনি ভালবাসেন। বাংলা-রাজ্যের মালিক আসলে ছিলেন সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবনের পুত্র সুলতান নাসিরুদ্দীন। এঁর পুত্র মুইজুদ্দীন দিল্লীর সম্রাট হন। তারপর নাসিরুদ্দীন তাঁর পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য যাত্রা করেন। তাঁরা গঙ্গা নদীর উপরে[৩] পরস্পরের সম্মুখীন হন। তাঁদের সাক্ষাৎকার 'লিকা-উস্-সদাইন' ('দুটি শুভ তারার সাক্ষাৎকার') নাম দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। আমরা আগেই এর বিবরণ দিয়েছি

---

১ "সোদকাওয়াঙ্"=চট্টগ্রাম। এ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ৭ দ্রষ্টব্য।

২ ইব্‌ন্ বতুতা এখানে কর্ণফুলী নদীকে ভুল করে "গঙ্গা" বলেছেন বলে মনে হয়।

৩ আসলে সরযূ নদী।

এবং বলেছি কীভাবে নাসিরুদ্দীন তাঁর পুত্রের পক্ষে দিল্লীর সিংহাসন ত্যাগ করলেন এবং বাংলাদেশে ফিরে এসে আমরণকাল সেখানেই রইলেন। এরপর তাঁর (নাসিরুদ্দীনের) পুত্র শামসুদ্দীন[৪] সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তিনিও মারা গেলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন তাঁর পুত্র শিহাবুদ্দীন; তাঁকে তাঁর ভাই গিয়াসুদ্দীন বহাদুর বূর কালক্রমে পরাস্ত করলেন। শিহাবুদ্দীন সুলতান গিয়াসুদ্দীন তোগলকের সাহায্য ভিক্ষা করলেন, তিনি তাঁকে সাহায্য করলেন এবং বহাদুর বূরকে বন্দী করলেন। সুলতান গিয়াসুদ্দীনের পুত্র মুহম্মদ সিংহাসনে আরোহণ করে বহাদুর বূরকে মুক্ত করে দিলেন, তিনি (বহাদুর বূর) তাঁর (মুহম্মদ তোগলকের) সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করতে সম্মত হলেন। কিন্তু তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলেন। সুলতান মুহম্মদ তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁকে বধ করলেন এবং তাঁর ধর্ম-ভ্রাতাকে[৫] এই প্রদেশ শাসনের ভার দিলেন; কিন্তু তাঁকে সৈন্যেরা বধ করল। তখন আলী শাহ—যিনি লখ্‌নৌতিতে ছিলেন—বাংলার শাসনক্ষমতা হস্তগত করলেন। যখন ফখরুদ্দীন দেখলেন যে সুলতান নাসিরুদ্দীনের বংশের রাজত্ব শেষ হয়েছে, তখন তিনি তাঁদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের[৬] জন্য সোদকাওয়াঙে ও বাংলার অবশিষ্ট অংশে বিদ্রোহ করলেন। কিন্তু আলী শাহের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ বেধে গেল। শীতকালে এবং বর্ষার কাদার মধ্যে ফখরুদ্দীন জলপথে লখ্‌নৌতি আক্রমণ করতেন, কারণ জলে তিনি শক্তিশালী ছিলেন। কিন্তু শুষ্ক ঋতু (গ্রীষ্ম) এলে আলী শাহ স্থলপথে বাংলাদেশ আক্রমণ করতেন, কারণ স্থলে তিনিই ছিলেন শক্তিশালী।

কাহিনী

"ফকীরদের প্রতি সুলতান ফখরুদ্দীনের শ্রদ্ধা এত গভীর ছিল যে তিনি শায়দা নামে একজন ফকীরকে সোদকাওয়াঙে তাঁর নায়েব (প্রতিনিধি) নিযুক্ত করেছিলেন। তারপর সুলতান ফখরুদ্দীন তাঁর এক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য যাত্রা করেন। কিন্তু শায়দা নিজে স্বাধীন হবার মৎলব করে তাঁর বিরুদ্ধে

৪ শামসুদ্দীন (ফিরোজ শাহ) নাসিরুদ্দীনের পুত্র নন। বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ৮ দ্রষ্টব্য।
৫ বহ্‌রাম খান। এঁর স্বাভাবিক মৃত্যুই হয়েছিল। ৬ এই উক্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ আছে। বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ৮-৯ দ্রষ্টব্য।

বিদ্রোহ করে বসল। সে সুলতান ফখরুদ্দীনের পুত্রকে হত্যা করল; এইটি ছাড়া সুলতানের আর কোন পুত্র ছিল না। খবর শুনে সুলতান তাঁর রাজধানীতে ফিরে এলেন। শায়দা এবং তার সমর্থকরা দুর্ভেদ্য ঘাঁটি সুনার-কাওয়াঙ (সোনারগাঁও) নগরে পালিয়ে গেল। সুলতান ঐ স্থান অবরোধ করবার জন্য এক সৈন্যবাহিনী পাঠালেন। সেখানকার অধিবাসীরা নিজেদের জীবনের ভয়ে শায়দাকে ধরে সুলতানের সৈন্যবাহিনীর কাছে পাঠিয়ে দিল। সুলতানের কাছে এ খবর গেল। তিনি বিদ্রোহীর মাথা পাঠিয়ে দিতে আদেশ করলেন। আমি যখন সোদকাওয়াঙে গিয়েছিলাম, তার সুলতানকে আমি দেখিনি, তাঁর সঙ্গে আলাপও করিনি, কারণ তিনি ভারতবর্ষের সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন এবং তা (ফখরুদ্দীনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার) করলে তার ফল কী হবে, সে সম্বন্ধে আমার ভয় ছিল। আমি সোদকাওয়াঙ ত্যাগ করে কামরু (কামরূপ) পর্বতমালার দিকে রওনা হলাম। সেখান (সোদকাওয়াঙ) থেকে ঐ জায়গায় যেতে এক মাস সময় লাগে। কামরু পর্বত-মালা বিরাট ও বিস্তীর্ণ, চীন থেকে তিব্বত পর্যন্ত প্রসারিত। সেখানে কস্তুরী মৃগ পাওয়া যায়। এই সব পাহাড়ের অধিবাসীদের সঙ্গে তুর্কীদের মিল আছে। এদের পরিশ্রমসাধ্য কাজ করার শক্তি অসাধারণ। তাদের জাতের একজন ক্রীতদাস অন্য জাতের অনেকজন ক্রীতদাসের সমকক্ষ। তারা যাদু এবং ভোজবাজীতে দক্ষতা ও অনুরাগের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। আমার এই পর্বতমালাতে যাবার উদ্দেশ্য ছিল একজন সন্তকে দর্শন করা। তিনি ঐখানেই বাস করছিলেন। তাঁর নাম শেখ জলালুদ্দীন তব্রিজী।

শেখ জলালুদ্দীন

"এই শেখ ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ সন্ত, তাঁর ব্যক্তিত্ব অনন্যসাধারণ। তাঁর 'কেরামৎ' (অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ) এবং মহৎ কাজগুলি জনসাধারণের কাছে সুপরিচিত। তাঁর বয়স খুব বেশী। তিনি আমাকে বলেছিলেন—ভগবান তাঁকে দয়া করুন—যে খলিফা অল- মুস্তাশিম্ বিল্লাহ্ অল-আব্বাসীকে তিনি বাগদাদে দেখেছিলেন এবং তাঁর হত্যাকাণ্ডের সময়ে তিনি উপস্থিত ছিলেন। তাঁর অনুচরেরা আমায় পরে বলেছিলেন যে তিনি একশো পঞ্চাশ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। চল্লিশ বছর ধরে তিনি উপবাস করেছিলেন, পর পর দশ দিন অনশনে অতিবাহিত করার আগে কোন উপবাসই তিনি ভঙ্গ করতেন

না। তাঁর একটি গরু ছিল, তার দুধ খেয়ে তিনি উপবাস ভাঙতেন। তিনি সারারাত্রি খাড়া থেকে প্রার্থনা করতেন। তিনি ছিলেন ক্ষীণদেহ, দীর্ঘকায় এবং বিরলশ্মশ্রু। এইসব পর্বতের অধিবাসীরা তাঁরই কাছে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিল। এই কারণেই তিনি এদের মধ্যে বাস করতেন।[৭]

*

"শেখ জলালুদ্দীনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি হবঙ্ক শহরে গেলাম। (বাংলার) সবচেয়ে সুন্দর ও গৌরবপূর্ণ শহরগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। একটি নদীর উপর দিয়ে এখানে যেতে হয়। সেটি কামরু পর্বতমালা থেকে বেরিয়েছে। তার নাম 'নীল নদী' (নহ্‌র্‌-উল্‌-অজ্‌রক্‌)। বাংলা এবং লখ্‌নৌতিতে যাবার পথ এই নদী দিয়ে। এই নদীর ডান ও বাঁ দুই তীরেই জলের চাকী, বাগান এবং গ্রাম আছে, মিশরের নীল নদের তীরে যেমন আছে। হবঙ্কের অধিবাসীরা কাফের। তারা 'জিম্মা'র (রক্ষণব্যবস্থার) অধীন। তাদের উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক (সরকার কর্তৃক) নিয়ে নেওয়া হয়। তা ছাড়াও তাদের কোন কোন কর দিতে হয়। পনেরো দিন ধরে এই নদীতে নৌকো বেয়ে আমরা অনেক গ্রাম ও ফলের বাগান পার হলাম। (মনে হচ্ছিল) আমরা যেন বাজারের উপর দিয়ে যাচ্ছি। সেখানে (নদীতে) অসংখ্য নৌকা আছে। প্রত্যেক নৌকায় একটা করে ঢোল আছে। যখন দু'টি নৌকা সামনাসামনি আসে, দু'দলই নিজেদের ঢোল বাজায়। এইভাবে মাঝিরা পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময় করে। পূর্বোক্ত সুলতান ফখরুদ্দীন আদেশ দিয়েছেন যে এই নদীতে ফকীরদের কাছ থেকে কোন ভাড়া আদায় করা হবে না এবং যাদের কিছু নেই, তাদের খাবার দেওয়া হবে। তদনুসারে, এই শহরে কোন ফকীর এলে তাকে আধ দীনার দেওয়া হয়।

"আমরা যে বর্ণনা দিলাম, সেইভাবে পনেরো দিন ধরে নদীপথে চলবার পর আমরা 'সুনারকাওয়াঙ' (সোনারগাঁও) শহরে পৌছোলাম। এই শহরের অধিবাসীরাই শায়দা নামক ফকীর এখানে আশ্রয় নিলে তাকে বন্দী করেছিল।

---

[৭] এর পর ইব্‌ন্‌ বত্তুতা শেখ জলালুদ্দীন তব্রিজীর "অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ"-এর বিবরণ দিয়েছেন। নিষ্প্রয়োজনবোধে এগুলি বাদ দেওয়া হল। ইব্‌ন্‌ বত্তুতা সত্যই শেখ জলালুদ্দীন তব্রিজীকে দেখেছিলেন কিনা, সে বিষয়ে কোন কোন গবেষক সংশয় প্রকাশ করেছেন। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

এখানে পৌছে আমরা একটি 'জাঙ্ক' (চীনদেশের একধরনের বড় জাহাজ) দেখলাম।* সেটি সুমাত্রা যাবে। ঐ জায়গা (সুমাত্রা) এখান (সোনারগাঁও) থেকে চল্লিশ দিনের পথ। আমরা এই জাঙ্কে চড়লাম।"

(১) ওয়াংতা-ইউয়ানের বিবরণ

ইব্‌ন্ বতুতার গ্রন্থের সমসাময়িক একটি চীনা গ্রন্থেও আমরা বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাই। এই চীনা গ্রন্থটির নাম 'তাও-য়ি-চি-লিয়েহ্'[১] ; ১৩৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে এই গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল (T'oung Pao, 1915, p. 62 দ্রঃ)। এই গ্রন্থের লেখক ওয়াংতা-ইউয়ান চীনের ফু-কিয়েন প্রদেশের শুল্ক-বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন ; তিনি নিজে বাণিজ্য উপলক্ষে পৃথিবীর বহু স্থানে ভ্রমণ করেছেন এবং বিদেশী নাবিক ও বণিকদের কাছে আরও নানা স্থানের বিবরণ শুনেছেন ; 'তাও-য়ি-চি-লিয়েহ্' তে তিনি এই সব স্থানের বর্ণনা দিয়েছেন। এই গ্রন্থে প্রদত্ত বাংলাদেশের বর্ণনাটি নীচে উদ্ধৃত হল।

"এ দেশে পাঁচটি উচ্চ ও শিলাবন্ধুর পর্বতমালা এবং একটি গভীর অরণ্য আছে। লোকেরা (এ দেশে) বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে ছড়িয়ে বাস করে। সারা বছর তারা চাষ করে এবং বীজ বোনে, তাই পতিত জমি (এ দেশে) নেই। ক্ষেত্রগুলি খুবই শস্যসমৃদ্ধ। (এ দেশে) বছরে তিনবার ফসল ফলে। জিনিসপত্রের দাম মোটামুটিভাবে সস্তা ও মানানসই। প্রাচীনকালে এ দেশকে বলা হত হ্‌সিন্-তু-চৌফু (হিন্দুস্তানের) অধ্যক্ষালয় (prefecture)।

"এ দেশের আবহাওয়া সব সময়েই গরম থাকে। (এ দেশের) লোকদের আচারব্যবহার ও প্রথাপদ্ধতিগুলি পবিত্র ও ধর্মনিষ্ঠ। পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েই সূক্ষ্ম তুলার পাগড়ী এবং লম্বা আলখাল্লা পরে।

"(এ দেশের) সরকারী কর (আয়ের) দুই দশমাংশ। সরকার টং-কা নামে এক রকম মুদ্রা খোদাই করেন, এই মুদ্রার ওজন আট ক্যাণ্ডারীন (বা চীনা আউন্সের আট শতাংশ)। কেনাবেচার সময় এরা (বাংলার লোকেরা) কড়ি ব্যবহার করে। একটি ক্ষুদ্র মুদ্রার (অর্থাৎ টং-কার) সঙ্গে ১০,৫২০-র

* তখন কি সোনারগাঁও অবধি নদীপথে জাহাজ আসত ? ইব্‌ন্ বতুতা বোধহয় এখানে সোনারগাঁও ও চাটগাঁও-এর মধ্যে গোলমাল করে ফেলেছেন।

১ উচ্চারণ—'তাও-য়ি-ট্রি-লিয়েহ্'।

মত কড়ির বিনিময় হয়। জনসাধারণের পক্ষে এই মুদ্রা অত্যন্ত সুবিধাজনক। এদেশের উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আমাদের চীনদেশের মত তুলার বস্ত্র—যেমন পি-পু, কাও-নি-পু এবং তু লো-কিন; আর (উল্লেখযোগ্য দ্রব্য) মাছরাঙার পালক। বাণিজ্যের জন্য এইসব জিনিস ব্যবহৃত হয়—দক্ষিণের ও উত্তরের রেশম, রঙীন তফেতা, জায়ফল—নীল ও সাদা, সাদা চীনামাটির জিনিসপত্র, সাদা সুতা (বা ফিতা) এবং এই ধরনের আরও সব জিনিস।

"এই লোকগুলি (বাঙালীরা) নিজেদের গুণেই যাবতীয় শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। এর মূলে রয়েছে তাদের কৃষিকার্যের প্রতি অনুরাগ—যার ফলে তারা অবিরাম পরিশ্রম করে', চাষ করে' ও (শস্য) রোপণ করে' জঙ্গলে ঘেরা জমির উদ্ধার সাধন করেছে। স্বর্গের (আকাশের) বিভিন্ন ঋতু এই রাজ্যের উপরে পৃথিবীর সম্পদ ছড়িয়ে দিয়েছে; এখানকার লোকদের সম্পদ ও সততা বোধহয় চিউ-চিআং (পালেমবাং)-এর লোকদের চেয়ে বেশি এবং চাও-আর (জাভার) লোকদের সমান।"

যতদূর মনে হয়, এই বর্ণনা প্রধানত চট্টগ্রাম অঞ্চলের। চট্টগ্রামই সে সময় ছিল বাংলার বৃহত্তম বন্দর। চীনের নাবিক ও বণিকদের অধিকাংশই চট্টগ্রাম ভিন্ন বাংলার আর কোন স্থান দেখবার সুযোগ পেতেন না। ওয়াং-তা-ইউয়ান সম্ভবত চট্টগ্রাম অঞ্চলটুকুই দেখেছিলেন অথবা কারও কাছে তার বিবরণ শুনেছিলেন।

মা-হোয়ানের বিবরণ

সময়ের দিক দিয়ে—এর পরে উল্লেখযোগ্য আর একটি চীনা গ্রন্থ—মা-হোয়ানের 'য়িং-য়া শুং-লান'-এ প্রদত্ত বাংলা দেশের বিবরণ। ১৪০৯ এবং ১৪১২ খ্রীষ্টাব্দে চীন-সম্রাটের কাছ থেকে যে রাজপ্রতিনিধিদল বাংলার রাজার সভায় এসেছিলেন (এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ১৭৪-১৮১ দ্রষ্টব্য), মা-হোয়ান ছিলেন সেই দুই দলের দোভাষী। তাঁর 'য়িং-য়া-শুং-লান' গ্রন্থ ১৪২৫ থেকে ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়। এই গ্রন্থে মা-হোয়ান বাংলাদেশের যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন, তা আমরা নীচে উদ্ধৃত করছি। তবে এখানে একটি কথা বলার আছে। মা-হোয়ানের গ্রন্থের দু'টি বিভিন্ন সংস্করণ প্রচলিত আছে। একটি সংস্করণে প্রদত্ত বাংলা-সংক্রান্ত

বিবরণের অনুবাদ করেছিলেন রকহিল; ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের T'oung Pao পত্রিকায় (pp. 436-440) এই অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। আর একটি সংস্করণের বাংলা বিষয়ক অংশ ফিলিপ্‌স্ অনুবাদ করেন এবং ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের Journal of the Royal Asiatic Society (লণ্ডন) পত্রিকায় (pp. 529 543) এই অনুবাদ প্রকাশিত হয়। প্রথমে আমরা প্রথমোক্ত সংস্করণের বাংলা সংক্রান্ত অংশের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ দিচ্ছি।

"(বাংলা) দেশের আয়তন খুব বড়, লোকবসতিও অত্যন্ত ঘন এবং এর অগাধ ও প্রচুর ঐশ্বর্য। সু-মেন-তা-লা (সুমাত্রা) থেকে সমুদ্রপথে যাত্রা করলে প্রথমে একটি দ্বীপ এবং পরে ৎ-সুই-লন (নিকোবর) দ্বীপপুঞ্জ দেখা যায় এবং সেখান থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে যাত্রা করলে কুড়ি দিন বাদে চে-টি-কিআং (চাটগাঁও) তে উপস্থিত হওয়া যায়। এই জায়গাটি থেকে ছোট নৌকোয় চড়ে ৫০০ লি'র[১] মত দূর গেলে সো-না-উল্-কিআং (সোনার গাঁও)-তে পৌঁছোনো যায়। এই জায়গা থেকে বাংলার রাজধানীতে যেতে হয়। রাজধানীটি দেওয়াল দিয়ে ঘেরা, এর অনেকগুলি সহরতলী আছে। রাজার প্রাসাদ এবং ছোট বড় সমস্ত অমাত্যের প্রাসাদ শহরের মধ্যেই। তাঁরা সবাই মুসলমান।

"এ দেশের স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই গায়ের রং কালো, যদিও ফর্সা লোকও এদের মধ্যে হামেশাই দেখা যায়। পুরুষেরা মাথার চুল কেটে ফেলে এবং সাদা রঙের সুতীর পাগ্‌ড়ী মাথায় দেয়। তারা এক ধরনের লম্বা জামা পরে, তাতে গোল গ্রীবাবেষ্টনী লাগানো থাকে, সেটি জরীর পাড় দিয়ে আটকে রাখা হয়।

"রাজা এবং উচ্চপদস্থ অমাত্যেরা মুসলমানী কায়দার পোষাক ও টুপি পরেন। এই পোষাকগুলি খুব সুন্দর দেখতে। এখানে সর্বসাধারণের ব্যবহারের ভাষা বাংলা; অবশ্য কেউ কেউ ফারসী ভাষাতেও কথা বলেন।

"ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য এরা একরকম রৌপ্য-মুদ্রা ব্যবহার করে, তার নাম টং-কা, তার ওজন তিন ক্যাণ্ডারীন, পরিধি ১$\frac{২}{৫}$ ইঞ্চি এবং তার দু'দিকেই লেখা থাকে। এই দিয়ে এরা ওজন অনুসারে জিনিষপত্রের দাম নির্ধারণ করে। এরা কড়িও ব্যবহার করে।

[১] এই দূরত্ব নির্দেশে ভুল আছে; কারণ ১ লি = ·১৩৩২ মাইল, কিন্তু চাটগাঁও থেকে সোনারগাঁওয়ের দূরত্ব ১৪৪ মাইল।

"এ দেশের বিবাহ এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া মুসলিম ধর্মের বিধান অনুসারে সম্পন্ন হয়।

"এ দেশে অপরাধীদের নানারকম শাস্তির ব্যবস্থা আছে। যেমন ভারী বাঁশের লাঠি দিয়ে প্রহার এবং নির্বাসন।

"এ দেশের রাজকর্মচারীদের নিজেদের সিলমোহর আছে, চিঠিপত্রের মধ্য দিয়ে যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা আছে। সৈন্যদের জন্য নিয়মিত মাইনে এবং খাদ্যের বরাদ্দের ব্যবস্থা আছে। সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ককে বলা হয় পা-স্সে-লা-উল্ (সিপাহ্-সালার)।

"এদেশে জ্যোতিষী আছে, চিকিৎসক আছে, শাস্ত্রজ্ঞ আছে। এক কথায় এদেশে সব রকম কাজে দক্ষ লোক আছে। এখানকার কতকগুলি লোক সাদা ও কালো রঙের নক্শা দেওয়া এক রকমের জামা পরে। তাদের দেখায় ঠিক ভাঁড়ের মত। প্রবাল, স্ফটিক ও রঙীন পাথর এক সঙ্গে গেঁথে বানানো এক ধরণের মালা তারা গলায় ঝুলিয়ে রাখে, হাতেও পাথরের চুড়ি পরে। এই লোকগুলি খুব ভাল নাচতে এবং গান করতে পারে। পান-ভোজনের অনুষ্ঠানকে এরা আনন্দে ভরিয়ে রাখে।

"এখানে আর এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা কেন্-সিআও-সু-লু-নাই[২] নামে পরিচিত। প্রত্যেক দিন ভোর পাঁচটার সময়ে তারা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের এবং ধনী লোকদের বাড়ীর ফটকের সামনে সো-না (সানাই) এবং ঢাক বাজাতে থাকে। প্রাতরাশের সময় উপস্থিত হলে তারা বাড়ী বাড়ী গিয়ে বক্শিস্ আদায় করে—মদ, খাবার, টাকা এবং আরও অনেক জিনিস তারা পায়। এরা ছাড়াও এদেশে আরও নানারকমের বাজিয়ে আছে।

"এখানে আর এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা বাজারে এবং গৃহস্থবাড়ীতে এক ধরনের খেলা দেখায়। তাদের সঙ্গে লোহার শিকলে বাঁধা একটি বাঘ থাকে। (খেলা দেখাবার সময়) তারা বাঘের শিকল খুলে দেয় এবং বাঘ মাটিতে শুয়ে পড়ে। তারপর একটি লোক খালি গায়েই বাঘটিকে খোঁচা মারে। বাঘ ক্ষেপে গিয়ে লাফিয়ে তার উপর পড়ে এবং সেও বাঘের সঙ্গে মাটিতে পড়ে যায়। কয়েকবার এইরকম চলে। তারপর লোকটি বাঘের গলায় একটি ঘুসি মারে, অবশ্য বাঘের তাতে কোন আঘাত লাগে না। খেলা

---

২ বীমৃসের মতে মূল শব্দটি 'খঞ্জরী-সুর্নাই' (J. R. A. S., 1895, pp. 898-900 দ্রঃ)। শব্দটি 'কাঁসি-সানাই'ও হতে পারে।

দেখাবার পরে লোকটি বাঘকে আবার বেঁধে ফেলে। বাড়ীর লোকেরা তখন বাঘকে মাংস খাওয়াতে এবং লোকটিকে টাকা দিতে ভোলে না। বাঘের খেলা দেখানো এদেশে একটা লাভের ব্যবসা।

"এদেশের পাঁজীতে বারোটি মাস আছে, কিন্তু তাতে মলমাস গণনার কোন ব্যবস্থা নেই।[৩]

"দেশের শস্যের মধ্যে প্রধান হচ্ছে বাজরা, তিল, বরবটি এবং ধান। ধান এখানে বছরে দু'বার পাকে।[৪] উদ্ভিজ্জ দ্রব্যের মধ্যে প্রধান হচ্ছে আদা, সরষে, পেঁয়াজ, রসুন, শসা এবং বেগুন। এরা নারকেল, তাল এবং কাজাঙ্গ (খেজুর?) থেকে মদ তৈরী করে। চায়ের বদলে এরা পান খায়।

গৃহপালিত প্রাণীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উট, ঘোড়া, খচ্চর, মহিষ, গরু, ছাগল, মুরগী, পাতিহাঁস, শুয়োর, রাজহাঁস, কুকুর এবং বিড়াল।

এদের ফলমূল হচ্ছে কলা, কাঁঠাল, ডালিম, আখ, চিনি এবং মধু।

এদেশে অনেক রকমের কাপড় পাওয়া যায়। তার মধ্যে কয়েকটির নাম উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি হচ্ছে পি-পু[৫]—নানা রকম রঙের পাওয়া যায়। এগুলিকে পি-পো ও বলা হয়, এগুলি তিন ফুটেরও বেশী চওড়া এবং সাতান্ন ফুট লম্বা। এগুলি ছবির মত চমৎকার। এছাড়া আদার মত হলদে রঙের এক রকম কাপড় পাওয়া যায়, তার নাম মান্ চে-তি।[৬] এগুলি চার ফুট চওড়া এবং পঞ্চাশ ফুটেরও বেশী লম্বা—অত্যন্ত মজবুত ও ঠাসবুনানি। শা-না-পা-ফু[৭] নামে আর এক ধরনের কাপড় আছে, সেগুলি পাঁচ ফুট চওড়া এবং ত্রিশ ফুট লম্বা। কি-পই-লেই-ত-লি নামের কাপড়গুলি তিন ফুট চওড়া এবং ষাট ফুট লম্বা। এই কাপড়গুলির বুনানি আল্‌গা এবং এগুলি খুব মোটা।

"পাগড়ীর কাপড়ের নাম শা-ত-উল্ (চাদর)। এগুলি পাঁচ ইঞ্চি চওড়া এবং চল্লিশ ফুট লম্বা, আমাদের সন্-সোর মত। ম-হেই-ম লেই (মলমল)

৩ বলা বাহুল্য এখানে মুসলমানদের পাঁজীর কথা বলা হয়েছে।

৪ আমন ও বোরো ধান।

৫ যতদূর মনে হয়, 'পি পু' বিশগজী থান। ওয়াংতা-ইউয়ানের বিবরণেও 'পি-পু'র উল্লেখ আছে।

৬ বাসন্তী?

৭ সম্ভবত এই 'শা-না-পা-ফু'কেই ভারথেমা 'সিনাবাফ' নামে এবং বারবোসা 'সানাবাফোজ' ও 'সিনাবাফো' নামে উল্লেখ করেছেন তাঁদের ভ্রমণ-বিবরণে।

আর এক ধরণের কাপড়, চার ফুট চওড়া এবং কুড়ি ফুট লম্বা, আমাদের তু-লো-কিন-এর মত। এরা রেশম বুনে রুমাল তৈরী করে।

"জরীর কাজ করা তফেতাও এখানে আছে। এদেশের কাগজের রং সাদা, এই কাগজ গাছের ছাল থেকে তৈরী এবং হরিণের চামড়ার মত মসৃণ ও মোলায়েম।

"এদের গৃহস্থালীর সরঞ্জামের মধ্যে গালার পেয়ালা, বাটি, ইস্পাতের বর্শা* কাঁচি প্রভৃতির নাম করা যায়।"

মা-হোয়ানের গ্রন্থের দ্বিতীয় যে সংস্করণটি প্রচলিত আছে, তার বাংলা-সংক্রান্ত বিবরণের সঙ্গে উপরে উদ্ধৃত বিবরণের কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়। এই সংস্করণের কোন কোন স্থানে এমন কিছু কিছু বিষয় উল্লিখিত হয়েছে, যা উপরে উদ্ধৃত বিবরণে পাওয়া যায় না। উভয় সংস্করণের এই পার্থক্যের জন্য আমরা এই সংস্করণের বাংলা-সংক্রান্ত বিবরণেরও পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ নীচে দিলাম (প্রথমোক্ত সংস্করণের বিবরণকে 'ক-বিবরণ' নামে উল্লেখ করে এই সংস্করণের বিবরণের সঙ্গে তার পার্থক্য পাদটীকায় দেখানো হল)।

"সু-মেন্-তা-লা রাজ্য থেকে পাং-কো-লা (বাংলা) রাজ্য জাহাজে যাওয়া যায় এইভাবে—প্রথমে মাওশান[১] এবং ৎসুই-লন দ্বীপপুঞ্জ অভিমুখে যাত্রা করতে হয়; এ সব জায়গায় পৌছোবার পর জাহাজকে উত্তর-পশ্চিমে ঘোরাতে হয় এবং বাতাস অনুকূল থাকলে ২১ দিন[২] পরে চট্টগ্রামে পৌছে জাহাজ নোঙ্গর ফেলে। তারপর ছোট নৌকা ব্যবহার করে নদীপথে যেতে হয়। নদীর উজানে ৫০০ লি বা তার একটু বেশী গেলে সোনা-উর্হ্-কংয়ে পৌছোনো যায়; এখানেই অবতরণ করতে হয়। এই জায়গা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে[৩] যাত্রা করে ৩৫টি পর্ব (stage) পার হলে বাংলা রাজ্যে পৌছোনো যায়। এই রাজ্যের শহরগুলি দেওয়াল দিয়ে ঘেরা এবং

* রকহিলের ইংরেজী অনুবাদে এখানে রয়েছে steel gun, কিন্তু তা ভুল, কারণ বাংলা দেশে তখনও বন্দুক ব্যবহৃত হয়নি। মূল চীনা বিবরণে এখানে ch'iang শব্দ রয়েছে, এর মানে 'বর্শা'ও হয়, 'বর্শা' ধরাই এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত।

১ ক-বিবরণে "মাওশান" নামটি পাওয়া যায় না। ২ ক-বিবরণের মতে ২০দিন। ৩ পাণ্ডুয়া সোনারগাঁওয়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে নয়, উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত; চীনা দূতেরা বাংলার রাজধানী পাণ্ডুয়ায় গিয়েছিলেন, সুতরাং এ বর্ণনায় ভুল আছে; ক-বিবরণে দূরত্ব সম্বন্ধে কিছু লেখা নেই।

(রাজধানীতে) রাজা এবং সমস্ত স্তরের রাজপুরুষরা বাস করেন।[৪] এটি (বাংলা) বিরাট দেশ। এর উৎপন্ন দ্রব্য যেমন প্রচুর, জনসংখ্যাও তেমনি বিপুল। এরা (বাংলার লোকেরা) মুসলমান [৫] এবং তাদের ব্যবহার সরল ও খোলাখুলি। (এদেশের) ধনীরা জাহাজ তৈরী করে, যা দিয়ে এরা বিদেশী জাতিগুলির সঙ্গে বাণিজ্য চালায়। (এদেশের লোকদের মধ্যে) অনেকে ব্যবসায় করে এবং বেশ কিছু লোক চাষবাস করে। অন্যেরা মিস্ত্রী, তারা হাতের কাজ করে। এরা কৃষ্ণবর্ণ জাতি, যদিও প্রায়ই এদের মধ্যে ফরসা চেহারার লোক দেখা যায়। (এদের) পুরুষেরা মাথা কামায়; তারা এক রকম ঢিলা জামা পরে; তার কলার গোল; ঐ পোষাক তারা মাথা দিয়ে গলিয়ে পরে এবং চওড়া একটি রঙীন রুমাল দিয়ে তাকে কোমরের সঙ্গে বেঁধে রাখে।[৬] এরা ছুঁচলো প্রান্ত-বিশিষ্ট চামড়ার জুতা পরে।

রাজা এবং রাজপুরুষেরা সবাই মুসলমানের মত পোষাক পরেন; তাঁদের টুপি ও জামা-কাপড় যথাযোগ্যভাবে সাজানো থাকে।[৭] (এদেশের) লোকদের ভাষা বাংলা; ফারসী ভাষাও চলে।

"এ দেশের মুদ্রা হচ্ছে একটি রুপার মুদ্রা; তার নাম টং-কা; এর ওজন চীনদেশের দুই মেসের সমান; এর ব্যাস ১$\frac{২}{১০}$ ইঞ্চি এবং তার দু'পিঠেই খোদাই করা থাকে; এই মুদ্রা দিয়েই সমস্ত বড় ব্যবসায়-বাণিজ্য নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু ছোটখাট কেনাকাটার জন্য তারা একটি সামুদ্রিক পদার্থ (shell) ব্যবহার করে; বিদেশীরা (বাঙালীরা) একে বলে কও-লি (কৌড়ি)।[৮]

"এদের বয়ঃপ্রাপ্তি, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, দান-যজ্ঞ এবং বিবাহ উপলক্ষে এরা যে সমস্ত অনুষ্ঠান করে, সেগুলি মুসলমানদের মত।

"(এ দেশের) সারা বছর আমাদের গ্রীষ্মকালের মত গরম। এখানে দু'বার ধান পাকে। এখানে এক বিশেষ ধরনের ধান আছে, যার দানা খুব লম্বা, সুতার মত (wiry) এবং লাল। এখানে প্রচুর পরিমাণে গম, তিল, সব রকমের ডাল, জওয়ার, আদা, সর্ষে, পেঁয়াজ, ভাঙ, কোয়াস, বেগুন এবং নানা ধরনের তরীতরকারী ফলে। এদের ফলও অনেক রকমের, তার মধ্যে সংখ্যায়

৪ ক-বিবরণে পরবর্তী পাঁচটি বাক্য নেই। ৫ ক-বিবরণে স্পষ্টভাবে বাংলার সব লোককে মুসলমান বলা হয় নি। মা-হোয়ান বাংলার হিন্দুদের সম্বন্ধে কিছু জানবার সুযোগ পান নি বলে মনে হয়। ৬ এই বর্ণনা ক-বিবরণে একটু ভিন্নভাবে আছে। ৭ ঐ ৮ ক-বিবরণের সঙ্গে এর পার্থক্য লক্ষণীয়।

বেশী—কলা।[৯] এখানে তিন-চার রকমের মদ পাওয়া যায়—নারকেল, ধান, তাড়ি এবং কাজাঙ্গ (?) থেকে তৈরী। বাজারে উগ্র মদ বিক্রী হয়।[১০]

"চা (এদেশে) নেই বলে এরা অতিথিকে তার জায়গায় পান খেতে দেয়। (এদেশের) রাস্তাগুলিতে বেশ ভাল ভাল নানা ধরনের দোকান আছে; এ ছাড়া পানাগার, ভোজনাগার ও স্নানাগারও আছে।[১১]

"(এদেশের) পশু-পাখী সংখ্যায় অগণিত। তাদের মধ্যে আছে উট, ঘোড়া, খচ্চর, গাধা, মহিষ, বলদ, ছাগল, ভেড়া, রাজহাঁস, পাতিহাঁস, মুরগী, শূকর, কুকুর এবং বিড়াল। কলা ছাড়া এদের আরও নানা রকমের ফল আছে—যেমন কাঁঠাল, আম, ডালিম; এছাড়া আখ, দানাদার চিনি, সাদা চিনি এবং —চিনির রস দিয়ে পাক করা নানা রকমের সংরক্ষিত ফল।[১২]

"এদের উৎপন্ন দ্রব্যের অন্যতম ছ' রকমের সূক্ষ্ম তুলার কাপড়। (এদের মধ্যে) একটি আমাদের পি-পুর মত, এর বিদেশী (বাংলা) নাম পি-ছিহ্; এগুলির বুনানি খুব কোমল, (এগুলির) প্রস্থ তিন ফুট এবং দৈর্ঘ্য ছাপ্পান্ন-সাতান্ন ফুট।[১৩] আর এক রকমের আদার রঙের কাপড় আছে, তার নাম মান্-চে-তি—চার ফুট বা তার কিছু বেশী চওড়া এবং পঞ্চাশ ফুট লম্বা; এগুলির বুনানি খুব ঘন; (এগুলি) খুব মজবুত। এক রকমের কাপড় আছে—পাঁচ ফুট চওড়া ও কুড়ি ফুট লম্বা, এর নাম শাহ-না-কিএহ; এগুলি আমাদের লো-পুর মত।[১৪] আর (এক রকম কাপড়) আছে, তার বিদেশী নাম হিন্-পেই-তুং-তা-লি; এগুলি তিন ফুট চওড়া এবং আট ফুট লম্বা। এর বুনানির জালগুলি খোলা এবং সুষম; এগুলি কতকটা গ্যজের (gauze) মত, পাগড়ীর জন্য এগুলি খুব বেশি ব্যবহার হয়।[১৫] আর আছে শা-ত-উর্‌হ্ (চাদর); এর দৈর্ঘ্য ৪০ ফুট বা তার কিছু বেশী এবং প্রস্থ দু' ফুট পাঁচ বা ছ' ইঞ্চি; এর সঙ্গে চীনা (কাপড়) সন্-সোর বেশ মিল আছে। আর আছে ম-হেই-ম-লেহ্, এর দৈর্ঘ্য ২০ ফুট বা তার কিছু বেশী, প্রস্থ

---

৯ ক-বিবরণে এই বর্ণনা অনেক সংক্ষিপ্ত, জিনিসপত্রের নামও সেখানে অনেক কম। ১০ ক-বিবরণে তিন রকম মদের নাম আছে এবং সর্বশেষ বাক্যটি নেই। ১১ এই অনুচ্ছেদটি ক-বিবরণে নেই। ১২ ক-বিবরণে এই বর্ণনা সংক্ষিপ্ত, পশুপাখী ও জিনিসপত্রের নামও কম। ১৩ ক-বিবরণের সঙ্গে এর পার্থক্য লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে ক-বিবরণের বর্ণনাই ঠিক বলে মনে হয়। ১৪ ক-বিবরণের তুলনায় সম্পূর্ণ পৃথক। ১৫ ঐ

চার ফুট; এর দু'দিকে দশভাগের চার বা পাঁচ ভাগ ঘন আবরণ (facing) আছে; (এগুলির) সঙ্গে চীনা তৌ-লো-কিন-এর মিল আছে।

"এখানে তুঁতগাছ ও গুটিপোকাও দেখতে পাওয়া যায়।[১৬] সোনালী জরীতে খচিত চিত্রবিচিত্র কারুকার্য-করা রেশমী রুমাল ও টুপি, গামলা, পেয়ালা, ইস্পাতের জিনিসপত্র, বর্শা, ছুরি, কাঁচি—সমস্তই এখানে পাওয়া যায়।[১৭] এরা এক রকম গাছের ছাল থেকে এক ধরনের কাগজ তৈরী করে—যা হরিণের চামড়ার মত মসৃণ ও মোলায়েম (glossy)।

"এখানে আইন ভঙ্গ করার শাস্তি লাঠি দিয়ে প্রহার এবং নিকট ও দূর দেশে নির্বাসন। আমাদের দেশে যেরকম, সেরকম এখানেও বিভিন্ন পদমর্যাদা অনুযায়ী রাজকর্মচারীদের দেখতে পাওয়া যায়; তারা সরকারী বাসায় থাকে।[১৮] তাদের সিলমোহর আছে এবং সরকারী চিঠি চলাচলের ব্যবস্থা আছে। এছাড়া আছে চিকিৎসক, জ্যোতিষী, ভূলিখনবিদ্যার (geomancy) অধ্যাপক, কারিগর এবং হুনরী। তাদের স্থায়ী সৈন্যবাহিনী আছে, সৈন্যদের বেতন জিনিসপত্র দিয়ে দেওয়া হয়; সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষকে বলা হয় পা-স্জু-লা-উরূহ্।

"এদের ভাঁড়েরা একরকম লম্বা সাদা তুলার পোষাক পরে, তাতে কালো সুতা দিয়ে কারুকার্য করা থাকে—তা' তাদের কোমরে একটি রঙীন রেশমী রুমাল দিয়ে বাঁধা থাকে, তাদের কাঁধের উপরে (এই পোষাক) ঝোলে।[১৯] তাদের মধ্যে (ঐ পোষাকে) প্রবালের খণ্ড ও রঙীন পাথরে গাঁথা একটি সুতা (লাগানো) থাকে। তারা কব্জীতে পরে ঘোর লাল রঙের পাথরের বালা। ভোজ-উৎসবের সময় এই লোকগুলি নিয়োজিত হয় কোন কোন সুর বাজাবার, তাদের দেশের গান গাইবার এবং সমবেতভাবে নানা ধরনের নাচ নাচবার জন্য।[২০]

"এখানে কেন্-সি-আও-সু-লু-নাই নামে আর এক শ্রেণীর লোক আছে। এরা সঙ্গীতজ্ঞ। এই লোকগুলি প্রত্যেক দিন সকালে—প্রায় চারটার সময় উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের ও ধনীদের বাড়ীতে যায়; একজন লোক এক ধরনের

১৬ ক-বিবরণে এই বাক্যটি নেই। ১৭ ক-বিবরণে জিনিসপত্রের নাম অনেক কম এবং আলোচ্য অংশটি সেখানে বিবরণের শেষে আছে। ১৮ ক-বিবরণে এই বাক্যটি নেই এবং এর পরবর্তী বাক্য দু'টি ক-বিবরণের গোড়ার দিকে আছে। ১৯ ক-বিবরণে এই বর্ণনা একটু ভিন্নভাবে আছে। ২০ ক-বিবরণে এই বর্ণনা খানিকটা সংক্ষিপ্ত।

তূর্য বাজায়, আর এক জন বাজায় ছোট ঢাক, তৃতীয় জন বাজায় বড় ঢাক। যখন তারা আরম্ভ করে, তাদের লয় থাকে বিলম্বিত; ক্রমশ তা' দ্রুত হতে থাকে, চরমে পৌঁছোবার পরে বাজনা হঠাৎ থেমে যায়। এই ভাবে এরা এক বাড়ী থেকে অন্য বাড়ীতে যেতে থাকে। খাবার সময়ে তারা আবার সমস্ত বাড়ীতে যায়। তখন তারা টাকা ও খাবার উপহার পায়।[২১]

"এখানে অনেক বাজীকর (conjuror) আছে, কিন্তু তাদের খেলাগুলি খুব অসাধারণ কিছু নয়। নিম্নবর্ণিত খেলাটি কিন্তু উল্লেখ করার মত। একজন লোক এবং তার স্ত্রী একটা লোহার শিকলে বাঁধা বাঘ নিয়ে রাস্তায় হেঁটে যায়। কোন একটি বাড়ির সামনে এসে তারা এই খেলা দেখায়—বাঘটির শিকল খুলে দেওয়া হয়, সে মাটিতে বসে; পুরুষটি সম্পূর্ণ খালি গায়ে[২২] হাতে একটা চাবুক নিয়ে বাঘের সামনে নাচে, তাকে নিয়ে টানাটানি করে, ঘুসি মেরে তাকে ফেলে দেয় এবং তাকে লাথি মারে, বাঘ ক্রুদ্ধ হয়ে গর্জন করতে থাকে এবং লোকটির উপর লাফিয়ে পড়ে। তারা দু'জনেই (লোকটি ও বাঘটি) এক সঙ্গে (মাটিতে পড়ে) গড়াতে থাকে। তারপর লোকটি বাঘের মুখ দিয়ে তার গলার ভিতরে নিজের হাত ঢুকিয়ে দেয়, বাঘ তাকে কামড়াতে সাহস করে না। খেলা শেষ হলে বাঘের গলায় আবার শিকল বাঁধা হয় এবং সে (বাঘ) শুয়ে পড়ে। তারপর খেলোয়াড়রা (খেলোয়াড় ও তার স্ত্রী) আশপাশের বাড়ী থেকে বাঘের জন্য খাদ্য চায়; সাধারণত তারা পশুটির জন্য অনেক টুকরো মাংস পায়, সেইসঙ্গে তারা নিজেরা টাকা উপহার পায়।[২৩]

"এদের নির্দিষ্ট পঞ্জিকা আছে—বছরে বারোটি মাস, কোন মলমাস নেই।[২৪] ঋতুগুলি সুরু হবার কিছু আগেই এরা হিসাব করে যে, ঋতু তাড়াতাড়ি সুরু হবে, না দেরীতে। (এ দেশের) রাজা জাহাজে করে তাঁর লোকদের বিদেশে পাঠান বাণিজ্যের জন্য, (এদের মাধ্যমে তিনি অন্য

---

২১ ক-বিবরণে এই বর্ণনা সংক্ষিপ্ত। ২২ ইংরেজী অনুবাদে আছে "naked", এখানে অভিপ্রেত অর্থ "খালি গায়ে" বলেই মনে হয়। ২৩ ক-বিবরণে এই বর্ণনা সংক্ষিপ্ত ও কিয়দংশে পৃথক; এখানকার বর্ণনা অপেক্ষাকৃত সুন্দর ও বাস্তব। ২৪ ক-বিবরণে এই বাক্যটি বর্ণনার মাঝের দিকে আছে। এর পরবর্তী বাক্যগুলি ক-বিবরণে আদৌ নেই এবং ফিলিপ্‌সের অনুবাদে সংক্ষিপ্তভাবে আছে; বন্ধুবর রান-যুন-হুয়া মূল চীনা গ্রন্থ ('য়িং-য়া-শুং-লান') থেকে এই বাক্যগুলি অনুবাদ করে দিয়েছেন।

দেশের) স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্য, মুক্তা ও হীরা সংগ্রহ করেন এবং চীনে এই সমস্ত জিনিস ভেট হিসাবে পাঠান।"

ফেই-শিনের বিবরণ

এর পরবর্তী বিবরণটিও আমরা একটি চীনা গ্রন্থে পাই। এই চীনা গ্রন্থটির নাম 'শিং-ছা শুং-লান'। এটি ১৪৩৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। এর লেখকের নাম ফেই-শিন। ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে চীন-সম্রাটের কাছ থেকে যে দূতের দল বাংলার রাজা জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের সভায় এসেছিল (বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ১২১-২২ দ্রষ্টব্য); এবং তাঁর কাছে বিপুল সংবর্ধনা লাভ করেছিল, ফেই-শিন ছিলেন সেই দলের সদস্য। ফেই-শিন 'শিং-ছা-শুং-লান'-এ বাংলার রাজসভায় তাঁদের আগমন, বাংলার রাজার কাছে তাঁদের সংবর্ধনা এবং তাঁর দেখা বাংলা দেশের অত্যন্ত মনোরম বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। এই বর্ণনা নীচে উদ্ধৃত হল।

"বাতাস অনুকূল থাকলে সুমাত্রা থেকে এই দেশে কুড়ি দিনে পৌছোনো যায়। এ দেশ (চীনের) পশ্চিমে অবস্থিত ভারতবর্ষ নামে দেশটির অন্তর্গত। বাংলা দেশের পশ্চিম সীমায় বজ্রাসনের দেশ, যার নাম চও-ন-ফু-উল্ (জৌনপুর)—এই হচ্ছে সেই জায়গা, যেখান শাক্য বোধিলাভ করেছিলেন। সম্রাট য়ুং-লোর রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষে (১৪১৫ খ্রীঃ) সম্রাট দু'বার আদেশ রাজী করার পরে রাজপ্রতিনিধি হৌ-শিয়েন এক বিরাট নৌবহর এবং এবং অনেক লোকজন নিয়ে (বাংলার) রাজা, রানী এবং অমাত্যদের কাছে তাঁর (চীনসম্রাটের) উপহার পৌছে দেবার জন্য রওনা হলেন।

"এই দেশটিতে উপসাগরের কূলে একটি সামুদ্রিক বন্দর আছে, তার নাম চা-টি-কিআং (চাটগাঁও বা চাটিগ্রাম বা চট্টগ্রাম)। এখানে কোন কোন শুল্ক আদায় করা হয়। রাজা যখন শুনলেন আমাদের জাহাজ সেখানে এসে পৌছেছে, তিনি পতাকা এবং অন্যান্য উপহার সমেত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের সেখানে পাঠালেন। হাজারেরও বেশী ঘোড়া ও মানুষ বন্দরে এসে হাজির হল। ষোলটি পর্ব (stage) অতিক্রম করে আমরা সুও-না-উল-কিআং (সোনারগাঁও)-তে পৌছোলাম। এই জায়গাটি দেওয়াল দিয়ে ঘেরা; এখানে পুকুর, রাস্তাঘাট ও বাজার আছে, সেখানে সবরকম জিনিষের কেনাবেচা চলে।

এখানে রাজার লোকেরা হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি নিয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করল। সেখান থেকে রওনা হ'য়ে কুড়িটি পর্ব (stage) পার হয়ে আমরা পান্-টু-য়া (পাণ্ডুয়া)-তে পৌঁছোলাম, যেখানে দেশের রাজা বাস করেন। এই শহরের দেওয়ালগুলি খুব চমৎকার, বাজারগুলির ব্যবস্থা খুব ভাল, দোকানগুলি পাশাপাশি অবস্থিত, থামগুলি সুশৃঙ্খলভাবে সারে সারে সাজানো। এখানে সব রকমের জিনিস পাওয়া যায়।

"রাজার প্রাসাদ ইট ও সুরকীর গাঁথুনীতে তৈরী। যে সিঁড়ি বেয়ে প্রাসাদে উঠতে হয় তা উঁচু আর চওড়া। হলঘরের ছাদগুলি চারকোণা, তাদের ভিতরের দিকটা চুণকাম করা। প্রাসাদটিতে ন'টি মহল এবং তিনটি দরজা আছে। থামগুলি পিতলের রঙের এবং পালিশ করা, তাদের গায়ে নানারকম ফুল এবং জীবজন্তুর ছবি খোদাই করা। ডাইনে এবং বাঁয়ে লম্বা লম্বা অনেকগুলি বারান্দা রয়েছে। সেখানে এক হাজারের বেশী লোক জড়ো হয়েছিল, তাদের পরিধানে উজ্জ্বল বর্ম। বাইরের উঠানে সারি সারি সৈন্য দাঁড়িয়েছিল। তাদের মাথায় উজ্জ্বল শিরস্ত্রাণ এবং হাতে বর্শা, তরবারি, তীরধনুক প্রভৃতি শোভা পাচ্ছিল। তারা দৃপ্ত বীরত্বের প্রতিমূর্তি। রাজার ডাইনে এবং বাঁয়ে শত শত লোক, তাদের মাথায় ময়ূরের পালকে তৈরী ছাতা।[১] হল ঘরের সামনে কয়েকশো হাতীসওয়ার সৈন্য ছিল। প্রধান দরবার-ঘরে দামী পাথরে খচিত উঁচু এক সিংহাসনে পায়ের উপর পা রেখে রাজা বসেছিলেন, তাঁর কোলের উপর ছিল একটি দু'মুখো তলোয়ার।

"আমাদের ভিতরে নিয়ে যাবার জন্য দুটি লোক এল, তাদের হাতে রূপার লাঠি, মাথায় পাগড়ী। আমরা পাঁচ পা এগোলে তারা সেলাম করল। হলের মাঝখানে পৌঁছে তারা থামল এবং আর দু'টি লোক এল —তাদের হাতে সোনার লাঠি ; তারা আগেরই মত সেলাম করে আমাদের এগিয়ে নিয়ে গেল। রাজা আমাদের প্রত্যভিবাদন করে (আমাদের) সম্রাটের ফরমানটি নিলেন এবং নিজের মাথায় সেটি ঠেকিয়ে খুলে পড়লেন। (আমাদের) সম্রাটের উপহারগুলি গালিচার উপর ছড়িয়ে রাখা হল।

১ চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা ১৫শ পরিচ্ছেদে "ম্লেচ্ছ রাজা"র মাথায় 'ময়ূরপুচ্ছের আড়ানী (পাখা)" ধরার উল্লেখ আছে। চীনা বিবরণে যাকে "ছাতা" বলা হয়েছে, তা সম্ভবত "আড়ানী"ই।

"রাজা (চীন) সম্রাটের প্রতিনিধিদের এক ভোজসভায় আপ্যায়িত করলেন এবং আমাদের সৈন্যদের অনেক জিনিস উপহার দিলেন। ভোজে মেষমাংস ও গোমাংসের কাবাব দেওয়া হয়; মদ্যপান নিষিদ্ধ ছিল, কেন না এতে ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হবার ও শিষ্টাচারের বিধি লঙ্ঘিত হবার আশঙ্কা; তার বদলে তারা (চীনসম্রাটের প্রতিনিধিরা) গোলাপজল-দেওয়া সরবৎ পান করেছিল।[২] ভোজসভা শেষ হলে রাজা (চীনা) রাজপ্রতিনিধিদের সোনার বাটী, সোনার কটিবন্ধ, সোনার কুঁজো আর সোনার পেয়ালা উপহার দিলেন। প্রতিনিধিদের যাঁরা সহকারী, তাঁরা সবাই ঐ সমস্ত জিনিসই পেলেন, তবে সেগুলি রূপার তৈরী। নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা প্রত্যেকে পেল একটি সোনার ঘণ্টা এবং এক ধরনের লম্বা সাদা রেশমী পোষাক। সৈন্যেরা সবাই রূপার টাকা পেল। সত্যি কথা বলতে কি, এ দেশের লোকেরা যেমন ধনী তেমনি সৌজন্যপরায়ণ। এর পর রাজা সোনায় তৈরী একটি আধারে রক্ষিত এক স্মারকলিপি (চীন) সম্রাটকে দেবার জন্য সমর্পণ করলেন। স্মারকলিপিটি সোনার পাতের উপরে লেখা হয়েছিল। (চীনা) রাজপ্রতিনিধিরা যথোচিত সম্মানের সঙ্গে তাঁর কাছ থেকে (চীন) সম্রাটের উদ্দেশ্যে প্রেরিত আরো অনেক উপহার-সামগ্রী সমেত এই স্মারকলিপিটি গ্রহণ করলেন।

"এই দেশের লোকদের চরিত্র অত্যন্ত মহৎ। এদেশের পুরুষেরা সাদা সুতীর পাগড়ী মাথায় দেয় এবং সাদা রঙের লম্বা সুতীর জামা পরে। তারা পায়ে দেয় সোনালী জরীর কাজ করা ভেড়ার চামড়ায় তৈরী চটি জুতা। যারা একটু সৌখীন, তারা নানারকম নক্শা আঁকা জুতা পরে। প্রত্যেকটি লোকেরই নিজের ব্যবসায় আছে, যাতে দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা অবধি খাটে। কিন্তু যখন লোকসান হয়, তারা কখনও দুঃখ করে না।

"মেয়েরা খাটো জামা পরে, তার চারদিকে সুতী, রেশম বা কিংখাবের ওড়না জড়ায়। তাদের রং সাধারণত ফরসা, এইজন্য তারা অঙ্গরাগ ব্যবহার করে না। কানেতে তারা দামী পাথর বসানো সোনার দুল পরে। তাদের গলাতে দোলে হার। চুলগুলি তারা মাথার পেছনদিকে খোঁপা করে বেঁধে

২ এই বাক্যটি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র সেন মূল চীনা গ্রন্থ থেকে অনুবাদ করে দিয়েছেন; রক্‌হিল 'শিং-ছা-শুং-লান'-এর যে অনুবাদ করেছিলেন (T'oung Pao, 1915, pp. 440-444 দ্রষ্টব্য), তাতে এই বাক্যটি ভুলভাবে অনূদিত হয়েছিল।

রাখে। হাতের কব্জী এবং পায়ের গোড়ালীতে তারা সোনার বালা ও মল পরে এবং হাত ও পায়ের আঙুলে আংটি পরে।

"এখানে এক সম্প্রদায়ের লোক আছে, যাদের নাম য়িন্-তু (হিন্দু)। তারা গরুর মাংস খায় না এবং তাদের পুরুষ এবং স্ত্রীলোকেরা এক জায়গায় বসে খাওয়াদাওয়া করে না। স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রী আর দ্বিতীয়বার বিবাহ করে না, তেম্‌নি স্ত্রীর মৃত্যু হলে স্বামীও আর দ্বিতীয়বার বিবাহ করে না। * তাদের মধ্যে যদি কোন গরীব লোকের জীবিকানির্বাহের কোন উপায় না থাকে, তাহলে গ্রামের বিভিন্ন পরিবার পালা করে তাকে সাহায্য করবে, কিন্তু অন্য কোন গ্রামে গিয়ে ভিক্ষা করতে দেবে না। এই লোকগুলি তাদের উদার সমাজ-চেতনার জন্য সত্যই প্রশংসা পাবার যোগ্য।

"এখানকার মাটি উর্বর এবং তাতে প্রচুর ফসল ফলে; বছরে দু'বার ধান পাকে। এরা নিড়ানি দিয়ে ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করে না। পুরুষেরা এবং মেয়েরা মরসুম বুঝে কখনও ক্ষেতে কাজ করে, কখনও কাপড় বোনে।

"এদেশের ফলমূলের মধ্যে একটি হচ্ছে পো-লো-মি (কাঁঠাল), এক একটির আয়তন বুশেলের মত বিরাট আর স্বাদ অদ্ভুত রকম মিষ্টি। আর একটি ফল হচ্ছে আম, যদিও তার স্বাদ একটু টক, তবু খুব চমৎকার। এছাড়া এদেশে আরও নানারকমের ফল, তরীতরকারী, গরু, মহিষ, ঘোড়া, মুরগী, ভেড়া, হাঁস এবং সামুদ্রিক মাছ পাওয়া যায়। ব্যাপক ব্যবসায়ের জন্য এরা টাকার বদলে কড়ি ব্যবহার করে।

"এদেশের স্বাভাবিক উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে সূক্ষ্ম বস্ত্র (মসলিন), সা-হ-ল্ (শাল), কম্বল, তু-লো-কিন, নানারকম কাপড়, স্ফটিক, গোমেদ, প্রবাল, মুক্তা, দামী পাথর, চিনি, ঘি, ময়ূরের পালক প্রভৃতির নাম করা যায়।

"এদেশ থেকে সোনা, রূপা, সাটিন, রেশম, নীল ও সাদা রঙের চীনামাটি, পিতল, লোহা, চন্দন, সিঁদুর, পারদ এবং মাদুর রপ্তানী হয়।"

মা-হোয়ানের বিবরণে বাংলার মুসলমানদের কথাই কেবল লেখা হয়েছে, হিন্দুদের সম্বন্ধে মা-হোয়ান কিছু জানবার সুযোগ পাননি। ফেই-শিন কিন্তু

* ফেই-শিন এক্ষেত্রে যে ভুল খবর পেয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। স্বামীর মৃত্যু হলে হিন্দু স্ত্রী তখন দ্বিতীয়বার বিবাহ করত না এই কথা সত্য, কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যু হলে স্বামী বিবাহ করত; এমন কি হিন্দু পুরুষদের মধ্যে বহুবিবাহও প্রচলিত ছিল; সমসাময়িক সাহিত্য ও স্মৃতিশাস্ত্র থেকে তা জানা যায়।

হিন্দুদের সম্বন্ধে কিছু খবর পেয়েছিলেন এবং তাঁর বিবরণে তাদের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ করেছেন।

অন্য কয়েকটি চীনা গ্রন্থেও ('শি-য়াং-ছাও-কুং-তিয়েন-লু', 'শু-য়ু-চৌৎজ্-লু,' 'মিং-শ্র্' প্রভৃতি) পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলাদেশের বিবরণ পাওয়া যায়, কিন্তু এই বিবরণগুলি আমরা উদ্ধৃত করব না। কারণ—প্রথমত, এইসব চীনা গ্রন্থগুলি আলোচ্য সময়ের পরে লেখা; দ্বিতীয়ত, এগুলির বিবরণ প্রায় সম্পূর্ণভাবেই 'তাও-য়ি-চি-লিয়েহ্', 'য়িং-য়া-শুং-লান' ও 'শিং-ছা-শুং-লান' থেকে নেওয়া।

নিকলো কন্তির বিবরণ

নিকলো কন্তি (বা নিকলো দি কন্তি) নামে একজন ভেনিসীয় বণিক পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে মধ্য ও পূর্ব এশিয়ায় ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি পারস্যদেশ অতিক্রম করে মালাবার উপকূল ধরে সমুদ্রপথে অগ্রসর হয়েছিলেন, সেখান থেকে তিনি দেশের ভিতরে প্রবেশ করে বাংলা সমেত ভারতের কতকগুলি অঞ্চল দর্শন করেন। অতঃপর সিংহল, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, দক্ষিণ চীন, ইথিওপিয়া প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করে, জলপথে লোহিত সাগর অতিক্রম করে, মরুভূমি পার হয়ে তিনি কায়রোয় পৌঁছোন; এখানে তাঁর স্ত্রীর ও দু'টি পুত্রের মৃত্যু হয়। এর পঁচিশ বছর পরে—১৪৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভেনিসে ফিরে আসেন। সুতরাং ১৪১০ থেকে ১৪১৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি বাংলাদেশে ভ্রমণ করেছিলেন বলে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে।

নিকলো কন্তি তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিজে লিপিবদ্ধ করে যান নি। নিকলো একবার তাঁর সহযাত্রী ও স্ত্রীপুত্রদের বাঁচাবার জন্য খ্রীষ্টধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম বরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। দেশে ফেরার পর তিনি পোপ চতুর্থ ইউজেনের শরণ নেন এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য। পোপ বলেন নিকলো তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেই তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে। পোপের নির্দেশ অনুসারে নিকলো পোপের একান্ত-সচিব পোজ্জিও ব্রাচ্চিওলিনির কাছে তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। ব্রাচ্চিওলিনি নিকলোর অভিজ্ঞতাগুলি নিজের ভাষায় লিপিবদ্ধ করে একটি বই লেখেন। এই বই ল্যাটিন ভাষায় লেখা। এই বই থেকে নিকলো কন্তির বাংলাদেশ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নীচে উদ্ধৃত হল।

"স্থল ও জলপথে বহু ভ্রমণ করে তিনি (নিকলো) গঙ্গা নদীর মোহানায় এসে পৌঁছালেন। এই নদী ধরে পনেরো দিন যাবার পর তিনি শেরনোভ (শহর-ই-নৌ ?) নামে এক বিরাট ও বর্ধিষ্ণু নগরে এসে উপনীত হলেন। এই নদীটি (গঙ্গা) এত বড় যে এর মাঝখানে এলে দুই তীর আর দেখা যায় না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস নদীটি কোথাও কোথাও পনেরো মাইল চওড়া। এই নদীর তীরে খুব লম্বা লম্বা নলখাগড়া (বাঁশ) জন্মায়। সেগুলো এত আশ্চর্য রকম মোটা যে একজন লোক হাত দিয়ে তা জড়িয়ে ধরতে পারে না। এগুলো দিয়ে তারা (বাঙালীরা) জেলে-নৌকা তৈরী করে; তার জন্যে একটা (বাঁশ)ই যথেষ্ট। হাতের চেটোর চেয়ে একটু চওড়া কাঠ বা বল্কল দিয়ে তারা নদীর বুকে চলাফেরার জন্য ডিঙ্গি বানায়। (ডিঙ্গির) গাঁটগুলোর ব্যবধান হবে এক মানুষ সমান। কুমীর এবং আমাদের অজানা বহু মাছ নদীটিতে দেখা যায়। নদীর উভয় তীরেই চমৎকার অট্টালিকা, ফুলের বাগিচা ও ফলের বাগান নজরে পড়ে, তাতে (ফলের বাগানে) বহু বিচিত্র ফল ধরে আছে। এর মধ্যে আবার সেরা ফল হল মুসা (?)। সেগুলো মধুর চেয়েও মিষ্টি, দেখতে ডুমুরের মত। এ ছাড়া বাদামও আছে—যাকে আমরা বলি ভারতীয় বাদাম।

"নগরটি পরিত্যাগ করে তিনি (নিকলো কন্তি) তিন মাস ধরে গঙ্গা বেয়ে উপরের দিকে উঠতে লাগলেন। চারটি খুব বিখ্যাত শহর পিছনে রেখে তিনি এসে পৌঁছলেন মারাজিয়া (?) নামে এক বড় নগরে। এখানে প্রচুর পরিমাণে ঘৃতকুমারী লতা, কাঠ, সোনা, রূপা, মূল্যবান পাথর এবং মুক্তা পাওয়া যায়। এখান থেকে তিনি পূর্ব দিকের পাহাড়ের পথ ধরলেন,—সেখান থেকে পদ্মরাগ নামে মূল্যবান পাথর সংগ্রহ করার অভিপ্রায়ে। এই অভিযানে তেরো দিন কাটিয়ে তিনি শেরনোভ নগরীতে ফিরে এলেন। তারপর সেখান থেকে রওনা হলেন বুফেতানিয়া (বর্ধমান)-র দিকে। সেখান থেকে রওনা হয়ে একমাস চলার পর তিনি রাকা (আরাকান) নদীর মোহানায় উপনীত হলেন।"

নিকলো কন্তির ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে সাধারণভাবে তৎকালীন ভারতীয়দের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকদের কাছে এই তথ্যগুলি খুবই মূল্যবান্, তবে এদের কতখানি তৎকালীন বাঙালীদের জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে প্রযোজ্য, তা বলা মুশ্‌কিল। নিকলো কন্তির ভ্রমণ-বিবরণের

একটা বড় ত্রুটি হ'ল এই যে—তিনি পারস্য থেকে সুমাত্রা পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলটাকেই ভারতবর্ষ বলে গণ্য করেছেন। আসল ভারতবর্ষকে (বাংলা সমেত) তিনি "মধ্যভারত" বলেছেন। উপরে যে অংশটুকু উদ্ধৃত হল, তা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশেরই বর্ণনা। নিকলো কন্তির ভ্রমণ-কাহিনী থেকে আরও দু'টি অংশ আমরা নীচে উদ্ধৃত করছি, এদের মধ্যে প্রথমটি সতীদাহের বর্ণনা, দ্বিতীয়টি দেব-পূজার বর্ণনা। এই বর্ণনা দু'টি যে তৎকালীন বাংলাদেশ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

"জীবিত স্ত্রীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বামীর চিতায় সহমরণে যান। বিবাহের সময়ের চুক্তিমত একজন বা তার বেশী স্ত্রী যান সহমরণে। একমাত্র স্ত্রী হলেও প্রথম স্ত্রী আইনত সহমরণে যেতে বাধ্য। কিন্তু অন্য স্ত্রীদের সঙ্গে প্রকাশ্য চুক্তি থাকে যে চিতার মহিমা বৃদ্ধির জন্য তাদেরও সহমরণে যেতে হবে। এটা মহা গৌরবের কাজ বলে মনে করা হয়। সবচেয়ে ভাল পোষাক পরিয়ে খাটিয়ার উপরে মৃত স্বামীকে শুইয়ে দেওয়া হয়। তাঁর উপরে বিরাট এক পিরামিডের আকারে নানা সুগন্ধি কাঠের চিতা সাজানো হয়। চিতায় আগুন দেওয়া হলে শ্রেষ্ঠ পোষাকে সজ্জিত হয়ে স্ত্রী হাসিমুখে গান গাইতে গাইতে চিতা প্রদক্ষিণ করেন। তাঁর সঙ্গে এক বিরাট জনতা ঢাকঢোল ও বাঁশী বাজিয়ে গান করতে থাকে। ইতিমধ্যে বাচালি (?) নামে একজন পুরোহিত উঁচু মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে জীবন ও মৃত্যুকে তুচ্ছ করবার প্ররোচনা দিয়ে স্বামীর সঙ্গে পরলোকে প্রচুর আমোদ-আহ্লাদ-ধনৈশ্বর্য-অলঙ্কার পাওয়ার আশা দেখান। কয়েকবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করা হলে যে মঞ্চে পুরোহিত থাকেন, তার নীচে এসে সাজসজ্জা খুলে ফেলে বিধবা স্ত্রীর সাদা কাপড় পরেন। তার আগেই প্রথানুযায়ী তাঁকে স্নান করিয়ে নেওয়া হয়। পুরোহিতের সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি তখন আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। যদি কেউ ভয় পান (কারণ প্রায়ই দেখা যায় যে তাঁরা অন্যের আগুনে পোড়ার কষ্ট দেখে কিংবা নিজেদের কষ্টের কথা ভেবে বিহ্বল হয়ে পড়েন), দর্শকরা তাঁদের ধরে আগুনে ছুঁড়ে দেয়, তাঁদের মতামতের অপেক্ষা না রেখেই। তাঁদের ভস্ম কুড়িয়ে এনে হাঁড়িতে তুলে রেখে দেওয়া হয়—সেটা সমাধিস্থানের অলংকরণে নিয়োজিত হয়।"

... ...

"ভারতের সর্বত্র দেবতার পূজা হয়। সে জন্য তারা আমাদেরই মতন

মন্দির তৈরী করে তার ভিতরে বিভিন্ন মূর্তি এঁকে রাখে। পালপার্বণে মন্দিরগুলি ফুল দিয়ে সাজানো হয়। ভিতরে প্রতিমা রেখে দেয়, কোনটা পাথরের, কোনটা সোনার, কতকগুলো রূপার, বাকীগুলো হাতীর দাঁতের প্রতিমা। প্রতিমাগুলি কখনও কখনও ষাট ফুট উঁচু হয়। উপাসনা ও বলি দেবার পদ্ধতি আছে নানা ধরনের। পবিত্র জলে স্নান করে সকালে কি সন্ধ্যায় তারা মন্দিরে প্রবেশ করে। তারপর কখনো কখনো সাষ্টাঙ্গে শুয়ে হাত আর পা উঁচু করে স্তব পড়ে ও মাটি চুম্বন করে, কোথাও কোথাও হয়ত আরতি করা হয় দেবতাকে নানা রকম ধূপ-ধুনা দিয়ে। গঙ্গার এপারের ভারতীয়েরা ঘণ্টা ব্যবহার করে না—তারা ছোট ছোট করতাল বাজায়। পুরাকালের মূর্তি-উপাসকদের মত দেবতাদের উদ্দেশ্যে তারা ভোগ দেয়—পরে দরিদ্রদের সেই ভোগ বিলিয়ে দেওয়া হয়।"

রায়মুকুট বৃহস্পতি মিশ্রের বিবরণ

১৪২০ খ্রীঃ থেকে ১৫০০ খ্রীঃ—এই ৮০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে কোন বিদেশী ভ্রমণকারী এসেছিলেন বলে জানা যায় না। যদি কেউ এসে থাকেন, তিনি বাংলাদেশ সম্বন্ধে কোন বিবরণ রেখে যান নি।

এই সময়কার বাংলাদেশের কোন বিশদ বৃত্তান্ত কোথাওই পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র রায়মুকুট বৃহস্পতি মিশ্রের বিভিন্ন গ্রন্থ ও কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী থেকে এই যুগের বাংলা সম্বন্ধে দু'একটা বিচ্ছিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

বৃহস্পতি মিশ্রের কিছু পরিচয় আগেই দেওয়া হয়েছে (পৃঃ ১৬৭, ১৯২-১৯৪ দ্রঃ)। তিনি 'গীতগোবিন্দ', 'কুমারসম্ভব', 'রঘুবংশ', 'মেঘদূত' এবং 'শিশুপালবধ' প্রভৃতি কাব্যের টীকা রচনা করেছিলেন। এ ছাড়া 'স্মৃতিরত্নহার' নামে একটি স্মৃতিগ্রন্থ এবং 'পদচন্দ্রিকা' নামে অমরকোষের একটি টীকাও তিনি রচনা করেছিলেন। বৃহস্পতির বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকা ও পুষ্পিকা থেকে জানা যায় যে, বৃহস্পতির পিতার নাম গোবিন্দ, মাতার নাম নীলমুখায়ী, গুরুর নাম শ্রীধর, স্ত্রীর নাম নির্বৃতা এবং অন্যতম পুত্রের নাম বিশ্বাস রায়। বৃহস্পতি গুরু, পৃষ্ঠপোষক ও রাজাদের কাছ থেকে অনেক উপাধি পেয়েছিলেন—যেমন মিশ্র, আচার্য, রাজ্যধরাচার্য, রাজপণ্ডিত, পণ্ডিতসার্বভৌম, কবিপণ্ডিতচূড়ামণি, মহাচার্য এবং রায়মুকুট। বৃহস্পতির নিবাস ছিল রাঢ়ে।

বৃহস্পতির কর্মজীবন জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের রাজত্বকাল (১৪১৫-১৬, ১৪১৮-৩৩ খ্রীঃ) থেকে সুরু করে রুকনুদ্দীন বারবক শাহের রাজত্বকাল (১৪৫৫-৭৬ খ্রীঃ) পর্যন্ত প্রসারিত। বৃহস্পতি জলালুদ্দীনের কাছে কিছু পৃষ্ঠপোষণ পেয়েছিলেন এবং বারবক শাহের কাছ থেকে 'পণ্ডিতসার্বভৌম' ও 'রায়মুকুট' উপাধি পেয়েছিলেন। জলালুদ্দীনের সেনাপতি রায় রাজ্যধরও বৃহস্পতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

বৃহস্পতি তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে নিজের সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা লিখে গিয়েছেন, তার সারমর্ম আমরা উপরে দিলাম। বৃহস্পতির গ্রন্থগুলি থেকে সেযুগের বাংলা দেশ ও বাঙালী সমাজ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত তথ্যগুলি জানা যায়।

(১) সে যুগে মুসলমান গৌড়েশ্বররা হিন্দুদের উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করতেন। হিন্দু রায় রাজ্যধর ছিলেন জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের সেনাপতি, বৃহস্পতি মিশ্রের বিশ্বাস রায় প্রভৃতি পুত্রেরা ছিলেন বারবক শাহের মন্ত্রীদের মধ্যে মুখ্য। বৃহস্পতির 'রায়মুকুট' উপাধি থেকে মনে হয়, তিনি নিজেও কোন উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

(২) সে যুগে গৌড়েশ্বররা কাউকে উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করার সময় খুব আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান করতেন। রায় রাজ্যধরকে সেনাপতিপদে নিয়োগ করার সময়ে জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ তাঁকে হাতী, ঘোড়া, সোনা, রূপা, ছাতার সারি প্রভৃতি দান করে তূর্য ও শঙ্খের ধ্বনিতে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন (বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ১৬০ দ্রঃ)। বৃহস্পতি মিশ্রকে 'রায়মুকুট' উপাধি (যা কোন উচ্চ রাজপদের দ্যোতক বলে আমরা মনে করি) দেবার সময় রাজা (বারবক শাহ) তাঁকে উজ্জ্বল মণিময় সুন্দর হার, দ্যুতিমান্ দু'টি কুণ্ডল, রত্নখচিত দশ আঙুলের রত্নচূড় দিয়েছিলেন এবং তাঁকে হাতীর পিঠে চড়িয়ে স্বর্ণ-কলসের অভিষেক করিয়ে ছাতা ও ঘোড়া দান করেছিলেন (বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ১৯৩, পাদটীকা দ্রঃ)।

(৩) সে যুগের ধনী হিন্দুরা নানা রকম দান ও যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করতেন। রায় রাজ্যধর ব্রহ্মাণ্ড, স্বর্ণাশ্বযুক্ত রথ, বিশ্বচক্র, পৃথ্বী, কৃষ্ণাজিন ও কল্পতরু প্রভৃতি দান অনুষ্ঠান করে ব্রাহ্মণদের দৈন্য দূর করে দিয়েছিলেন। বৃহস্পতি মিশ্রের পুত্রেরা ব্রহ্মাণ্ড, কল্পতরু ও তুলাপুরুষ প্রভৃতি দান অনুষ্ঠান করেছিলেন। এ ছাড়া এই সব ধনী হিন্দুরা কবি-পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষণও করতেন।

(৪) সে যুগের হিন্দুদের বিশিষ্ট পার্বণ ছিল বৈশাখী পৌর্ণমাসী, আরণ্য ষষ্ঠী, শক্রোত্থান বা ইন্দ্রোৎসব, দুর্গোৎসব, কোজাগর, প্রেতচতুর্দশী, স্কন্দপূজা, শ্রীপঞ্চমী প্রভৃতি। শক্রোত্থান বা ইন্দ্রোৎসব বর্তমানে অপ্রচলিত। সেযুগে বর্ষার শেষের দিকে শুক্লপক্ষে ইন্দ্রের হাতে অসুরদের পরাজয়-স্মরণ উপলক্ষে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হত; উৎসব-প্রাঙ্গণে ইন্দ্রের একটি ধ্বজা তুলে তার চারদিকে লোকেরা সমবেত হয়ে নাচগান, আমোদপ্রমোদ করত। তখনকার দিনে বড় ও ছোট—দু'ধরণের দুর্গোৎসব ছিল। বড় দুর্গোৎসবে কৃষ্ণপক্ষের নবমীতে কল্পারম্ভ হত, নবপত্রিকা (কলা বৌ) স্নান করানো হত এবং অষ্টমী পূজার দিন মধ্যরাত্রে ভদ্রকালী পূজা হত। ছোট দুর্গোৎসবে কল্পারম্ভ হত দেবীপক্ষের ষষ্ঠীতে, তাতে নবপত্রিকা-স্নান এবং ভদ্রকালী পূজার রীতি ছিল না। বিজয়া দশমীর দিন লোকে ক্রীড়াকৌতুক-মঙ্গল বা শবরোৎসব (চণ্ডালদের উৎসব) নামে একটি উৎসব করত এবং এই উপলক্ষে অত্যন্ত কুৎসিত আচরণ ও অশ্লীল নৃত্যগীত করত। ব্রাহ্মণেরা তখনও প্রাচীনযুগের মত মুখস্থ বেদ আবৃত্তি করতেন, তবে আগেকার মত শ্রাবণ মাসে উৎসর্গ (বেদ আবৃত্তির আরম্ভ) এবং পৌষ মাসে উপাকর্ম (বেদ আবৃত্তির সমাপ্তি) অনুষ্ঠান না করে শ্রাবণ মাসেই উৎসর্গ ও উপাকর্ম অনুষ্ঠান করতেন; সম্ভবত তাঁরা খুব অল্প পরিমাণে বেদ পড়তেন। তখনও বোধ হয় ব্রাহ্মণেরা চার বর্ণে বিবাহ করতেন, কারণ কোন ব্রাহ্মণের মৃত্যুতে তাঁর ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের স্ত্রীদের গর্ভজাত সন্তানরা কীভাবে অশৌচ পালন করবে, বৃহস্পতি তার বিধান দিয়েছেন। (বৃহস্পতি মিশ্রের 'স্মৃতিরত্নহার' গ্রন্থ থেকে এই সমস্ত তথ্য জানা যায়—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৬১-৬৩ দ্রষ্টব্য)।

কৃত্তিবাসের বিবরণ

কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বেই (বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ১২৫-১২৮) আলোচনা করেছি এবং দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, কৃত্তিবাস রুকনুদ্দীন বারবক শাহের কাছে সংবর্ধনা লাভ করেছিলেন। কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী ('কৃত্তিবাস পরিচয়', পৃঃ ৫-১১ দ্রঃ) থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধের বাংলাদেশ সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায়, যেমন

(১) সেযুগে গৌড়েশ্বর অর্থাৎ বাংলার রাজা নয়-মহলা প্রাসাদে বাস

করতেন। প্রাসাদের ঘরগুলি ছিল সোনালী ও রূপালী রঙের কাজ করা ("সোনারূপার ঘর দেখি মনে চমৎকার")। শীতকালে রাজপ্রাসাদের আঙিনায় উন্মুক্ত সূর্যালোকে রাজার সভা বসত। এই সভা সকালে বসত এবং "সপ্ত ঘটি বেলা" অর্থাৎ বেলা প্রায় সাড়ে ন'টার সময়ে ভঙ্গ হত। আঙিনার ওপর রাঙা "মাজুরি" বিছিয়ে, তার ওপর "পাট নেত তুলি" পেতে সেখানে সভা বসানো হত। সভাতে পাটের চাঁদোয়ার নীচে উপবিষ্ট রাজার পিছনে ও দু'পাশে বিশিষ্ট সভাসদেরা বসে থাকতেন, অন্য সভাসদেরা দাঁড়িয়ে থাকতেন। সভা ভাঙবার পূর্বাহ্নে রাজসভায় নৃত্যগীত ও বিভিন্ন প্রমোদানুষ্ঠান হত; রাজা এ সময়ে কাব্যচর্চাও করতেন, কবি কৃত্তিবাস এই সময়েই রাজার দর্শন পেয়েছিলেন। রাজা কোন কবির কবিতা শুনে খুশি হলে তাঁকে ফুলের মালা ও পাটের পাছড়া দিয়ে সংবর্ধনা করতেন এবং রাজার আদেশে তাঁর কোন বিশিষ্ট সভাসদ কবির মাথায় চন্দনের ছড়া ঢেলে দিতেন। তারপর রাজা কবিকে (কবি চাইলে) অর্থ বা কোন মহার্ঘ উপহার দান করতেন। রাজা অনেক সময় অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিকে ঘোড়া উপহার দিতেন।

(২) সেযুগে বাঙালী ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁরা কুলে-শীলে শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং শাস্ত্রসঙ্গত আচরণ করতেন, তাঁরা শুধু বাংলা দেশে নয়, বাংলার বাইরেও খ্যাতি অর্জন করতেন। বেশি উপবাস করা সে যুগে খুব কৃতিত্বের বিষয় বলে গণ্য হত। কৃত্তিবাসের দুই ভাই—মৃত্যুঞ্জয় এবং শ্রীধর—নিত্য-উপবাসী ছিলেন।

(৩) সেযুগে বাংলার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র অবস্থিত ছিল উত্তর বঙ্গে। ফুলিয়া-নিবাসী কৃত্তিবাস "বড় গঙ্গা" (পদ্মা) পার হয়ে উত্তর বঙ্গে গিয়ে নানা গুরুর কাছে পড়ে সর্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন।[১]

[১] এর থেকে বোঝা যায়, বাংলার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র হিসাবে নবদ্বীপের উদ্ভব তখনও হয় নি; যদি হত, তা হলে কৃত্তিবাস উত্তরবঙ্গে না গিয়ে নবদ্বীপেই পড়তে যেতেন, কারণ নবদ্বীপ ফুলিয়া থেকে মাত্র ১৫।১৬ মাইল দূরে অবস্থিত। বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' ও জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' পড়লে মনে হয় চৈতন্যদেবের জন্মের সময়েই (১৪৮৬ খ্রীঃ) নবদ্বীপ বিদ্যাকেন্দ্র হিসাবে পূর্ণতা লাভ করেছিল। কৃত্তিবাসের ছাত্রজীবন নিঃসন্দেহে ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দের আগেই শেষ হয়েছিল। সুতরাং ১৪৬০ থেকে ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিদ্যাকেন্দ্র হিসাবে নবদ্বীপের অভ্যুদয় ও পূর্ণবিকাশ হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত করা যায়।

সনাতনের বিবরণ

হোসেন শাহের আমল থেকে আবার আমরা বিভিন্ন সমসাময়িক সূত্রে সে যুগের বাংলা দেশের বিশদ ও উজ্জ্বল চিত্র পাচ্ছি। এই সমস্ত সূত্রের মধ্যে সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য হোসেন শাহের মন্ত্রী ও চৈতন্যদেবের পার্ষদ সনাতন গোস্বামীর 'বৃহদ্ভাগবতামৃত'। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবেই শুধু এই বইখানি মূল্যবান নয়, এর মধ্যে যে হোসেন শাহ্ ও তাঁর আমলের বাংলাদেশ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্যও কিছু পাওয়া যায়, তা ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার দেখিয়েছেন; তিনি লিখেছেন, "সনাতন রাজমন্ত্রী ছিলেন। তাই রাজা, মহারাজা ও সার্ব্বভৌম নৃপতির বৈশিষ্ট্য তিনি কয়েক স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন (১।১।৪৫-৪৬; ২।১।১)। গ্রামের এক একজন অধিকারী থাকিতেন; কতকগুলি গ্রামের উপর এক একজন মণ্ডলেশ্বর থাকিতেন; তাঁহাদের উপর মহারাজা ও সর্ব্বোপরি সার্ব্বভৌম বা রাজচক্রবর্ত্তী। মণ্ডলেশ্বরের উপাধি ছিল রাজা।...মণ্ডলেশ্বর ব্রিটিশ আমলের ভারতীয় রাজন্যদের মতন পররাষ্ট্রের আক্রমণ হইতে নিরুদ্বেগে বাস করিতে পারিতেন না।......রাজচক্রবর্ত্তী—সর্ব্ব মণ্ডলের অধিপ সম্রাটের বিবিধ আদেশ, যথা 'ইহা কর', 'ইহা করিও না' ইত্যাদিরূপ আদেশ পরিপালন করিতে যাইয়া অনুভব হইত যে, তিনি অস্বতন্ত্র বা পরাধীন।" (ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী-সাহিত্য, পৃঃ ২৯৯-৩০০)

সনাতন বাংলাদেশের বিবরণ দিতে গিয়েই এই সমস্ত কথা বলেছেন। তাঁর উক্তি অনুসরণ করে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, হোসেন শাহের আমলে—সুলতানের অধীনে বিভিন্ন আঞ্চলিক বিভাগের (ইক্‌লীম্ ?) শাসন-কর্তারা, তাঁদের অধীনে উপবিভাগের (অর্সহ্ ?) শাসনকর্তারা, তাঁদের অধীনে উপবিভাগেরও উপবিভাগের (মুলুক বা মুল্‌ক ?) শাসনকর্তারা এবং তাঁদের অধীনে গ্রামের শাসনকর্তারা ছিলেন।

সনাতন 'বৃহদ্ভাগবতামৃতে' বৈকুণ্ঠেশ্বরের সভায় গোপকুমারের গমনের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার মধ্যেও কিছু ঐতিহাসিক তথ্য প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত রয়েছে বলে মনে হয়। গোপকুমার বৈকুণ্ঠের প্রাসাদের গোপুরে বা প্রধান দ্বারে উপস্থিত হলে দ্বারপাল তাঁকে বহির্দ্বারে অপেক্ষা করতে বলে তাঁর "প্রভু"কে অর্থাৎ উর্দ্ধতন কর্মচারীকে সংবাদ দিতে গেলেন। "প্রভু" গোপকুমারের আগমনসংবাদ শুনে প্রাসাদে প্রবেশের অনুমতি দিলেন।

তারপর প্রতি দ্বারে দ্বারপালেরা নিজের নিজের অধ্যক্ষকে জানিয়ে গোপ-কুমারকে প্রবেশ করাতে লাগলেন। বৈকুণ্ঠেশ্বরের যত কাছে যে দ্বারপাল থাকেন, তিনি তাঁর চেয়ে দূরে অবস্থিত দ্বারপালের মাননীয়। দ্বারপালেরা এক দ্বার থেকে অন্য দ্বারে গমন করে সেই দ্বারের অধিকারীদের প্রণাম করতে লাগলেন। গোপকুমার দেখলেন যে, যাঁরা প্রাসাদে প্রবেশ করছেন, তাঁরা শুধু-হাতে যাচ্ছেন না, নানারকম ভেট নিয়ে যাচ্ছেন। বৈকুণ্ঠেশ্বরের সভায় প্রবেশ করে গোপকুমার দেখলেন যে রত্নখচিত সুন্দর স্বর্ণময় সিংহাসনে গদি পাতা রয়েছে এবং তার উপর সুন্দর সুন্দর সব তাকিয়া রয়েছে, বৈকুণ্ঠেশ্বর তাকিয়ায় কনুই রেখে বসে আছেন।

যতদূর মনে হয়, হোসেন শাহকে দর্শনের জন্য যাঁরা তাঁর সভায় যেতেন, তাঁদের এই গোপকুমারেরই অনুরূপ অভিজ্ঞতা লাভ হত এবং হোসেন শাহের প্রাসাদেও বৈকুণ্ঠেশ্বরের প্রাসাদের অনুরূপ আদবকায়দা প্রচলিত ছিল। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন, "সনাতন গোস্বামী বৈকুণ্ঠের ভগবানের খাস্ প্রাসাদ বুঝাইতে মুসলমানী মহাল শব্দও টীকায় ব্যবহার করিয়াছেন—শ্রীমতো মহল্লপ্রবরস্য পরমোত্তমান্তঃপুরবিশেষস্য মধ্যে প্রাসাদমেবং (২।৪।৬৩ টীকা)।" (ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী-সাহিত্য, পৃঃ ৩০২)

ভারথেমার বিবরণ

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে—১৫০৩ থেকে ১৫০৮ খ্রীঃর মধ্যে ভারথেমা নামে একজন ইতালীয় পর্যটক ভারতবর্ষে আসেন। তিনি অল্প সময়ের জন্য বাংলাদেশেও এসেছিলেন এবং এখানকার একটি বন্দর-শহর দর্শন করে তার বিবরণ লিখে রেখে গিয়েছেন। ভারথেমা ঐ বন্দর-শহরের নাম বলেছেন "Banghella"। এই "Banghella"র অবস্থান সম্বন্ধে কিছু মতভেদ আছে। দুয়ার্তে বারবোসার বাংলাদেশ-সংক্রান্ত বিবরণে "Bengala" নামে বাংলার একটি বন্দর-শহরের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারথেমার "Banghella" ও বার-বোসার "Bengala" অভিন্ন বলেই মনে হয় এবং খুব সম্ভবত এই বন্দর শহরটি চট্টগ্রামের খুব কাছে এবং তার ঠিক উল্টো দিকে অবস্থিত ছিল। ভারথেমার ভ্রমণ-বিবরণের (Itnerario de Ludovico de Varthema etc. নামে ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত) ইংরেজী অনুবাদের (J. W. Jones কৃত; Hakluyt Society, London থেকে প্রকাশিত) ভূমিকায় (p. lxxx)

সম্পাদক G. P. Badger লিখেছেন, "In an old Dutch Latin Geograpby book,...with wonderfully good maps, by J and C. Blaen, (no title ; date about 1640, as Charles I is spoken of as reigning,) I find *Bengala* put down as a town close and opposite to *Chatigam* (Chittagong.)"

ভারথেমার ভ্রমণ-বিবরণের প্রাসঙ্গিক অংশ নীচে উদ্ধৃত হল,

"আমরা বাংঘেলা শহরের দিকে রওনা হলাম। ঐ শহর টার্নাস্‌সরি (টেনাসেরিম) থেকে সাতশো মাইল দূর, সেখান থেকে এখানে আমরা সমুদ্রপথে এলাম এগারো দিনে। আমি এ পর্যন্ত যত শহর দেখেছি, তার মধ্যে এটি (বাংঘেলা) অন্যতম শ্রেষ্ঠ, এবং খুব বড় রাজার অধীন। এই স্থানের রাজা একজন মুর (মুসলমান); তিনি দু'লক্ষ পদাতিক ও অশ্বারোহীকে যুদ্ধের জন্য নিয়োজিত রেখেছেন, তারা সবাই মুসলমান। তিনি সব সময়েই নরসিংঘের (উড়িষ্যার ?) রাজার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন। এই দেশে শস্য, সব রকমের মাংস, চিনি, আদা এবং তুলা পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলির তুলনায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এখানেই আমি সবচেয়ে ধনী বণিকদের দেখা পেয়েছি। এই স্থানে প্রতি বছর পঞ্চাশটি জাহাজ তুলা ও রেশমের দ্রব্যে—অর্থাৎ বৈরাম, নামোন, লিজাতি, সিআনতার, দোআজার ও সিনাবাফ প্রভৃতি বস্ত্রে—(রপ্তানীর জন্য) বোঝাই হয়। এই সব জিনিস গোটা ভারত, গোটা তুরস্ক, সিরিয়া, পারস্য, আরব উপদ্বীপ ও ইথিওপিয়ায় চালান যায়। এখানে জহরতের খুব বড় ব্যবসায়ী অনেক আছে, এই সব জহরৎ অন্যান্য দেশ থেকে আমদানী হয়।

"এখানে আমাদের কয়েকজন খ্রীষ্টান বণিকের সঙ্গে দেখা হল। তাঁরা বললেন যে তাঁরা সারনৌ (?) নামে একটি শহর থেকে এসেছেন। তাঁরা রেশমের জিনিস, মুসব্বর, ধুনা, কস্তুরী প্রভৃতি বিক্রী করবার জন্যে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা ক্যাথের মহান্ খানের প্রজা।[১]

"...বাংঘেলা থেকে বিদায় নেবার আগে আমরা প্রবালগুলি,[২] জাফরান

[১] এর থেকে বোঝা যায়, ঐ সময়ে সুদূর চীন ও মঙ্গোলিয়ার লোকেরা বাংলায় ব্যবসায়-বাণিজ্য করতে আসত।

[২] প্রবালের জিনিসগুলি "বাংঘেলা"র চেয়ে পেগো (পেগু)-তে বেশী দামে বিক্রী হত। এইজন্য পূর্বোক্ত চীনা খ্রীষ্টান বণিকরা ভারথেমা এবং তাঁর সঙ্গীদের তাঁদের আনা প্রবালগুলি পেগোতে নিয়ে গিয়ে বিক্রী করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

এবং ফ্লোরেন্স থেকে আনা দু'টি গোলাপী রঙের কাপড় ছাড়া আর সব বাণিজ্যিক সামগ্রীই বিক্রী করলাম। (তারপর) আমরা শহরটি ত্যাগ করলাম। আমার বিশ্বাস, থাকার জন্য এই শহরটিই পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ। আপনারা যে সব বস্ত্রের কথা ইতিপূর্বে (আমার কাছ থেকে) শুনেছেন, সেগুলি এই শহরে স্ত্রীলোকেরা বোনে না, পুরুষরা বোনে।

সেখান থেকে আমরা পূর্বোক্ত খ্রীষ্টানদের সঙ্গে রওনা হলাম এবং বাংঘেলা থেকে ১০০০ মাইল দূরে অবস্থিত পেগো নামক একটি শহরের দিকে যাত্রা করলাম।"

বারবোসার বিবরণ

ভারথেমার সমসাময়িক আর একজন ইউরোপীয় বণিক প্রায় একই সময়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। ইনি জাতিতে পর্তুগীজ। এঁর নাম দুয়ার্তে বারবোসা। বিখ্যাত নাবিক ম্যাগেলান এঁর জ্ঞাতি।

বারবোসা বাংলাদেশ সমেত ভারতবর্ষের বহু অঞ্চলে ভ্রমণ করেছিলেন। এই ভ্রমণের বিবরণ পাওয়া যায় তাঁর লেখা Liuro em que da relacão do que viu e ouviu no Oriente বই থেকে।

বারবোসা কোন্ বছরে বাংলা দেশে ভ্রমণ করেছিলেন, তা তিনি বলেন নি, তবে তাঁর ভ্রমণ-বিবরণে দিউ-এর বর্ণনা, ওরমুজ অধিকারের বৃত্তান্ত, কালিকটে পর্তুগীজদের দুর্গ প্রতিষ্ঠা এবং পর্তুগীজদের ভারতীয় জাহাজ দখল করে' ভারতীয়দের সামুদ্রিক বাণিজ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করা প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ থাকার জন্য মনে হয়, ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে বারবোসা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করেন।

বারবোসা তাঁর দেখা বাংলাদেশের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, তা' নীচে উদ্ধৃত হ'ল।

"উড়িষ্যা (Otisa) রাজ্য—এটি পৌত্তলিকদের দেশ...'গ্যান্জেস্' নদী পর্যন্ত সমুদ্রতটের সত্তর লীগ পরিমিত স্থান জুড়ে বিস্তৃত। একে ('গ্যান্জেস্'কে) এরা বলে 'গুএঙ্গা' (গঙ্গা)। এই নদীর অপর পার থেকে বাংলা রাজ্যের সুরু। এর সঙ্গে উড়িষ্যার রাজার কখনও কখনও যুদ্ধ হয়। সব ভারতীয়রা তীর্থযাত্রা উপলক্ষে এই নদীতে (গঙ্গায়) গিয়ে স্নান করে, তারা বলে যে এতে তারা সবাই নিরাপদ হয়, কারণ এমন একটি ঝর্ণা থেকে

এটি (গঙ্গা) বেরিয়েছে, যা পৃথিবীর স্বর্গ। এই নদীটি বিরাট এবং অতি সুন্দর। এর দুই তীরে পৌত্তলিকদের বহু সমৃদ্ধ ও অভিজাত নগর অবস্থিত। এই নদী এবং ইউফ্রেটিস নদীর মাঝখানে রয়েছে প্রথম ও দ্বিতীয় ভারত। ঐ অঞ্চল খুব সমৃদ্ধ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বাস্থ্যকর ও নাতিশীতোষ্ণ; এই নদী থেকে সুরু করে মালাকা (মালাক্কা) পর্যন্ত অঞ্চলকে মুরেরা (মুসলমানেরা) বলে তৃতীয় ভারত।[১]

'গ্যান্‌জেস' (গঙ্গা) নদী পার হয়ে (উড়িষ্যা থেকে) সমুদ্রতট ধরে উত্তর-পূর্বে কুড়ি লীগ গিয়ে তারপর পূর্বে গেলে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে কুড়ি লীগ গিয়ে তারপর পূর্ব দিকে বারো লীগ দূরবর্তী প্যারালেম (?) নদী পর্যন্ত গেলে বাংলা (Bengala) রাজ্যে পৌছোনো যাবে। এই রাজ্যের ভিতরের দিকে এবং সমুদ্রতটে অনেক শহর আছে। ভিতরের শহরগুলিতে পৌত্তলিকেরা বাস করে। তারা বাংলার রাজার প্রজা; তিনি (বাংলার রাজা) একজন মুর (মুসলমান)। সামুদ্রিক বন্দরগুলিতে মুর ও পৌত্তলিকেরা বাস করে। তারা বহু জিনিসপত্রের ব্যবসায় করে এবং বহু স্থানে জাহাজ নিয়ে যায়; এই সমুদ্র একটি উপসাগর, এটি উত্তর দিকে (স্থলভাগের মধ্যে) প্রবেশ করেছে। এর অভ্যন্তরে প্রত্যন্তদেশে একটি বিরাট শহর আছে। সেখানে মুররা বাস করে। তার নাম 'বেংগালা'। সেটি একটি ভাল বন্দর। এর অধিবাসীরা শ্বেতকায়, তাদের দেহ সুগঠিত। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত বহু বিদেশী এই শহরে বাস করে, আরব ও ইরানী দুই জাতের লোকেরা, হাবশীরা এবং ভারতীয়েরা এখানে সম্মিলিত হয়েছে,—কারণ দেশটি অত্যন্ত উর্বর, এর জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। এরা সকলেই বড় ব্যবসায়ী, এদের নিজেদের বড় জাহাজগুলির নির্মাণকৌশল মক্কার জাহাজের মত, অন্য জাহাজগুলি চীনদেশের পদ্ধতিতে তৈরী, তাদের এরা বলে "জাঙ্গো" (jungo = junk); এগুলি খুবই বৃহৎ এবং যথেষ্ট পরিমাণে মাল বহন করে। এইসব জাহাজ নিয়ে এরা চোল-মান্দার, মালাবার, কাম্বে, পেগু, টার্নাসারি (টেনাসেরিম্‌), সমাত্রা (সুমাত্রা), সিংহল এবং মালাকায় যায়। এরা নানা জায়গায় বহু রকম জিনিসের ব্যবসায় করে।

এই দেশে প্রচুর তুলা এবং আখের চাষ হয়, এখানে খুব ভাল আদা এবং

[১] নিকলো কন্তির বিবরণেও অনেকটা এই ধরনের কথা পাওয়া যায়।

লম্বা মরিচ জন্মায়। এরা অনেক রকমের কাপড় তৈরী করে, সেগুলি খুব মিহি আর নরম। এরা নিজেদের ব্যবহারের জন্য রঙীন কাপড় এবং আর সব জায়গায় বাণিজ্যের জন্য সাদা কাপড় তৈরী করে। এগুলিকে এরা বলে সারাভেতি, মেয়েদের শিরোবাস হিসাবে এগুলি খুব চমৎকার, এই কাজে এদের মূল্য খুব বেশী। আরবেরা এবং ইরানীরা এই কাপড়ে এত বেশী টুপি তৈরী করে যে, প্রত্যেক বছর তারা তা দিয়ে বহু জাহাজ ভর্তি করে' বিভিন্ন স্থানে পাঠায়। এরা (বাংলার লোকেরা) অন্যরকম কাপড়ও বানায়; কোনটাকে তারা বলে মামুনা, কোনটাকে দুগুজা (দুগজি?), কোনটাকে চাউতর (চাদর). কোনটাকে তোপান, কোনটাকে সানাবাফোজ; জামা তৈরীর জন্য এগুলি খুব মূল্যবান। এগুলি খুব টেকসই। এগুলির প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য কুড়ি হাত অথবা তার সামান্য বেশী বা কম। এই শহরে ('বেংগালা'য়) তাদের সবগুলির দামই সস্তা। এগুলি পুরুষে বোনে চাকা আর মাকু দিয়ে।

"এই শহরে (বেংগালায়) খুব ভাল জাতের সাদা চিনি তৈরী হয়, কিন্তু এ' (সাদা চিনি) দিয়ে কী করে পাঁউরুটি তৈরী করতে হয়, তা এরা জানে না। তাই এরা তাকে গুঁড়ো করে ভালভাবে সেলাই করে', কাঁচা পশুচর্মে ঢাকা কাপড়ে 'প্যাক' করে। তারা এ' দিয়ে বহু জাহাজ বোঝাই করে এবং সব দেশে বিক্রীর জন্য রপ্তানী করে। যখন এইসব ব্যবসায়ী স্বাধীনভাবে নির্ভয়ে মালাবার ও কাম্বে বন্দরে জাহাজ নিয়ে যেত, তখন এক বস্তা চিনির দাম মালাবারে ছিল আড়াই ডুকাট, একটি ভাল সিনাবাফোর দাম দুই ডুকাট, মেয়েদের একটি টুপির উপযোগী এক টুকরো মসলিনের দাম তিনশো মারাভেদিস, সবচেয়ে ভাল জাতের একটি চাউতরের (চাদর) দাম ছ'শো মারাভেদিস। যারা এগুলি নিয়ে যেত, তারা অনেক টাকা লাভ করত।

"বাংলার এই শহরের (বেংগালার) লোকেরা আদা, কমলালেবু, লেবু এবং এদেশে অন্য যে সমস্ত ফল ফলে, তাই দিয়ে খুব ভাল মোরব্বা তৈরী করে। এই দেশে ঘোড়া, গরু ও ভেড়া অনেক আছে। অন্য মাংসও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, খুব অসাধারণ রকমের বড় মুরগীও মেলে। এই শহরের মুরিশ (মুসলমান) বণিকেরা দেশের ভিতরে গিয়ে বহু পৌত্তলিক বালককে কেনে তাদের পিতামাতার অথবা যারা তাদের চুরি করে, তাদের কাছ থেকে—এবং তাদের নপুংসক বানায়। তাদের (ঐ বালকদের) মধ্যে কেউ কেউ এতে মারা যায়; যারা বেঁচে যায়, তাদের এরা খুব ভালভাবে মানুষ

করে এবং পণ্য হিসাবে ইরানীদের কাছে লোক পিছু কুড়ি বা ত্রিশ ডুকাট দামে বিক্রী করে; তারা (ইরানীরা) তাদের স্ত্রীদের এবং ঘরবাড়ীর রক্ষক হিসাবে এদের খুব মূল্যবান জ্ঞান করে। এই শহরের সম্ভ্রান্ত মুররা পরে লম্বা মরিসকো জামা; এগুলি সাদা রঙের, এদের বুনানি হালকা এবং পায়ের উপর দিক পর্যন্ত এগুলি প্রসারিত; ভিতরে এরা পরে একধরনের বস্ত্র, তা কোমরের নীচে জড়ানো থাকে। এদের জামার উপরে থাকে কোমর ঘিরে জড়ানো একটি রেশমী বন্ধনী (sash) এবং রূপা-বসানো ছোরা। তারা আঙুলে রত্ন-খচিত আংটি পরে এবং মাথায় দেয় মিহি সুতি-কাপড়ের তৈরী টুপি। এরা বিলাসী লোক, খুব বেশী পরিমাণে পানভোজন করে এবং এদের অন্যান্য খারাপ অভ্যাসও আছে। এদেব বাড়ীতে বড় বড় পুকুর আছে, তাতে এরা বারবার স্নান করে। এদের অনেকগুলি করে চাকর থাকে। প্রত্যেকের তিন চারটি স্ত্রী আছে, আরও যতগুলি (উপপত্নী) তারা রাখতে পারে রাখে। তাদের (স্ত্রীদের) এরা একেবারে আবদ্ধ করে রাখে, খুব দামী পোষাক পরায় এবং রেশম ও রত্নখচিত স্বর্ণালঙ্কার দিয়ে সাজিয়ে রাখে। এরা রাত্রিতে পরস্পরের সঙ্গে দেখা করতে এবং মদ্যপান করতে বার হয়; উৎসব ও বিবাহের ভোজ রাত্রিতেই করে। এই দেশে নানারকমের মদ তৈরী হয়, প্রধানত চিনি আর তালগাছ থেকেই তা তৈরী হয়, এ ছাড়া অন্য অনেক জিনিস থেকেও হয়। স্ত্রীলোকেরা এই সব মদ খুব ভালবাসে, এতেই তারা অভ্যস্ত। এরা (বাঙালীরা) ভাল সঙ্গীতজ্ঞ, গান গাওয়া আর বাজনা বাজানো দুইই পারে। সাধারণ স্তরের পুরুষেরা খাটো সাদা জামা পরে, সেগুলি উরুর আধখানা অবধি প্রসারিত। এছাড়া এরা পায়জামা (drawers) পরে এবং মাথায় তিন চার পাক দিয়ে ছোট পাগড়ী জড়ায়। এরা সবাই চামড়ার জুতা পায়ে দেয়; কেউ পরে বড় জুতা (shoe), কেউ পরে খুব সুন্দরভাবে তৈরী রেশমী এবং সোনালী সুতা দিয়ে সেলাই করা চটিজুতা।

"(এখানকার) রাজা খুব বড় এবং ধনী নৃপতি। তাঁর রাজ্য বিস্তীর্ণ এবং ঘনবসতিপূর্ণ। এই অঞ্চলগুলির পৌত্তলিকরা প্রত্যহই (অনেকে) মুর (মুসলমান) হয়ে যায়, শাসকদের অনুগ্রহ পাবার জন্য। 'বেংগালা' শহর থেকে দূরে দূরে দেশের ভিতরে ও সমুদ্রতটে উভয় স্থানেই আরও অনেক শহর আছে, সেখানেও এই রকম মুর ও পৌত্তলিকদের বাস; তারা এই

রাজার প্রজা। এই সব শহরে তিনি শাসনকর্তাদের এবং তাঁর প্রাপ্য শুল্ক ও রাজস্ব আদায় করার জন্য কর্মচারীদের নিযুক্ত রাখেন।"

বাবরের বিবরণ

ভারথেমা এবং বারবোসার বিবরণে আলাউদ্দীন হোসেন শাহের শাসনাধীন বাংলাদেশ সম্বন্ধে সংবাদ পাওয়া যায়। এই দুই বিবরণের কয়েক বছর পরে রচিত বাবরের আত্মকাহিনীতে নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ এবং তাঁর আমলের বাংলাদেশ সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। অবশ্য বাবর স্বয়ং বাংলাদেশে কোনদিন আসেননি। তবে তিনি তাঁর আত্মকাহিনীতে বাংলাদেশ ও তার রাজার যেটুকু বিবরণ দিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য, কারণ বিশ্বস্ত সংবাদ-দাতাদের দেওয়া সংবাদের উপর নির্ভর করে তিনি এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। বাবরের বিবরণ নীচে উদ্ধৃত হ'ল।

"বাংলা দেশের রাজা নসরৎ শাহ। তাঁর পিতা ছিলেন জনৈক সৈয়দ। তিনি আলাউদ্দীন নাম নিয়ে বাংলাদেশে রাজত্ব করেছিলেন। নসরৎ শাহ উত্তরাধিকার সূত্রে রাজত্ব লাভ করেন। বাংলার একটি বিস্ময়কর প্রথা এই যে, এখানে উত্তরাধিকারসূত্রে সিংহাসনে আরোহণ খুব কমই ঘটে। রাজার পদ স্থায়ী এবং আমীর, উজীর ও মনসবদারদের পদ স্থায়ী। পদকেই বাঙালীরা শ্রদ্ধা করে। প্রত্যেক পদের অধীনে একদল বিশ্বস্ত ও অনুগত কর্মচারী আছে। রাজার মন যদি চায় যে, কোন একজন লোক বরখাস্ত হয়ে তার জায়গায় আর একজন লোক নিযুক্ত হোক্, তা'হলে ঐ পদের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত কর্মচারী নবনিযুক্ত ব্যক্তির কর্মচারী হয়। খাস রাজার পদের মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্য আছে। যে কোন লোক রাজাকে বধ করে নিজে সিংহাসনে বসলে সে-ই রাজা হয়। আমীরেরা, উজীরেরা, সৈন্যেরা ও কৃষকেরা তক্ষণি তার বশ্যতা স্বীকার করে, তাকে ভক্তি করে এবং তার পূর্ববর্তী রাজার জায়গায় তাকেই আইনসঙ্গত রাজা বলে স্বীকার করে। বাঙালীরা বলে, "আমরা সিংহাসনের প্রতি বিশ্বস্ত; যে সিংহাসন অধিকার করে, তাকেই আমরা অনুগতভাবে ভক্তি করি।" দৃষ্টান্তস্বরূপ, নসরৎ শাহের পিতা আলাউদ্দীনের রাজত্বের আগে একজন হাবশী তার রাজাকে বধ করে সিংহাসনে আরোহণ করেছিল এবং কিছু সময় রাজত্ব করেছিল। আলাউদ্দীন ঐ হাবশীকে বধ করে সিংহাসনে বসেন এবং রাজা হন। বাংলা

দেশে আর একটি প্রথা আছে। কোন রাজার পক্ষে পূর্ববর্তী রাজাদের সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করা অগৌরবজনক বলে গণ্য হয়। রাজা হবার পরে তিনি নিজের অর্থ নিজেই সংগ্রহ করেন। বাংলাদেশে আরও একটি নিয়ম আছে। প্রত্যেক রাজকীয় ব্যয় এবং কোষাগার, মন্দুরা প্রভৃতি ব্যয় নির্বাহের জন্য বিভিন্ন পরগণা নির্দিষ্ট আছে। এই সমস্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য অন্য কোন জমি থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হয় না।

"উপরে উল্লিখিত এই পাঁচজনই (অর্থাৎ নসরৎ শাহ্ এবং দিল্লী, গুজরাট, বাহমনী ও মালবের সুলতান) শ্রেষ্ঠ মুসলমান নৃপতি। ভারতবর্ষে এঁদের সম্মানিত আসন। এঁদের সৈন্যসংখ্যা বিপুল, রাজ্যও বিশাল।"

বক্সারের কাছে ঘর্ঘরা নদীর উপরে বাংলার সুলতানের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে বাবরের সৈন্যবাহিনীর যে যুদ্ধ হয়েছিল, বাবর তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন তাঁর আত্মকাহিনীতে। আমরা আগেই এই বিবরণের সংক্ষিপ্তসার উদ্ধৃত করেছি এবং এ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় মন্তব্য করেছি (পৃঃ ৪২০-৪২৩ দ্রঃ)।

বাঙালীরা যে যোদ্ধা হিসাবে মোটেই হীনবল ছিল না, তার প্রমাণ বাবর-প্রদত্ত যুদ্ধের বর্ণনা থেকেই পাওয়া যায়। বাবরের অধীনস্থ সিকন্দরপুরের শিকদার মাহ্‌মুদ খান বাবরকে লিখেছিলেন, তিনি ঘর্ঘরা নদী পার হবার জন্য, " 'হলদী'র ঘাটে ৫০টি নৌকা সংগ্রহ করেছেন এবং মাঝিদের ভাড়া দিয়েছেন, কিন্তু তারা বাঙালীরা আসছে গুজব শুনে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছে।"

এই যুদ্ধে বাবরের বাহিনী বেঁটে কামান (mortar), দীর্ঘ সর্পাকার হাতলযুক্ত কামান (culverin) এবং ফিরিঙ্গী (পাথর নিক্ষেপ করার যন্ত্র) প্রভৃতি অস্ত্র ব্যবহার করেছিল। বাংলার বাহিনীও এই সমস্ত অস্ত্র ব্যবহার করেছিল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। বাঙালী গোলন্দাজদের কামান-চালনার নৈপুণ্য সম্বন্ধে বাবর যে মন্তব্য করেছেন, তা আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি (পৃঃ ৪২১ দ্রঃ)।

জোআঁ-দে-বারোসের বিবরণ

পর্তুগীজ ঐতিহাসিক জোআঁ-দে বারোসের লেখা প্রামাণিক ইতিহাসগ্রন্থ 'Da Asia' ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত হয়। এই গ্রন্থে গিয়াসুদ্দীন

মাহ্‌মূদ শাহের রাজত্বকালের গৌড় শহরের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা নীচে উদ্ধৃত হল।

"(গৌড়ের) রাস্তাগুলি খুব চওড়া আর সোজা। প্রধান প্রধান রাস্তাগুলিতে দেওয়াল-বরাবর সারে সারে গাছ লাগানো। এখানকার লোকের সংখ্যা খুব বেশী। জনতা এবং যানবাহনের ভীড়ে রাজপথগুলি সমাকীর্ণ। যারা রাজসভায় যেতে চায়, তাদের ভীড় এত বেশী যে তাদের একজন আর একজনকে অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে পারে না। এই শহরের একটা বড় অংশ সুরম্য ও সুনির্মিত প্রাসাদে ভর্তি।"

কোন প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে শুনে জোঁআ-দে-বারোস এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন বলে মনে হয়।

সাতগাঁও এবং চাটগাঁও বন্দর সম্বন্ধে জোআঁ-দে-বারোস যা লিখেছেন, তা'ও উদ্ধারযোগ্য। তিনি লিখেছেন, "(গঙ্গা নদীর) প্রথম মোহানা পশ্চিম দিকে। একে 'সাতিগান্' (সাতগাঁও) বলা হয়, নদীর উপরে এই নামের একটি শহর আছে। এখানে আমাদের লোকেরা (অর্থাৎ পর্তুগীজরা) বাণিজ্যিক কাজকর্ম করে। অন্য মোহানাটি পূর্ব দিকে। এর (মোহানার) খুব কাছেই আর একটি অধিকতর বিখ্যাত বন্দর আছে। এর নাম 'চাটিগান্' (চাটগাঁও)। বিভিন্ন রাজ্য থেকে যে সব বণিক যাওয়া-আসা করে, তাদের অধিকাংশই এই বন্দর ব্যবহার করে।"

বৃন্দাবনদাসের বিবরণ

বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' থেকে সে যুগের বাংলাদেশ সম্বন্ধে অজস্র তথ্য পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে বৃন্দাবনদাস যে সমস্ত ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন, তাদের প্রায় সবগুলিই হোসেন শাহের রাজত্বকালের। সুতরাং এর মধ্যে যে সমস্ত তথ্য মেলে, তাদের হোসেন শাহী আমল সংক্রান্ত তথ্য বলেই গ্রহণ করা যায়। অবশ্য দু'একটি ক্ষেত্রে হয়তো লেখক কালবৈষম্য করেছেন, এমন কোন কোন বিষয়ের অবতারণা করেছেন, যা হোসেন শাহী আমলে ছিল না ; সেগুলি তার পরবর্তী কালের অথবা 'চৈতন্যভাগবত' রচনার সমকালের বিষয়। কিন্তু এই জাতীয় ব্যাপারগুলিও আমাদের আলোচ্য সময়েরই (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রীঃ) ব্যাপার, কারণ 'চৈতন্যভাগবত' ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে অথবা তার সামান্য পরেই রচিত হয়েছিল।

সুতরাং বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে আমরা যে সব তথ্য পাই, তাদের ভিত্তিতে হোসেন শাহ ও তাঁর বংশধরদের রাজত্বকালের বাংলাদেশের একটি উজ্জ্বল ও প্রামাণিক আলেখ্য রচনা করা যেতে পারে।*

বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' থেকে জানা যায় যে, সে যুগে নবদ্বীপ খুব বিশাল ও সমৃদ্ধ নগর ছিল। রাঢ়, পূর্ববঙ্গ, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, উড়িষ্যা প্রভৃতি নানা স্থানের লোকেরা এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন।[১] নবদ্বীপের সম্পদ ছিল অপরিমেয়। এখানে এক এক গঙ্গাঘাটে "লক্ষ লোক" স্নান করত। নবদ্বীপে অসংখ্য পণ্ডিত ও অধ্যাপক বাস করতেন, নানা দেশ থেকে ছাত্রেরা নবদ্বীপে এসে বিদ্যাশিক্ষা করত। এখানে বালকেরা এতখানি বিদ্যা অর্জন করত যে তারা ভট্টাচার্যদের সঙ্গেও তর্ক করত।[২] কিন্তু এই সব অধ্যাপক ও ছাত্রেরা কৃষ্ণভক্ত ছিলেন না, এমন কি যাঁরা গীতা বা ভাগবত পড়াতেন, তাঁরাও না। দু'একজন কেবল স্নানের সময় 'গোবিন্দ' বা 'পুণ্ডরীকাক্ষ' নাম উচ্চারণ করতেন।[৩]

তন্তুবায়, গোয়ালা, গন্ধবণিক, মালাকার, তাম্বুলী, শঙ্খবণিক, খোলাবেচা (থোড়, কলা, মূলা, খোলা প্রভৃতির বিক্রেতা) প্রভৃতি নানা জাতির ও পেশার লোক নবদ্বীপে বাস করত।[৪] অনেক তপস্বী, সন্ন্যাসী, জ্ঞানী, যোগীও এখানে বাস করতেন, এঁরা কৌমার্যব্রতধারী ছিলেন, অনেকে কোন দান পরিগ্রহ করতেন না।[৫]

নবদ্বীপে বহু অধ্যাপক ছিলেন। এরা ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী, মিশ্র, আচার্য প্রভৃত উপাধি দ্বারা পরিচিত হতেন; নানা শাস্ত্রে এঁরা পণ্ডিত ছিলেন।[৬] প্রত্যেকেরই অনেক ছাত্র থাকত, এই সব ছাত্রেরা গঙ্গায় স্নানের সময় নিজের গুরুর উৎকর্ষ ও অপরের গুরুর অপকর্ষ প্রচার করে ঝগড়া-মারামারি করত।[৭] ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ন্যায়, স্মৃতি প্রভৃতি নানা শাস্ত্র এখানে পড়ানো হত। কোন কোন পণ্ডিতের টোল তাঁর বাড়ীতেই ছিল[৮], কেউ কেউ আবার অপরের বাড়ীতে (সাধারণত কোন ধনী ব্যক্তির দালানে বা চণ্ডীমণ্ডপে) টোল বসাতেন।[৯] টোল বসত সকালে ও বিকালে।[১০] ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেরই জীবনযাত্রা ছিল নিষ্কিঞ্চন, অনেকে আবার অত্যন্ত

*পরবর্তী পাদটীকাগুলির সঙ্কেত ব্যাখ্যার জন্য একাদশ অধ্যায়ের সর্বশেষ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

১ আ ২ (১০) ২ আ ২ (১১) ৩ আ ২ (১১) ৪ আ ৮ (৫৭-৫৯) ৫ ম ১০ (১৫৯)
৬ আ ২ (১১) ৭ আ ৬ (৩৬) ৮ আ ৬ (৩৬) ৯ আ ৭ (৪৮) ১০ ম ১ (১০০)

আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন করতেন[১১]; এরা দোলাতেও চড়তেন।[১২] নবদ্বীপের বাইরে বাংলার অন্যান্য জায়গাতেও বিদ্যা-কেন্দ্র ছিল।[১৩] সে যুগে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা ভক্ত ও শিষ্যদের কাছে সোনা, রূপা, জলপাত্র, আসন, সুরঙ্গ-কম্বল প্রভৃতি জিনিস উপহার পেতেন।[১৪]

নবদ্বীপে তথা সমগ্র বাংলাদেশে সে সময় হিন্দুদের মধ্যে অনেক লৌকিক দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। কেউ বিষহরীর (মনসা) পূজা করত, কেউ বহু ধন দিয়ে "পুত্তলি" করত, কেউ নানা উপচার দিয়ে বাসুলীর পূজা করত, কেউ বা মদ্য-মাংস দিয়ে যক্ষপূজা করত; এই সব পূজা উপলক্ষে নৃত্য-গীত-বাদ্য-কোলাহল অনেক হত।[১৫] চণ্ডীর পূজাও অনেকে করত, বিশেষ ভাবে করত চোর-ডাকাতরা।[১৬] চণ্ডীভক্তরা "জাগরণ" করে মঙ্গল-চণ্ডীর গীত করত, এবং এই উদ্দেশ্যে ভাল ভাল গায়েন আনাত।[১৭] ষষ্ঠীর পূজাও প্রচলিত ছিল।[১৮] লোকে "যোগিপাল-ভোগিপাল-মহীপালের গীত" (পালরাজাদের কীর্তিকাহিনী বিষয়ক গান?) শুনতেও ভালবাসত।[১৯]

শিশুর জন্মের পর যথাসময়ে বালক-উত্থান, নামকরণ প্রভৃতি পর্ব অনুষ্ঠিত হত; তারপর কয়েক (পাঁচ?) বছর বয়স হলে কর্ণবেধ ও চূড়াকরণ সহকারে হাতে-খড়ি অনুষ্ঠিত হত।[২০] ব্রাহ্মণ-সন্তানদের উপনয়নের বয়স হলে উপনয়ন অনুষ্ঠিত হত; এই উপলক্ষে বন্ধুবান্ধবরা নিমন্ত্রিত হত, নারীরা কৃষ্ণের জয়ধ্বনি দিত, নটেরা মৃদঙ্গ, সানাই ও বাঁশী বাজাত, ব্রাহ্মণরা বেদ পাঠ করত ও ভাটেরা রায়বার পড়ত।[২১] ব্রাহ্মণদের পক্ষে সন্ধ্যা করা ও সন্ধ্যার শেষে কপালে তিলক কাটা অবশ্যকর্তব্য বলে গণ্য হ'ত।[২২]

সে যুগে ভণ্ড সন্ন্যাসী, অমিতাচারী সন্ন্যাসী ও জাল মহাপুরুষের অভাব ছিল না। কোন কোন সন্ন্যাসী (!) বিবাহিত ছিল এবং তারা মদ্যপান করত; সুরাকে তারা বলত "আনন্দ",[২৩] এরা সাধারণত শাক্ত হত।[২৪] জাল মহাপুরুষরা নিজেদের ভগবান বলে প্রচার করত এবং এদের মধ্যে কেউ 'রঘুনাথ', কেউ 'গোপাল' বলে নিজেদের অভিহিত করত।[২৫] এক-

১১ ম ৭ (১৩৩) ১২ ম ৭ (১৩৪) ১৩ আ ১০ (৬৯-৭০) ১৪ আ ১০ (৭১) ১৫ আ ২ (১১) ১৬ আ ৩ (২১) ও অ ৫ (৩১২) ১৭ ম ১৩ (১৭০) ১৮ অ ৪ (২৯৩) ১৯ অ ৪ (২৯৩) ২০ আ ৩ (১৮-১৯) ও আ ৪ (২৬) ২১ আ ৬ (৩৫-৩৬) ২২ আ ১০ (৭৩) ২৩ ম ১৯ (১৯৭) ও অ ২ (২৬১) ২৪ অ ২ (২৬১) ২৫ ম ১৭ (১৮৮) ও আ ১০ (৭০)

দল তান্ত্রিক মধুমতী সিদ্ধি জানে বলে লোকের ধারণা ছিল। তারা নাকি রাত্রে মদ খেয়ে মন্ত্র পড়ে পঞ্চকন্যা আনত। তাদের সঙ্গে নানারকম খাবার, মালা ও কাপড়ও আসত। এই সব সাধকরা ঐ খাবার খেয়ে উক্ত পঞ্চকন্যার সঙ্গে রমণ করত।[২৬]

তখনও 'দুর্গোৎসব' ছিল বাংলার প্রধান পার্বণ। সমস্ত ঘরে মৃদঙ্গ, মন্দিরা ও শঙ্খ থাকত, দুর্গোৎসবের সময় এই সব বাদ্য বাজানো হত।[২৭] দুর্গোৎসবে সবাই "হুড়াহুড়ি" করে "সাড়ি" দিত অর্থাৎ আওয়াজ করত।[২৮] বৈষ্ণবদের একটি বিশিষ্ট উৎসব ছিল মাধবেন্দ্রপুরীর আরাধনা-দিবস পালন। এই উপলক্ষে শঙ্খ-ঘণ্টা-মৃদঙ্গ-মন্দিরা-করতাল সহযোগে সঙ্কীর্তন অনুষ্ঠান হত এবং খাওয়া-দাওয়া হত।[২৯] কোথাও কোন মহাপুরুষের আগমন হ'লে সেখানে হাট বসে যেত।[৩০]

চৈতন্যদেবের প্রথমবার বিবাহ হয়েছিল বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মী দেবীর সঙ্গে। পাত্রপক্ষ ও পাত্রীপক্ষ উভয়েই দরিদ্র বলে এ বিবাহে ঘটা বিশেষ হয় নি। বৃন্দাবনদাস এই বিবাহের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার থেকে বোঝা যায়, সে যুগে দরিদ্র হিন্দুদের (বিশেষভাবে ব্রাহ্মণদের) বিবাহ কেমনভাবে হত। সে যুগেও পাত্রকে যৌতুক ও পণ দেবার প্রথা ছিল, কিন্তু বল্লভাচার্য দরিদ্র বলে মাত্র পঞ্চ হরিতকী দিয়ে কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন। বিবাহের পূর্বে উভয়পক্ষের আত্মীয়স্বজনরা সমবেত হয়ে বিবাহের উদ্যোগ করতে লাগলেন। শুভ দিনে শুভ লগ্নে অধিবাস হল, এই উপলক্ষে নটেরা নৃত্য-গীত করতে ও নানা বাদ্য বাজাতে লাগল, চারদিকে ব্রাহ্মণেরা বেদধ্বনি করতে লাগল, মাঝখানে বর চৈতন্যদেব বসলেন। তাঁর আত্মীয় ব্রাহ্মণরা ঈশ্বরের গন্ধমাল্য দিয়ে শুভক্ষণে তাঁর অধিবাস করালেন। তিনিও গন্ধ, চন্দন, তাম্বুল ও মালা দিয়ে ব্রাহ্মণদের সন্তুষ্ট করলেন। তারপর তাঁর শ্বশুর বল্লভাচার্য এসে অধিবাস করিয়ে গেলেন। বিবাহের দিন প্রভাতে চৈতন্যদেব স্নান ও দানধ্যান করে পূর্বপুরুষদের পুজা করলেন। তখন নৃত্য, গীত, বাদ্য ও মঙ্গলধ্বনি হতে লাগল, চারদিকে কোলাহল উঠল; এয়োরা এবং আত্মীয়, বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী, ব্রাহ্মণ ও সজ্জনরা এলেন। চৈতন্যদেবের জননী শচীদেবী এয়োদের খই, কলা, সিঁদুর, পান ও তেল দিয়ে সন্তুষ্ট করলেন। গোধূলি লগ্নে চৈতন্যদেব আত্মীয়দের সঙ্গে বল্লভাচার্যের গৃহে এসে উপস্থিত হলেন।

---

২৬ ম ৮ (১৩৯ ও ১৪৩) ২৭ ম ২৩(২১৫) ২৮ ম ৮ (১৪৩) ২৯ অ ৪ (২৯৪-২৯৫) ৩০ অ ৩ (২৭৮)

বল্লভাচার্য জামাতাকে সসম্ভ্রমে আসন দিয়ে বিধিমত বরণ করলেন। শেষে তিনি তাঁর কন্যা লক্ষ্মীকে সর্ব অলঙ্কারে ভূষিত করে নিয়ে এলেন। লক্ষ্মী বরকে সাতবার প্রদক্ষিণ করার পরে হাতজোড় করে রইলেন। দু'জনে "পুষ্পমালা ফেলাফেলি" হল। লক্ষ্মী চৈতন্যদেবের পায়ে মালা দিয়ে নমস্কার করলেন। বল্লভাচার্য চৈতন্যদেবের চরণে পাদ্য দিয়ে, কলেবর বস্ত্র-মাল্য-চন্দনে ভূষিত করে কন্যা সম্প্রদান করলেন। অতঃপর স্ত্রী-আচার অনুষ্ঠিত হল। সে রাত্রি শ্বশুরবাড়ীতেই কাটিয়ে পরের দিন সন্ধ্যায় স্ত্রীকে নিয়ে, গন্ধ-মাল্য-অলঙ্কার-মুকুট-চন্দনে ভূষিত হয়ে দোলায় চড়ে চৈতন্যদেব নৃত্য-গীত-বাদ্য-কোলাহলের মধ্যে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। শচী দেবী বিপ্রপত্নীদের নিয়ে পুত্রবধূকে ঘরে তুললেন এবং ব্রাহ্মণ, নট ও বাজনদারদের অর্থ, বস্ত্র ও বাক্য দিয়ে পরিতুষ্ট করলেন।[৩১]

চৈতন্যদেবের দ্বিতীয়বার বিবাহ হয় রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে। সনাতন মিশ্র ধনী লোক ছিলেন; চৈতন্যদেবের তরফে বিবাহের সমস্ত ব্যয় বহন করেছিলেন তাঁর দুই ধনী শিষ্য—মুকুন্দ-সঞ্জয় ও বুদ্ধিমন্ত খান। বাজেই খুব আড়ম্বর ও সমারোহের সঙ্গে এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই বিবাহের যে বর্ণনা বৃন্দাবনদাস দিয়েছেন, তার থেকে সে যুগে ধনী হিন্দুদের বিবাহের বাস্তব চিত্র পাই। এই বিবাহের অধিবাস-লগ্নে বড় বড় চন্দ্রাতপ টাঙিয়ে চার দিকে কলাগাছ লাগানো হয়েছিল; পূর্ণ ঘট, প্রদীপ, ধান, দই, আম্রসার প্রভৃতি মঙ্গল-দ্রব্য একত্র সমাবেশ করে সারা মাটিতে আলপনা দেওয়া হয়েছিল। ঐদিন বিকালে বাজনদাররা মৃদঙ্গ, সানাই, জয়ঢাক, করতাল প্রভৃতি বাজনা বাজাতে লাগল, ভাটেরা রায়বার পড়তে লাগল, এয়োরা জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন, ব্রাহ্মণরা বেদ আবৃত্তি করতে লাগলেন। বর চৈতন্যদেব ব্রাহ্মণদের মাঝখানে বসলেন। নিমন্ত্রিত সবাইকে গন্ধ, চন্দন, তাম্বুল, গুবাক, মালা দেওয়া হতে লাগল (সে যুগে বিবাহ-অনুষ্ঠানে খাওয়াবার রেওয়াজ ছিল না)। এক এক জন তিনবার করে এ সব নিতে লাগলেন। সনাতন মিশ্রও এসে অধিবাস করিয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি নিজের বাড়ীতে ফিরে বিষ্ণুপ্রিয়ার অধিবাস করালেন। পরের দিন প্রভাতে চৈতন্যদেব গঙ্গাস্নান করে, প্রথমে বিষ্ণুর পূজা করে, তারপর আত্মীয়দের নিয়ে নান্দীমুখ করতে বসলেন; সে

৩১ আ। ৭ (৪৯-৫০)

সময় বাদ্য-নৃত্য-গীতে মহা কোলাহল উঠল, চারদিকে 'জয়' 'জয়' শব্দে মঙ্গলধ্বনি হতে লাগল; ঘরে, দ্বারে এবং অঙ্গনে অসংখ্য পূর্ণ ঘট, ধান, দই, প্রদীপ ও আম্রসার স্থাপন করা হল, চার দিকে নানা রঙের পতাকা ওড়ানো হ'ল, কলাগাছ রোপণ করে তাতে আমের শাখা বেঁধে দেওয়া হল। শচী দেবীও এয়োদের নিয়ে লোকাচার করতে লাগলেন; তিনি প্রথমে গঙ্গার পুজা করে বাদ্যধ্বনির মধ্য দিয়ে ষষ্ঠীর স্থানে গিয়ে ষষ্ঠীর পূজা করলেন। তারপর আত্মীয়দের ঘরে ঘরে গিয়ে লোকাচার করে তিনি ঘরে ফিরে খই, কলা, তেল, পান ও সিঁদুর দিয়ে এয়োদের বরণ করলেন, প্রতি এয়োকে বিভিন্ন দ্রব্য পাঁচ-সাতবার করে দেওয়া হল। অতঃপর এয়োরা তেল মেখে স্নান করলেন। কন্যার বাড়ীতেও বিষ্ণুপ্রিয়ার জননী অনুরূপভাবে লোকাচার অনুষ্ঠান করলেন। এদিকে চৈতন্যদেব বিধি অনুযায়ী কর্ম করে অল্পক্ষণের জন্য বিশ্রাম করলেন; তারপর ব্রাহ্মণদের পদমর্যাদা অনুযায়ী ভোজ্য[৩২] ও বস্ত্র দিয়ে নম্রচিত্তে সম্মানিত করলেন। ব্রাহ্মণরাও তাঁকে আশীর্বাদ করে বাড়ীতে ভোজন করতে গেলেন। বিকালে চৈতন্যদেব বর-বেশে সজ্জিত হলেন; চন্দনে অঙ্গ চর্চিত করে মাঝে মাঝে গণ্ড (ফোঁটা) দিলেন; কপালে অর্ধচন্দ্রাকারে চন্দন দিয়ে তার মাঝখানে গন্ধের তিলক দিলেন; মাথায় মুকুট ও গলায় সুগন্ধি মালা পরলেন; ত্রিকচ্ছ দিয়ে সুলক্ষণ পীত বস্ত্র পরে চোখে কাজল দিলেন এবং হাতে ধান, দূর্বা ও সুতা বেঁধে "রম্ভামঞ্জরী" দর্পণ ধারণ করলেন; দুই কানে সোনার কুণ্ডল পরে হাতে নব-রত্ন হার বাঁধলেন। তারপর তিনি বাদ্য-গীত, ব্রাহ্মণদের বেদধ্বনি ও ভাটদের রায়বার পাঠের মধ্য দিয়ে জননীকে প্রদক্ষিণ করে, ব্রাহ্মণদের নমস্কার ও মান্য করে দোলায় চড়ে বসলেন। অতঃপর নারীদের জয়ধ্বনি ও মঙ্গলধ্বনির মধ্য দিয়ে তিনি প্রথমে গঙ্গাতীরে গেলেন, তারপর সারা নবদ্বীপ ভ্রমণ করলেন; তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট দল যেতে লাগল, তারা সহস্র সহস্র জলন্ত দীপ নিয়ে চলতে লাগল, নানারকম বাজি পোড়াতে লাগল, নানারকম পতাকা ওড়াতে লাগল; নানা সম্প্রদায়ের নর্তকরা নৃত্য করে যেতে লাগল; বাজনদাররা জয়ঢাক, বীরঢাক, মৃদঙ্গ, কাহাল, পটহ, দগড়, শঙ্খ, বাঁশী, করতাল, বরগোঁ, শিঙ্গা, পঞ্চশব্দী প্রভৃতি বাজনা বাজাতে লাগল,

---

৩২ "ভোজ্য" রাঁধা নয়, কাঁচা—কারণ এর পরেই বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণেরা বাড়ীতে ভোজন করতে গেলেন।

অনেক শিশু বৃহৎ বাদ্যভাণ্ডের ভিতরে বসে নেচে যেতে লাগল। এইভাবে নবদ্বীপ ভ্রমণ করে চৈতন্যদেব গোধূলি লগ্নে সনাতন মিশ্রের বাড়িতে প্রবেশ করলেন, তখনও মহা জয়ধ্বনি ও বাদ্যধ্বনি হতে লাগল; সনাতন মিশ্র চৈতন্যদেবকে আলিঙ্গন করে সভায় বসালেন ও তাঁর উপর পুষ্পবৃষ্টি করলেন। অতঃপর তিনি পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনী, বস্ত্র ও অলঙ্কার দিয়ে জামাতাকে বরণ করলেন এবং তাঁর স্ত্রী অন্য নারীদের সঙ্গে মিলে জামাতার মাথায় ধান-দূর্বা দিয়ে, সপ্ত ঘৃতের প্রদীপে আরতি করে খই-কড়ি ফেলে লোকাচার করলেন। অতঃপর সর্বালঙ্কারভূষিতা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে তাঁর আত্মীয়েরা আসনে (পিঁড়িতে) বসিয়ে আনলেন, চৈতন্যদেবকেও আসনে ধরে তোলা হল,[৩৩] মধ্যে অন্তঃপট ধরে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে সাতবার চৈতন্যদেবকে প্রদক্ষিণ করানো হল। তারপর তুমুল বাদ্যধ্বনি ও জয়ধ্বনির মধ্যে "পুষ্প ফেলাফেলি" হল, বিষ্ণুপ্রিয়া চৈতন্যদেবের পায়ে মালা দিলেন, চৈতন্যদেব বিষ্ণুপ্রিয়ার গলায় মালা দিলেন। অতঃপর প্রদীপের সমারোহ ও বাদ্যধ্বনির প্রাচুর্যের মধ্যে সনাতন মিশ্র চৈতন্যদেবকে পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনী দিয়ে কন্যা সম্প্রদান করলেন এবং ধেনু, ভূমি, শয্যা ও দাসদাসী[৩৪] যৌতুকস্বরূপ দিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াকে চৈতন্যদেবের বাঁ পাশে বসিয়ে হোমকর্ম, বেদাচার ও লোকাচার সম্পন্ন করানো হল। এর পর বর-বধূ ভোজন করে একত্রে সুখ-রাত্রি (বাসর) যাপন করলেন। পরদিন অপরাহ্ণে যথারীতি নৃত্য, গীত, জয়ধ্বনি, নারীদের মঙ্গলধ্বনি, ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদ, যাত্রাযোগ্য শ্লোক পাঠ, ঢাক-পড়া-সানাই-বরগোঁ-করতাল প্রভৃতি বাদ্যের ধ্বনি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে চৈতন্যদেব মাননীয়দের নমস্কার করে বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে দোলায় আরোহণ করলেন এবং নৃত্য-গীত-বাদ্য-পুষ্পবৃষ্টির মধ্য দিয়ে নবদ্বীপে ভ্রমণ করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। তখন শচী দেবী এয়োদের নিয়ে পুত্রবধূকে বরণ করলেন এবং বর-বধূ ঘরে এসে বসলেন। অতঃপর চৈতন্যদেব নট, ভাট ও ভিক্ষুকদের বস্ত্র, অর্থ ও বাক্য দিয়ে সন্তুষ্ট করলেন; ব্রাহ্মণ ও আত্মীয়দের প্রত্যেককে তিনি বস্ত্র দিলেন।[৩৫]

সে যুগে পৌরাণিক কাহিনী অভিনয় করা হত। একজন নট রাম-বনবাস পালায় দশরথের ভূমিকায় অভিনয় করার সময় ভাবাবিষ্ট হয়ে পরলোকগমন

---

৩৩ বর্তমানে কেবলমাত্র কনেকেই পিঁড়িতে বসিয়ে তুলে ধরে সাত পাক ঘোরানো হয়।

৩৪ ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী? ৩৫ আ ১০ (১৫-৭৯)

করেছিলেন।[৩৬] চৈতন্যদেব তাঁর সন্ন্যাসের কিছুদিন আগে একবার তাঁর ভক্তদের সঙ্গে মিলে রুক্মিণীহরণ পালা অভিনয় করেছিলেন; এতে চৈতন্যদেব রুক্মিণী, হরিদাস কোতোয়াল, শ্রীবাস পণ্ডিত নারদ, শ্রীরাম পণ্ডিত স্নাতক, শ্রীমান পণ্ডিত "দিয়ড়িয়া হাড়ি" ও নিত্যানন্দ বড়াই সেজেছিলেন; এটি অনেকটা নৃত্যনাট্যের মত; এতে সংলাপ বিশেষ ছিল না, একদল লোক কীর্তন কর্‌ছিল আর অভিনেতারা নাচছিল।[৩৭] নিত্যানন্দ তাঁর বাল্যকালে তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে নানা পৌরাণিক পালা অভিনয় করতেন।[৩৮] "ডক্ক" নামে পরিচিত একদল লোক সে যুগে বড়লোকদের বাড়ীতে কালীয়-দমন পালা গান করত।[৩৯] কীর্তন চৈতন্যদেবের আগেও অল্পস্বল্প ছিল, বিশেষ বিশেষ পুণ্যতিথিতে ও গ্রহণের সময় কীর্তন হত[৪০], কিন্তু ব্যাপকভাবে কীর্তন প্রচলন চৈতন্যদেবই করেন; চৈতন্যদেব তাঁর ভক্তদের প্রথমে যে কীর্তনটি শিখিয়েছিলেন, তা হচ্ছে

হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥

কেদার রাগে এটি গাওয়া হত[৪১]

চৈতন্যদেব নগর-সঙ্কীর্তনও প্রবর্তন করেছিলেন। প্রথম যে রাত্রে তিনি নবদ্বীপে নগর সঙ্কীর্তনে বেরিয়েছিলেন, সেদিন নবদ্বীপের প্রতি বাড়ী কাঁদি কাঁদি কলা, নারকেল, আম্রসারে পূর্ণ ঘট ও ঘৃতের প্রদীপ এবং দই, দূর্বা ও ধানে-ভরা বাটা দিয়ে সাজানো হয়েছিল।[৪২]

সে যুগে হিন্দু ও মুসলমানদের সম্পর্ক খুব মধুর ছিল না। মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই হিন্দুদের কীর্তন প্রভৃতি পছন্দ করত না; কেউ কেউ হিন্দুদের অত্যন্ত ঘৃণা করত, হিন্দুদের দেখলে ভাত খেত না; কোন মুসলমান হরিনাম করলে অথবা হিন্দুর মত আচরণ করলে মুসলিম রাজশক্তি তাকে নিষ্ঠুরভাবে শাস্তি দিত।[৪৩] তবে মুসলমানরা রামচন্দ্রের কাহিনী শ্রদ্ধা করে শুনত এবং শুনে অশ্রুবর্ষণ করত।[৪৪] হিন্দুদের মধ্যে কেউ, এমন কি কোন ব্রাহ্মণও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে হিন্দুরা তাতে ঔদাসীন্য দেখাত।[৪৫] কোন কোন হিন্দু আবার হিন্দুদেরই কীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠানে আপত্তি করত, পাছে মুসলিম

---

৩৬ আ ৬ (৪২) ৩৭ ম ১৮ (১৮৮-১৯৩) ৩৮ আ ৬ (৪২-৪৩) ৩৯ আ ১১ (৮৪) ৪০ আ ২ (১৪) ৪১ ম ১ (১০৪) ৪২ ম ২৩ (২২১) ৪৩ আ ১১ (৭৯-৮২) ৪৪ অ ৪ (২৯১) ও ম ৩ (১১৭) ৪৫ আ ১১ (৮১)

রাজশক্তি অপ্রসন্ন হয়, সেই ভয়ে; এরা কীর্তনকারীদের রাজশক্তির হাতে সমর্পণ করার কথা অবধি চিন্তা করতে দ্বিধা করত না।[৪৬] হিন্দুরা মুসলমানদের নীচ জাতি বলে মনে করত।[৪৭] হিন্দুদের মধ্যে অনেকে ধর্ম মানত না, তারা গোমাংস খেত, মদ খেত, চুরি-ডাকাতি-পরগৃহদাহ করত এবং কুৎসিত গালিগালাজ করত।[৪৮]

সে যুগের খাদ্যের মধ্যে প্রধান ছিল নারকেল, সন্দেশ, মেওয়া, ক্ষীর, কর্কটিকা ফল, আখ, দই, দুধ, ঘী, সর, ননী, মুগ, কলা, চিঁড়া, চালভাজা, লাফরা, পিঠাপানা, ছানাবড়া, তেঁতুল পাতার অম্বল, নানা ধরনের শাক—যথা অচ্যুত, পটোল, বাহুক, কাল, শালিঞ্চা, হিলঞ্চা প্রভৃতি।[৪৯] বৈষ্ণবদের অন্নের উপরে তুলসী-মঞ্জরী দেওয়া হত।[৫০] গরীবেরা খোলায় ভাত খেত ও পিতলের বাটি ব্যবহার করত।[৫১] যারা খোলা বিক্রী করত, তারা থোড়, কলা এবং মুলাও বেচত।[৫২] সেযুগে পান খাওয়ার বেশ চলন ছিল। সেযুগে লোকে আমলক দিয়ে কেশ-সংস্কার করত।[৫৩] কেবল নারীরা নয়, পুরুষেরাও নানারকম অলঙ্কার পরতেন, যেমন—অঙ্গদবলয়, আংটি, নূপুর, কুণ্ডল; এইসব গয়না সোনায় তৈরি হত, তার সঙ্গে সময় সময় রূপাও থাকত এবং মরকত, প্রবাল, মুক্তা, বিড়ালাক্ষ প্রভৃতি রত্নও গয়নায় ব্যবহৃত হত।[৫৪]

নারীরা অন্তঃপুরচারিণী ছিলেন, তবে চৈতন্যদেব ও শ্রীবাসের স্ত্রীরা তাঁদের কোন কোন বন্ধু বা ভক্তের সামনে বার হতেন।[৫৫] দিনের বেলায় সাধারণত স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে দেখা হত না। এইজন্য চৈতন্যদেব পূর্ববঙ্গ থেকে বাড়ীতে ফিরে লক্ষ্মীকে না দেখেও বুঝতে পারেননি যে তিনি মারা গিয়েছেন।[৫৬] সহমরণ প্রথা অবশ্যই ছিল, কিন্তু তা বাধ্যতামূলক ছিল না, জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যুর পরে তাঁর পত্নী শচী দেবী সহমৃতা হন নি।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সে যুগের হিন্দুদের মধ্যে প্রবল বাছবিচার ছিল। ব্রাহ্মণেরা অন্য জাতির লোকদের হাতে তো খেতেনই না, অনাত্মীয় ও অপরিচিত ব্রাহ্মণদের রান্নাও খেতেন না। কারও বাড়ীতে অতিথি এলে তাঁকে কাঁচা ভোজ্যসামগ্রী দেওয়া হ'ত, অতিথি সেগুলি রান্না করতেন।[৫৭]

---

৪৬ ম ২ (১১১) ৪৭ ম ১০ (১৫৫) ৪৮ ম ১৩ (১৬৬) ৪৯ ম ৮, ম ৯, অ৪, অ৮, অ১০ (১৪৪, ১৪৭, ২৯০, ২৯৫, ৩২৫, ৩৩২) ৫০ অ ৪ (২৯০) ৫১ ম ৯ (১৪৯) ও ম ১১ (১৬১) ৫২ ম ৯ (১৪৯) ৫৩ ম ২৫ (২৩৮) ৫৪ অ ৫, অ ৮ (৩০৬, ৩১০, ৩২৩) ৫৫ ম ১১ (১৬১-১৬৩) ৫৬ আ ১০ (৭২) ৫৭ আ ৩ (২২-২৩)

সে যুগে লোকদের জীবনযাত্রা ছিল স্বচ্ছল। সকলেই ভাবত, যে দোলা-ঘোড়া চড়ে, দশ-বিশ জন লোক যার আগে-পিছে নড়ে—সে-ই সুকৃতী।[৫৮] ছেলে-মেয়েদের বিবাহ এবং অন্যান্য উৎসবে লোকে বহু অর্থ ব্যয় করত।[৫৯] তবে দেশে মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষও হত।[৬০] ধানের দর পাছে বাড়ে, এই ভয়ে লোকে আতঙ্কিত হয়ে থাকত।[৬১] দেশে অনেকেই জুয়া খেলত।[৬২] চোর ও ডাকাতের সংখ্যা বড় অল্প ছিল না। ছোট ছেলের গায়ে অলঙ্কার থাকলে চোরে তাকে অনেক সময় নিয়ে যেত।[৬৩] ডাকাতদের মধ্যে নানাজাতির লোক থাকত, অনেক সময় ব্রাহ্মণের ছেলেরাও ডাকাতদের সর্দার হত।[৬৪]

সে যুগে লোকেদের বাড়িতে শৌচাগারের পাট ছিল না, প্রয়োজনমত বাড়ির বাইরে গিয়ে তারা মলমূত্র ত্যাগ করত।[৬৫]

সে যুগে আয়ুর্বেদ ও টোটকা মতে লোকের চিকিৎসা হ'ত। কারও বায়ুরোগ হলে মাথায় বিষ্ণুতৈল, নারায়ণতৈল ও আরও সব সুগন্ধি পাক-তৈল দেওয়া হত, শুধু তাই নয়, তাকে তৈলদ্রোণে (তেলে-ভর্তি বিরাট পাত্রে) রাখা হত।[৬৬] অনেক সময় বায়ুরোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে বেঁধেও রাখা হত, তাকে খেতে দেওয়া হত ডাবের জল; বায়ুর প্রকোপ বেশী হলে শিবাঘৃত প্রয়োগ করা হত।[৬৭] কফ-রোগের ওষুধ ছিল পিপ্পলিখণ্ড।[৬৮]

সে যুগে যে সব ফুলের সমাদর ছিল, তার মধ্যে প্রধান—জম্বীর, কদম্ব ও দমনক (দনা)।[৬৯] লোকেরা জলে সাঁতার কাটতে খুব ভালবাসত। বাংলাদেশে 'কয়া' নামে এক ধরনের জলক্রীড়া প্রচলিত ছিল, তাতে লোকেরা জলে নেমে 'কয়া' 'কয়া' বলে হাততালি দিয়ে জলে বাদ্য বাজাত।[৭০]

তখনকার কালে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সরকারী বিভাগ যা'ই থাকুক না কেন, লোকেরা নিজেদের ধারণা অনুযায়ী একটা বিভাগ করে নিয়েছিল। কাটোয়ার কিছু পশ্চিমে অবস্থিত বিশাল ভূখণ্ডকে তারা রাঢ় বলত।[৭১] নবদ্বীপ ও তৎসন্নিহিত অংশকে বলত আম্বুয়া-মুলুক এবং তার দক্ষিণের অংশকে বলত সপ্তগ্রাম-মুলুক। আরও দক্ষিণের অংশকে বলত

৫৮ আ ৫ (৩০) ৫৯ ম ২২ (২১১) ৬০ ম ৮ (১৪৩) ৬১ আ ১১ (৮৬) ৬২ অ ৩ (২৭৬) ৬৩ আ ৩ (২০) ৬৪ অ ৫ (৩১১) ৬৫ আ ৫ (৩৪) ৬৬ আ ৮ (৫৬) ৬৭ ম ২ (১০৭) ৬৮ ম ২৫ (২৩৬) ৬৯ অ ৫ (৩০৪) ৭০ অ ৯ (৩২৯) ৭১ অ ১ (২৪৭)

"দক্ষিণ রাজ্য"।[৭২] পূর্ববঙ্গকে বলা হত 'বঙ্গদেশ'। তবে 'শ্রীহট্ট' ও 'চাটিগ্রাম' (চট্টগ্রাম)—এই দু'টি অঞ্চলকে স্বতন্ত্রভাবেই চিহ্নিত করা হত।[৭৩]

বক্রেশ্বর ও বৈদ্যনাথধাম তখনও প্রসিদ্ধ তীর্থ ছিল।[৭৪]

বাংলা-উড়িষ্যার (এবং স্বতই অন্যান্য রাজ্যেরও) মাঝখানের সীমানায় দানী (tax-collector) রা থাকত, দান (tax) না দিলে এরা লোকদের এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যেতে দিত না।[৭৫]

অন্যান্য চরিতকারের বিবরণ

বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' ভিন্ন কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত', জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' এবং অন্য কোন কোন চরিতগ্রন্থেও "চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কাল" সম্বন্ধে সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু এই সংবাদগুলি বৃন্দাবনদাস-প্রদত্ত সংবাদের মত ব্যাপকও নয়, ততটা নির্ভরযোগ্যও নয়। নির্ভরযোগ্য না হবার কারণ, এই বইগুলি আমাদের আলোচ্য যুগ অতিক্রান্ত হবার পরে লেখা, সুতরাং এদের লেখকেরা চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কাল সম্বন্ধে বলতে গিয়ে স্থানে স্থানে নিজেদের সময়েরই কথা বলেছেন, এ রকম সন্দেহ করা যেতে পারে। যা হোক্, জয়ানন্দ ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের দেওয়া সংবাদগুলির মধ্যে যেগুলি আলোচ্য যুগ সম্বন্ধে প্রযোজ্য বলে মনে হয়, আমরা নীচে সেগুলি উল্লেখ করলাম।

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' (রচনাকাল ১৫৪৮ থেকে ১৫৬০ খ্রীঃর মধ্যে) থেকে জানা যায় যে, বাংলার মুসলমান রাজা কখনও কখনও হিন্দুদের উপর অত্যাচার করতেন;[১] রাজার লোকরা কখনও কখনও হিন্দু শিশুদের চুরি করে নিয়ে যেত;[২] ব্রাহ্মণ ও মুসলমানের মধ্যে চিরন্তন বিবাদ ছিল;[৩] কিন্তু অনেক হিন্দু (এমন কি ব্রাহ্মণও) দাড়ি রাখত, ফারসী পড়ত, মসনবী আবৃত্তি করত; কোন কোন হিন্দু দেবালয় খুলে তার প্রণামী-লব্ধ অর্থে জীবিকা নির্বাহ করত।[৪]

কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' (রচনাকাল ১৬১২ খ্রীঃ)

৭২ অ ২ (২৫৬) ৭৩ আ ২ (১০) ৭৪ আ ৬ (৪৩) ৭৫ অ ২ (২৫৮)

১ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ, পৃঃ ১১-১২ ২ ঐ, পৃঃ ১৯-২০ ৩ ঐ, পৃঃ ১১ ৪ ঐ, পৃঃ ১৩৯ ও পৃঃ ৭১

থেকে জানা যায় যে, সে যুগে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাধারণভাবে বিরোধ থাকলেও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের সূচনা দেখা দিয়েছিল, দুই সম্প্রদায়ের লোকদের ভিতর গ্রাম-সম্পর্কও স্থাপিত হতে সুরু হয়েছিল।[৫] কোন কোন জীবিকা মুসলমানদের একচেটিয়া ছিল, যেমন দরজীর জীবিকা, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও মুসলমান দরজীর সাহায্য নিতেন।[৬] জিনিসপত্রের দাম তখন খুব সস্তা ছিল, মাত্র তিন টাকা দামে একটি "বহুমূল্য" ভোটকম্বল পাওয়া যেত; [৭] চৈতন্যদেব ও তাঁর সঙ্গীদের অনেক ভক্ত নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন, এই গোটা দলকে একবার খাওয়াতে মাত্র চার পণ কড়ি খরচ হত।[৮]

কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃতে' সে যুগের খাদ্যদ্রব্যের বিস্তৃত তালিকা পাওয়া যায়। অবশ্য এগুলি বৈষ্ণবের খাদ্যদ্রব্য, সুতরাং নিরামিষ। নানাধরনের শাক, নিম-সুকুতার ঝোল, মরিচের ঝাল, ছানাবড়া, বড়ী, দুগ্ধতুম্বী, দুগ্ধকুষ্মাণ্ড, বেসারি, লাফরা, মোচাভাজা, বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ডবড়ীর ব্যঞ্জন, ফুলবড়ী, নব নিম্বপত্রসমেত ভৃষ্ট বার্তাকী (বেগুনভাজা), পটোলভাজা, মানচাকী, ভৃষ্ট মাষ, মুদ্গ স্থপ (মুগের ডাল), মধুরাম্ল, (মিষ্টি ও টকের অম্বল), বড়াম্ল (বড়ার অম্বল), মুদ্গবড়া, মাষবড়া, কলাবড়া, ক্ষীরপুলী, নারকেলপুলী, কাঞ্জিবড়া, দুগ্ধলকলকী, দুগ্ধচিঁড়া, নানা ধরনের পিঠা, ঘৃতসিক্ত পরমান্ন, চাঁপাকলা, ঘন দুধ, আম-কাঁঠাল ও নানাধরনের ফলমুল, দই, সন্দেশ, অমৃতগুটিকা (?), পিঠাপানা—এইগুলি ছিল বৈষ্ণবদের বিশিষ্ট খাদ্য।[৯] দীর্ঘ পথ পাড়ি দেবার সময় অথবা দূরদেশে অবস্থিত প্রিয়জনদের উপহার দেবার জন্য লোকে এমন সব খাদ্যদ্রব্য নিয়ে যেত, যা সহজে নষ্ট হয় না। এই সব খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে প্রধান—আম্রকাসুন্দী, আদাকাসুন্দী, ঝালকাসুন্দী, নেম্বু (লেবু)-আদা, আম্র-কোলি, আমসী, আম্রখণ্ড (আমসত্ব?), তৈলাম্র, আমতা, পুরোনো সুকুতার গুঁড়া, ধনিয়া, মুহুরী ও চাল-গুঁড়া করে চিনি দিয়ে পাক করা নাড়ু, শুণ্ঠীখণ্ড নাড়ু (কড়াইশুঁটি ও মিছরির নাড়ু), কোলিশুণ্ঠী, কোলিচূর্ণ, কোলিখণ্ড, নারকেলখণ্ড নাড়ু, চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার (?), চিরস্থায়ী ক্ষীরসার ও মণ্ডা, অমৃতকর্পূর, শালিকাঁচুটি

৫ আ ১৭ (৬৫) ৬ আ ১১ (৬৭) ৭ ম ২০ (২০৭) ৮ অ ৬ (৩০১) কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন, "দুই নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি অষ্ট পণ।" ৯ ম ১৫ (১৭২-৭৩)

ধানের আতবচিঁড়া, ঘীয়ে ভাঁজা চিঁড়া ও মুড়ি-চিনি দিয়ে পাক করা নাড়ু, ঘী মেশানো শালি-চালভাজার গুঁড়া, কর্পূর-মরিচ-এলাচ-লবঙ্গ-রসবাসের বিভিন্ন ধরনের নাড়ু, ঘীয়ে ভাজা শালি-ধানের খই, চিনি দিয়ে পাক করা কর্পূর-মেশানো উখড়া, ঘীয়ে ভাজা ফুটকলাই গুঁড়া প্রভৃতি।[১০]

দুর্গাপুজার সামগ্রীর মধ্যে প্রধান ছিল—জবাফুল, হলুদ, সিঁদুর, রক্ত-চন্দন ও চাল।[১১] বৈষ্ণবরা দুর্গাপুজা করত না। কোন বৈষ্ণবের ঘরে বা দরজার বাইরে কেউ দুর্গাপূজার সামগ্রী রেখে গেলে তাকে ঘৃণ্য অপরাধ বলে গণ্য করা হত এবং হাড়ি (মেথর) দিয়ে ঐ সব সামগ্রী ফেলে দিয়ে জল ও গোময় দিয়ে ঐ স্থান লেপানো হত।[১২] পক্ষান্তরে নিষ্ঠাবান শাক্তেরাও তাদের দুর্গামণ্ডপে বৈষ্ণবরা এসে উঠলে তাদের তাড়িয়ে দিত ও মাটি খুঁড়িয়ে ফেলে দিয়ে গোময় দিয়ে মন্দির-প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করত।[১৩] এর থেকে বোঝা যায়, সেযুগে বৈষ্ণব ও শাক্তদের মধ্যে বিরোধ ছিল।

'চৈতন্যচরিতামৃত' থেকে জানা যায় যে, কোন বিশিষ্ট অমাত্য বাংলার সুলতানদের অপ্রীতিভাজন হলে তাঁকে বন্দী করে রাখা হত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তাঁকে "বাহ্যকৃত্য" (শৌচকার্য) করবার জন্য বাইরে যেতে দেওয়া হত।[১৪] সেযুগে পায়খানার প্রবর্তন হয় নি মনে হয়।*

পূর্বোল্লিখিত বিবরণগুলি ছাড়া আরও কোন কোন বিবরণে আলোচ্য যুগের বাংলাদেশ সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু এগুলি হয় আলোচ্য যুগের পরে লেখা, না হয় প্রক্ষেপ-দোষে দুষ্ট (যেমন বিজয়গুপ্ত ও বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গল'), না হয় বাঙালী সমাজের এক অতি ক্ষুদ্র অংশের পরিচয়দায়ক (যেমন স্মৃতিগ্রন্থ ও কুলজীগ্রন্থ)। সেইজন্য বর্তমান অধ্যায়ে আমরা এই সূত্রগুলিকে ব্যবহার করলাম না।

[১০] অ ১০ (৩১৬-১৮) [১১] আ ১৭ (৬২) [১২] আ ১৭ (৬২) [১৩] অ ৩ (২৭৭) [১৪] ম ২০ (২০৫)

*এই অধ্যায়ে 'চৈতন্যভাগবত' ও 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র নিদর্শনী দেবার সময় প্রথমে সংক্ষেপে 'খণ্ড' বা 'লীলা'র নাম ('আ'=আদিখণ্ড ও আদিলীলা, 'ম'=মধ্যখণ্ড ও মধ্যলীলা, 'অ' =অন্ত্যখণ্ড ও অন্ত্যলীলা), পরে পরিচ্ছেদের সংখ্যা এবং তারপর ( ) বন্ধনীর মধ্যে পৃষ্ঠাসংখ্যা ('চৈতন্যভাগবতে'র ক্ষেত্রে বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির প্রকাশিত ৫ম সংস্করণের এবং 'চৈতন্য-চরিতামৃতে'র ক্ষেত্রে "বঙ্গবাসী" প্রকাশিত ৪র্থ সংস্করণের) উল্লিখিত হয়েছে।

[এই অধ্যায়টি লেখার জন্য নিম্নলিখিত বই ও সাময়িক পত্রগুলি ব্যবহার করেছি।

ইব্‌ন্‌ বতুতার বিবরণের জন্য

The Rehla of Ibn Baṭṭuṭa—Tr. by Mahdi Husain.

চীনা বিবরণ তিনটির জন্য

T'oung pao (1915, pp. 435-44).

Visva-Bharati Annals, Vol I (pp. 96-134).

Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland (1895, pp. 529-30).

নিকলো কন্তির বিবরণের জন্য

নিকলো কন্তির ভারত-ভ্রমণ—গিরীন চক্রবর্তী কর্তৃক অনূদিত।

India in the 15th century—Edited by R. H. Major.

রায়মুকুট বৃহস্পতি মিশ্রের বিবরণের জন্য

রাজা গণেশের আমল—সুখময় মুখোপাধ্যায়।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৬১-৬৩)।

কৃত্তিবাসের বিবরণের জন্য

কৃত্তিবাস-পরিচয়—সুখময় মুখোপাধ্যায়।

সনাতনের বিবরণের জন্য

ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী-সাহিত্য—বিমানবিহারী মজুমদার।

ভারথেমার বিবরণের জন্য

The travels of Ludovico di Varthema—Tr. by J. W. Jones, ed. by G. P. Badger.

বারবোসার বিবরণের জন্য

The book of Barbosa—ed. by Mansel Longworth Dames,

বাবরের বিবরণের জন্য

The Bābur-namā (Memoirs of Bābur)—Tr. by A. S. Beveridge.

জোআঁ-দে-বারোসের বিবরণের জন্য

Da Asia—João De Barros (Vol. VIII, Lisbon Edition. 1778).

বৃন্দাবনদাসের বিবরণের জন্য

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত—উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।

জয়ানন্দের বিবরণের জন্য

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল—নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিবরণের জন্য

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত।]

দ্বাদশ অধ্যায়

স্বাধীন সুলতানদের আমলের স্মৃতিচিহ্ন

পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তানের নানা জায়গায় এখনও স্বাধীন সুলতানদের আমলের অনেক স্মৃতিচিহ্ন ছড়িয়ে আছে—এই আমলে নির্মিত প্রাসাদ, মসজিদ ও অন্যান্য স্থাপত্যকীর্তির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে। নীচে এই ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্নগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় সমেত একটি তালিকা দেওয়া হল। (এদের স্থাপত্যকলা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার জন্য ডঃ আহমদ হাসান দানীর Muslim Architecture in Bengal গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।)

(১) আদিনা মসজিদ (দ্রঃ পৃঃ ৫৪-৫৬)—এই মসজিদের নির্মাতা ইলিয়াস শাহী বংশের দ্বিতীয় সুলতান সিকন্দর শাহ। এর নির্মাণসমাপ্তিকাল ৭৭০ হিজরা (১৪৬৯ খ্রীঃ)। বর্তমানে এর একাংশ মাত্র (পশ্চিম দিকের কতকাংশ) বর্তমান আছে। এই অংশটির বাইরে ও ভিতরে অসংখ্য চমৎকার কারুকার্য আছে। এর মধ্যে বহু হিন্দু দেবতার মূর্তিও দেখতে পাওয়া যায়। মসজিদটি অত্যন্ত বিরাট। এটি বাংলা দেশের মুসলিম স্থাপত্যকলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। পাণ্ডুয়া (মালদহ) থেকে এক মাইল উত্তরে এই মসজিদটি অবস্থিত।

(২) গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের সমাধি—পূর্ব পাকিস্তানের মগরাপাড়া (ঢাকা) গ্রামে প্রাচীন সোনারগাঁওয়ের ধ্বংসাবশেষের কাছে—পাঁচ পীর দরগাহ্‌র ১০০ ফুট পূর্বে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের সমাধি অবস্থিত। এই সমাধি যে বাড়ীটিতে আছে, তার মধ্যে স্থাপত্যকলার সুন্দর নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে আদিনা মসজিদের প্রভাব সুস্পষ্ট।

(৩) একলাখী ভবন—এই ভবনটি আয়তনে ছোট হলেও স্থাপত্যকলার নিদর্শনের দিক দিয়ে অপূর্ব। এটি প্রায় আগাগোড়া ইঁটে তৈরী। সম্ভবত পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রাজা গণেশ এই ভবনটি তৈরী করান এবং এটি মূলে ছিল হিন্দু মন্দির (দ্রঃ পৃঃ ১৪৮)। একলাখী ভবন পাণ্ডুয়ায় অবস্থিত।

(৪) চিকা মসজিদ—এই মসজিদটি গৌড়ে অবস্থিত। এটি সম্ভবত রাজা গণেশের বংশধরদের আমলে নির্মিত হয়েছিল। এর মধ্যে একলাখী

ভবনের স্থাপত্যকলার দুর্বল অনুকরণ লক্ষ করা যায়। এই মসজিদের ভিতরে অনেক বাদুড় (চিকা) ছিল বলে আধুনিক কালে এর নাম 'চিকা' মসজিদ হয়েছে।

(৫) কোৎওয়ালী দরওয়াজা—গৌড় নগরীর দক্ষিণ প্রান্তে নির্মিত এই বিরাট তোরণটির ধ্বংসাবশেষ মাত্র বর্তমানে দেখতে পাওয়া যায়। মাহ্‌দীপুর গ্রামের কাছে এটি অবস্থিত। সম্ভবত নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে কোৎওয়ালী দরওয়াজা নির্মাণ করান।

(৬) বাইশগজী—গৌড় শহরে সুলতানদের যে বিরাট ও সুরম্য প্রাসাদ ছিল, তার সবই এখন লুপ্ত হয়েছে, কেবল একটি দেওয়াল এখনও অবশিষ্ট আছে। এটিই 'বাইশগজী' নামে পরিচিত। এটি আগে বাইশ গজ উঁচু ছিল বলে কথিত আছে।

(৭) দাখিল দরওয়াজা—উত্তর দিক থেকে গৌড়ের সুলতানদের দুর্গ ও প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করার এটিই ছিল প্রধান তোরণ। এই দাখিল দরওয়াজার যে অংশ এখনও বর্তমান আছে, তা বাংলার স্থপতিদের আশ্চর্য প্রতিভার নিদর্শন বহন করছে। এই তোরণটি যেমন বিশাল ও উচ্চ, তেমনি অপূর্ব এর কারুকার্য। এটি ইঁটে তৈরী। সম্ভবত রুকনুদ্দীন বারবক শাহের রাজত্বকালে দাখিল দরওয়াজা নির্মিত হয়।

(৯) চামকাটি মসজিদ—গৌড়ের এই প্রাচীন মসজিদটির ধ্বংসাবশেষ মাত্র বর্তমানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এটি 'চামকাটি' নামে পরিচিত মুসলমানদের একটি সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল বলে প্রবাদ আছে। কানিংহাম এই মসজিদের যে শিলালিপি পেয়েছিলেন, তার থেকে জানা যায় যে, শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহের রাজত্বকালে—৮৮০ হিজরায় (১৪৭৫ খ্রীঃ) এই মসজিদটির নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছিল। এই মসজিদটি ইঁটেই তৈরী, তবে এর ভিতরের অংশে কিছু পাথরের কাজ দেখতে পাওয়া যায়।

(১০) তাঁতীপাড়া মসজিদ—এই মসজিদটি গৌড়ের যে অংশে অবস্থিত, সেখানে আগে তাঁতীদের পাড়া ছিল। কানিংহাম এর যে শিলালিপি পেয়েছিলেন, তার থেকে জানা যায় যে, চামকাটি মসজিদ নির্মাণের পাঁচ বছর পরে—৮৮৫ হিজরায় (১৪৮০ খ্রীঃ) এই মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল এবং এর নির্মাতার নাম মির্শাদ খান। এই মসজিদের বিভিন্ন

অঙ্গগুলি যেমন সমানুপাতে বিন্যস্ত, তেমনি সূক্ষ্ম ও অপূর্ব এর কারুকার্য। এর অলঙ্করণে টেরা-কোটা রীতির নিদর্শন দেখা যায়। কানিংহামের মতে গৌড়ের সমস্ত স্থাপত্যকীর্তির মধ্যে এটিই সবচেয়ে সুন্দর।

(১১) ধুনিচক মসজিদ—এই মসজিদও গৌড়ে অবস্থিত। বর্তমানে এটি প্রায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, কিছু দেওয়াল মাত্র অবশিষ্ট আছে। সম্ভবত মাহ্‌মূদ শাহী সুলতানদের আমলে এটি নির্মিত হয়েছিল।

(১২) লোটন মসজিদ—এই মসজিদটি গৌড় শহরের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত। এটি লোটন নামে জনৈকা নর্তকীর অর্থে নির্মিত হয়েছিল বলে প্রবাদ আছে। ক্রেটন ও কানিংহামের মতে এটি ৮৮০ হিজরায় (১৪৭৫ খ্রীঃ) নির্মিত হয়েছিল, কিন্তু ডঃ দানীর মতে মসজিদটি হোসেন শাহী বংশের সুলতানদের আমলে তৈরী। এই মসজিদটি মিনে-করা ইঁট দিয়ে তৈরী হয়েছিল বলে এর বাইরের সৌন্দর্য আগে খুব জমকালো ছিল। বর্তমানে ইঁটগুলির 'মিনে' উঠে গিয়েছে বলে এখন মসজিদটির সৌন্দর্যের একাংশের মাত্র আস্বাদ পাওয়া যায়।

(১৩) দরাসবাড়ী মসজিদ—এটি গৌড়ে অবস্থিত একটি জামী (শুক্রবারের উপাসনা করার) মসজিদ। সম্ভবত আগে একটি দরাসবাড়ী বা মাদ্রাসাহ্‌ এর সংলগ্ন ছিল। মসজিদটির অধিকাংশই বর্তমানে বিধ্বস্ত। এর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে, তার থেকে জানা যায় যে, শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহ ৮৮৪ হিজরায় (১৪৭৯ খ্রীঃ) মসজিদটি নির্মাণ করান।

(১৪) খনিয়া দিঘী মসজিদ—গৌড়ের খনিয়া দীঘি ও বালুস দীঘির মাঝখানে এই মসজিদটি অবস্থিত। এর গঠনকৌশল অনেকটা চামকাটি মসজিদের অনুরূপ। সম্ভবত মাহ্‌মূদ শাহী সুলতানদের আমলে এটি নির্মিত হয়।

(১৫) ফিরোজ মিনার—এই লাল রঙের মিনারটি গৌড়ের একটি অবশ্য-দ্রষ্টব্য বস্তু। এর নির্মাতা সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ (দ্রঃ পৃঃ ২৫৪)। এর উচ্চতা ৮৪ ফুট এবং নীচের অংশের পরিধি ৬২ ফুট।

(১৬) বড় সোনা মসজিদ—এটি গৌড়ের বৃহত্তম মসজিদ; এর আর এক নাম "বারদুয়ারী মসজিদ"। এই মসজিদটিতে ইঁট ও পাথর দুই উপকরণই

ব্যবহৃত হয়েছে—পাথরগুলির উপরে নানারকম কারুকার্য করা। মসজিদটির উপরে এগারটি গম্বুজ রয়েছে—এগুলি আগে সোনালী রঙের গিল্টি-করা ছিল। নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ ৯৩২ হিজরায় (১৫২৫-২৬ খ্রীঃ) এই মসজিদটি নির্মাণ করান।

(১৭) গুণমন্ত মসজিদ—এই মসজিদটি ভাগীরথী নদীর (গঙ্গার পুরোনো খাত) তীরে মাহ্‌দীপুর গ্রামে—লোটন মসজিদ থেকে সামান্য দূরে তার পশ্চিম দিকে অবস্থিত। কারও কারও মতে জলালুদ্দীন ফতেহ্‌ শাহের রাজত্বকালে এটি নির্মিত হয়, আবার কেউ কেউ বলেন এটি হোসেন শাহী আমলের কীর্তি। এই মসজিদটির চার কোণের স্তম্ভ (tower)-গুলি আট-কোণা (octagonal) এবং এতে ইঁট ও পাথর দুই উপকরণই ব্যবহৃত হয়েছে। ইটে তৈরী অংশে চমৎকার কারুকার্যপূর্ণ টেরাকোটা-শিল্প দেখা যায়। পাথরে তৈরী অংশের মধ্যেও টেরাকোটা শিল্পের নকল দেখা যায়।

(১৮) গুমটি দরওয়াজা—এটি গৌড় শহরের পূর্বদিকে ঢোকবার ফটক ছিল। সম্ভবত আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকালে এটি নির্মিত হয়। এর গঠন-কৌশল সুন্দর ও জমকালো—তবে একটু হালকা ধরণের।

(১৯) কদম রসূল ভবন—গৌড়ে অবস্থিত এই ভবনের নির্মাণকাল সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে (দ্রঃ পৃঃ ৪৩৩-৩৪)। এর মধ্যে আগে হজরৎ মুহম্মদের পদচিহ্ন-সংবলিত একটি কালো পাথর ছিল—বর্তমানে এটি আর সেখানে নেই। এই ভবনের গঠনকৌশলে যথেষ্ট কারুকার্য থাকলেও তা হালকার দিকেই ঝুঁকেছে।

(২০) ঝনঝনিয়া মসজিদ—গৌড়ের এই মসজিদের মূল নাম সম্ভবত 'জহানিয়া মহজিদ'। গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের রাজত্বকালে—৯৪১ হিজরায় (১৫৩৪-৩৫ খ্রীঃ) এটি নির্মিত হয়। এর শিল্পকলা আড়ম্বরপূর্ণ, আতিশয্য থেকে একেবারে মুক্ত নয়।

(২১) ফতেহ্‌ খানের সমাধি-ভবন—গৌড়ে অবস্থিত এই ছোট ভবনটির গঠনকৌশল দোচালা কুঁড়েঘরের মত। এর নির্মাণকাল সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে বিরাট মতদ্বৈধ আছে। কারও কারও মতে এটি রাজা গণেশের আমলে নির্মিত হয়, আবার কেউ কেউ বলেন এটি মোগল আমলের কীর্তি।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে এই ভবনটি মূলে হিন্দু মন্দির ছিল, কিন্তু এই মত সকলে গ্রহণ করেন নি।

(২২) ছোট সোনা মসজিদ—এটি গৌড় শহরের সর্বদক্ষিণ প্রান্তে—বর্তমান ফিরোজাবাদ (পূর্ব পাকিস্তান) গ্রামে অবস্থিত। আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকালে জনৈক আলীর পুত্র ওয়ালি মুহম্মদ এই মসজিদটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। বড় সোনা মসজিদের মত ছোট সোনা মসজিদেও সোনালী রঙের গিল্টির কারুকার্য ছিল, তার কিছু অংশ এখনও বর্তমান আছে। এই মসজিদের চার কোণেও চারটি আট-কোণা স্তম্ভ আছে। মসজিদটির মধ্যে কারুকার্য ও স্থাপত্যকলার উৎকর্ষের নিদর্শন মেলে। তবে হোসেন শাহী আমলের মসজিদ ও সৌধগুলির কারুকার্য সামগ্রিকভাবে পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় নিষ্প্রভ।

(২৩) খান জহানের সমাধি—বাগেরহাটে এই সমাধি অবস্থিত। এর নির্মাণকাল পঞ্চদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ, এর স্থাপত্যকলায় দিল্লীর তোগলক আমলের শিল্পকলার প্রভাব দেখা যায়।

(২৪) ষাট-গম্বুজ মসজিদ—বাগেরহাটে খান জহানের সমাধির তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এই মসজিদটি অবস্থিত। এর গঠন-কৌশল অপূর্ব। বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের এইটিই বৃহত্তম মসজিদ। এর নাম "ষাট-গম্বুজ মসজিদ" হলেও এতে সাতাত্তরটি গম্বুজ আছে। এর নির্মাণকাল পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ বলে মনে হয়।

(২৫) মসজিদকুর মসজিদ—খুলনা জেলার মসজিদকুর গ্রামে এই মসজিদটি অবস্থিত। এটি আয়তনে বৃহৎ। এর স্থাপত্যকলাও সুন্দর। এর নির্মাণকাল ষাট-গম্বুজ মসজিদের সমসাময়িক বলে মনে হয়।

(২৬) কসবা মসজিদ—বাখরগঞ্জ জেলার কসবা গ্রামে এই মসজিদ অবস্থিত। এর গঠনকৌশল মসজিদকুর মসজিদের অনুরূপ; নির্মাণকালও ঐ মসজিদের সমসাময়িক বলে মনে হয়।

(২৭) মসজিদবাড়ী মসজিদ—বাখরগঞ্জ জেলার মসজিদবাড়ী গ্রামে এই মসজিদ অবস্থিত। রুকনুদ্দীন বারবক শাহের রাজত্বকালে খান মুআজ্জম উজ্জ্বল (?) খান ৮৭০ হিজরায় (১৪৬৫ খ্রীঃ) এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। এর গঠনকৌশল এই অঞ্চলের অন্যান্য মসজিদের তুলনায় স্বতন্ত্র ধরনের।

(২৮) সালিকুপা মসজিদ—যশোহর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার সালিকুপা মৌজায় এই মসজিদ অবস্থিত। নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের রাজত্বকালে এটি তৈরী হয় বলে প্রসিদ্ধি আছে। এর স্থাপত্যকলায় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় আছে, তবে আধুনিককালের সংস্কার-সাধনের ফলে সেই বৈশিষ্ট্য অনেকখানি মুছে গিয়েছে।

(২৯) বাবা আদমের মসজিদ—ঢাকা জেলার রামপাল গ্রামে এই মসজিদটি অবস্থিত। জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহের রাজত্বকালে মালিক কাফুর এটি নির্মাণ করান। এর গঠন-কৌশল মাহ্মুদ শাহী বংশের আমলে নির্মিত গৌড়ের মসজিদগুলির অনুরূপ।

(৩০) শঙ্করপাশা মসজিদ—শ্রীহট্ট জেলার শঙ্করপাশা গ্রামে এই মসজিদ অবস্থিত। সম্ভবত হোসেন শাহী আমলে এটি নির্মিত হয়। এর গঠনকৌশল জমকালো, আড়ম্বরপূর্ণ অলঙ্করণই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

(৩১) বাঘা মসজিদ—রাজসাহী জেলার বাঘা গ্রামে অবস্থিত এই মসজিদটি নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের রাজত্বকালে—৯৩০ হিজরায় (১৫২৩ খ্রীঃ) নির্মিত হয়। এটি ইটে তৈরী এবং জমকালো কারুকার্যে ভরা।

(৩২) নবগ্রাম মসজিদ—পাবনা জেলার নবগ্রামে অবস্থিত এই মসজিদটি নসরৎ শাহের রাজত্বকালে—৯৩২ হিজরায় (১৫২৫ খ্রীঃ) নির্মিত হয়। গঠন-কৌশল ও কারুকার্যের দিক দিয়ে লোটন মসজিদ ও গুমটি দরওয়াজার সঙ্গে এর মিল আছে।

(৩৩) শাহজাদপুর মসজিদ—পাবনা জেলার শাহজাদপুরে অবস্থিত এই চমৎকার মসজিদটি সম্ভবত পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়। এতে পনেরটি গম্বুজ আছে।

(৩৪) সুরা মসজিদ—দিনাজপুর জেলার সুরা গ্রামে অবস্থিত এই মসজিদটি সম্ভবত হোসেন শাহী বংশের আমলে নির্মিত হয়েছিল। এতে ইঁট ও পাথর দুই উপকরণই ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর নির্মাণ-কৌশল ছোট সোনা মসজিদের অনুরূপ।

এগুলি ছাড়া স্বাধীন সুলতানদের আমলের নিম্নলিখিত স্থাপত্যকীর্তি-গুলিও উল্লেখযোগ্য।

(৩৫) মোল্লা সিমলা (হুগলী) গ্রামের মসজিদ।

(৩৬) গোপালগঞ্জ (দিনাজপুর) গ্রামের মসজিদ।

(৩৭) কালনার (বর্ধমান) মজলিস সাহেবের মসজিদ।

(৩৮) বাগেরহাটের (খুলনা) সালিক মসজিদ।

(৩৯) খেরৌল গ্রামের (মুর্শিদাবাদ) মসজিদ।

(৪০) শ্রীহট্টের রুকন্ খানের মসজিদ।

(৪১) বড় গোয়ালি গ্রামের (ত্রিপুরা জেলা, পূর্ব পাকিস্তান) মসজিদ (নির্মাণকাল ৯০৬ হিজরা বা ১৫০০ খ্রীঃ)।

পরিশিষ্ট

অতিরিক্ত টীকা ও সংশোধনী

পৃঃ ১১ ছঃ ৯-১০—ডঃ আবদুল করিমের মতে ইব্‌ন্ বতুতা যে শেখ জলালুদ্দীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, তিনি শেখ জলালুদ্দীন ত'ব্রজী নন, শেখ জলালুদ্দীন কুন্যাঈ (Social History of the Muslims in Bengal, pp. 97-98, f. n. এবং Journal of the Pakistan Historical Society, Vol. VIII, Pt. I, 1960, pp. 290-96 দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ইব্‌ন্ বতুতা যে লোককে নিজের চোখে দেখেছিলেন, তাঁর নাম ভুলভাবে লেখা তাঁর পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। শেখ জলালুদ্দীন ত'ব্রজী একজন অতিবিখ্যাত ব্যক্তি; অন্য কারও সঙ্গে দেখা করে "শেখ জলালুদ্দীন তব্রিজীর সঙ্গে দেখা করেছি" বলা কোন প্রকৃতিস্থ লোকের পক্ষেই সম্ভব বলে মনে হয় না। ডঃ সুকুমার সেন একবার ঠিক এইরকমভাবে অনুমান করেছিলেন যে জয়ানন্দ শৈশবে গদাধর দাস বা গদাধর পণ্ডিতের দেখা পান, কিন্তু পরবর্তী জীবনে তাঁর সঙ্গে চৈতন্যদেবের গোলমাল করে ফেলে তিনি চৈতন্যমঙ্গলে লেখেন যে শৈশবে তিনি চৈতন্যদেবের দর্শন পেয়েছিলেন (বা. সা. ই. ১।২, পৃঃ ২৬৯); আমরা ডঃ সেনের এই উক্তির তীব্র সমালোচনা করি (প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম, পৃঃ ৩১৯-৩২০); তার পরে ডঃ সেন ঐ উক্তি প্রত্যাহার করেন (বা. সা. ই. ১।৩, পূর্বার্ধ, পৃঃ ৩৬৪)।

ডঃ আবদুল করিম লিখেছেন, "Ibn Baṭṭūṭah's reference to Shaykh Jalāl Tabrizī in Kamrup is a mistake for Shaykh Jalāl Kunyāī, as he committed in many other cases in connection with Bengal." কিন্তু ইব্‌ন্ বতুতার বাংলাদেশ সম্বন্ধীয় বিবরণে যেটুকু ভুল আছে, তা প্রধানত বাংলার ইতিহাস ও ভূগোল সংক্রান্ত। কোন দেশের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিবরণ সংগ্রহ করার সময় এবং দীর্ঘকাল পরে তা লিপিবদ্ধ করার সময় ভুল করা কারও পক্ষেই বিচিত্র নয়, কিন্তু কেউ যখন বলে যে সে নিজে একজন বিশিষ্ট লোককে দেখেছে, তখন তাতে তার ভুল হবার কথা কল্পনা করা যায় না। দীনেশচন্দ্র সেনের বইগুলিতে ইতিহাসঘটিত ভুলের বহু নিদর্শন মেলে, কিন্তু তাই বলে

দীনেশচন্দ্র সেন যেখানে লিখেছেন যে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখেছিলেন, সেখানে তাঁর উক্তিকে কেউ অবিশ্বাস করবে না। অতএব ইব্‌ন্ বতুতা যে শেখ জলালুদ্দীন তব্রিজীকে দেখেছিলেন, তাতে সন্দেহের কোন কারণই নেই।

ইব্‌ন্ বতুতা যে শেখ জলালুদ্দীন তব্রিজীকে দর্শন করেছিলেন, তা মনে করার আর একটি কারণ, তিনি এই শেখ সম্বন্ধে যে সমস্ত উক্তি করেছেন, তাদের সমর্থন অন্য বহু সূত্র থেকে পাওয়া যায়।

ইব্‌ন্ বতুতা ৭৪৭ হিজরা বা ১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে এসেছিলেন। তিনি লিখেছেন যে তার একবছর পরে অর্থাৎ ১৩৪৭ খ্রীষ্টাব্দে শেখ জলালুদ্দীন তব্রিজী ১৫০ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন ; তাহলে ইব্‌ন্ বতুতার উক্তি অনুসারে শেখ জলালের জন্মসাল হচ্ছে ১১৯৭ খ্রীঃ (চান্দ্র বৎসর ধরলে ৫৯৮ হিজরা বা ১২০২ খ্রীষ্টাব্দ হয়)। শেখ কুৎবুদ্দীন বখ্‌তিয়ার কাকীর (ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের লোক এবং শেখ জলালুদ্দীন তব্রিজীর বন্ধু) বাণীর সংগ্রহ-গ্রন্থ 'ফওয়াইদ অল-সালকীন' ও সূফীদের অন্য জীবনীগ্রন্থগুলি থেকে প্রামাণিকভাবে জানা যায় যে শেখ জলালুদ্দীন তব্রিজী তাব্রজ শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং দু'জন গুরুর কাছে শিক্ষা লাভ করার পরে দিল্লীতে আসেন , তখন শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশ (১২১০-১২৩৬ খ্রীঃ) দিল্লীর সুলতান।

ডঃ আবদুল করিম মনে করেছেন যে ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে যদি শেখ জলালুদ্দীন তব্রিজী ইলতুৎমিশের রাজত্বকালে দিল্লীতে আসেন, তা "...means that he was a mere boy when he came to Dehli, though the sources at our disposal assert that he already served two of his teachers." কিন্তু ইলতুৎমিশ ১২৩৬ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করলে শেখ জলালুদ্দীন তাব্রজীর ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বয়স হয় ৩৯ বছর। ঐ বছরে কেন, তার ১৫ বছর আগেও জলালুদ্দীন দুই গুরুর কাছে শিক্ষালাভ সম্পূর্ণ করে দিল্লীতে আসতে পারেন।

অতএব দ্বাদশ শতকের শেষ দিকেই যে শেখ জলালুদ্দীন তব্রিজীর জন্ম হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখানে ইব্‌ন্ বতুতার উক্তির সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। অপরদিকে বুকাননের বিবরণীতে লেখা আছে যে শেখ জলালুদ্দীন তব্রিজী আলাউদ্দীন আলী শাহের রাজত্বকালেও অর্থাৎ ৭৪২-৭৪৩

হিজরায় (১৩৪১-১৩৪২ খ্রীঃ) জীবিত ছিলেন এবং আলাউদ্দীন আলী শাহ তাঁকে সশরীরে প্রত্যক্ষ করেছিলেন; সুতরাং এখানেও ইব্‌ন্ বতুতার উক্তির সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে।

মোটের উপর, ইব্‌ন্ বতুতা যে শেখ জলালুদ্দীন তব্রিজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, তা শুধু তাঁর নিজের উক্তি থেকে নয়, পূর্বোল্লিখিত বিভিন্ন সূত্রের সাক্ষ্য থেকেও প্রমাণিত হয়।

ডঃ আবদুল করিম ইব্‌ন্ বতুতার উক্তির বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ আবুল ফজল ও ফিরিশ্‌তার উক্তির উল্লেখ করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি লিখেছেন, "According to Khazīnat al-Aṣfiyā' he died in 642/A. D. 1244, while according to Tadhkirat-i Awliyā'-i-Hind, an Urdu biography of the saints, he died in 622/A. D. 1225". কিন্তু ইব্‌ন্ বতুতার প্রত্যক্ষদৃষ্ট ব্যক্তি সম্বন্ধে ইব্‌ন্ বতুতার উক্তির বিরুদ্ধে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে রচিত 'আইন-ই-আকবরী', সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রচিত 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা', অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত 'খজীনৎ অল-আশফিয়া' এবং উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত 'তজকিরৎ-ই-আউলিয়া-ই-হিন্দ'-এর উক্তির কোনই মূল্য নেই। ডঃ করিম দেখিয়েছেন যে নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের রাজত্বকালে—৯৩৪ হিজরা বা ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ দেওতলার শিলালিপিতে দেওতলাকে "শেখ জলাল মুহম্মদ তব্রিজীর শহর" বলা হয়েছে। কিন্তু এই শিলালিপি ইব্‌ন্ বতুতার বাংলাদেশে আগমনের দেড়শো বছরেরও বেশী পরে উৎকীর্ণ। অতএব আলোচ্য বিষয়ে ইব্‌ন্ বতুতার উক্তির তুলনায় তার উক্তি বেশী গুরুত্ব লাভ করতে পারে না। ডঃ আহমদ হাসান দানী দেখিয়েছেন যে আশরফ সিম্‌নানীর একটি চিঠিতে "জলালিয়া দরবেশ"দের দেওতলাতে সমাধিস্থ হওয়ার কথা লেখা আছে। কিন্তু এই চিঠিও শেখ জলালুদ্দীনের সমসাময়িক নয়। অবশ্য এ'রকম হওয়া মোটেই অসম্ভব নয় যে শেখ জলালুদ্দীন তব্রিজী অনেকদিন দেওতলাতে বাস করেছিলেন এবং তাঁর বহু শিষ্য-প্রশিষ্য সেখানেই সমাধিস্থ হয়েছিলেন; তা' যদি হয়, তাহলে পূর্বোক্ত দেওতলা শিলালিপি এবং আশরফ সিমনানীর এই চিঠির উক্তির মধ্যে যাথার্থ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

ইব্‌ন্ বতুতা লিখেছেন যে শেখ জলালুদ্দীন তব্রিজী কামরূপ পর্বতেই

পরলোকগমন করেছিলেন ও সেখানেই সমাধিস্থ হয়েছিলেন। এ কথার যাথার্থ্য সম্বন্ধে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু বহু জায়গাতেই শেখ জলালুদ্দীন তব্রিজীর সমাধি দেখতে পাওয়া যায়। অধ্যাপক মাহ্‌দী হোসেন এ সম্বন্ধে যথার্থই লিখেছেন, "...great saints and martyrs about whom contemporary history is silent have given rise to popular stories, and monuments have been raised in their honour sometimes in the shape of replica tombs bearing identical names".

এখন এই প্রসঙ্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর একটি বিষয়ের মীমাংসা করতে হবে। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম পাদে সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে বাংলার মুসলিম রাজশক্তি সর্বপ্রথম শ্রীহট্ট জয় করে। প্রাচীন প্রবাদ ও 'সুহৈল-ই-য়মন' নামক অর্বাচীন গ্রন্থের মতে শাহ জলাল নামে একজন দরবেশ মুসলমানদের শ্রীহট্ট-বিজয়ের অভিযানে নেতৃত্ব করেছিলেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই শাহ জলাল কে? অনেকে মনে করেন জলালুদ্দীন তব্রিজী। আমরাও এই বইয়ের প্রথম সংস্করণে এই ধারণাই ব্যক্ত করেছিলাম। কিন্তু শ্রীহট্টের শাহ জলালের দরগায় আলাউদ্দীন হোসেন শাহের ৯১৮ হিজরায় (১৫১২ খ্রীঃ) উৎকীর্ণ যে শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে, তাতে লেখা আছে "মুহম্মদের পুত্র শেখ জলাল মুজাররদের দয়ায় সিকন্দর খান গাজী" প্রথম শ্রীহট্ট জয় করেছিলেন। এই দরগায় প্রাপ্ত ৯১১ হিজরায় উৎকীর্ণ আর একটি শিলালিপিতে এই শেখকে "শেখ জলাল মুজাররদ কুন্যাঈ (কুন্যার অধিবাসী)" বলা হয়েছে। গউসী নামে একজন গ্রন্থকার ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে 'গুলজার-ই-আব্রার' নামে একটি বই লেখেন; এই বইয়ে তিনি শ্রীহট্ট-বিজেতা সৈন্যদের অন্যতম ও শেখ জলালের অনুচর নূরুল হুদার বংশধর শেখ আলী শেরের 'শরহ্‌-ই-নজহৎ-উল্-আরওয়াহ্‌' অবলম্বনে লিখেছেন যে, শেখ জলালুদ্দীন মুজাররদের বাড়ী ছিল তুর্কীস্তানে এবং তিনি তাঁর গুরুর দেওয়া কয়েক শত সৈন্য নিয়ে শ্রীহট্ট (সিরহট) জয় করেছিলেন (J. A. S. P., 1957, Vol. II, pp. 61-66 দ্রঃ)। যদিও এইসব শিলালিপি ও বই মুসলমানদের শ্রীহট্ট-বিজয়ের সমসাময়িক কালে রচিত নয় এবং এদের পরস্পরের উক্তির মধ্যে সম্পূর্ণ

ঐক্য নেই, তাহলেও এদের সাক্ষ্যকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সুতরাং এদের উক্তির উপর নির্ভর করে আপাতত সিদ্ধান্ত করছি যে, শ্রীহট্ট-বিজয়ের সঙ্গে যে শাহ্ জলালের নাম জড়িত, তিনি শেখ জলালুদ্দীন তব্রিজীর থেকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি—শেখ জলালুদ্দীন কুন্যাঈ। এই শাহ্ জলাল যদি সত্যিই শ্রীহট্ট অভিযানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে তিনি শেখ জলালুদ্দীন তব্রিজীর সঙ্গে অভিন্ন হ'তে পারেন না, কারণ শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে শেখ জলালুদ্দীন তব্রিজীর বয়স ১০০ বছরের বেশী হয়েছিল।

কিন্তু আমাদের এই নতুন সিদ্ধান্ত দ্বারা ডঃ আবদুল করিমের সিদ্ধান্ত (অর্থাৎ ইব্‌ন্ বত্তুতা শেখ জলালুদ্দীন তব্রিজীকে দেখেন নি, শেখ জলালুদ্দীন কুন্যাঈকে দেখেছিলেন) মোটেই সমর্থিত হয় না। কারণ, ইব্‌ন বত্তুতা এ কথা কোথাও বলেন নি যে, তিনি যে শেখ জলালুদ্দীনের দর্শন পেয়েছিলেন, তিনি শ্রীহট্ট বিজয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইব্‌ন্ বত্তুতা যে জায়গায় শেখ জলালুদ্দীনকে দেখেছিলেন, তা শ্রীহট্ট নয়—কামরূপের পর্বতমালা। শেখ জলালুদ্দীন কুন্যাঈ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম পাদে শ্রীহট্ট-বিজয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অংশ গ্রহণ করার পরেও যে আরও ৩০।৪০ বছর বেঁচে থেকে ১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইব্‌ন্ বত্তুতাকে দর্শন দিয়েছিলেন, এ কথা ভাবার অনুকূলে কোন প্রমাণ নেই; শেখ জলালুদ্দীন তব্রিজীর মত পরমায়ু তো আর সবাই পায় না। শেখ জলালুদ্দীন তব্রিজী যে বাংলায় এসেছিলেন, এ কথা তাঁর সব জীবনীগ্রন্থে পাওয়া যায়। বাংলার পাণ্ডুয়া, দেওতলা প্রভৃতি স্থানে অনেক দিন বাস করার পরে তিনি কামরূপের পর্বতমালায় চলে যান এবং সেখানেই শেষ জীবন অতিবাহিত করে পরলোক-গমন করেন—এতে সন্দেহের কোন কারণ নেই। মোটের উপর, ইব্‌ন্ বত্তুতার উক্তির সঙ্গে 'ফওয়াইদ-অল-সালকীন' ও সুফী দরবেশদের অন্যান্য জীবনীগ্রন্থ এবং বুকাননের বিবরণের উক্তি মিলিয়ে দেখলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ইব্‌ন্ বত্তুতা শেখ জলালুদ্দীন তব্রিজীরই দর্শন পেয়েছিলেন।

পৃঃ ৯৭ ছঃ ১৫-১৬—'আইন-ই-আকবরী'তে লেখা আছে, "সেই দেশের (বাংলার) অধিবাসী কান্‌সি নামে একজন হিন্দু কৌশলের জোরে তাঁর (গিয়াসুদ্দীনের) পৌত্র শামসুদ্দীনের (অর্থাৎ শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহের)

উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন।" ("কান্‌সি নাম বুমি অজ্ হীলা আন্দোজি রব্ শামসুদ্দীন্ নবিরে উ চিরা দস্তিয়ফ্‌ৎ।") 'রিয়াজ উস্ সলাতীন'-এ লেখা আছে, "ঐ সময়ে (শিহাবুদ্দীনের রাজত্বকালে) কান্‌স্ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিলেন।"

পৃঃ ১০২ ছঃ ২২-২৮—তবকাৎ-ই-আকবরী, আইন-ই-আকবরী, মাসির-ই-রহিমী, তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা প্রভৃতি বইতে বাংলার স্বাধীন সুলতানদের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা সংক্ষিপ্ত ও ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। 'রিয়াজ-উস্-সলাতীন' ও বুকাননের বিবরণী এদের তুলনায় পরবর্তী কালে রচিত হলেও এই দুটি সূত্রের সাক্ষ্য এদের তুলনায় বেশী নির্ভরযোগ্য। 'রিয়াজ'-রচয়িতা কতকগুলি অধুনালুপ্ত নির্ভরযোগ্য সূত্র ব্যবহার করে বহু অকৃত্রিম তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। এখানে এইরকম একটি তথ্যের উল্লেখ করছি। 'রিয়াজ'-এ লেখা আছে যে মুসলমান দরবেশদের উপর রাজা গণেশের অত্যাচারের ফলে নূর কুৎব্ আলম ক্ষুব্ধ হয়ে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কীকে চিঠি লিখলেন, এই ইব্রাহিম শর্কী "ঐ সময়ে বিহারের সীমা পর্যন্ত শাসন করতেন।" ইব্রাহিম শর্কী যে রাজা গণেশের সমসাময়িক নৃপতি ছিলেন এবং বিহার পর্যন্ত তাঁর অধিকার ছিল, একথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু 'তবকাৎ', 'আইন', 'ফিরিশ্‌তা' ও 'মাসির'-এর বিবরণ অনুসারে ইব্রাহিম শর্কীর সিংহাসনে আরোহণের কয়েক বছর আগেই রাজা গণেশ বা কান্‌স পরলোকগমন করেছিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ঐ সব বইতে যেখানে ভুল খবর দেওয়া হয়েছে, সেক্ষেত্রে 'রিয়াজ'-এ সঠিক সংবাদ লিপিবদ্ধ হয়েছে। 'রিয়াজ'-রচয়িতা তাঁর ব্যবহৃত নির্ভরযোগ্য সূত্রগুলির নাম প্রায় করেনই নি, অবশ্য কোথাও কোথাও তিনি "দ্বিতীয় একটি বিবরণ", "কোন এক ক্ষুদ্র পুস্তিকা" বলে অস্পষ্টভাবে তাদের উল্লেখ করেছেন এবং উল্লেখ করে তাদের যেটুকু সাক্ষ্য উদ্ধৃত করেছেন, তা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই খাঁটি। 'রিয়াজ'-রচয়িতার ঐতিহাসিক বোধও বেশ প্রখর ছিল; 'সুলতান আলাউদ্দীন'-এর যে 'হোসেন শাহ' নাম ছিল, 'নসীব শাহ' নামে উল্লিখিত সুলতানের প্রকৃত নাম যে 'নসরৎ শাহ', তা তিনি শিলালিপির সাক্ষ্য উদ্ধৃত করে প্রমাণ করেছেন। তিনি যে সব গল্প ও প্রবাদ লিপিবদ্ধ করেছেন, তাদের সূচনায় "কথিত আছে" লিখে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে এগুলি কোন প্রামাণিক সূত্র থেকে সংগৃহীত নয়।

বুকাননের বিবরণী যে পুঁথির উপর নির্ভর করে লিখিত, সেটি খুবই মূল্যবান সূত্র ছিল. তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ এই বিবরণীতে সুলতানদের নাম সবক্ষেত্রেই নির্ভুলভাবে উল্লিখিত হয়েছে; তাঁদের রাজত্বকালও যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তা প্রায় সব ক্ষেত্রেই সত্যের কাছাকাছি। পক্ষান্তরে 'তবকাৎ', 'ফিরিশ্‌তা', 'মাসির' প্রভৃতি বইতে সুলতানদের রাজত্বকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এবং নামও অনেক ক্ষেত্রে ভুলভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। 'রিয়াজ-উস-সলাতীনে'র উক্তির সঙ্গে বুকাননের বিবরণীর উক্তির অনেক জায়গায় ঐক্য দেখা যায়, আবার অনৈক্যও কোন কোন ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। আচার্য যদুনাথ সরকার বুকানন-বিবরণীর রাজা গণেশ ও তাঁর বংশ সংক্রান্ত অংশটি সম্বন্ধে লিখেছেন, "...it looks like a careless and incorrect summary of Riyaz-us-salatin", কিন্তু এই মত সমর্থন করা যায় না; কারণ বুকানন-বিবরণীর এই অংশে সৈফুদ্দীন, শিহাবুদ্দীন প্রভৃতি সুলতানদের নাম সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে ও রাজত্বকাল প্রায় সঠিকভাবে উল্লিখিত হয়েছে, যা 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে' হয়নি। অন্যান্য বিষয়েও দুই বিবরণীর মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট। কেউ কেউ মনে করেন, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মুন্‌শী শ্যামপ্রসাদ ফার্সী ভাষায় বাংলার মুসলমান রাজাদের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখেছেন, সেটি এবং বুকানন-বিবরণীর আধার ফার্সী পুঁথিটি অভিন্ন। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল, কারণ মুন্‌শী শ্যামপ্রসাদ বুকাননের সমসাময়িক লোক; তাঁর লেখা ফার্সী বিবরণের পাণ্ডুলিপি India Office Libraryতে আছে, ডঃ আহমদ হাসান দানী Muslim Architecture in Bengal গ্রন্থের পরিশিষ্টে সেটিকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করেছেন। এই বিবরণী বুকানন-বিবরণী থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। (J. A. S. B., 1902. Pt. I, No. I, p. 44-এ মুন্‌শী শ্যামপ্রসাদের বিবরণ সম্বন্ধে আলোচনাও দ্রষ্টব্য)।

ইতিহাস-রচনার প্রতি হিন্দুদের অনাসক্তি সর্বজনবিদিত। কিন্তু মুসলমানরা ইতিহাস লিখতে ভালবাসতেন। অথচ বাংলাদেশে এসে মুসলমানরাও ইতিহাস লিখতে ভুলে গিয়েছিলেন। যাহোক, 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে' উল্লিখিত "ক্ষুদ্র পুস্তিকা" ও "দ্বিতীয় বিবরণ" প্রভৃতি এবং বুকানন-বিবরণীর আধার পুঁথিটি থেকে প্রমাণ হয় যে মধ্যযুগে বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু কিছু নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছিল।

পৃঃ ১৫৪ ছঃ ১৬—স্টুয়ার্ট তাঁর History of Bengal-এ লিখেছেন যে তিনি জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কীকে লেখা শাহ্‌রুখের চিঠিটি পেয়েছেন। তিনি ঐ চিঠির একটি ইংরেজী অনুবাদ দিয়েছেন (Stuart, History of Bengal, 2nd Edn., pp. 111-112 দ্রষ্টব্য)। স্টুয়ার্ট লিখেছেন "...the Letter is a curious specimen of the pompous style of the East" এবং "The Letter is taken from Ferishtah" কিন্তু 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা'র মুদ্রিত সংস্করণে এই চিঠিটি পাওয়া যায় না। স্টুয়ার্ট হয়তো 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা'র কোন পুঁথিতে এটি পেয়েছিলেন। আমরা নীচে এই চিঠির বাংলা অনুবাদ দিলাম।

"এই আদেশ (সমস্ত পৃথিবী যার অধীন এবং বিশ্ব যার বাধ্য) একদিনের দূরত্ব অতিক্রম করে পৌঁছোবামাত্র সেই দেশের সমস্ত মুসলমান বন্দীদের সমবেত করবে ও তাদের যার যার প্রভুর হাতে সমর্পণ করে ঐ ব্যাপারে কাজীদের স্বাক্ষরিত ও মোহরযুক্ত একটি নিদর্শন (certificate) নেবে এবং অবিলম্বে তা সম্রাটের সিংহাসনের পাদমূলে প্রেরণ করবে। নিশ্চিত জেনো, যদি তুমি একটুও দেরী কর অথবা সামান্যতম পরিমাণেও এই আদেশ উপেক্ষা কর, তাহলে আমরা আমাদের প্রসিদ্ধতম পুত্র, কাবুলের অধিপতি সুলতান মাহ্‌মুদকে এবং খোটেলান, গজনী, কান্দাহার ও গরম্‌সীরের শাসনকর্তাদের রাজকীয় আদেশ পাঠাব অগ্রসর হতে এবং তোমাকে এমন ভয়ঙ্কর শাস্তি দিতে, যা অন্যদের কাছে উদাহরণ-স্বরূপ হয়ে থাকবে। তা যদি যথেষ্ট না হয়, তাহলে আমরা সেনাপতি ফিরোজ শাহকে খোরাসানের সৈন্যবাহিনী নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করে তোমার উপর প্রতিশোধ নিতে আদেশ দেব। তাতেও যদি কাজ না হয়, আমরা আমাদের মহত্তম পুত্র সুলতান শামসুদ্দীনকে আদেশ পাঠাব অরহং, পিরাই, কুন্দ্‌দিজ এবং বাকেলানের সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়ে তোমাকে শাস্তি দেবার জন্য। তাতেও যদি কোন ফল না হয়, আমরা আমাদের সাহসী এবং বিজয়ী পুত্র বয়েস্তেগুর বাহাদুরকে বাবুল, সারী, মাজিনদেরান, তবারিস্তান, গরিক এবং জিলানের সৈন্যদের নিয়ে অগ্রসর হয়ে তোমাকে তোমার অপরাধ আর অযোগ্যতা সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে নির্দেশ দেব। তা সত্ত্বেও তুমি যদি তোমার অসৎ আচরণ চালিয়ে যেতে সমর্থ হও, তাহলে আমরা আমাদের মহান্ পুত্র সুলতান ইব্রাহিমকে ইরাক,

আজারবাইজান, বাগদাদ এবং আরবের নানা অঞ্চলের সৈন্যবাহিনী নিয়ে যাত্রা করে তোমার দেহ থেকে আত্মা পৃথক করে ফেলতে আদেশ দেব। তারা যদি আমাদের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে সমর্থ না হয়, তাহলে আমাদের প্রিয়তম এবং বিজয়ী পুত্র উলুগ বেগ গুরগনকে আমাদের রাজকীয় ইচ্ছা জানিয়ে দেব, যাতে সে তুর্কীস্তানের অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয় এবং তোমাকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলে অথবা তোমার দেহকে ঝুলিয়ে রাখে কাকেদের খাবার জন্য।"

তিনটি জিনিস এখানে সাবধানে লক্ষ করতে হবে। প্রথমত, চিঠিতে বাংলাদেশের নাম কোথাও উল্লিখিত হয়নি। এই চিঠিতে যে দেশের বন্দীদের মুক্তি দেবার কথা আছে, স্টুয়ার্ট ( ) বন্ধনীর মধ্যে তাকে "Bengal" বলেছেন, কোন্ প্রমাণে বলেছেন, তা আমরা জানি না। দ্বিতীয়ত, চিঠিটিতে ইব্রাহিম শর্কীরও নাম উল্লিখিত হয়নি। তৃতীয়ত, চিঠিটিতে ইব্রাহিম যে ঐ দেশ আক্রমণ করেছিলেন, সে কথাও লেখা হয়নি। এই চিঠি যদি ইব্রাহিম শর্কীকেই লেখা হয়, তাহলে এর থেকে শুধু এইমাত্র জানা যায় যে ইব্রাহিম ঐ দেশের অনেক বন্দীকে মুক্তি না দিয়ে আটক করে রেখেছিলেন। সুতরাং 'মতলা-ই-সদাইনে' শাহ্রুখের ইব্রাহিমকে প্রেরিত যে ফরমানের উল্লেখ আছে তা এই চিঠির সঙ্গে অভিন্ন নয়। আলোচ্য চিঠিটি যদি অকৃত্রিম হয়, এটি যদি ইব্রাহিম শর্কীকেই লেখা হয় এবং এতে উল্লিখিত ঐ বিশেষ দেশটি যদি বাংলাদেশই হয়, তাহলে বলতে হবে ইব্রাহিম শর্কী বাংলাদেশের উপর আক্রমণ বন্ধ করার পরেও এদেশের বন্দীদের মুক্তি দেননি, তাই শাহ্রুখ দ্বিতীয়বার তাঁর উপর আদেশ জারী করে মুসলমান বন্দীদের মুক্তি দিতে বলেছিলেন এবং সেই আদেশই এই চিঠির মধ্য দিয়ে জানানো হয়েছে।

আসলে যতদূর মনে হয়, এই চিঠি আদৌ ইব্রাহিম শর্কীকে লেখা নয়। কারণ চিঠিটিতে স্পষ্ট লেখা রয়েছে যে এর লেখক ও প্রাপকের মধ্যে দূরত্ব এক দিনের। কিন্তু শাহ্রুখের রাজধানী হীরাট থেকে ইব্রাহিমের রাজধানী জৌনপুরে যেতে ঐ সময়ে কয়েক মাস লাগত।

পৃঃ ১৫৮ ছঃ ২৩-২৮—জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের পরে নাসিরুদ্দীন মাহ্মুদ শাহ (১ম), রুকনুদ্দীন বারবক শাহ, শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহ, জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহ ও আলাউদ্দীন হোসেন শাহ 'খলীফৎ আল্লাহ্" উপাধি

ব্যবহার করেছিলেন। নতুন মুসলমান জলালুদ্দীনের পক্ষে এই উপাধি গ্রহণ ইসলাম ধর্মের প্রতি তাঁর অত্যধিক নিষ্ঠার পরিচয় দেয়, কিন্তু তাঁর পরবর্তী সুলতানবর্গ কর্তৃক এই পুরানো উপাধি ব্যবহার থেকে তাঁদের ধর্মনিষ্ঠা সম্বন্ধে কোন হদিস পাওয়া যায় না।

ডঃ আবদুল করিমের মতে রুকনুদ্দীন বারবক শাহের পরে বাংলার কোন সুলতান "খলীফৎ আল্লাহ্" উপাধি গ্রহণ করেন নি, কারণ তাঁদের কারও মুদ্রাতেই ঐ উপাধি উল্লিখিত হয়নি (Corpus of the Muslim Coins of Bengal, pp. 174-176)। কিন্তু শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহ, জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহ ও আলাউদ্দীন হোসেন শাহের কয়েকটি শিলালিপিতে সুলতানদের নামের সঙ্গে "খলীফৎ আল্লাহ্" উপাধি যুক্ত করা হয়েছে। এ' সম্বন্ধে ডঃ আবদুল করিম বলেন যে ঐ শিলালিপিগুলি সুলতানরা স্বয়ং খোদাই করাননি, তাঁদের কর্মচারী ও প্রজারা খোদাই করিয়েছিলেন, তাঁরা চাটুকারিতা করে সুলতানদের "খলীফৎ আল্লাহ্" বলেছেন। কিন্তু বিভিন্ন জায়গার এতগুলি লোক এই সব সুলতানকে তোষামোদ করে "খলীফৎ আল্লাহ্" বলেছেন ভাবা কঠিন; আর আলাউদ্দীন হোসেন শাহের যে চারটি শিলালিপিতে তাঁর "খলীফৎ আল্লাহ্" উপাধির উল্লেখ আছে, তাদের মধ্যে একটি তাঁরই আদেশে ক্ষোদিত হয়েছিল (Dani, Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal, pp. 49-50 দ্রষ্টব্য)। অতএব শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহ, জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহ ও আলাউদ্দীন হোসেন শাহের যে "খলীফৎ আল্লাহ্" উপাধি ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মুদ্রার স্বল্পপরিমিত স্থানের মধ্যে সবগুলি উপাধি লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয় বলে ঐ সব সুলতানরা "খলীফৎ আল্লাহ্" উপাধিকে মুদ্রা থেকে বাদ দিয়ে তার জায়গায় অন্য উপাধি সন্নিবেশ করেছিলেন, কিন্তু শিলালিপির মধ্যে প্রচুর স্থান থাকার দরুন তাতে এই উপাধিটি তাঁরা যথাযথভাবে উল্লেখ করেছিলেন।

পৃঃ ১৫৯ ছঃ ১-১৪—পঞ্চদশ শতাব্দীর গ্রন্থকার অল-সখাওয়ী (১৪২৬-৯৬ খ্রীঃ) তাঁর 'অল্-জও অল্-লামে লে-অহ্ল্ অল্-করন্ অল্ তাসে' নামক আরবী ভাষায় লেখা গ্রন্থে (Vol, VIII, p. 280) জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তার বাংলা অনুবাদ নীচে দিলাম। শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন মৈত্রের ইংরেজী অনুবাদ থেকে এই অনুবাদ করা হয়েছে।

"মুহম্মদ বিন্ কান্দু অল জলাল আবুল মুজাফফর,
মুজাফফর আহমদের পিতা, বাংলার শাসক।

এঁর পিতা ছিলেন কাফের, কান্‌স্ নামে পরিচিত। শামসুদ্দীনের পুত্র সিকন্দর শাহের পুত্র গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের পুত্র সৈফুদ্দীন হমজার ক্রীতদাসদের অন্যতম শহাব তাঁকে আক্রমণ করে; সে বাংলাদেশে রাজা হয় এবং তাঁকে বন্দী করে। এই লোকটির (কান্সের) পুত্র মুসলমান হয়ে মুহম্মদ নাম নিলেন এবং তিনি শহাবকে আক্রমণ করে তার কাছ থেকে রাজ্য কেড়ে নিলেন। তিনি ইসলামের উন্নতিবিধান করলেন, ইসলামের বিবিধ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন এবং তাঁর পিতা মসজিদ ও অন্যান্য জিনিস যা কিছু ধ্বংস করেছিলেন, সেগুলির সংস্কারসাধন করলেন। তিনি আবু হানিফার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হলেন। তিনি মক্কায় অনেকগুলি প্রাসাদ, বিশেষভাবে একটি অপূর্বসুন্দর মাদ্রাসাহ্ তৈরি করলেন এবং মিশরের শাসক আশরফকে উপহার সহযোগে চিঠি পাঠিয়ে অনুরোধ জানালেন তাঁকে খলিফার স্বীকৃতি (investiture) পাঠাবার জন্য। তিনি (আশরফ) তাঁকে (জলালকে) মক্কার শেরিফের মারফৎ একটি সম্মান-পরিচ্ছদ পাঠালেন। তিনি (জলাল) সেই পোষাক অঙ্গে ধারণ করে খলিফাকে উপহার পাঠালেন। এইসব উপহার আলা-উল-বুখারির মারফৎ প্রেরিত হয়। এইভাবে মিশর ও দামাস্কাসে ক্রমাগত উপহার পাঠানো হয়েছিল। তিনি ৮৩৭ সালের রবী-উল-আখির মাসে পরলোকগমন করেন। তাঁর পুত্র তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন, যখন তাঁর বয়স মাত্র ১৪ বছর।"

এই বিবরণে কিছু তথ্যগত ভুল আছে (পৃঃ ৯৭, পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

পৃঃ ১৬০ ছঃ ১৯—'স্মৃতিরত্নহার' গ্রন্থের উপক্রমের তৃতীয় থেকে সপ্তম শ্লোকে রায় রাজ্যধরের প্রশস্তি আছে। এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত 'স্মৃতিরত্নহার'-এর পুঁথি থেকে আমরা শ্লোকগুলি নীচে উদ্ধৃত করছি। পুঁথিটি কীটদষ্ট হওয়ার দরুণ শ্লোকগুলির কয়েকটি শব্দ পাওয়া যায় নি।

জীয়াদয়ং স জগদত্ত-সুতোঽতিবেল-
স্তৈস্তৈর্গুণৈ.......................
......পা নিজভুজদ্রবিণার্জিতশ্রীঃ
শ্রীরায়রাজ্যধরনাম পদং প্রপন্নঃ ॥ ৩

সৈনাধিপত্যমিভসৈন্ধবতুর্যশঙ্খ-
চ্ছত্রাবলীললিতকাঞ্চনরূপ্য……
…দান্ বহুভূষণঞ্চ
জল্লালদীননৃপতির্ম্মুদিতো গুণৌঘৈঃ ॥ ৪

যো ব্রহ্মাণ্ডং কনকতুরগস্যন্দনং বিশ্বচক্রং
পৃথীং কৃষ্ণাজি [ন] সুরতরূন্ ধেনুশৈলোদধীংশ্চ।
…ধিবদবনীদেবতানামমন্দং
ভিন্দন্ দৈন্যং সপদি দধতে ধর্ম্মসূনোরভিখ্যাম্ ॥ ৫

জন্মাপ্তং জগদত্ততো গুণনিধের্ম্মূর্দ্ধাভি [ষিক্তা] স্বয়ে
দারাঃ সংতুলিতা·· তিঃ শ্রীভাস্করাঃ সূনবঃ।
লক্ষ্মীরদ্ভুতদানভোগসুভগা মন্ত্রিত্বমুর্ব্বীভুজা-
মিথং যস্য মনোরথায় কৃতিনঃ কিঞ্চিন্ন কাম্যং স্থিতম্ ॥ ৬

আচার্য্য ইত্যভিমতং কবিচক্র [বর্ত্তী]
………দ্বিতয়মধ্যগমত্ততো যঃ।
স শ্রীবৃহস্পতিরিমং বহুসংগ্রহার্থৈ-
র্নির্ম্মাতি নির্ম্মলমতিঃ স্মৃতিরত্নহারম্ ॥ ৭

এর মধ্যে চতুর্থ শ্লোকে নৃপতি জলালুদ্দীন ('জল্লালদীন') কর্তৃক রায় রাজ্যধরকে সেনাপতি-পদে নিয়োগের কথা আছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি মতের উল্লেখ করছি। এই মত প্রথমে প্রচার করেন ডঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, তার পরে ডঃ রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরা। কিন্তু এঁদের মত প্রচারিত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খণ্ডিত হয়। এঁরাও নীরব হন। বর্তমানে একমাত্র ডঃ আহমদ হাসান দানী ছাড়া এই মতের সমর্থক আর উল্লেখযোগ্য কেউ নেই। মতটি হচ্ছে এই যে, রায় রাজ্যধর এবং সুলতান জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ অভিন্ন। কিন্তু এই মত কোনক্রমেই সমর্থন করা যায় না। কারণ উপরে উদ্ধৃত 'স্মৃতিরত্নহার'-এর পঞ্চম শ্লোকে বৃহস্পতি মিশ্র বলেছেন যে রাজ্যধর ব্রহ্মাণ্ড, স্বর্ণাশ্বযুক্ত রথ, বিশ্বচক্র, পৃথ্বী, কৃষ্ণাজিন, কল্পতরু প্রভৃতি দান অনুষ্ঠান করে ভূমিদেব ব্রাহ্মণদের দৈন্য দূর করে দিয়ে ধর্মপুত্র আখ্যা লাভ করেছিলেন। নিষ্ঠাবান মুসলমান জলালুদ্দীন এই জাতীয়

দান অনুষ্ঠান করতে পারেন না। তৃতীয় ও ষষ্ঠ শ্লোকে বৃহস্পতি বলেছেন যে রাজ্যধরের পিতার নাম ছিল জগদত্ত এবং ষষ্ঠ শ্লোকে তিনি বলেছেন যে রাজ্যধরের শ্রীভাস্কর প্রভৃতি পুত্রেরা ('শ্রীভাস্করাঃ সূনবঃ') জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ষষ্ঠ শ্লোকেই বৃহস্পতি বলেছেন যে রাজ্যধর রাজাদের মন্ত্রিত্ব লাভ করেছিলেন। বলা বাহুল্য,—গণেশের পুত্র, শামসুদ্দীন আহ্‌মদ শাহের পিতা এবং সার্বভৌম নৃপতি জলালুদ্দীন সম্বন্ধে এ'সব কথা প্রযোজ্য হতে পারে না। সব চেয়ে বড় কথা, চতুর্থ শ্লোকে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে যে জলালুদ্দীন রাজ্যধরকে সেনাপতি-পদে নিয়োগ করেছিলেন। বলা বাহুল্য, জলালুদ্দীন নিজেই নিজেকে সেনাপতি-পদে নিয়োগ করতে পারেন না।

কিন্তু অপর পক্ষও হাল ছাড়েন নি। তাঁরা বলেন—(১) পুঁথিতে যাকে 'জগদত্ত' পড়া হয়েছে, তা আসলে 'জগদন্ত' হবে (কিন্তু পুঁথিতে পরিষ্কারভাবে 'জগদত্ত'ই লেখা আছে ; আমরা পুঁথি দেখেছি) ; 'জগদন্ত' আবার 'গজদন্ত'র ভ্রান্ত পাঠ, আর 'গজদন্ত' অর্থে 'গণেশ' বুঝতে হবে। (২) 'শ্রীভাস্করাঃ' রাজ্যধরের পুত্রদের নাম নয়, বিশেষণ। (৩) ষষ্ঠ শ্লোকের "মন্ত্রিত্বমুর্ব্বীভুজাম" ভ্রান্ত পাঠ, তার জায়গায় "যন্ত্রিত্বমুর্ব্বীভুজাম্" হবে। (৪) জলালুদ্দীন রাজ্যধরকে সেনাপতি-পদে নিয়োগ করেননি, বৃহস্পতিকেই সেনাপতি-পদে নিয়োগ করেছিলেন, সেই কথাই চতুর্থ শ্লোকে বলা হয়েছে। কিন্তু পুথির যে পাঠ পাওয়া যাচ্ছে, তার স্পষ্ট ও সঙ্গত অর্থ যখন করা যায়, তখন ঐ পাঠের পরিবর্তন করা (জগদত্ত<জগদন্ত<গজদন্ত ধরলে দু'বার পরিবর্তন করা হয়) জবরদস্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়। বৃহস্পতি জলালুদ্দীনের পিতার নাম সোজাসুজি 'গণেশ' না লিখে 'গজদন্ত'ই বা লিখতে যাবেন কেন ? চতুর্থ শ্লোকের শূন্যস্থানগুলি ব্যাকরণসম্মতভাবে যেমন করেই পূরণ করা হোক না কেন, তার থেকে কিছুতেই এমন অর্থ দাঁড় করানো যায় না যে জলালুদ্দীন বৃহস্পতিকে সেনাপতি-পদে নিয়োগ করেছিলেন; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে সেনাপতি-পদে নিয়োগ করার কল্পনার অবাস্তবতা সংক্রান্ত প্রশ্ন ছেড়েই দিলাম। অপর পক্ষ চতুর্থ শ্লোকের শূন্যস্থানগুলি যেভাবে পূরণ করেন, তাতে শ্লোকটি মারাত্মকভাবে ব্যাকরণদুষ্ট হয়ে পড়ে। এসব ব্যাপারকে গবেষণার নামে স্বৈরাচার ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। রায় রাজ্যধর যে জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের সঙ্গে অভিন্ন নন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

সপ্তম শ্লোক থেকে জানা যায়, রায় রাজ্যধর বৃহস্পতি মিশ্রের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বৃহস্পতির অন্য কতকগুলি গ্রন্থের পুষ্পিকায় উল্লিখিত তাঁর "রাজ্যধরাচার্য্য" উপাধি থেকে বোঝা যায়, রাজ্যধর বৃহস্পতির শিষ্যও ছিলেন; "মন্ত্রিত্বমূর্ব্বীভুজাম্" উক্তি থেকে বোঝা যায়, রাজ্যধর অন্তত তিনজন রাজার মন্ত্রিত্ব লাভ করেছিলেন; ঐ সময়ে এ ব্যাপার মোটেই অসম্ভব ছিল না, কারণ ১৪১০ খ্রীঃ থেকে ১৪৩৭ খ্রীঃর মধ্যে ১০।১১ জন রাজা বাংলার সিংহাসনে বসেছিলেন।

পৃঃ ১৮১ ছঃ ১২-১৩—চীন সম্রাটদের প্রত্যেকের "রাজত্বে"র একটি করে নির্দিষ্ট নাম থাকত। "য়ুং-লো" ও "চেন থুং" এই রকম "রাজত্বে"র নাম। এই দুই সম্রাটের ব্যক্তিগত নাম যথাক্রমে Chu Ti এবং Chu Ch'i-chen ('Ch'-এর উচ্চারণ 'চ' ও 'ট্র'র মাঝামাঝি)।

পৃঃ ১৮৯ ছঃ ২৩—শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন মৈত্র মুল্লা তকিয়ার 'বয়াজে'র সংশ্লিষ্ট অংশটির মূল ফার্সী থেকে যে ইংরেজী অনুবাদ করেছেন, তার থেকে এই বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে। শ্রীযুক্ত মৈত্রের ইংরেজী অনুবাদটি নীচে উদ্ধৃত হল।

"Previously, Sultan Firoz Shah Tughlaq had brought Sultan Shamsuddın Haji Illyas under his domination and had annexed the territory of Tirhut in his possesion, which later on became the part of the Sharqi Kingdom. But after 121 years, i. e. in the year 875, Rukn-ud-din Barbak Shah, the Sultan of Bengal, having collected Afghans in his army, which were more than locusts in number, invaded the territory of Tirhut, which was in the possesion of Sultan Husain Shah Sharqi. And after a lot of warfare, he became perfectly victorious and directly came into possesion of the fort of Hajipur and its suburbs, as much as formed part of the dominion of Haji Illyas. With this, he extended to the north as far as the river Budi Gandak, which was in the hands of the zeminder of Tirhut, where he appointed Kedar Rai as his Naib (Deputy) for the realisation of royal revenues and protection of frontiers. The son of the

zeminder, Bharat Singh by name, ejected the above-mentioned Rai, through his extreme folly and force, and became supreme there. As soon as Sultan Barbak Shah heard this news, he hastened to give punishment to the zeminder. But the Raja showed his submission and gave assurance of his loyalty to the king."

পৃঃ ১৯৪ ছঃ ১২-১৫—এই শ্লোকটি I. H. Q., 1941, p. 467-468 থেকে উদ্ধৃত। এই শ্লোকটি থেকে জানা যাচ্ছে যে, 'পদচন্দ্রিকা' ১৩৯৬ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথি বা ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জুন তারিখে সম্পূর্ণ হয়েছিল। এই শ্লোকটি এবং এর পরবর্তী দু'টি শ্লোক—তিনটিতেই 'পদচন্দ্রিকা'র রচনাসমাপ্তির কথা আছে। দ্বিতীয় শ্লোকের শেষ চরণ 'তাবন্মে কৃতিরাতনোতু কৃতিনামানন্দবৃন্দো (দ) য়ং' থেকে বোঝা যায়, শ্লোকগুলি বৃহস্পতি মিশ্রের নিজেরই রচনা। 'পদচন্দ্রিকা'র আর একটি পুঁথিতে সংক্ষেপে এর রচনাসমাপ্তিকাল '১৩৯৬' (শকাব্দ) উল্লিখিত হয়েছে (I. H. Q., 1941, p. 457 দ্রষ্টব্য)।

'পদচন্দ্রিকা' যে রুকনুদ্দীন বারবক শাহের রাজত্বকালে সম্পূর্ণ হয়েছিল, সে সম্বন্ধে রচনাসমাপ্তিকালবাচক শ্লোকটির সাক্ষ্য ছাড়া অন্য প্রমাণও আছে। 'পদচন্দ্রিকা'য় বৃহস্পতি মিশ্র বলেছেন যে তাঁর বিশ্বাস রায় প্রভৃতি পুত্রেরা রাজার মন্ত্রীদের মধ্যে মুখ্য ছিলেন। অর্জুন মিশ্র তাঁর 'মোক্ষধর্মার্থ-দীপিকা'র টীকায় লিখেছেন যে তিনি গৌড়েশ্বরের মহামন্ত্রী বিশ্বাস রায়ের অনুজ্ঞা পেয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন (I. H. Q., 1941, p. 466; f. n. দ্রষ্টব্য)। অর্জুন মিশ্রের আর একজন পৃষ্ঠপোষকের নাম সত্য খান (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত A Descriptive Catalogue of Sanskrit Maunscripts in the Collections of the Asiatic Society of Bengal, Vol V., Preface, pp. lxix-lxx দ্রষ্টব্য) এবং এক সত্য খান বারবক শাহের সমসাময়িক (বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ২০৩ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং 'পদচন্দ্রিকা' বারবক শাহের রাজত্বকালে সম্পূর্ণ হয়েছিল বলেই স্থির করা যায়।

যাঁরা মনে করেন বৃহস্পতির সব বই জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের রাজত্বকালে

রচিত হয়েছিল, তাঁদের মতের বিপক্ষে একটি যুক্তি দেখানো যায়। 'স্মৃতিরত্নহার' বইয়ে বৃহস্পতি জলালুদ্দীন কর্তৃক রায় রাজ্যধরের সেনাপতিপদে নিয়োগের উল্লেখ করেছেন। এই বই এবং রঘুবংশটীকা ও শিশুপালবধটীকার মধ্যে বৃহস্পতির গুরুপ্রদত্ত 'মিশ্র' উপাধি ছাড়া 'আচার্য্য' এবং 'কবিচক্রবর্ত্তী' এই দুটি মাত্র উপাধির উল্লেখ দেখা যায় এবং শেষ তিনটি বইয়েও রাজ্যধরের নাম উল্লিখিত হয়েছে। অতএব এই চারটি বইয়ের রচনাকালের মধ্যে বিশেষ ব্যবধান ছিল না এবং এই বইগুলি জলালুদ্দীনের রাজত্বকালে অথবা তার অল্প পরেই রচিত হয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু 'পদচন্দ্রিকা'র মধ্যে বৃহস্পতির অতিরিক্ত পাঁচটি উপাধির উল্লেখ দেখা যায়। এই পাঁচটি উপাধি হচ্ছে—পণ্ডিতচূড়ামণি, মহাচার্য, রাজপণ্ডিত, পণ্ডিতসার্ব্বভৌম ও রায়মুকুট। এতগুলি উপাধি অর্জন করতে সময় লাগে। সুতরাং 'পদচন্দ্রিকা যে জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের রাজত্বকালের অনেক পরে রচিত হয়েছিল, তা এর থেকেও বোঝা যায়।

পৃঃ ১৯৮ ছঃ ২২-২৬—ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী তাঁর 'ফরঙ্গ-ই-ইব্রাহিমী' বা 'শরফনামা' গ্রন্থে যে বারবক শাহের নাম করেছেন, তিনি বাংলার সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক শাহ কিনা, সে সম্বন্ধে ডঃ এ. বি. এম. হবিবুল্লাহ্ সংশয় সৃষ্টি করেছেন। ডঃ হবিবুল্লাহ্ লিখেছেন, "Fārūqī claims Jaunpur as his native town. Bārbak Shah mentioned in some of the eulogistic verses, therefore, need not necessarily be the Sultan of Bengal, for Jaunpur also at this time had a Bārbak Shāh, the younger son of Bahlol Lodī, appointed as vassal ruler after Husain Sharqī was driven out and whom Sikandar Lodī finaly removed a few year after his accession." (J. A. S. P., Vol. V, p. 21)।

কিন্তু নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী যে বারবক শাহের নাম করেছেন, তিনি বাংলার সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক শাহ ভিন্ন আর কেউ নন।

(১) ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী বারবক শাহকে "আবুল-মুজাফফর বারবক শাহ" বলেছেন। রুকনুদ্দীন বারবক শাহের অসংখ্য মুদ্রা ও শিলালিপি থেকে

দেখা যায় তাঁর পূর্ণ নাম ছিল 'রুকন্-উদ্ দুনিয়া ওয়াদ্ দীন আবুল-মুজাফফর বারবক শাহ্।' অতএব বাংলার বারবক শাহের "আবুল-মুজাফফর" "কুনীয়াহ্" ছিল। কিন্তু জৌনপুরের বারবক শাহের "আবুল মুজাফফর" "কুনীয়াহ্" ছিল বলে জানা যায় না। স্ট্যানলী লেনপুল সম্পাদিত 'Coins of the Muhammadan States of India in the British Museum'-এ (p.112) জৌনপুরের বারবক শাহের মুদ্রার যে বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে, তার থেকে দেখা যায়, মুদ্রায় তাঁকে 'আবুল-মুজাফফর বারবক শাহ্' বলা হয়নি, শুধু 'বারবক শাহ্' বলা হয়েছে।

(২) ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী বারবক শাহ্ সম্বন্ধে লিখেছেন, "বারবক শাহ্ শাহ্-ই-আলম (পৃথিবীপতি) হোন্ এবং তিনি তাই। জমশিদের রাজ্য তাঁর অধীনে থাকুক এবং তা' আছে।" রুকনুদ্দীন বারবক শাহের প্রশস্তি করে এই সমস্ত কথা কোন কবি লিখতে পারেন। কিন্তু অতি বড় স্তাবকও জৌনপুরের বারবক শাহ্ সম্বন্ধে এই সমস্ত কথা লিখতে পারেন না। কারণ জৌনপুরের বারবক শাহ্ স্বাধীন নৃপতি ছিলেন না, তিনি তাঁর পিতা বহ্‌লোল লোদীর অধীনে শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁর পিতা জীবিত ও সিংহাসনে আরূঢ় থাকতে কেউ তাঁকে 'পৃথিবীপতি' ও 'জমশিদের রাজ্যের মালিক' বলে প্রশস্তি করবে বলে কল্পনা করা যায় না। পিতার মৃত্যুর পরে এই বারবক শাহ্ অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর ভ্রাতা সিকন্দর লোদীর কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হন এবং কয়েক বছর সিকন্দরের অধীনস্থ শাসনকর্তা হিসাবে জৌনপুরে থাকেন। কিন্তু জৌনপুরের জমিদারদের বিদ্রোহ দমনে তিনি বারবার ব্যর্থ হওয়ার দরুণ সিকন্দর তাঁকে শেষ পর্যন্ত পদচ্যুত ও বন্দী করেন। অতএব পিতার মৃত্যুর পরেও জৌনপুরের বারবক এই জাতীয় প্রশস্তি লাভ করতে পারেন বলে মনে করা যায় না।

(৩) বারবক শাহের দান সম্বন্ধে ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী লিখেছেন, "যিনি প্রার্থীকে বহু ঘোড়া দিয়েছেন। যারা পায়ে হেঁটে যায়, তারা হাজার হাজার ঘোড়া উপহার পেয়েছে। এই মহান আবুল-মুজাফফর, যাঁর সবচেয়ে সামান্য ও সাধারণ উপহার একটি ঘোড়া।"

এই ঘোড়া দান করা বাংলার সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক শাহেরই

বৈশিষ্ট্য। কৃত্তিবাসের সম্পর্কিত পিতৃব্য নিশাপতি তাঁর কাছ থেকে ঘোড়া পেয়েছিলেন ; এ সম্বন্ধে কৃত্তিবাস লিখেছেন,

রাজা গৌড়েশ্বর দিল প্রসাদ ঘোড়া।
পাত্রমিত্র সকলে দিলেন খাসা জোড়া॥

বৃহস্পতি মিশ্রকে 'রায়মুকুট' উপাধি দান করবার সময় রুকনুদ্দীন বারবক শাহ তাঁকে ঘোড়া উপহার দিয়েছিলেন। এ' সম্বন্ধে বৃহস্পতি তাঁর 'পদচন্দ্রিকা'য় লিখেছেন,

যঃ প্রাপ্য দ্বিরদোপবিষ্টকনকস্ম.নৈরবিন্দম্নৃপা-
চ্ছত্রৈস্তৈস্তুরগৈশ্চ রায়মুকুটাভিখ্যামভিখ্যাবতীম্॥

(৪) 'ফরঙ্গ-ই-ইব্রাহিমী'তে ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী শুধু বারবক শাহের প্রশস্তি করেননি, "জলালুদ্দীন" নামে আর একজন নৃপতির প্রশস্তি করেছেন (বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ২১৮-১৯ দ্রষ্টব্য)। ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী যদি জৌনপুরে বসে বই লিখে তাতে জৌনপুরের শাসনকর্তা বারবক শাহের প্রশস্তি করে থাকেন, তাহলে প্রশ্ন উঠবে এই জলালুদ্দীন কে? কিন্তু তিনি বাংলায় বসে বই লিখেছেন ও বাংলার বারবক শাহের প্রশস্তি করেছেন ধরলে এই প্রশ্নের উত্তর সহজেই পাওয়া যায়। সে ক্ষেত্রে অনায়াসেই বলা চলে যে ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী যে "জলালুদ্দীন"-এর প্রশস্তি করেছেন তিনি বারবক শাহের ভাই এবং তাঁর পরের পরের সুলতান জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহ।

(৫) বাংলার সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক শাহ ছিলেন বিদ্যা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক, কিন্তু জৌনপুরের বারবক শাহ তা ছিলেন বলে' কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং শব্দকোষ-রচয়িতা পণ্ডিতপ্রবর ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকীর পক্ষে বাংলার বারবক শাহের কাছে পৃষ্ঠপোষণ লাভ করাই স্বাভাবিক।

এই সমস্ত প্রমাণ থেকে অনায়াসেই বলা চলে যে ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী "বারবক শাহ" বলতে বাংলার সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক শাহকেই বুঝিয়েছেন।

পৃঃ ২৮৫ ছঃ ২৩-২৫—জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক নিয়ামতুল্লাহ্ তাঁর 'মখজান-ই-আফগানী' গ্রন্থে সিকন্দর শাহ ও আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সংঘর্ষ সম্বন্ধে লিখেছেন, "From this place he (Sikandar Shah)

started on the campaign against sultan 'Alāuddin, king of Bengal. As Sikandar reached Tughluqpur lying within the Bihar Territory, Sultan 'Alāuddin detached his son in order to reconnoitre. Sultan Sikandar deputed Mahmud Khan Lodi and Mubarak Khan Nuhani to oppose him. The two forces confronted each other at Barh when both the parties made overtures for peace. It was stipulated that the two monarchs would not make war upon each other nor harbour rebels. (N. B. Roy, Niamatullah's History of the Afghans, 1958, pp. 77-78)

পৃঃ ২৯৩ ছঃ ১৮—হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকনের যে মতের কথা আমরা এখানে উল্লেখ করেছি, তা তাঁর লেখা 'আসাম বুরঞ্জি'-তে লিপিবদ্ধ আছে। ঐ বই ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। একজন অসমীয়া পণ্ডিত কর্তৃক বাংলা ভাষায় লেখা আসামের ইতিহাস-গ্রন্থ হিসাবে এর একটা বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু এই বইয়ের ঐতিহাসিক মূল্য খুবই অকিঞ্চিৎকর। এর মধ্যে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলার সুলতানদের আসাম-অভিযান সম্বন্ধে যা লেখা আছে, তা নীচে উদ্ধৃত হল (অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'আসাম বুরঞ্জি' পৃঃ ১০-১১ দ্রষ্টব্য।)

"গৌড়দেশের বাদশাহ হুসেন শাহার জামাতা নওয়াব দুলালগাজী নামক একজন কোন কারণ নিমিত্ত মক্কা যাওয়া আবশ্যক হওয়াতে, তিনি মক্কা না গিয়া কামরূপে আসিয়া কামরূপ অধিকার করিয়া এইখানেই ওয়াক্কা হন। তাঁহার কবর গুয়াহাটীতে লৌহিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর পারে আছে।

"পরে তৎপুত্র মসন্দর গাজী এই দেশের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানী অশ্বক্রান্তের উত্তরে ছিল।

"পরে তাঁহার মরণান্তে সুলতান গয়াসুদ্দিন গৌড় হইতে আসিয়া এতদ্দেশ আক্রমণ করিয়া শাসন করিয়াছিলেন। আরো তিনি হিন্দুর অনেক দেবালয় নষ্ট করিয়া লৌহিত্যের উত্তর গরুড়াচল পর্ব্বতে মৃত্যু প্রাপ্ত হন। তাঁহার যে কবর আছে তাহাকে পাওমক্কা কহে।"

উদ্ধৃত অংশটিতে দুলাল গাজী "মক্কা যাওয়া আবশ্যক হওয়াতে" মক্কায়

না গিয়ে তার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে কামরূপে কেন গেলেন, তার কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। এই অংশটিতে যে "সুলতান গয়াসুদ্দন"-এর কথা বলা হয়েছে, তিনি নিশ্চয়ই হোসেন শাহের পুত্র গিয়াসুদ্দীন মাহ্মুদ শাহ। কিন্তু ঐ সুলতান সম্বন্ধে এতে যা লেখা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ অলীক। কারণ শের শাহ গিয়াসুদ্দীন মাহ্মুদ শাহের রাজ্য কেড়ে নেবার পর গিয়াসুদ্দীন বাংলার পূর্বদিকে অবস্থিত কামরূপে যান নি, পশ্চিমদিকে বিহার অঞ্চলে গিয়েছিলেন, সেখানে শোন ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে হুমায়ূনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় এবং তার অল্প বাদেই তিনি পরলোকগমন করেন; একথা প্রামাণিক ইতিহাস-গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়। অতএব তাঁর "গৌড় হইতে আসিয়া" কামরূপ শাসন করে সেখানে মৃত্যু বরণ করার কথা সম্পূর্ণ অমূলক। 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে'র মতে গিয়াসুদ্দীন মাহ্মুদ শাহ ভাগলপুরের নিকটবর্তী কহলগাঁওতে পরলোকগমন করেছিলেন।

পৃঃ ২৯৮ ছঃ ১৩-১৫—সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় লেখা প্রায় সমস্ত চৈতন্য-চরিতগ্রন্থ থেকে জানা যায় যে প্রতাপরুদ্র চৈতন্যদেবের পরম ভক্ত ছিলেন। এসম্বন্ধে ডঃ এন. কে. সাহু একটি অভূতপূর্ব মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন, "It may be pointed out that nowhere in any of his inscriptions, which are so numerous and in any of his literary works Prataprudra speaks of Sri Chaitanya as his Guru, and that contemporary literature, either Sanskrit, Oriya, or Bengali, has not declared Sri Chaitanya a royal preceptor. On the other hand we know definitely that Kavidindima Jivadevacharya the court poet, was the royal Guru." (A History of Orissa, ed. by N. K. Sahu, Vol II, p. 387)

এই উক্তি সত্যই বিস্ময়কর। কেউ কোনদিনই বলেনি যে চৈতন্যদেব প্রতাপরুদ্রের গুরু ছিলেন; সুতরাং তা খণ্ডন করার কোন প্রয়োজন ছিল না। নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবদের মতে চৈতন্যদেব কখনও কারও দীক্ষাদাতা গুরু হননি। চৈতন্যচরিতগ্রন্থগুলির মতে প্রতাপরুদ্র চৈতন্যদেবের ভক্ত ছিলেন, তাকে অবিশ্বাস করার কোন কারণই নেই। জীবদেবাচার্য কবিডিণ্ডিম যে

প্রতাপরুদ্রের গুরু ছিলেন, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু স্বয়ং জীবদেবাচার্য কবিডিণ্ডিমের লেখা "ভক্তিভাগবতম্"-এর ২৮ নং শ্লোক (বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ৩০৭ দ্রষ্টব্য) থেকেই জানা যায় যে প্রতাপরুদ্র চৈতন্যদেবের ভক্ত ছিলেন।

পৃঃ ৩৫৬ ছঃ ১৩-পৃঃ ৩৫৭ ছঃ ১—পরাগল খান ও ছুটি খানের পদমর্যাদা কী ছিল, সে সম্বন্ধে ডঃ আবদুল করিম সম্প্রতি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তিনি লিখেছেন, "আধুনিক পণ্ডিতেরা পরাগল খান ও ছুটি খানকে হোসাইন শাহী আমলে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা (বা গভর্ণর) মনে করেন। কিন্তু লক্ষণীয় যে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী তাঁদের নামের সঙ্গে শুধু 'লস্কর' শব্দ (বা উপাধি) ব্যবহার করেছেন। লস্কর শব্দের অর্থ সৈন্য।......সুতরাং শুধু আক্ষরিক অর্থ মেনে নিলে বলতে হয় পরাগল খান ও ছুটী খান দুজনেই সামান্য সৈনিক ছিলেন ......বলা যেতে পারে যে ছন্দের মিল রাখার জন্য কবি 'সর-ই-লস্কর'-এর প্রথম অংশ (সর) বাদ দিয়েছেন এবং দ্বিতীয় অংশই (লস্কর) শুধু উল্লেখ করেছেন। এই অনুমান সত্য হলেও বলতে হবে পরাগল খান ও ছুটী খান সর-ই-লস্কর (সেনাপতি) ছিলেন। সমসাময়িক শিলালিপিতে উজীর, জিলা (আরছা বা ইক্লীম) কর্তৃপক্ষ এবং থানাদার সবাই সর-ই-লস্কর হিসাবে উল্লেখিত হয়েছে। সুতরাং শুধু সর-ই লস্কর শব্দে তাদের (পরাগল খান ও ছুটী খানের) প্রকৃত পদমর্যাদা নিরূপণ করা সম্ভব নয়। ছুটী খানী মহাভারতের উদ্ধৃত অংশে মনে হয় 'চাটিগ্রাম নগরের নিকট উত্তরে' 'চন্দ্রশেখর পর্বত-কন্দরে' 'ফণী নদী বেষ্টিত স্থানে' পরাগল খান ও ছুটী খানের আবাসস্থান ছিল। 'লস্করী বিষয়' থেকে মনে হয় তাঁরা সৈন্য পরিচালনা সংক্রান্ত কোন কাজের ভার পান।...মনে হয়, ঐস্থানে সৈন্যদের একটি থানা স্থাপন করা হয়েছিল এবং পরাগল খান ও ছুটী খানকে ঐ থানারই অধিপতি নিযুক্ত করা হয়েছিল।" (সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা সংখ্যা, ১৩৭১, পৃঃ ১৬৩-১৬৬)

কিন্তু ডক্টর করিমের এই মত সমর্থন করা যায় না। কারণ, ডক্টর করিম আরবী 'লস্কর' শব্দের মূল অর্থ বিশ্লেষণ করে তার উপরে তাঁর অভিমতকে দাঁড় করিয়েছেন; কিন্তু ঐ সময়ে বাংলা ভাষায় 'লস্কর' শব্দ কী অর্থে ব্যবহৃত হত, তা বিচার করে দেখার তিনি প্রয়োজন বোধ করেন নি। বৃন্দাবনদাসের

'চৈতন্যভাগবত' ও ত্রিপুরার 'রাজমালা'র সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ঐ সময়ে বাংলায় 'লস্কর' শব্দ সামরিক শাসনকর্তা অর্থে ব্যবহৃত হত (বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ৩৫৬ ও পৃঃ ৩৭৫-'৬ দ্রষ্টব্য।) কবীন্দ্র পরমেশ্বর যে 'লস্কর' শব্দ সেনাপতি অর্থে ব্যবহার করেন নি—তার প্রমাণ হচ্ছে, পরাগল খান সম্বন্ধে তিনি তাঁর মহাভারতে লিখেছেন যে পরাগল খান প্রথমে হোসেন শাহের সেনাপতি ছিলেন এবং পরে লস্কর হন।

নৃপতি হুসেন শাহ গৌড়ের ঈশ্বর।
তান এক সেনাপতি হওন্ত লস্কর ॥
লস্কর পরাগল খান মহামতি।

পরাগল খান ও ছুটি খান সম্বন্ধে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী যা লিখেছেন, তা অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। এই দুই কবির সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, পরাগল খান হোসেন শাহ কর্তৃক চট্টগ্রামের সামরিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং বহুকাল এই অঞ্চল শাসন করেছিলেন; ছুটি খানও বাংলার সুলতানের কাছে "লস্করী বিষয়" পেয়েছিলেন অর্থাৎ কোন একটি অঞ্চলের (চট্টগ্রামের নয়, কারণ পরাগল খান তখনও জীবিত ও কর্মরত) সামরিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি সম্ভবত ত্রিপুরার অধিকৃত অঞ্চলের শাসনভার পেয়েছিলেন।

ডঃ আবদুল করিম বাংলা সাহিত্যে উল্লিখিত 'লস্কর' শব্দকে 'সর-ই লস্কর'-এর অপভ্রংশ বলে মনে করেছেন, কিন্তু আমাদের মনে হয় এক্ষেত্রে 'লস্কর'-'লস্কর-ওয়াজীর' (লস্কর উজীর) শব্দের অপভ্রংশ। সমসাময়িক শিলালিপিতে ও বাবরের আত্মকাহিনীতে বাংলার সুলতানের অধীন বিশিষ্ট রাজকর্মচারীদের মধ্যে কারও কারও নামের সঙ্গে 'লস্কর-ওয়াজীর' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, এর অর্থ 'সামরিক শাসনকর্তা' বলেই পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য থেকে মনে হয়।

পৃঃ ৩১৭ ছঃ ৪—অধ্যাপক আহমদ শরীফের মতে দৌলত-উজীর বাহ্‌রাম খান ১৫৪৫ থেকে ১৫৫৩ খ্রীঃর মধ্যে 'লায়লী-মজনু' কাব্য রচনা করেন (ঢাকার বাঙলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত 'লায়লী-মজনু'র ভূমিকা, পৃঃ ১২-২১ দ্রষ্টব্য)। বাহ্‌রাম খান 'লায়লা মজনু'তে লিখেছেন "চাটিগ্রাম-অধিপতি" "নৃপতি নেজাম শাহা সুর" তাঁর পিতাকে ও তাঁকে "দৌলত-

উজীর" খেতাব দেন। অধ্যাপক আহমদ শরীফের মতে এই "নেজাম শাহা সুর" শের শাহ সুরের ভ্রাতা নিজাম খান।

কিন্তু শের শাহের ভাই নিজাম খান যে কোনদিন "চাটিগ্রাম-অধিপতি" হয়েছিলেন, এ' কথা কোন সূত্র থেকে জানা যায় না। আরও একটি কারণে অধ্যাপক আহমদ শরীফের মত সমর্থন করা চলে না। 'লায়লী-মজনু'তে বাহ্‌রাম খান লিখেছেন যে তাঁর পূর্বপুরুষ হামিদ খান গৌড়ের নরপতি হোসেন শাহের "প্রধান উজীর" ছিলেন; এরপর কবি লিখেছেন,

অনুক্রমে বংশ কথ গঞ্জিলেন্ত এই মত গৌড়ের অধীন (পাঠান্তর—অদিন) হইল দূর।

চাটিগ্রাম অধিপতি হইলেন্ত মহামতি নৃপতি নেজাম শাহা সুর॥

১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন শাহ পরলোকগমন করেন। তার ২৬ থেকে ৩৭ বছর পরে কাব্য রচনা করলে বাহ্‌রাম খান এই উক্তি করতেন না। তাঁর এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, হোসেন শাহের মৃত্যুর পর চট্টগ্রামে বহু রাজবংশ রাজত্ব করে যাওয়ার পরে নিজাম শাহ সেখানে রাজা হন। সুতরাং ১৫১৯ খ্রীঃর অন্তত ১০০ বছর পরে বাহ্‌রাম খান কাব্য রচনা করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বাহ্‌রাম খান যে ঔরংজেবের রাজত্বকালে (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রীঃ) 'লায়লী-মজনু' রচনা করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ 'লায়লী মজনু'র উপক্রমে "আওরঙ্গ শাহা দিল্লীশ্বর"-এর প্রশস্তি আছে এবং এই প্রশস্তিকে প্রক্ষিপ্ত বলবার কোন কারণ নেই। বাহ্‌রাম খান যে ঔরংজেবের সমসাময়িক, তার অন্য প্রমাণও আছে। চট্টগ্রাম-নিবাসী কবি মোহাম্মদ খানের লেখা 'মক্তুল হোসেন' (রচনাকাল ১০৫৬ হিজরা বা ১৬৪৬ খ্রীঃ) কাব্যে এক পীর সদর জাঁহার উল্লেখ পাওয়া যায়, যাঁকে বারো ভুঁইয়ার অন্যতম ঈশা খাঁ সংবর্ধনা করেছিলেন (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬, পৃঃ ১০০ দ্রঃ)। ঈশা খাঁ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে স্বাধীন রাজা হন এবং ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পরলোকগমন করেন (Histroy of Bengal, D. U., Vol. II, p. 238 দ্রঃ)। [ঐ সদর জাঁহার প্রকৃত নাম শাহ আবদুল ওহাব (সা. প. প., ১৩৫৪, পৃঃ ২৭-২৮ দ্রঃ)] এদিকে চট্টগ্রামবাসী বাহ্‌রাম খানও 'লায়লী-মজনুতে লিখেছেন যে তাঁর

পীর আছাউদ্দীনের প্রপিতামহের নাম সদর জাঁহা ("ছদরজাহান")। সদর জাঁহা ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে জীবিত থাকলে তাঁর প্রপৌত্রের শিষ্য বাহ্‌রাম খান খুব স্বাভাবিকভাবেই ১৬৫৮ থেকে ১৭০৭ খ্রীঃর মধ্যে জীবিত থাকবেন।

বাহ্‌রাম খানের পৃষ্ঠপোষক "নেজাম শাহা" বা নিজাম শাহ্ কোন মুসলমান নৃপতি নন, তিনি আসলে আরাকানের রাজা। তার প্রমাণ, বাহ্‌রাম খান নিজাম শাহ্‌কে "ধবল অরুণ গজেশ্বর" বলেছেন। আলোচ্য সময়ের আরাকানের রাজাদের যে এই জাতীয় উপাধি ছিল (উপাধিগুলিকে বিভিন্ন কবি ও অনুবাদক বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় "ধবল অরুণ গজেশ্বর", "ধবল গজেশ্বর"; "শ্বেত রক্ত মাতঙ্গ ঈশ্বর" "Lord of the Red Elephant, Lord of the White Elephant"; "Elder brother of the sun, Lord of the golden House and White Elephant" প্রভৃতি রূপে লিপিবদ্ধ করেছেন),—তা আরাকানের রাজাদের মুদ্রা থেকে, দৌলৎ কাজীর 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী', আলাওলের 'পদ্মাবতী,' মোহাম্মদ খানের 'মক্তুল হোসেন' প্রভৃতি কাব্য থেকে এবং শিহাবুদ্দীন তালিশের লেখা মোগল বাহিনীর চট্টগ্রাম-বিজয় সংক্রান্ত বিবরণ থেকে জানা যায় (J. A. S. B., 1846, pp. 234-235; প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৬৮, পৃঃ ৬০৬-৬০৮, বা. সা. ই. ১।২, পৃঃ ৫৯৮ এবং Studies in Mughal India by Jadunath Sarkar, p. 119 দ্রষ্টব্য)।

সুতরাং "নেজাম শাহা" আরাকানেরই রাজা। আরাকানের রাজার মুসলমানী নাম থাকা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সুলতানের সাহায্যে মেং-সোআ-মৃউন্ রাজ্য ফিরে পাবার (বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ১৫৬ দ্রঃ) পর থেকে আরাকানের রাজারা নিজেদের আসল নামের সঙ্গে সঙ্গে একটি করে মুসলমানী নামও নিতেন; এঁদের মধ্যে অনেকে নিজেদের মুদ্রায় মুসলমানী নাম উল্লেখ করেছেন, সকলে অবশ্য করেন নি। বাহরাম খান যখন 'লায়লী-মজনু' রচনা করেন, তখন ঔরংজেব জীবিত ছিলেন, সম্ভবত "নেজাম শাহা"ও জীবিত ছিলেন, দুজনেই যদি এই সময়ে জীবিত থাকেন, তাহলে বলতে হবে এই "নেজাম শাহা" আরাকানরাজ শ্রীচন্দ্রসুধর্মা (রাজত্বকাল ১৬৫২-১৬৮২ খ্রীঃ) কারণ তিনিই ঔরংজেবের সমসাময়িক একমাত্র আরাকানরাজ, যিনি "চাটিগ্রাম-অধিপতি" ছিলেন।

'বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর'-এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হবার কিছুদিন পরে অধ্যাপক আহমদ শরীফ 'কবি দৌলতউজির ও কবি মুহম্মদ খান সম্বন্ধে নতুন তথ্য' নামে একটি প্রবন্ধ লিখে সেটি 'সাহিত্য পত্রিকা'য় (১৩৬৯, শীত সংখ্যা, পৃঃ ২০৬-২১৩) প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধের 'ক' অংশে তিনি দৌলত উজীর বাহ্‌রাম খানের কাব্যরচনাকাল সম্বন্ধে তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে আমাদের সিদ্ধান্তই মেনে নেন। কিন্তু 'খ' অংশে আবার নতুন একটি বিষয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে এ সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ রেখে দেন। এই নতুন বিষয়টি সংক্ষেপে এই—'বহারিস্তান গায়বী' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে আরাকান অভিযানের সময় জাহাঙ্গীরের সেনাপতি কাশিম খানের বাহিনী চট্টগ্রামের কাছে নিজামপুর নামে একটি গ্রামে বিশ্রাম গ্রহণ করে, এই নিজামপুর থেকে ছ' শো' টাকা রাজস্ব সংগৃহীত হত। অধ্যাপক আহমদ শরীফ বলেন, "নিজামপুর একটি পরগণা এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, ষোল শতকে কোনো এক ধনী ও মানী নিযাম চট্টগ্রামে ছিলেন—যাঁর নামে ছয়শ' টাকা রাজস্বের একটি পরগণার সৃষ্টি হয়েছিল। বাহ্‌রাম যদি আলোচ্য নিযামের দৌলতউজির হন, তা হলে কবির আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত বহাল থাকে।" এর পর অধ্যাপক আহমদ শরীফ ১৩৭২ বঙ্গাব্দের বর্ষা সংখ্যা 'সাহিত্য পত্রিকা'য় (পৃঃ ২২১) নিজামপুর-প্রসঙ্গের পুনরবতারণা করে লিখেছেন, "দৌলত উজির বাহরাম খানের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অপরিবর্তিতই রয়েছে।"

অধ্যাপক আহমদ শরীফের মত প্রাজ্ঞ গবেষক যেভাবে তুচ্ছ "নিজামপুর"-এর উপর নির্ভর করে তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্ত বজায় রাখবার চেষ্টা করেছেন, তা মজ্জমান ব্যক্তির তৃণখণ্ড অবলম্বন করে বাঁচার চেষ্টাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই "নিজামপুর"-এর নামকরণ যাঁর নামে হয়েছে, সেই নিজাম একজন "ধনী ও মানী" ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর একজন "দৌলত-উজীর" (ধনাধ্যক্ষ) রাখার ক্ষমতা ছিল এবং তিনি ষোড়শ শতাব্দীর লোক ছিলেন—ইত্যাদি বিষয় অনুমান করার সপক্ষে অধ্যাপক শরীফ কোন যুক্তি দেখান নি। ঐ "নিজাম" ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ—যে কোন শতাব্দীর লোক হতে পারেন, কারণ উক্ত নিজামপুর গ্রামের ইতিহাস যে কত দিনের, তা জানা যাচ্ছে না; আর ঐ "নিজাম" একজন "ধনী ও মানী" ব্যক্তি না হয়ে ফকীর বা দরবেশও

হতে পারেন। ইনি চতুর্দশ শতাব্দীর বিখ্যাত দরবেশ নিজামুদ্দীন আউলিয়ার সঙ্গেও অভিন্ন হতে পারেন। নিজামুদ্দীন আউলিয়ার শিষ্য ও ভক্ত সারা ভারতেই অসংখ্য ছিল (Glimpses of Medieval Indian Culture, by Yusuf Husain, pp. 41-42 দ্রষ্টব্য), সুতরাং তাঁদের মধ্যে কেউ তাঁর নাম অনুসারে আলোচ্য "নিজামপুর" গ্রামের নামকরণ করে থাকতে পারেন। মোটের উপর, "নিজামপুর" গ্রাম অধ্যাপক আহমদ শরীফের পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিপোষণে কোন সাহায্য করে বলে মনে হয় না।

অধ্যাপক আহমদ শরীফের আর একটি যুক্তি এই যে,—১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম জয় করে তার নাম ঔরঙ্গজেবের নির্দেশ অনুসারে ইসলামাবাদ রেখেছিলেন; কিন্তু দৌলত-উজীর বাহ্‌রাম খান 'লায়লী-মজনু'তে চট্টগ্রামকে "ফতেয়াবাদ" নামে অভিহিত করেছেন; অতএব 'লায়লী-মজনু' ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের আগে রচিত। কিন্তু বাহ্‌রাম খান কি সত্যই তাঁর সমসাময়িক চট্টগ্রামকে "ফতেয়াবাদ" বলেছেন? তিনি তাঁর পূর্বপুরুষ হামিদ খানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করার সময় বলেছেন যে হোসেন শাহ্ তাঁকে "চাটিগ্রাম"-এর অধিকারী করেছিলেন এবং এই "চাটিগ্রাম"-এর নামান্তর ছিল "ফতেয়াবাদ"—

নগর ফতেয়াবাদ দেখিয়া পুরএ সাধ
চাটিগ্রাম সুনাম প্রকাশ।

হোসেন শাহের রাজত্ব অবসানের প্রায় দেড়শো বছর পরে চট্টগ্রামের "ইসলামাবাদ" নামকরণ হয়েছিল। তার কথা বাহ্‌রাম খান এখানে বলতে যাবেন কেন? প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ঔরঙ্গজেবের দেওয়া চট্টগ্রামের এই নতুন নাম মোটেই চলে নি, মথুরার নামও ঔরঙ্গজেব "ইসলামাবাদ" রেখেছিলেন, সে নামও চলেনি।

যা হোক, দৌলত-উজীর বাহ্‌রাম খান যে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালেই (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রীঃ) 'লায়লী-মজনু' রচনা করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পৃঃ ৩৬৯ ছঃ ২৭-২৮—শ্রীযুক্ত গোবর্ধন দাস বাবাজী তাঁর 'শ্রীশ্রীব্রজধাম ও গোস্বামিগণ' বইয়ে (২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৯) রূপ-সনাতনের সমসাময়িক বলে কথিত এবং সনাতনের নাম সংবলিত দুটি দলিলের উল্লেখ করেছেন। তিনি

লিখেছেন, "পিরোজপুরের নিষ্কর মালিকদার মিঞা সাহেবের আরবি ভাষায় লিখিত দলিলের শিরোদেশে পাতশাহের স্বর্ণমসীদ্বারা দেবাক্ষরে এইরূপ লিখিত আছে—শ্রীল শ্রীযুক্ত গোব্রাহ্মণ প্রতিপালক সনাতন দবিরখাস। কিন্তু কদম-রোশুল নামক দরগার নিষ্কর ভূমির দলিলে কেবল—'শ্রীসনাতন দবিরখাস' লিখিত আছে।" শ্রীযুক্ত গোবর্ধন দাস বাবাজী আরও লিখেছেন যে উল্লিখিত দু'টি দলিলের মধ্যে প্রথমটি রূপের এবং দ্বিতীয়টি সনাতনের স্বহস্তে লেখা বলে তিনি শুনেছেন। কিন্তু তিনি এই দুটি দলিলের বিস্তৃত বিবরণ দেন নি অথবা এদের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে কোন প্রমাণের উল্লেখ করেন নি। এতদিন বাদে রূপ-সনাতনের আমলের দলিল আবিষ্কৃত হওয়া যেমন সন্দেহজনক, তেমনি মুসলমানের কাছে প্রাপ্ত আরবী ভাষায় লেখা দলিলে সনাতনের "গোব্রাহ্মণ প্রতিপালক" উপাধির উল্লেখ থাকাও সন্দেহজনক। তা ছাড়া সনাতন যখন হোসেন শাহের "দবিরখাস" ছিলেন, তখন তাঁর "সনাতন" নামই ছিল না; তিনি রাজপদ ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হবার পর চৈতন্যদেব তাঁকে সনাতন নাম দেন। সুতরাং আলোচ্য দলিল দু'টি যে জাল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পৃঃ ৩৭৭ ছঃ ১৬-পৃঃ ৩৭৮ ছঃ ১৩—এখানে আমরা লিখেছি যে 'কবিরঞ্জন'-এর "প্রকৃত নাম দৈবকীনন্দন সিংহ। এর তিনটি উপাধি—কবিরঞ্জন, কবিশেখর ও বিদ্যাপতি। এই তিন ভণিতাতেই তিনি পদ রচনা করতেন।" কিন্তু এ সম্বন্ধে সমস্ত গবেষক একমত নন। কারও কারও মতে 'গোপালবিজয়' কাব্যের রচয়িতা 'কবিশেখর' উপাধিধারী দৈবকীনন্দন সিংহ এবং পদকর্তা কবিশেখর পৃথক লোক। সেই রকম, অনেক গবেষকের মতে কবিশেখর ও কবিরঞ্জন ভিন্ন লোক, সুতরাং এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা দরকার বলে মনে করছি।

প্রথমে, দৈবকীনন্দন সিংহ যে পদকর্তা কবিশেখরের সঙ্গে অভিন্ন, তার প্রমাণ উল্লেখ করছি (এসম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনার জন্য 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম', পৃঃ ১৭০-১৭২ দ্রষ্টব্য)।

(১) পদকর্তা কবিশেখর 'শেখর' ও 'রায়শেখর' ভণিতাতেও পদ লিখতেন; 'গোপালবিজয়ে'ও 'কবিশেখর' ভণিতার সঙ্গে দু'এক জায়গায় 'শেখর' ও 'রায়শেখর' ভণিতা পাওয়া যায়।

(২) 'গোপালবিজয়ে'র ভণিতার সঙ্গে পদকর্তা কবিশেখরের রচনা 'দণ্ডাত্মিকা পদাবলী'র ভণিতার হুবহু মিল দেখা যায়। কবিশেখরের কোন কোন পদের অংশবিশেষের সঙ্গে 'গোপালবিজয়ে'র কোন কোন অংশের ভাষায় ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে।

(৩) রামগোপালদাস ও রসিকদাসের শাখানির্ণয়ে মাত্র একজন কবিশেখরেরই নাম আছে, তিনি রঘুনন্দনের শিষ্য পদকর্তা কবিশেখর। কিন্তু রামগোপালদাসের 'রসকল্পবল্লী'তে কবিশেখরের 'গোপালবিজয়' কাব্য থেকে কতকাংশ উদ্ধৃত হয়েছে। রামগোপালদাস পদকর্তা কবিশেখর ও 'গোপাল-বিজয়'-রচয়িতা কবিশেখরকে পৃথক লোক বলে জানলে 'শাখানির্ণয়ে' 'গোপালবিজয়'-রচয়িতার নাম স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হত বলে বোধ হয়। তা না হওয়াতে মনে হয়, উভয় কবিশেখর অভিন্ন।

(৪) দুই কবিশেখরের সময়ও এক।

কবিশেখর ও কবিরঞ্জন যে অভিন্ন লোক, তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থেকে প্রমাণিত হয়।

(১) কবিশেখর ও কবিরঞ্জন উভয়েই রঘুনন্দনের শিষ্য এবং উভয়ের পদের রচনারীতি এক।

(২) রামগোপাল দাস কবিরঞ্জন সম্বন্ধে লিখেছেন, "ছোট বিদ্যাপতি বলি যাহার খেয়াতি"। এর থেকে মনে হয়, কবিরঞ্জনের 'বিদ্যাপতি' উপাধি ছিল। চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির মিলন-বর্ণনামূলক কয়েকটি পদ থেকেও বোঝা যায়, এই কবিরঞ্জন 'বিদ্যাপতি' নামে অভিহিত হতেন (সা. প. প., ১৩৩৭, পৃঃ ৪০-৪৭ দ্রষ্টব্য)। কবিশেখরেরও 'বিদ্যাপতি' উপাধি ছিল। কারণ লোচন তাঁর 'রাগতরঙ্গিণী'তে কবিশেখর-ভণিতাযুক্ত একটি পদ উদ্ধৃত করে তার নীচে লিখেছেন, "ইতি বিদ্যাপতেঃ"। ডঃ শহীদুল্লাহ্ দেখিয়েছেন একই বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত পরস্পরের পরিপূরক দুটি পদের একটিতে 'কবিশেখর' ভণিতা এবং অপরটিতে 'বিদ্যাপতি' ভণিতা পাওয়া যায় ('বিদ্যাপতি-শতক'-এর ভূমিকা, পৃঃ ।৵০ দ্রষ্টব্য)।

(৩) রামগোপালদাস লিখেছেন যে কবিরঞ্জন 'রাজসেবী' ছিলেন। কবিশেখরও 'রাজসেবী' ছিলেন, কারণ তাঁর ভণিতা-সংবলিত পদে নসরৎ

শাহের নাম আছে। 'বিদ্যাপতি'-ভণিতাযুক্ত কয়েকটি পদেও হোসেন শাহ ও 'নসীরা শাহ' অর্থাৎ নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের নাম আছে।

(৪) উপরে 'রাগতরঙ্গিণী'তে সঙ্কলিত 'কবিশেখর' ভণিতাযুক্ত যে পদটির আমরা উল্লেখ করেছি, বিভিন্ন গ্রন্থে ও পুঁথিতে তার বিভিন্ন পাঠ পাওয়া যায়। কোন পাঠে 'কবিশেখর', কোন পাঠে 'কবিরঞ্জন', আবার কোন পাঠে 'বিদ্যাপতি' ভণিতা পাওয়া যায়। নীচে পদটির কয়েকটি পাঠ উদ্ধৃত করলাম।

(ক) 'রাগতরঙ্গিণী'তে (মুদ্রিত গ্রন্থ, পৃঃ ৪৪-৪৫) এই পাঠ পাওয়া যায় (খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত 'বিদ্যাপতি'র ৯৩২ সংখ্যক পদেও এই পাঠ গৃহীত হয়েছে),

আনন লোচুঅ বচনে বোলএ হঁসি।
অমিঅ বরিস জনি সরদ পুণিমা সসি॥
অপরুব রূপ রমনিআঁ।
জাইতে দেখলি গজরাজ গমনিআঁ॥
কাজলে রঞ্জিত ধবল নয়ন বর।
ভমর মিলল জনি অরুন কমল দল॥
ভান ভেল মেহি মাঝ খীনি ধনি।
কুচ সিরিফল ভরে ভাঁগি জাতি জনি॥
কবিশেখর ভন অপরুব রূপ দেখি।
রাএ নসরদ শাহ ভজলি কমলমুখি॥

(খ) সুধীরচন্দ্র রায় ও অপর্ণা দেবী সম্পাদিত 'কীর্তন-পদাবলী'তে (পৃঃ ১৫৯) এই পাঠ পাওয়া যায়,

নমুয়া-বদনি ধনি বচন কহসি হসি।
অমিয়া বরিখে জনু শরদ পূনিম শশী॥
অপরূপ রূপ রমণি-মণি।
যাইতে পেখলুঁ গজরাজগমনি ধনি॥
সিংহ জিনি মাঝা খিনি তনু অতি কমলিনি।
কুচ ছিরিফল ভরে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জানি॥
কাজরে রঞ্জিত বনি ধবল নয়নবর।

ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমল পর ॥
কবিরঞ্জন ভণে অশেষ অনুমানি।
রাএ নসরৎ শাহ্ ভুলল কমলা বাণী ॥

(গ) 'পদকল্পতরু'তে (পদসংখ্যা ১৯৭) পদটির এই পাঠ পাওয়া যায়,

নমুডা বদনি ধনি বচন কহসি হসি।
অমিয়া বরিখে জনু শরদ পুনিম শশী ॥
অপরূপ রূপ রমণি-মণি।
যাইতে পেখলু গজরাজগমনি ধনি ॥
সিংহ জিনি মাঝা খিনি তনু অতি কমলিনি।
কুচ-ছিরিফল ভরে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জানি ॥
কাজরে রঞ্জিত বনি ধবল নয়নবর।
ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমল পর ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি সো বর-নাগর।
রাই-রূপ হেরি গর-গর অন্তর ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৫৩ নং পুথিতে পদটির আর একটি পাঠ পাওয়া গিয়েছিল। এই পাঠ এপর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি, তবে ডঃ শহীদুল্লাহ্ এর ভণিতাটি প্রকাশ করেছেন (সা. প. প. ১৩৬০, পৃঃ ৫০, পাদটীকা দ্রঃ)। সেটি এই,

বিদ্যাপতি ভানি
অশেষ অনুমানি
সুলতান শাহ নসীর মধুপ ভুলে কমল বাণী ॥

একই পদের বিভিন্ন পাঠে 'কবিশেখর', 'কবিরঞ্জন' ও 'বিদ্যাপতি' ভণিতা পাওয়া যাওয়াতে প্রমাণ হচ্ছে যে এই তিনটি নাম একই লোকের। এই 'বিদ্যাপতি' মৈথিল হতে পারেন না, কারণ শেষ তিনটি পাঠে বাংলা ভাষার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, অনেক গবেষক একটি পদের বিভিন্ন পাঠ পেলে সব সময়েই মনে করেন যে গায়েন ও লিপিকরদের হস্তক্ষেপের ফলে এই পাঠের বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে; কিন্তু কবি নিজেও যে বিভিন্ন সময়ে একই পদকে বিভিন্ন রূপ দিতে পারেন, তা এঁদের মাথায় ঢোকে না। আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে দেখতে পাই, তিনি তাঁর

অনেক গানের বারবার পরিবর্তন সাধন করে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দিয়েছেন। মধ্যযুগে লেখা ছাপা হত না বলে কবিদের একটী পদের মূল রূপকে সারাজীবন এক-ভাবে রাখবার সুযোগ ও অনুপ্রেরণা এখনকার তুলনায় অনেক কম ছিল। উপস্থিত ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কবিশেখর বা কবিরঞ্জন বা বাঙালী বিদ্যাপতি একটি পদকেই নানা সময় নানা রূপ দিয়েছেন এবং এক একবার তাঁর এক একটি উপাধিকে ভণিতায় বসিয়ে দিয়েছেন। তিনি যে সুলতানের পৃষ্ঠপোষণ পেয়েছিলেন, তাঁকে তিনি দুটি পাঠে "রাএ নসরৎ (নসরদ) শাহ" বলেছেন এবং একটি পাঠে "সুলতান শাহ নসীর" বলেছেন। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, এই সুলতান দিল্লী বা আর কোন জায়গার সুলতান নন, ইনি বাংলার সুলতান নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ (১৫১৯-৩২ খ্রীঃ)।

এই বইয়ের ৪৩৫ পৃষ্ঠায় আমরা 'শেখ কবীর' ভণিতা-সংবলিত যে পদটির উল্লেখ করেছি, সেটি আসলে উপরে উক্ত পদটিরই আর একটি পাঠ। অধ্যাপক আহমদ শরীফ সম্পাদিত 'মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য' (পদসংখ্যা ২৪) থেকে ঐ পাঠটি আমরা উদ্ধৃত করলাম,

অকি অপরূপ রূপের রমণী ধনি ধনি
চলিতে পেখল গজ-রাজ-গমনি ধনি ধনি।
কাজলে রঞ্জিত ধনি ধবল নয়ন ভালে
ভোমরা ভুলল বিমল কমল দলে॥
গুমান না কর ধনি ক্ষীণ অতি মাঝাখানি
কুচগিরি ফলের ভরে ভাজি পড়িব যৌবনি॥
সুন্দরী চান্দ মুখে বচন বোলসি হাসি
অমিয়া বরিখে যৈসে শারদ পূর্ণিমা শশী॥
শেখ কবীরে ভণে অহি গুণ পামরে জানে
সুলতান নাসির সাহা ভুলিছে কমলবনে॥

পূর্বোদ্ধৃত পাঠগুলির সঙ্গে এই পাঠের প্রায় সর্বত্রই মিল আছে, এবং চতুর্থ পাঠের ভণিতার সঙ্গে এই পাঠের ভণিতার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। সুতরাং এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, এই পাঠটি স্বতন্ত্র পদ নয় অথবা 'শেখ কবীর' নামে স্বতন্ত্র একজন কবির লেখা নয়। যতদূর মনে হয়, এই পাঠের ভণিতায় প্রথমে 'কবিশেখর' নামই ছিল, পরে 'কবিশেখর' 'কবিরশেখ'-এ পরিবর্তিত

হয়েছে এবং তা আবার পরে 'শেখ কবির (কবীর)'-এ পরিণত হয়েছে।

যাহোক, আমরা যে সমস্ত যুক্তি ও প্রমাণ ইতিপূর্বে দেখিয়েছি, তার থেকে অনায়াসেই বলা যায় যে দৈবকীনন্দন সিংহ, কবিশেখর এবং কবিরঞ্জন একই লোক। ইনি 'শেখর', 'রায়শেখর' ও 'শেখর রায়' ভণিতা-তেও পদ রচনা করতেন, শেষোক্ত দুই ভণিতা থেকে কেউ কেউ মনে করেছেন যে এঁর বংশ-পদবী ছিল 'রায়'। কিন্তু 'রায়' শব্দটি তখন পদবী হিসাবে ব্যবহৃত হত না; বংশমর্যাদার পরিচায়ক হিসাবে বা নিছক সম্মানবাচক বিশেষণ হিসাবে এটি তখনকার দিনে নামের সঙ্গে যুক্ত হত। বৃন্দাবনদাস তাঁর 'চৈতন্যভাগবতে' নিত্যানন্দকে 'নিত্যানন্দ রায়' বলেছেন।

আর একটি কথা। এই 'কবিশেখর'-বিদ্যাপতির একটি পদের ভণিতায় পাই,

সাহ হুসেন অনুমানে।
পঞ্চগৌড়েশ্বর জানে॥
চিরঞ্জীবী হউ পঞ্চ গৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভাণে।

কিন্তু এর পাঠান্তরের ভণিতায় পাই,

সে যে নশিরা শাহ সে জানে
যারে হানল মদন বাণে॥
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চগৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভাণে।

(বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ৩৭৮ ও ৪৩৫ দ্রষ্টব্য।)

'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'র একটি প্রাচীন পুঁথিতে (লিপিকাল ১৬৮৬ শকাব্দ ও ১১৭১ সন অর্থাৎ ১৭৬৪-৬৫ খ্রীঃ) এই পদটির দুই পাঠই পর পর উদ্ধৃত হয়েছে, প্রথম পাঠে 'সাহ হুসেন'-এর এবং দ্বিতীয় পাঠে 'নশিরা সাহ'-র নাম-সংবলিত ভণিতা দেখা যায়। প্রথম পাঠটির আরম্ভ হয়েছে 'ধনি গো আজহু দেখলি বালা' দিয়ে এবং দ্বিতীয় পাঠটির আরম্ভ হয়েছে 'গোধূলি পেখলু বালা' দিয়ে। উভয় পাঠে চরণগুলির ভাষার দিক দিয়ে খুব সামান্য পার্থক্য আছে, কিন্তু দুই পাঠে চরণগুলির বিন্যাসের ক্রম ভিন্ন ধরণের (সাধনা, ১৩০০, পৃঃ ২৬৯-২৭৫ দ্রষ্টব্য)। এর থেকে মনে হয় আসল ব্যাপারটি এই। কবি পদটি হোসেন শাহের রাজত্বকালেই লিখেছিলেন এবং তখন তার ভণিতায় 'সাহ হুসেন অনুমানে' লিখেছিলেন; অতঃপর হোসেন শাহের

পুত্র নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের রাজত্বকালে তিনি পদটির ভাষার ও চরণগুলির বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটান এবং ভণিতা থেকে হোসেন শাহের নাম তুলে দিয়ে তার জায়গায় নতুন রাজার নাম বসিয়ে 'সে যে নশিরা সাহ সে জানে' লেখেন। শ্রীকর নন্দীও তাঁর মহাভারতে ঠিক এই ভাবেই যেখানে রাজা হিসাবে হোসেন শাহের নাম ছিল, সেখানে সুকৌশলে নসরৎ শাহের নাম বসিয়ে দিয়েছিলেন (বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ৩২৮ দ্রষ্টব্য)।

পৃঃ ৩৮২ ছঃ ১৭-১৯—'চৈতন্যভাগবত'-এর বসুমতী সাহিত্য মন্দির সংস্করণে শ্লোকটির এই পাঠ পাওয়া যায়,

দুঃখে সব নগরিয়া থাকে লুকাইয়া।
হিন্দু কাজী সব আরো মারে কদথিয়া॥

এই পাঠের উপর নির্ভর করেই আমরা সিদ্ধান্ত করেছি যে হোসেন শাহের হিন্দু কাজী ছিল। কিন্তু 'চৈতন্যভাগবত'-এর সিদ্ধান্তসরস্বতী-সম্পাদিত সংস্করণে শ্লোকটির এই পাঠ পাওয়া যায়,

দুঃখে সব নগরিয়া থাকে লুকাইয়া।
হিন্দুগণে কাজি সব মারে কদথিয়া॥

এই পাঠে "হিন্দু কাজী"র কোন উল্লেখ নেই।

পৃঃ ৩৯৬ পাদটীকা—কুতুবন (কুৎবন) কৃত মৃগাবতী—সম্পাদক ডঃ শিবগোপাল মিশ্র (হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন, প্রয়াগ থেকে ১৮৮৫ শকাব্দে প্রকাশিত), পৃঃ ৬৮ থেকে সংশ্লিষ্ট অংশটি নীচে উদ্ধৃত করলাম।

সাহ হুসেন আহ বড় রাজা।
ছত্র সিংহাসন উনকো ছাজা॥
পণ্ডিত ঔ বুধিবন্ত সয়ানা।
পঢ়ৈ পুরান অরথ সব জানা॥
ধরম দুদিস্টিল উন্‌হ্ কহঁ ছাজা।
হম সির ছাঁহ জীউ জগ রাজা॥
দান দেয় বহু গনত ন আবৈ।
বলি ঔ করন ন সরবরি পাবৈ॥
রায় জহাঁ লহি গজপ অহহী।
সেবা করহি বার সব চহহী॥

চতুর সুজান ভাষা সব জানৈ
ঐস ন দেখৈ কোয়।
সভা সুনহু সব কান দৈ
ফুনি রে বখানৈ সোয়॥

পৃঃ ৪১১ ছঃ ১৮-২০—বৃন্দাবন দাস লিখেছেন যে রামকেলিতে "ব্রাহ্মণসমাজ" ছিল। এইখানে বসেই করঞ্জগ্রামীণ ব্রাহ্মণ চতুর্ভুজ "বিধু মনু" অর্থাৎ ১৪১৬ শকাব্দে (১৪৯৪ খ্রীঃ) 'হরিচরিত' কাব্য রচনা করেছিলেন। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' কানাই-নাটশালা গ্রামে চৈতন্যদেবের "কৃষ্ণচরিত্রলীলা" দর্শনের উল্লেখ আছে।

পৃঃ ৪২১ ছঃ ৯-১৩—অনেকের ধারণা আছে যে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬ খ্রীঃ) ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম কামান ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এ ধারণা একেবারেই ভুল; চতুর্দশ শতাব্দী থেকেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধে কামান ব্যবহৃত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় (The Delhi Sultanate, Bharatiya Vidya Bhavan. pp. 460-461 দ্রষ্টব্য)। বাংলা দেশেও পাণিপথের প্রথম যুদ্ধের অন্তত নয় বছর আগে থেকে কামান ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। পর্তুগীজ বিবরণগুলিতে লেখা আছে যে, ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ শাসনকর্তার প্রতিনিধি জোআঁ-দে-সিলভেরা যখন চট্টগ্রামের উপকূলের কাছে একটা চালে-বোঝাই নৌকা জোর করে দখল করে নিয়েছিলেন, তখন চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ডাঙা থেকে সিলভেরার জাহাজকে উদ্দেশ করে কামান দেগেছিলেন (Campos, Portugese in Bangal p. 29 দ্রঃ)। বাবরের সমসাময়িক বাংলার সুলতান নসরৎ শাহের গোলন্দাজ-বাহিনীর কামান চালনা দেখে বাবর মুগ্ধ হয়েছিলেন, সুতরাং পাণিপথের প্রথম যুদ্ধের অনেক আগেই যে বাংলা দেশে কামান ব্যবহৃত হতে সুরু হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

হিজরা ও খ্রীষ্টাব্দ

হিজরা	খ্রীষ্টাব্দের কোন্ তারিখে আরম্ভ	হিজরা	খ্রীষ্টাব্দের কোন্ তারিখে আরম্ভ
৭৩৯	২০।৭।১৩৩৮	৭৬৩	৩১।১০।১৩৬১
৭৪০	৯।৭।১৩৩৯	৭৬৪	২১।১০।১৩৬২
৭৪১	২৭।৬।১৩৪০	৭৬৫	১০।১০।১৩৬৩
৭৪২	১৭।৬।১৩৪১	৭৬৬	২৮।৯।১৩৬৪
৭৪৩	৬।৬।১৩৪২	৭৬৭	১৮।৯।১৩৬৫
৭৪৪	২৬।৫।১৩৪৩	৭৬৮	৭।৯।১৩৬৬
৭৪৫	১৫।৫।১৩৪৪	৭৬৯	২৮।৮।১৩৬৭
৭৪৬	৪।৫।১৩৪৫	৭৭০	১৬।৮।১৩৬৮
৭৪৭	২৪।৪।১৩৪৬	৭৭১	৫।৮।১৩৬৯
৭৪৮	১৩।৪।১৩৪৭	৭৭২	২৬।৭।১৩৭০
৭৪৯	১।৪।১৩৪৮	৭৭৩	১৫।৭।১৩৭১
৭৫০	২২।৩।১৩৪৯	৭৭৪	৩।৭।১৩৭২
৭৫১	১১।৩।১৩৫০	৭৭৫	২৩।৬।১৩৭৩
৭৫২	২৮।২।১৩৫১	৭৭৬	১২।৬।১৩৭৪
৭৫৩	১৮।২।১৩৫২	৭৭৭	২।৬।১৩৭৫
৭৫৪	৬।২।১৩৫৩	৭৭৮	২১।৫।১৩৭৬
৭৫৫	২৬।১।১৩৫৪	৭৭৯	১০।৫।১৩৭৭
৭৫৬	১৬।১।১৩৫৫	৭৮০	৩০।৪।১৩৭৮
৭৫৭	৫।১।১৩৫৬	৭৮১	১৯।৪।১৩৭৯
৭৫৮	২৫।১২।১৩৫৬	৭৮২	৭।৪।১৩৮০
৭৫৯	১৪।১২।১৩৫৭	৭৮৩	২৮।৩।১৩৮১
৭৬০	৩।১২।১৩৫৮	৭৮৪	১৭।৩।১৩৮২
৭৬১	২৩।১১।১৩৫৯	৭৮৫	৬।৩।১৩৮৩
৭৬২	১১।১১।১৩৬০	৭৮৬	২৪।২।১৩৮৪

হিজরা	খ্রীষ্টাব্দের কোন্ তারিখে আরম্ভ	হিজরা	খ্রীষ্টাব্দের কোন্ তারিখে আরম্ভ
৭৮৭	১২।২।১৩৮৫	৮১৪	২৫।৪।১৪১১
৭৮৮	২।২।১৩৮৬	৮১৫	১৩।৪।১৪১২
৭৮৯	২২।১।১৩৮৭	৮১৬	৩।৪।১৪১৩
৭৯০	১১।১।১৩৮৮	৮১৭	২৩।৩।১৪১৪
৭৯১	৩১।১২।১৩৮৮	৮১৮	১৩।৩।১৪১৫
৭৯২	২ ।১২।১৩৮৯	৮১৯	১।৩।১৪১৬
৭৯৩	৯।১২।১৩৯০	৮২০	১৮।২।১৪১৭
৭৯৪	২৯।১১।১৩৯১	৮২১	৮।২।১৪১৮
৭৯৫	১৭।১১।১৩৯২	৮২২	২৮।১ ১৪১৯
৭৯৬	৬।. ১ ১৩৯৩	৮২৩	১৭।১।১৪২০
৭৯৭	২৭।১০।১৩৯৪	৮২৪	৬।১।১৪২১
৭৯৮	১৬।১০।১৩৯৫	৮২৫	২৬।১২।১৪২১
৭৯৯	৫।১০।১৩৯৬	৮২৬	১৫।১২।১৪২২
৮০০	২৪।৯।১৩৯৭	৮২৭	৫।১২।১৪২৩
৮০১	১৩।৯।১৩৯৮	৮২৮	২৩।১১।১৪২৪
৮০২	৩ ৯।১৩৯৯	৮২৯	১৩।১১।১৪২৫
৮০৩	২২।৮।১৪০০	৮৩০	২।১১।১৪২৬
৮০৪	১১।৮।১৪০১	৮৩১	২২।১০।১৪২৭
৮০৫	১।৮।১৪০২	৮৩২	১১।১০।১৪২৮
৮০৬	২১।৭।১৪০৩	৮৩৩	৩০ ৯ ১৪২৯
৮০৭	১০।৭।১৪০৪	৮৩৪	১৯।৯।১৪৩০
৮০৮	২৯।৬।১৪০৫	৮৩৫	৯।৯।১৪৩১
৮০৯	১৮।৬।১৪০৬	৮৩৬	২৮।৮।১৪৩২
৮১০	৮।৬।১৪০৭	৮৩৭	১৮।৮।১৪৩৩
৮১১	২৭।৫।১৪০৮	৮৩৮	৭ ৮।১৪৩৪
৮১২	১৬।৫।১৪০৯	৮৩৯	২৭।৭।১৪৩৫
৮১৩	৬।৫।১৪১০	৮৪০	১৬।৭।১৪৩৬

হিজরা	খ্রীষ্টাব্দের কোন্ তারিখে আরম্ভ	হিজরা	খ্রীষ্টাব্দের কোন্ তারিখে আরম্ভ
৮৪১	৫	৭	১৪৩৭	৮৬৮	১৫	৯ ১৪৬৩
৮৪২	২৪ ৬	১৪৩৮	৮৬৯	৩	৯	১৪৬৪
৮৪৩	১৪ ৬	১৪৩৯	৮৭০	২৪ ৮	১৪৬৫
৮৪৪	২ ৬	১৪৪০	৮৭১	১৩ ৮ ১৪৬৬
৮৪৫	২২	৫	১৪৪১	৮৭২	২ ৮ ১৪৬৭
৮৪৬	১২ ৫.১৪৪২	৮৭৩	২২|৭|১৪৬৮
৮৪৭	১	৫	১৪৪৩	৮৭৪	১১	৭	১৪৬৯
৮৪৮	২০ ৪ ১৪৪৪	৮৭৫	৩০	৬	১৪৭০
৮৪৯	৯.৪ ১৪৪৫	৮৭৬	২০|৬|১৪৭১
৮৫০	২৯ ৩ ১৪৪৬	৮৭৭	৮ ৬	১৪৭২
৮৫১	১৯.৩|১৪৪৭	৮৭৮	২৯ ৫|১৪৭৩
৮৫২	৭.৩|১৪৪৮	৮৭৯	১৮|৫|১৪৭৪
৮৫৩	২৭.২|১৪৪৯	৮৮০	৭ ৫|১৪৭৫
৮৫৪	১৪.২|১৪৫০	৮৮১	২৬|৪|১৪৭৬
৮৫৫	৩	২	১৪৫১	৮৮২	১৫	৪	১৪৭৭
৮৫৬	২৩	১	১৪৫২	৮৮৩	৪	৪	১৪৭৮
৮৫৭	১২	১	১৪৫৩	৮৮৪	২৫	৩	১৪৭৯
৮৫৮	১	১	১৪৫৪	৮৮৫	১৩	৩	১৪৮০
৮৫৯	২২	১২	১৪৫৪	৮৮৬	২	৩ ১৪৮১
৮৬০	১১	১২	১৪৫৫	৮৮৭	২০	২	১৪৮২
৮৬১	২৯	১১	১৪৫৬	৮৮৮	৯	২	১৪৮৩
৮৬২	১৯	১১	১৪৫৭	৮৮৯	৩০	১	১৪৮৪
৮৬৩	৮	১১	১৪৫৮	৮৯০	১৮	১	১৪৮৫
৮৬৪	২৮	১০	১৪৫৯	৮৯১	৭	১	১৪৮৬
৮৬৫	১৭	১০	১৪৬০	৮৯২	২৮	১২	১৪৮৬
৮৬৬	৬	১০	১৪৬১	৮৯৩	১৭	১২	১৪৮৭
৮৬৭	২৬	৯	১৪৬২	৮৯৪	৫	১২	১৪৮৮

হিজরা	খ্রীষ্টাব্দের কোন্ তারিখে আরম্ভ	হিজরা	খ্রীষ্টাব্দের কোন্ তারিখে আরম্ভ
৮৯৫	২৫	১১	১৪৮৯	৯২১	১৫	২	১৫১৫
৮৯৬	১৪	১১ ১৪৯০	৯২২	৫	২	১৫১৬
৮৯৭	৪	১১	১৪৯১	৯২৩	২৪ ১	১৫১৭
৮৯৮	২৩	১০	১৪৯২	৯২৪	১৩	১	১৫১৮
৮৯৯	১২	১০	১৪৯৩	৯২৫	৩	১	১৫১৯
৯০০	২	১০	১৪৯৪	৯২৬	২৩	১২	১৫১৯
৯০১	২১ ৯	১৪৯৫	৯২৭	১২	১২	১৫২০
৯০২	৯	৯ ১৪৯৬	৯২৮	১	১২	১৫২১
৯০৩	৩০	৮	১৪৯৭	৯২৯	২০	১১	১৫২২
৯০৪	১৯	৮	১৪৯৮	৯৩০	১০	১১	১৫২৩
৯০৫	৮ ৮	১৪৯৯	৯৩১	২৯	১০	১৫২৪
৯০৬	২৮	৭	১৫০০	৯৩২	১৮	১০	১৫২৫
৯০৭	১৭	৭	১৫০১	৯৩৩	৮	১০ ১৫২৬
৯০৮	৭	৭	১৫০২	৯৩৪	২৭	৯ ১৫২৭
৯০৯	২৬	৬	১৫০৩	৯৩৫	১৫	৯	১৫২৮
৯১০	১৪	৬	১৫০৪	৯৩৬	৫	৯	১৫২৯
৯১১	৪ ৬	১৫০৫	৯৩৭	২৫ ৮	১৫৩০
৯১২	২৪	৫	১৫০৬	৯৩৮	১৫	৮	১৫৩১
৯১৩	১৩	৫	১৫০৭	৯৩৯	৩	৮	১৫৩২
৯১৪	২	৫ ১৫০৮	৯৪০	২৩	৭	১৫৩৩
৯১৫	২১	৪	১৫০৯	৯৪১	১৩	৭	১৫৩৪
৯১৬	১০	৪	১৫১০	৯৪২	২	৭	১৫৩৫
৯১৭	৩১	৩	১৫১১	৯৪৩	২০	৬	১৫৩৬
৯১৮	১৯	৩	১৫১২	৯৪৪	১০	৬	১৫৩৭
৯১৯	৯	৩	১৫১৩	৯৪৫	৩০	৫	১৫৩৮
৯২০	২৬	২ ১৫১৪		

সঙ্কেতপঞ্জী

বা. সা. ই. ১।২—ডঃ সুকুমার সেন রচিত বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ।

বা. সা ই. ১।৩—ঐ, তৃতীয় সংস্করণ।

বা. সা. ই. ১।৪—ঐ, চতুর্থ সংস্করণ।

সা. প. প.– সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা।

I. H. Q.—Indian Historical Quarterly,

I. M. C.—Indian Museum Catalogue.

J. A. S.—Journal of the Asiatic Society.

J. A. S. B.—Journal of the Asiatic Society of Bengal.

J. A. S. P.—Journal of the Asiatic Society of Pakistan.

J. B. O. R. S.—Journal of the Bihar and Orissa Research Society.

J. B. R. S.—Journal of the Bihar Research Society.

J. N. S. I.—Journal of the Numismatic Society of India.

P. A. S. B.—Proceedings of the Asiatic Society of Bengal.

নির্ঘণ্ট ও গ্রন্থপঞ্জী

এবং

সামাজিক ইতিহাসের বিষয়সূচী

নির্ঘণ্ট ও গ্রন্থপঞ্জী

[এই গ্রন্থ রচনার সময় যে সমস্ত গ্রন্থ থেকে উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে, অথবা কোন-না-কোন ভাবে যে সব গ্রন্থ লেখকের কাজে লেগেছে, সেগুলি নির্ঘণ্টে * চিহ্ন দিয়ে উল্লেখ করা হল। আশা করি, এতেই গ্রন্থপঞ্জীর প্রয়োজন নিবৃত্ত হবে। বেশীর ভাগ গ্রন্থেরই আধুনিকতম সংস্করণ ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য কোন কোন গ্রন্থের অন্য সংস্করণ ব্যবহৃত হয়েছে। অপ্রকাশিত গ্রন্থগুলির বেলায় কোথাও পুঁথি ব্যবহার করা হয়েছে, কোথাও বা অন্য লেখকের বিবরণের উপর নির্ভর করা হয়েছে।]

সামাজিক ইতিহাসের বিষয়সূচী

[বর্তমান গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ে স্বাধীন সুলতানদের আমলের বাংলাদেশ সম্বন্ধে বিভিন্ন সমসাময়িক সূত্রের সাক্ষ্য উদ্ধৃত হয়েছে। ঐ যুগের বাংলার সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে বহু তথ্যই তার মধ্যে পাওয়া যাবে। এই গ্রন্থের অন্যত্রও সামাজিক ইতিহাস সংক্রান্ত দু' একটি তথ্য উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু সে যুগের সামাজিক ইতিহাস বিষয়ানুক্রমে লিখিত না হওয়ায়—যাঁরা কোন নির্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে জানতে চান, তাঁদের অসুবিধা হতে পারে। সেই অসুবিধা দূর করার জন্য—আমরা এই গ্রন্থে পরিবেশিত সে যুগের বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যের একটি বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী এখানে সংকলন করে দিলাম।]